"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

১৩২৯ বৈশাখ হইতে আ

তি-সংখ্যার মূল্য ।৵০]

ভারতী কার্য্যালয়

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

১৩২৯ বৈশাখ—আশ্বিন

বিষয়-সূচী

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র সূচী

৪৬শ বর্ষ, } বৈশাখ, ১৩২৯ { প্রথম সংখ্যা

বিদূষক

১

কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। চন্দনে, হাতির দাঁতে, আর সোনা-মাণিকে হাতি বোঝাই হল।

দেশে ফেরবার পথে বলেশ্বরীর মন্দির বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজা পূজো দিলেন।

পূজো দিয়ে চলে আসচেন—গায়ে রক্তবস্ত্র, গলায় জবার মালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক, সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আর বিদূষক।

একজায়গায় দেখ্‌লেন পথের ধারে আমবাগানে ছেলেরা খেলা করচে।

রাজা তার দুই সঙ্গীকে বল্‌লেন, "দেখে আসি, ওরা কি খেল্‌চে।"

২

ছেলেরা দুই সারি পুতুল সাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলচে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে কার যুদ্ধ?"

তারা বল্‌লে, "কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীর।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার জিৎ, কার হার?"

ছেলেরা বুক ফুলিয়ে বল্‌লে, "কর্ণাটের জিৎ কাঞ্চীর হার।"

মন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হল, রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদূষক হা হা করে হেসে উঠ্‌ল।

৩

রাজা যখন তাঁর সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন, তখনো ছেলেরা খেলচে।

রাজা হুকুম করলেন, "একেকটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাঁধো, আর লাগাও বেত!"

গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছুটে এল। বল্‌লে, "ওরা অবোধ, ওরা খেলা করছিল, ওদের মাপ কর।"

রাজা সেনাপতিকে ডেকে বল্‌লেন, "এই গ্রামকে শিক্ষা দেবে, কাঞ্চীর রাজাকে কোনো দিন যেন ভুল্‌তে না পারে।"

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

৪

সন্ধ্যে বেলায় সেনাপতি রাজার সমুখে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করে বললে, "মহারাজ, শৃগাল কুকুর ছাড়া এ গ্রামে কারো মুখে শব্দ শুন্‌তে পাবে না।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মহারাজের মান রক্ষা হল।"

পুরোহিত বল্‌লে, "বিশ্বেশ্বরী মহারাজের সহায়।"

বিদূষক বল্‌লে, "মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।"

রাজা বল্‌লেন, "কেন?"

বিদূষক বল্‌লে, "আমি মার্‌তেও পারিনে, কাট্‌তেও পারিনে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাস্‌তে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাস্‌তে ভুলে যাব।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কে !

চির-চেনার চমক নিয়ে চির-চমৎকার
নতুন দুটি ভ্রমর-কালো চোখে
কে এলে গো হোরার মেলায় দৃষ্টি-অলঙ্কার
বৃষ্টি ক'রে পুলক স্বর্ণালোকে !

কে এলে গো !···অশোক বীথির ছায়ায় ছায়ায় আজি
নিশ্বাসে পাই তোমার নিশাসখানি।
পদ্মগন্ধা কে সুন্দরী জাফ্‌রাণে মুখ মাজ
হাওয়ার পিঠে গেলে আঁচল হানি'।

সৌরভে তোর বিভোর ভুবন মগজ সে মস্‌গুল্‌
ধূপের বাতি আগুন-ভ'য়ে ওঠে,
অগুরু-বাস আগুন-উছাস বিহ্বলে বিল্‌কুল্‌
সংজ্ঞাহারা বকুল ভুঁয়ে লোটে।

শামার শিসে কোন্ ইসারা করিস্ গো তুই কারে
মন গোপনে ওঠে কেমন ক'রে
চির-যুগের বিরহী ধায় তোমার অভিসারে
অশ্রু-মুক্তা অর্ঘ্যে দু'হাত ভ'রে।

চাঁদের আলোর রাজ্যে রাণী তুমি চাঁদের কোণা
মর্ত্ত্যজনের চির-অ ধর তুমি,
স্বর্গ তোমার প্রসাদ হাসি স্বপ্নে আনাগোনা
মূর্চ্ছে তৃষা তোমার আভাস চুমি'।—

আনন্দে তোর নিত্য-বোধন পূজা শিরীষ ফুলে
আরতি তোর আঁখির জ্যোতি দিয়ে
বিজ্ঞা তুমি সন্ধ্যা মেঘের রক্ত-নদীর কূলে
পূর্ণা তুমি প্রাণের পুটে প্রিয়ে !

পারিজাতের পাপ্‌ড়ি তুমি ইন্দ্রেরি উদ্যানে
রাঙা তুমি একশো হোমের ধূমে,
তপ্ত সোনার মূর্ত্তি তুমি নিদাঘ দিনের ধ্যানে
স্ফর্ত্তি তোমার পদ্মরাগের ঘুমে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পরের ছেলে

(উপন্যাস)

১

রুগ্ন স্বামী শয্যায় শুইয়া ছিলেন, স্ত্রী কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছেন। উভয়েই সংসারের নিকট বহুদিনের বহু অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন, কেন না উভয়েই চুল পাকাইয়া প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহাতে আবার স্বামী নন্দকিশোর রায় একজন বড় দরের জমিদার। তাঁহার সন্তান-হীনা পত্নী রাজেশ্বরী দেবীও স্বামীর সকল-বিষয়ে একমাত্র অধীশ্বরী। তাঁহাদের পরস্পরের স্নেহ বা কোন বিষয়ের মধ্যেই অন্য-কোন ভাগীদার নাই।

উভয়ের মুখ কিন্তু অতি বিষণ্ণ। কর্ত্তার ব্যারামের জন্য নূতন করিয়া আজ এ অশান্তি জাগে নাই। জমিদার আজ বৎসরাবধি কাল এইরূপে শয্যাগত আছেন সুতরাং সেটা উভয়পক্ষেরই যেন গা-সহা হইয়া গিয়াছে। এ বিষণ্ণতার অন্য কারণ ছিল।

কিছুক্ষণ পরে স্বামী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু বিনয় এটা ভালর জন্যই করেছে, বড় বৌ। ভাখো, এ ক'দিন কি তুমি আমার কাছে এ সময়টা বস্‌তে পেতে ? মায়ের জন্যে সে কেঁদে অস্থির করত, আর তোমরাও তা'কে নিয়ে—"

স্ত্রী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে প্রথম ক'দিন, বৌমা মারা যাবার দু-চার দিন পর পর্য্যন্ত। এদানি তো আর সে কাঁদত না। আমাকেই ঘুমের ঘোরে মা মনে করে—"

বলিতে বলিতে গৃহিণীর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। কর্ত্তা তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই যেন বলিলেন,

"হ্যাঁ, তা তোমায় সেই মাণ্ডড় ছেলে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখেই বিনয় খোকাকে তার শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েচে, বুঝেচ ? তুমি তো কখনো এ-সব হাঙ্গাম সওনি, ওতে তোমার কষ্ট হচ্ছে ভেবেই—"

গৃহিণী এবার একটু উচ্চ কণ্ঠে বেগের সহিতই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আর তোমার আদরের ভাগ্নের ভাবটি 'ভাল-ভাল' বলে আমার কাছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে যেয়ো না। তাকে কি আমার এত দিনেও চিন্তে বাকি আছে ? তুমি থাক্তেই আমার সঙ্গে চিরকাল যা করে চলেছে—এর পর সে যখন সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে বসবে, তখন যে আমার কি হাড়ির হাল্ করবে তা আমি বুঝতেই পারচি। কেবল তুমিই তা কখনো বুঝলে না।"

কর্ত্তা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে ঈষৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "কিন্তু বিনয় তো কখনো তোমায় অমান্য করে না। মুখ তুলে উঁচু করে কথাটি পর্য্যন্ত কয় না।"

গৃহিণী যেন খেদের সহিত বলিলেন, "ঐতো, ওতেই তুমি ভাবো, ভাগনের আমার ওপর খুব ভক্তি, না ? ওর চেয়ে মুখ তুলে যদি কখনো দুটো কোঁদল-কচকচি করত, সেও ছিল ভাল ! তা কি মায়ে-বেটাতেও হয় না ? আর এই যে ধরি মাছ না ছুঁই পানি ভাব, আমার সঙ্গে তার যেন কোন সুবাদই নেই, এ কি ভেবেছ খুব ভাল লক্ষণ ?" এ প্রশ্নে স্বামীর কোন উত্তর না পাইয়া আবার তিনি আরম্ভ করিলেন, "এই যে ছেলেটাকে নিয়ে কত ক'রে তার মাকে ভুললুম, নিয়ে দুদিন একটু নাড়তে-চাড়তে চাইলাম, তা তোমার বিনয়ের প্রাণে সইলো কি ? অমনি এখান থেকে নিজের শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। যদি আমার ওপর একটুও টান্ থাকৃত, তাহ'লে কি সে এ কাজ করতে পারত ? ককৃখনো না।"

কর্ত্তা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে মৃদুস্বরে আবার বলিলেন, "খোকাটা শান্ত আর কৈ হয়েছিল ? কালও তো মা-মা ক'রে রাত্রে খুব কেঁদেছিল।"

গৃহিণী এবার আরও একটু অধীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, কেঁদেছিল না হয় মান্লাম কিন্তু তার দিদিমার কাছে গিয়েই সে চুপ করবে ভেবেছ তোমরা ? তাকেই কি সে চেনে ? সেইতো ছ' মাসের ছেলে সেখান থেকে আসে, আর এখন তিন বছর পেরিয়েছে, দিদিমাকে সে কটা দিন দেখেছে বা তার কাছে থেকেছে ?"

"না, না—মাঝে মাঝে দেখেছে বৈ কি ! আর কি জান, হাজার হলেও নাড়ির টান্—কি বলে গিয়ে—রক্তর সম্বন্ধ যাকে বলে, সেটা—"

"ওগো বুঝেচি গো বুঝেচি। আমার সঙ্গে তো তাদের কোন রক্তর সম্বন্ধ নেই, তাই তোমরা আমার কাছে তার থাকা পছন্দ করতে পারলে না ! বেশ ত, তাতে আর এমন হয়েছে কি। আমারই বা কেন এত ঝক্কি—ভাগনের ছেলে বইতো নয়। তাকে মানুষ করে কি আমি চতুর্ভুজ হব। ভাগ্নেই কোনদিন সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, তা আমি আবার তার ছেলে নিয়ে আদ্দি করতে গেছি। যেমন আমার কপাল !"

বলিতে বলিতে ক্রন্দন-রুদ্ধ স্বরে গৃহিণী পাখা রাখিয়া উঠিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা কিছুক্ষণ কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে থাকিয়া শেষে চেষ্টার দ্বারা ঈষৎ কাশিয়া খানিক নড়িয়া-চড়িয়া দুই-একটা উঃ আঃ শব্দ করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট তখনি সিদ্ধ হইল। স্ত্রী আবার ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "রতনকে কি ডেকে দেব ?"

"রত্নাকে ! হাঁ, তা না তুমিই বসো,—এই একটু পিপাসা পেয়েছে আর কি।" স্ত্রী সোরাই হইতে গ্লাশে জল ঢালিয়া স্বামীর মুখের নিকট ধরিলেন এবং তাঁহার পান শেষ হইলে গ্লাশ রাখিয়া আবার নিঃশব্দে যথাস্থান অধিকার করিয়া পাখা হাতে লইলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, "তাহলে তোমার ইচ্ছেটা কি, বড় বৌ ?"

"ইচ্ছে ! আমার আবার কিসের ইচ্ছে !"

"ছাখো, আমার মনের কথা তো চিরদিনই তুমি জান, কিন্তু তোমার মনের কথা বল। আমার তা স্পষ্ট ক'রে জানার দরকার হচ্ছে দেখ্চি। তুমি কি চাও না যে বিনয়কে আমি জীবিতমানে যেমনভাবে চিরদিন রেখে এসেছি—অবর্ত্তমানে তা আর রাখি ?"

"সে আবার কি কথা ! আমি কি তোমার ভাগ্নেকে তাড়িয়ে দিতে বল্ছি নাকি ?"

"তাড়াবার কথা নয়,—অর্থাৎ তুমি কি সত্যিই চাওনা যে তুমি-আমি-অবর্ত্তমানে বিনয়ই আমাদের উত্তরাধিকারী হয় ?"

"আমি তা না চাইলেই কি তুমি আমায় তা দেবে ? তোমার ভাগ্‌নে,—তুমি কি তাকে—"

"বড় বৌ, বিনয়কে তাহলে তুমি আমাদের বিষয় থেকে বঞ্চিত করতেই চাও ?"

"আমি একবারও সে কথা বলিনি। বল, কথনো আমি তোমায় এ কথা বলেছি ? যখন চৌধুরীদের সেই নাড়ুস-নুদুস ছেলেটি আমায় দিতে চাইলে—আমি কি তখন তোমায় তা বল্‌তে পেরেছি যে, তোমার ন্যায্য অধিকারীকে বঞ্চিত করে তাকে আমায় নিতে দাও ? এখনো ইচ্ছা করলে এই আমাদের খোকার মতন কত ছেলে পাওয়া যায়—তাদের বাপ মায়ে ছেলে এত বড় বিষয়ের মালিক হবে জেনে আগ্রহ করেই দিতে চায়,—তা আমি কি—"

"না, তা করনি বটে—কিন্তু আজ আমি এটুকু ভাব্‌চি বড় বৌ—"

"তবে এটুকুও জেনো—বিনয় কখনো আমাকে মায়ের মতন দেখ্‌তে পারেনি, আর কখনো তা পার্‌বেও না! তাই কি কেউ কখনো পারে! অত বড় ছেলে—নিজের মায়ের কোলে বড় হয়েছে—সে অমনি পরকে মা মনে করলেই হলো! পরে যদি ঐ খোকাকে আমি কোলে-পিঠে ক'রে নিয়ে মানুষ করতে পেতাম—ওকে যদি নিতে দিত আমায়—তবেই ঠিক্ মা-ছেলের মতন সম্বন্ধ হতো। তুমি অবর্ত্তমানে আমায় সেই ভাগ্‌নের তাঁবেদারীতে মামী থাক্‌তে হবে—বিশেষ তোমার বিনয় যে চক্ষে আমায় ত্যাখে! কি যে আছে আমার অদৃষ্টে!"

বলিতে বলিতে গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন। যে সব ভবিষ্যৎ চিন্তার আভাস মাত্রেও তরুণেরা অধীর হইয়া সেদিক হইতে মনকে অন্যত্র ফিরাইয়া লয়—প্রৌঢ় দম্পতী অম্লান মুখেই সেই সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

কর্ত্তা খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া খেদের সহিত বলিলেন, "জানি, তোমার সেই নিজের ছেলের মত একটি ছেলে পাবার ইচ্ছেটা এতদিনেও মিলোয় নি। কিন্তু বিনয়ের কথাটাও মনে করো! সে আমার ভাগ্‌নে—চিরকাল তাকে ছেলের মত ক'রেই মানুষ ক'রে আস্‌ছি।"

"কিন্তু তা ব'লে সে কখনো ছেলের মতন ন্যাওটা হয়নি। পনের যোল বছরের ছেলে এসে কি তা হয় কখনো ?"

"শোনো। তার পরে সেও অনেকদিন জেনেছে যে মামা-মামী অবর্ত্তমানে আমিই এ সম্পত্তির মালিক। ভাল ক'রে তাই তখন লেখাপড়াও করলে না—এখন তো বিষম বাবু হয়ে উঠেছে। আমি যা না ক'রে উঠ্‌তে পারি—বিনে ততখানি নবাবী চালে চলে। গান-বাজনা আর বেহালা নিয়েই তো দিন-রাত কাটাচ্ছে।"

"যাহোক্, তোমার যে এটুকুও নজরে পড়েছে, এ দেখেও বাঁচলাম—"

"কিন্তু বুঝে ত্যাখো বড় বৌ, আমিই তার আখের এই রকম ক'রে নষ্ট করেছি। এখন সেই পাঁচশ ছাব্বিশ বছরের ধাড়ি ছেলেকে যদি "যা পারিস্ নিজে ক'রে খা গিয়ে" বলে তাড়িয়ে দিয়ে একটা পুষ্যিপুত্তুর নিই, তাহলে ধর্ম্মে কি বলে ?"

গৃহিণী একটু ভাবিবার ভাণ করিয়া বলিলেন "তা বটে, কিন্তু আর এক কাজ করলেও তো হয়।"

"কি কাজ ?"

"কেন, তার ছেলে খোকাকে যদি আমার পুষ্যিপুত্তুর নিইয়ে দাও।"

"খোকাকে ? তার মাণিককে ? বড় বৌ, তুমি ক্ষেপেচ! সে যাকে তোমার কাছ থেকে সরাবার জন্যে—কি যে বলে ভাল—সে তা কখনই দেবে না বড় বৌ, এ নিশ্চয় জেনো।"

"কথা চাপা দিচ্চ কেন! সে যে আমার কাছ থেকে ছেলে সরাবার জন্যেই শাশুড়ীর কাছে দিয়ে এসেছে, তা কি আমিই জানিনে ? আমি রাক্ষুসী—আমি ডাইনি—আমি তার ছেলেকে মেরে ফেল্‌তাম, তাই সে নিজে যাকে একদণ্ড চোখের আড় করতে পারত না, তাকে বাড়ী-ছাড়া করেছে।"

"আহা হা, কি যে বল,— তা নয় —"

"কিন্তু সে যাই হোক্, এইটে তোমায় বুঝতে হবে যে, এরই হাতে তুমি অবর্ত্তমানে আমাকে পড়তে হবে। যার ছেলের দিকে চাইলে কি কাছে কোলে নিলে ছেলের মন্দ হবে বলে তার বিশ্বাস, সেই ভাগ্ নেই আমার—"

"ওগো না গো, তা নয়। আমিও যে দেখেছি বড় বৌ, তুমি মাণিককে নিয়ে এমনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে যে আমার দিকেও মন দেবার তোমার সময় হ'তো না। ডেকে ডেকে তোমায় আমি পেতাম না। জানো, পরের ছেলেকে নিয়ে অত পাগল হতে নেই, তাতে কেবল কষ্ট ভোগ হয় মাত্র।"

"তা আমার অদৃষ্টে কি আর বাকি আছে দেখছ? কিন্তু তুমি যে আমায় ঐ ডাইনের হাতে ফেলে দেবে, সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না, জেনো। যদি অন্য কোন বিহিত না কর, দেখো, আমি কাশী গিয়ে ভিক্ষা করে খাব, তবু—"

"আঃ, কি যে পাগলের মত বকো বড় বৌ, তুমি বর্ত্তমানে বিনে কে! আমাদের অভাবে হবে তো সে বিনয় পাবে।"

"এই যদি তোমার শেষ মত হয় তাহলে আর কথার দরকার নেই, যা আমার অদৃষ্টে আছে হবে। তোমায় আর আমার কিছুই বল্‌বার নেই।"

"উঠো না, বসো। জানো তুমি যে তোমার অসুখী আমি কিছুতেই করতে পারব না, তেমনি তুমিও আমার ধর্ম্ম রেখে আমার কর্ত্তব্য আমায় বল, বড় বৌ।"

"ঐ ছেলেকেই আমায় পুষ্যি-পুত্তুর নিতে দাও। দেখি, বিনয় কি ক'রে তাকে তখন আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়!"

"এতে তো কারও জোর চল্‌বে না বড় বৌ। যদি সে ছেলে না দেয়?"

"অন্য পুষ্যি-পুত্তুর নেবার ভয় দেখালে তখন জব্দ হয়ে আপনিই সোজা হতে হবে।"

"তাও যদি না হয়?"

"সে তখন আমি বুঝ্‌ব, তুমি পুষ্যিপুত্তুরের অনুমতি দাও তো!"

স্বামী গম্ভীর মুখে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন, "কিন্তু আমার পা ছুঁয়ে একটা দিব্যি তোমায় করতে হবে। যদি বিনে কিছুতেই ছেলে না দেয়, তখন তুমিও অন্য পুষ্যি-পুত্তুর কিছুতেই নিতে পাবে না। এ দিব্যি না করলে আমি পোষ্যপুত্রের অনুমতি কিছুতেই দেব না তোমায়।"

গৃহিণী দুই হাতে স্বামীর পদ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন।

কর্ত্তা আবার বলিলেন, "তোমার ওপর আমার এটুকু নির্ভর আছে যে আমার আসল ইচ্ছাটাকে তুমি একেবারে অগ্রাহ্য করবে না। বিনয়ই আমার উত্তরাধিকারী, তবে তার ছেলেকে দেওয়াও যা, তাকে দেওয়াও তাই, তাই তোমায় সুখী করবার জন্যে এটুকুতে আমায় রাজী হতে হলো। আমি উইল ক'রে লিখে রেখে যাব যে, তোমার পুষ্যিপুত্তুরের অনুমতি রইল, কিন্তু তুমিও মনে রেখো আমার কথা।"

"সে কি, উইলে লিখে রেখে যাওয়া কি! তুমি একটু ভাল হয়ে আমায় ছেলে নিইয়ে দেবে না?"

"ভাল হওয়া বড় বৌ, এ মিছে আশাটা কি এখনো কর?—যাক্, তুমি এর পরে—"

"না, সে হবে না। তুমি আমায় ছেলে নিইয়ে দেবে —তা নইলে—"

"সেটুকু আমি পারব না, জেনো। এই শেষ-সময়ে এখন যে ছেলেটা নিয়ে টানা-হেঁচ্ড়া করে বিনেকে যন্ত্রণা দেওয়া, তা আমার দ্বারা হবে না। আমি আগে যাই, তারপরে তুমি যা পার, করো।"

"তবে আমার ছেলেয় কাজ নেই। তোমায় উইলও করতে হবে না,—আমার কিছুরই দরকার নেই।"

"ছেলে-মানুষি করো না। এখন কিছুদিন দরকার বোধ না করলেও পরে আবার একদিন হয়ত দরকার বোধ করবে। আর বিনে যাতে তোমার অধীন হয়ে থাকে, ভবিষ্যৎ ভেবে, সেটুকুও আমার ক'রে যাওয়া উচিত বই কি। এই পুষ্যি-পুত্তুরের অনুমতি লিখে দিয়ে গেলেই সে তোমার হাত-ধরা হয়ে থাক্‌বে, কিন্তু তুমিও আমার ধর্ম্ম রেখো।"

"কেন বারে বারে বল্‌ছ অমন ক'রে! থাক্, তোমায় কিছু লিখতে হবে না। পুষ্যি-পুত্তুর, উইল, এ সবে আমার

দরকার নেই গো। যা ভগবান কর্‌বেন, তাই হবে এর পরে, এখন ও-সব কথা থাক্, দুটো অন্য কথা কও।"

"তা কইছি। এর জন্যে আমাদের নতুন ক'রে বেশী কিছু তো ভাবতে হচ্চে না। যা ভাববার তাতো এই এক বৎসরে আমরা ভেবেও রেখেচি। তোমার এতদিনে প্রস্তুত হয়ে ওঠা উচিত ছিল বড় বৌ, আমরা তো আর ছেলে-মানুষটী নই। দু-জনেরই মাথার আর কগাছি চুল কালো আছে? এখন দু-চার বছর আগে আর পরে এই তো কথা! যাক্, তাহলে ঐ পরামর্শ ভাল, বিনেও তাহলে তোমার বশে থাক্‌বে। আর নিতান্তই যদি তুমি শেষে তার ছেলেকে নাও—তাতেও বিনের কিছু ক্ষতি হবে না।"

"ছেড়ে দাও না ও-সব ভাবনা গো—"

"এই যে! রত্নাকে ডাকাও—কি খেতে দেবে, দাও—এইবার ঘুমুতে হবে।"

২

আবার বৎসর ঘুরিতে চলিল। বহু যত্ন বহু চিকিৎসাতেও যখন জমিদার আরোগ্য হইলেন না, তখন সকলেই বুঝিল, কালের আহ্বান, ইহাকে নিষ্ফল করা মানুষের চেষ্টার অতীত ব্যাপার।

নন্দকিশোর রায় এই এক বৎসর রোগ-শয্যায় শুইয়া ভাগিনেয় ও পত্নীর পরস্পরের প্রতি মনোভাব লক্ষ্য করিয়া শেষে অপুত্রা পত্নীর ইচ্ছামত ব্যবস্থা করাই উচিত বলিয়া মনে করিলেন। বিনয়ের মনুষ্যোচিত গুণের অভাব নাই, তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে পুত্রের অভাবই সে নিবারণ করিতেছে বটে, কিন্তু তবু যেন মাতুলানীর প্রতি তাহার মনের ধারণা তেমন কোমল নয়। মাতুলানীও যে তাহার প্রতি স্নেহশীলা নন, তাহা জমিদার পূর্ব্বাবধিই জানিতেন, কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে বিনয়কে তাঁহার স্ত্রীর আর একটু অধানে রাখিয়া গেলেই যেন তাঁহার পত্নীর পক্ষে ভাল হয়, এইরূপ ধারণা ক্রমশঃই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রী তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া যে শপথ করিয়াছেন, তাহার যে তিনি ব্যতিক্রম করিবেন না, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে বিশেষভাবেই ছিল। তাহা হইলে এ দত্তক-গ্রহণে বিনয়ের ক্ষতি কিছুই নাই, তাহার উপযুক্ত মাসহরার বন্দোবস্তও না হয় তিনি করিয়া যাইবেন, বাকি, বিনয় যেমন আছে তেমনি বরং সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াই থাকিবে। ইহাতে মাত্র স্ত্রীর অনেকখানি সন্তোষ, তাঁহার চিরবুভুক্ষু অন্তরের কতকটা তৃপ্তি-সাধন এবং বিনয়কে তাঁহার বশতাপন্ন করিয়া রাখা এই গুরু উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে। মাতুলানীও ভাগিনার উপর যেরূপ স্নেহহীনা, ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে অশান্তি কাটিয়া যাইবারো সম্ভাবনা। কিন্তু এই ব্যাপারে মাতুলানীর মনও অলক্ষ্যে বিনয়ের প্রতি একটু সমবেদনাশীল হইয়া পড়িবার কথা, কেননা যেমন করিয়াই হোক্ বিনয়কে কতকটা বঞ্চিত এবং আঘাত দেওয়া তো হইবেই। এক্ষেত্রে মাতুলানীর বক্র মনও তাহার প্রতি একটু কোমল হইবে এ সম্ভাবনাও রহিল।

এই এক বৎসর বিনয়ের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, রোগশয্যায় পড়িয়াও মাতুল পুনঃপুনঃ তাহাকে বিবাহের অন্য অনুরোধ করিয়াছেন, বিনয়ও পুত্রোচিত উত্তর দিয়াছে—আপনি আগে সারিয়া উঠুন, পরে সে কথা। কিন্তু এই এক বৎসরেও সে ছেলেটিকে একদিনও এ-বাড়ীতে আনে নাই। সেই যে স্ত্রীর মৃত্যুর দিন-কতক পরেই তাহাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিয়াছে, তাহার পর আর একদিনও শিশু পুত্রকে মাতুলানীর নিকট আনিয়া দেয় নাই। মাতুলের শুশ্রূষা করিয়া দিনে বা রাত্রে যে কোন সুবিধা-মত সময়ে কিরূপে ছেলেকে দেখিতে গ্রামান্তরে ছোটে, তাহাও কর্ত্তা জানিতেন। মাণিককে না দেখিয়া সে যে একদিনও থাকিতে পারেনা তাহা সকলেই জানে, কিন্তু মাতুলানীর কাছে তাহাকে রাখিতেই বা বিনয়ের কিসের এত আপত্তি? বধূ মরিয়া যাওয়ার পর মাতুলানী যে তাহার শিশুকে খুবই ভাল বাসিতেছিলেন, তাহা বিনয় তো জানে, তবে বিনয়ের এ কি রকম আচরণ! মাত্র এই একটী অপরাধই তাহার বাকি সমস্ত স্বভাবের উপরে একটা সন্দেহের ছায়া আনিয়া দিতেছে। সে ঘোর বাবু,—গাড়ী নহিলে এক পা হাঁটে না, তাহার চাল-চলন জমিদারের উপরও সময়ে সময়ে উঠিয়া থাকে, সাধারণ জমিদার-সন্তানের মতই অল্প-দিনে সেও লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া আমোদে কাল কাটায়, তথাপি মাতুল একদিনও তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন্ নাই।

জানিতেন, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। তাঁহাদের যৌবনও এইভাবে ব্যয়িত হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারীও যে সেই দৃষ্টান্ত ধরিবে, এ'ত একান্তই সাধারণ কথা। কিন্তু পুত্র-সম্বন্ধে বিনয়ের এই বক্র ভাব, এইটাই মাতুলের সব চেয়ে খারাপ লাগিল। তাহার শ্বশুরালয়ও মোটেই সম্পন্ন ঘর নয়, স্বামীহীনা শ্বশ্রুঠাকুরাণী অতি-কষ্টেই নিজের সন্তান-সন্ততিগুলিকে পালন করিয়া থাকেন। সেই অভাবের মধ্যে বিনয় নিজের সন্তানকে রাখিয়াছে, তবু এখানকার সর্ব্বপ্রকারের বাঞ্ছিত আদরের মধ্যেও তাহাকে রাখিতে চাহে না—এ যে বড়ই বিসদৃশ ব্যবহার! জমিদারও ইহাতে ক্রমে মনে ঈষৎ অভিমান বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু গম্ভীর স্বভাব-প্রযুক্ত ভাগিনাকে একদিনও এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করিলেন না।

নিজের মেয়াদ ফুরাইতে আর বেশী দেরী নাই বুঝিয়া তিনি অতি-বিশ্বাসী দুই-তিনটি বন্ধুর সাক্ষাতে পত্নীকে দত্তক গ্রহণের স্বাক্ষরিত অনুমতি দিলেন এবং যতদিন না পত্নী ইচ্ছা করিবেন সেই ক্ষুদ্র উইলখানি ততদিন পর্য্যন্ত গোপন রাখিতেই পত্নী ও বন্ধুদের আদেশ দিলেন। বুঝি, তখনো তাঁহার মনে ক্ষীণ আশা ছিল, যদি ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে, তাঁহার বিয়োগে যদিই পত্নীর এ বিষয়ে একটু উপেক্ষা আসিয়া বিনয়কে এ আঘাত হইতে রক্ষা করে!

সেইদিনই জমিদার আরও বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। বিনয় সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিল। মনে আশা ছিল, অন্ততঃ সন্ধ্যার পরেও মাতুল একটু ঘুমাইতে পারিলে সে টম্‌টম্ হাঁকাইয়া এক-ছুটে গিয়া মাণিককে একবার দেখিয়া আসিবে। এটুকু না হইলে রাত্রে যে সে ঘুমাইতেই পারিবে না। নহিলে এ সময়ে না হয় একদিন গ্রামান্তরে নাই ছুটিত। কিন্তু বিনয়ের যে তা একেবারেই সাধ্যাতীত! আর তাহার মনের ধারণা, তাহার মাণিকও বুঝি দিনান্তে একবার অন্ততঃ তাহাকে না দেখিলে অসুস্থতা বোধ করিবে, বুঝি সেও রাত্রে সুস্থ হইয়া ঘুমাইবে না! রাত্রে ঘুমের ঘোরে বুঝি কাঁদিবে! এক বৎসর সে মাতৃহীন হইয়াছে, এই এক বৎসর বিনয়ই যে সন্ধ্যার পর নিত্য তাহাকে ঘুম পাড়ায়

কিন্তু সন্ধ্যা হইতে সহিস টম্‌টমে ঘোড়া জুতিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তথাপি বিনয় বাহির হইতে পারিল না। মাতুল যে কিছুতেই সুস্থ হন না, ঘুম আসা তো দূরের কথা! এপাশ ওপাশ উঃ আঃ করিতে করিতে এক সময় বিনয়ের মুখের পানে চাহিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ তোমার যে বেরুনো হচ্ছে না। আমি এখন একটু ভাল বোধ করছি—তুমি যেতে পার।"

বিনয় নত মস্তকে রহিল, উত্তর দিল না। সবই বুঝিল,—মাতুলের ইহা স্তোক্ বাক্যমাত্র। তিনি এখনো একটুও সুস্থতা বোধ করেন নাই! নিঃশব্দে সে তাঁহার মাথায় বাতাস দিতে লাগিল। স্ত্রী পায়ের তলায় বসিয়া মাঝে মাঝে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, তাঁহার পানে চাহিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "তুমি এসে বাতাস কর, বিনয়কে ছেড়ে দাও।"

মাতুলানীর দিকে মাথা তুলিয়া চাহিয়া বিনয় বলিল, "থাক্, আজ আর যাব না।"

"তাও কি হয়? যাও।"

রাজেশ্বরী উঠিয়া আসিয়া বিনয়ের হাত হইতে পাখা লইলেন। বিনয় অগত্যা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাতুল আবার বলিলেন, "দেরী করছ কেন—রাত হয়ে যাচ্ছে যে। ফিরতে বেশী রাত হলে আবার ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।"

বিনয় ধীরে ধীরে মাতুলানীর অধিকৃত স্থানে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়ত।"

পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঈষৎ তীব্রস্বরে মাতুল বলিলেন, "তুমি তো ঘুমোওনি,—যাও।"

এ কি অভিমান? মাতুল তো কখনো এই আজিকার মত এমন ভাবের কথা বলেন নাই! অভিমান-বিদ্ধ স্বর বিনয়কে যেন চমকিত করিয়া তুলিল! এই পিতৃসম স্নেহশীল ব্যক্তিকে বুঝি সে আঘাতই দিয়াছে! তাহার এই দুর্ব্বলতাকে তিনি বুঝি ক্ষমা করিতে পারেন নাই। বিনয় উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সহসা মাতুলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই যেন শোনাইয়া বিনয় বলিল, "আমি খোকাকে আন্‌তে যাচ্ছি।"

মাতুল পাশ ফিরিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিলেন। মাতুলানী ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! কেন?"

উত্তর না দিয়া বিনয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায়,—মাতুলানীর স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "না, না, এখন আর তাকে আন্‌তে হবে না,—এখন আর কেন!"

বিনয় বাধা মানিল না, নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

গভীর রাত্রে চোরের মত নিঃশব্দে পা টিপিয়া বিনয় যখন মাতুলের কক্ষে প্রবেশ করিল, মাতুল তখন ঈষৎ সুস্থ বোধ করিয়াই ঘুমাইতেছেন অথবা নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া আছেন মাত্র, তাহা বিনয় বুঝিতে পারিল না। কেবল মাতুলানী বিনিদ্র-ভাবে তাঁহার নিকটে বসিয়া আছেন, দেখিল। বিনয় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দেই বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি চোখ্ তুলিতেই ভাগিনার সঙ্গে চোখো-চোখি হইয়া গেল। বিনয় মৃদুস্বরে বলিল, "আনতে পার্‌লাম না, তার জ্বর হয়েছে। এই ঠাণ্ডায়—"

"ভালই করেছ। এ সময়ে কে তাকে এখন দেখ্‌বে?

শেষ রাত্রি হইতেই জমিদারের অসুস্থতা অত্যন্ত বাড়িল এবং প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ করিল। সেদিন রাত্রিটা সেইভাবে কাটাইয়া পর দিন প্রাতঃকালে নন্দকিশোর বাবু প্রাণত্যাগ করিলেন। ভাগ্যের বিরূপতায় বিনয় আর নিজের ত্রুটিটুকু সংশোধন করিবার অবসরই পাইল না।

৩

কয়েকদিন মাত্র স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, তখনো শ্রাদ্ধ-শান্তি চোকে নাই। স্বামীর বিপুল নামের উপযুক্ত ভাবে তাঁহার ঊর্দ্ধ্বদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য, সদ্য বিধবা রাজেশ্বরী দেবী তাঁহার শোক-শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভাগিনা বর্ত্তমান থাকিলেও অপুত্রা পত্নী তিনিই যে স্বামীর মুখাগ্নি হইতে সমস্ত কার্য্যেরই অধিকারী। কাজেই অবস্থা-গতিকে তাঁহার এ প্রৌঢ় বয়সের শোককে প্রথম হইতেই তাঁহাকে যথাসাধ্য সম্বরণ করিতে হইয়াছিল। আর এই দুই বৎসর যে তাঁহাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, ইহাও সত্য।

দাসীর মধ্যস্থতায় কর্ম্মচারীর সহিত সকল দিকের নানা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া রাজেশ্বরী দেবী ক্লান্তভাবে বসিয়াছেন, এমন সময় সহসা চমকিত হইয়া দেখিলেন, পঞ্চম বর্ষীয় শিশু পুত্রের হাত ধরিয়া বিনয় তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

খানিকক্ষণ কেহই কথা কহিলেন না। রাজেশ্বরী বুঝিতে ছিলেন, কি উদ্দেশ্যে আজ বিনয়ের এ সন্ধি-স্থাপন। আজ মাণিককে তাঁহার হাতে দিতে আসে নাই, যাঁহার জন্য সে দিন রাত্রে ছুটিয়া গিয়াও বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, আজ স্বর্গগত সেই তাঁহারই প্রীত্যর্থে পুত্রকে মাতুলানীর নিকট আনিয়া দিতেছে। কিন্তু কেন আর?

কিছুক্ষণ পরে অপ্রসন্ন স্বরে তিনি বলিলেন, "এখন কেন আন্‌লে? কে ওকে এখন দেখ্‌বে? আর দুদিন পরে তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে নয় একেবারেই আসতো। তিনি কাজে আসতে পারবেন তো?"

"আসবেন বৈ কি; মাণিককে আগেই আন্‌লাম।"

"কেন আন্‌লে বাছা? কার কাছে ও থাকবে? তুমি সাম্‌লাতে পারবে ত?"

বিনয় উত্তর না দিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া তখন বেগের সহিত আবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যাঁর জন্যে এনেচ, তিনি তো আর দেখতে আসছেন না! আমার আর কেন বাছা! আমি আর তোমার ছেলে নিয়ে কি করব,—কিছুতেই আর আমার কাজ নেই। সব দরকারই এখন আমার ফুরিয়ে গেছে। দিয়ে এসো ওকে তোমার শাশুড়ীর কাছে, তার সঙ্গে একেবারেই তখন আসবে।"

দ্বিগুণ আহত পাইয়া ম্লান মুখে বিনয় সেখান হইতে চলিয়া গেল। তার মনে বিশ্বাস ছিল, মাতুলানী মুখে যতই যা বলুন, নিকটে ফেলিয়া দিয়া গেলে নারী-স্বভাব-বশে শিশুকে তিনি দেখিতে বাধ্য হইবেনই। হইলও তাই।

পিতাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মাণিক চঞ্চল হইয়া ওঠায় রাজেশ্বরী একজন দাসীকে আহ্বান

করিয়া তখন তাহাকে লইতে বলিলেন এবং একটু পরেই কিছু খেলনা ও খাবার লইয়া আবার তাহার নিকটস্থ হইলেন।

শোকের প্রাবল্যের মুখে তিনি ভাবিয়াছিলেন, আর তাঁহার কিছুতেই কাজ নাই, কিন্তু কয়েকদিন পরেই নিজের সে ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন, না, সমস্ততেই এখনো তাঁহার দরকার আছে। এমন কি বুঝি পূর্ব্বের অপেক্ষা আরো বেশী করিয়াই তাহার প্রয়োজন পড়িতেছে! এতদিন নিজের অধিকারটা তো এমন জাহির হইবার দরকার ছিল না। তাহারই যে সব, এতো আর কাহাকেও কানে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইতে হইত না! আজ সে অধিকার ভগবানের বিধানে কোথায় যেন খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে—তাই তাহার বন্ধন তাহার মোহও যেন বেশী করিয়া আঁটিয়া বসিতেছে। সর্ব্ববিষয়ে সত্ব সাব্যস্তের জন্য অন্তরে-বাহিরে একটা যেন বিদ্রোহ বাধিয়া উঠিতেছে।

উপযুক্ত সমারোহে নন্দকিশোর রায়ের শ্রাদ্ধ চুকিয়া গেল। কেহ ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিল, কেহ বা নাক সিঁটকাইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, তাঁর উপযুক্ত কি এই কাজ? ছেলে নাই, পিলে নাই, দান-সাগর করা উচিত ছিল। কেহ বা উত্তর দিল, "ছেলে নাই কি গো—ভাগ্‌নে রয়েছে, গিন্নি কি এখন সব উড়িয়ে দেবে! ভাগ্‌নে,—ভাগ্‌নের ছেলে! ভগবান দিলে ওতেই একটা সংসার হতে পারে। কর্ত্তা তো চিরদিনই সবগুলিকে মানুষ ক'রে আসছেন, এখন ওরা ছাড়া গিন্নিরও আর কেই বা আছে? ওদের নিয়েই তিনি সংসার ধর্ম্ম করবেন।"

বিনয়ের শাশুড়ী অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত এ সব কথায় সায় দিতেছিলেন কিন্তু লক্ষ্য করিলেন, পাঁচজনের এই-সব মন্তব্য শুনিয়া কর্ত্রীর মুখ ক্রমশ অন্ধকার হইয়া উঠিতেছে। আর বিনয় দেখিতেছিল, তাঁহার মুখে-চোখে আবার সেই সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষার চিহ্ন জাগিয়া উঠিতেছে—যাহার জন্য মাণিককে লইয়া সে দূরে রাখিয়াছিল। এ যে শুধু স্নেহ নয়, মমতা নয়। সে আত্মদানের চিহ্ন এ স্নেহে বিনয় খুব কমই দেখিতে পাইত। এ যেন কেবল আত্মসাৎ করিয়া লইবারই একটা বিপুল চেষ্টা, শুধু আপনার বলিয়া পাইবার একটা দুর্দ্দম অভিলাষ! ইহাই যে বিনয় সহিতে পারে নাই! আবার সেই ভাব মামীর মধ্যে ঈষৎ জাগিতে দেখিয়া বিনয় ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

কিন্তু এতদিন সে যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য যে সেদিন অনুতপ্তও হইতে হইয়াছে! সেই অনুতাপেই সে আবার নিজে হইতে ছেলেকে মামীর কাছে আনিয়া দিয়াছে! এখন এটুকু যে তাহাকে সহিতেই হইবে। আর এখন মাণিক ক্রমশ বড় হইয়া উঠিতেছে, বিনয়ের সান্নিধ্যও তো সে সর্ব্বদা পাইবে। মাতুলানী যতই করুন, মাণিক তো তাহারই থাকিবে। মাণিকের স্বর্গগতা-মায়ের স্মৃতি বিনয়ই সর্ব্বদা তাহার মনে জাগাইয়া রাখিয়া যেমন এতদিন তাহাকে মা ভুলিতে দেয় নাই, এখনো তেমনি দিবে না! রাজেশ্বরী একেবারে তো তাহার নিকট হইতে মাণিককে দূরে রাখিতে পারিবেন না! এখন মাণিককে তাঁহার নিকট না রাখিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দুইদিকেই যে অন্যায় করা হয়, কাজেই তাঁহার এ-ভাবটাকে বিনয়ের সহিয়া লইতেই হইবে।

বিনয়ের শাশুড়ী নিজ গৃহে যাইবার দিন আড়ম্বরে গৃহিণীর নিকট বিদায় লইতে গিয়া অনেক বাক্যচ্ছটা বিস্তার করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে—এতদিন কর্ত্তার যত্নের অসুবিধা হইত বলিয়াই বিনয় মাণিককে দূরে রাখিয়াছিল, নহিলে মাণিকের উপর গৃহিণীর স্নেহের কথা কে না জানে। এখন বিনয় ও মাণিকের তিনি ছাড়া আর কেই বা আছে! তাঁহারও যখন অন্য অবলম্বন নাই, মাণিক তখন নিকটেই থাক্। মাতৃহীন হইয়াও সে যে মার স্নেহ পাইবে, তাহা তাঁহারা সকলেই চিরদিন জানেন। এতদিন কেবল - ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এত সমবেদনা ভরা কথাতেও রাজেশ্বরী দেবীর মুখের সে অন্ধকার-ভাব কমিল না—বরং যেন বাড়িয়াই চলিল। তিনি উদাসভাবে বলিলেন, "পরের ছেলে নিয়ে আমি কি করব বেয়ান? কোন্ দিন বিনয়ের আবার কি মনে হবে, কেড়ে নিয়ে যাবে! আর তাতে কাজ নেই। তোমাদের ছেলে তোমাদের কাছেই থাকুক। তবে কর্ত্তার নাম আর বংশ যাতে থাকে, তা আমায়

দেখ্‌তেই হবে, আর কর্ত্তাও তাই বলে গিয়েছেন। আমি আর পরের ছেলে কাছে রেখে কি করব? তবে তোমরা পার যদি বিনয়ের একটা বিয়ে দিয়ে তাকে ঘরবাসী কর্‌বার চেষ্টা কর। নৈলে ঐ একটা ছেলে নিয়ে মাণিক-মাণিক করেই ও উচাটন হয়ে বেড়াবে। ওকে কোথাও রেখে কারু কাছে দিয়ে ওর বিশ্বাস হবে না। বিয়ে দাও, বৌ হোক্, অন্য ছেলে-মেয়ে হোক্, তাহলেই এমন আদিখ্যেতা-ভাব আর থাক্‌বে না।"

বিনয়ের শাশুড়ী গৃহিণীর প্রথম দিকের বাক্যের ভাবার্থ যা একটু বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে তো তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছিল; এইবার শেষের কথাটায় কূল পাইয়া বলিলেন, "সেও তো এখন তোমারই কাজ বেয়ান্! ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ আন্‌তে হয়, যা যা কর্‌তে হয়, তুমিই কর। তবে আমার মাণিক,—তাকে তুমি যেমন ভালবাস তাতে হাজারই ভাই-বোন্ হোক্ তার জন্যে আমার ভাবনা কিছুই নেই। বিনয় আবার তোমার কাছ থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে যাবে? তা কি আর পারে বেয়ান? সে কথা আর মনেও ভেবো না। সেই রাত্রেই মামার কাছে নিয়ে আস্‌বে বলে ধুম কি! তা সে রাত্রে ছেলেটার তেমনি জ্বর! অতরাত্রে গাড়ী ক'রে গ্রাম অন্তর থেকে আন্‌তে ঠাণ্ডা লেগে ব্যারাম যদি বাড়ে বলে আমি তাকে পাঠালাম না। নৈলে সেই রাত্রেই সে ছেলে এনে তোমাদের হাতে দিত। আর ও কথা মনেও করো না, আর তাছাড়া সে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বে কার কাছে? আমার কাছে তো! আর তা রাখুক না, দেখি!"

রাজেশ্বরী বলিলেন, "তা না হয় নিজের কাছেই রাখ্‌বে, ছেলে তো এখন বাটের দিন দিন বড় হবে। ও কথা এখন থাক্। আগে বিনয়ের বিয়ে দাও, তার পরে যা হয় করা যাবে।"

"তা কি আমিও বলিনি বেয়ান্ যে—তুমি বেটা ছেলে, তোমার ঐ মামা-মামীর বিষয়ের তুমি ভিন্ন আর কেউ ভাগীদার নেই—তুমি কেন বিয়ে করবে না! তোমার মামী মাণিককে যেমন ভালবাসে, তোমার আর পাঁচটা ছেলে হলেও মাণিকের আমার কিছু ক্ষতি হবে না। তা, বলে, আমার মাণিক বেঁচে থাকুক, বিয়ে আবার কিসের জন্যে!"

গৃহিণী এইবার ক্রোধোদ্দীপ্ত স্বরে বলিলেন, "বটে! তা হলে সেই মাণিককেই মানুষ করবেন কি করে, শুনি? কর্ত্তা ত ভাগ্‌নের জন্যে অমনি কিছু মাসহরার বন্দোবস্ত করে যাননি। তিনি যা অনুমতি দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর বাপ-পিতাম'র নাম আর জল-পিণ্ডির ব্যবস্থা আমায় করতেই হবে! তাতে কোন নিষেধ নেই। বিয়ে! ওঁরই ভালর জন্যেই বলচি।"

মাণিকের দিদিমা এইবার যেন অধিকমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন "সে কি বেয়ান্! বিনয় হতেই কি বেহাইয়ের আর তোমার বংশ থাক্‌বে না? ছেলে আর ভাগ্‌নে কি ভিন্ন?"

গৃহিণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ভিন্ন না হলে কি আর ইচ্ছে করলেই নিজের ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে? আমায় যখন বেঁচে থাকতেই হবে, তখন এমন করে বুকে দুটি হাত দিয়ে তো সংসারে কেউ থাকতে পারে না! এমন একটু কিছু চাই মানুষের, যার ওপর জোর সাজে? যাকে ইচ্ছে করলেই কেউ কেড়ে নিয়ে যেতে পারে না! ভাগ্‌নে না হয় আমাদেরই জল-পিণ্ডি দিলে, তিন পুরুষই নাহয় জল পিণ্ডি পেলাম, কিন্তু তার ওপর পুরুষদের তো বংশ-লোপ হবে! তারা তো আর তা পাবেন না! আর ভাগ্‌নেতে বংশ থাকা বলে না, বেয়ান। এত-বড় বংশ কি আমরা লোপ করতে পারি? কর্ত্তাও তাই অনুমতি দিয়ে গিয়েছেন।"

বিনয়ের শাশুড়ী প্রায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যাওয়া ঘুরিয়া গেল। তখনি বিনয়কে ডাকাইয়া বিস্তর অনুরোধের সহিত জানাইলেন, বিনয়ই মামার নিকট হইতে ছেলে কাড়িয়া লইয়া গিয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিয়াছে। জমিদার বোধ হয় পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়াছেন,—এখন বিনয় কি করিবে, করুক!

শুধু বিনয় নয়—এ-কথা যে শুনিল, সেই অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া পড়িল। কর্ত্তার ভাগিনেয়-প্রীতির কথা

সকলেই এমনি দৃঢ়ভাবে জানিত এবং সেই ন্যায়নিষ্ঠ বিবেচক জমিদার যে সন্তান-তুল্য ব্যক্তির উপর এই সামান্য দোষে এত বড় দণ্ড দিয়া যাইবেন, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিন্তু যখন উপযুক্ত সাক্ষ্যের সাহত তাঁহার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন আর কাহারো বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সত্যই জমিদার স্ত্রীকে পোষ্য-পুত্র-গ্রহণের অনুমতি দিয়া গিয়াছেন, তবে তাহাতে এই সর্ত্ত আছে যে যদি বিনয় তাহার সন্তান মাণিককে দত্তক দেয়, তাহা হইলে আর অন্য কাহারো পুত্রকে তিনি লইতে পারিবেন না। বিনয় যদি ইচ্ছা করে, তবে পুত্রের বিনিময়ে সে যথোপযুক্ত বিষয়-সম্পত্তি বা মাসহরাও গ্রহণ করিতে পারিবে, আর বিষয়-সম্পত্তি এবং নাবালক পুত্রের দ্বিতীয় অভিভাবকস্বরূপ মাতুলানার সংসারে চিরদিনই সে আধিপত্য করিবে। শুনিয়া কেহ বলিল, তবু ভাল, কেহ-বা তথাপি ভ্রুকুঞ্চিত করিল।

কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া বিনয়ের শাশুড়ী নিঃশব্দে নিজের গৃহে পলায়ন করিলেন। বিনয় যে কি করিবে, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিতেছিলেন। সে যে তাহার মাণিককে এমন স্থলেও পোষ্যপুত্র দিবে, ইহা একেবারে অসম্ভব! কিন্তু মাণিক যে তাহা হইলে একেবারে ভিখারীর সন্তান হইবে, এ চিন্তাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। মাণিককে সেইখানেই ফেলিয়া নিজের পলায়নই শ্রেয় বলিয়া তাঁহার মনে হইল। বিনয় ও তাহার মাতুলানী যা হয় একটা মীমাংসা নিজেরাই করুক!

কিন্তু কোন মীমাংসাই হইল না। রক্ত-চক্ষু রুক্ষমূর্ত্তি উন্মাদের মত বিনয় একদিন শাশুড়ীর তারস্বরের তিরস্কার এবং অনুরোধ কানে না তুলিয়া মাণিককে তাঁহার কাছে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সে যে কিছুতেই ছেলেকে পোষ্যপুত্র দিবে না, ইহা এইবারে স্থির বুঝিতে পারিয়া বিনয়ের শাশুড়ী মাণিকের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একেবারে মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

পয়লা তারিখ বোশেখ মাসে

পয়লা তারিখ বোশেখ মাসে (কবির কানে খপর আসে)
রাতারাতি ঘুম ভেঙে না উঠে,—
আকাশের ঐ ওপার থেকে বসন্ত কয় মাকে ডেকে
কোলের কাছে দৌড়ে গিয়ে ছুটে;
ঘুমের শিশির চোখের পাতায় জড়িয়ে তখন, পড়ছে মাথায়
এলো-খোঁপায় এলিয়ে চাঁপা ফুল,
অঙ্গে সারা ফুল-আভরণ, শিথিল বসন অলস চরণ,—
বল্‌তে কথা হয় অগণন ভুল;
অশোক ফুলের নূপুর পায়ে, ফুর ফুর ফুর উড়্‌চে গায়ে
দখিণ হাওয়ার রেশ্‌মী সূতোয় বোনা—
জুঁই-চামেলির চুম্‌কি দেওয়া ভোর আকাশে ছুপিয়ে নেওয়া
সাড়ির আঁচল পাড়-বসানো সোনা,—

"ঘুম চোখে নেই! দুষ্টু মেয়ে! (মুখের পানে মা কয় চেয়ে)
এই সকালে কেউ কখনো ওঠে—?
দে গালে দে একটা চুমো, আরো খানিক শুয়ে ঘুমো,
বল্লে কথা শুনিস্‌ নে ত মোটে!
গোলাপ জলে মুখ ধুয়ে আয়, পায় ক্ষিদে ত বলিস্‌ আমায়,
তৈরী আছে ফুলের মধু সাজো;"
"আমায় তুমি কী যে ভাবো! এই সকালে খাবার খাবো?
মা আমি কি কচি খুকি আজো?
মাগো, আমার পড়্‌চে মনে— ফাগুনে সেই ফুলের বনে
বসিয়ে কোলে ভুলিয়ে কত ছলে,
সাজিয়ে তুমি দিলে আমায় ফলে-ফুলে লতায়-পাতায়,
পর পর গয়না পর বলে!

আবির নিয়ে কতই খেলা খেলেচি সেই ছেলেবেলা
সিঁদুর মেঘের টিপ পরেচি কত,
চাঁদের আলোয় স্নান করেচি, সুর সাহানায় গান ধরেচি,
জাল বুনেচি স্বপ্নে শত শত ;
আমার পোষা কোকিল ডেকে, আমের মুকুল মিষ্টি দেখে
খাইয়ে দিছি নিজের হাতে ক'রে,
ফুলের সনে ফুলের বিয়ে দিয়েচি মা কতই দিয়ে,
অমিল হ'লে গাল খেয়েছি পরে ;
রং-বেরংএর ঢেউ তুলেছি, কতই না সে দোল দুলেছি,
চপল বুকে তরুণ-তরুণীর ;
মিলন দিছি নিবিড় ক'রে নিছাঁক হাসির মধু ভ'রে,
বিরহেতে তপ্ত আঁখি নীর !
মন্ চুরির সেই মন্ত্রখানা আমার যেটা ছিল জানা,
বিলিয়ে সেটা দিলেম পথে ঘাটে ;
কান্না-হাসি অকারণে, শিউরে-ওঠা সুখ-স্বপনে,
নিষ্কৃতি নেই ঘুমিয়ে সোনার খাটে ;
আর সে এখন ছেলেখেলা, চাঁদের হাটে ফুলের মেলা,
নাচিয়ে তোলা রূপ-সায়রের জল,
বাঁশীর সুরে হাসির গানে ঢুলিয়ে-দেওয়া সকল প্রাণে—
ফুটিয়ে তোলা প্রেমের শতদল,
আর সে এখন অনুরাগে কুঙ্কুমেরি রক্তরাগে—
রাঙিয়ে দেওয়া আকাশ বাতাস আলো,
আন্‌তে গো' জল সাঁঝের বেলা আপনারে সেই হারিয়ে ফেলা,
চম্‌কে দেওয়া কাজল চোখে কালো,
হাসির আড়ে লুকিয়ে রাখা মনের ব্যথা মরম ঢাকা,
কল্পনারি রঙীন পাখায় ওড়া,
ভুল করা সেই পায়ে পায়ে, একলা বিজন বকুল ছায়ে
সৃষ্টিছাড়া খেয়াল যত গড়া,
বল্‌না মাগো বল্‌না আমায়, আর কি এখন তেমন মানায় ?
আল্‌তা পায়ে বাজিয়ে যাওয়া মল ?
আজো আমার সুর্মা চোখে দেখলে কী সব বল্‌বে লোকে ?
—বুড়ো মেয়ে জানেও এত ছল !
মুনি-জনের মনোহরণ এক-গা গায়ে রতন-ভূষণ,
বল্‌না মাগো আর কি আমায় সাজে ?
আর না দেব চরণ-মূলে আল্‌তা নূপুর ফেল্‌বো খুলে,
আপনা হেরি আপনি মরি লাজে !
আজ্‌কে মা এই বিরিয়ানা খোল-কড়াই ঠেক্‌চে কানা,
বনের কোকিল উড়িয়ে দেব বনে,
মিট্‌চে না ত মনের ক্ষুধা, কোথায় সুধা ? কোথায় সুধা—?
পাগল হলেম তারি অন্বেষণে !
আবার কৃচ্ছ্র ব্রত, নেব, ভোগ-ঐশ্বর্য্য বিলিয়ে দেব,
ত্যাগের মন্ত্র জপ্‌বো রাত্রিদিন,
ঝরা ফুলের আসরেতে আসনখানি নেব পেতে
কঠোর তপে করবো তনু ক্ষীণ ;
মাখ্‌বো ধূলি ভস্ম গায়ে, রৌদ্রে খর ঝঞ্ঝা-বায়ে
নগ্ন দেহ করবো বিসর্জ্জন,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাদল রেতে বৃষ্টি নেব মাথায় পেতে,
বজ্র বুকে করবো আলিঙ্গন ;
কাল-বোশেখীর প্রলয়-দোলায়, বিরাম-বিহীন শ্রাবণ-ধারায়,
কন্ কন্ কন্ মাঘ-পৌষের শীতে,
অনাবৃত স্থির অচপল এক-আসনে অচল অটল
আমায় মা তুই পারবি চিনে নিতে ?
মা কেন তুই ভাবিস্ মনে ? ফির্‌বো ব্রত-উদ্‌যাপনে,
নতুন হয়ে ফিরবো তোরি কোলে,
খাইয়ে মধু লতায়-পাতায় সাজিয়ে তখন দিস্ গো আমায়,
পর পর গয়না পর ব'লে !"

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

ডায়না

রণোজী সিন্ধিয়া

ফরাসী সম্রাট দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের অধিনায়কতার যে সকল সেনাপতি প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই জীবনের প্রারম্ভে অতি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। মুরাট ছিলেন সামান্য ভৃত্য, ম্যাসেনা গোপনে মদ্য আমদানি করিতেন, আর লেনে ঘরের দেওয়ালে রং চড়াইতেন! নেপোলিয়ন অসাধারণ গুণজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাই সাধারণ সৈনিকদিগের মধ্য হইতেও প্রতিভাশালী লোক খুঁজিয়া বাহির করিয়া সৈন্য-পরিচালনার ভার দিতেন। পেশবা প্রথম বাজীরাওএরও লোক চিনিবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাই তাঁহার অধিনায়কতায় যে সকল সেনানায়ক যশ ও সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে অন্ত্যজ ও দরিদ্র পিতামাতার সন্তান, ধনীর দুলাল নহেন। হোলকার বংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহার রাও মেষপালক ধাঙ্গরের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন; পিতৃহীন বালক মলহার মাতুলের কৃপা-দত্ত অন্নে প্রতিপালিত হইয়া মেষপালনে বাল্য অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সাগর রাজ বংশের আদি পুরুষ গোবিন্দ পন্ত বুন্দেলে ছিলেন রাজা রাওয়ের সূপকার; আর গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা পাদুকাবাহী ভৃত্য।

রণোজী সিন্ধিয়া জাতিতে মারাঠা শূদ্র বা 'কুনবী'। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা সাতারার সন্নিহিত কুন্নির খেড় গ্রামের পাটীল বা পল্লী-প্রধান ছিলেন। কুন্নির খেড়এর সিন্ধিয়া বংশ মুসলমানী আমলে একবার সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। বংশ-মর্য্যাদাতেও তাঁহারা মারাঠাদিগের মধ্যে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। শাহু যখন মুঘল রাজধানীতে বন্দী, তখন এই কুন্নির খেড়ের সিন্ধিয়া বংশের এক কুমারীর সহিত সম্রাট ঔরংজীব মহাসমারোহে তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। সিন্ধিয়াদিগের সামরিক শৌর্য্যের কথাও সেকালে নিতান্ত অবিদিত ছিল না, কাজেই বলিতে হইবে রণোজী অজ্ঞাত-কুলশীল নহেন—খুব বনিয়াদী ঘরের ছেলে।

বনিয়াদী বংশের সন্তান রণোজী কেন যে পেশবার পাদুকাবাহী ভৃত্যের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কীন সাহেব বলেন—যে সিন্ধিয়া বংশের সমৃদ্ধি হ্রাস হইতে হইতে রণোজীর পিতার আমলে স্মৃতি মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল; তিনি দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাই রণোজী বংশ-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া পাদুকাবাহীর নীচ কর্ম্ম গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ম্যালকলমের মত কিন্তু অন্য প্রকার। তিনি বলেন যে পেশবাগণের নিকটে থাকিলে উচ্চ পদাধিরোহণের সুযোগ পাওয়া যাইত, সুতরাং সেকালের উচ্চাভিলাষী যুবকেরা নীচ কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও পেশবার সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করিতেন। রণোজীও উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় পাদুকাবাহী ভৃত্যের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন—দারিদ্র্যের তাড়নায় নহে।

যুবক রণোজী যখন ভৃত্যরূপে পেশবার প্রাসাদে প্রবেশ করেন তখনও বালাজী বিশ্বনাথ জীবিত। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল বালাজীর পুত্র বাজীরাওয়ের শাসন-কালে নিতান্ত আকস্মিক ভাবে। কথিত আছে যে, বাজীরাও একদা রাত্রিকালে কোন গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে শাহু নরপতির মন্ত্রণাগারে প্রবেশ করেন। মন্ত্রণাগারের দ্বারে তিনি রণোজীকে পাদুকা রক্ষার জন্য রাখিয়া যান। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল। কিন্তু মন্ত্রণা আর শেষ হয় না। রণোজী প্রভুর পাদুকা দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। গভীর রাত্রে বাজীরাও মন্ত্রণা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভৃত্য নিদ্রিত, কিন্তু নিদ্রার প্রভাবও তাহাকে কর্ত্তব্য বিস্মৃত করায় নাই। এই কর্ত্তব্য-প্রিয়তার পুরস্কার স্বরূপ বাজীরাও রণোজীকে স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যদলে নিযুক্ত করিলেন। সেই হইতে রণোজীর সৌভাগ্যের সূত্রপাত। গোয়ালিয়র দরবারের রাজদূত ষ্টুয়ার্ট সাহেবের নিকট হইতে স্যার জন মালকলম এই বিবরণ সংগ্রহ

২০১৪ ১৫.৪.৭৬

করিয়াছিলেন। জিব্বাদাদা বক্সীর চরিতাখ্যায়ক রাজাধ্যক্ষ মহাশয় এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার সহিত ম্যালকলমের বিবরণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়। রাজাধ্যক্ষের মতে বাজীরাও রামচন্দ্র বাবা সুখটনকরের গৃহে মন্ত্রণার জন্য গিয়াছিলেন। মন্ত্রণা হইতে প্রত্যাগত বাজীরাও ও রামচন্দ্র বাবা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিদ্রিত রণোজীকে দেখিতে পান। বাজীরাও ভৃত্যের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইলেন আর রেখা-শাস্ত্রজ্ঞ রামচন্দ্র দেখিলেন, নিদ্রিত যুবকের হস্ত-পদে রাজচিহ্ন সকল প্রকট। রামচন্দ্র স্থির করিলেন, এই ভাগ্যবান যুবকের সাহায্য করিয়া তিনিও যশস্বী হইবেন। উত্তরকালে পেশবা বাজীরাও রামচন্দ্র বাবা শেনবীকে রণোজী সিন্ধিয়ার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সিন্ধিয়া বংশের কুমার বলবন্তরাও ভাইয়া সাহেব কিন্তু এই প্রবাদে অবিশ্বাস করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহাদের বংশের ইতিহাসে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। তাঁহাদের কৌলিক অবদানেও তিনি রণোজী কর্তৃক পেশবার পাদুকা-বহনের কথা শুনেন নাই। কিন্তু এই যুক্তির বলে ম্যালকলমের বিবরণ অগ্রাহ্য হইবে কি না সন্দেহ। কারণ গোয়ালিয়র দরবারের ইংরাজ দূত ষ্টুয়ার্ট যখন মালকলমের জন্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন অন্ততঃ গোয়ালিয়রের প্রাচীন অধিবাসীগণের মধ্যে তাঁহাদের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার প্রথম জীবনের এই কাহিনীটি বিশেষ ভাবেই প্রচলিত ছিল। রণোজীর পুত্র মহাদজীও সেকালের প্রবাদ অনুসারে পিতার ন্যায় আপনাকে পেশবার পাদুকা-বাহী ভৃত্য বলিয়াই মনে করিতেন। দিল্লীর বাদশাহের সনদ ও উপচার গ্রহণের জন্য দ্বিতীয় মাধবরাও যে বিরাট দরবার ডাকিয়াছিলেন, রণোজীর পুত্র হিন্দুস্থান বিজয়ী মহাদজী সেই দরবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, পাদুকা কক্ষে লইয়া। আর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের সময়ে পেশবার পদ হইতে পুরাতন পাদুকা অপসারিত করিয়া তাঁহার ব্যবহারের জন্য নূতন পাদুকা জোগাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে একবার নানা-ফড়নবীস মহাদজীকে অপ্রতিভ করিবার জন্য স্থির করিয়াছিলেন যে পেশবা দ্বিতীয় মাধবরাও যখন হস্তী আরোহণে নগরের পথে বাহির হইবেন, তখন তাঁহার সামন্তবর্গকে পদব্রজে তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। মহাদজী খঞ্জ সুতরাং পদব্রজে পেশবার অনুসরণ করিতে অক্ষম। তাই তিনি পেশবার পাদুকা লইয়া তাঁহারই হস্তীতে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বসিলেন,—কারণ তিনি তখনও মনে করিতেন যে তিনি পেশবার পাদুকাবাহী ভৃত্য, সামন্ত নহেন। মহাদজীর কাল পর্য্যন্ত যে প্রবাদ নিতান্ত সত্য বলিয়া প্রচলিত ছিল, এতকাল পরে তাহাকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন বোধ হয় না।

রণোজী রাও সিন্ধিয়ার ইংরেজী জীবন-চরিত লেখক শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বামনরাও বর্ব্বে প্রাচীন ও আধুনিক মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, রীতি-নীতি, আদব-কায়দায় প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দুদিগের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি রাওসাহেব আপটের ব্যবহার উল্লেখ করিয়াছেন। রাওসাহেব আপটের স্বভাব ঠিক খাপ-খোলা তলোয়ারের ন্যায়, দরবারী সৌজন্যের তিনি আদৌ ধার ধারিতেন না। তিনি কেবল তাঁহার মনিব জয়াজী সিন্ধিয়ার নিকট একটু নরম থাকিতেন। ইংরেজ রেসিডেণ্ট এবং দেওয়ান স্যানবর্দিক রাওকে পর্য্যন্ত তিনি হিসাবের মধ্যেই আনিতেন না। দরবারী কায়দা-কানুনে এমন অকুশল এই রাওসাহেব আপটে একদিন দেখিলেন, সিন্ধিয়া জয়াজী রাও নিজের খাস খানসামাকে ডাকিতেছেন কিন্তু খানসামার চিহ্নও দেখা যাইতেছে না। আপটে ব্রাহ্মণ আর সিন্ধিয়া শূদ্র। কিন্তু শূদ্র মনিবের পাদুকা আগাইয়া দিতেও এই ব্রাহ্মণ যোদ্ধা কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কুচিত হইলেন না। সিন্ধিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে উদ্যত হইলে আপটে উত্তর করিলেন—

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈবচ।
জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃস্মৃতাঃ॥

বর্ব্বে মহাশয়ের যুক্তি এই যে, সেকালের হিন্দু আপটে খোসামোদ-প্রবৃত্তির অধীন হইয়া মনিবের জুতা বহন করেন নাই এবং তিনি জয়াজীর জুতা বহিবার চাকরও ছিলেন না। এইরূপ প্রভুভক্তির বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় রণোজী পাদুকা-বাহী ভৃত্যের অনুপস্থিতিতে ব্রাহ্মণ প্রভুর উপানৎ

বহন করিয়া থাকিবেন। এবং সেই ঘটনা হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের সূচনা হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার পুত্রও এই পাদুকা-বহনের স্মৃতির সমুচিত সমাদর করিয়াছেন। আমার মনে হয় না, এই সামান্য ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন আছে। সিন্ধিয়া পরিবারের কোন ব্যক্তি যদি তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের পক্ষে পাদুকা-বহনের কার্য্য অপমানকর মনে করেন, তবে তিনি নিতান্তই ভ্রান্ত। সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জনে কোন লজ্জা নাই। অপর পক্ষে রণোজী যে প্রথম জীবনে দরিদ্র ছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। দরিদ্র না হইলে বনিয়াদী বংশের কৃতী সন্তান রণোজীর জন্মের তারিখ ও বাল্যের বিবরণ একেবারে অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত না।

সেনাদলে প্রবেশ করিবার পরেই রণোজী স্বীয় সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তল-ভুপালের যুদ্ধে তিনি পেশবা বাজীরাওয়ের পার্শ্বচররূপে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধের কারণ আলোচনার স্থান এ নহে। এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তল-ভুপালের যুদ্ধে নিজাম উল-মুলুকের পরাজয় না হইলে কিছুতেই মালব মারাঠার করায়ত্ত হইত না। সুতরাং যাহাদের শৌর্য্যে ও কৌশলে এই যুদ্ধে পেশবা বিজয়ী হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে তাহার অনুগ্রহভাজন হইবেন ইহা আর বিচিত্র কি? তল-ভুপালের যুদ্ধের পর বাজীরাও রণোজীকে স্বীয় ভ্রাতা চিমনাজীর সহায়তার জন্য কোঁকণ উপকূলে পাঠাইয়া দেন। চিমনাজী তখন পর্ত্তুগীজ অধিকৃত বেসিন বা বসই বিজয়ে ব্যাপৃত। বেসিন বিজয় চিমনাজীর জীবনের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যুদ্ধেও রণোজীর রণ কুশলতা মারাঠাদিগের বিজয় লাভের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তিনিই পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে কুন্তলবাড়ী ওঠধনু নামক দুইটী জায়গা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। চিমনাজী আপ্পা যখন বেসিন বিজয়ে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়েই নাদির শাহ দিল্লী অধিকার করেন। বাজীরাও তখন মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য রণোজী ও মলহর রাওকে নর্ম্মদা তীরে আহ্বান করেন। বেসিন বিজিত হইলে এই দুই মারাঠা বীর প্রভুর সহিত নর্ম্মদা তীরে মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু নাদিরের সহিত বাজীরাওয়ের বীর্য্য পরীক্ষা করিতে হয় নাই। পারসীক নরপতি মারাঠার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই।

পেশবার সেনাদলে রণোজী এরূপ প্রতিপত্তি ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে দিল্লীর বাদশাহের সহিত পেশবার যে সন্ধি স্থির হয়, তাহার সর্ত্ত প্রতিপালনের জন্য পেশবার তরফ হইতে তিনিই অন্যতম প্রতিভূ হইয়াছিলেন। জীবনের প্রথম অবস্থা দারিদ্র্যে অতিবাহিত হইলেও রণোজীর শেষ জীবন শান্তিতে সম্পদের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। নববিজিত মালব রাজ্যে তিনি ২২ ½ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। এই জায়গীর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া এক বিস্তীর্ণ রাজ্য খণ্ডে পরিণত হইয়াছিল।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সুজালপুর নামক স্থানে রণোজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স কত হইয়াছিল তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি পর পর তিন জন পেশবার অধীনে চাকরী করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান হয় যে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স নিতান্ত কম ছিল না। পেশবা যুগে শক্তি-সাহস থাকিলে যে নিতান্ত দরিদ্রের সন্তানের পক্ষেও রাজ-সিংহাসন লাভ অসম্ভব ছিল না রণোজী তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। দেশে দরিদ্রের সংখ্যাই বেশী, সুতরাং দরিদ্রের গৃহেই অধিক-সংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তির জন্ম হয়। যে দেশে দরিদ্রের প্রতিভা-বিকাশের সুযোগ যত বেশী, সেই দেশ তত সৌভাগ্যবান।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

শেষ-বেলা

পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই
অস্তাচলের ধারে আসি'।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই
তার লাগি আজ বাজাই বাঁশি।
যখন এ কূল যাব ছাড়ি,'
পারের খেয়ায় দেব পাড়ি,
মোর ফাগুনের গানের বোঝা
বাঁশির সাথে যাবে ভাসি' ॥

সেই যে আমার বনের গলি
রঙীন ফুলে ছিল আঁকা,
সেই ফুলেরি ছিন্ন দলে
চিহ্ন তাহার পড়ল ঢাকা।
মাঝে মাঝে কোন্ বাতাসে
চেনা দিনের গন্ধ আসে,
হঠাৎ বুকে চমক লাগায়
আধ্-ভোলা সেই কান্না হাসি ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শিলাইদা, ১০ই চৈত্র, ১৩২৮।

বিতরণ

আসা-যাওয়ার পথের ধারে
গান গেয়ে মোর কেটেচে দিন।
যাবার বেলায় দেব কারে
বুকের কাছে বাজ্‌ল যে বীণ?
সুরগুলি তার নানাভাগে
রেখে যাব পুষ্পবাগে,
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায়
স্বর্ণলেখায় করব বিলীন।

কিছু বা সে মিলন-মালায়
যুগল গলায় রইবে গাঁথা।
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে
দুই চাহনির চোখের পাতা।
একদা কোন্ চৈত্র মাসে
বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
হঠাৎ আমার মনের কথা
কুড়িয়ে পাবে কোন্ উদাসীন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শিলাইদা, ১১ই চৈত্র, ১৩২৮।

অবশেষ

কার যেন এই মনের বেদন
চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়;
ঝুমকো লতার চিকন পাতা
কাঁপেরে কার চম্‌কে-চাওয়ায়।
হারিয়ে-যাওয়া কার সে বাণী,
কার সোহাগের স্মরণখানি,
আমের বোলের গন্ধে মিশে
কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়।

কাঁকন দুটির রিনিঝিনি
কার বা এখন মনে আছে?
সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি
পিয়াল বনের শাখায় নাচে।
যার চোখের ঐ আভাস দোলে
নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে
তার সাথে মোর দেখা ছিল
সেই সেকালের তরী-বাওয়ায় ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শিলাইদা, ১২ই চৈত্র, ১৩২৮।

নিদ্রাহারা

নিদ্রাহারা রাতের এ গান
বাঁধব আমি কেমন সুরে ?
কোন্ রজনীগন্ধা হতে
আনব সে তান কণ্ঠে পূরে।
সুরের কাঙাল আমার কথা—
ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা,—
সাঁঝ সকালে বনের পথে
উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে।

ওগো সে কোন্ বিহান বেলায়
এই পথে কার পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণকুসুম
শিউরেছিল শিশির জলে !
অলকে তার একটি গুছি
করবীফুল রক্তরুচি ;
নয়ন করে কি ফুল চয়ন
নীল গগনে দূরে দূরে !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শিলাইদা, ১৩ই চৈত্র, ১৩২৮।

চেনা

এক ফাগুনের গান সে আমার
আর ফাগুনের কূলে কূলে
কার খোঁজে আজ পথ হারাল
নতুন কালের ফুলে ফুলে ?
শুধায় তারে বকুল, হেনা
"কেউ আছে কি তোমার চেনা ?"
সে বলে, "হায়, আছে কি নাই
না বুঝে তাই বেড়াই ভুলে।
নতুন কালের ফুলে ফুলে" ॥

এক ফাগুনের মনের কথা
আর ফাগুনের কানে কানে
গুঞ্জরিয়া কেঁদে শুধায়
"মোর ভাষা আজ কেউ কি জানে ?"
আকাশ বলে, "কে জানে সে
কোন্ ভাষা যে বেড়ায় ভেসে !"
"হয়ত জানি, হয়ত জানি,"
বাতাস বলে দুলে দুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শিলাইদা, ১৪ই চৈত্র, ১৩২৮।

গোলাপের জন্ম

"সে বলেচে একটি রাঙা গোলাপ এনে দিলে আমার সঙ্গে নাচবে। কিন্তু হায়, আমার সারা-বাগানে একটিও রাঙা গোলাপ নেই !"

গাছের ডালে বাসায় বসে পাপিয়া ছাত্রের এই করুণ কথাগুলি শুনতে পেলে। পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, পাপিয়া অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

ছাত্রের বড় বড় চোখদুটি অশ্রুজলে ভরে উঠল। কান্নার স্বরে সে আবার বললে, "আমার সারা-বাগানে

একটিও রাঙা গোলাপ নেই! হায়, কি তুচ্ছ জিনিসের জন্যে প্রাণের সব শান্তি-সুখ ব্যর্থ হয়ে যায়! জ্ঞানীদের সব লেখা আমি পড়ে ফেলেচি, ষড়দর্শন আমার কণ্ঠস্থ,—কিন্তু তবু, সামান্য একটি রাঙা গোলাপের অভাবে আজ কিনা আমি এমন লক্ষ্মীছাড়া!"

পাপিয়া বল্‌লে, "হ্যাঁ, এতদিনে একজন আসল প্রেমিকের দেখা পেলুম! প্রেমিককে চিনতুম না, কিন্তু রাতের পর রাত গলা ভেঙে তারি জন্যে গান গেয়েচি, তারায় তারায় তার বার্ত্তা পাঠিয়েচি, আজ তাকে আমারি সাম্‌নে মূর্ত্তিমান দেখতে পেলুম! তার চুলগুলি কালো যেন কৃষ্ণকলি; তার ঠোঁট-দুখানি তারি-চাওয়া গোলাপের মতন রাঙা! কিন্তু দুঃখ তার কপালে নিজের হাতের ছাপ্ রেখে গেছে, কষ্ট তার মুখকে সন্ধ্যার আকাশের মত বিষণ্ণ ক'রে তুলেছে!"

যুবক ছাত্র নিজের মনে গুন্‌গুন্ ক'রে বল্‌লে, "রাজ-বাড়ীতে আজ উৎসবের বাঁশী বেজেচে—আমি যাকে ভালোবাসি, সেও আমন্ত্রণ পেয়েচে! সে বলেচে, আমি যদি তাকে একটি রাঙা গোলাপ উপহার দি, তাহ'লে সে আমার সঙ্গে নাচ্‌বে। আমি যদি তাকে একটি রাঙা গোলাপ উপহার দি, তবে তাকে আমার এই আলিঙ্গনের ভিতরে ধর্‌তে পার্‌ব, তার মুখখানি বিরাম কর্‌বে আমার এই কাঁধের উপরে, তার হাতদুটি এলিয়ে থাকবে আমার এই মুঠির ভিতরে। কিন্তু আমার বাগানে তো রাঙা গোলাপ নেই!... ...দোসর-হারা আমি নীরবে বসে থাক্‌ব, আর আমারি সুমুখ দিয়ে সে চ'লে যাবে—আমার পানে একটিবার ফিরেও না তাকিয়ে! হায়, অবহেলায় বুক যে আমার ভেঙে যাবে!"

পাপিয়া বল্‌লে, "হুঁ, লোকটি প্রেমিক না হয়ে আর যায় না! যা নিয়ে আমি গান গাই, তার জন্যেই এ ব্যথা পাচ্চে; আমার সুখ ওর দুঃখ! সত্যি, কি অপূর্ব্ব এই প্রেম! পান্নার চেয়ে অমূল্য, মণির চেয়ে দুর্লভ! মুক্তার মালার বদলে তাকে পাওয়া যায় না, হাটে-বাজারে তা কিন্‌তে মেলে না!"

যুবক বল্‌লে, "বাদকরা বীণার তারে তারে রিঙ্গিনী তুল্‌বে, আর তারই তালে তালে প্রিয়া আমার নাচ সুরু কর্‌বে! তার গতি এমন মেঘের মতন লঘু, যে নরম-নধর পা-দুখানি মাটি ছোঁয় কি না-ছোঁয় তা বোঝা যাবে না! তার চারিপাশে ভক্তের দল এসে ভিড় ক'রে থাক্‌বে! কিন্তু আমার সঙ্গে সে নাচ্‌বে না—কারণ আমার বাগানে রাঙা গোলাপ ফোটে নি!"—যুবক ঘাসের উপরে লুটিয়ে পড়্‌ল এবং দুইহাতে মুখ ঢেকে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

একটা গিরগিটি ল্যাজ তুলে ছুটে যেতে যেতে বল্‌লে, "লোকটা কাঁদে কেন?"

রবির একটি ঝিল্‌মিলে কিরণ-ধারায় স্নান কর্‌তে কর্‌তে প্রজাপতি বল্‌লে, "সত্যিই তো, কাঁদে কেন?"

সরোবরে কমলিনী এক সখীর কাণে কাণে ফিস্-ফিস্ ক'রে বল্‌লে, "সত্যিই তো, কাঁদে কেন?"

পাপিয়া বল্‌লে, "একটি রাঙা গোলাপের জন্যে ও-বেচারা কাঁদচে।"

"একটি রাঙা-গোলাপের জন্যে! ও হরি, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও তো শুনি-নি কখনো!"—গিরগিটি তো হেসেই অস্থির!

কিন্তু যুবকের বুকের দরদ পাপিয়ার বুকে বাজ্‌ল। সে নীরবে গাছের ডালে বসে রইল আর ভাবতে লাগ্‌ল, প্রেমের কি রহস্য! ... ...

আচম্বিতে দুই ডানা ছড়িয়ে সে একদিকে উড়ে গেল—এক টুক্‌রো ছায়ার মত উপবনের পুষ্পকুঞ্জ পেরিয়ে!

খানিকটা ঘাসে-ঢাকা জমি। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দর গোলাপগাছ।

তারই এক ছোট শাখায় গিয়ে ব'সে পাপিয়া বল্‌লে, "আমাকে একটি রাঙা গোলাপ দাও। আমার সব গানের সেরা যে গান, তাই তোমাকে শোনাব।"

গাছ মাথা নেড়ে বল্‌লে, "আমার গোলাপ যে সাদা—সমুদ্দুরের ফেনার মত! হিমালয়ের তুষারও তত সাদা নয়। তবে ঝরণার পাশে আমার ভায়ের কাছে গেলে তোমার আশা হয়তো মিট্‌তে পারে।"

পাপিয়া আবার উড়ে গেল—ঝরণার ধারে যে গোলাপ

গাছ বাসা বেঁধেছে তার কাছে। বল্‌লে, "আমাকে একটি রাঙা গোলাপ দাও। আমার সব গানের সেবা যে গান, তাই তোমাকে শোনাব।"

গাছ মাথা নেড়ে বল্‌লে, "আমার গোলাপ যে হল্‌দে—তৈলস্ফটিকের আসনে পাতালের যে মৎস্যনারী বসে থাকে, তারি চুলের মত। পীত কুমুদও তত হলদে নয়। তবে যুবক ছাত্রের জান্‌লার তলায় আমার ভায়ের কাছে গেলে তোমার আশা হয়তো মিট্‌তে পারে।"

পাপিয়া আবার উড়ে গেল—যুবক ছাত্রের জান্‌লার তলায় যে গোলাপগাছ বাসা বেঁধেছে তার কাছে। বল্‌লে, "আমাকে একটি রাঙা গোলাপ দাও। আমার সব গানের সেবা যে গান তাই তোমাকে শোনাব।"

গাছ মাথা নেড়ে বল্‌লে, "আমার গোলাপ রাঙা—কপোতের পায়ের মত। সমুদ্দুরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যে প্রবাল দোলে সেও তত রাঙা নয়। কিন্তু শীতে আমার শিরা-উপশিরা হিম হয়ে গেছে, তুষার আমার কুঁড়ির ওপরে খিম্‌চি কেটে গেছে, ঝড় আমার ডালপালা ভেঙে দিয়ে গেছে! এবার সারা-বছরে আমার গোলাপ ফুটবে না।"

পাপিয়া কাতর স্বরে ব'লে উঠল, "একটি—সুধু একটি গোলাপ আমার দরকার! কিছুতেই কি তা পাওয়া যায় না?"

গাছ বল্‌লে, "হ্যাঁ, এক উপায় আছে। কিন্তু সে এমন ভয়ানক উপায় যে তোমাকে বল্‌তেও আমার মুখ বোবা হয়ে যাচ্চে!"

পাপিয়া বল্‌লে, "বল, বল,—তুমি সব খুলে বল। আমি ভয় পাব না।"

গাছ বল্‌লে, "যদি তুমি রাঙা গোলাপ চাও, তবে চাঁদের আলোয় গানের সুরে তোমাকে তা রচনা করতে হবে, আর বুকের রক্তে তাকে রাঙাতে হবে। নিজের বুকে একটি কাঁটা বিঁধিয়ে আমার ডালে বসে তোমাকে গান গাইতে হবে। সারারাত ধ'রে তুমি গান গাইবে, কাঁটা তোমার বুকের ভেতর গিয়ে ঢুক্‌বে আর তোমার প্রাণের রক্ত আমার শিরায়-শিরায় ঢুকে আমারি রক্ত হয়ে যাবে।"

পাপিয়া করুণ সুরে বল্‌লে, "মরণের বদলে একটি রাঙা-গোলাপ,—দাম যে বড় চড়া! জীবন কার প্রিয় নয়? সোনার রথে সূর্য্য ওঠা, মুক্তার রথে চাঁদ ওঠা—সবুজ বনে বসে সেই দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকা কি আনন্দের! পাহাড়ের উপরে-নীচে বিচিত্র যে-সব রঙিন ফুল ফোটে, তাদের গন্ধ কি মধুর! ... ...তবু, জীবনের চেয়ে প্রেমই শ্রেয়, আর মানুষের প্রাণের তুলনায় একটা পাখীর প্রাণের মূল্যই বা কতটুকু?"

পাপিয়া দুই ডানা ছড়িয়ে আবার উড়ে এল—এক-টুক্‌রো ছায়ার মত উপবনের পুষ্পকুঞ্জ পেরিয়ে।

যুবক তখনো ঘাসের উপরে শুয়েছিল, তার ডাগর চোখ দুটি থেকে অশ্রু তখনো শুকিয়ে যায় নি।

পাপিয়া বল্‌লে, "খুসি হও, খুসি হও! তোমার রাঙা গোলাপ তুমি পাবে। চাঁদের আলোয় গানের সুরে আমি তা রচনা করব, নিজের বুকের রক্তে আমি তা রাঙিয়ে তুল্‌ব! তোমার কাছ থেকে আমি খালি একটি প্রতিদান চাই। তুমি যেন খাঁটি প্রণয়ী হও—কারণ সব জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের চেয়ে প্রেমই হচ্চে শ্রেয়। আগুনের রঙের মত তার পক্ষ দুটি, তার দেহও আগুনের রঙের মত রঙিন। তার ওষ্ঠাধর মধুর মত মিষ্ট, আর তার নিশ্বাসে ধূপ-ধূনার সুগন্ধ!"

যুবক মুখ তুলে পাপিয়ার স্বর শুন্‌লে, কিন্তু তার কথা বুঝতে পার্‌লে না,—কারণ কেতাবে যা লেখা আছে তাছাড়া আর-কিছুই সে বুঝতে পারে না।

কিন্তু শালগাছ তার বাণী বুঝতে পার্‌লে। কারণ পাপিয়াকে সে বড় ভালবাস্‌তো, আর তারই ডালে পাপিয়ার বাসা। সে চুপি-চুপি বল্‌লে, "আমাকে তোমার শেষ-গান শুনিয়ে যাও। তোমাকে বিদায় দিয়ে একলাটি আমার মন বড় খাঁ খাঁ করবে।"

পাপিয়া তাকে নিজের গান শোনাতে লাগল—তার সে সুরের ধারা যেন রূপোর ঝারি থেকে উছ্‌লে-পড়া গন্ধ-জলের মতন।

পাপিয়ার গান থাম্‌লে যুবক ছাত্র আস্তে আস্তে উঠে

বস্‌ল এবং কাগজ-কলম নিয়ে ভাবতে লাগ্‌ল; "আমার প্রিয়ার গড়ন সুডৌল, এটা সকলকেই মান্‌তে হবে। কিন্তু তার প্রাণে কি মমতা আছে?——বোধ হয়, না। আসলে, সে আর আর কলাবিদের মত; তার ভঙ্গি আছে, কিন্তু সরলতা নেই। সে দিন-রাত খালি গান আর গান নিয়েই মেতে আছে, আর কে না জানে কলামাত্রই স্বার্থপর? তবু এটা বল্‌তেই হবে যে, বাস্তবিকই তার সুর-বোধ আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সে সুরের অর্থ পাওয়া যায় না, আর তা সংসারের কোন কাজেই লাগে না!" যুবক তার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল, তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের প্রেমের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

স্বর্গের ছায়ায় যখন চাঁদের মুখ জেগে উঠ্‌ল, পাপিয়া তখন গোলাপগাছের ডালে গিয়ে কাঁটার উপরে বুক দিয়ে বস্‌ল। কাঁটায় বুক চেপে সারারাত ধ'রে সে গান গেয়ে গেল, আকাশের চাঁদ পশ্চিমে ঢ'লে প'ড়ে কাণ পেতে সে গান শুন্‌তে লাগ্‌ল। পাপিয়া যত গান গায়, রাত তত গভীর হয়ে ওঠে, কাঁটা তত বুকের ভিতরে গিয়ে বেঁধে, আর তার প্রাণের রক্ত ততই কমে আস্‌তে থাকে!

পাপিয়া প্রথমে গাইলে, বালক-বালিকার হৃদয়ে প্রেমের জন্ম-কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে গাছের টঙের ডালে অপূর্ব্ব এক গোলাপের কুঁড়ি ফুটে উঠ্‌ল। সুরের ধারার পর সুরের ধারা আসে, আর সে কুঁড়িতে পাপ্‌ড়ির পর পাপ্‌ড়ি ফোটে। প্রথমে সে ফুল ছিল পাণ্ডু—নদীর জলের উপরে দোলায়মান কুয়াশার মত। রূপোর আয়নায় যেমন গোলাপের ছায়া, সরোবরের জলে যেমন গোলাপের ছায়া,—গাছের টঙের-ডালে-ফোটা তেম্‌নি সেই অপরূপ গোলাপটি!

গাছ হেঁকে বল্‌লে, "আরো জোরে, আরো জোরে বুক চেপে ধরো, নইলে গোলাপ-ফোটা শেষ হবার আগেই দিন এসে পড়্‌বে!"

পাপিয়া কাঁটার উপরে আরো জোরে বুক চেপে ধর্‌লে, তার গানের সুর পর্দ্দায় পর্দ্দায় আরো চড়্‌তে লাগ্‌ল—তখন সে যুবক-যুবতীর হৃদয়ে প্রেমের জন্ম-কাহিনী গাইছিল।

গোলাপের পাতার উপরে একটুখানি কোমল লাল্‌চে আভা ফুটে উঠ্‌ল—বরের প্রথম চুম্বনে নব-বধূর কপোলে রঙের আভাসের মতন। কিন্তু কাঁটা তখনো পাপিয়ার অন্তরের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছোয় নি, তাই গোলাপের হৃদয়ও শুভ্র হয়ে রইল—কারণ পাপিয়ার বুকের রক্ত ভিন্ন গোলাপের বুক রাঙা হ'তে পাবে না।

গাছ হেঁকে বল্‌লে, "আরো জোরে, আরো জোরে বুক চেপে ধরো, নইলে গোলাপ-ফোটা শেষ হবার আগেই দিন এসে পড়্‌বে!"

পাপিয়া কাঁটার উপরে আরো জোরে বুক চেপে ধর্‌লে, কাঁটা তার হৃদয়কে স্পর্শ কর্‌লে এবং তীব্র এক যাতনা বিদ্যুতের মত তার সর্ব্বাঙ্গ ভেদ ক'রে বয়ে গেল। তিক্ত,—বড় তিক্ত সে যন্ত্রণা! তার গানের সুর তখন ক্রমেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—কারণ পাপিয়া তখন সেই প্রেমের কাহিনী গাইছিল, মরণের দ্বারা যা পরিপূর্ণ এবং শ্মশানের চিতা যাকে গ্রাস কর্‌তে পারে না।

অপূর্ব্ব সেই গোলাপ লাল হয়ে উঠ্‌ল—পূর্ব্বাকাশের নিত্য-বিকসিত জ্বলন্ত গোলাপের মত।

পাপিয়ার স্বর কিন্তু ক্রমেই ঢিমিয়ে এল, তার ডানা কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, তার চোখের উপরে একটা পর্দ্দা ঘনিয়ে উঠ্‌ল। তার গান হোলো মৃদু হ'তে মৃদুতর এবং তার মনে হোলো, গলা যেন বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।

পাপিয়া তখন প্রাণপণে সঙ্গীতে শেষ-সুরের মূর্চ্ছনা দিলে। চাঁদ তাই শুনে উষার কথা ভুলে আকাশের উপরে স্থির হয়ে রইল। রাঙা গোলাপ তা শুন্‌তে পেলে, তার সর্ব্বাঙ্গে একটা পুলক-হিল্লোল বয়ে গেল এবং শীতার্ত্ত ভোরের বাতাসে তার পাপ্‌ড়িগুলি ছড়িয়ে পড়্‌ল। পাপিয়ার শেষ-সুরের ঝঙ্কার নিয়ে প্রতিধ্বনি চারিদিকে ছুটে গেল, এবং রাখালদের রাতের স্বপন থেকে জাগিয়ে তুল্‌লে। তটিনীর জল-বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে সুর ব্যাপ্ত হয়ে গেল এবং সমুদ্রের কাছে আপনার বার্ত্তা পাঠিয়ে দিলে।

গাছ চেঁচিয়ে বল্‌লে, "দেখ, দেখ! এতক্ষণে গোলাপ-ফোটা শেষ হয়েচে!"

কিন্তু পাপিয়া শুন্‌তে পেলে না। সে তখন ঘাসের উপরে ম'রে প'ড়ে আছে—তার বুকের উপরে বেঁধা সেই নিদারুণ কাঁটা!

দুপুর বেলায় যুবক ছাত্র জান্‌লা খুলে দেখে সবিস্ময়ে ব'লে উঠল, "কি সৌভাগ্য! এই যে একটি রাঙা গোলাপ ফুটেচে...... মরি, মরি, এমন গোলাপ তো জীবনে কখনো দেখি-নি! আহা, কি সুন্দর! উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে নিশ্চয়ই এর একটা কোন জম্‌কালো নাম আছে!" সে ঝুঁকে প'ড়ে গোলাপটি চয়ন করলে।

তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় প'রে গোলাপটি হাতে ক'রে সে তার অধ্যাপকের বাড়ীর দিকে ছুট্‌ল—অধ্যাপকের কন্যাই তার প্রিয়তমা।

অধ্যাপকের কন্যা দরজার কাছে বসে বসে লাটিমে রেশমের সুতো জড়াচ্ছে, তার পায়ের তলায় ঘুমিয়ে আছে একটি ছোট কুকুর।

যুবক উল্লাস-ভরে বল্‌লে, "একটি রাঙা গোলাপ পেলে তুমি আমার সঙ্গে নাচ্‌বে বলেছিলে। এই নাও দুনিয়ায় সব-চেয়ে রাঙা গোলাপ। এটিকে তোমার বুকের ওপরে আজ সন্ধ্যায় গুঁজে রেখ। মনে রেখ, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি!"

ভুরু কুঁচ্‌কে যুবতী বল্‌লে, "উঁহু, আমার পোষাকের সঙ্গে এ গোলাপ তো খাপ্ খাবে না। আর, এখন আমার গোলাপের দরকারও নেই, আমার এক ধনী বন্ধু আমাকে আসল জড়োয়া গয়না পাঠিয়ে দিয়েচে। দামী গয়নার কাছে আবার ফুল!"

যুবক ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌লে, "তুমি কি পাষাণী!"—কাছ দিয়ে একখানা ময়লা-ফেলা গাড়ী যাচ্ছিল, যুবক হাতে গোলাপটি সেইদিকে নিক্ষেপ করলে, গাড়ীর চাকা গোলাপটিকে ছিন্নভিন্ন ক'রে থেঁৎলে চলে গেল।

যুবতী বল্‌লে, "আমি পাষাণী! তোমার কথা এমন অভদ্র কেন?...আর সত্যি কথা বল্‌তে গেলে, তোমাতে আমাতে কিসের সম্পর্ক? তুমি তো সামান্য এক গরীব ছাত্র! আমাকে যে গয়না পাঠিয়েচে, তার কত টাকা, সে খবর কিছু রাখো?"—এই ব'লে যুবতী বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

যুবক ধীরে ধীরে চল্‌তে চল্‌তে আপন মনে বল্‌লে, "প্রেম কি বোকামির ব্যাপার! ন্যায়-শাস্ত্রের মতন উপকারীও নয়, তার দ্বারা কোন-কিছু প্রমাণিতও হয় না, সে যা বলে তা কখনো ঘটেনা, সে যা বিশ্বাস করে তা কখনো সত্য হয় না। আসলে প্রেমটা মোটেই বস্তুতন্ত্র নয়, এই বাস্তব-যুগে প্রেম একেবারেই অচল। আর আমার প্রেমে কাজ নেই, তার চেয়ে ষড়দর্শন আর মনোবিজ্ঞানে মনোযোগ দিলে ঢের বেশী লাভ হবে।"

যুবক তখন বাড়ীতে ফিরে এল এবং একখানা ধূলা-ভরা মস্ত-বড় কেতাব টেনে নিয়ে পড়্‌তে বস্‌ল।*

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

* Oscar Wildeএর The Nightingale and the Rose হইতে।

উপসংহার

১

ভোজরাজের দেশে মেয়েটি ভোর বেলাতে দেব-মন্দিরে গান গাইতে যায়। সে ছিল কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে।

আচার্য্য বলেন, "একদিন শেষরাত্রে আমার কানে একখানি সুর লাগল। তার পরে যখন সাজি নিয়ে পারুলবনে ফুল তুলতে গেছি তখন মেয়েটিকে ফুলগাছ তলায় কুড়িয়ে পেলুম।"

সেই অবধি আচার্য্য তাকে আপন তম্বুরাটির মত

কোলে নিয়ে মানুষ করেচে; মুখে যখন কথা ফোটেনি এর গলায় তখন গান জাগল।

আজ আচার্য্যের কণ্ঠ ক্ষীণ, চোখে ভাল দেখেন না। মেয়েটি তাঁকে শিশুর মত মানুষ করে।

কত যুবা দেশ-বিদেশ থেকে এর গান শুন্‌তে আসে। তাই দেখে মাঝে মাঝে আচার্য্যের বুক কেঁপে ওঠে, বলেন,—"যে বোঁটা আলগা হয়ে আসে ফুলটি তাকে ছেড়ে যায়।"

মেয়েটি বলে,"তোমাকে ছেড়ে আমি একপলক বাঁচিনে।"

আচার্য্য তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেন, "যে গান আজ আমার কণ্ঠ ছেড়ে গেল, সেই গান তোরই মধ্যে রূপ নিয়েচে। তুই যদি ছেড়ে যাস্ তাহলে আমার চিরজন্মের সাধনাকে আমি হারাব।"

২

ফাল্গুন পূর্ণিমায় আচার্য্যের প্রধান শিষ্য কুমার সেন গুরুর পায়ে একটি আমের মঞ্জরী রেখে প্রণাম করলে। বললে, "মাধবীর হৃদয় পেয়েচি, এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তাহলে দুজনে মিলে আপনার চরণ সেবা করি।"

আচার্য্যের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। বল্‌লেন, "আন দেখি আমার তম্বুরা। আর তোমরা দুইজনে রাজার মত রাণীর মত আমার সামনে এসে বস।"

তম্বুরা নিয়ে আচার্য্য গান গাইতে বস্‌লেন। দুলহা-দুলহীর গান সাহানার সুরে। বল্‌লেন, "আজ আমার জীবনের শেষ গান গাব।"

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোয় না, বৃষ্টির ফোঁটায় ভেরে'-ওঠা জুঁই ফুলটির মত হাওয়ায় কাঁপ্‌তে কাঁপতে খসে পড়ে। শেষে তম্বুরাটি কুমার সেনের হাতে দিয়ে বললেন, "বৎস, এই লও আমার যন্ত্র।"

তারপরে মাধবীর হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বল্‌লেন, "এই লও আমার প্রাণ।"

তার পরে বল্‌লেন, "আমার গানটি দুজনে মিলে শেষ করে দাও, আমি শুনি।"

মাধবী আর কুমার গান ধরলে—সে যেন আকাশ আর পূর্ণ চাঁদের কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া।

৩

এমন সময় দ্বারে এল রাজদূত, গান থেমে গেল।

আচার্য্য কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আসন থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজের কি আদেশ?"

দূত বল্‌লে, "তোমার মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন, মহারাজ তাকে ডেকেচেন।"

আচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ইচ্ছা তাঁর?"

দূত বল্‌লে, "আজ রাত পোয়ালে রাজকন্যা কাম্বোজে পতিগৃহে যাত্রা করবেন, মাধবী তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে।"

রাত পোয়াল, রাজকন্যা যাত্রা করলে।

মহিষী মাধবীকে ডেকে বল্‌লে, "আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে যাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমার উপরে।"

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিকরে পড়ল।

রাজকন্যার ময়ূর-পংখী আগে যায়, আর তার পিছে পিছে যায় মাধবীর পাল্কী। সে পাল্কী কিংখাবে ঢাকা, তার দুই পাশে পাহারা।

পথের ধারে ধুলোর উপর ঝড়ে ভাঙা অশ্বথ ডালের মত পড়ে রইলেন আচার্য্য, আর স্থির দাঁড়িয়ে রইল কুমার সেন।

পাখীরা গান গাইছিল পলাশের ডালে, আমের বোলের গন্ধে বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। পাছে রাজকন্যার মন প্রবাসে কোনোদিন ফাল্গুন সন্ধ্যায় হঠাৎ নিমেষের জন্য উতলা হয় এই চিন্তায় রাজপুরীর লোকে নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আদিধাতুর জন্ম-কর্ম্ম

রিপু-হারী

নীকোলো ওগায়োভানী ব্যাবসেলীর নির্ম্মিত এই ব্রোঞ্জমূর্ত্তিটি ফেরারা গির্জ্জার একটী বহুমূল্য সম্পত্তি।

সে কোন্ বিস্মৃত যুগে, জগতে প্রথম্ নব-নারীর আবির্ভাবের পর বহুকাল মানুষকে তাহার প্রতিদিনের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রকৃতির কঠিনতম দান শিলা-খণ্ডের উপরই একান্ত নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। সেই প্রাণহীন অতি কঠোর পাষাণ—সেদিন অন্তরতম বন্ধুর মত সৃষ্টির প্রথম যুগের নিতান্ত অসহায় আদিম মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য না করিলে মানুষও হয়ত আজ ধরণীপৃষ্ঠ হইতে অন্যান্য অনেক জীবের মতই বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

মানুষও তাই সেদিন আপনাকে নিতান্ত নিরুপায় রাখিয়া ঐ নিশ্চল অকরুণ পাষাণকেই পরমাত্মীয় বোধে প্রাণপণে অবলম্বন করিতে শিখিয়াছিল। আহারের জন্য পশুপক্ষী শিকার করিতে গিয়া সে পাথরের গুল্‌তি ব্যবহার করিত; কোনও বন্য জন্তু বধ করিবার প্রয়োজন হইলে সে ভারী পাথর ছুঁড়িয়া তাহাকে আঘাত করিত; শত্রুর আক্রমণ হইতে পুরী রক্ষা করিবার জন্য উচ্চ নগর-প্রাকার হইতে বিপক্ষদলের উপর বড়বড় শিলা নিক্ষেপ করিত; কিছু কাটিতে হইলে পাথরেরই কুঠার ও খড়্গ ব্যবহার করিতে হইত; অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য সে পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকি করিয়া স্ফুলিঙ্গ বাহির করিত; গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তাহাকে পাষাণেরই ভিত্তি গঠন করিতে হইত এবং নগর নিরাপদ করিবার জন্য

যন্ত্রী ও তন্ত্রী

পিয়াঙ্কারীনো গঠিত এই ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিটি জেনোয়ার বিয়াঙ্কো প্রাসাদে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

উহার চারিদিকে সে পাষাণেরই অভ্রভেদী প্রাচীর তুলিয়া দিত। পাথরের নির্ম্মিত ঘটি, বাটি, থালা, রেকাব প্রভৃতি তৈজস-পত্র; চৌকা, ত্রিবল, ফুলদান, দেওয়ালগিরি প্রভৃতি পাথরের আসবাব, শিল, নোড়া, চাকা পিঁড়ি, যাঁতা প্রভৃতি গৃহস্থের প্রস্তর-নির্ম্মিত নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তু এবং খেলনা, পুতুল, মূর্ত্তি প্রভৃতি বিবিধ শিল্প-সামগ্রী—যাহা আজও মানুষের নানা প্রয়োজনে লাগিতেছে সে সমস্তই সেই আদিম যুগের অদ্ভুত জীবন-যাত্রার নানা স্মৃতির সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত এবং উহারা সেই সুদূর অতীতের প্রস্তরাবলম্বী যুগের প্রাচীন ধারাও কতকটা বহন করিয়া আসিতেছে।

তারপর সহসা মানুষ কোন্ এক শুভদিনে অপ্রত্যাশিত রূপে ধাতু-পদার্থের সন্ধান পাইয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল! আজ বিজ্ঞানের এই চরমোন্নতির দিনে আদিম পিতামহগণের সে যুগের সে মনোভাব আমরা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিব না। ধাতুপদার্থ আজ আমাদের চক্ষে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহাই ছিল সেদিন আমাদের আদি-পূর্ব্ব-পুরুষগণের নিকট পরম সম্পদস্বরূপ! অগ্নিকুণ্ডের ভস্মাবশেষের ভিতর হইতেই খুব সম্ভবতঃ সে একদিন সর্ব্বপ্রথম তাম্র-খণ্ড কুড়াইয়া পাইয়াছিল, তারপর, কে জানে কোন্ পর্ব্বতের গুপ্ত ভাণ্ডারে ঐ তাম্র ও উহার প্রতিবেশী টিনের সন্ধান পাইয়া সে উহাদের টানিয়া আনিয়াছিল এবং ক্রীড়াচ্ছলে বা কৌতূহলের বশে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া উহাদিগকে একত্রে মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। এইরূপে মানুষ সেদিন নিজের অজ্ঞাতসারেই জগতের এমন এক সুপ্রসিদ্ধ ধাতুপদার্থের সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা আজ সভ্য জগতে মূল্যবান "ব্রোঞ্জ" নামে অভিহিত ও আদরণীয় হইতেছে। এই "ব্রোঞ্জ্" আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তাহার অপরিসীম শক্তির সন্ধান পাইয়াছিল এবং ঐ অপূর্ব্ব ধাতুর সাহায্য লইয়া ধরণীর শোভা-সম্পদ ও শিল্পকলার প্রসারে প্রস্তর-যুগকে শীঘ্রই অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল।

'ব্রোঞ্জের' জন্মদিনের তিথি-নক্ষত্র হিসাব করিয়া এখনও পর্য্যন্ত কেহ একটা সঠিক সময় নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, প্রত্ন-তত্ত্ব-বিদেরা সকলেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। পৃথিবীর এই আদি ও অক্ষয় ধাতুতেই গঠিত হইয়াছিল কত হাজার হাজার যুগের বিভিন্ন সভ্যতার অজস্র উপাদান; শিল্পকলার প্রথম অরুণোদয়ের

নগ্নানন্দ

পম্পীর ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে এই অনুপম শিল্প সম্পদটী খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। মেলীনের গঠিত এই অপরূপ ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তিটি এখন লাক্সেমবর্গ যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কত না খ্যাত ও অখ্যাত সুনিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া অগণিত অতুলনীয় কারু কার্য্য ইহার অক্ষয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। এর একজন সুদক্ষ ভাস্করের সৃষ্ট এক একটি সুন্দর অবিনশ্বর প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিলে আনন্দে ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে হয়—জগতে শিল্প-সৌন্দর্য

অবসর-শয়নে

শিল্পী উয়েস্ট এই সুন্দর ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিটিতে গড়িয়া তুলিয়াছেন এক তরুণী গিরিবালা নির্জ্জন পর্ব্বতশৃঙ্গে আপনার লীলায়িত নগ্ন দেহ মেলিয়া দিয়া আপন মনে নিম্নভূমির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে।

এই যে অনুপম অমূল্য দান—পূর্ব্ব পুরুষগণের এ ঋণ কি আমরা কোনও দিন পরিশোধ করিতে পারিব?

চকমকির কুঠারই যখন মানুষের প্রধান অস্ত্র ছিল, তখন অরণ্য-পরিবেষ্টিত পার্ব্বত্যভূমিতে কাষ্ঠাহরণে আসিয়া বৃক্ষমূলচ্ছেদন করিতে করিতে হয়ত কোনও দিন কাঠুরিয়ার হস্ত-বিচ্যুত কুঠার বৃক্ষকাণ্ড লঙ্ঘন করিয়া পার্ব্বত্য ভূমির উপর আঘাত করিয়াছিল এবং সেই আঘাতের ফলে হয়ত তৎসান্নিধ্যে পতিত মৃত্তিকা-সংযুক্ত লৌহদলের সহিত সংঘর্ষে যে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছিল, তাহারই সংস্পর্শে সন্নিহিত শুষ্কপত্রনিচয় জ্বলিয়া উঠিয়া প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল। মানবের আদি পিতামহগণ সেদিন সহসা এই নূতন শক্তির আবির্ভাব দর্শনে স্বভাবতঃ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অগ্নির ঔজ্জ্বল্য, উহার তেজ ও উত্তাপ এবং সকলের উপর উহার সর্ব্বভুক্ লোলিহান জিহ্বার অসাধারণ দাহিকা শক্তি দেখিয়া উহাকে তাঁহারা সেদিন হইতে দেবতা বোধে পূজা করিয়াছিলেন, তাই—আজও পর্য্যন্ত কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে উহার পূজা প্রচলিত রহিয়াছে। পূজায় প্রসন্ন হইয়া অথবা যে-কোনও কারণেই হোক্—অগ্নিদেবতা ক্রমশঃ ভক্তদের এমন অধীন হইয়া পড়িলেন যে, উহারা তাঁহাকে রন্ধন-কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহদ্বার হইতে বন্যপশু-বিতাড়ন ও শীত-নিবারণে পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতে লাগিল। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদের সেই ভগবান বৈশ্বানর ইহাতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং তাহাদের এমন একটা বর দিলেন, যাহার প্রভাবে মানুষ আজ সসাগরা ধরণীকেও অনায়াসে করায়ত্ত করিয়াছে।

বন্যপশু বিতাড়নের জন্য অথবা শীত নিবারণার্থে প্রজ্বলিত যে অগ্নিকুণ্ড,—তাহারই ভিতরে কতদিন পড়িয়া যে সকলের অজ্ঞাতসারে প্রস্তর ও মৃত্তিকাময় লৌহদল দ্রবীভূত হইয়া অঙ্গার-ভস্মের সংস্পর্শে ইস্পাতে পরিণত হইয়া যাইতেছিল, বহুদিন পর্য্যন্ত কেহ তাহার পরিচয় গ্রহণ করে নাই—কত সহস্র বৎসর ধরিয়া সেই অযত্নে প্রস্তুত ইস্পাত মানুষের কাজে লাগিবার জন্য উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তারপর একদিন হয়ত কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীর ভিন্ন-দেশ জয় করিবার সহজ পথ অন্বেষণ করিতে করিতে উহার সন্ধান পাইয়াছিল এবং আপন স্বজাতিদের উহারই নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া অনায়াসেই দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছিল! ইতিহাস যতদূর প্রমাণ পাইয়াছে তাহারই অনুসরণ করিয়া তাহারা বলিয়াছে যে, দানায়ুব-উপত্যকাবাসী—নীলাক্ষ 'কেলট্' জাতিই সর্ব্বপ্রথমে লৌহাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিল এবং উহারই সাহায্যে তাহারা নাকি সর্ব্বপ্রথম 'গ্রীস' ও 'এসিয়া মাইনর' জয় করিয়াছিল। সে যাহা হউক, ইতিমধ্যে এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশেও স্থানে স্থানে অজ্ঞাত অপরিচিত আবিষ্কার করা তাম্রের সন্ধান পাইয়া উহার দ্বারা ছোরা-ছুরি প্রভৃতি

ছোট-খাট অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহকর্ম্মের উপযোগী টুকিটাকি যন্ত্র-পাতি নির্ম্মাণ করিয়া লইতেছিল; কিন্তু চক্‌মকি পাথরের অস্ত্রশস্ত্রই তখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ প্রদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল এবং ক্ষুরধার গুণের জন্য তামার অস্ত্র অপেক্ষা উহা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় সর্ব্বত্র আদৃত হইত। বিশুদ্ধ তাম অস্ত্রোপযোগী ধাতুর তুলনায় নরম প্রমাণিত হওয়ায় উহা প্রহরণ হিসাবে কোনও দিনই মানুষের বিশেষ কোনও কাজে আসে নাই; আদিম পূর্ব্ব-পুরুষেরা তাই তাম্রের সহিত টিনের সংমিশ্রনে উৎপন্ন নূতন ধাতু পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সংমিশ্রনের ফলে যে কঠিন 'ব্রোঞ্জ' ধাতুর সৃষ্টি হইয়াছিল, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহারা প্রথমে একখানি মনের মত কুঠার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং আশা ও আশঙ্কায় দুলিতে-দুলিতে বৃক্ষ-শাখায় উহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ সিদ্ধির আনন্দে অতিমাত্র উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আমেরিকার পেরু-বাসীদের দ্বারা ব্রোঞ্জ-শিল্পের প্রভূত উন্নতি ও সভ্য-জগতে উহার প্রভূত প্রচার ঘটিয়াছিল। ভূমধ্যসাগর প্রদেশ, যাহাকে য়ুরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়া এই তিনটী মহাদেশের সংযোজক বা মিলন-ভূমি বলা যাইতে পারে, সেখানে মিশর, ব্যারিকুয়া, আসিরীয়া ও ক্রীটই সর্ব্ব প্রথম ব্রোঞ্জ আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছিল। উক্ত প্রদেশ সমূহে তখন তাম্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও টিনের একান্ত অভাব হইতেছিল; সেইজন্য টিনের সন্ধানে চারিদিকে লোক লাগিয়াছিল। ভূমধ্যসাগর তটের সেই ধাতু-সন্ধানী বণিক-সম্প্রদায় দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ কালে তাহাদের নিজ নিজ সভ্যতার গৌরব ও শিক্ষার উৎকর্ষও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এবং এইভাবে কর্ণবাল ও অর্কণী দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ-সাগরের উত্তরকুল পর্য্যন্ত ও সেখান হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্ব-এসিয়াতেও নবাবিষ্কৃত ব্রোঞ্জ ধাতুর প্রচলনের সঙ্গে মিশর ও ব্যারিরুয়ার সভ্যতাও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তারপর প্যালেষ্টাইনের অধিকতর উৎসাহী ব্যবসায়ীরা রীতিমত যুদ্ধ করিয়া স্পেনের তাম্র ও টিনের খনি দখল করিয়া কর্ণবালের সীমান্ত পর্য্যন্ত তাহাদের বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিল।

এই ব্রোঞ্জ ধাতুর অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী হওয়ায় বহু শতাব্দী ধরিয়া ভূমধ্যসাগর কুলের ও পারস্যোপসাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসীরাই— প্রাচীন জগতের শিল্প ও সভ্যতার অগ্রণীরূপে উহার উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছিল। তারপর মধ্য-য়ুরোপের অরণ্যচারী 'কেল্‌ট্' জাতিরা যেদিন তাহাদের নিজের দেশেও টিন ও তাম্রের

দেবদূত

চরণযুগলে পক্ষসংযুক্ত এই স্বর্গের সন্দেশবাহীর বিশ্রাম-নিরত মূর্ত্তিটী গ্রীকশিল্পের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন। নেপল্‌সের যাদুঘরে এই মূর্ত্তিটা এখন রক্ষিত আছে।

অস্তিত্বের সন্ধান পাইল, অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত তাহারাও ব্রোঞ্জ প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেল এবং শীঘ্রই ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত অসি, বর্ম্ম, কিরীচ, ভল্ল, ত্রিশূল, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র ও দেহাচ্ছাদনের জন্য ব্রোঞ্জেরই প্রস্তুত সুদৃঢ় বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দেশ-জয় করিতে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল এবং অবলীলাক্রমে গ্রীস ও ইটালি অধিকার করিয়া বসিল। মধ্য-য়ুরোপের ঐ দীর্ঘকায়, নীলাক্ষ, সুকেশ, গৌরাঙ্গ জাতি ক্রমে জগতের মধ্যে উৎকৃষ্টতম ব্রোঞ্জ নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিল। কি ক্ষুর-ধার অস্ত্র-শস্ত্র; কি কঠিনতম অথচ সুশ্রী সুন্দর তৈজস-পত্র, কি গৃহ-সজ্জার কারু-কার্য্য-খচিত

আসবাব, তাহাদের নির্ম্মিত সমস্ত জিনিসই ভূমধ্যসাগর কূলের অধিবাসীগণের প্রস্তুত ব্রোঞ্জের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইতে লাগিল। গ্রীস অধিকার করিয়া তাহারা গ্রীকরূপে সেখানে বসবাস করিতে লাগিল। ইটালী জয় করিয়াও তাহারা সেখানে বসবাস করিয়াছিল, কিন্তু সেটা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন নামে;—তন্মধ্যে উহাদের 'রোমান' নামটাই জগতে আজ পর্য্যন্ত অমর হইয়া আছে।

আত্ম-নিগ্রহ

লেটনের গঠিত এই অতি চমৎকার ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিটী দেখিলে মনে হয় যেন বলিষ্ঠ বীর এক অজগর ভুজঙ্গের সহিত আপনার শক্তি পরীক্ষা করিতেছেন কিন্তু ইহার আদর্শভাব বোধ হয় আত্ম-নিগ্রহের দ্বারা প্রবৃত্তি-জয়!

একদিন যাহারা জগতে ব্রোঞ্জের চরম উন্নতি ও পরিণতি দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছিল, পরে তাহারাই আবার একদিন সর্ব্বপ্রথম লৌহ আবিষ্কার করিয়া ব্রোঞ্জকে এক প্রকার পরিহার করিয়াছিল। পাহাড়ের গায়ে হাওয়ার মুখে তাহারা একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া গর্ত্তের তলায় হাওয়া ঢুকিতে পারে এরূপ ফাঁক রাখিয়া, উহাতে পাথর চাপাইয়া দিত, পরে উহাতে আগুন ধরাইয়া কাঠ-কয়লার সহিত প্রস্তর ও মৃত্তিকা মিশ্রিত লৌহদল জ্বালাইয়া এমন খানিকটা লৌহপিণ্ড প্রস্তুত করিয়া লইত যে, ইচ্ছামত পিটিয়া উহাতে কুঠার, তরবারি, ছুরী, ছেনি, হাতুড়ি, প্রভৃতি অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি অতি সুন্দর তৈয়ার হইতে পারে।

লৌহের অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহার কাঠিন্য ও তীক্ষ্ণতা ব্রোঞ্জের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বিবেচিত হওয়ায় সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র, কলকারখানার যন্ত্রপাতি আর গৃহস্থালীর প্রয়োজনোপযোগী কঠিন দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে ব্রোঞ্জের ব্যবহার বন্ধ হইয়া আসিল। তখন হইতে উহা কেবলমাত্র সত্যের সুপ্রতীক, শিবের সেবা শান্ত ও সৌন্দর্য্যের ষড়ৈশ্বর্য্য প্রকাশে নিয়োজিত হইতে লাগিল। মিশরের বড়-বড় পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্ত্তি ব্রোঞ্জের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন গ্রীক শিল্পের চরমোন্নতির যুগেই ঐ টিন ও তাম্র মিশ্রিত ধাতু মানুষের ইচ্ছায় এবং তাহারই নিপুণ করের যাদু-স্পর্শে যে কী অপূর্ব্ব-শ্রী ও সৌন্দর্য্যের অনুপম প্রতিমূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার অসংখ্য পরিচয় দিয়াছিল সে যুগের অসাধারণ শক্তিশালী গ্রীক শিল্পীরা ভাস্কর্য্য বিদ্যায় যে সর্ব্ব-সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, আমরা এযুগে অধিকাংশ স্থলে তাহার সম্যক পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, কারণ সেই সুদূর অতীতে মর্ম্মরের মর্ম্মভেদ করিয়া কল্পনার রঙীন আলোকে তাঁহারা যে মুনি মনোহর মুখপদ্মের সদ্যস্ফুট শতদলগুলি বিকশিত করিয়া গিয়াছিলেন, যে সুঠাম কমনীয় দেহলতার ললিত ভঙ্গী নয়নাভিরাম করিয়া গড়িয়া গিয়াছিলেন, গমনের সুছন্দ গতি, চরণের নৃত্য-লীলা অধরের সুমধুর হাসি, যাহা তাঁহারা আপন আপন খোস্-খেয়ালে জড়-আধারেও জীবন্ত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ তাহার অনেকটাই কালের সর্ব্ব-বিধ্বংসী করস্পর্শে ভগ্ন ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

ঘাতভঙ্গুর মর্ম্মর সে যুগের অমর-কীর্ত্তিকে সম্পূর্ণ অটুট অবস্থায় ধরিয়া রাখিতে পারে নাই বলিয়া হয়ত শিল্পীর

হতাশ বক্ষের কত মর্ম্মন্তুদ আক্ষেপ প্রতিদিন আমরা শুনিতে পাইতাম, কিন্তু এই অবিনাশী ব্রোঞ্জ ধাতু তাহাদের হৃদয়ে সে নৈরাশ্যজনিত ক্ষোভের উদ্রেক হইতে দেয় নাই। সে এখনও বিশ্বস্ত ভাণ্ডারীর মত অতীতের সমস্ত কারু-কীর্ত্তির সম্পূর্ণ পরিচয় উত্তরাধিকারিগণকে বুঝাইয়া দিতেছে! য়ুফ্রেটিস্ ও টাইগ্রীসের মরু-তীরবর্ত্তী বালুগর্ভ হইতে সংগৃহীত বহুমূর্ত্তি ও তৈজস-পত্রে এবং পারস্যোপসাগর কূলের একাধিক প্রাচীন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ভিতর একমাত্র ব্রোঞ্জ্ই আজ পর্য্যন্ত সে বিস্মৃত-যুগের সভ্যতার ইতিবৃত্ত ও নানা শিল্প-গৌরব সযত্নে, সস্নেহে, অটুট অবস্থায় রক্ষা করিতেছে। মিশর, ক্রীট, ও এশিয়া-মাইনরের মৃত্তিকা-গহ্বর হইতে ব্রোঞ্জ্-গঠিত যে শিল্প-সম্ভার কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে, গ্রীস ও ইটালীর আবর্জ্জনাস্তূপ অন্বেষণ করিয়া, পূর্ব্ব-পুরুষগণের কল্পনা-প্রসূত প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপের যে অসংখ্য অক্ষয় নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে, ভবিষ্যতের ভাস্কর ও শিল্পীগণ উহা দেখিয়া নিঃসন্দেহ আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে এবং অতীতের সেই ওস্তাদ-বৃন্দের বন্দনা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। এখনও বহুদিন ধরিয়া বহু অনাগত শিল্পী ঐ সকল অপূর্ব্ব উপাদান হইতে আদর্শে, কল্পনায়, কলা-কৌশলে কারু-বৈচিত্র্যে ও শিল্প-শোভায় ভাব ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারিবে!

রোম-সাম্রাজ্য যখন অর্দ্ধ-জগত পরিব্যাপ্ত ছিল, সেই সময়ই ব্রোঞ্জ্ শিল্পের আধিপত্য জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হইয়াছিল। সহরের সরকারী কার্য্যালয়সমূহের প্রধান প্রধান প্রবেশ-দ্বার, চিত্রোৎকীর্ণ তোরণ, গৃহতল, ভিত্তিগাত্র ও চন্দ্রাতপ প্রভৃতি এই চিরস্থায়ী উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ্ ধাতু বিনির্ম্মিত শিল্পাবরণে ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। রোমের যে প্রাচীনতম অট্টালিকা "প্যান্থিয়ান", যাহা কালের অত্যাচারে এখনও পর্য্যন্ত ধরণী-পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, কথিত আছে জনৈক পোপ নাকি উক্ত অট্টালিকা হইতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার মণ ব্রোঞ্জ খুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ও তাহার কিয়দংশ লইয়া তিনি যুদ্ধের জন্য কামান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং কিয়দংশ সেন্ট্ পীটার গির্জ্জার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। কামান প্রস্তুত করিবার জন্য এখনও ব্রোঞ্জের ব্যবহার হইতেছে, কিন্তু সে অন্য নামে, অর্থাৎ উহাকে ঠিক ব্রোঞ্জ্ না বলিয়া এখন বলা হইতেছে—গান্-মেটাল বা কামান নির্ম্মাণের ধাতু। শতকরা নব্বই ভাগ তামার সহিত দশ ভাগ টিন মিশ্রিত

জয়শ্রী

পদতলে বিলুণ্ঠিত ভূমণ্ডল বিজয়লক্ষ্মীর এই মূর্ত্তিটি পম্পীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া নিমজ্জিত ছিল। সম্প্রতি ইহার উদ্ধার হইয়াছে।

করিয়া এই 'গান-মেটাল্' প্রস্তুত হইতেছে, অথচ ব্রোঞ্জের জন্যও ঐ দুই ধাতুরই সংমিশ্রণে, তবে ভাগের কিছু তারতম্য আছে বটে। সংগ্রামে সংহার-কার্য্যে সহায়তার জন্য ব্রোঞ্জ্ আজ আবার এক নূতন সাজে দেখা দিয়াছে। শতকরা নব্বই ভাগ তামা ও দশ ভাগ টিনের সহিত শতকরা আধ কিম্বা পোনে একভাগ ফস্ফরাস্ মিশ্রিত করিয়া যে অসাধারণ বজ্র-কঠোর, ঘাতসহ ও দীর্ঘস্থায়ী ধাতু প্রস্তুত হইতেছে
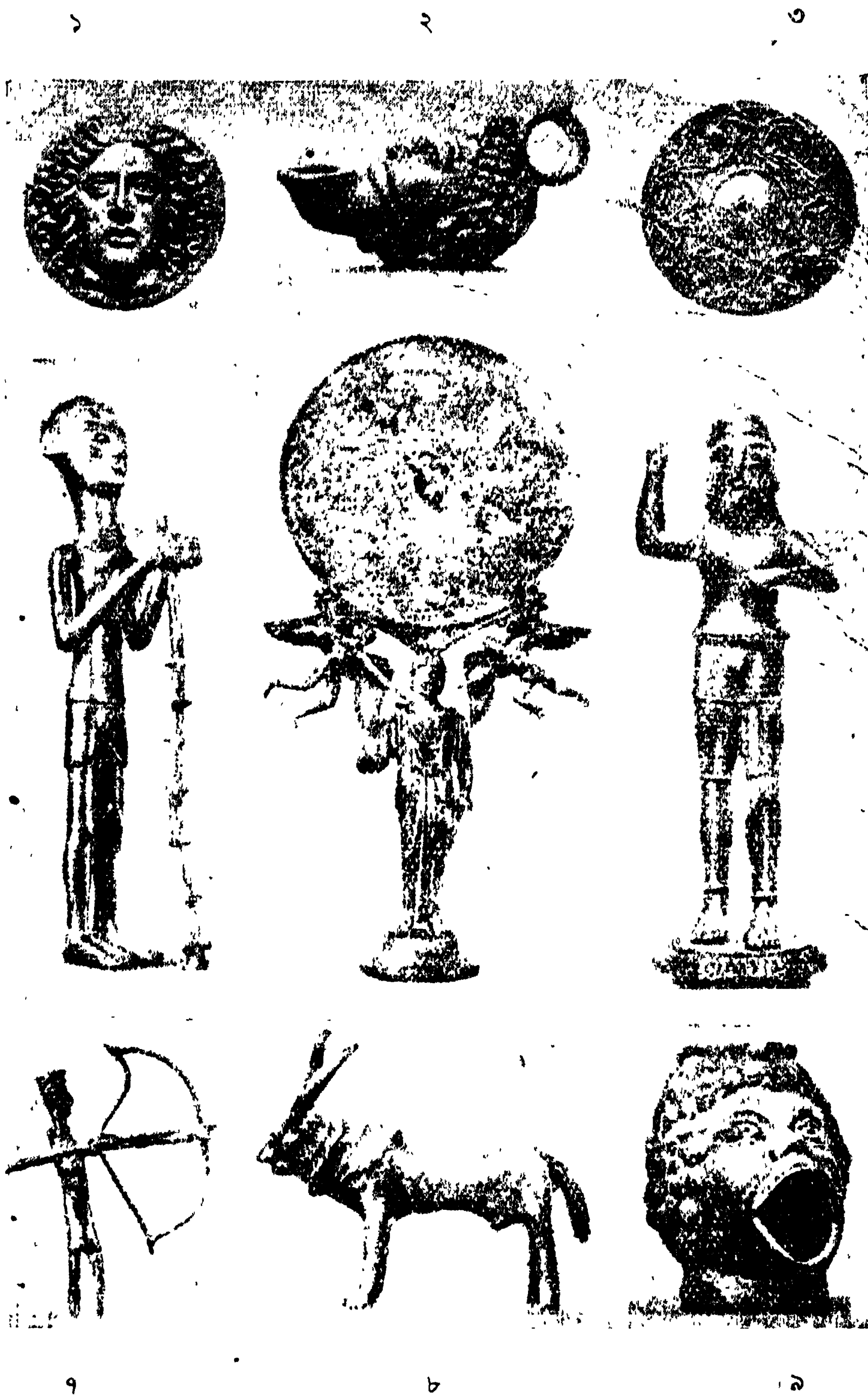
১ সূর্য্যদেব। ২ দীপাধার [নাইনেভের ধ্বংশাবশেষ হইতে প্রাপ্ত] ৩ ঢাল। (প্রাচীন ইংরেজদের)
৪ সৈনিকমূর্ত্তি (প্রাচীন গ্রীক) ৫ দর্পণ (গ্রীক শিল্প নিদর্শন) ৬ সৈনিকমূর্ত্তি (প্রাচানতম) ৭ ধনুর্দ্ধারী। (আসীরীয়া) ৮ বৃষ। নাইনেভে হইতে প্রাপ্ত) ৯ কাফ্রী (নাইনেভের ধ্বংশাবশেষ হইতে প্রাপ্ত)

হার নাম হইয়াছে 'ফস্ফর-ব্রোঞ্জ'। ঐ সব নবাবিষ্কৃত কঠোরতম ধাতু 'গান্-মেটাল্' বা 'ফস্ফর-ব্রোঞ্জের' প্রজ্জ্বলিত উদর হইতে নৃশংস মানবের হিংসার রোষানল অগ্নিময় লৌহ-গোলকের মূর্ত্তি ধরিয়া বজ্র-নিনাদে বাহির হইতেছে এবং শত্রু বিনাশের অজুহাতে ভ্রাতৃ-বধ করিয়া ধাতা ও ধরিত্রীকে ক্রমাগত পীড়া দিতেছে। অনন্ত প্রসারিত জলধিও মানুষের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই। নৌশক্তির একাধিপত্য রক্ষা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য বৃহৎ রণতরী-সমূহ ঐ ব্রোঞ্জেরই সাহায্য লইয়া অবিরাম সংগ্রাম করিতে করিতে সমুদ্র মন্থন করিয়া ফেলিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার নিকট রুষিয়ার অসংখ্য বাহিনীর যে বার বার পরাজয় হইয়াছিল সেও অষ্ট্রীয়ার ঐ অগণিত ব্রোঞ্জ কামানেরই গুণে। উহারই সাহায্যে অষ্ট্রীয় সেনা সেদিন অভ্রভেদী আল্পস্ উল্লঙ্ঘন করিয়া ইটালীর তুষারাবৃত উত্তর সীমান্ত অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

সংগ্রামে ব্রোঞ্জের এই রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ যেন না উহাকে কেবলমাত্র ধ্বংসেরই সহচর মনে করেন। লৌহ ইস্পাতে রূপান্তরিত হইবার পর হইতেই উহার সে দুর্ণাম আর একেবারেই নাই। ঘাতকের যা কিছু কাজ তাহা এখন লোহ একাই সম্পাদন করিতেছে। ব্রোঞ্জ্ সেদিন হইতে গীর্জ্জায়, মন্দিরে, পূজারীর আসন-পার্শ্বে, দেবভক্ত সাধুর মত ঘণ্টার আকারে বিরাজ করিতেছে।

এই ঘণ্টা-রূপী ব্রোঞ্জের অন্তর্নির্গত সুরে কথনও

আনন্দের উল্লাস-রব, কখনও ক্রন্দনের করুণ-রোল, কখনও বা ভক্তের স্তুতি-নিনাদ ধ্বনিত হয়। এই সুর-সৃষ্টির সুবিধার জন্য ঘণ্টাঙ্গ ব্রোঞ্জে টিনের ভাগ কিছু অধিক মাত্রায় মিশ্রিত করিতে হয়, নতুবা ঘণ্টায় 'বেসুর' বাজে। মিশর, মেসোপটেমিয়া ও ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম দেবপূজার জন্য মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা প্রচলিত হইয়াছিল। তারপরই রোমে সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে লোক আহ্বান করিবার জন্য ঘণ্টা-ধ্বনির ব্যবস্থা হয় এবং সেইখান হইতেই উহা ভক্ত উপাসকগণকে একত্র সমবেত করিবার জন্য গীর্জ্জার চূড়ায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। পরে গীর্জ্জা, মঠ ও সন্ন্যাসীদের আশ্রম হইতে উহা ক্রমে জাহাজে গিয়া উঠে

এবং এখনও সেখানে বর্ত্তমান ইস্কুল আদালত প্রভৃতিতে যেরূপ ব্যবস্থা আছে সেইপ্রকার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডানুসারে ঘণ্টা ধ্বনি করিয়া প্রতিদিন সময় নির্দ্দেশ করিতেছে! এইভাবে ক্রমশঃ উহা জলে, স্থলে, রথে, পথে, বিবাহে, শবদাহে, পূজায়, অর্চ্চনায়, আহ্বানে, সাবধানে, বিজয়োৎসবে ও শান্তির অনুষ্ঠানে সংসার-তাপক্লিষ্ট মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের নানা বিচিত্র সুর শুনাইয়া আসিতেছে!

১ সম্পুট। (ব্রোঞ্জ-শিল্প) ২ পা-পা। (শিশুর প্রথম পাদক্ষেপের এই চমৎকার মূর্ত্তিটি নাইনেভের ধ্বংশাবশেষ হইতে পাওয়া গিয়াছে) ৩ মুকুট (এক্রুরায় জাতীয় এই ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত শিরোভূষণ ওলম্পায়া হইতে পাওয়া গিয়াছে) ৪ ছাগদম্পতী। (গ্রীক শিল্প নিদর্শন) ৫ উচ্চাসন। (এক্রুরায় জাতির ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত এই উচ্চাসন ব্যবহার করিত) ৬ দুগ্ধপাত্র; ৭ কলস।

মানুষের হাতে গড়া আদিম যুগের এই প্রথম ধাতু, মানুষের গৌরব ও মহিমার কত অতুলনীয় কীর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া, যেন উত্তর জগতের নিকট উহার সাক্ষ্য ও প্রমাণ দিবার জন্য, কৃতজ্ঞ কিঙ্করের মত মানব-সভ্যতার সে কোন বিস্মৃত যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে!

শ্রী·বেন্দ্র দেব।

আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের ভাষা

কাণা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' রাখিলে সেটা যে হাস্যাস্পদ হয় তাহা আমরা সকলেই বুঝি। কিন্তু তথাপি পুত্রের নামকরণের সময় আমরা ভাবিনা যে আমাদের অধিকাংশ নামেরই সার্থকতা নাই। নামের দ্বারা প্রকাশ্য ভাবটী নামের উপলক্ষ্যভূত ব্যক্তিতে প্রায়ই থাকে না। ফলে অনেক সময় দেখা যায় যে 'করুণাময়' বা 'দয়ালচাঁদ' নাম-বিশিষ্ট ব্যক্তি নাম-প্রকাশ্য ভাবের বিপরীত ভাবের আধার। কিন্তু ভাষা-সৃষ্টির প্রথম যুগে যখন বস্তু বা ব্যক্তির নামকরণ প্রথা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন যে এ-ভাবে নামকরণ হইত না তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ বস্তু-প্রকাশ্য ভাবটী ধরিয়া রাখিবার জন্যই ভাষা। ভাষার কার্য্যই হইল 'ভাষণ' বা 'বলিয়া দেওয়া'; কিন্তু মিথ্যা কথা বলিয়া দেওয়া নহে। যদি কোনও বস্তুতে একাধিক ভাব বা লক্ষণ থাকে তাহা হইলে সভ্যসমাজের ভাষায় তাহার একটীমাত্র লক্ষণ বা ভাব লইয়া ঐ বস্তুর নামকরণ হইতে দেখা যায়। যেমন 'হস্তী' বা 'কেশরী' শব্দ। মানুষ বা বানরের হাত থাকিলেও 'হস্তী' শব্দে তাহাদের অভিব্যক্তি হয় না। অশ্বের কেশর তাহার নামকরণের উপযোগী লক্ষণ নহে। কিন্তু এ-সকল স্থলে নামকরণের বৈশিষ্ট্য এই যে, যদি কোনও বস্তুর অন্তর্গত ভাব বা লক্ষণের সমষ্টি হয় ক+খ+গ, তাহা হইলে কেবলমাত্র ক, অথবা খ, অথবা গ লক্ষণ দ্বারাই বস্তুর নামকরণ হইতে পারে। কিন্তু যে বস্তুতে তিনটী লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহার একটী মাত্র গ্রহণ করিলে সেটী যে প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে তাহার কি কারণ আছে? অনেক সময়েই একটী অপ্রধান লক্ষণ হইতে বস্তুর নামকরণ হয়। যেমন, চেয়ারের হাত, চৌকির পা। 'পা' শব্দের অর্থের পক্ষে যদি 'চলচ্ছক্তি' প্রধান লক্ষণ হয় (যেমন 'ছেলেটীর এখনও পা হয় নাই') তাহা হইলে চৌকির 'পা' থাকিতে পারে না। 'কর্ম্মকারিতা' যদি হাত শব্দের প্রধান লক্ষণ হয় তাহা হইলে চেয়ারের 'হাত' অচিন্তনীয় ভাষা। সুতরাং এ সকল স্থলে অপ্রধান লক্ষণ লইয়া বস্তুর নামকরণ সভ্য ভাষার লক্ষণ। কারণ সৃষ্টির প্রথম যুগে বস্তুর নামটীতে তৎ-প্রকাশ্য সমগ্র ভাবটী ধরিয়া রাখিবার চেষ্টাই হইয়া থাকে, দ্বিতীয় যুগে ভাবের সমগ্রতা কমিয়া আইসে বটে, কিন্তু অপ্রধান বা গৌণ লক্ষণ দ্বারা নামকরণ হয় না। প্রধান লক্ষণ বা মুখ্য ভাবটী বর্জ্জন করা তখন ভাষার পক্ষে দুঃসাহস। সে সাহস অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য জাতির থাকে না। অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য জাতির ভাষায় তাহাদের মনোবৃত্তি-গ্রাহ্য সরল ভাব প্রকাশ করিয়াই ভাষার কার্য্য-সমাপ্তি হয়; কিন্তু সভ্যজাতির জটিল মনোবৃত্তির অনুরূপ জটিল এবং সংখ্যাতীত ভাব প্রকাশের জন্য ভাষাকে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং পুরাতন উপাদানের সাহায্যে গৌণ লক্ষণ প্রকাশ দ্বারা সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে (convention দ্বারা) বস্তুর নামকরণ এই অবস্থায় আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাই মানবের সভ্যতার বিকাশের সহিত ভাষার বিকাশের এত সম্পর্ক। কারণ অপেক্ষাকৃত অল্প উপাদান বা শব্দের দ্বারা সভ্যতা-উদ্ভাবিত অধিক-সংখ্যক ভাব প্রকাশ করাই সভ্যজাতির ভাষার পক্ষে একমাত্র কঠিন সমস্যা। নতুবা অপ্রধান লক্ষণ দ্বারা বস্তুর নামকরণ বোধ হয় কোনও যুগেই হইত না।

আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের (Red Indians) ভাষায় বস্তুর নামকরণের সময় বস্তু-প্রকাশ্য সমগ্র ভাবটী ধরিয়া রাখিবার প্রবল চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। যদি কোনও বস্তুতে ভাবের সমষ্টি হয় ক+খ+গ তাহা হইলে সেই বস্তুর নামও হইবে 'কখগ'; ইহার কোনও অংশই ত্যাগ করা তাহাদের সাহসেও কুলায় না, আবশ্যকও হয় না। সেইজন্য তাহাদিগের বিশেষ্য পদে অসংখ্য ভাব ও লক্ষণের একত্র সমাবেশ (extreme connotiveness of many qualities and characteristics *) দেখা যায়। প্রত্যেক বস্তুতেই অসংখ্য ভাব ও অসংখ্য

* J. W. Powell on "The Evolution of Language" in the first Annual Report of the American Bureau of Ethnology.

লক্ষণ আছে। তাহাদের অংশমাত্র লইয়া যে নামকরণ তাহা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ ভাবে কোনও বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে তাহার অংশমাত্রের গ্রহণে চলে না; সমগ্রতা আবশ্যক হয়। কিন্তু সমগ্রতা দিয়া বস্তুর নামকরণ করিতে হইলে সভ্যসমাজে সভ্যতা দ্বারা উদ্ভাবিত অসংখ্য ভাবের প্রকাশ করিতে অসংখ্য নাম বা শব্দের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। কিন্তু সে প্রকার অসংখ্য শব্দ সৃষ্টি করিতে হইলে ভাষা পদে পদে প্রতিহত হয়। তাই সভ্যসমাজে অংশ মাত্র বা গৌণ লক্ষণ মাত্র লইয়া অসংখ্য বস্তু বা ভাবের অভিব্যক্তি সেই সমাজের ভাষায় লভ্য পুরাতন উপাদান ও convention বা সম্মতি দ্বারা হইয়া থাকে।

আমেরিকার ভাষায় বস্তুর নামকরণের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের যাবতীয় নাম ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন। বস্তুর গুণ অপেক্ষা কার্য্যের বর্ণনাতেই ইহাদের জীব, বস্তু বা ব্যক্তির নামকরণ হয়। ফলে ক্রিয়াপদ ও বিশেষ্য পদে কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। ইহাদের ভাষায় পদবিভাগ বা parts of speech নাই বলিলেই হয়। 'উতে' ভাষায় ভল্লুকের নাম 'সে-আক্রমণ-করে'। এখানে বিশেষ্য পদের পরিবর্ত্তে ক্রিয়া পদেরই ব্যবহার হইয়াছে এবং ভল্লুকের প্রধান কার্য্যকে লক্ষণ ধরিয়া সেই প্রধান লক্ষণ হইতেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। রোমদেশে সেনেকা (Seneca) উত্তরদিকের নাম দিয়াছিলেন 'সূর্য্য-কখনও সেদিকে-যায়-না' এবং এই বাক্যটী বিশেষ্য বা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশেষণে কোনও প্রভেদ কল্পনা হয় নাই। আধুনিক ইংরাজী ভাষায় a stick-to-it-ive policy প্রভৃতি পদ-রচনা চলিতেছে। ইহাও কতকটা আমেরিকার polysynthetic বা বহু-সংযোজী ভাষার অনুরূপ প্রয়োগ। 'পবন্ত' (Pavant) ভাষায় বিদ্যালয়ের নাম পো-কুন্ত্-ঈন্-ঈঞ্-য়ী-কন্ (po kunt-in-in-yi-kan)* এখানে 'পো-কুন্ত্' = যাদুবিদ্যা অনুশীলিত হয়। ইহাদের লেখার নাম যাদুবিদ্যা (sorcery), কারণ লিপিবিদ্যাকে ইহারা যাদুবিদ্যা বা sorcery বলিয়া মনে করে। 'ঈন্-ঈঞ্-য়ী' = গণনা করা। ইহাদের 'পড়া' বা 'পাঠ' গণনা করা বলিয়া বিবেচিত হয়। আর 'কন্' (Kan) শব্দে 'কুটীর' বা wigwam বুঝায়। সুতরাং সমগ্র বিশেষ্য পদটীর অর্থ হইল 'যেখানে যাদুবিদ্যার গণনা হয় এমন স্থান' অর্থাৎ 'পাঠশালা' বা 'বিদ্যালয়'। সুতরাং 'পবন্ত' জাতীয় মনুষ্য বিদ্যালয় বা পাঠশালার নামকরণে ঐ স্থানটীর উদ্দেশ্য বা কার্য্যের বর্ণনা করিতে ভুলে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহারা আমাদিগের ন্যায় সভ্যতার উচ্চস্তরে উন্নীত হয় নাই: তাই abstraction বা ভাব-নিষ্কর্ষ ইহাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে কোনও প্রকার কল্পনা বা চিন্তাপ্রণালী আবশ্যক হয় না। যাহা দেখিলাম তাহা বুঝিলাম, তাহার চিত্র মানস-পটে অঙ্কিত হইল। স্মৃতির সাহায্যে তাহাকে পুনরায় মানস-পটে দেখিতে পারি, তাহাতে কল্পনা আবশ্যক হয় না। কিন্তু যাহা দেখিতে পাই না, অথচ দৃষ্ট বস্তু-বিশেষে যাহার সত্তা, এমন কোনও ভাব বা বস্তু-ধর্ম্মের উপলব্ধি করা কল্পনা সাপেক্ষ। 'আমার হাত', 'তোমার-পা', 'তাহার-মাথা' বলিলে প্রত্যেক শব্দ বা পদে এক একটী বস্তু নির্দ্দিষ্ট ভাবে উপলক্ষিত হয়। সুতরাং আমেরিকাবাসী আদিম জাতির ভাষায় এই সকল শব্দ আছে। কিন্তু আমারও নহে, তোমারও নহে, তাহারও নহে, আর কাহারও নহে, এবম্বিধ একটা পা, বা হাত, বা মাথার উপলব্ধি তাহাদের কল্পনায় হয় না। কারণ এ প্রকার সর্ব্ব-ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অবয়ব প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত না হওয়ায় তাহার উপলব্ধি ভাব-নিষ্কর্ষ বা কল্পনা-সাপেক্ষ। যদি একখানি কাটা পা' ডাক্তারের অস্ত্র করিবার টেবিলে দেখে তবে আমেরিকাবাসী তাহার নাম দিবে 'কোনও-ব্যক্তি-তাহার-পা'। এখানে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নবদেহ-বিচ্ছিন্ন পা খানির উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে কষ্টকর নহে। তাই তাহার ভাষায় এই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বিচ্ছিন্ন অবয়বের নাম আছে। কিন্তু সেই নামকরণ ব্যাপারেও ঐ প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বস্তু বা অবয়বের একটী স্বামীর কল্পনা করিয়া তাহার স্মৃতি-শক্তি আশ্বস্ত

* উদাহরণগুলি J. W. Powell এর পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

হয়। এই বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞানই এই প্রকার স্মৃতি বা কল্পনা-সাপেক্ষ। স্মৃতি ও কল্পনা ব্যতীত তাহাকে চেনা যায় না। পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তু চিনিয়া লইবার জন্য যতটুকু স্মৃতি বা কল্পনা আবশ্যক হয় তাহা মনুষ্য মাত্রেরই আছে। তবে সভ্যজাতি কথোপকথনকালে এই কল্পনা বা স্মরণ কার্য্যের উল্লেখ না করিয়াও ভাব-প্রকাশ করিতে পারে, অসভ্য জাতি ভাবপ্রকাশকালে তাহার নিজের মানসিক প্রক্রিয়ার সমগ্রটীর বর্ণনা না করিয়া পারে না।

ইহাদের সর্ব্বনামের ব্যবহারেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। * স্বাধীন সর্ব্বনাম ইহাদের অল্পই আছে। ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম বা personal pronoun ইহাদের আছে বটে, তবে অধিক ব্যবহার নাই। 'আমি' না বলিয়া ইহারা 'এই ব্যক্তি' বলিতে অধিক অভ্যস্ত। ইংরাজী he, she, it, বা বাঙ্গালা 'সে' পদের পরিবর্ত্তে ইহারা 'সেই ব্যক্তি' বা 'সেই বস্তু' পদের অধিক পক্ষপাতী। নির্দ্দেশক সর্ব্বনাম বা demonstrative pronoun বিশেষণরূপে খুব ব্যবহৃত হয়। বহুবচনে ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম বা personal pronoun ইহাদের অনেকগুলি আছে। দ্বিবচন ও বহুবচন আছে। উত্তম পুরুষের দ্বিবচনে 'আমি এবং-তুমি' ও 'আমি এবং-সে' এই দুই পদ আছে। বহুবচনে 'বক্তা-ও উপস্থিত-জন-গণ' এবং 'বক্তা-ও-অনুপস্থিত-জন-গণ' এই পদ আছে। এই-সকল প্রভেদ-কল্পনা আমাদের ভাষায় জোড়া-তাড়া দিয়া হয়। ইহাদের মধ্যম ও প্রথম পুরুষেও এক-বচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের পদ আছে। যদি দ্বিবচনের ব্যবহার প্রাচীনতা ও অনুন্নততার লক্ষণ হয় তবে সে লক্ষণ ইহাদের ভাষায় আছে।

ইহাদের ভাষায় আর এক প্রকার সর্ব্বনাম আছে। ইংরাজী ভাষায় তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'article pronoun' বা সম্পর্ক-জ্ঞাপক সর্ব্বনাম। এই সর্ব্বনামের স্বাধীন ব্যবহার নাই। ক্রিয়াপদের সহিত মিলিত হইয়া এই সর্ব্বনাম লিঙ্গ-বচন-ব্যক্তিত্বাদি সম্পর্ক জ্ঞাপন করে। উপসর্গ, প্রত্যয় বা পদমধ্যে আগম রূপে ইহার ব্যবহার হয়। †

কর্ত্তৃপদ ও কর্ম্মপদের বচন, লিঙ্গ ও পুরুষ এই সম্পর্ক-জ্ঞাপক সর্ব্বনাম প্রকাশ করে, অথচ ইহার অবস্থিতির স্থান ক্রিয়া-পদের সহিত। কর্ত্তৃপদ ও কর্ম্মপদও ক্রিয়াপদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক ক্রিয়া হইতে একটী বাক্য বা sentence-word রচনা করে। সেইজন্য আমেরিকার ভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার বড় জটিল। সম্পর্ক-জ্ঞাপক সর্ব্বনামের একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন আছে। কর্ত্তৃপদের নির্দ্দেশক হইলে যে সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হয়, কর্ম্মপদের জন্য তাহা হয় না; অন্য একটী সর্ব্বনামের ব্যবহার হয়। সুতরাং কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-প্রয়োগ ভেদেও সম্পর্ক-জ্ঞাপক সর্ব্বনামের রূপ-বিভিন্নতা আছে। আবার যদি কর্ত্তৃপদ ও কর্ম্মপদ উভয়ই একসঙ্গে নির্দ্দেশিত হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ একটা পৃথক সর্ব্বনামের ব্যবহার হইতে পারে। পূর্ব্বের দুইটা দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় না।

আবার সম্পর্ক-জ্ঞাপক সর্ব্বনামের লিঙ্গ ব্যবহার নিতান্তই বিচিত্র ও জটিল। আমেরিকার ভাষার আলোচনা-কালে এক-দম ভুলিয়া যাইতে হইবে যে, লিঙ্গ দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রীজাতির ভাব প্রকাশ হয়। আমেরিকার ভাষায় লিঙ্গ প্রকাশ করিবার একমাত্র উপাদান এই সম্পর্ক-জ্ঞাপক সর্ব্বনাম। কিন্তু ইহার দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ভাব প্রকাশ হইতেও পাবে, নাও পারে। তাহাদের লিঙ্গ-বাচনে পুংস্ত্ব-স্ত্রীত্ব জ্ঞাপন অতি অপ্রধান কার্য্য। লিঙ্গ-বাচনের প্রথম সোপানেই বিচার্য্য এই যে, বস্তুটীর প্রাণ আছে কি না? যদি প্রাণ থাকে তবে তাহা পুরুষ কি স্ত্রীজাতীয় তাহা ভাবিতে হইবে। প্রাণ না থাকিলে এ-সকল কল্পনা নিতান্ত অনর্থক। প্রাণ-বিশিষ্ট হইলেই যে তাহার পুং-স্ত্রীত্ব-নির্দ্দেশ অবশ্য-কর্ত্তব্য তাহাও নহে। ইহাদের চিন্তাপ্রণালীতে ও-প্রকার ভাবনা হয় নিরর্থক, না-হয় অশ্লীলতাব্যঞ্জক। কিন্তু পুং-স্ত্রীত্ব নির্দ্দেশ না করিলেও ইহাদের চিন্তা-প্রণালীতে লিঙ্গ-প্রকাশ্য ভাব অনেক আছে। সবগুলিই কিন্তু প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত। বস্তুই হউক, ব্যক্তিই হউক অথবা ইতর প্রাণীই হউক, তাহার গঠন-প্রকৃতি (বা কল্পিত গঠন-প্রকৃতি) লিঙ্গ-বাচনকালে ইহাদের বিচারের বিষয়। ভাবিতে হইবে বস্তুটী

* প্রকৃত পক্ষে ইহাদের পদবিভাগ বা parts of Speech নাই।
† 'as prefixes, infixes or suffixes'—J. W. Powell.

'দণ্ডায়মান', 'উপবিষ্ট', না 'শয়ান'। তারপর ভাবিতে হইবে তাহার গঠন জলীয়, অর্দ্ধতরল, মৃত্তিকাবৎ, প্রস্তরবৎ, দারুবৎ, কি মাংসবৎ। এই সমস্ত ভাব এক লিঙ্গের দ্বারা প্রকাশ্য। সুতরাং লিঙ্গবাচন প্রণালী ফুটনোটের চিত্রানুরূপ :—*

অতএব আমেরিকার ভাষায় লিঙ্গবিচারে পুং-স্ত্রীত্ব বাদ দিয়াও বিভিন্ন লিঙ্গের সংখ্যা অষ্টাদশ। আর পুরুষ ও স্ত্রীজাতির বিভিন্নতা ধরিলে লিঙ্গ বিভিন্নতার সংখ্যা বিংশতি। একটী উদাহরণ ধরা যাউক। আমরা বলি "সে একটা খরগোস মেরেছে"। কিন্তু আমেরিকাবাসীর ভাষায় এইটুকুমাত্র বলিলে চলে না। তাহার ভাষা হইবে :—

"সে-এক-সজীব-মাংসবৎ-দণ্ডায়মান-কর্তৃপদ উদ্দেশ্য-পূর্ব্বক-বাণমারিয়া বধকরিয়াছে খরগোস-সে-এক সজীব-মাংসবৎ-উপবিষ্ট-কর্ম্মপদ"

এতগুলি কথা না বলিলে তাহার ভাব প্রকাশ হয় না। এই বাক্যটীর আলোচনা করিলে আমরা এই দেখিতে পাই যে, আমেরিকাবাসীর চিন্তাপ্রণালীতে খুঁটিনাটি সহ সমগ্র ভাবটীর চিত্র আঁকিতে হইবে। কেবল একটী কথা 'সে' বলিলে হইবে না। ভাবিতে হইবে সে 'এক' কি 'দ্বি' কি 'বহুবচন'? সে 'সজীব' কি 'নির্জীব'? তাহার গঠন কি প্রকার? সে 'দণ্ডায়মান' কি 'শয়ান' কি 'উপবিষ্ট'? আবার তারপর ভাবিতে হইবে সে 'কর্তৃপদ কি 'কর্ম্মপদ'। কোনও কোনও ভাষায় ইহাতেও কুলাইবে না। আরও ভাবিতে হইবে সে 'পুরুষ' কি 'স্ত্রী' জাতীয়? তবে আমাদের এক 'সে' বা ইংরাজী 'he' পদবাচ্য একটী পদের রচনা হইবে। ঠিক যেন একটী ছবি আঁকা। ছবি আঁকিতে হইলে যেমন তাহার খুঁটিনাটি সবটী ভাবিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয়, ভাষাতেও তাহাই। আবার ক্রিয়াতে উদ্দেশ্য আছে কি না তাহার বিচার চাই। কি অস্ত্র ব্যবহার হইয়াছে তাহার উল্লেখ চাই। নতুবা অর্থবোধ হইবে না। আংশিক ভাব প্রকাশ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। কর্ম্মপদেও কর্তৃপদের ন্যায় সমস্তটী ভাবিয়া ফুটাইতে হইবে। ইহাদের মধ্যে যে-সকল জাতি অপেক্ষাকৃত সভ্য, তাহারা চিত্র-লিপির দ্বারা লিখিয়া ভাব প্রকাশ করে। সুতরাং তাহাদের লিপিবিদ্যা ও ভাষা অভিন্ন প্রকারের। চিত্রেও যেমন ভাষাতেও তেমনি; ভাবটী সমগ্র ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহারা সার অসারের প্রভেদ কল্পনা করিতে পারে না। আধুনিক বঙ্গীয় নাট্যে একজাতীয় 'ঝি'র চরিত্র মাঝে মাঝে দেখা যায়। ইহারা অসংখ্য অবাস্তব কথা বলিয়া সময় নষ্ট করে, আসল কথা বলিতে অত্যন্ত বিলম্ব করে। সার ও অসারের ভেদ কল্পনা করিতে পারে না। নার-ক্ষারের সমবায় হইতে নীর বর্জ্জন ও ক্ষীর গ্রহণ হংসেরই কার্য্য, কাকের নহে।

আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যঋষিগণের লিঙ্গরচনায় তাঁহাদের মানসিক চিন্তাপ্রণালীর এই আভাস পাওয়া যায় যে, তাঁহারা ভাবুক ও কাল্পনিক ছিলেন। তাঁহারা পুং-স্ত্রীত্ব বাচন বা সজীব-নির্জীবতা নির্দ্ধারণ লইয়া মাথা ঘামাইতেন না। তাঁহারা প্রকৃতির নানা চিত্র হইতে যেমন দেব-দেবী কল্পনা করিতেন সেইরূপ প্রকৃতির নানা চিত্রের পুং-স্ত্রীত্ব কল্পনা করিতেন। প্রকৃতিতে যাহা মধুর, যাহা কমনীয়, যাহা রমণীয়, তাহাই স্ত্রীলিঙ্গ। আর যাহা বীরত্বাদি পুরুষ-ধর্ম্মের আধার তাহাই পুংলিঙ্গ। এই
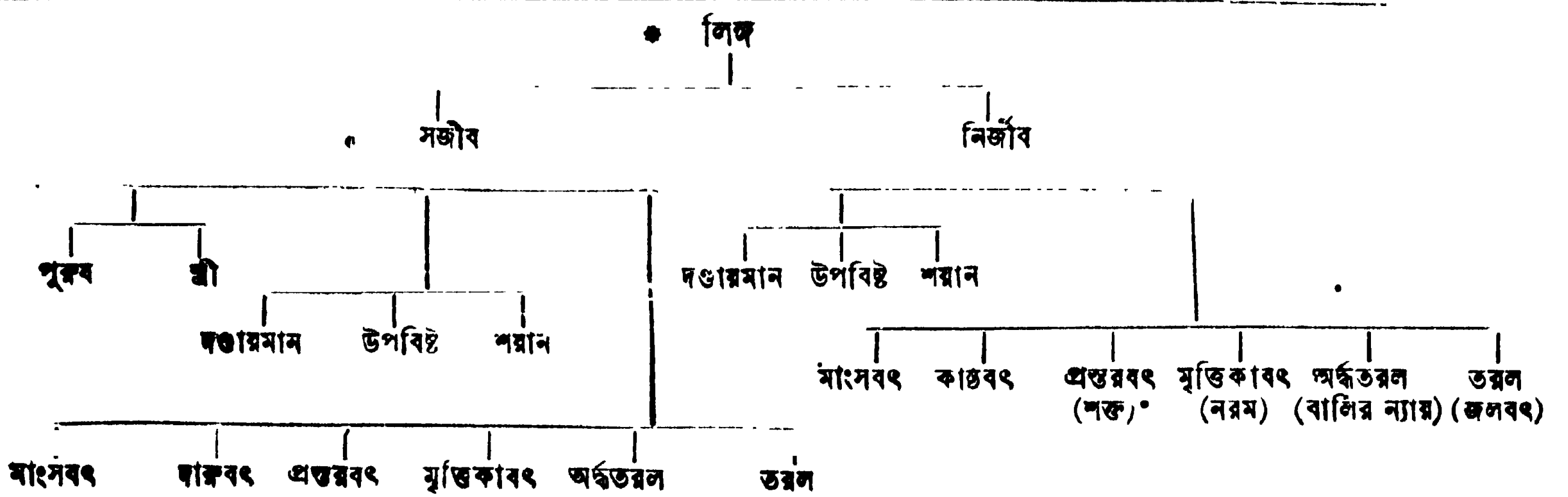
লিঙ্গরচনা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা কবি ছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী কোনও অংশে খর্ব্ব ত ছিলই না, অধিকন্তু তাঁহারা বিশ্লেষণ-প্রণালীর উচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়া অসার চিন্তা বর্জ্জন ও ভাষায় convention বা সাধারণ সম্মতির অতিরিক্ত সমাদর করিয়া ছিলেন। আমাদের দেশেই দ্রাবিড় জাতির লিঙ্গরচনায় আমরা অনুরূপ চিন্তাপ্রণালীর পরিচয় নাই। ইহারা সজীব-নির্জীবতা নির্দ্ধারণ না করিয়া লিঙ্গরচনা করেন না। যাহা নির্জীব, যাহার প্রাণ নাই, তাহার আবার লিঙ্গ থাকিবে কেন? আবার যাহাদের প্রাণ আছে তাহারাই যে লিঙ্গবান্ হইবে তাহাও নহে। প্রাণ যাহার আছে তাহার মধ্যে আবার চিন্তাশীলতার বিচার চাই। অর্থাৎ দ্রাবিড়ী ভাষায় লিঙ্গ-বত্তা অর্থাৎ পুং-স্ত্রীত্ব চিন্তাশীলতার ব্যঞ্জক। দ্রাবিড়গণ চিন্তাশীলতার সহিত লিঙ্গবাচনের সম্পর্ক করিয়া ভাষায় লিঙ্গের একটী বড় সুন্দর ব্যবহার করিয়াছেন। তাই আমাদের 'গৌরবে বহুবচনে'র ন্যায় ইহাদের লিঙ্গবত্তাও গৌরবের বাচক হইয়াছে। আমেরিকাবাসীর লিঙ্গ ব্যবহারের অষ্টাদশ বা বিংশতি ভেদ সত্ত্বেও ইহা হইতে ভাষার কোনও উপকার হয় নাই। ভাষা ইহার প্রভাবে আড়ষ্ট ও সঙ্কুচিত হইয়া ইহাদের মানসিক খর্ব্বতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতেছে।

আমেরিকাবাসীর ভাষায় সম্পর্ক-জ্ঞাপক সর্ব্বনামের অনেক কার্য্য। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের ভাষায় ক্রিয়ার প্রত্যয় বা তিঙ্ বিভক্তি দ্বারা যে-সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়, আমেরিকায় এই সম্পর্ক-জ্ঞাপক সর্ব্বনাম সেই-সকল কার্য্য করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া পুরুষ, বচন, লিঙ্গ এবং কর্ত্তৃ ও কর্ম্মপদ বুঝাইয়া দেওয়াও এই সম্পর্ক-সর্ব্বনামের কার্য্য। আমাদের ভাষায় প্রত্যয় আছে; সেই প্রত্যয় যেমন ক্রিয়ার সহিত কর্ত্তৃপদ, কর্ম্মপদ ও অন্যান্য কারকের সম্পর্ক বুঝাইয়া দেয়, ইহাদের ভাষায় প্রত্যয়ের অভাবে সেই-সমস্ত কার্য্যই এই সম্পর্ক-সর্ব্বনামকে করিতে হয়। যে-সকল ভাষায় এই সম্পর্ক-সর্ব্বনামের অভাব সে-সকল ভাষায় ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম বা personal pronoun বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, এবং সম্পর্ক-সর্ব্বনামের কার্য্য ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনামেই আংশিভাবে সম্পন্ন করে। অবশ্য আমাদের ভাষায় অন্বয় শব্দের যাহা অর্থ সে অর্থে অন্বয় ইহাদের ভাষায় নাই বলিলেই হয়। কারণ ক্রিয়াপদটীর সহিত নানা উপাদানের সংযোগে ইহারা যে বাক্য নির্ম্মাণ করে তাহাকে বাক্য বলাই যায় না, সমাস বলাও যায় না, কারণ সমাসে বিভক্তি বা প্রত্যয় থাকে না। সুতরাং এক ক্রিয়াপদের গঠনেই সমস্ত বাক্য গড়িয়া উঠে, তাই ইংরাজীতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "sentence-word", বা বাক্য-শব্দ। এরূপ ক্ষেত্রে অন্বয়ের স্থান না থাকিলেও সমাসকে ভাঙ্গিয়া যেমন ব্যাস-বাক্যে সমস্ত পদ সমূহের সম্পর্ক দেখান হয় এবং সম্পর্ক না বুঝিলে সমাসটীকে বুঝা যায় না, সেইরূপ ইহাদের বাক্যটীরও সম্পর্ক জ্ঞাপন আবশ্যক; নতুবা অর্থবোধ হইবে কেন? তাই ইহাদের ভাষায় সম্পর্ক-সর্ব্বনামের এত সমাদর। এ অবস্থায় স্বতঃই একটী প্রশ্ন হইতে পারে এই যে এক-মাত্র সম্পর্ক-সর্ব্বনামের দ্বারা কি প্রকারে এত প্রকার সম্পর্ক প্রকাশ পায়? সম্পর্ক-সর্ব্বনাম একটা জিনিস নহে—কতকগুলি উপাদানের সমবায়ে এই সম্পর্ক-সর্ব্বনাম গঠিত। সুতরাং ইহা অগঠিত সরল বস্তু নহে, ইহার জটিলতা আছে। ইহার উপাদান-সমূহের এক একটী অংশের দ্বারা এক একটী ভাব প্রকাশ পায়—একটী দ্বারা বহুভাব প্রকাশ হয় না, কোনও কোনও ভাষায় সম্পর্ক-সর্ব্বনামের উপাদান সমূহ ক্রিয়া মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয় না; ইহাদের সমবায় লইয়া একটী স্বাধীন সম্পর্ক-সর্ব্বনাম গড়িয়া তাহাই ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। তাহাতেই ক্রিয়ার অন্বয় বোধ হয়।

আমেরিকাবাসীর ভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার অতি জটিল। কারণ এক ক্রিয়াপদেই ইহাদের সমস্ত বাক্যটী আবদ্ধ থাকে বলিলেও চলে। ইহারই মধ্যে সম্পর্ক-সর্ব্বনাম সংযোজিত হইয়া কর্ত্তৃ ও কর্ম্মপদের অন্বয় প্রকাশ করে। এই প্রকারে ক্রিয়া, সর্ব্বনাম ও বিশেষণ এরূপভাবে মিলিত হইয়া পড়ে যে ইহাদের মধ্যে আর প্রভেদ-কল্পনা থাকেনা। আমাদের সভ্য ভাষা অপেক্ষা আমেরিকার ভাষায় ক্রিয়াপদের অনেক বেশী উপযোগিতা। এক

ক্রিয়াপদ দিয়াই ইহাদের বিশেষ্য বিশেষণ গড়িয়া উঠে। ইহাদের বিশেষণ পদ অকর্ম্মক ক্রিয়া স্থানীয়। ইংরাজীতে the man is good বাক্যটীতে যেমন একটী copula বা অন্বয়াত্মক ক্রিয়া আছে, আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় (লোকটা ভাল) সে প্রকার ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয় না। বিশেষণ পদটীর ব্যবহারে ক্রিয়া-গর্ভ অন্বয় ফুটিয়া উঠে। আমেরিকার ভাষায় এইটী ধাতু-মূলক ক্রিয়াপদ। 'that pe son is there' বাক্যটী বাঙ্গালায় হইবে 'ঐ লোকটা ওখানে আছে'। এখানে 'আছে' এই ক্রিয়াপদের ব্যবহার ক্রিয়া বিশেষণের সহিত হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকার ভাষার ক্রিয়া-বিশেষণটীও অকর্ম্মক ক্রিয়া। বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় ক্রিয়ার অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎভেদে এবং একবচন-দ্বিবচন-বহুবচন ভেদে বিভিন্ন রূপ বা conjugation হয়। বলা বাহুল্য এই সকল রূপ-বিভিন্নতা অন্বয় সর্ব্বনাম বা সম্পর্ক-সর্ব্বনাম দ্বারা প্রকাশ পায়। আবার ক্রিয়াপদও সময়ে সময়ে সম্পর্ক-সর্ব্বনামের যোগে ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়; এবং সময়ে সময়ে ক্রিয়ার মধ্যে ক্রিয়াবিশেষণ সংযোজিত থাকে। ফলে এই প্রকার অন্বয় আমাদের পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। বিশেষ্য পদও সময়ে সময়ে অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। আবার কর্ত্তৃপদ, গৌণ ও মুখ্য কর্ম্মপদ, বিশেষণ পদ এবং অন্বয়-বোধক পদ সমূহ অধিকাংশ সময়েই ক্রিয়াপদের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে। এই সকল কারণে আমেরিকার ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে মুখ্য ভাবে ইহার ক্রিয়ার ব্যবহার শিখিতে হয়।

আমাদের ক্রিয়া ও আমেরিকা-বাসীর ক্রিয়া-পদের আর একটী প্রধান প্রভেদ এই যে, ইহাদের ক্রিয়া-পদে অত্যন্ত ভাব-বাহুল্য বা extreme connotiveness of many qualities and characteristics পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং বিশেষ বিশেষ ভাব-প্রকাশের জন্য পৃথক পৃথক ক্রিয়ার ব্যবহার হয়। সাধারণ ভাব-প্রকাশক একটী ক্রিয়ার সহিত অন্যপদ জুড়িয়া বিশেষ বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি ইহাদের ভাষায় হয় না। ফলে 'বাড়ী যাওয়া', 'বাড়ী হইতে যাওয়া', 'গৃহ ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে যাওয়া,' 'গৃহ ভিন্ন অন্য কোনও স্থান হইতে যাওয়া,' 'এখান হইতে যাওয়া,' 'উপরে যাওয়া,' 'নীচে যাওয়া', 'চতুর্দ্দিকে যাওয়া', 'পাহাড়ে যাওয়া', 'উপত্যকায় যাওয়া', 'নদীতে যাওয়া', 'হাঁটিয়া যাওয়া', 'অশ্বারোহণপূর্ব্বক যাওয়া', 'ভেলায় চড়িয়া যাওয়া,' 'জলকে যাওয়া,' 'কাঠকে যাওয়া' প্রভৃতি সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ক্রিয়া। ইহাদের মধ্যে যে সাধারণ উপাদান 'যাওয়া' আছে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য কোনও ক্রিয়া ইহাদের ভাষায় নাই। এইরূপে এক 'ভাঙ্গা' (to break) ক্রিয়ার ভাব (নানা ভাবে 'ভাঙা' ও নানা উপায়ে 'ভাঙা') বহু ক্রিয়া দ্বারা প্রকাশ পায়। 'প্রহার করা' ইহারা বুঝে না। 'ঘুসি মারা', 'লাঠি-মারা,' 'চড়-চাপড় মারা,' চাবুক মারা,' 'কাঁচা বাঁশের কঞ্চি দিয়া মারা', 'চাপা মারা' ইত্যাদি নানা ভাবে নানা ক্রিয়া দ্বারা 'প্রহার করা'র ভাব প্রকাশ পায়। ক্রিয়ার সত্তা-সম্ভাবনা বিধি-নিষেধাদি প্রকাশের রীতিও (modes) অতি বিচিত্র। ইহাদের সত্তাব্যঞ্জক-রীতিতে (indicative mode) বক্তা 'নিশ্চিত সত্য' বলিয়া কোনও কিছু প্রকাশ করে। সন্দেহ-ব্যঞ্জকরীতিতে (dubitative mode) উক্তিতে সন্দেহের ভাব থাকে। কিম্বদন্তী রীতিতে (quotative mode) শুনা কথা প্রকাশ করা হয়। আদেশিনী রীতিতে (imperative mode) আদেশ প্রকাশ পায়। প্রার্থনা-রীতিতে (implorative mode) প্রার্থনা বা যাচ্ঞা প্রকাশ পায়। অনুমতি-রীতিতে (permissive mode) অনুমতি প্রকাশ পায়। নিষেধিনী-রীতিতে (Negative mode) নিষেধ প্রকাশ পায়। একত্রতা রীতিতে (Simulative mode) একসঙ্গে অনেক কার্য্য বা Simultaneous-action প্রকাশ পায়। ইচ্ছাব্যঞ্জক রীতিতে (desiderative mode) ইচ্ছা প্রকাশ পায়। বিধিব্যঞ্জক রীতিতে (obligative mode) কর্ত্তব্যতা প্রকাশ পায়। পৌনঃ-পুনিক রীতিতে (repetitive mode) ক্রিয়ার পৌনঃ-পুনিকতা বা repetition প্রকাশ পায়। কারণজ রীতিতে (causative mode) ক্রিয়ার কার্য্যমাণতা প্রকাশ পায়। এই প্রকার কত রীতি আছে। এই সকল রীতিও পৃথক পৃথক শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায়। ক্রিয়ার মধ্যে এই সকল শব্দ অন্তর্নিবিষ্ট হয়। ইহা ছাড়া ক্রিয়ার উদ্দেশ্য, সাধন, নিমিত্ততা, দিক্, প্রকার

(manner) ও অন্যান্য যাবতীয় ক্রিয়াবিশেষণের ভাব পৃথক পৃথক পদ-সন্নিবেশ দ্বারা অভিন্ন উপায়ে প্রকাশ পায়। এই সকল পরাধীন পদকে প্রত্যয়-স্থানীয় বলা যায়। অথচ প্রকৃত পক্ষে ইহাদের ভাষায় প্রত্যয় নাই, বিভক্তি নাই, পদবিভাগ বা classification of parts of speech নাই।

ক্রিয়াবিশেষণে, সম্ভাবনাদিরীতি এবং কাল প্রকাশ করিতে ক্রিয়ার সহিত পৃথক পৃথক পদ সংযোজিত থাকে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করা কঠিন। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনটা কাল স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সময়ে সময়ে অতি প্রাচীন কাল বা দূরবর্ত্তী যুগেরও ভাব প্রকাশ হয়। সচরাচর বর্ত্তমান-সামীপ্য-বাচক একটী ভবিষ্যৎকাল দেখা যায়। বর্ত্তমান ও অন্যান্য নানাবিধ সূক্ষ্ম ভেদ ইহাদের ভাষায় লক্ষিত হয়। ক্রিয়ার সহিত কালবাচক, রীতিবাচক ও ক্রিয়াবিশেষণ-বাচক পদ এরূপভাবে বিজড়িত থাকে যে, এই তিনের মধ্যে প্রভেদ কল্পনা অতি কঠিন। এই সমস্তকেই এক জটিল ক্রিয়াপদের অংশ বলা যায়। ক্রিয়ার বাচ্য প্রকাশ করিতেও এই প্রকার প্রত্যয়-স্থানীয় পদবিশেষের ব্যবহার হয়। ফলকথা এই সম্পর্ক জ্ঞাপক পদ ইহাদের ভাষায় ক্রিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক প্রকাশ করে। সুতরাং সম্পর্ক-সর্ব্বনামের ন্যায় ইহারও ভাষায় উপযোগিতা খুব বেশী।

ইহাদের ভাষায় কথার পর কথা জুড়িয়া জুড়িয়া বাক্য গঠন বা বাক্যশব্দ (sentence-word) নির্ম্মাণ হয় এবং ভালরূপ পদ-বিভাগ নাই বলিয়া এই সকল ভাষার নাম হইয়াছে সমগ্র-সঙ্কেতক (holophrastic), বহু-সংযোজী (poly-synthetic) বা সংযোজন-ধর্ম্মী (synthetic)। শেষের নামটী অর্থাৎ 'সংযোজন-ধর্ম্মী' এই আখ্যাই এই সকল ভাষায় বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু আধুনিক ইংরাজী ভাষাও অনেকটা সংযোজন-ধর্ম্মী। ইহাতেও প্রত্যয়াদির ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। ইংরাজী ভাষায় এক্ষণে sentence-word অনেক রচিত হইতেছে, যেমন know-not-what purpose,' 'yield-to-nobody principle,' 'divide-and-rule policy,' ইত্যাদি। কিন্তু আমেরিকার ভাষা ও ইংরাজী ভাষায় একটা মহান্ প্রভেদ আছে এই যে, ইংরাজী ভাষায় একটা গঠন-শৃঙ্খলা বা organisation আছে, যাহা আমেরিকার ভাষায় নাই। এই গঠন-শৃঙ্খলার ফলে ইংরাজী ভাষায় পদ-বিভাগ আছে। I love, love affairs, love's labour প্রভৃতি স্থলে একটা ক্রিয়াপদই ক্রিয়া, বিশেষণ ও বিশেষ্যের কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু এই গঠন-প্রণালীর এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে তাহার রচনা-কৌশলে পদবিভাগের ভাব ধারণাবদ্ধ হয়; মনে হয় প্রথমটী ক্রিয়াপদ, দ্বিতীয়টী বিশেষণ এবং তৃতীয়টী বিশেষ্য। ইহা না বুঝিলে অর্থগ্রহ হয় না। এই কারণে সংযোজন-ধর্ম্মিতা থাকিলেও ইংরাজী ভাষাকে প্রত্যয়-ধর্ম্মী (বা inflectional) ভাষা বলা হয়। বস্তুতঃ পক্ষে প্রত্যয়-ধর্ম্মী হইলেও ইংরাজী ভাষায় সংযোজন-ধর্ম্মিতা যথেষ্ট আছে। বঙ্গভাষার বিষয়েও একই কথা বলা যায়। তবে বঙ্গভাষা ইংরাজী অপেক্ষা অনেক অল্পমাত্রায় সংযোজন-ধর্ম্মী। সুতরাং আমেরিকার ভাষা সংযোজন-ধর্ম্মী বলিলে আমরা ইহা বুঝিব না যে ইহার গঠন-প্রণালী আমাদের ভাষার গঠন-প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে ইহা সত্য যে আমেরিকার ভাষা অতিরিক্ত মাত্রায় সংযোজন-শীল। সংযোজন-শীলতার পরিমাণে অনেক প্রভেদ আছে। সুতরাং প্রভেদটা প্রকৃতি-গত নহে, পরিমাণ-গত।

সভ্যজাতির ভাষায় মিতব্যয়িতা (economy) বা আরাম একটা প্রধান লক্ষণ। এই মিতব্যয়িতা বা আরাম দুই স্থানে লক্ষিত হইবে—(১) উচ্চারণ, (২) চিন্তা। আমেরিকার ভাষায় যে চিন্তাপ্রণালী অন্তর্নিবিষ্ট দেখা যায় তাহাতে মিতব্যয়িতা বা আরামের চেষ্টা মোটেই নাই। ইহাদের যত চেষ্টা, যত যত্ন, সমস্ত ন্যস্ত হইয়াছে বর্ণনার সমগ্রতার জন্য। যত অবান্তর কথা বলিতে হয় হউক, আপত্তি নাই; কিন্তু বর্ণনার সমগ্রতা ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। পরিশ্রম বা চিন্তার অপব্যয় ইহাদের পরিহার্য্য নহে;' পূর্ব্বোল্লিখিত 'ঝি-চরিত্র' লভ্য মানসিক প্রকৃতি ইহাদের জাতীয় মনের প্রকৃতি। "Brevity is the soul of wit" ইহাদের প্রাজ্ঞগণের প্রবচন নহে। কিন্তু এ-কথাটাও অবিমিশ্রভাবে ইহাদের ভাষায় প্রযোজ্য নহে। কারণ ভাষার ধর্ম্মই হইল মিতব্যয়িতার চেষ্টা। তবে সেই চেষ্টা আমেরিকার ভাষায়

অতি অল্প পরিমাণে দেখা যায়। সুতরাং এ প্রভেদটাও পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নহে। আমাদের ভাষাতেও চিন্তার অপচয় নানা স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। ইংরাজীতে 'if' থাকিলেই যখন subjunctive moodএর ভাব প্রকাশ পায়,—তখন subjunctive moodএ verbএর পৃথক conjugation এর আবশ্যক কি? সুতরাং 'if he were' হইবে, না 'if he was' হইবে, না 'if he be' হইবে, এ চিন্তা অতিরিক্ত চিন্তা; চিন্তার অপচয় মাত্র। ফলে ইংরাজী ভাষার subjunctive mood এর conjugation ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। তবে যেখানে অর্থের দিক দিয়া বিভিন্নতা আসিয়া জুটে, সেখানে রূপ-বিভিন্নতা পরিত্যক্ত না হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরাজী he, she ও it এর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালায় একমাত্র সর্ব্বনা ব্যবহৃত হয় 'সে' (বা 'তাহা' ও 'ইহা'—নপুংসকলিঙ্গে)। এ-ক্ষেত্রে বঙ্গভাষারই উৎকর্ষ দেখা যায়। কারণ বর্ণনার সময় পুনঃ পুনঃ 'সে' শব্দবাচ্য ব্যক্তির লিঙ্গ চিন্তা করা চিন্তার অপব্যয়। হাজার বারের মধ্যে একবার মাত্র একটি বিশেষণ দ্বারা ঐ ব্যক্তির লিঙ্গ সূচিত করিলে অবশিষ্ট নয় শত নিরনব্বই বারের ব্যবহারে ইহার পুনরুল্লেখ আবশ্যক হয় না। এইরূপে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে আমাদের ভাষাতেও চিন্তা ও উচ্চারণের অপচয়ের উদাহরণ আছে। তবে আমেরিকা-বাসীর ভাষার ন্যায় অত বেশী নহে।

ইংরাজী ভাষার বিন্যাস প্রণালী বা syntaxএ যেমন স্থানের মূল্য আছে, ইহাদের ভাষায়ও সেই প্রকার পদের অবস্থানের মূল্য আছে। ইংরাজীতে 'A man killed a tiger' না বলিয়া 'A tiger killed a man' বলিলে যেমন বিপরীত ভাবের প্রতীতি হয়, আমেরিকা বাসীর ভাষায়ও সেইরূপ অবস্থানের পরিবর্ত্তন অনুসারে ভাব প্রকাশেরও ব্যতিক্রম হয়।' ইংরাজী অপেক্ষা আমেরিকার ভাষায় পদের অবস্থানের উপযোগিতাও অপেক্ষাকৃত অধিক।

ইহাদের ভাষায় ভাব প্রকাশের আর একটি প্রধান উপাদান সুর বা accent. ইংরাজী বা বাঙ্গলা ভাষায় জিজ্ঞাসা-বাচক বাক্যে এক প্রকার উচ্চারণ-ভঙ্গী বা সুর ব্যবহৃত হয়। এই সুর দ্বারাই জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ পায়। ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা-বাচক বাক্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট রচনা প্রণালী অবলম্বন না করিলেও কেবলমাত্র এই সুর দ্বারা জিজ্ঞাসা-প্রতীতি হয়। যেমন "You have applied for the situation?" এই বাক্যটী জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে উচ্চারিত হইলেই জিজ্ঞাসার ভাব প্রকাশ করে। সুতরাং এই সুর আমাদের ভাষায় ভাব প্রকাশের একটি অপরিত্যাজ্য উপায়। বিস্ময়াদি নানা ভাব প্রকাশ করিতে আমরা এই সুর নানা ভাবে ব্যবহার করি। চীন দেশের ভাষায় আট প্রকারের সুরের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার এই সুর বা tone বহুবিধ ভাবে বহুবিধ ভাব প্রকাশ করে। ইহাদের ভাষায় আমাদের বেদের ভাষারও ন্যায় ত্রিবিধ সুর আছে।

আমেরিকায় যেমন অসংখ্য আদিম জাতির বাস, তেমনি ইহাদের ভাষাও অসংখ্য। যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাদের ভাষার সংখ্যা চারি ও পাঁচ শতের মধ্যে। সকল ভাষার প্রকৃতিই প্রায় একরূপ। অবশ্য সামান্য সামান্য প্রভেদও কম নহে। অসংখ্য জাতি একত্রে বাস করিলে এবং তাহাদের ভাষা বিভিন্ন হইলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাব প্রকাশের একটী উপায় সঙ্কেত। আমেরিকাবাসীদিগের মধ্যে এই কারণে নানাবিধ সঙ্কেতের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। সঙ্কেত দ্বারা ইহারা অনেক কথা বলিতে পারে। না শিখিলে সে সকল সঙ্কেত সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় না।

ইহাদের মধ্যে যে সকল জাতি কিছু সভ্য, তাহাদের সাহিত্য আছে। এই সাহিত্য সাধারণতঃ চিত্র-লিপিতে লেখা। ডাকোটা ও মায়া জাতির চিত্র-লিপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মায়া জাতি গণিত বিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী। ইহারা নানারূপ চিত্র-লিপি দ্বারা সংখ্যা ও মাসের নাম লিখে। উনিশদিনের তের মাসে ইহাদের বৎসর। মাস ও দিন এরূপ জটিলভাবে গণিত হয় যে, মাসের নামকরণ আবশ্যক হয় নাই। কেবল দিনের সংখ্যা জুড়িয়া দিন গণনা করিয়া যাওয়া হয়। ফলে অভিন্ন সংখ্যার সহিত অভিন্নদিনের নাম বৎসরান্তে আইসে।*

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

* মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য লিখিত প্রবন্ধ।

সিঁদুরের টিপ

চত্রকব মোলারাম

প্রত্যাবর্ত্তন

(উপন্যাস)

গত বর্ষে প্রকাশিত অংশের চুম্বক

[ছাব্বিশ বৎসর বয়সে গোপাল-মন্দিরের সেবায়েৎ গৌরীপতি মৃতা পত্নী দুর্গা দেবীকে শ্মশানে দাহ করিয়া আসিয়া ছেলে গোপালকে মাতা সর্ব্বমঙ্গলার হাতে সঁপিয়া দিলেন। রাত্রে গোপাল বাপের কাছে শুইয়াছিল। হঠাৎ গভীর রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির ঘনঘটায় গৌরীপতি ঘুম ভাঙ্গিয়া গোপালকে আর খুঁজিয়া পাইলেন না। সারা গ্রাম, পথ-ঘাট শ্মশান সব ঘুরিয়া দেখিলেন, গোপাল কোথাও নাই! তিনি শূন্যচিত্তে বাড়ী ফিরিলেন।

ওদিকে জমিদার ইন্দ্রনাথ কংগ্রেসের পর নৌকায় বাড়ী ফিরিতে ছিলেন; পথে ঝড়-বৃষ্টির জন্য একজায়গায় নৌকা বাঁধিয়া ছিলেন, ঝড়ের পরদিন সকালে উঠিয়া নদীর তীরে জলমগ্ন একটি বালককে কুড়াইয়া তাহাকে ঘরে আনিলেন। ইন্দ্রনাথ বিবাহ করে নাই—ঘরে বিধবা মা কাত্যায়নী দেবী তার জন্য বারবার সাধিয়াও ছেলেকে বিবাহে রাজী করাইতে পারেন নাই। ইন্দ্রনাথ ছেলেটিকে নিজের কাছে রাখিলেন; নিজের ছেলের মতই মানুষ করিতে লাগিলেন,—ছেলের নাম রাখিলেন, অরুণ। সকলে ভাবিল, ছেলেটিকে ইন্দ্রনাথ বুঝি পোষ্যপুত্র লইবেন। ইন্দ্রনাথ তাহা করিলেন না, তবে অরুণের আদর ছেলের চেয়ে কম ছিল না। এমনিভাবে কিছুদিন কাটিলে ইন্দ্রনাথের মৃত্যু হইল। ইন্দ্রনাথের জ্ঞাতিভ্রাতা আলোকনাথ আসিয়া তখন বিষয়-সম্পত্তি দখল করিয়া বসিল। কাত্যায়নী দেবীও পুত্রশোক সহিতে না পারিয়া মরিয়া বাঁচিলেন। বেচারা অরুণের লেখাপড়ায় বেশ মন ছিল। আলোকনাথ অরুণকে দূরে সরাইলেন। সুদূর পল্লীগ্রামে মুক্তাঠাকুররাণী নামে তাঁহার এক আত্মীয়া ছিল। অরুণ সেখানে থাকিয়া আলোকনাথের অর্থে লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। নিঃসঙ্গ গৃহে বইগুলাকে নাড়িয়া অরুণের দিন কাটিতেছিল,—হঠাৎ এমন সময় মুক্তা ঠাকুরাণীর বিধবা ভাগিনেয়ী রাণী নিজের আইবুড়ো মেয়ে হিমানীকে লইয়া সেই গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। হিমানী অরুণের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিল, অরুণ তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিল। হিমানী মেয়েটি বুদ্ধিমতী; সে পড়া-শুনায় বেশ অগ্রসর হইতে লাগিল। তারপর একদিন পনেরো টাকা বৃত্তি পাইয়া অরুণ গ্রাম্য স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে গেল। সেখানে তাহার বন্ধু জুটিল জলদকান্তি, ও প্রফুল্ল। জলদ তাহার পিশে মহাশয়ের নাতি প্রদ্যুম্ন ও নাতনি বরুণাকে পড়াইবার জন্য অরুণকে তাহাদের টিউটর নিযুক্ত করিয়া দিল। ইহাতে অরুণের পয়সার কষ্ট কতক ঘুচিল এবং সে ছাত্রদের বাড়ীতে নিজের গুণে সকলের আদরের ও স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিল। হিমানী ওদিকে অরুণের অভাব খুবই অনুভব করিতেছিল।

ক্রমে হিমানীর বয়স তেরো হইল—আর বিবাহ না দিলে নয়, নহিলে পল্লীর ঘরে ঘরে নিন্দা! কাজেই মুক্তাঠাকুরাণী ধরিয়া-করিয়া আলোকনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে কোন মতে যদি তার বিবাহ দেওয়াইতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে রথের সময় আলোকনাথের বাড়ীতে হিমুকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। আলোকনাথ অপুত্রক, তাহার স্ত্রী হেমলতা চিররুগ্না—তবু স্বামী-স্ত্রীতে প্রণয়ের কমতি ছিল না। আলোকনাথের ভাইপোটি হেমলতার বড় আদরের ছিল। সে প্রফুল্ল। প্রফুল্ল একবগগা ধরণের ছেলে, কলেজের ফার্ষ্ট বয়, পিঠে স্বদেশী কাপড়ের মোট বহিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া বিক্রয় করে। হিমুকে দেখিয়া হেমলতার খুবই পছন্দ হইল—সে ভাবিল, প্রফুল্লর সঙ্গে হিমুর বিবাহ দিলে বেশ হয়। সে সাধে বাদ পড়িল। সহসা এক বিপদ বাধিল। আলোকনাথ হিমুকে দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল, তাহাকে বিবাহ করিবে। মাও পুত্রের মতে সায় দিলেন। কথাটা সকলের কাণে গেল। শুনিয়া হিমু বিরক্ত ও হেমলতা ক্ষুণ্ণ হইল। এমন সময় প্রফুল্ল বাড়ী আসিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিল।

ওদিকে অরুণের বন্ধু জলদ ডেপুটি হইয়া চট্টগ্রামে আসিল। স্ত্রী সঙ্গে আসে নাই। নিঃসঙ্গ অবসর কাটাইবার জন্য সেখানকার সিনিয়র ডেপুটি মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী এমনি আসর জাঁকাইয়া বসিল যে স্ত্রীর কথা সে ভুলিয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু আবার তাহার বন্ধু অমূল্যর বাপ। অমূল্যর কিশোরী কুমারী ভগ্নী কিরণের সঙ্গে জলদের হাসি-গল্প করায় এমনি ঝোঁক চাপিল যে স্ত্রী আসিলেও কাছারির ছুটির পর বাড়ী আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া সে কিরণদের বাড়ী ছুটিত। জলদের স্ত্রী সুনীতি স্বামীর এ-ভাবে প্রথমটা বিস্মিত হইল, পরে ক্ষুণ্ণ হইল এবং শেষে জীবনে হতাশ হইয়া ভাবিল, প্রেমহীন স্বামীর সহিত দাম্পত্য জীবন বহন করা, এ যে বড় কঠিন! অথচ স্বামীর সান্নিধ্য ছাড়িয়া আর কোথাও যে চলিয়া যাইবে, এমন সামর্থ্যও তাহার ছিল না।]

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

ননদ-ভাজ

"বৌ, একটা কথা বল্‌বি ভাই? সত্যি কিন্তু?"

"কি ভাই ঠাকুরঝি, কি কথা? বল্ না?"

সুনীতি খাটের বিছানার চাদর তুলিয়া ঝাড়িয়া পুনরায় তাহা বিছাইতেছিল। শৈলাঙ্গিনী মেঝেয় বসিয়া সুপারি

কাটিতেছিল। জলদ জল খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যার পরে ফিরিবে। মা ওদিকে রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া চাকরের কাছে বাজারের হিসাব লইতেছেন। ছোট খোকা দোলায় ঘুমাইতেছে। বড় খোকা একটা লম্বা কাপড়ের পাড় নিজের দুই বগলের নীচে দিয়া চালাইয়া ঘোড়া হইয়া ছোকরা চাকর রামগোলামের হাতে দাড় তুলিয়া দিয়া ছুটাছুটি খেলিতেছিল। শৈল বলিল, "তুই অমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিস কেন, বল্ দেখি? শরীরে ত কোন রোগ দেখ্‌চি না, তবে দশা কেন অমন হচ্চে দিন দিন?"

সুনীতি পাতা চাদরখানি হাত দিয়া জোরে জোরে ঝাড়িয়া কহিল, "খেতে দিস্‌নে, বোধ হয়। নৈলে শরীরে যখন রোগ নেই, তখন সুধু-সুধু রোগা হতেই বা গেলুম কেন?"

"দূর পোড়ারমুখী—মা শুন্‌লে ভাববে, সত্যিই বা। আচ্ছা, খেতেই না হয় দিইনা। ধোপা-নাপিতও কি আমি বন্ধ করে দিয়েচি? দু ঘণ্টা চুল বাঁধা, তিন ঘণ্টা সাবান মাখা, সেগুলোও কি আমার হুকুমে বন্ধ না কি?"

"ভেবে দেখা গেল, অনর্থক বাজে খরচে সময় বা পয়সা নষ্ট কর্‌বার দিন আর নেই। তাই ওগুলো ছেড়ে দেওয়া গেছে।" বলিয়া সুনীতি ননদের দিকে পিছন করিয়া বিছানায় বালিশ সাজাইতে লাগিল। সমবেদনার এতটুকু স্পর্শেই চোখে তাহার জল ভরিয়া আসিয়াছিল। ঠাকুরঝি ভালবাসে, তাই এ সব তার চোখে পড়ে। কিন্তু স্বামীর এ সব আর চোখেও পড়ে না! আগে একদিন ময়লা কাপড় পরিলে কত হাঙ্গামই না করিতেন! অতীত সুখের স্মৃতি এখন অন্তরকে মন্থন করিয়া কেবল বেদনাই জাগায়, আনন্দ দিতে পারে না।

শৈল বলিল, "আর ঘর-ভরা প্রাণখোলা সে হাসি—যাকে শাসন দিয়ে কখনো বাঁধ্‌তে পারা যায়নি?"

সুনীতি কথা কহিল না। কথা কহিবে কি? তাহার চোখের জল যে এবার চোখ ছাপাইয়া গাল বহিয়া ঝরিতে সুরু করিয়াছিল। এই অতি-অবাধ্য পানুশে চোখ দুইটাই হইয়াছে তাহার সকল অসম্ভ্রমের মূল। ইহারা স্থান-কাল কিছুই বুঝিতে চায় না; যেখানে-সেখানে আত্ম-প্রকাশ করিয়া বসে। শৈল নীরবে উঠিয়া আসিয়া সুনীতির মুখখানা ধরিয়া ফিরাইল। তার পর গভীর স্নেহে সেই মুখখানা বুকে চাপিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "এ কি তোর সখের কান্না নয়, বৌ? সাধ করে কেন এ দুঃখ পাস ভাই?"

ননদের বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া সুনীতি যেন তাহার প্রাণের কান্না আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। বুকের দারুণ বোঝা নামাইবার জন্য সে যে এমনি একটা সহানুভূতির আশ্রয়ই খুঁজিতেছিল। এত দুঃখ কি আর একা একা চাপিয়া গুমরিয়া সহা যায়? তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছে। চোখের জল দাহ হইয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। এ দুঃখ যে সহিতে পারা যায় না। প্রকাশ করারও নয়—বিশেষতঃ নারী হইয়া নারীর কাছে নিজের সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার সংবাদ জানানো—এ লজ্জার আর সীমা নাই! তবু চিরদিনের বন্ধু এই ননন্দার নিকট মনের ব্যথা প্রকাশ করিয়া আজ যেন মন তাহার অনেকখানি হাল্‌কা হইয়া গেল। বিয়ের কনেটি হইয়া যখন নব বধূ সে এ বাড়ীতে প্রথম আসিয়াছিল, তখন হইতে দু-এক বছরের বয়সে বড় এই ননদটিই ছিল তাহার খেলার সাথী, কর্ম্মের সঙ্গিনী! ভাব-আড়ির ছড়াছড়ির মধ্য দিয়া দুজনেই দুজনকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর ভালবাসার দিনেও ইহার সাহায্য নহিলে তাহার চিঠি লেখা হইত না, স্বামীর ভালবাসার সব কথা না জানাইয়া তৃপ্তি হইত না। স্বামী কলিকাতায় পড়িতে গেলে দুই সখীতে এক-বিছানায় গলাগলি করিয়া শুইয়া কত সুখের কথায় রাত কাটাইয়া প্রভাতের সূচনায় লজ্জার হাসি হাসিয়াছে; গল্পে মাতিয়া কখন যে রাত কাটিয়া গিয়াছে, তাহা তাহারা জানিতেও পারে নাই! তারপর শৈলর বিবাহ হইল। সে শ্বশুর বাড়ী গেলে তাহার বিচ্ছেদ-ব্যথা যেমন করিয়া সে অনুভব করিয়াছিল, এমন বোধ হয় আর কেহই করে নাই। শৈলও মন খুলিয়া তাহার মনের সব কথা সখীর কাছে জানাইয়া সুখী হইত, শৈলর স্বামী অভয়াপ্রসাদ বলিতেন, "শৈল, তুমি আমার চেয়ে সুনীতিকে বেশী ভালবাস।" শৈল হাসিত আর বলিত, "ওটা যে ছেলেবেলার বদ্ অভ্যাস। ওটা এম্‌নি দস্যি যে ওকে ভাল না বাসিয়ে ছাড়েনা। তাইতো তোমার

ভয়ে ভয়ে চোখে চোখে রাখি, পাছে আবার আমার দশায় পড়ে যাও! দেখচ না কেমন ডাকিনী! দাদাকে কি-রকম ওঠ্-বোস করাচ্ছে!" এখন তাহারা ছেলে-পুলের মা। তাই পদবী-অনুসারে গম্ভীর হইয়াছে। এখন আর কথায় কথায় কলহ ও সন্ধি হয় না। তবু তাদের মনের টান তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। বরং সময়ের জ্বালে প্রেমের দুগ্ধ মরিয়া গাঢ় হইয়াছে।

শৈলর সমবেদনায় সুনীতির মনের ব্যথা গলিয়া জল হইয়া দুই চোখে ঝরিতে লাগিল। উত্তর দিবার তাহার আছেই বা কি? শৈলও যেমন পাগল! কোন মেয়ে কখনো সাধ করিয়া এমন দুঃখ নাকি আবার স্বেচ্ছায় ভোগ করিতে চায়! তাহার কপাল মন্দ, তাই সে এত দুঃখ পাইতেছে। অদৃষ্টের সহিত ত আর কোঁদল চলে না।

শৈল কিন্তু এ যুক্তি মানিতে চাহিল না। কহিল, অদৃষ্টের সহিত কলহ না চলিতে পারে,—স্বামীর সহিত ত চলে, তাঁহাকেই কেন স্পষ্ট করিয়া বল না, এ-সব খেয়ালের খেলা আমি পছন্দ করি না—সুতরাং ছাড়িয়া দাও।

সুনীতির মুখখানা লজ্জাজড়িত হাস্যে রঞ্জিত হইল। সে কহিল, "যদি বলেন, অন্যায়টা কি করছি, দেখিয়ে দাও? তুমি পছন্দ না করলেও আমি করছি যে,—তখন মানটা থাক্‌বে কোথায়?"

শৈল কহিল, "পোড়ারমুখী, মান নিয়ে কি ধুয়ে খাবি? না হয় অপমানই হলি। স্বামীর কাছে আবার মান-অপমান কিরে? বলে ত ছাখ্ আগে।"

সুনীতি কহিল, "মরণ! এ সব নোংরা কথা কখনো বলা যায়? সত্যিই ত আমি তাঁর মনের কথা জানি না। যদি বলেন, তাকে আমি বোনের মতন ভালবাসি, তোমার মন অশুদ্ধ, তাই তুমি সাদাকে কালো দেখ্চ?"

"ইস্ লো! বোনের মত ভাল বাসেন! তাই একটা সন্ধ্যে বাড়ীতে থাকতে অত সাধলুম, তা সময় হলো না! বলে, শশা খেয়ে যেমন জলকে টান! তেমনি ভায়ের বোনকে টান। অত পোষাকের ছটা, এসেন্সের ঘটা, চুল আঁচড়াবার কায়দা, বোনের মন ভুলুতে ত দরকার হয় না, ভাই।"

"তোর আপ্‌শোষ হচ্ছে, না ভাই ঠাকুরঝি, ওগুলো যদি তার জন্যে না হয়ে তোর জন্যে হতো! না?"

শৈল এ বিদ্রূপ গায়ে মাখিল না, কহিল, "তাতে ক্ষতি কি হতো ভাই? আমিও ভায়ের রাজবেশ দেখে চোখ জুড়ুতুম, তোরও বুকের দুড়দুড়ুনি ঘটত না। যাক্—ও সব বাজে কথা—না সত্যি, একদিন বারণ করেই দেখ্ না, কি বলেন?"

"করেছিলুম। বল্লেন, সারাদিন খেটেখুটে এসে ছেলেদের কান্না আর বাড়ীর গোলমাল ভাল লাগে না, একটু বেড়াতে যাই। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে একটু গল্প করি, এতে রাগ হয় তোমার?"

"কিন্তু ঐ একটিমাত্র শান্তি-মন্দির ছাড়া কি সহরে আর বেড়াবার জায়গা নেই? ও বাড়ীতে ত একটি পাল ছেলে-মেয়ে, নির্জ্জনতার আবাস বটে! মহেন্দ্রবাবুর বড় মেয়ে হিরণ এসেচে। তাঁরও গুটি তিন-চার ছেলে-মেয়ে দেখলুম। এ মেয়েটি কিন্তু ভাই, বেশ গেরস্তালী ধরণের, নভেলিয়ানা ভাব নেই এর। আজ নদীতে চান কত্তে গিয়ে দেখা হোল। একদিন আস্‌বে বলেচে। আচ্ছা বৌ, মেয়েটা কি দাদাকে সত্যিই ভাল্‌বেসেচে না কি?" শৈলজা সুনীতির পানে চাহিয়া একটু ক্ষোভের হাসি হাসিল।

সুনীতি কহিল, "নব-অনুরাগের কি কি লক্ষণ ভাই ঠাকুরঝি, সে ত আমার চেয়ে তুমি আরও ভালই জান! আমাদের বোন কবে সেই সত্য যুগে মান্ধাতার আমলে বিয়ে হয়েছিল, জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখ্‌চি বোন যে আদিকাল থেকে এই চেনা মানুষটিকেই ভাল বাস্‌চি। এতে না ছিল পূর্ব্বরাগ, না ছিল প্রেমের নেশা। হৃদয়-সরোবরে প্রেম-শতদল কখন যে তার সহস্র দল মেলেছিল—তার সাল-তারিখ্‌টাও জানা যায় নি। তোদের বরং দেখা-শোনার বিয়ে—ঠাকুর জামাই পছন্দ করে বিয়ে করেচেন, তোরও দেখে যাবার পর পূর্ব্বরাগের অবকাশ মিলেছিল—তুই বরং এ-সব তত্ত্বে পাকা।"

"ও হরি! তাই এত গলদ? তোদের বিয়ে তা'হলে বিয়েই নয়, বল্? দাদার ত যা হোক্ সাধ মিটল। পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, 'সএব যমুনা-তীরঃ সএব মলয়ানিলঃ,' অনুরাগিণী

শ্রীরাধাও পথ চেয়ে প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু তোর জন্মটা যে মিথ্যে হয়ে গেল বৌ, তার কি করা যায়, বল্‌ দেখি—?” বলিয়া শৈল দুষ্টামির হাসি হাসিল।

সুনীতি ননন্দার গাল টিপিয়া দিয়া হাসিয়া কহিল, “আমি তরু-অরুর মা। আমার জন্ম আগেই সার্থক হয়ে গেছে।”

“বৌ, আমি এম্‌নি কথাই তোর মুখে শুন্‌তে চাই ছিলুম। সত্যিই ত! স্বামীর ভালবাসার যদি কিছু অভাবই পড়ে থাকে, তাতে কাতর হব কেন? পুরুষের কত কাজ,—কত রকম সঙ্গ, একভাবে তারা কি চিরকালই আমাদের মত জীবন কাটাতে পারে? কিন্তু আমরা যে মায়ের জাত! আমাদের প্রেম ত সঙ্কীর্ণতায় বদ্ধ রাখবার জিনিষ নয়। স্বামীর প্রেমের অংশ নিয়েই যে সন্তান-বাৎসল্য আমাদের বুকের সুধায় জন্মেচে। এ প্রেমের মূল্য নেই, কাড়াকাড়ি নেই—যত পার বিলোও। দানে এর ক্ষয় নেই। এমন বিশ্ব-ভরা আনন্দ যখন আমাদের হাতে, তখন মিথ্যের পিছনে কেন আর ছুটোছুটি! স্বামীর ভালবাসার অভাব সকল নারীর মনেই অল্প-বিস্তর থাকে। তবে কারো বেশী, কারো কম, এই যা। কেউ ভাবে, তার প্রিয় ভালবাসে না, বা ভালবাসা, তা অপাত্রে ব্যয় করে। কেউ ভাবে, ভালবাসতে জানে না! ফলে ঐ একই অবস্থা। অভাবের ভাব সবার মনেই জেগে থাকে। কেউ খুলে বলে, কেউ চাপা। আমরাও যদি গোড়া থেকে বুঝে-সুঝে ভালবাসতে শিখতুম্‌, তা'হলে এমন করে দেউলে হতুম না!” সুনীতিকে বাহু-বেষ্টনে জড়াইয়া হাত ধরিয়া পুনরায় সে কহিল, “তার চেয়ে আয় ভাই, এবার এমন কাউকে ভালবাসি, যাঁর ভালবাসায় সন্দেহ করে কাঁদতে হবে না, প্রতারিত হবার ভয় থাক্‌বে না, হিংসা, ক্রোধ, অভিমান আস্‌বে না,—শুধু আনন্দ আর শান্তিই ভোগ করা যাবে। যাঁর ভালবাসা যৌবন-বার্দ্ধক্যের খোঁজ রাখে না, রূপের মোহে ছলাকলায় ভোলে না, মনের ভিতরের লুকোন মনকেও খুঁজে বার করে। যে প্রেম ক্ষমা কর্‌বার জন্যেই ব্যাকুল হয়ে থাকে, সেই প্রাণের প্রাণকে প্রাণ ভরে ভালবাস্‌ ভাই। ভালবাসাও ধন্য হবে— মনের অভাবও সব মিটবে। অমৃতের অধিকারী আমরা— আমরা ত দুঃখী নই। অতিথশালার কাজ বজায় রেখে শুধু কর্ত্তব্য করে যাবে। এখানকার সরা-বাটীতে লোভ করিস্‌ নে—সে যে আবার দুদিন পরেই ফেলে যেতে হবে। বোঁচ্‌কা বয়ে ত আর সঙ্গে নিতে পার্‌ব না।”

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লর পণ

হিমুর সহিত শত্রুতা সাধিয়াই যেন রথের দিনটি আর নিকটবর্ত্তী হইতে চাহিতেছিল না। দিদিমার ধনুক-ভাঙ্গা পণ। তিনি রথ না দেখিয়া কিছুতেই বাড়ী ফিরিবেন না। অথচ হিমুর দিনগুলা যে কেমন করিয়া কাটিতেছে, সে খবর লইতে তাঁহার অবকাশই হইত না। একটিমাত্র সঙ্গী নাই। দু দণ্ড কথা বলিয়া মনের বোঝা নামাইবে, এমন একটি মানুষ নাই! ছুটিয়া বেড়াইবারও স্থানের অভাব। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত সে যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। এই কয়দিনের মধ্যেই এখানকার এত বড় বাড়াখানা তাহার চোখে ক্ষুদ্র কারাগারে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার পৃথিবীর বর্ণও যেন কেমন ধূম্র-মলিন হইয়া গিয়াছে। দিদিমা নাচে গৃহিণীর মহলে থাকেন। সেখানে গেলেই দাসী-মহলে আশ্রিতা প্রসাদাকাঙ্ক্ষিণীর দলে ‘আহা’ ‘উহু’ সহযোগে কতই না আদর-আপ্যায়ন চলিতে থাকে। গৃহিণী মুখে স্পষ্ট করিয়া কিছু না বলিলেও চোখে যে স্নেহ ভরিয়া চাহিয়া দেখেন—এখন হিমুর তাহাতেও সন্দেহ জাগে। এ-সব আদর-আপ্যায়ন তাহার সহ্য হয় না। সে বিরক্ত চিত্তে রাত্রে ঘুমাইবার সময়টি ছাড়া দিদিমার সঙ্গও ত্যাগ করিল। বাগানে সকালে-বিকালে আলোকনাথ বেড়াইতে যায়, তাই সে আর বাগানে যায় না। হেমলতার কাছে যাইবার জন্য তাহার ব্যাকুল মন অনেক সময়ই ছুটিতে চায়, কিন্তু কতক লজ্জায়, কতক ভয়ে সাহস করিয়া সে যাইতে পারে না। অনিচ্ছাতেও সে যে তাঁহার নিকট অপরাধিনী! আর এ কথা এ-বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি যে বুঝিতে পারিলেন না! তিনিও হয় ত ভাবিয়া রাখিয়াছেন, গহনা-কাপড়ের লোভে হিমু তাঁহার বুড়া স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়াছে! তা যা খুসী, তিনি ভাবুন!

যতক্ষণ না সে বাড়ীর বাহির হইতে পারে, অনেকেই অনেক কথা ভাবিবে। তারপর—সে যখন সকলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া এ বাড়ী ছাড়িয়া মার কাছে ফিরিয়া যাইবে, তখন সবাই বুঝিবে, হিমুকে বিবাহ করা কেমন সহজ! আর হেমলতাদিও তখন নিশ্চয় নিজের ভুল বুঝিয়া হিমুর জন্য কাঁদিতে বসিবে। এই সকল জটিল সমস্যায় বিব্রত হইয়াই সে লাইব্রেরী-ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে আত্ম-গোপন করিয়াছিল। এখানে তাহার জন্য আশ্রয় ও আনন্দ দুইটাই প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। লোক-সঙ্গের অভাব সে পুস্তক-পাঠের আনন্দে ভুলিয়াছিল। এখন ভাবনা হইত, এত বইয়ের মধ্যে কয়খানিই বা সে পড়িয়া লইবার অবসর পাইবে! এমনও তাহার মনে হইত যে বুড়া কর্ত্তার মতিচ্ছন্ন না হইলে সে বাছা-বাছা খানকতক বই তাঁহাকে বলিয়া সঙ্গে লইত, আবার পড়া শেষ হইলে কাহাকেও দিয়া ফিরাইয়া আনিবার কথা বলিয়া যাইত।

আজ লাইব্রেরীর এ নিরাপদ আশ্রয়টুকুও যখন তাহার ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দারুণ শূন্যতায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। সে শুনিয়াছিল, এই লাইব্রেরী-কক্ষে ঐ একটিমাত্র মানুষেরই পূর্ণ অধিকার! এখানকার সহিত আর কাহারও কোন সহানুভূতি বা সংস্রব নাই। এ কয়দিন সে অনধিকারে যাহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার আগমনমাত্রেই সেখান হইতে তাহার নির্ব্বাসন হইয়া গেল। তাই দণ্ডদাতাকে সে এ বাড়ীর অন্য কাহারও চেয়ে অধিক-তর অপ্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিল না। পাছে দৈবাৎ সেই অপ্রীত লোকটিরই চোখে পড়িয়া যায়, এই ভয়ে সে যখন হেমলতার কক্ষে বা অন্য কোথাও থাকিত, সে সময়ও সে সাহস করিয়া পুস্তকাগারে যাইতে পারিত না। অথচ তাহার আনন্দ-রস-লুব্ধ মনটি সেই সব ঝক্ঝকে বাঁধানো, সুবর্ণ অক্ষরে নামাঙ্কিত, রাশি রাশি ইংরাজী ও বাংলা বইয়ে-ভরা কাঁচের বড় বড় আলমারীগুলির সাম্‌নেই ঘুরিয়া বেড়াইত।

কাঁচের সার্শির ভিতর দিয়া বিকাল বেলার রোদ খানিকটা ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের নীল আকাশ খোলা দরজা দিয়া চোখে পড়িতেছিল। পাখীর ঝাঁক উড়িয়া চলিয়াছে। একটা চিল উড়িতে উড়িতে আসিয়া সাম্‌নের গেটের মাথায় বিশ্রাম লইতে বসিল। ঠিক যেন ধাতু-গঠিতের মতই সে স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। খাটের বিছানায় শুইয়া হেমলতা এই দৃশ্যগুলিই চোখ দিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। কার্য্যহীন রোগ-যন্ত্রণা-কাতর শরীরে মনের অস্বাচ্ছন্দ্য তাহাকে ক্রমেই অধিক পীড়িত করিতেছিল। একঘেয়ে রোগের দীর্ঘ সেবায় বাড়ীর লোকও ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী দিনান্তে একবার কাছে আসিয়া বসিতেন, কুশল প্রশ্ন করিতেন—তিনিও আজ কদিন আর আসেন নাই। আর যে কারণে আসেন নাই, সেটা এমনি দাম্পত্য প্রেমের অন্তরায়, যে হেমলতাও নিজ হইতে তাঁহাকে আসিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইতে পারে নাই। লজ্জা, সঙ্কোচ, বিরাগ, ঔদাসীন্য সবই যেন সেই চিন্তার ভিতর জড়াজড়ি করিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল। দিনের পর দিন একই ভাবে শুইয়া থাকা, ঔষধ খাওয়া, ডাক্তারের নিকট পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ তাহার নাই! অথচ এমন একঘেয়ে আধ-মরা জীবন, এও যেন সে আর বহিতে পারিতেছিল না। ঘরের যেদিকে চাহিয়া দেখ, টেবিল, চেয়ার, আল্‌না, আল্‌নার উপর ঝোলান কোঁচান সাড়ীগুলি, দেওয়ালের ছবি, ব্রাকেটের উপর ঘড়িটি পর্য্যন্ত সবই যেন সেই একঘেয়ে বিমর্ষ চাহনিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। এই আনন্দ-লেশহীন একান্ত দুর্ব্বহ জীবনে কবে যে মুক্তি লাভ করিবে, ইহা হইয়াছে এখন তাহার প্রধান চিন্তা। স্বামীর বিবাহ-চিন্তায় সে তাঁহাকে দোষারোপ করে না। রুগ্না স্ত্রীর সেবা করিয়া চিরদিন যদি তিনি নাই কাটাইতে পারেন! কিন্তু স্বামীর তাচ্ছিল্যে সে ব্যথা অনুভব করিত, দিনান্তে একবার চোখের দেখা দেখিয়া গেলে ক্ষতিই বা কি এমন ছিল! হিমুকে প্রথম দর্শনেই সে ভালবাসিয়াছিল; মনেও একটা মধুর সাধ জাগিয়াছিল। হেমলতা ভাবিয়াছিল, প্রফুল্লর সঙ্গে এই সুন্দরী মেয়েটীর বিবাহ দিয়া ইহাকে রাণীর সাজে সাজাইয়া সে তাহার অতৃপ্ত কামনা মিটাইবে। তাহার বন্ধ্যা হৃদয়ে নবোচ্ছ্বসিত স্নেহধারা এই মেয়েটির পানেই তাই স্নিগ্ধ শীতলতায় আর্দ্র হইয়া ধীরে ধীরে বহিতে সুরু করিয়াছিল। সে আর কতটুকু, কত দিনেরই

বা! স্বামীর কাছে এ প্রসঙ্গ তুলিবার উপক্রম না করিতেই সব অদল-বদল হইয়া গেল। কল্পনায় যাহাকে রাণীর সাজে সাজাইয়া বুকে চাপিয়া সে ব্যর্থ স্নেহের সকল ক্ষুধা মিটাইতে চাহিতেছিল, সে তেমনই রাণী সাজিয়াই রহিল বটে, শুধু তাহার বুকের ব্যথা জুড়াইয়া না দিয়া সেখানে ব্যথা হইয়াই বাজিয়া রহিল! হেমলতা শুনিল, স্বামী নিজেই তাহাকে বিবাহ করিবেন। শুনিয়া সে দুঃখিত হইল। সে তবে এতদিনের এত ভালবাসা দিয়াও তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই? তাই নূতনের মোহে তিনি উচিত জ্ঞানও হারাইলেন!

কিন্তু নিজের স্বার্থ-হানির চিন্তার চেয়ে বেশী চিন্তা হইল, সেই অবাধ্য যুবা,—যাহাকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে; মা-বাবা শিশুকে কত পরিশ্রমে, কত যত্নে, কত না আদরে-সোহাগে বড় করিয়াছে—সেই ফুলুর জন্য! সে যে চিরদিন শুনিয়া আসিয়াছে, সেই এ জমিদারীর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। এখানকার আঁধার ঘরের মণিদীপ সে! আজ সে দীপের আলো, শুধু তাহারি কল্পদের অপরাধের ঝড়ো হাওয়ায় নিবাইতে বসিল, সে এমনি অপরাধিনী খুড়ি-মা! ফুলুরই কি এ কথা এতক্ষণ শুনিতে বাকী আছে! ইহা শুনিলে অভিমানী সে, সে কি আর এ গৃহের কিছু স্পর্শ করিবে! হয়ত কোথাও চলিয়া যাইবে! হয়ত আর কখনো খবরও দিবে না, কাহারো খবর লইবেও না! কিন্তু হেমলতা যে এখনও তাহার হাতের প্রজ্জলিত অগ্নিকণাতেই নিজ ব্যর্থ জীবনকে শীতল করিবে, আশা রাখিয়াছে! এ সাধও কি তবে তার পূর্ণ হইবে না?

সহসা হেমলতার চিন্তার ধারা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। "ও মেয়েটী কে খুড়ি-মা? ভারী সুন্দর দেখতে ত!" বলিয়া হাসিমুখে প্রফুল্ল ঘরে ঢুকিল। মাথার কাছে খাটে বসিয়া হেমলতার ললাটে হাত রাখিয়া তাপ-পরীক্ষান্তে প্রফুল্ল পুনরায় বলিল, "ও মেয়েটি কে, খুড়িমা?"

হেমলতা মৃদু হাসিয়া কহিল, "ও হিমু—দুদিন বাদে তোমার খুড়িমা হবেন।"

প্রফুল্ল যে কাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, সে তাহার কথার বিশেষণেই হেমলতা বুঝিয়াছিল, উদ্গত নিঃশ্বাসটা তাই চাপিয়া ফেলিতে হইল। বড় আশার জিনিষ যেন হারাইয়া গেল, প্রফুল্লর প্রশ্নে এমনি একটা ব্যর্থতার ব্যথা হেমলতার মনে বাজিল।

"কে হবেন্?" বলিয়া প্রফুল্ল হাসিমুখে তাহার অবিন্যস্ত চুলগুলি গুছাইয়া দিতে লাগিল। যাহা শুনিল, তাহা এমনি অবিশ্বাস্য, যে বিস্ময় বোধ করারও প্রয়োজন ছিল না। সে কথার উত্তর না দিয়া হেমলতা কহিল, "জল খেয়েচ? মার কাছে গেছলে?"

"নিশ্চয়! অবস্থা দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? সোজা হয়ে বসবার যো আছে পেটের ভারে? ঠাকুমা ভাবে, পেট্‌টা যেন আমার রবারের থলি। এগারো মাসের বাকী খাবার একমাসে এর মধ্যে ঠেসে-ঠুসে সে বেশ ধরাতে পারে।"

হেমলতা চোখ তুলিয়া স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল, "যে ছিরি করে আস, বাবা! না করেই বা করবেন কি, বল? ছুটিটাও যদি এখানে কাটাতে, তাহলেও যে আমাদের আশ মিটত।"

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল, "সেই যে একটা গান্ আছে,—"সাধ কখনো মেটে না ভাই—সাধে পড়ুক বাজ। বেলা-বেলি চল্‌রে চলি সাধি আপন কাজ!—সাধ বুঝি আবার কখনো মেটে, খুড়িমা? ওকে যত বাড়াবে, ততই বাড়্‌বে। ছুটিতে সময় কোথা পাই, বল? আমারও যা কিছু কাজ তাও ঐ সময়টুকুর জন্যেই তোলা থাকে।"

হেমলতা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তোমার কাকা ত ঐ জন্যেই রাগ করেন। শুনলুম, তুমি না কি পিঠে মোট বয়ে কোথায় স্বদেশী কাপড় বেচ্‌তে গেছ্‌লে। কোথায় দুর্ভিক্ষ হয়েচে, তার জন্যে দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে চাঁদা চেয়ে বেড়িয়েচ, এ সব কেন কর, ফুলু? শরীরটাকে তুমি একটুও যত্ন কর না!"

"শরীরের চেয়েও যে আমার দেশ্‌কে আমি ভালবাসি খুড়িমা। আমার দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, পর্‌তে পাচ্চে না, অত্যাচারে জর্জ্জরিত হচ্চে,—এ দেখে শুধু শরীর বাঁচাবার জন্যে আমি লুকিয়ে বসে থাকব? সে শরীর কখনো বাঁচে, তুমি মনে করেচ? অর্থে না পারি, সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব তা কেন কর্‌ব না? তুমি নিজে ভেবে আমায় বল, এ কি ভারী অন্যায় করি?"

"তোমার কাজে ন্যায়-অন্যায় বিচার ত আমি কখনও করিনি বাবা। যা তুমি কর, সবই আমি মনে করি, তুমি যখন বুঝে করেচ, তখন তা অবশ্যই ভাল। কারণ মন্দ কাজ করা ত তোমার দ্বারা হবে না। তবে তুমি যা করবে নিজেকে বাঁচিয়ে কর। শরীর রেখে ধর্ম্ম,—আমাদের মেয়েলি শাস্তরেও বলে থাকে। তোমরা ত কত সংস্কৃত শ্লোক-টোক জান। মানুষকে মানুষ ভালবাসবে না, এ কি আর কেউ কখনো বলতে পারে?" বলিয়া হেমলতা একটু স্নিগ্ধ ভাবে হাসিল।

প্রফুল্ল কহিল, "তোমার শাস্ত্রই ত আমি মেনে চলি। শরীর না রাখলে কি এমন থাকে? দেখ দেখি আমার হাতের গুলি। আচ্ছা, আমার সঙ্গে কে পাঞ্জা লড়তে আসবে—আসুক—।" বলিয়া সে পাঞ্জাবির আস্তিন গুটাইয়া খুড়িমাকে অনাবৃত বলিষ্ঠ বাহু-শোভা দেখাইয়া হাসিতে লাগিল।

হেমলতা মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি ভারী দুষ্টু ছেলে। কেবল তর্কে জিততে শিখেচ। কিন্তু লোকে তোমায় কি বলচে, জান? লেখাপড়া শিখে তুমি যেমন কাজ হারালে—সহজ বুদ্ধিতে কেউ কখনো এমন করত না। জমিদারীর কাজকর্ম্ম শিখলে না,—ঘর-বাসী হলে না বলে তোমার কাকাও আগে আগে অনেক দুঃখ করতেন। এখন অবশ্য আর কিছু বলেন না।"

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল, "লেখাপড়া শিখলে কি বুদ্ধি এমনি কেঁচে যায়—যে কর্ত্তব্য কাজও মানুষ করতে পারে না? জমীদারি চালাবার জন্যে কি লেখাপড়া একটা অন্তরায় না কি? প্রজা ঠেঙ্গানো—তা সেটা কোন জমিদারই নিজের হাতে করে না। আমি এমন অনেক শিক্ষিত জমিদারকে জানি, যাঁরা প্রজা-পীড়নে—কশায়েরও বাবা। যাদের মেহনতে তাঁদের নবাবী—তাদেরই এতটুকু ত্রুটিতে—ত্রুটি আর কি, খাজনা দিতে দেরী হলে বা বিনা পয়সায় বেগার খাটতে রাজি না হলে পাইক দিয়ে ধরিয়ে এনে মার-পিট, এমন কি ঘরে বন্ধ পর্য্যন্ত করে রাখে,—কেউ-কেউ আবার প্রজার ঘরের ঘটি-বাটি ধান-চালের সঙ্গে তাদের স্ত্রী-বোন্-মেয়েকে পর্য্যন্ত নিজের পাওনা মনে করে। অবশ্য সবাই এক ধাতুর হলে পৃথিবী সইতে পারতো না। তা ভাল মন্দ সকল শ্রেণীতেই আছে। তবে শিক্ষায় যে মানুষ চরিত্র বদলায়, তা ভেবো না। যে যা থাকে, সে তা থাকেই, বাইরেটা শুধু মার্জ্জিত আর অমার্জ্জিত। গোখরো সাপের মাথায় মাণিক থাকে, তা বলে সে কি কেউটের চেয়ে কামড়ায় কম? বাইরের ব্যবহারটা শোভন আর অশোভন—এইটুকুই তফাৎ! শিক্ষিত জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদের বিবেক-বুদ্ধি তুমি কি মনে কর, আত্ম-সর্ব্বস্ব মোড়লদের চেয়ে বেশী তফাৎ? কখনই না! যে উৎপীড়ন-অবিচারে দক্ষ না হয়, সে তার কর্ম্মগত দুর্ব্বলতার জন্যই হয় না। না হলে শিক্ষায় মানুষকে অকর্ম্মণ্য করে না, বরং কাজের লোকই করে। যে একটা শিখতে পাবে, সে আর একটাও পারে। বরং লেখাপড়া শেখা থাকলে মাথা বুদ্ধি চালতে শীঘ্রই পারে। আমার কিন্তু অত-শত পোষাবে না। জমিদার হওয়া আমার ধাতে সইবে না, দেখচি। তিন পুরুষ ধরে চাষ করেচেন বাপ্-পিতামহরা, হাড়ের ভিতর এখনও সেই রক্ত বইচে যে। ধরে-বেঁধে বাবু সাজা কি সাজবে কখনও?" বলিয়া সে হাসিমুখে খুড়িমার চুলের ভিতর কুবাইয়া দিতে লাগিল।

এই একটুখানি স্নেহের অভিব্যক্তি! তবু অনাবৃষ্টির দিনে এতটুকুও জলের অভাব তৃষ্ণা-কাতর মুমূর্ষু ধরণী যেমন মুহূর্ত্তেই শুষিয়া লয়, ক্ষুদ্র বটে তবু এ যে কত কাঙ্ক্ষিত, তাহা তৃষ্ণাদগ্ধ মরুবক্ষই শুধু অনুভব করিতে পারে! চোখে তাহার বন্যার ধারা উপচাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তবু হেমলতার সহিষ্ণু চিত্ত সে বিড়ম্বনা ঘটিতে দিল না। এই স্নেহাস্পদকে স্নেহ, ইহার মহৎ হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ও তৎপ্রতি অবিচারের ব্যথা, সমস্ত মিলিয়া তাহার ব্যথা-কাতর মনটিকে বিক্ষোভিত করিয়া তুলিলেও মুখে সে একটু করুণ হাসি হাসিয়া কহিল, "তাই হবে তোমার, বাবা। চাষ করে কোদাল পেড়েই তুমি খেয়ো। জমিদারের ফরমাস দেওয়া হচ্চে। যে সেখানে সাজবার, সেই সেখানে সাজবে। ঘুঁটে-কুড়ুনি মা কি কখনো রাজার মা হয়? তুমও এবার মনের সুখে যত খুসী গুণ্ডামি করে বেড়াওগে। কেউ মানা করবে না, খবরও নেবে না তোমার।"

প্রফুল্ল মনে করিল, হেমলতা নিজের শারীরিক অবস্থার

কথা ভাবিয়া বলিতেছে। সে সবিস্ময়ে কহিল, "মানে? মতলবটি কি তোমার, শুনি? ফাঁকি-ফুঁকি কিছু ঠাউরে রেখেছ না কি? সে সব চল্‌বে না, তা কিন্তু সাফ্‌ বলে দিচ্চি। তারপর ফরমাসি জমিদারটি আস্‌বেন কোথা থেকে, শুনি?"

হেমলতা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "তার উত্তর ত ঘরে ঢুকেই পেয়েচ, বাবা।"

"ঘরে ঢুকে—?" বলিয়া প্রফুল্ল অতীত ক্ষণের স্মরণে কিছুক্ষণ বৃথা কাটাইয়া কহিল, "হারলুম! আমার ত বিন্দু-বিসর্গও মনে পড়্‌ল না, কখন আবার নতুন জমিদারের কথা হোল?"

হেমলতা কহিল, "নেকা ছেলে! আগে গাছ, না আগে ফল? তোমার নতুন খুড়ির কথা প্রথমেই কি বলিনি? আকাশ থেকে পড়্‌লে যে?"

প্রফুল্ল বিষণ্ণভাবে কহিল, "তোমায় আমি ছেলে-বেলা থেকে মায়ের মান্য দিতে পারিনি—মা, খুড়ি, বোন, বন্ধু,—সব মনে করে সব দৌরাত্ম্যই করে এসেচি, তুমি তাতে বাধা দাওনি, মান্য করতেও শেখাওনি! কিন্তু কাকাকে আমি কতখানি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, তা তুমিও জান। তাঁর সম্বন্ধে এ রকম তামাসা করাও তোমার উচিত নয়।"

হেমলতা বলিতে গেল, সে বংশ রক্ষার জন্য,—কিন্তু মুখে তাহার বাধিয়া যাওয়ায় শুধু কহিল, "তিনি যদি দ্বিতীয়বার বিয়েই করেন—তা হলে কি তুমি আর তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারবে না বাবা? ওটা কি এতই ক্ষণ-ভঙ্গুর?"

প্রফুল্ল উদ্ধত-ভাবে কহিল, "না, তা আমি পারব না। খুলে বল দেখি, ব্যাপারটা কি? ও কাদের মেয়ে? জুটলই বা কেন এসে? কে এ সব দুর্ব্বুদ্ধি ওঁর মাথায় দিলে? আর তোমাকেও বলি—তুমি এ হতে দেবে?"

"আমি? আমি ত তোমাদের সংসারের বোঝামাত্র, ফুলু। শুধু সেবা নিচ্ছি, দিতে পারলুম না কিছু। উনি যদি সুখী হতে চান—"

খাটের ডাণ্ডায় মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তীব্র স্বরে প্রফুল্ল কহিল, "তখন পতিব্রতা হয়ে তাঁকে পাগ্‌লামিতে উৎসাহ দেওয়া তোমার উচিত বই কি! বেশ! তোমাদের তরফ ছাড়া আর একটা দিক্‌ও ত আছে। সুখী হওয়াটা ত তাঁর একলারই জন্য নয়—বড় মানুষকে বিয়ে করে ও মেয়েটির কি হবে, শুনি?"

একটুখানি বিষাদের ম্লান হাসি হাসিয়া হেমলতা কহিল, "হাসালে তুমি ফুলু! আইবুড়, দুঃখীর মেয়ে! বিয়ে জুটবে না বলে বিধবা মায়ের গলায় কাঁটা হয়ে ফুটে আছে! এমন রাজ-সংসারে রাণী হবে, দুঃখ তার কোথায় পেলে? যদি বল, সতীন? সে ত অনেক দিনের নয়। আর জ্যান্তে যে মরা, সে ত মরার বাড়া। স্বামীর এতটুকু বয়সের কথা যদি বল,—সে আর এমন কি বেশী! এর চেয়ে কত বেশী বুড়ো মানুষে দ্বিতীয় ছেড়ে তৃতীয়-চতুর্থ বার যে বিয়ে কচ্চে—তা কি নিক্তির ওজনে সবাই সব পায়, না পাচ্চে? এই কি অনেক নয়?"

"না, অনেক নয়। আর যে যা বলুক, তোমার মুখের কথা এ, মনের নয়। সত্যি বলচ খুড়িমা? মেয়ে মানুষের এই চরম পাওয়া? তারা ঐশ্বর্য্যকে সব-চেয়ে বড় পাওনা মনে করে? বিশেষতঃ অমন মেয়ের—"

"ফুলু জানলাটা বন্ধ করে দাও ত বাবা চোখে পড়ন্ত রোদটা লাগচে।"

প্রফুল্ল উঠিয়া আদেশ-পালনান্তে ফিরিয়া আসিলে হেমলতা একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া কহিল, "গোপা-লের মাকে ডেকে দিয়ে যেয়ো ত, একটু বাতাস দেবে।"

খুড়িমা যে এ-প্রসঙ্গে আর একটুও অগ্রসর হইবেন না তাহা বুঝিয়া প্রফুল্ল বিষণ্ণ মুখে উঠিয়া গেল। আমি বাতাস দিতেছি, গোপালের মাকে প্রয়োজন কি?—এ কথাটা মনে উঠিলেও সে মুখে কিছু বলিল না। সে জানিত, খুড়িমা আপাততঃ একটু নির্জ্জনতা চাহিতেছেন। বিশ্বের সহিত সে বিদ্রোহ করিতে পারে, কিন্তু কোন দিক্‌ দিয়াও ইঁহার মনে এতটুকু আঘাত সে ইচ্ছা করিয়া অকারণ দিতে পারে না। এখানে সে যে কত পাইয়াছে ও এখনও পাইতেছে, সে কেবল সেই জানে। সে ত বাহিরের লৌকিকতা বজায় রাখা সাধারণ স্নেহ নয়! সেই জন্যই সে এমন বিসদৃশ ব্যাপার আরও ঘটিতে দিবে না। স্থির করিল, ইহার একটা হেস্ত-নেস্ত করিয়া তবে সে ছাড়িবে! এ-সব কি? (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

পুত্রের প্রতি

বাদল রে তুই কেন এলি সর্ব্বনেশে এমন দেশে,
কেন এলি কলম-পেশার ঘরে!
একটি রজত মুদ্রা যেথা দিতে হচ্ছে দুধওলাকে,
জল-মেশানো সের-তিনেকের তরে!
ছুঁচোর বাজার ঘরে যাদের, বাইরে তোফা লম্বা কোঁচা,
কেবল যারা মুখেই ধোনে তুলো;
যতক্ষণ, হায় জেগে থাকে, পেটের দায়ে খেটে মরে,
রাত্রে যাদের প্রায় জ্বলে না চুলো!
তাদের ঘরে দুর্দ্দিনে, হায়, খাবি কি তুই কচুপোড়া?
কি আছে এই লক্ষ্মী-ছাড়ার দেশে!
সকল জিনিস মাগ্যি হেথায়, কি খেয়ে তুই বাঁচবি ব্যাটা,
জীবন-তরী যায় বা বুঝি ফেঁসে!

ইউরোপের এই মহাসমর হাহাকারটা আন্‌লো ধরায়,
সোনার ভারত রক্ষা কি আর পাবে?
পরের মুখাপেক্ষী জাতির মনুষ্যত্ব শুকিয়ে মরে,
টের পেয়েছি থেকে পরের তাবে।
সৃষ্টি-করা দারুণ অভাব, বিলাসিতার বাঁদরামিতে,
পড়ে গেছি একটা মহাভ্রমে;
তাই তো ধরাপৃষ্ঠ হতে দুর্ভিক্ষে ও ম্যালেরিয়ায়,
মুছে যাচ্ছি আমরা ক্রমে ক্রমে!
ধ্বংসোন্মুখ জাতির দেশে তোরা কেন আসিস্ বাবা?
এ আনন্দে তাই তো হৃদয় কাঁদে!
মোদের মত তুই কি বাদল, দুঃখের জের টান্‌বি শুধু,
চিরকালটাই কাঁদ্‌বি বসে ফাঁদে!

অনেক কথাই আস্‌ছে মনে, সব কথা কি বল্‌তে পারি!
বিনা দোষে ধর্‌বে টুঁটি চেপে!
সাদার স্বার্থ ষোল আনা—এই কথাটি মনে রাখিস্,
সুখ-সুবিধা তাদের ভারত ব্যেপে!
তোর জনমের আগে-পরে ঢের ঘটনা ঘটে গেল,
সারা জীবন গেঁথে রাখিস্ প্রাণে;
এতে অনেক শিক্ষা পাবি, বুদ্ধি বেজায় খুলে যাবে,
ধর্ম্ম-নীতি কে না হেথায় জানে?
সাদা পায়ের স-বুট লাথি দয়া করে পড়লে পিঠে,
কালার যদি নেহাৎ প্লীহা ফাটে;
তাতে সাদার দোষ কখনো এই জগতে হয় না প্রমাণ,
কারণ কালা ভয়ে চরণ চাটে!

এ-সব ব্যাপার অহরহ এই দেশেতেই ঘটে থাকে,
আমরা তবু সাদার প্রেমে মাতি!
কোল-বালিসের ওয়াড় পরে,' মাথায় মস্ত ধামা দিয়ে,
সেজে বেড়াই বুল্ সাহেবের নাতি!
বাপের কাছে ভাইয়ের কাছে ইংরেজীতে পত্র লিখি,
যখন তখন কপ্‌চাই বাঁধা বুলি;
জাতির সাথে জাৎ-ভাষাতে কথা বল্‌তে লজ্জা বোধ হয়;
বাদল, তোকে বল্‌ব কি আর খুলি'!
আমরা আত্ম-অবিশ্বাসী, তাইতো মোদের এমন দশা,
দেশ-বিদেশে খাচ্ছি লাথি-ঝ্যাঁটা!
ভারতবাসীর ভাগ্যাকাশে সূর্য্য যাবৎ উদয় না হন,
প্রতাপসিংহের মতন থাকিস্, ব্যাটা!

দেশের মানুষ ক্ষিধের জ্বালায় খেজুর গাছের খাচ্ছে মাথি,
হচ্ছে উজাড় খুলনা বরিশাল;
ধান্য চালের দেশের লোকের, আজকে এ কি দুরবস্থা!
ভারত জুড়ে নাচছে মহাকাল!
জাতির দুঃখ কর্‌তে মোচন জন্মেছিস্ তুই ভারতবর্ষে,
এই কথাটি নিত্য করিস ধ্যান!
জন্মভূমির হিত-সাধনে বিদেশ গেলে জাৎ যাবে না,
লভিস যেন এমন ধারাই জ্ঞান!
ছোট্ট কুয়োর ব্যাঙের মত কুয়োটাকেই সাগর ভেবে,
বদ্ধ যদি থাকিস্ কভু তাতে;
সাগর দেখার দারুণ অভাব এই জগতে পূরবে না তোর,
অন্ধকারে মর্‌বি নিরাশাতে!

তারপরে এই জগৎটাকে ভাল করে চিনতে শিখিস্,
জাতির শত্রু হাজার হাজার পাবি ;
লোচ্চা আছে, সাধুও আছে,আছেন ত্যাগী স্বদেশসেবক,
মিলবে সবি, যখন যেটি চাবি।
গান্ধীর মত মহাপুরুষ, এমনধারা বাপের ব্যাটা,
এই দুনিয়ায় দুইটি নাহি মি
আজ স্বরাজের আন্দোলনে, াদার সঙ্গ-বর্জ্জনেতে,
ভারত আদেশ মাথা পেতে নিলে।
তাঁর কথাতে ছোট-বড় মুচি-মেথর হাড়ি-চাঁড়াল —
মিললো সকল হিন্দু-মুসলমান ;
জন্মেছিস্ তুই গান্ধী-যুগে, আনন্দে তাই দেশের কাজে,
খেটে খেটে জীবন করিস্ দান !

সংসারে তুই চল্‌বি যখন, রাগটাকে তোর দাবিয়ে রাখিস্.
একটা গভীর অনুরাগের চাপে ;
জ্ঞানে পুণ্যে দেশ-সেবাতে মনুষ্যত্বের উচ্চ চূড়ায়,
হবেই তোকে উঠ্‌তে ধাপে-ধাপে।
হৃদয়টাকে বড় করে' গোটা ভারতবর্ষটাকে,
পূরে রাখিস্ বিশাল বুকের মাঝে ;
গরীব কাঙাল মানুষগুলোর দুঃখ যেন অন্তরে তোর,
দিন-যামিনী শেলের মতই বাজে !
খেটে খেটে ভাত জোগাবি, তবু যেন ধনীর দ্বারে
এই জীবনে পাতিস্ নেকো হাত ;
হস্ত-চরণ থাকতে যাঁরা নড়ে বসতে চান্ না মোটেই,
সত্যি তাঁরা পুরীর জগন্নাথ !

সংসারটা কেমন-ধারা সংক্ষেপে তা চিনিয়ে দিলাম,
দেখে-শুনেই চলতে হবে তোকে ;
ধর্ম্ম-পথে মতি রেখে আত্ম-বিকাশ করে যাবি,
এই জীবনে হোস্‌নে অধীর শোকে।
ঠেকে ঠুকে দুঃখে-সুখে অভিজ্ঞতা বাড়বে ক্রমে,
দিনে দিনে বুঝতে পারবি সবি,
দুনিয়া একটা চিড়িয়াখানা, পশু-ধর্ম্মী মানুষে-ভরা,
দেখবি কেবল কাড়াকাড়ির ছবি !
পশুত্বটা পিষে মেরে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধলোকে,
ভ্রমণ করে' পুরাস্ মনের সাধ ;
মানুষ থেকে দেব্‌তা হয়ে একটা অমর নাম রেখে যাস,
এইটি আমার প্রাণের আশার্ব্বাদ !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ত্রিপুরার চতুর্দ্দশ দেবতা

যযাতিনন্দন দ্রুহ্য-পিতা-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত এবং নির্ব্বাসিত হইয়া, তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে কিরাত-ভূমিতে যাইয়া নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি কিরাত প্রদেশ আর্য্য সভ্যতার প্রথম আলোক-রেখার ক্ষীণ জ্যোতি-লাভের অধিকারী এবং তথায় আর্য্যনিবাস স্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্য "ত্রিপুরা" নামে অভিহিত হয়। * শ্বাপদ-সঙ্কুল হিংস্রবৃত্ত অনার্য্যদ্বারা অধ্যুষিত অরণ্যময় প্রদেশে আর্য্য শাসন স্থাপিত হইবার পরেও তথায় আর্য্য প্রভাব বিস্তৃতি লাভে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, অনার্য্য সাহচর্য্যে রাজকুমারগণের মধ্যেও সময় সময় উদ্ধত ও অনাচারীর অভ্যুত্থান দেখা যাইতেছিল, দৃষ্টান্ত স্থলে মহারাজ দৈত্যের পুত্র ত্রিপুরের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহার সম্বন্ধে রাজমালা গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে,

দ্রুহ্য বংশে দৈত্য রাজা কিরাত নগর,
অনেক সহস্র বর্ষ হইল অমর।
বহুকাল পরে তান পুত্র উপজিল,
ত্রিবেগেতে জন্ম নাম ত্রিপুর রাখিল

* রাজ্যের 'ত্রিপুরা' নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এ বিষয়ের আলোচনা অল্প কথায় হইবার নহে, তাহা করাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

জন্মাবধি না দেখিল দ্বিজ সাধু ধর্ম্ম,
সেই হেতু ত্রিপুর হইল ক্রূর কর্ম্ম।
দান-ধর্ম্ম না দেখিল আগম পুরাণ,
বেদশাস্ত্র না পঠিল নাহি কোন জ্ঞান।
দীক্ষিত না হইল দেবগুরু না চিনিল,
সল্লোকের ব্যবহার কিছু না দেখিল।
কিরাত-প্রকৃতি হৈল কিরাত-আচার,
সাধুসঙ্গ না ঘটিল কখনো তাহার।
পুত্রের চরিত্র দেখি দৈত্য মহারাজ,
নজ কর্ম্ম স্মরি বনে দিছে পিতা প্রজা।

* * *

বেদ বেদাঙ্গের তত্ত্ব বক্তা নাহি সঙ্গে,
পুত্র আমা মূর্খ হৈল কে পঠাবে রঙ্গে।
এই সব দুঃখে রাজা চিন্তিত হইল,
পঠাইতে যত্ন কৈল পুত্রে না পঠিল।"

—রাজমালা—দৈত্যখণ্ড।

বংশ-তালিকা আলোচনায় জানা যায়, ত্রিপুর দ্রুহ্যুর অধস্তন ৪০শ স্থানায়। সাধারণতঃ তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করা হয়। সেই হিসাবে দ্রুহ্যু ও ত্রিপুরের মধ্যে তের শতাব্দী অন্তর সাব্যস্ত হইতেছে। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতায়মান হইবে, দ্রুহ্যুর বংশধরগণ কত দীর্ঘকাল যযাতির অভিসম্পাতের ফল ভোগ করিয়াছিলেন।

মহারাজ দৈত্য বার্দ্ধক্যে পুত্র-হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। রাজ্যলাভের পরেও মহারাজ ত্রিপুরের চরিত্রগত কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল না। অবিরত বণস্পৃহা, প্রজাপীড়ন, লঘুদোষেও প্রাণদণ্ড, অবিচার, পর-স্ত্রী-হরণ ইত্যাদি অনাচারে প্রকৃতি-পুঞ্জ বিষম বিপন্ন ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। রাজমালার মতে, সর্ব্ব-মঙ্গলাকর মহেশ্বর উৎপীড়িত প্রজাবৃন্দের দুঃখে ব্যথিত হইয়া উপদ্রব-শান্তির নিমিত্ত সংহারক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন এবং স্বহস্তে ত্রিপুরকে সংহার করিলেন।*

* মারিলেক ত্রিশূল অস্ত্র হৃদয় উপর।
শিব মুখ হেরি রাজা ত্যজে কলেবর।
—রাজমালা।

এই সময় রাজবংশে রাজ্যভার গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকায়, সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, লুণ্ঠন ইত্যাদি বিবিধ উপদ্রবে অল্পকালের মধ্যেই রাজ্য অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রজাগণ দেখিল, অত্যাচারী রাজার রাজ্য অপেক্ষা অরাজক দেশ অধিকতর ভয়ঙ্কর। তাহারা উপায়ান্তর না পাইয়া জনৈক প্রজারঞ্জক রাজা পাইবার প্রার্থনায় শূলপাণির অর্চ্চনা আরম্ভ করিল। আশুতোষ প্রকৃতিপুঞ্জের পূজায় প্রসন্ন হইয়া, পূজাস্থানে আবির্ভূত হইলেন; এবং তাঁহার বরপ্রভাবে মহারাজ ত্রিপুরের ত্রিলোচন নামক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ত্রিপুরার শাসন-দণ্ড ধারণ করিলেন। এই বর প্রদান-কালে মহাদেব আদেশ করিয়াছিলেন;—

"চতুর্দ্দশ দেব পূজা করিব সকলে,
আষাঢ় মাসের শুক্ল অষ্টমী হইলে॥

* * * *

চতুর্দ্দশ দেবতার চতুর্দ্দশ মুখ,
নির্ম্মাইয়া দিল শিবে আপনা সম্মুখ॥

—রাজমালা—ত্রিপুর খণ্ড।

এই দেববাণী-অনুসারে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মহাদেব স্বয়ং দেবতার মুখ (মুণ্ড) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ধর্ম্মপ্রাণ লেখকের এই উক্তি বর্ত্তমান কালে সকলের নিকট ভাল লাগিতে না পারে, কিন্তু মহারাজ ত্রিলোচনের শাসন-কালে এই সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না।

চতুর্দ্দশ দেবতার অন্তর্ভুক্ত দেবদেবীগণের নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে;—

"হরোমা হরি মা বাণী কুমারো গণপা বিধিঃ।
ক্ষ্মাব্ধির্গঙ্গা শিখাকামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশ॥"

—রাজমালিকা।

অন্যত্র লিখিত আছে;—

"শঙ্করঞ্চ শিবানীঞ্চ মুরারিং কমলাং তথা।
ভারতীঞ্চ কুমারঞ্চ গণেশং বেধসং তথা॥

ধরণীং জাহ্নবীং দেবীং পয়োধিং মদনং তথা।
হুতাশঞ্চ নগেশঞ্চ দেবতাস্তাঃ শুভাবহাঃ॥"
সংস্কৃত রাজমালা।

"হরউমা হরিমা বাণী কুমার গণেশ।
ব্রহ্মা পৃথ্বী গঙ্গা অব্ধি অগ্নি সে কামেশ॥
হিমালয় অন্ত করি চতুর্দ্দশ দেবা।
অগ্রেতে পূজিব সূর্য্য পাছে চন্দ্র সেবা॥"
—রাজমালা।

উদ্ধৃত শ্লোক-সমূহ আলোচনায় জানা যায়, শিব, দুর্গা, হরি, লক্ষ্মী, বাগদেবী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী,—সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমাদ্রি এই চৌদ্দটি দেবতা-সমষ্টিকে 'চতুর্দ্দশ দেবতা' বলা হয়। ইহা ত্রিপুর রাজ-বংশের কুলদেবতা মধ্যে পরিগণিত। এই সকল দেব-দেবীর চৌদ্দটি মুণ্ড অর্চ্চিত হইয়া থাকে; মুণ্ড-সমূহ অষ্টধাতু-নির্ম্মিত। তন্মধ্যে মহাদেবের মুণ্ডটী রজত বর্ণের এবং অন্য সমস্ত মুণ্ড সুবর্ণ-মণ্ডিত।

চতুর্দ্দশ দেবতা কতকালের বিগ্রহ, তাহা নির্ণয় করা বর্ত্তমান সময়ে কিছু কঠিন সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। আমরা নিম্নলিখিত সূত্র অবলম্বনে মোটামুটি ভাবে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

ত্রিপুরেশ্বর চিত্ররথ, ভারত-সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সম-সাময়িক রাজা, ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত আলোচনায় এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।* উভয়ধারার বংশ-তালিকা আলোচনা করিলেও তাহাই প্রমাণিত হইবে। যুধিষ্ঠির এবং চিত্ররথ উভয়েই চন্দ্রবংশীয় ভূপতি। চন্দ্র হইতে পর্য্যায়-গণনায় যুধিষ্ঠির অধস্তন ৪৩শ স্থানীয় সাব্যস্ত হইতেছেন; চিত্ররথও ঐরূপ গণনায় চন্দ্রের অধস্তন ৪৩শ স্থানীয়। সুতরাং ইঁহারা উভয়ে সম-পর্য্যায়ের ও সম-সাময়িক রাজা বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সময় নির্ণয় লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন চলিয়াছে, অদ্যাপি সে বিষয়ে স্থির মীমাংসা হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে যুধিষ্ঠির ১৫১৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।* রাজ-তরঙ্গিণীর মতে তিনি কলির ৬৫৩ বৎসর অতীতে আবির্ভূত হইয়াছেন।† বরাহ মিহিরের মতে শালিবাহনের সালে ২৫২৬ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় হইবে।‡ এই সকল মত পরস্পর অসামঞ্জস্য হইলেও সকলের মত অনুসারেই যুধিষ্ঠিরের প্রাচীনত্ব কিঞ্চিন্ন্যূন সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর সাব্যস্ত হইতেছে। এই নির্দ্ধারণ সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে কিনা জানি না। মোটামুটি হিসাবের পক্ষে এই মত গ্রহণ করিতে আপত্তি না হইলে, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় চিত্ররথের প্রাচীনত্বও সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

চতুর্দ্দশ দেবতার স্থাপয়িতা মহারাজ ত্রিলোচন চিত্ররথের অধস্তন চতুর্থ স্থানীয়। তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণনার হিসাবে ত্রিলোচন চিত্ররথের ১৩৩ বৎসরের কনিষ্ঠ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং ত্রিলোচন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চতুর্দ্দশ দেবতা চারি সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন বিগ্রহ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে কোনরূপ বাধা দৃষ্ট হয় না।

এই বিগ্রহ ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে স্থাপিত হইয়াছিল; সেইস্থান হইতে রাজপাট উঠাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বর্ত্তমান রাজধানী আগরতলায় নীত হইয়াছে। উদয়পুরস্থ চতুর্দ্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির এখনও জীর্ণ দেহ লইয়া অতীতের সাক্ষ্য-স্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছে। আগরতলায় বর্ত্তমান মন্দির তাহার তুলনায় অনেক হীন।

আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমী চতুর্দ্দশ দেবতার বিশেষ অর্চ্চনার নির্দ্ধারিত দিন, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উক্ত তিথিতে বিপুল সমারোহের সহিত দেবতার বার্ষিক অর্চ্চনা চলিয়া আসিতেছে। এই অর্চ্চনাকে 'খার্চ্চি

* মহারাজশ্চিত্ররথো রাজসূয়ে মহাক্রতৌ।
বহুসম্মানিতস্তত্র নিজরাজ্যমুপাগমৎ॥
রাজরত্নাকর।

* ১২৯৯।১৩০০ সালের নব্যভারত ও জন্মভূমি সাময়িক পত্র দ্রষ্টব্য।

† শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণাম ভবন্ কুরু পাণ্ডবাঃ॥
রাজতরঙ্গিণী—১ম তরঙ্গ।

‡ আসনমঘাসু মুনয়ঃ শাসিনতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শক কালস্তস্য রাজ্যশ্চ॥
বারাহীসংহিতা—১৩শ অঃ

পূজা' বলে। ইহা চতুর্দ্দশ দেবতার একটী প্রধান উৎসব বলিয়া পরিগণিত।

ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রতিষ্ঠিত কোন কোন বিগ্রহ উৎকল দেশীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা, কোন বিগ্রহ মণিপুরী ব্রাহ্মণ দ্বারা এবং কতিপয় বিগ্রহ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দ্বারা অর্চ্চিত হইতেছে। কোন কোন বিগ্রহ অর্চ্চনার ভার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের হস্তেও অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু চতুর্দ্দশ দেবতার অর্চ্চনায় একটী বিশেষত্ব এই যে, উক্ত দেবতার পূজারিগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ নহেন। ত্রিপুরা-জাতীয় 'চন্তাই' ও 'দেওড়াই' প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তিগণ অর্চ্চনার ভার পাইয়াছেন। এই দেবতার প্রধান পূজককে (দেবালয়ের মোহান্ত-স্থানীয় ব্যক্তি) চন্তাই বলা হয়। দেবতার সেবা-পূজার ভার এই শ্রেণীর লোকের হস্তে বিনা-কারণে প্রদান করা হয় নাই; শিবের আদেশই এবম্বিধ ব্যবস্থার একমাত্র কারণ। মহাদেব বলিয়াছেন :—

"পূজায় যে পূর্ব্বাদিন প্রাতঃকাল লাভে।
সংযম করিবে চন্তাই দেওড়াই সবে॥
পূজাবিধি দেওড়াই সবে তাকে জানে।
সমুদ্রের দ্বীপে তারা রহিছে নির্জ্জনে॥
তাহাকে আনিবা যাইয়া রাজার সহিতে।
যেখানে পূজিবা আমি আসিব সাক্ষাতে॥
যেই বর চাহে রাজা পাইবা সত্বর।" ইত্যাদি

—রাজমালা -ত্রিলোচন খণ্ড।

অন্যত্র লিখিত আছে :—

"শুভদিনে দেওড়াই রাজার সহিতে।
রাজধানী আসিলেন মন হরষিতে॥
চতুর্দ্দশ দেবতাকে সমর্পিল রাজা।
তদবধি দেওড়াই নিত্য করে পূজা॥"

—রাজমালা।

তৎকালে দেওড়াইগণ বিশেষ ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। ইহাঁদের আচার সম্বন্ধে রাজমালা বলেন,—

"নারীর রন্ধন তারা নাহি করে ভক্ষ্য॥
নিত্য স্নান ধৌত-বস্ত্র আকাশে শুকায়ে!
আকাশে শুকাইয়া বস্ত্র পবিত্রে পৈরয়॥
স্বহস্তে রন্ধন করি ভোজন করয়।
দেবতা পূজিতে ভক্তি তারা অতিশয়॥"

এবম্বিধ শুদ্ধাচারী সাধু-পুরুষদিগকে সমুদ্রের দ্বীপ হইতে আনিয়া, চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গালিম, বাছাল ইত্যাদি কতিপয় সম্প্রদায়ের লোক পুরুষানুক্রমে সেই দেবালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত আছে; এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ইহারা সকলেই রাজ-সরকারী বৃত্তি-ভোগী কর্ম্মচারী। ইহাদের বংশধর ব্যতীত অন্য কোন বংশীয় লোকের এই সকল কার্য্য করিবার অধিকার নাই। এই সকল সম্প্রদায় হইতে যোগ্যতা অনুসারে লোক নির্ব্বাচিত হয়।

ত্রিপুরেশ্বরগণ বংশ-পরম্পরা-ক্রমে এই কুল-দেবতার প্রতি বিশেষ আস্থাবান, ত্রিপুরার ইতিহাসে ইহার বিস্তর প্রমাণ আছে। প্রাচীন নৃপতিবৃন্দ অনেক সময় চন্তাইর মুখে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রত্যাদেশ অবগত হইয়া অনেক কার্য্য করিয়াছেন। কালক্রমে অসাধু লোকের হস্তে এহেন পবিত্র এবং দায়িত্বপূর্ণ চন্তাইয়ের কার্য্য-ভার পতিত হইয়াছে। কোন কোন দুষ্ট-বুদ্ধি চন্তাই স্বার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে, বা দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে, অথবা রাজদ্রোহিগণের বশবর্ত্তী হইয়া, চতুর্দ্দশ দেবতার প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া, নানাবিধ অনর্থ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও ত্রিপুরার ইতিহাসে বিরল নহে। সেই সকল ঘটনায় ভূপতিবৃন্দের অটল ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে একটীমাত্র ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

মহারাজ বিজয়-মাণিক্য দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী এবং রাজনীতি-কুশল ভূপতি ছিলেন। তাঁহার শাসন-কালে (খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দার শেষভাগে) চট্টগ্রামে পাঠান-বাহিনীর সহিত আট মাসকাল ত্রিপুরার ভীষণ সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত পাঠান সেনাপতি মোমারক খাঁ (মতান্তরে মহম্মদ খাঁ) ধৃত ও লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ-অবস্থায় রাজ-দরবারে নীত হইলেন। এই মোমারক গৌড়েশ্বর দায়ুদ সার শ্যালক ছিলেন। * ধৃত শত্রুকে দেবতা-সমক্ষে বলি প্রদান

* মমারক খাঁ নামেত গৌরেশ্বর শালা।
মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভালা॥ রাজমালা।

করা ত্রিপুরার তদানীন্তন প্রথা থাকিলেও + মমারক খাঁকে বধ করিতে মহারাজা বিজয়-মাণিক্য অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু চন্তাইর ইচ্ছা অন্যরূপ। খাঁ সাহেবকে দরবারে উপস্থিত করা মাত্রই,—

দুর্লভ চন্তাই নাম রাজাতে যে কহে,
চতুর্দ্দশ দেবে বলি খাঁকে দিব তাহে।
নৃপতিয়ে বলে চন্তাই উচিত না হয়,
মমারক খাঁ বড়লোক সর্ব্বলোকে কয়।"

—রাজমালা।

চন্তাই বুঝিলেন, দেবতার দোহাই না দিলে এ কার্য্যে রাজার সম্মতি লাভ করা কঠিন হইবে। তাই,—

"চন্তাই বলে খাঁকে বলি দিবাব তবে,
দেবতার আজ্ঞা হৈছে বলিল রাজারে।

—রাজমালা।

দেবতার প্রত্যাদেশ শুনিয়া ধর্ম্মপ্রাণ রাজা বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া,—

"নিঃশব্দে রহিল রাজা, অনুমতি-জ্ঞানে,
চন্তাইয়ে খাঁকে নিল রত্নপুর স্থানে।" —রাজমালা।

পর দিবস মহাসমারোহে মমারক খাঁকে চতুর্দ্দশ দেবতার সম্মুখে বলি প্রদান করা হইল। এই সূত্রে গৌরের সহিত ত্রিপুরার মনোমালিন্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। চন্তাইগণের এবম্বিধ কার্য্যের দৃষ্টান্ত রাজমালায় বিস্তর পাওয়া যাইবে।

চতুর্দ্দশ দেবতাব সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতীত ঘটনাবলী স্মরণ করিলে, হৃদয়ে স্বতঃই যেন কি এক বিভীষিকা-মিশ্রিত ভক্তি-রসের সঞ্চার হয়। যে বিগ্রহকে সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর কাল যাবত বিবিধ সম্প্রদায়ের কোটি কোটি আর্য্য ও অনার্য্য ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন, সেই বিগ্রহের গৌরব বা গাম্ভীর্য্য কম নহে, এ কথা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কত পরামক্রশালী বীরের উত্তপ্ত শোণিতে দেব-মন্দির প্রক্ষালিত হইয়াছে, কত কোটি নর ও পশ্বাদির জীবন এই দেবদ্বারে আহুতি প্রদান করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে! এই সকল কথা ভাবিতে গেলে, হৃদয়ে বিষম বিভীষিকাব ছায়াপাত হয়। বর্ত্তমানকালে নর-বলি বাদ পড়িয়া থাকিলেও প্রতি বৎসর অসংখ্য পশু-বলি দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা চলিতেছে। অসংখ্য হংস এবং পারাবতও বলি দেওয়া হয়।+

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ।

+ পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যে নর-বলির নিয়ম বা সংখ্যা নির্দ্ধারিত ছিল না। মহারাজ ধন্যমাণিক্য তাহা নির্দ্ধারণ করেন। রাজমালায় লিখিত আছে;—

"পূর্ব্বেতে ত্রিপুর রাজা নর-বলি দিত,
সহস্রে সহস্রে বর্ষে বর্ষে কাটা যাইত।
শ্রীধন্য মাণিক্য মানা তাহাকে করিল,
তদবধি,নর-বলি নিষেধ হইল।
তিন বৎসরে এক নর চতুর্দ্দশ দেবে,
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে।
দৌচা পাথরে দুইনর শত্রু পাইলে হয়,
গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময়।
ইহাতে অধিক বলি মানা করে রাজা,
তদবধি নিশ্চিন্তে রহিল রাজ্য প্রজা।"

+ কামরূপ প্রদেশে হংস ও পারাবত ইত্যাদি ভক্ষণ করা শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা দেবার্চ্চনেও ব্যবহৃত হয়। যোগিনী তন্ত্রে কামরূপাধিকার নামক দ্বিতীয় অষ্টম ভাগের পটলে উক্ত হইয়াছে;—

"হংস পারাবতং ভক্ষ্যং বরাহং কৌর্ম্মমেবচ।
কামরূপে পরিত্যাগাৎ দুর্গতি তস্য সংভবেৎ।"

ত্রিপুরা রাজ্য কামরূপের অন্তর্গত, সুতরাং তথায় হংস ও পারাবত বলি প্রদান দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করা শাস্ত্র-সম্মত। কামাখ্যা তন্ত্রে, কামরূপ প্রদেশের সীমা ও পরিণাম ফল নিম্নোক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে;—

করতোয়া সমারভ্য যাবদ্দিকরবাসিনীং;
উত্তরে বটকী নাম্নী দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ।
তন্মধ্যে যোনিপীঠক নীল-পর্ব্বত-বেষ্টিতং
শত-যোজন-বিস্তীর্ণং কামরূপং মহেশ্বরি।"

শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশ এই সীমার অন্তর্ভুক্ত। উক্ত তন্ত্রে কামরূপের অন্তর্গত সপ্ত-পর্ব্বতের নামোল্লেখ-স্থলে প্রথমেই ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায়, যথা;—

"ত্রিপুরা কৈকিকাচৈব জয়ন্তী মণি-চন্দ্রিকা,
কাছাড়ী মাগধী দেবী অন্তামী সপ্ত পর্ব্বতাঃ।"

যোগিনী তন্ত্রের মতেও ত্রিপুরা, কামরূপের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সোনার রথ

আজ তাকে বিদায় করে দিয়েছি। ভারী ব্যথা পেয়েছে, বোধ হয়! পুরুষ মানুষ—তাই বোধ হয় কাঁদতে পারেনি। মুকুল চলে যাবার পরে আমি কিন্তু চোখের জল আট্‌কে রাখ্‌তে পারিনি। মনের মধ্যে কিসের আকুল ব্যথা যেন গুমরে গুমরে উঠ্‌ছিল, ওর যাবার সময়ের বিষাদ-ক্ষীণ মুখ দেখে। ওর পায়ের শব্দ মেলাতে না মেলাতেই আমি মুখ লুকিয়ে কেঁদেছি। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছি—অনেকক্ষণ ধরে। মা এসে যখন ডাক্‌লেন—আশা, ও কি, কাঁদছি কেন তুই?—কেঁদে কেঁদে বুকটা তখন হালকা হয়ে এসেছে। মাকে বল্লাম—কিছুই না মা, এমনি! মা বিশ্বাস কল্লেন কি না, কে জানে? খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে মা বেরিয়ে গেলেন।

ওকে যেতে বলে কেঁদেছি অনেকক্ষণ ধরে! তবু গ্রহণ করতে পারিনি ওর ওই সবল স্নেহ-প্রবণ প্রাণকে!......

বিদায় করে দিয়ে কি ভাল করেছি? বল্‌তে পারি না। মনে ত হচ্ছিল ভালই করেছি—ওকে যেতে বলে দেওয়াই বুঝি সব-চেয়ে ভাল পথ। বুড়োবয়সে বছরের পর বছর ধরে কাঁদার চেয়ে এখন কিছুদিনের জন্যে কাঁদা কি ভাল নয়? এখন ত কত ব্যথাই পাই আমরা—আবার ভুলতেও সেগুলো বেশী দিন সময় লাগে না। অতি-বড় ব্যথাও যৌবনের সব সারাবার ঢেউয়ের মুখে বেশীদিন আপনাকে জাইয়ে রাখ্‌তে পারে না। মুকুলকে হারাবার শোক এখন সয়ে যেতে বেশী দিন সময় লাগ্‌বে না। কিন্তু আজ যদি বুকের কান্নাকে থামাতে গিয়ে পেটের কান্নাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতাম, রক্তের গরম কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যখন পেটের ডাকটা ভারি তীব্র হয়ে উঠ্‌ত, তখন হয়ত অঝোর ধারায় নাম্‌ত। শীতল রক্তের সঙ্গে শীতল অশ্রুর সংযোগ যে সে সময়টাকে মধুময় করে তুল্‌ত না, সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে।

আমাকে চিরজীবন সুখী রাখতে পারে, তৃপ্ত রাখ্‌তে পারে—এমন কি আছে মুকুলের? তার অর্থ নেই, মান নেই! বিদ্যা খানিকটা আছে বটে, কিন্তু সেটা প্রভূত অর্থকরী নয়।

তবে একটা জিনিষ তার আছে—যা অনেকেরই নেই! সেটা হচ্ছে তার মস্ত-বড় হৃদয়! অমন প্রকাণ্ড দরাজ বুক আমি কারো দেখিনি! সেবার যখন কলেরার করুণ আহ্বানে হাজার হাজার সবল মানুষের বলিষ্ঠ হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যেতে লাগ্‌ল, সেই ভীষণ হাহাকারের মধ্যে সবার আগে যার ছবিটা চোখে পড়ত—সে মুকুল! কি অমানুষিক শক্তি নিয়ে ও কাজ করত সেই মৃত্যু-বিভীষিকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে! চারধারে কলেরার মারাত্মক বীজাণু, তার মাঝখানে মায়ের মত কোমল বুক নিয়ে ও সেবা করছে তাদের—যাদের মা-ভাই-বোনেরা কলেরার ডাকে কিম্বা ভয়ে সে দেশ থেকে সরে পড়েছে! প্রাণের ভয় ছিল না ওর এতটুকু। নিজের কথা ও ভাব্‌তই না! ওর কোলের উপর মাথা রেখে কত অভাগা মৃত্যু-দূতের আহ্বানে চোখ বুজেছে চিরকালের জন্য! দু'চোখ বেয়ে ওর জল ঝরে পড়েছে সেই মৃতের প্রতি করুণায়! আবার চোখের জল শুকোতে না শুকোতেই ও চলে গিয়েছে আর-এক মৃত্যু-পথের যাত্রীর পাশে, তার মৃত্যু-যন্ত্রণার সেবায় প্রলেপ দিতে।

সে সময় ও আমাকে ওর সঙ্গী হতে ডেকেছিল। বলেছিল—ও পুরুষ মানুষ! সব জায়গায় পুরুষ মানুষের সেবায় সেবা সম্পূর্ণ হয় না! আমি নারী—আমিও যেন আমার স্নেহ-হাতের স্পর্শ দিয়ে মৃত্যুক্ষীণ প্রাণীকে সজীব করে তুলি!

আমি জানি, একমাত্র আমাকেই ও ডেকেছিল ওর মহাকর্ম্মে যোগ দিতে! আমি যেতে পারিনি—যাই নি। কারণ আর পাঁচজনেরই মত আমার নিজের প্রাণটাকে আমি এতই ভালবাসি, যে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে পরের প্রাণ-উৎসর্গে বাহবা দিতে পারি! কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব হয়ে ওঠে না! প্রাণ-উৎসর্গের মধ্যে থেকে আমি আমাকে বরাবর দূরে রাখি!

মুকলকে তাই আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি—দূর থেকে! অত-বড় বিশাল হৃদয়ের কাছে মাথা যে আপনি নু'য়ে আসে।

কিন্তু ওকে স্বামীরূপে পেতে আমার সাহস হয় না! শক্তিও আছে কি না, জানিনা!

তাই আমার কানে যখন ওর সেই অনেক দিনের আশার বাণী ঢেলে দিয়ে আমার কাছে তার পরিপূর্ণতার বর চাইলে, আমি কোনমতেই বল্‌তে পারলুম না—হ্যাঁ-গো-হ্যাঁ, আমিও তোমার এই বল্‌বার প্রতীক্ষাতেই বসে আছি! না—ওকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারবোনা। আমি জানি শুধু দুটো মুখের কথায় সুখে থাকা যায় না—কারণ ওতে পেট ভরে না! অথচ শুধু মুখের কথায় তৃপ্তি দেওয়া ছাড়া ওর আর বেশী কিছু দেবার শক্তি নেই যে। আমি নিজে সুখী হতে চাই—খুব বেশী রকমেই সুখী হতে চাই। আর নিজে সুখী হতে চাই বলেই আজ মুকুলকে সুখী করতে পারলাম না। নিজেও কিছুক্ষণের জন্য একটা অতৃপ্তির ছায়া বরণ করে নিয়েছি!

মুকুল! মুকুল! বেশ নামটি! নিজেও ত সে নামের চেয়ে কোন অংশে কম ভাল নয়! তবু ওকে আমি আমার বলে বরণ করে নিতে পারি নি! ওকে বিদায় করে দিতে হয়েছে ওর হাতে আমাকে সঁপে দিতে পারি নি!

আমার হৃদয় যাকে বরণ করে নেবে, সোনার আংটি হাতে দিতে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে না, বন্ধনের ভয়ে। সোনার বাঁধনে-বাঁধা ঘোড়ায়-টানা সোনার রথে চেপে সে আমার হৃদয় জয় করতে আস্‌ছে! তার সোনার রথের সোনার ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে!

যখন সে এসে পৌছুবে, তখন এই অন্যায় বিচ্ছেদ-ব্যথা দূর করে হৃদয় আমার তাকে বরণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বে!

শ্রীসোমনাথ সাহা।

মেয়েদের মানুষ হওয়া

মেয়েরা মনুষ্যত্ব লাভ করিবার সুযোগ পাইলে এতকাল পরে তাঁহারা আপনাদের জন্ম-গত অধিকার পাওয়ায় তাঁহাদের প্রতি ন্যায় বিচার ত হইবেই, তা ছাড়া কতদিক দিয়া যে পৃথিবীর মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা সে কথা বলা যায় না। আইন, লোকাচার, দেশাচারের বাধা দূর হইয়া প্রকৃত স্বাধীনতার হাওয়ায় শিক্ষিত বর্দ্ধিত হইতে পারিলে তাঁহাদের সর্ব্বত্র যাতায়তও সহজ, স্বাভাবিক হইতে পারিবে। তখন তাঁহারা সকল স্থানেই আপনার স্বামী, পুত্রের সঙ্গী হইতে পারিবেন; এখনকার মত তাঁহাদের বোঝা-স্বরূপ থাকিতে হইবে না। সুতরাং যে সকল কাজে এখন পুরুষদের একা যাইতে হয়, সে সকল কাজেও তাঁহারা সঙ্গে যাইতে পারিবেন ও তাঁহাদের দ্বারা প্রকৃত সাহায্যও হইতে পারিবে। এমন কি ভবিষ্যতে বিবাহ একরূপ কার্য্যকারী স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই বেশী হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং স্বামী, স্ত্রী দুই জনেই অধিকাংশ-স্থলে একসঙ্গে কাজকর্ম্মও করিতে পারিবেন। তাহা ভিন্ন নূতন উপনিবেশ ইত্যাদি যে সব স্থলে এখন মেয়েদের যাওয়া অনেকটা বন্ধ আছে, সে সকল স্থানে তাঁহারা যাইতে পারিলে ঐ সকল স্থানের নৈতিক হাওয়াও যে কতকটা ভাল হইবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই সেদিন Statesman পত্রে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ-সমূহে বৃটিশসাম্রাজ্য রক্ষা করিতে যে সকল শ্বেতাঙ্গ পুরুষপুঙ্গবের আগমন হইয়া থাকে, তাঁহাদের নৈতিক অবস্থার কথা কি নির্লজ্জ ভাবেই না প্রকাশিত হইয়াছে! ঐ সকল পুরুষের সহিত শ্বেতাঙ্গ নারীগণও আসিতে পারিলে যে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা তাঁহারাও স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাদের নিজদেশেও অতিরিক্ত নারী-সংখ্যা এতটা সমস্যার কারণ হইয়া উঠিতে পারিত না। সর্ব্বত্রই একজাতীয় স্ত্রী-পুরুষ সমান সংখ্যায় থাকিলে নৈতিক চরিত্র ঠিক থাকিতে পারে। এখন তাহার অভাবে সকল স্থানেই

যে কি বিসদৃশ অবস্থা ঘটে, যে কোন স্থানের বিষয় অনুসন্ধান করিলেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকলই অত্যন্ত পরীক্ষিত ও জানা কথা। কিন্তু মেয়েদের অবস্থা এমনই করিয়া রাখা হইয়াছে, যে তাঁহাদের কোথাও যাওয়া, আসা বা থাকা কিছুই সহজ ব্যাপার নয়। অথচ আবার ঐ নারীজাতির একাংশকে পুরুষের লালসা-নিবৃত্তির জন্য নিযুক্ত রাখিয়া ঘরে-বাহিরে তাঁহাদের দ্বারাই নারীর সর্ব্বনাশ সাধন করা হইতেছে! অধীন-দেশের লোককে তাহাদেরই বিরুদ্ধে নিযুক্ত করার সহিত ইহার কেমন সাদৃশ্য দেখা যায়!

তার পর শ্রমিকদের খরচে ধনিকদের একতরফা লাভের চেষ্টায় তাঁহারা তাহাদের নীতি, ধর্ম্ম, সুবিধা, অসুবিধা কোন-কিছুর দিকেই এতদিন চাহিতেন না। এখন শ্রমিকদের অভ্যুদয় হইলে সকলের মধ্যেই মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া চলার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঠিক এক রকম না হইলেও শ্রমিকদের যথার্থ মূল্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে মেয়েদের সম্বন্ধেও ন্যায়-বিচার হওয়ার আশা করিতে পারা যায়। কারণ তাঁহারাও এক প্রকার শ্রমিক। তাহাদের স্নেহ ও প্রেমের মূল্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহারা এতদিন প্রাণপাত পরিশ্রমে দিনরাত যে খাটিয়া আসিতেছেন, বক্তৃতা দিবার সময় যতই বলা হউক তাহার মূল্য তাঁহারা এতদিন কিছুই পান নাই। তাহাতে তাঁহাদের অধীনতা, পরমুখাপেক্ষিতাও এতটুকু ঘোচে নাই। বাস্তবিক শ্রমিকদের অধিকার-প্রতিষ্ঠার সহিত যে সকল নূতন রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী মনীষীদের কল্পনা হইতে ক্রমেই কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে, তাহার সহিত নারীর মূল্যজ্ঞান ও মনুষ্যত্ব-প্রতিষ্ঠাও অপরিহার্য্যরূপে জড়িত। নারী বাহিরে আসিলেই তাহার চরিত্র মন্দ হইয়া যাইবে বলিয়া তাহার একাংশকে ঘরে চাবি দিয়া অপরাংশকে আপনাদের কু-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া পৃথিবীতে যে অস্বাভাবিকতা ও দুর্নীতির স্রোত বহিয়াছে, তাঁহারা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগ পাইলে তাহা যে ক্রমেই কমিয়া আসিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। অসভ্য অবস্থায় ইহা ততটা টের পাওয়া যায় না। বাস্তবিক অসভ্যদের মধ্যে এ রকম অস্বাভাবিকতা নাইও। কিন্তু সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত যখন নারীজাতির অবস্থার উন্নতি না হইয়া তাহাদের বিধি-নিষেধের ব্যবস্থাই উগ্রতর হইয়া উঠিতে থাকে, তখন যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়, এ-পর্য্যন্ত সকল সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেই তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। সকল প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসেই দেখা যায়, মেয়েদের সম্বন্ধে উত্তরোত্তর যতই কঠোর ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে কোণ-ঠেসা করা হইয়াছে, ততই তাঁহারা—যতই স্নেহপরায়ণ হউন না কেন—শিক্ষা, সহবৎ, ভূয়োদর্শন, ললিতকলার চর্চ্চা ইত্যাদি সকল প্রকার মনুষ্যত্বে বঞ্চিত হইয়া শিক্ষিত পুরুষের মন যোগাইতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের নর-নারীর স্বাভাবিক মনের আদান-প্রদান ও সাহায্যের জন্য আর-এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল স্ত্রীলোককে সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত মনোরঞ্জিনী কলা দুই-চারিটি শিখাইয়া যতই চকচকে করিয়া লওয়া হউক, তাহারা পুরুষের ভোগ্যবস্তু মাত্র থাকিয়া কেবল দুর্নীতির স্রোতই বাড়াইয়া চলিত।

নারী সম্বন্ধে এই ঘোর অস্বাভাবিকতা ও অন্যায়ই যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সভ্যতার ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ, তাহা ক্রমেই স্বীকৃত হইতেছে। আমাদের দেশে নাগরিক-চর্য্যার মধ্যে এই ভাবের ব্যবস্থাই ছিল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহার অবশেষ আমাদের দেশে এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। পাশ্চাত্য দেশে কেহ কেহ যে মেয়েদের বিবাহ ও সন্তান-জন্ম এবং জীবনের সাহচর্য্য এই দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ করিয়া এই দুই ভাগে পুরুষের বহু-বিবাহের কথা বলেন, তাঁহাদের মত (doctrine) এই প্রাচীন প্রথার নব্য-সংস্করণ মাত্র। বাস্তবিক মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষদের স্পর্দ্ধা ও অন্যায়াচরণের সীমা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়! তাঁহাদের ঐ দুই ভাবেই নারীকে প্রয়োজন,—অথচ তাঁহাদের পূর্ণ মনুষ্যত্বের সুযোগ দিয়া একাধারে এই দুই বিষয়ের উপযোগী হইতে দিবার ইচ্ছা নাই! কারণ তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের করতল-গত হইয়া সকল রকমে কেবল তাঁহাদের ন্যায়ান্যায়-বাসনা ও খেয়ালের বশে চলিতে চাহিবেন না।

যাহা হউক, নারী-জাতির মনুষ্যত্ব-লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিকৃত সংস্কার ক্রমে ঘুচিতে পারিবে, আশা হয়। ইহাতেও প্রাচ্য-নারীদের জাগরণের আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে। তাঁহারা পাশ্চাত্য নারীদের সহিত মিলিতে পারিলেই পৃথিবীতে নারী-সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়া সমস্ত জগতের কল্যাণ সহজে সাধিত হইবে। বাস্তবিক নারীর উন্নতিতে যে পুরুষেরও প্রকৃত উন্নতি, এই সহজ সত্য মনে রাখিয়া সকলে মিলিয়া একত্রে মানব জাতির এই কলঙ্কজনক অন্যায় ব্যবস্থা দূর করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হওয়া উচিত। পুরুষের ইহা মনে রাখা উচিত, মনোবৃত্তির সকল বিভাগে তাঁহার এত উন্নতি-সত্ত্বেও নারী-সম্বন্ধীয় সংস্কারে কেন তিনি এ পর্য্যন্ত বর্ব্বর যুগের অবস্থা হইতে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই? নারীকে আপনার সমধর্ম্মী মানুষ মনে না করিয়া আপনার সুখ-সুবিধার উপকরণ হিসাবে দেখাই ইহার কারণ নয় কি? নারীর প্রতিষ্ঠা ভিন্ন পুরুষ ক্রমোন্নতিশীল সভ্যতার পথে কখনই চলিতে পারিবেন না। তাহা একপাশে ভারী হইয়া কাৎ হইয়া পড়িবেই, এবং তাঁহার অস্তিত্ব যদি নারীর অনুগ্রহেই লোপ না পায়, তাহা হইলেও আবার বর্ব্বরতার যুগ হইতে নূতন যাত্রা সুরু করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ইহাই শিখাইতেছে। আমাদের দেশের সভ্যতাই এ-পর্য্যন্ত কালের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে বলিয়া আমরা গৌরব করি বটে, কিন্তু আমরা যে-ভাবে আছি—তাহা কি খুব গৌরবের? কোন মতে টিঁকিয়া থাকাই অবশ্য মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় লক্ষ্য নয়,—বরং বিশেষ একটী নামে মার্কামারা না হইয়াও যদি জগতের জ্ঞান ও সত্যের ভাণ্ডারে নব-নব রত্ন আহরণ করিয়া চলিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে সভ্যতার বিনাশ হইতে পারে না।

বাস্তবিক মানুষের জ্ঞান চক্ষু যতই খুলিতেছে, ততই সে বুঝিতেছে, বিজ্ঞতার উপদেশ যাহাই হউক, তাহার প্রকৃতির বিশুদ্ধতম অবস্থায় সে যাহা ভাল মনে করে, তাহাই তাহার পক্ষে যথার্থ করণীয়। জগতের প্রকৃত মঙ্গলের সহিত তাহার যোগ থাকিবেই। নর-নারী উভয়েই যখন বিধাতার সৃষ্টি, তখন উভয়ের কি হওয়া উচিত, অনুচিত, তাহা তাঁহাদের আপন-আপন শিক্ষিত স্বাধীন মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেককে সেই পরমেশ্বরের কাছে মাত্র দায়ী থাকিবার ব্যবস্থা রাখা উচিত। উন্নততর রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় অবশ্য স্বাধীনতার সহিত শিক্ষা, সংযমের আবশ্যকতাও বাড়িয়া চলিবে, তাই তাহাতে ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতাও যেমন, প্রত্যেকের কাছে রাষ্ট্র, সমাজের দাবীও সেইরূপ গুরুতর হইতে থাকিবে।

পরিশেষে বলিতে হয়, নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত রাখিতে যখন বিধাতার কাছ হইতে পুরুষ কোন সনন্দ পান নাই, তখন তাহাতে যে তাঁহাদের অধিকার নাই, এই স্পষ্ট সত্যটী মনে রাখিয়া নারী ঐগুলি পাইলে নারীই থাকিবেন, না, পুরুষ হইয়া যাইবেন, তাহার ভার তাঁহার ও তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার উপর দিলেই ভাল হয়!

বঙ্গনারী।

জল-স্রোত

ভালোবাসি জল স্রোত ধারা,
মুক্তি তার শক্তি তার কল-ভাষা অনিবার
কি মোহিনী জানে প্রাণ-কাড়া!
হোক্ স্বচ্ছ হোক্ ঘোলা প্রাণের কি ছন্দ দোলা
তারি মাঝে রয়েছে কেবলি,
মুখর আবর্ত্তে ঘিরে যেন হাসে ফিরে-ফিরে,
বুদ্বুদের বারতা, কি বলি?
কোথা উৎস গোমুখীর কোথায় পয়োধি ক্ষীর
অনাদি খুঁজিছে অন্তহীনে,
চির-তৃষিতের মুখে, চির-পিপাসার বুকে
শান্তি নাই সম্মিলন বিনে!

পাবনী সে সলিলের লীলা,
শঙ্খ-নাদে ডাক দিয়া ভগীরথ যায় নিয়া
সিন্ধুধারা যেথায় সুনীলা!
মৃত্যু যেথা নিদ্রা-হীন দিগন্ত সীমায় লীন
যুগান্তের কঙ্কাল যেথায়,
তাহারি পঞ্জর ভরি নব-যুগ তোলে গড়ি
প্রবালের অরুণিমা তায়!
মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্রে জাগায় নূতন তন্ত্রে,
পুরাতন কলুষ নাশিয়া,
তমসার অবসান, জেগে ওঠে অংশুমান
চিরন্তন হাস্যে উদ্ভাসিয়া!

গলে-পড়া বিন্দু গুটিকত,
মরে টলমল কবে,' টল-টলে প্রাণ ভবে'
জীবনের রসায়ন যত,
গাহনে নূতন তনু পরিশুদ্ধ প্রতিঅণু,
অশ্রুঝরে ব্যথা অবসান,
নামে বর্ষা নীলিমায়, বসুধার ত্রিসীমায়
হয়ে যায় তৃষ্ণার আশান!
মুঞ্জরিয়া শুষ্ক-তরু তৃপ্ত করি তপ্তমরু
মুখরিয়া স্তব্ধ নদ-নদী
কিশলয় কলরবে উৎসব আনিয়া ভবে
বহিয়া চলেছে নিরবধি!

বিন্দু-মাঝে সিন্ধুর শকতি
ঐরাবতে করি হেলা করে সে খেলার-খেলা,
স্বর্গে মর্ত্যে সম-মতিগতি॥
বহু তপস্যার ধন বহু যুগ আরাধন,
পূজার ষোড়শ উপচার,
আল্‌গোছে তাই নিয়ে যে আছে, ভাসায়ে দিয়ে
নিমেষে, করে সে সুবিচার।
যমুনার জল কালো, বড়ই বাসিয়া ভালো,
বুকে তার জড়াইয়া ধরে
গরলের নীল-দোষ তরলের ঈর্ষা রোষ
প্রেম দিয়ে সাদা-সিধা করে।

ইন্দু-মৌলি রেখেছে মাথায়,
রজত গিরির ধারা তরল মুকুতা পারা,
গান গেয়ে চলে জোছনায়,
আগম, নিগম, বেদ, মিটায়ে মনের খেদ,
তারি মাঝে রাখিয়াছে সুর,
তরঙ্গের বাঁধা তারে বাজি ওঠে বারে বারে।
তানপুরা গভীর মধুর!
জীবনের সব কথা সব ব্যথা ব্যাকুলতা
সব সুখ সব দুঃখ তার,
সেই সুর সেই লয়, তাহারি মাঝারে লয়
মরমের সব বারতার॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সঙ্গীতের পথ

পুঁথি-লেখা থেকে পুঁথি-গাঁথা পর্য্যন্ত যে চৌষট্টি কলা-বিদ্যা, গীত-কলা হল তারি একটা। কলা-বিদ্যা বিশেষ ভাবে যাঁরা চর্চ্চা করেছেন তাঁরাই বলবেন যে-কটা কলা-বিদ্যা আছে তার মধ্যে সঙ্গীতই প্রধান;—'গানাৎ পরতরং নহি' এ কথাটা বলাও চলে। কিন্তু আজ যদি আমাকে কেউ শুধোয়, এই যে এত বড় সঙ্গীত-বিদ্যা—এটা এখনো তোমাদের দেশে আছে না গেছে, তবে সত্যের মর্য্যাদা যদি রাখতে হয় তো আমাকে বলতেই হবে—নহি নহি গেছে গেছে চুলোয় গেছে—জাহান্নমে গেছে! জীবনে যৌবন একবার আসে, সেই কালটা কাটিয়েছিলেম—এই তথা-কথিত ভারত-সঙ্গীতের সন্ধানে, খুঁজে পাই নি। এই সঙ্গীতের যে রূপ তখন আমার চোখে পড়েছিল

আজও সঙ্গীত সেই রূপেই চির-যৌবনা মায়া-মৃগের মতো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেই হরিণীকে ধরার ফাঁদ সে দিন কোনো ওস্তাদ আমায় দিতে পারি নি, আজও কেউ দিতে পারে কি না সে বিষয়ে বাস্তবিকই আমার সন্দেহ আছে। সঙ্গীত-পারিজাত—পুঁথির কাগজে যেটা কাগজের ফুলের মতো ধরা রয়েছে—সেটাকে দখল করা অত্যন্ত সহজ আর সামান্য কাজ, কিন্তু নন্দন-বনের যে পারিজাতের মধ্যে থেকে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ সুর হয়ে বেরিয়ে আসে, তাকে আহরণ করে আনা এই পৃথিবীতে, সে যে সাধনার কর্ম্ম নয়, এটা কে না বল্‌বে! কিন্তু সঙ্গীত-চর্চ্চার যে কটা রাস্তা এ দেশে দেখ্‌ছি তার একটা রাস্তাও কি চলেছে ঠিক দিকে? বল্‌তেই হবে—নহি নহি একশোবার নহি! ওস্তাদের কাছে গেলেই প্রথমে সে বলে বসে—এখন কিছুকাল গলা সাধো, তারপরে গান। প্রথমেই টুঁটি চেপে ধরা! কাজেই লোক যে গানের দিকে এগোতেই ভয় পাবে তা আশ্চর্য্য নয়! থিয়েটারের গান একথা বলে না; সে বলে—শোনো, ইচ্ছে হয় যেমন খুসি গেয়ে যাও বাধা নেই; কাজেই যার একটু গানের সখ আছে, সে একটা হারমোনিয়াম্ নিয়ে প্যোঁ-প্যোঁ, নয় তো ফ্লুলুট্ কিনে পোঁ-পোঁ সুরু করে দিয়ে আনন্দে বাস করে। গানের ওস্তাদ যে ভোরে উঠে গলা সাধতে বসে এবং সভায় বসেও সেই কাজ করে তার চেয়ে সাধারণ লোক সময়-অসময়ে হারমোনিয়াম্ আর ফ্লুলুট্ সেধে যে কিছু কম আনন্দ পায় এবং পাড়াপড়সীকে কম ভোগ ভোগায় তা নয়; কিন্তু যারা এই দুই দলের কাছ থেকে তফাৎ আছে তারাই বোঝে—দুই দলের কেউ পায় নি সুরলোকের সুর-তরঙ্গিণীর একটি ফোঁটাও।

ঔরঙ্গজেব বাদসা গানের টুঁটি চেপে একদিন যে মারতে চেয়েছিল, তার মধ্যে অনেকখানি সত্যি যেটা লুকিয়ে আছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না! বাদসার মতো বাদসা স্পষ্টবক্তা ঔরঙ্গজেব! গানে হয় তো বাদসার আপত্তি ছিল না কিন্তু গান উৎপাত হয়ে উঠলে সে সইবে কেন? ঘাড় ধরে বিদায় করে দিলে গানকে! যে গান শুনি সাপকেও বশ করে, সে গানের এমন ক্ষমতা হয় নি তো সেদিন মোগল-বাদসাকে সুরের জালে বন্দী কর্‌তে! কারু হাতে সে মায়া-জাল থাক্‌লে তো? ঔরঙ্গজেবকে গানের দুর্দ্দশার মূল বলে নির্দ্দেশ করা বিষম ভুল। গানের দুর্দ্দশা গাইয়েদের হাতেই হয়েছিল অনেক পূর্ব্বে, সুচতুর ঔরঙ্গজেবের সেটা জান্‌তে এক লহমাও দেরী হয় নি এবং সেটা গাইয়েদের জানিয়ে দিতেও সে একটুও ইতস্ততঃ করে নি;—কেন না সে ছিল বাদসার মতোই বাদসা। এখনকার জনসাধারণ আমরা ওস্তাদি গানের সম্বন্ধে বাদসাহি না পেয়েও যা বিচার কর্‌ছি তার চেয়ে সত্যিকার বাদসা যে বেশী অবিচার করেছিল তা তো নয়! ঘরের মধ্যেটাই আমাদের দখল, সেখানের ত্রিসীমানা থেকে ওস্তাদের নির্ব্বাসন আর দিল্লীর সব ঘরগুলো যার দখলে সেই সাহা-দরবার থেকে নির্ব্বাসন একই! এখন এই কারণে বাদসাকে বা জনসাধারণকে বেরসিক মূর্খ ইত্যাদি যদি গানের ওস্তাদের দিক থেকে বলা হয় তবে দু-জনের উপরেই ওদিক থেকেও খুব যে সু-বিচার করা হবে তা বলা যায় না। কবিরাজ যখন দেখেশুনে আত্মীয়-স্বজনের গঙ্গা-যাত্রার ব্যবস্থা করেন তখন কবিরাজকে যে অত্যন্ত অবোধ সেও গাল পাড়ে না তো!

সব-চেয়ে বড় যে কলা-বিদ্যা আমাদের দেশে সব-চেয়ে দুর্দ্দশা হ'ল তারই—আমাদের পক্ষে এটা অত্যন্ত লজ্জা আর দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই, এবং সেই লজ্জা দূর কর্‌তে সাধারণতঃ বাংলা দেশের লোকেরা সঙ্গীতের লুপ্ত গ্রন্থ সকল উদ্ধার, সঙ্গীত-বিদ্যালয় ইত্যাদি কাজের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে সব-প্রথমেই যে অগ্রসর হয়েছেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাক্‌তে পারে না কারু মনে, কিন্তু এ সত্ত্বেও বলতেই হয় আলমগীরের আমলে যে-সঙ্গীত মরেছিল আজও সে পূর্ণ-জীবন পেয়ে ফিরে আসে নি। শত শত বৎসর, শত শত জীবন এই সঙ্গীতের শিখা জ্বালিয়ে রাখ্‌তে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছে কর্‌ছে—সময়ে-সময়ে কালে-কালে, কিন্তু তবু নেমে গেছে সঙ্গীত ধাপে-ধাপে ঔরঙ্গজেব যে কবরটা দেখিয়েছিল তারি দিকেই। এত-বড় বিদ্যা সে বাঁচতে পারে নি এদেশে যে কেন, তার কারণ আছে। ইতিহাস থেকে তার সাক্ষ্য পাচ্ছি। মুনি-ঋষি কিম্বা দেবতা, যাঁরা এই সঙ্গীতের স্রষ্টা, তাঁদের সাক্ষ্যমঞ্চে টেনে আনতে চাইনে,

কেন না মানুষ যে ভুল করে তার উপর তাঁরা; কিন্তু তানসেন যাঁকে সঙ্গীতের দ্বিতীয় স্রষ্টা বল্লেও বলা যায় তাঁর জীবনের ইতিহাস যে সঙ্গীতের অধঃপতনের মূল কারণ নির্দ্দেশ করছে সেটা পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্ছি।

হরিদাস স্বামী যে-নির্জ্জনে সাধন-ভজন কর্‌তেন সেই নির্জ্জনে তানসেন বিদ্যার সঙ্গে পরিণীত হলেন। তাপস-কন্যা সঙ্গীত, তাঁকে পেলেন তানসেন কিন্তু তাঁকে নিয়ে এলেন তপোবন থেকে আগ্রার প্রাসাদের রং-মহলে বাঁদিগিরি করতে আর তাঁর গুরু রইলেন বসে সেই দরবারে যে দরবারের রাজাকে গান শুনিয়ে শুধু আনন্দই পাওয়া যায়—মণি-মুক্তা এবং ক্ষণিক সমস্ত বাহবা ও বাহারের সামগ্রী নয়। তানসেনের অদৃষ্টে ঠিক এর উল্টোটা ঘট্‌লো। সঙ্গীত তার ঘরে এসে মণি-মুক্তা ঐশ্বর্য্যে এমন ঝক্‌মকে হয়ে উঠলো যে দীপক-রাগের দীপ্তিও তার কাছে হার মান্‌লে, তানসেনের সঙ্গীত যেখানে-সেখানে বিনা মেঘেই দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা হাজার বাহবা বৃষ্টিও করে গেলেন কিন্তু যে অমৃত-রসবিন্দু পেয়ে সঙ্গীত কালে-কালে মানুষের প্রাণের মধ্যে সজীব হয়ে বর্ত্তমান থাক্‌বে সেই নির্ঝরের মুখে সোনারূপা, বাহবা ও বাহারের আবর্জ্জনা স্তূপাকার হয়ে জমা হয়ে চল্লো দিনে-দিনে—এক বাদশার আমল থেকে অন্যের আমলে!

ঔরঙ্গজেব সঙ্গীতের মধ্যে যে সত্য-সুরের সাড়া পায় নি তার মধ্যে সত্যি অনেকখানি আছে। সোনার সঙ্গে খাদ মিশতে-মিশতে একদিন যেমন সেটা রাং হয়ে পড়ে, তেমনি সুরের নিত্যতার মধ্যে মানব-মনের নীচতার খাদ মিশতে-মিশতে সুরময় কেবল স্বর-আলাপ নয় আবাবে যখন সেটা পরিসমাপ্ত হ'ল একদিন, তখন তাকে নিয়ে কি লাভ?—এই কথাই ঔরঙ্গজেব বলতে চেয়েছিল। মরা সোনাকে যতই মেজে-ঘসে পালিস কোরে ধরা যায়, ততই পরিষ্কার প্রমাণ হয় সেটা সোনা নয়; বরং মাটির মধ্যে পিতলও যখন ঝক্‌ঝক্ করে তখন সেটার একটা সোনার মোহ সঞ্চার করার পন্থা থাকে, কিন্তু সেটাকে সোনা বলে জোর কোরে বাজারে খাড়া কর্‌তে চাইলে মূর্খ ছাড়া কাউকে সে ঠকাতে পারে না।

যে বিদ্যাই বল না কেন, গুরু তার জনক; এবং বর যেমন কন্যাকে বহন করে ঘরে আনে, ছাত্র তেমনি বিদ্যাকে অর্জ্জন করে আনে এবং সেই ছাত্রকেই বলা হয় বিদ্বান্ বা কলাবিদ। সুতরাং বিদ্বানের সতী-স্ত্রী হলেন বিদ্যা। ভার্য্যার সঙ্গে ভর্ত্তার, ভর্ত্তার সঙ্গে ভার্য্যার যে পরম এবং নিত্য সম্পর্ক, বিদ্বানের সঙ্গে বিদ্যার ঠিক সেই যোগাযোগ, সুতরাং সতীবিদ্যা—তাঁকে দিয়ে যদি কেউ উদর পূরণ করার মতলব করে তবে বিদ্যা তাতে আপত্তি করেন না, দাসিগিরি ভিক্ষাবৃত্তি সব করাতে পারো তোমার জন্যে বিদ্যাকে দিয়ে, তাতে বিদ্যাকে ক্ষুণ্ণ করা হয় না—কেন না সে যে সতী। কিন্তু এই অন্যায়ের ফলে, দুর্দ্দশার তাড়না-তাচ্ছিল্য সমস্ত তাকেই ভোগ করতে হয়, যে বিদ্যাকে অপমানিত করে—পরমুখপ্রেক্ষার লাঞ্ছনা দিয়ে।

দিনে-দুপুরে সহরের রাস্তায় এটা আমরা প্রায়ই দেখি স্ত্রী-পুত্র গান নাচ কোরে দ্বারে-দ্বারে ফিরছে, পুরুষটা তাদের পিছনে পিছনে কেবলি পয়সা আদায় করে চলেছে একে বলে বিদ্যা বিক্রয়! সঙ্গীত-বিদ্যাকে এই দাসী-হাট থেকে আমাদের ঘরের মধ্যে হৃদয়-সিংহাসনে যতদিন না বসানো হবে ততদিন যে-ভাবে চলেছে এই ভাবেই সঙ্গীত একটা যাদুবিদ্যার দ্বারায় চাঙ্গা-করা মড়ার মতো অত্যন্ত অদ্ভুত তামাসা-আকারে ঘুরে বেড়াবে—এদেশে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যখন বিবাহের সময় বর কন্যার পাণিগ্রহণ করে তখন বরকে অনেক দেবতা সাক্ষী রেখে অনেকগুলো শক্ত-শক্ত প্রতিজ্ঞা করতে হয়। গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা নেবার সময় গুরু না বল্লেও একটা কথা শিষ্য পালন করবে তা গুরু আশা করে থাকেন; সেটা আর কিছু নয়—এই বিদ্যাকে শিষ্য সযত্নে রক্ষা করবেন, মলিন ও ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না এবং উপযুক্ত চর্চ্চার দ্বারায় এই বিদ্যাকে ফলবতী কোরে তুলে ছাত্র থেকে ছাত্রের মানুষ থেকে মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করবেন। তাপসীকে এনে তানসেন বিলাসের দাসী করলেন, তাতে করে হ'ল এই যে, সঙ্গীত-বিদ্যার পক্ষে সেইদিন থেকে স্বাধীনতা পাওয়া মুস্কিল হল; ফরমাস খাটতেই আরম্ভ করলে এই বিদ্যা—বাদসা থেকে আরম্ভ কোরে বৈটকখানার বাবুদের পর্য্যন্ত! সেই একের ভুল, তার ফল হয়ে উঠল অনেকখানি ভয়ানক! ওমরাহদের সখের

মতো গড়ে উঠলো সঙ্গীত—ওস্তাদের মনোমতো নয়; গান হয়ে উঠলো জানের খোরাক নয়, রোজের নান্‌রুটি বা জলপান! এতে করে ওস্তাদ সে নিজেই যে বঞ্চিত হ'ল তা নয়, দেশশুদ্ধ আস্তে-আস্তে সঙ্গীতের যথার্থ রসে বঞ্চিত হয়ে গেল।

সাত সুর সাত বর্ণ সপ্ত ছন্দের অতি বিচিত্র নির্ম্মিতি যে-সকল বিদ্যা, তাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে; সুতরাং হৃদয়-হারী যে-সব পন্থা, তাই দিয়েই এ-সব বিদ্যাকে বশে আন্‌তে হয়;—হুকুম কোরে ধুমধাম হাঁক-ডাক কোরে হবার জো নেই। তা যদি হতো তো এতদিন কোন্ কালে সঙ্গীত-ছবি-কবিতার ত্রিবেণী ঘরে-ঘরে বিরাজ করতো! তা হয় না। এরা ঋষিদের মানস-কন্যা, এদের তপস্যার দ্বারায় বরণ করে ঘরে আন্‌তে হয়, সেই তপস্বী কচিৎ কোনো যুগে শ্রীচৈতন্যের মতো একটিবার দেখা দেন চোখের-জলে-মেশা সুরের স্রোতে দেশ-বিদেশ ভাসিয়ে; তাঁরাই মিলিয়ে দেন কালে-কালে চকিতের মতো এসে—বিশ্বে যে আহত এবং অনাহত ধ্বনি উঠছে নিত্যকাল, তারি সুরে মানব-আত্মার সুর; সেই সুর রেশ দিয়ে চলে পৃথিবীতে অনেকদিন পর্য্যন্ত, তারপর সে রেশ যখন মিলিয়ে যায় অনাহতের মধ্যে, তখন নতুন যোগী আসেন আহতের সঙ্গে অনাহতের নতুন পরিণয় ঘটাতে। সুতরাং এ-কথা নিশ্চয় বলছি—সঙ্গীতকে পেতে হবে নতুন কোরে তপস্যা দ্বারায়, গলাবাজি কারসাজি কোরে নয়, লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার কোরে অথবা তানসেনের হুবহু নকল কোরে এবং সাহা-দরবারের পুনরাবৃত্তি করে নয়—কিছুতে নয়,—নহি নহি নহি। "Music is so elevated that it is beyond the reach of the intellect." (Goethe)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্কলন

নৌকা

মানবজাতির ধরাধামে আবির্ভাবের পর হইতেই নৌকার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় জল-প্লাবনের বৃত্তান্ত প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীরই প্রায় স্বীকার্য্য; এবং নৌকায় চড়িয়া প্রাণিবর্গের আত্মরক্ষার পৌরাণিক বৃত্তান্তও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর গ্রন্থেই স্থান পাইয়াছে। মৎস্যপুরাণে মৎস্যের সঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া তাহাতে জীবনিবহের রক্ষার ব্যবস্থা মৎস্যরূপী ভগবান্ নিজেই করিয়াছিলেন। প্রকারান্তরে এই কথাটা বাইবেলেও গৃহীত হইয়াছে। ঔণাদিক প্রক্রিয়ানুসারে নিষ্পন্ন নৌ-শব্দও পদার্থটির প্রাচীনতা ঘোষণা করিতেছে, সুতরাং উহার প্রাচীনতা স্থাপনের জন্য প্রমাণান্তর প্রদর্শন অনাবশ্যক।

আমরা কেবল ইহার শ্রেণী বিভাগ এবং তদনুযায়ী আকৃতির বিবরণ প্রভৃতি সংগ্রহের চেষ্টা করিব।

নৌকা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। তন্মধ্যে যাহা নদ-নদী খাল বিল প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার সাধারণ নাম সাধারণ নৌকা, এবং যাহা সমুদ্রে ব্যবহারের যোগ্য তাহা মহা-নৌকা বা পোত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রামায়ণে "মহানৌ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহার্ণবে ব্যবহার্য্য নৌকা "পোত" নামে অভিহিত হইয়াছে। নৈষধ কাব্যেও পোত-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

দণ্ডীর দশকুমার চরিতে উহা "প্রবহণ" নামে কথিত হইয়াছে। যাহারা পোতে অর্থাৎ জাহাজে চড়িয়া বাণিজ্য করে, তাহারা পোত-বণিক এবং সাংযাত্রিক নামে অভিহিত হইয়াছে। যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদোক্ত চারি প্রকার বৃক্ষের কাষ্ঠ নৌকার উপাদান বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত চারি প্রকার কাষ্ঠ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে যে কাষ্ঠ লঘু, কোমল ও সুঘট (যাহা সহজে অন্যের সহিত যোড়া লাগে) তাহা ব্রাহ্মণ জাতি। যাহা দৃঢ়, লঘু ও অঘট (সহজে যোড়া মিলে না) তাহা ক্ষত্রিয় জাতি। যাহা কোমল অথচ গুরু তাহা বৈশ্য জাতি। এবং যাহা দৃঢ় ও গুরু তাহা শূদ্রজাতি। যদিও কাষ্ঠের চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি নৌকা নির্ম্মাণে ভোজের মতে কেবল ক্ষত্রিয়-জাতি কাষ্ঠ ব্যবহার্য্য এবং অন্যান্যের মতে লঘু ও সুদৃঢ় কাষ্ঠ ব্যবহার্য্য।

বিভিন্নজাতি কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত নৌকা সুখকর এবং মঙ্গলদায়ক হয় না। উহা জলে ডুবিয়া যায়। অথবা অল্পকাল মধ্যে জীর্ণ হইয়া

ভাঙ্গিয়া যায়। গ্রন্থকারের উক্ত হইতে ইহাও বুঝা যায়, সেকালে সমুদ্রগামিনী নৌকাকে লৌহের দ্বারা বাঁধান হইত না, কারণ সমুদ্রস্থিত অয়স্কান্তমণির আকর্ষণে লৌহবদ্ধ নৌকা জলে মগ্ন হইয়া যায়।

যুক্তিকল্পতরুর মতে সামান্য ও বিশেষ নৌকার এই দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজহস্ত অর্থাৎ পরিমাণে ব্যবহার্য্য এক হস্ত দীর্ঘ হইলে তাহার ওসার ও খাড়াই এক হস্তের চতুর্থাংশ, এই অনুপাতে পরিমাণ গ্রহণ করিয়া নৌকা নির্ম্মাণ করিলে "ক্ষুদ্রা" নামক সামান্য নৌকা হইয়া থাকে।

দেড়হাত দীর্ঘ, তদর্দ্ধ প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশ উচ্চ এই অনুপাতে পরিমিত নৌকা মধ্যমা নামে অভিহিত। পরিমাপক রাজহস্ত এক এবং দেড় এই ক্রমে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করিয়া এবং দৈর্ঘ্যের পরিমাপক হস্তের অর্দ্ধাংশ হারে বিস্তার ও উন্নতির বৃদ্ধি করিয়া নৌকা প্রস্তুত করিলে যথাক্রমে ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, ভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা ও মন্থরা এই দশ প্রকার সামান্য নৌকা হয়।

ইহাদের মধ্যে ভীমা, ভয়া ও গর্ভরা এই তিন প্রকার নৌকা অশুভ ফলদায়ক। মন্থরার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট যে কয় প্রকার নৌকার নাম কথিত হইয়াছে, সমুদ্রে সেই সকল নৌকাই যাতায়াত করিতে পারে; অর্থাৎ মন্থরা নৌকা সমুদ্রপথে গমনের অযোগ্য। সাধারণতঃ দৃঢ়তা ও প্রকাণ্ডতা ইহাদের গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বিশেষ নৌকার দীর্ঘা ও উন্নতা এই দুই প্রকারের ভেদ আছে। রাজহস্তদ্বয় দৈর্ঘ্যে তাহার অষ্টমাংশ বিস্তার এবং দৈর্ঘ্যের দশমাংশ উন্নত, এই অনুপাতে পরিমাণানুসারে নির্ম্মিত নৌকা দীর্ঘিকা নামে অভিহিত। উহার এক-এক হস্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে দীর্ঘিকা, তরণি, লোলা, গত্বরা গামিনী তরি জঙ্ঘলা, প্লাবিনী, ধারিণী ও বেগিনী, দীর্ঘা নামক বিশেষ নৌকার এই দশ প্রকার নাম হইয়া থাকে। ইহাদের বিস্তার ও উন্নতি যথাক্রমে দৈর্ঘ্যের অষ্টমাংশ এবং দশমাংশ। ইহাদের মধ্যে লোলা, গামিনী ও প্লাবিনী নৌকা দুঃখপ্রদা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

লোলার পরিমাণ হইতে গত্বরা পর্য্যন্ত লোলার মত গুণই বুঝিতে হইবে। বেগিনীর পূর্ব্বে যে নৌকার নাম কথিত হইল, তাহার গুণও বেগিনীর মত শুভপ্রদ। উল্লিখিত নৌকাগুলির নামের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহাদের গতি প্রভৃতির অনেকটা স্বরূপ প্রতিভাত হয়।

ভোজদেব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নৌকার দৈর্ঘ্যের কোনও নিয়ম নাই। ইচ্ছানুসারেই পরিমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আট চারি ও নয় ইহাদের অতিরিক্ত হস্ত সংখ্যা গৃহীত হইতে পারে না। অর্থাৎ দশকের পর ৪, ৮ অথবা ৯ থাকিতে পারে। যেমন চৌদ্দহাত, আঠার হাত, উনিশ হাত, চব্বিশ হাত, আটাশ হাত উনত্রিশ হাত এইরূপ দৈর্ঘ্য হইতে পারে। পনর, ষোল ইত্যাদি হইতে পারে না।

অষ্ট সংখ্যার অধিক হস্ত সংখ্যা হইলে নৌকা কুল, বল ও ধন এই কয়টি বিনাশ করে। নব্বইর অধিক ও চল্লিশের কম সংখ্যাও পরিত্যাজ্য। অপর দশক পর্য্যন্ত এই ফল বুঝিতে হইবে।

নৌকার চিত্রণ কার্য্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কর্ত্তৃক স্ব-স্ব জাতির নৌকায় স্বর্ণ, রজত, তাম্র এবং মিলিত তিন ধাতু ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখা যায়। নৌকার অঙ্কনে চারি, তিন, দুই ও এক শৃঙ্গ ব্যবহারেরও নিয়ম দেখা যায়। এই স্থলে শৃঙ্গ শব্দে শৃঙ্গাকার চিহ্ন অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আবার ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির নৌকায় যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও নীল রং ব্যবহারের উপদেশ দেখা যায়।

সূর্য্যাদিগ্রহের দশায় জাত নৃপতিদিগের নৌকার মুখভাগে যথাক্রমে সিংহ, মহিষ, সর্প, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী, ভেক ও মনুষ্য ইহাদের মুখাকৃতি বিন্যাসের ব্যবস্থা আছে এবং অনুপাদি ত্রিবিধ দেশবাসী রাজাদের নৌকায় কলস, দর্পণ ও চন্দ্র এতত্রিতয়ের চিহ্ন স্থাপনের উপদেশ দেখা যায়। সূর্য্যাদি গ্রহের দশাজাত রাজাদিগের নৌকার উপরে ক্রমে হংস, ময়ূর, শুক, সিংহ, হস্তী, সর্প, ব্যাঘ্র ও ভ্রমর ইহাদের আকৃতি বিন্যাসের ব্যবস্থা দেখা যায়। নবদণ্ডের রীত্যানুসারে নৌকাতে মণির বিন্যাস করিতে হয়। মুক্তার লহরের দ্বারা ভূষিত নৌকা সর্ব্বতোভদ্রা নামে অভিহিত হয়। নৌকাতে ন্যসনীয় স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুর মালা জয়মালা নামে পরিভাষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ স্বকীয় নৌকায় দুইটি করিয়া মালা নিহিত করিবেন, এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণ এক একটি মালা বিন্যাস করিবেন।

নির্গৃহ ও সগৃহভেদে নৌকার আরও দুই প্রকার বিভাগ দেখা যায়। নির্গৃহ নৌকার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অধুনা সগৃহ নৌকার বিবরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

সগৃহ-নৌকা

যে নৌকার উপরে গৃহ অর্থাৎ ছৈ আছে, তাহা সগৃহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরন্তু নামের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই ছাদগুলি সম্পূর্ণ গৃহাকারে সন্নিবেশিত হইত বলিয়াই মনে হয়। নৌকার অবয়ব বিশেষে গৃহের সন্নিবেশানুসারে আবার "সর্ব্ব-মন্দিরা" "মধ্য-মন্দিরা" ও "অগ্র-মন্দিরা" এই তিন প্রকার সংজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যে নৌকার সমস্তাংশ ব্যাপক গৃহ সন্নিবেশিত হয়, তাহার নাম সর্ব্বমন্দিরা, যাহার মধ্যভাগে গৃহ থাকে, তাহার নাম মধ্যমন্দিরা, এবং যাহার কেবল অগ্রভাগেই গৃহ থাকে, তাহার নাম অগ্রমন্দিরা। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বমন্দিরা নৌকায় রাজার ধন, অশ্ব ও রমণীদিগের গমনাগমনের ব্যবস্থা দেখা যায়। মধ্যমন্দিরা নৌকা রাজাদিগের বিলাস প্রভৃতির উপকরণরূপে এবং বর্ষাকালে ব্যবহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অগ্রমন্দিরা নৌকা চিরপ্রবাসে যুদ্ধকার্য্যে এবং বর্ষার অবসানে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

নৌকার গৃহ কাষ্ঠজ ও ধাতুজ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কাষ্ঠজ-গৃহ সুখসম্পাত্তপ্রদ ও ধাতুজ-গৃহ বিলাসোপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উক্তি হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, নৌকাস্থ গৃহমধ্যে শয্যা, আসন, চাঁদোয়া প্রভৃতির সমাবেশ ও শয্যাসনাদি প্রকরণোক্ত নিয়মই প্রতিপালিত হইত, এবং সাধারণতঃ নৌকার যে কিছু লক্ষণ কথিত হইল, উহা কেবল প্রধান নৌকার পক্ষেই বুঝিতে হইবে। সুতরাং সাধারণ নৌকার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থান্তরে নিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ লঘুতা, দৃঢ়তা, শীঘ্রগামিতা, অছিদ্রতা ও সমতা এই কয়টি নৌকার গুণ বিবেচিত হইতেছে। যুক্তিকল্পতরুতেই নৌকাকে যুদ্ধের উপকরণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির ব্যাকরণে এবং অমর কোষ প্রভৃতি গ্রন্থে সেনাঙ্গ শ্রেণীতে হস্তী অশ্ব, রথ ও পদাতিই পরিগণিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় ভারতে নৌযুদ্ধের উদ্ভাবন প্রথমতঃ গৌড়েই হইয়াছিল। কালিদাসের লেখনীও রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় এই বিষয়ের সমর্থন করিতেছে।

গৌড়ের সম্পর্কেই ভোজদেবের গ্রন্থমধ্যে নৌকা যুদ্ধোপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এই কল্পনা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে চতুরঙ্গ সেনার বর্ণন প্রসঙ্গে প্রথমেই নৌবাটকের সমুল্লেখ দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধার্থ ব্যবহারে সজ্জিত নৌকাশ্রেণীই "নৌবাটক" নামে অভিহিত হইয়াছে।

(গৌড়লেখমালা ১৪পৃঃ দ্রষ্টব্য)

মহাভারতে "যন্ত্রচালিত" নৌকার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিদুর কর্ত্তৃক প্রেরিত মানব পার্থ-দিগকে ক্ষিপ্রগামিনী "যন্ত্রযুক্তা" পতাকান্বিতা ও "সর্ব্ববাতসহা" নৌকা দেখাইয়াছিল।

শব্দকল্পদ্রুমে এবং তাহার পরবর্ত্তী অভিধানে নিঃসন্দেহে উক্ত "যন্ত্রযুক্তা" নৌকা ইদানীন্তন ষ্টীমার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "এতেন যন্ত্রবাহিণী নৌকা প্রতীয়তে। কলের নৌকা ইতি ষ্টিম্বোট ইতি যস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ।" আমরা কিন্তু এই ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ অধুনা অনেক যন্ত্র ষ্টিমের সাহায্যে পরিচালিত হয় দেখিয়া প্রাচীনকালেও যন্ত্রমাত্রই ষ্টিমের সাহায্যে পরিচালিত হইত, এই কল্পনা নিতান্তই ভিত্তিহীন। পূর্ব্বকালেও নানাকার্য্যের উপযোগী প্রভূত যন্ত্রের উল্লেখ সাহিত্যে দেখা যায়। কিন্তু ষ্টিমের ব্যবহারের উল্লেখ নাই। সুতরাং এই যন্ত্র বায়ুকে নিজের ইচ্ছানুরূপে তাহার প্রতিকূল দিকেও চালাইবার কল বলিয়াই প্রতিভাত হয়। বর্ণিত নৌকার "সর্ব্ববাতসহা" বিশেষণটি আমাদের ব্যাখ্যার সহায়তা করিতেছে। কারণ যাহা সর্ব্বপ্রকার বায়ুর বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়, তাহাই সর্ব্ববাতসহা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। বায়ুর আঘাতে ভাঙ্গিয়া না পড়া তাৎপর্য্য নহে। তাহা নৌকামাত্রের সাধারণ গুণ দৃঢ়তার দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়।

মনুসংহিতায় অনূপদেশে অর্থাৎ জলবহুল দেশে নৌকার দ্বারা যুদ্ধের উপদেশ আছে। কিন্তু এই উপদেশের সার্থকতা গৌড়েই রক্ষিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

তত্ত্ববোধিনী, মাঘ ১৩২৮।

বঙ্গদেশে দাস ব্যবসায়

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল বলিলে একটু আশ্চার্য্যান্বিত হইবার কথা; তৎকালের খৃষ্টিয়ান বণিকগণ এদেশে অতি বিস্তৃতরূপে দাসব্যবসায় চালাইতেন বলিলে আরও একটু বিস্মিত হইতে হয়; আমাদের দেশের গরীব হিন্দু পিতামাতা গরুবাছুর বেচার মত শিশু ও কিশোর বয়স্ক পুত্রকন্যা বিক্রয় করিত একথা বলিলে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। কিন্তু কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য, অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। নিম্নে একখানি দাসখতের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল, তাহা পাঠ করিলে সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাস তিরোহিত হইবে।

/৭ শ্রীশ্রীরাম

সন ১৭৩৫

ইয়াদী কির্দ্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীগাছপার কোরর্ণের ফিরিঙ্গী শুচরিতেষু লিখীতং শ্রীআত্মারাম বাগদীকস্য ছোকরা বিক্রয় পত্র-মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমার বেটা নাম শ্রীস্যামা বাগ্দী ছোকরা বএশ আট বৎসর বর্ণ কালা ইহার কিম্মত মান্দরাজী ৭৲ সাততঙ্কা পাইয়া আমি সেৎছা পূর্ব্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম তুমী ইহাকে বাতিজর ক্রিস্তাও করিয়া খোরাক পোষাক দিয়া আপন খেদমতে রাখহ এই ছোকরার দানবিক্রয়ের সত্বাধিকার তোমার আমার সহিত এবং আমার ওয়ারীসের সহিত এই ছোকরার কোন এলাকা নাঃ এই করারে ছোকরা বিক্রয় করিলাম. ইতি সন ১১৪২ এগারো সত ব্যাল্লিষ শাল তারিখ ১৭ সতরঞ্চী জ্যৈষ্ঠ মাহ ২৮ মাই সন ১৭৩৫ সাল।

আজ হইতে ঠিক ১৮৭ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার এক বাগ্দীর ছেলে তাহার পিতা কর্ত্তৃক ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হইয়াছিল—এই পুরাতন পত্রখানি তাহারই দাসখৎ। দাসখৎখানি বিবিধ কারণে বিশেষ করিয়া বুঝিয়া দেখিবার জিনিষ। পিতা আত্মারাম বাগ্দী ৭টী মান্দ্রাজী তঙ্কা লইয়া স্ব-ইচ্ছায় ছেলেটিকে "সকল মঙ্গলাময় শ্রীগাছপার কোরর্ণের" (Casper Gornet) নামক সাহেবকে নিঃস্বত্ব হইয়া

বিক্রয় করিল; এবং দান বিক্রয়ের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান করিবার অধিকার পর্য্যন্ত ক্রেতাকে প্রদান করিল। সেই বৎসর অক্টোবর মাসে শ্যামা প্রভু কর্ত্তৃক ২৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া মসিয়ে থেরেসার নামক অন্য একজন ফরাসীর সম্পত্তি হইল। তারপর নভেম্বর মাসের ২৫শে তারিখে শ্যামা আবার হাতবদল হইয়া ৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া মসিয়ে থেরো নামক তৃতীয় প্রভুর অধীন হইল।

শ্যামা বাগ্দীর প্রথম মনিব "শ্রীগাছপার কোরর্ণের ফিরিঙ্গী"। ফিরিঙ্গী শব্দটা আজকাল ইউরোপীয়গণের প্রতি প্রয়োগ করা শীলতাবিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সেকালে এরূপ ছিল না; দাসখতের মধ্যগত "ফিরিঙ্গী মুচবিতেসু" এই কথাই তাহার প্রমাণ। দাসখৎখানির নাম "ছোকরা বিক্রয় পত্রমিদং"। আজকাল ইংরাজ সাহেবেরা তাঁহাদের চাকরকে "Boy" বলিয়া ডাকেন; ফরাসি সাহেবেরা garcon বলেন; বালক যুবা বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে চাকর মাত্রেই Boy বা Garcon। এই Boy বা Garcon কথার অর্থ বালক নহে, "ছোকরা; ছোকরা শব্দ বান্দা বা ক্রীতদাসের প্রতিশব্দ মাত্র। অবস্থাগতিকে ছোট বড় হয়, আবার বড় ছোট হইয়া যায়; ভাষার মধ্যগত অনেক শব্দেরও এই অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। "ফিরিঙ্গী" শব্দ সম্মানের আসন হইতে চ্যুত হইয়া এখন প্রায় একটা দুর্ব্বাক্যে পরিণত হইয়াছে বলিলেই হয়; আর যে "ছোকরা" শব্দ দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে ক্রীতদাসের অভিধা ছিল—আজ তাহা বেতনভোগী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনবৃত্তি-সম্পন্ন ভৃত্য মাত্রের জ্ঞাপক হইয়াছে।

পুত্রের পরিচয় প্রদান-কালে আত্মারাম বলিয়াছে "আমার বেটা নাম শ্রীশ্যামা বাগ্দী বএস আট বৎসর বর্ণ কালা"। বিশেষ করিয়া ছেলের বর্ণের পরিচয় দিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? ইহার অর্থ—ফরাসি কায়দা অনুসারে শ্যামার জাতিত্বের প্রমাণ দিবার প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ সে যে ভারতবাসী, ফিরিঙ্গী নহে, ইহাই "বর্ণ কালা" শব্দে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

আত্মারাম যখন নিঃস্বত্ব হইয়া ছেলেকে বিক্রয় করিল—ছেলেকে "খোরাক পোষাক দিয়া" তাহাকে "আপন খেদমতে" রাখিবার কথাটা বিক্রয় পত্রের মধ্যে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। কিন্তু ছেলেটীকে "ক্রিস্তাঙ" করিবার কথাটা বিক্রয় সত্ত্বের মধ্যে স্থান পাইল কেন? হিন্দুর ছেলে শ্যামা, বাগ্দী হইলেও, যখন "ফিরিঙ্গীর" ঘরে 'ছোকরা' রূপে প্রবেশ করিল তখন ত তাহার "ক্রিস্তাঙ" হওয়া ভিন্ন গতি ছিল না? "বাতিজর" (baptise) করিবার ভার ও ব্যয়টা বোধ হয় ক্রেতার উপর অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যেই এ কথার বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা ৮ বৎসরের বালককে তাহার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে "ক্রিস্তাঙ" করা বিধিসঙ্গত ছিল না তাই দানপত্র গ্রহণ করিলেও পিতার অনুমতিটা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

এই দাসখতের তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১১৪২ সাল বা ২৮এ মে ১৭৩৫ সাল। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ২৮এ মের সহিত কেমন করিয়া মিলিল বলা যায় না। ইউরোপীয় পঞ্জিকা সংস্কারের সময় তারিখগুলা একটু সরিয়া গিয়াছে বোধ হয়, সেই জন্য বাংলা মাসের ১লা এখন প্রায় ইংরাজী মাসের মধ্যস্থলে পড়ে। সে যাহা হউক ১৭৩৫ সালে চন্দননগরে ফরাসী কুলপ্রদীপ ডুপ্লেক্স Director General, চন্দননগরের তখন বড়ই বোলবোলা, তখন স্বনামখ্যাত শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চন্দননগরে ফরাসী বাণিজ্যের প্রধান সহায়; তিনি ফরাসী কোম্পানির একদিকে বড় বেনিয়ান, অপর দিকে রাজস্বের ইজারাদার। আত্মারাম মাদ্রাজী ৭ টাকায় তাহার ৮ বৎসরের ছেলেকে বেচিল, দরটা চড়া হইল কি নরম হইল এতদিন পরে বলা কঠিন। মাদ্রাজী টাকার সহিত আজকালকার টাকার সম্বন্ধ কি তাহারও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে আহার্য্যের মূল্যবৃদ্ধির হার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় তখনকার ৭ টাকা এখনকার প্রায় ৩০ টাকার সমান হইতে পারে।

১১৪২ সালে লিখিত এই দলিলখানি গদ্য রচনা পদ্ধতির নিদর্শন হিসাবে মূল্যবান, এই দলিলখানি অপেক্ষা প্রাচীনতর আর একখানি মাত্র লিখন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ১৭ই ফাল্গুন ১১২৫ সনের লিখিত বৈষ্ণবদিগের একখানি প্রাচীন দলিলের প্রতিলিপি ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩০৬ সনের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। দাসখৎখানির ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ-বহুল ও উর্দ্দু ও ফার্সী পারিভাষিক শব্দসংমিশ্রিত। এই ১১ ছত্র লেখার মধ্যে ইয়াদী, কিদ্দ, ফিরিঙ্গী, ছোকরা, বেটা, কিম্মত, খোরাক, পোষাক, ওয়ারীশ, এলাকা, করার, খেদমতে, তারিখ, সন এই ১৪টি কথা উর্দ্দু বা ফার্সী আর সকল শব্দই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা বা সংস্কৃত। রচনা-ভঙ্গী, প্রথম বাক্যটী ছাড়িয়া দিলে (ইয়াদী কির্দ্দ-স্মরণ রাখিও) বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল বাঙ্গলা। একটু বিচিত্রতা এই, আত্মারাম সাহেবের প্রতি তুমি ও তোমার এই কথা ব্যবহার করিয়াছে। প্রায় দুই শত বর্ষ পরে আজ যে ভাষায়, যে ভাবে পাট্টা কবুলিয়ৎ লিখা হয়, এ দাসখৎখানি তাহারই অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। আত্মারাম নিরক্ষর ছিল একথা নিঃসংকোচে বলা যায়। পত্রখানি কোন মসীজীবীর পাকা হাতে লেখা; লেখক আত্মারামের হইয়া সহি করিয়াছে, আত্মারাম একটী কালির আখর মাত্র কাটিয়া সম্মতি জানাইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই—আত্মারাম তাহার ৮ বছরের ছেলেকে ৭৲ টী টাকায় বিক্রয় করিল কেন? কেন তাহার আভাস দাসখতেই পাওয়া যাইতেছে। খোরাক পোষাক দিয়া রাখিবার অনুরোধের

দাসখতের প্রতিলিপি (প্রবর্ত্তকের সৌজন্যে)

দাসখতের প্রতিলিপি (প্রবর্ত্তকের সৌজন্য)

মধ্যে এই পুত্রবিক্রয়ের নিগূঢ় অভিপ্রায় কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। জঠরজ্বালায় পীড়িত দরিদ্র আত্মারাম তাহার আত্মজকে "স্বেচ্ছাপূর্ব্বক" ক্রীতদাস করিল, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া, স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া যদি তাহার পুত্র দুটী খাইতে পায় আত্মারাম তাহারই ব্যবস্থা করিল এবং নিজেরও উদরান্নের কথঞ্চিৎ জোগাড় করিল।

তখন মুসলমান রাজ্যস্থিতি তিল তিল করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় রাহুগ্রস্ত মুসলমান শক্তির জ্যোতি ও তেজ হরণ করিয়া তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই নিদারুণ পরিবর্ত্তনের যুগে—মারাঠার লুট ও ক্ষুদ্র জমিদারগণের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে পড়িয়া রাজা প্রজা উভয়েই ক্ষুদ্ধ বিপর্য্যস্ত পীড়িত হইয়া দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিল; কিন্তু দুঃখের বোঝা সকল সময়েই দরিদ্রের ক্ষীণ স্কন্ধকে অধিকতর ভারাক্রান্ত করে। নিঃসম্বল নিম্নস্তরের লোকেই দুর্দ্দিনের দারুণ কশাঘাত উপলব্ধি করে। আত্মারাম বাগ্দীর মত শত শত নিরন্ন দুঃখী প্রজা অনন্যোপায় হইয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া সন্তান বিক্রয় করিয়া ও পরিশেষে আপনার শেষ সম্পত্তি আপনার দেহ বিক্রয় করিয়া জঠরানলে হব্য সংগ্রহ করিতেছিল।

কেহ না মনে করেন যে এক আত্মারাম বাগ্দী ছেলে বেচিয়াছিল বলিয়া এ দেশের এতটা হীন অবস্থা পরিকল্পনা করা অন্যায়। কল্পনা নহে, সত্য ঘটনা। শুধু এই একখানি দানপত্র নহে, বহু বিপর্য্যয় অতিক্রম করিয়া যে কয়খানা পুরাতন কাগজ-পত্র এখনও ফরাসীর দপ্তরখানায় বিদ্যমান আছে তাহার মধ্যে এখনও অন্ততঃ ১০০ খানা দাস বিক্রয়, দাস বিনিময় ও দাসত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য কাগজ পাওয়া যায়। আর শুধু চন্দননগরে নহে বাংলার সকল জেলায় পুরাতন কাগজ পত্রে ও তৎকালের সংবাদ-পত্র সমূহে দাসব্যবসায়ের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার জীবনে দাসব্যবসায় দাসদাসী ক্রয় একটা অতি সাধারণ ঘটনা ছিল। প্রত্যেক সমৃদ্ধ মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের সংসারে পাল পাল ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ছিল। একপাল ক্রীত দাসদাসী রাখা বড়মানুষীর অঙ্গ ছিল। এমন একটা খৃষ্টান পরিবার ছিল না যাহাতে একটীও ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী না থাকিত।

কোন না কোন সময়ে প্রত্যেক জাতির মধ্যে দাসীকরণ প্রথার প্রবর্ত্তন ছিল; প্রাচীন হিন্দু সমাজে ছিল, প্রাচীন গ্রীসে ছিল, রোমে মিশরে ছিল। মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশের সহিত দাসপ্রথার উদ্ভব ও বিলোপে। মনুষ্য সমাজের বিকাশের সঙ্গে যে দাসত্ব প্রথার উদ্ভব ও পরিপুষ্টি, সে দাসত্ব প্রথা বস্তুতঃ কদর্য্য প্রথা নহে; ব্যক্তি বিশেষ তাহার প্রবর্ত্তক নহে, তাহা স্বাভাবিক, আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী; সে প্রথা যে কারণ পরম্পরা অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হইয়াছিল সে কারণ পরম্পরার বিলোপ হইলে, উহাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—কোন ব্যক্তি-বিশেষের হুকুমে সে প্রথা জন্মায় নাই, কাহারও হুকুমে মরে নাই। কিন্তু আমরা খৃষ্টিয়ান জগতে যে দাসত্ব প্রথার কথা ইতিহাসে পাঠ করিয়া থাকি, তাহা মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশের সহিত সম্পর্কশূন্য, তাহার জন্য ব্যক্তিবিশেষে দায়ী এবং সে-প্রথা প্রকৃতই অতি নৃশংস ও ক্রূর; রাজার হুকুমে তাহার উদ্ভব ও রাজার হুকুমে তাহার বিলোপ।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে ইক্ষুক্ষেত্রে যে স্থানীয় বর্ব্বর জাতিকে নিয়োগ করা হইত তাহারা অলস ও দুর্ব্বল। আফ্রিকার কাফ্রি আদিম নিবাসীরা বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী। Bishop Las Casas নামক জনৈক পাদ্রীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল এই বলিষ্ঠ ও শ্রমশীল নম্রপ্রকৃতি কাফ্রিগণকে ইক্ষুর চাষে লাগাইলে সুবিধা হইতে পারে। পাদ্রীর বুদ্ধিতে পরিচালিত ইউরোপীয় রাজগণ পাদ্রীর সংকল্পের সমর্থন করিয়া হুকুম প্রচার করিলেন; নৃশংসভাবে সহস্র সহস্র কাফ্রি নরনারীকে বলপূর্ব্বক বা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া দেশচ্যুত করিয়া, বন্য পশুর মত জাহাজে বোঝাই দিয়া আমেরিকায় ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে আকের চাষ করিতে চালান করা হইল—এ দাস-ব্যবসায় রাজার হুকুমে আরম্ভ হইয়াছিল এবং Wilberforce এবং Father Gregoryর চেষ্টায় খৃষ্টিয়ান জগতের করুণা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হইলে, রাজার হুকুমে সে ব্যবসায় রহিত হইল।

কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকা হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় কাফ্রি-দাসের পণ্যস্রোত, পূর্ণ মাত্রায় বহিয়া চলিয়াছে খৃষ্টিয়ান ব্যবসায়ীবর্গ যখন প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করিতে আসিলেন তাঁহারা ভারতবর্ষে দাস প্রথার প্রচলন দেখিলেন। ভারতবর্ষেও তাঁহারা কাফ্রি দাসের আমদানি করিলেন। তখন দেশের রাজা মুসলমান—মুসলমান দাসত্ব প্রথাকে চিরদিন পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আগন্তুক খৃষ্টিয়ান বণিকসকলকে দাসব্যবসায় চালাইবার জন্য ইতস্তত করিতে হইল না। তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে রাজানুসৃত পথ বহিয়া চলিতে লাগিলেন। কাফ্রি খোজা মুসলমান অন্তঃপুরের পরিরক্ষক ছিল। কাফ্রি দাসদাসী খৃষ্টিয়ান আগন্তুকগণের গৃহে, পাচকের কাজ করিত, নাপিতের কাজ করিত, খানসামার কাজ করিত, মেম সাহেবদের নেপথ্যের সহায়তা করিত, সঙ্গীত আলাপ করিয়া প্রভুর মনোরঞ্জন করিত। আফ্রিকাবাসী দরিদ্র, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশের লোকও দরিদ্র, সেই দরিদ্র ভারতবাসীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে দাসীকরণপটু অভ্যাগতগণের বিলম্ব হয় নাই। তাঁহারা আফ্রিকার ন্যায় চট্টগ্রাম হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরভূমি হইতে প্রভূত ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। আফ্রিকার ন্যায় ভারতবর্ষেও দস্তুর মত দাসব্যবসায় চালাইয়া ছিলেন। তাহার গোটাকতক নিদর্শন যাহা খুঁজিয়া পাইয়াছি নিম্নে দিলাম।

মরিশাস্ ও বুরব এই দুইটী দ্বীপ মনুষ্য-বাসোপযোগী করিয়া কৃষিকার্য্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ করিবার মানসে ফরাসি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চেষ্টিত হন। অনাদিকাল হইতে বর্দ্ধিত বনানি ধ্বংস করিয়া কৃষিক্ষেত্র বিস্তারের জন্য এবং বন কাটিয়া নগর নির্ম্মাণ করিবার জন্য প্রথমে ক্রীতদাসের প্রয়োজন হয়; এবং সে ক্রীতদাসের পাল ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করিয়া কোম্পানী বাহাদুর উক্ত দ্বীপদ্বয়ে প্রেরণ করেন। প্রথমে চন্দননগরের উপর ক্রীতদাস সংগ্রহের ভার পড়ে; কত যে বাঙ্গালী ও বিহারী দরিদ্র ব্যক্তি জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্রপারে বুরবঁর বনে ও মরিশাসের উৎকট উত্তাপে ইহলীলা সাঙ্গ করে তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন।

১৭২৯ সালের মধ্যভাগে পণ্ডিচারী হইতে হুকুম আসে যে চন্দননগর হইতে ক্রীতদাস কিনিয়া আর পাঠাইতে হইবে না, মান্দ্রাজ উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেখানে বাংলা অপেক্ষা সস্তা দরে ক্রীতদাস পাওয়া যাইতেছে। দুই বৎসর পরে সে প্রদেশে সুজন্মা হয় তখন হুকুম আসে সেখানে দর চড়া অতএব আবার চন্দননগর হইতে ক্রীতদাস পাঠান হউক। ১৭৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দননগর হইতে পণ্ডিচারীতে সংবাদ যায় যে পাটনার নবাব (আলিবর্দ্দী খাঁ) কোন এক হিন্দু রাজাকে (সম্ভবতঃ বিহারের কোন জমিদার বা বঞ্জারা নামক দস্যুগণকে) যুদ্ধে পরাভূত করিয়া ১২ হইতে ১৫ হাজার বন্দীকে ক্রীতদাস করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। চন্দননগর হইতে ডুপ্লেক্স এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাটনার ফরাসী কুঠিয়াল Groisselleকে হুকুম দিলেন ৩০০ ক্রীতদাস ক্রয় কর। পণ্ডিচারী হইতে সংবাদ আসিল—"যদিও বুরবঁ দ্বীপে প্রতি বৎসর ২০ জন মাত্র পাঠাইবার হুকুম আছে—মরিশাস দ্বীপে ৩০০ ক্রীতদাস পাঠাইলে কাজে আসিবে, এবং যেহেতু মনে হয় মাল সস্তায় পাওয়া যাইবে, প্রত্যেক জাহাজে কিছু কিছু করিয়া ৩০০ শতই পাঠাইয়া দেওয়া হউক।"

La Bourdonnais তখন মরিশাস দ্বীপের শাসনকর্ত্তা, তাঁহার উপর কোম্পানির হুকুম ছিল তিনি আবশ্যক মত ভারতবর্ষ হইতে ক্রীতদাস আমদানি করিতে পারিবেন। ১৭৫১ সালে বুরবঁর শাসন-সঙ্ঘ হইতে আবেদন আসে ৬০ জন ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী, বয়ঃক্রম ১৫ হইতে ৩০, পাঠান হউক—পণ্ডিচারী হইতে চন্দননগরের উপর সে আবেদন রক্ষা করিবার ভার পড়ে।

দাসীকরণের প্রক্রিয়া পুরাতন কাগজ পত্র হইতে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে প্রদান করিলাম।

কোন এক ধনী দাস ব্যবসায় করিবেন তিনি সংগ্রাহক নিযুক্ত করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিলেন। কুলির আড়কাঠির ন্যায় তাহারা ছলে বলে কৌশলে অথবা অতি সহজে দীনহীনগণের সন্তান সকল ক্রয় করিয়া দাসদাসীর আড়তে হাজির করিল। ঋণদানে অশক্ত হইলে উত্তমর্ণকে দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, আদিমকালের ন্যায় এ নিয়ম মুসলমান যুগেও বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং দরিদ্রকে ঋণজালে জড়িত করিয়া পুত্রকন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য করা, দাসী-করণের অতি সহজ উপায় ছিল আমরা শিশুগণকে যে ছেলেধরার ভয় দেখাই, দাসসংগ্রাহকগণ সেই ছেলেধরা, ইয়োরোপীয় বণিকগণের প্রত্যেক আড্ডায় চন্দননগরে, হুগলিতে, চুঁচুড়ায়, শ্রীরামপুরে ও কলিকাতায় দাসের আড়ত ছিল, দাসের হাট বসিত। গহনার নৌকায় বোঝাই দিয়া যেমন আজকাল ব্যবসায়ী হাটে বেসাত লইয়া আসে, তৎকালে দাসব্যবসায়ী দাসদাসী বোঝাই দিয়া ভাগীরথী বক্ষ বহিয়া দাসের হাটে জীবন্ত বেসাত লইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য একেবারেই অভিনব ছিল না। মনুষ্যসমাজে প্রথম ক্রীতদাস রমণী, দাসের হাটে রমণীর আদরই অধিক ছিল। যে সংসারে দশটা গোলাম, তাহার মধ্যে নয়জন স্ত্রী ও একজন পুরুষ। যে কারণ মেষপালক মেষ অপেক্ষা মেষীর অধিক আদর করে দাস অপেক্ষা দাসীর আদর সেই কারণেই অধিক ছিল। মেষী মেষ-শাবক প্রসব করিয়া প্রভুর ধনবৃদ্ধি করে, দাসীও দাসশিশু প্রসব করিয়া প্রভুর ধনবৃদ্ধি করিত। অনেকে দাসীর পাল পুষিত, দাসব্যবসায়ের সুবিধার জন্য। Cattle-breedingএর ন্যায় Slave-breeding একটা লাভের ব্যবসায় ছিল। দাসদাসীর মূল্য স্ত্রী-পুরুষ অনুসারে বয়ঃক্রম অনুসারে ও অন্যান্য গুণাগুণ অনুসারে অল্প বা অধিক হইত। নামমাত্র মূল্য হইতে তখনকার শত মুদ্রা পর্য্যন্ত মূল্যের পরিচয় পাইয়াছি। ইংরাজ কোম্পানীর হুকুমে ডাকাতি অপরাধে অপরাধী হতভাগ্যের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যা দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া সরকারী নিলামে বিক্রীত হইত। জেলের খরচ বাঁচাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইলে কয়েদীগণকে সুমাত্রাদ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হইত অথবা দাসরূপে বাজারে বেচিয়া ফেলা হইত। ফরাসী বা অন্যান্য কোম্পানীর আদেশ যে অন্যবিধ ছিল তাহা মনে হয় না। কারণ রোমান ক্যাথলিক পাদরী এই জঘন্য আধুনিক দাসব্যবসায়ের প্রবর্ত্তক। ফরাসী কোম্পানি রোমান ক্যাথলিক কোম্পানি এবং এদেশে রোমান ক্যাথলিক পরিবার মধ্যেই অধিক সংখ্যক দাসদাসী পোষিত হইত। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে ক্রীত দাসদাসীর নিদর্শন কোথাও পাই নাই। কৃষাণ বা মজুর হিসাবে হিন্দুর ঘরেও হয়ত ক্রীতদাস ছিল কিন্তু গৃহসংসারের পরিচারিকা বা পরিচারক হিসাবে থাকা সম্ভব নহে। হিন্দুগণ অর্থের লোভে আগন্তুক খৃষ্টিয়ানগণের ও মুসলমানগণের দাসব্যবসায়ে সহায়তা করিতেন সন্দেহ নাই; স্বয়ং ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দাসদাসী ক্রয় বিক্রয়ের শুল্ক আদায় করিতেন কিন্তু তাঁহারা নিজে যে দাসদাসী পুষিতেন তাহার পরিচয় পাই নাই। মুসলমানগণ ক্রীত দাসদাসীর প্রতি অতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন।

দাসবংশ রাজতক্তে বসিয়াছিল, দাসী পাটরাণী হইয়াছিল, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দাসদাসীগণের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিলে পুণ্য আছে, ইহাই কোরাণের আদেশ। দাসী দাসশিশু প্রসব করিলে প্রভুর মৃত্যুর পর সে স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত বিধি। স্বধর্ম্মাবলম্বীকে মুসলমান ক্রীতদাস করিতে পারিতেন না। ক্রীতদাস মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে সামান্য ভৃত্য মধ্যে পরিগণিত হইত; এইজন্য মুসলমান সমাজে নিগ্রো খৃষ্টিয়ান বা হিন্দু ভিন্ন দাস থাকিতে পারিত না। দাস দাসীকে স্বাধীনতা দান করা মুসলমানের পক্ষে পুণ্য কর্ম্ম। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অনেক মুসলমান দাসদাসীকে মুক্তি প্রদান করিতেন।

মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত নীতির প্রভাব খৃষ্টিয়ানগণের উপর কিয়ৎ পরিমাণে পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমি অনেকগুলি খৃষ্টানের পুরাতন উইল দেখিয়াছি, প্রত্যেকখানিতেই অন্ততঃ একজন দাস বা দাসীকে মুক্তি প্রদানের কথা আছে। দুই এক স্থলে প্রভু আপনার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া মুক্ত দাসদাসীদিগকে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান যেমন মুসলমানকে ক্রীতদাস করিতে পারিত না, খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে সে স্বধর্ম্মানুরাগ ছিল না। তাহারা দাসগণকে খৃষ্টান করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইত বটে কিন্তু দাসত্বের কোন ব্যত্যয় হইত না। খৃষ্টিয়ান সংসারে দাসগণ অনেক সময়ে অতি নৃশংস ব্যবহার প্রাপ্ত হইত, অতি সামান্য অপরাধের জন্য বেত্রাঘাত অতি সাধারণ শাস্তি ছিল, মাঘের শীতে উলঙ্গ করিয়া দাস বা দাসীর মস্তকে উপর্য্যুপরি বহু কলসী ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেওয়া একটা আমোদজনক প্রক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত ছিল।

দাস ক্রয় বা বিক্রয় করিতে হইলে সরকারকে একটা মাশুল দিতে হইত। ইংরাজ সরকার দাস-প্রতি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা শুল্ক লইতেন। ফরাসী সরকার দাসখৎখানি লিখিবার কাগজের জন্য পাঁচ সিকা লইতেন এবং দাসদাসীর মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা শুল্ক আদায় করিতেন। এই পাকাপাকি রকমের ব্যবস্থা একটা পাকাপাকি রকমের ব্যবসায়ের সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু ব্যবস্থার মধ্যে একটা কাঁচা ব্যবহার থাকেই থাকে। আইন থাকিলে আইনের চক্ষে ধূলি দিবার উপায় উদ্ভূত হয়। আইন বহির্ভূত উপায়ে—তখনকার লোকের চক্ষে গর্হিত উপায়ে অর্থাৎ জোর করিয়া, চুরি করিয়া, সরকারকে বঞ্চিত করিয়া—দাসদাসী সংগ্রহ ও বিক্রয় এত অধিক মাত্রায় চড়িয়া উঠিয়াছিল যে ১৭৮৯ সালে চন্দননগরের তৎকালীন গবর্ণর মঁসিয়ে মণ্টিগ্নি নিম্নলিখিত আজ্ঞা প্রচারিত করেন :—

"The Master Attendant of Chandernagore is directed to see that no native be embarked without an order signed by the Governor and all Captains of vessels trading to the port of Chandernagore are stirctly prohibited from receiving any natives on board" (Seton Karr—Selections from the Calcutta Gazette. 1865.)

কিন্তু আইনসঙ্গত দাসব্যবসায় পূর্ব্ববৎই চলিতে থাকে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আদেশে উহা সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়।

শ্রীচারুচন্দ্র রায়।

প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন ১৩২৮।

মাটির ডাক

১

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে,
যেদিন হাওয়া উঠ্‌ত ক্ষেপে'
ফাগুন বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগ্‌ত পুলক কি মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথায়,
সেদিন মনে হ'ত কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে;
তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে'-ওঠা আমার সারা গায়ে।

আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল ক্ষেতে
সূর্য্য-ওঠার রাঙা-রঙীন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠ্‌ত দুলে'
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়,
সেদিন আমার হ'ত মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবী;
তাইত হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবী

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে'
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
"যে জননীর কোলের পরে
জন্মেছিলি মর্ত্ত্যঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হ'তে তোরে
কে এনেচে হরণ করে'.
ঘিরে তোরে রাখে নানান্ পাকে '
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।"
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাইত ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে—
"গে ছস্ দূরে, অনেক দূরে,"
কি যেন তাই চোখের পরে ঢাকা।
তাই এতদিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভাল করে' পাইনি তাহা বুঝে;
ফিরেছি তাই নানামতে
নানান্ হাটে, নানান্ পথে
হারানো কোন্ কেবল খুঁজে খুঁজে।

৩

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার অঙন মাঝে
প্রভাত রবির শঙ্খ বাজে,
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,
এইখানে সে-পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্তমনে ক্লান্ত দিনের শেষে।

হেথা হ'তে গেলেম দূরে
কোথা যে ইঁট-কাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্ব্বাসনে,
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই ত মেশা,
আবর্জ্জনা জমে উপার্জ্জনে।
যন্ত্র-জাঁতায় পরাণ-কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলক-ধাঁধায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে,
পথ বেড়ে' যায় ঘুরে' ঘুরে',
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে' যাই মুক্তি সুখে,
ইঁটের শিকল দিই ফেলে, দিই টুটে',
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েচেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশতলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হ'তে না রইল ব্যবধান।
যে দূতগুলি গগন পারের,
আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েচে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কি ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা' নিকট, তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে
চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শান্তিনিকেতন, চৈত্র ১৩২৮।

পয়লা বোশেখ

(গল্প)

১

বেলা প্রায় সাড়ে চারটের সময় খবর পেলুম যে, শচীন আজ পাঁচটার ট্রেণে বাড়ী আস্‌ছে।

শচীন আমাদের ছেলেবেলাকার বন্ধু, সম্প্রতি অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরে আগ্রা থেকে সে বাড়ী আস্‌ছে। কত রকম খবরই তার কাছে থেকে পাওয়া যাবে!

ষ্টেশনে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নেবার খুব ইচ্ছে থাক্‌লেও, আফিস তো আর রেহাই দেবে না,—কাজেই মনের ইচ্ছে মনেই চেপে গেলুম।

ষ্টেশনে আর যাওয়া হ'ল না। অফিস-ফেরৎ বাড়ীতেই গেলুম। স্ত্রী তখন উনুন ধরাতেই মহাব্যস্ত,—একটু চা ক'রে দিতেই হয় তো বা তাঁর সন্ধ্যে উৎরে যাবে!

ছেলেটা খুব চেঁচাচ্ছিল। দুই ধমকে সেটাকে থামিয়ে দিলুম।

স্ত্রী চা এনে ঘরে দিয়ে গেল। একটুখানি যেন টেবিল ঘেঁসে দাঁড়িয়েও ছিল, কিন্তু অত নজর না করে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে আমি শচীনদের বাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

গিয়ে দেখি যে, অগণিত বল্‌লেই চলে,—বন্ধু-বান্ধবে শচীনের ঘর ভরপুর; তবু শচীনের মুখখানায় এতটুকু প্রাণের দীপ্তি নেই কেন?

ও লোকটা বড্ড স্ত্রৈণ ছিল কি না, তাই স্ত্রী-বিয়োগের পর এখনো শান্ত হতে পারেনি।

বহুক্ষণ গল্প-গুজবের পর যখন আমি উঠলুম, রাত তখন প্রায় সাড়ে-এগারোটা। শচীন সঙ্গে সঙ্গে পথ অবধি এগিয়ে এসেছিল।

এসেছিলুম অন্ধকারে, কিন্তু ফিরতি মুখে দেখি পূর্ব্বাকাশে চাঁদ উঠ্‌ছে,—যা হোক জ্যোৎস্নার আলোয় যাওয়া যাবে ভেবে মনটা খুসি হয়ে উঠ্‌লো!

আকাশে কোথাও মেঘের নাম-গন্ধ ছিল না, শুধু শেষ-বসন্তের হাওয়ায় অতি দূর থেকে ক্লারিয়োনেটের সুর ভেসে আস্‌ছিল। বোধ হয় কোনো বিরহী যুবকের প্রাণের গান হবে! হঠাৎ শচীন আমার কাছে সরে এসে কেমন যেন অস্বভাবিক গাঢ় স্বরে বল্‌লে, "আচ্ছা নরেশ, তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাসো?"

কি অদ্ভুত প্রশ্ন দেখ!

একটু চুপ ক'রে ভাবলুম,—স্ত্রীকে ভালবাসি কি না? সেই ষোল বছর বয়সে বিয়ে হবার পর এইতো বছরের পর বছর একসঙ্গেই কাটাচ্ছি ধরতে গেলে, কিন্তু ভাল-বাসা-বাসির কোনো কথাই তো এ-যাবত মনে হয়নি! কাজেই এ প্রশ্নের উত্তর মাত্র-এক-মিনিটেই দিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না।

সেই প্রথম বিয়ে হবার পরে দিন-কতকের কথা মনে করা চলে।—যখন স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখ্‌তেস্ লবে দিব্যি এক একখানি হাত-পা-ভাঙা কাব্য তৈরী ক'রে ফেলতুম—কিন্তু আরে রামঃ! তাকে কি ভালবাসা বলে? সে তো নেশা

এই আজই তো সারাদিনের মধ্যে আমি একটী বারও স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দেখিনি! চা দিয়ে গেল, দাঁড়িয়েও ছিল, হয়তো বা আমার কাছে কিছু আশাই করছিল, কিন্তু আমার তা খেয়ালই হয়নি।

শচীন আমার উত্তরের অপেক্ষা করছিল, তাকে বললুম, "স্ত্রীকে আর কে না ভালবাসে! ভালবাসবারই তো জিনিষ!"

"উঁহু—ও-রকম কথা হচ্ছে না তো!"

"তবে কি কথা?"

"তুমি বুঝ্‌লে না! দেখ, এই জ্যোৎস্না রাতে আগ্রায় থাকতে আমি প্রায় রোজই তাজমহল দেখ্‌তুম, বড় সুন্দর দেখাতো!"

বিপত্নীক শচীনের ভাঙা গলায় বড় করুণ সুর বাজ্‌ছিল। আমি নির্ব্বোধের মত বললুম, "শচীন, তুমি আবার বিয়ে কর—"

"কি বল্‌লে ?"

ভারি লজ্জা পেয়ে আমি চুপ ক'রে রইলুম। এই রাত-দুপুরে আমি চলেছি আমার বাড়ীর দিকে, শচীন যে কি করতে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তার ঠিক নেই!

দু-চারটে রাত-চরা মাতাল আর রাত-চরা পশু-পাখী ছাড়া এত রাত্রে, কেউ কোথাও আর জেগে নেই!

খানিক দূরে এসে শচীন আবার বল্‌লে, "আচ্ছা, তোমার স্ত্রী তোমায় ভালবাসে ?"

এবারে আমি হাস্‌লুম,—বল্‌লুম, "তা কি জানি!"

"সত্যিই জানো না, না, বোঝো না ?"

"সত্যিই জানিনে—"

"জানো না ? তুমি দেখছি একেবারেই নিরেট—ভালবাসা বোঝা যায় না আবার!"

"অন্ততঃ বোঝবার চেষ্টা তো করিনি কোন দিন!"

"করো। হয় তো বা কোন্‌দিন আমারি মত সব হারিয়ে-টারিয়ে ভিক্ষুক হয়ে দাঁড়াবে। এইবেলা যতটুকু পাবো সঞ্চয় ক'রে নিয়ো।"

"ধর, যদি আমিই আগে মরে যাই ?"

"সেও বড় সুখের কথা হয় না।"

একটা চৌমাথা এসে পড়লো। শচীন বাঁ দিকের মোড়ে চল্‌লো, আমাকে সোজাই যেতে হবে আমি বল্‌লুম, "ও কি হে,—ওদিকে চল্‌লে যে ?"

"হাঁ,—আমি এখন গঙ্গার ধারে যাব।"

"গঙ্গার ধারে ? কি সর্ব্বনাশ! এত রাত্রে গঙ্গার ধারে কেন ?"

"হাওয়া খেতে—"

সে দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমারও তখন যে-কথা কোনদিন মনে হয় না, সেই কথাই মনে হতে লাগলো, সে আমার স্ত্রীর কথা।

বাস্তবিক কি আমার স্ত্রী আমাকে ভালবাসে ? আমি তো নিত্য দেখি, তার মুখ-টিপে নিঃশব্দে কলের পুতুলের মত কাজ যুগিয়ে চলা! আমি বাড়ী না থাকলে বোধ হয় সে হাসে-টাসে, কিন্তু আমি বাড়ী ঢোকবা মাত্র, ধরা-বাঁধা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব!

নাঃ—সত্যি ওদিকেও একটু নজর রাখা দরকার দেখ্‌চি!

মাথার উপর স্তব্ধ জ্যোৎস্না-সাগর মাতিয়ে দিয়ে পাপিয়া চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল। কি সুন্দর মিষ্টি এই করুণ মধুর সুর!

বাড়ী পৌঁছুলুম রাত দুপুরে। দোরে ধাক্কা দিয়ে বার-কতক ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দুয়ার খুল্‌লো। ঠিকে চাকর বাড়ী চলে গেছে, ঘুম-চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে স্ত্রীই এসে দুয়ার খুলে দিলে।

আমি আজ তার দিকে একটু বিশেষ চোখে চেয়ে দেখলুম,—যদি তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে না থাক্‌তো তা হলে আমার মুখ-পানে চেয়ে সে বেশ অবাক্ হতো!

গরম ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে সে আগুন উস্‌কে দুধ গরম করতে বস্‌ল।

তার সঙ্গে একটু কথা বলবার ইচ্ছেতেই আমি বললুম, "শচীনের সঙ্গে দেখা ক'রে এলুম।"

সে অন্যমনস্ক ছিল, আমার কথায় আশ্চর্য্য হয়ে মুখ তুল্‌লে,—তার নির্ব্বাক চোখ যেন বলতে চায় যে, আমি শচীনের সঙ্গে দেখা ক'রে এলুম, তাতে তার কি ? এই রাত বারোটা অবধি ভাত গরম রাখতে রান্না-ঘর আগ্‌লে পড়ে থাক্‌তে হয়েছে, এই তো!

কিন্তু তা নয়!

আমার কথা ভাল ক'রে তার কানেই যায়নি বোধ হয়, তাই সে মনে করলে যে, আমাদের দাম্পত্য দস্তুর-মত আমি বুঝি তাকে ছেলের কথাই জিজ্ঞাসা করছি, তাই সেও দস্তুর-মত জবাব দিলে, "হ্যাঁ, খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে।"

বাস্, আমিও চুপ্,—সেও চুপ্!

আমাদের পরস্পরের সঙ্গে তো চাল, ডাল, তেল, নুন কিংবা ছেলের কথা ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কোনো কথা কখনো হয় না!

২

ইদানীং বিপত্নীক শচীনের আড্ডায় রোজই যাই, আর তার ভালবাসার বাতিকে আমারও মাথা বিগ্‌ড়ে যেতে বস্‌লো !

বলতে লজ্জা করা উচিত,—তবু সত্যি বল্‌তে কি, আমার মনে আমার স্ত্রীর উপরই কি-রকম সন্দেহ জম্‌তে লাগ্‌লো, সে বুঝি আমাকে ভাল বাসে না।

আপিসে খেটে আসি। কিন্তু রাগ-ঝাল, যত পৌরুষ সব তো চিরকাল স্ত্রীর উপর দিয়েই চালিয়ে আস্‌ছি, সেও আমাকে যত ভয় ক'রে চলেছে, ততই আমার পতি-গিরির চাল বেড়ে গেছে।

এই সমস্ত বিবাহিত জীবন মনে ক'রে দেখতে গেলে, এমন একটী দিনও আমার মনে পড়ে না, যেদিন আমার স্ত্রী আমার মুখের কোনো কথার উত্তর দিয়েছে !

এখন ভাবছি কি,—যে, যে এই এত দুর্ব্বাক্য, এমন সব ব্যবহার মানুষ শুধু চুপ ক'রে সহ্যই করে, জবাব দিতে জানে না, সে আমাকে ভয় হয়তো খুবই করে, কিন্তু ভাল বোধ হয় বাসে না !

স্ত্রীর সঙ্গে ভাব করতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে হয়ে গিয়েছে কেমন যেন দূরের জিনিষ। তাকে মারতে পারি, বকৃতে পারি, কিন্তু তার সঙ্গে মিলতে পারিনে !

রবিবারের দিনে দুপুরবেলায় যখন একটু ঘুমের যোগাড় করছি, তখন দেখ্‌ছিলুম সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে স্ত্রী বাড়ার ঝীয়ের সঙ্গে বসে দিব্যি গল্প করছে।

আমি আর সেদিন নিদ্রাকে আমল দিলুম না, জেগেই রইলুম। ছেলেটা চেঁচাচ্ছিল, পাছে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হয় সেই ভয়ে স্ত্রী তাকে সরিয়ে নিতে এলে বললুম, "ছেলে নিয়ে কোথায় চল্‌লে ? বসো না গা একটু এইখানে।"

"এইখানে ?"

নিরুৎসাহ হয়ে সে খাটের একধারে জড়োসড়ো হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল, যেন কাঠের পুতুল ! আমি পাশ-বালিশটা ফিরিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে বললুম, "আমি ডাকলুম বলে তোমার বড্ড অসুবিধে হচ্ছে নাকি ?"

"অসুবিধে ? না।"

"তবে অমন আড়ষ্ট হয়ে রইলে যে !"

"কই, না।"

"তুমি আমাকে বড্ড ভয় কর, নয় ? শচীন বলছিল যে, তার স্ত্রী তাকে একটুও ভয় করতো না, খুব ভাল বাস্‌তো।"

স্ত্রী তার চোখ তুলে আমার দিকে একটুখানি চেয়ে আবার পলক নামিয়ে ফেল্‌লে। ম্লান ব্যথা-হত দৃষ্টি ! তাতে অনেক দিনকার অনেক অনুযোগ জমা হয়ে আছে।

বসে থেকে থেকে পা গুটিয়ে সে শুয়ে পড়্‌লো। আমিও অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপর স্নিগ্ধ স্বরে ডাক্‌লুম, "অনু—"

অন্নপূর্ণাকে অনেকদিন পরে এই নাম ধরে ডাকলুম। তার বোধ হয় ঘুম এসেছিল, বিদ্যুতের ঝাঁকানি লাগার মত চমকে চট্‌ ক'রে উঠে বসে সে বললে, "এ্যাঁ,—কি বলছো ! ডাকছো আমাকে ?"

"ডাক্‌ছি,—শোনো, এদিকে এসো।"

নির্ব্বাক প্রতিমার মত সে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, আমি তার দুই বাহু চেপে ধরতে গিয়ে দেখি, খুব গরম ! বললুম, "এ কি, তোমার জ্বর হয়েছে ?"

"কি জানি ! জ্বর বোধ হয় হয়নি।"

"হয়েছে বৈকি ! খুব গরম যে গা !"

মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে সে বললে, "ওগো, না, না, আমার জ্বর হয়নি।"

আমি বুঝলুম, এই জ্বরটা স্ত্রী আমার কাছে চেপে যেতে চায় ! কেন না স্ত্রীর রোগ হওয়া আমি মোটে পছন্দ করিনে,—হলে রাগ-ঝাল রুগীর উপরেই জাহির করে থাকি,—তার ফলে আজ শারীরিক যন্ত্রণাও আমার কাছে প্রকাশ করবার মত সাহস তার নেই !

আমি বললুম, "কেন ঢাকতে চাও, বল দেখি ? তোমার স্পষ্ট জ্বর হয়েছে—বুঝতে পারচো না ? কষ্ট হচ্ছে না ?"

হঠাৎ তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝরে পড়্‌লো ! সে কেঁদে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল !

আমি মূঢ়ের মত কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে

ভাবতে লাগলুম, কি আশ্চর্য্য! এই এত বছর আমরা একত্রে ঘর-সংসার করছি, তবু আমরা পরস্পরে এত দূরে ?

বলতে পারিনে, শচীনের পাগ্‌লামি আমার মাথাতেও কে ছাই-ভস্ম ঢ়ুকিয়ে দিয়েছিল!

৩

শচীনের বাড়ী থেকে ফিরতে আমার রাত ন'টা হয়েছিল। যখন বাড়ী ফিরলুম, তখন খুব বৃষ্টি আর সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ঝাপ্‌টায় গাছেরা উঁচু মাথা নুইয়ে নুইয়ে যেন ধ্বংস-দেবতার পায়ে করুণ মিনতি জানাচ্ছে! আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে তীক্ষ্ণ তরোয়ালের ফলার মত বিদ্যুৎ ঝলকে উঠ্‌লো।

আর যদি দু মিনিট বাড়ী আসতে দেরী হতো, তো পথেই শিল আর ঝড়ে আমাকে থেঁতো ক'রে দিত!

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ীর বারান্দায় উঠে এসে যেন দম নিয়ে বাঁচলুম।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই প্রকৃতির উগ্রসুন্দর রূপ-লীলার একটু নমুনা দেখছিলুম—কিন্তু ঝড়ের ঝট্‌কা সইতে না পেরে অবশেষে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই হ'ল।

আমি তখন রবীন্দ্রনাথের পয়লা নম্বর গল্পটী মনে ক'রে ভাবছিলুম,—কে জানে যে আমারো এই অবহেলার,—না, না, অবহেলায় তো ঠিক নয়, ঔদাস্যের তলে কোন সিতাংশু মৌলি পরিপুষ্ট হচ্ছে কি না ?

এই মেয়েগুলো যে কি ভয়ানক সহ্য-শক্তি নিয়ে জন্মায়, তা ভাবলেও রাগ হয়! যখন শোকের ঘা খেয়ে বুক ভেঙে-চুরে গেছে, তখনো মুখের অবিচল ভাব বজায় রেখে হুকুম পালন করাকেও কি আর প্রেমের আনুগত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া চলে!

তা চলে না,—তা এর আগে কেন যে বুঝিনি, তাই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি!

হোক্ শচীন খেয়ালী লোক! তবু ভালো করে ভেবে দেখ্‌লে তার যুক্তিগুলি যে সব নিতান্তই অকাট্য, তা স্বীকার করতে হয়!

না,—আমার স্ত্রী আমাকে ভালেবাসে না, এই ঠিক!

মনটা বিষিয়ে উঠ্‌লো। ঘরে ঢুকে দেখলুম, স্ত্রী চুপ ক'রে শুয়ে আছে, টেবিলের কাছে পেতলের ঢাকা-দেওয়া আমার খাবার রয়েছে।

আমাকে খাবারটা দেখিয়ে খেতে বলে স্ত্রী যেন আরামের নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচ্‌লো!

আমি বললুম, "জ্বর গায়ে আবার খাবার তৈরী করতে গেলে কেন ? কিছু আনিয়ে খেলেই তো চলতো।"

স্ত্রীর তরফ থেকে কোনো জবাব পেলুম না। মনে করলুম, ওর তো কথা বলা না, ব্যাগার ঠেলা,—তা সে দুর্ভোগ আর কত পোহাবে ?

কি সর্ব্বনাশ! এই সসর্প গৃহে বাস ক'রে কি না আমি দিন-রাত কাটাই ?

সমস্ত শরীরে যেন বিষের দহন সুরু হয়েছিল! ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় বাড়ী ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করছিল!

যে নিদ্রার বহরের আভাস দেখে আমার দৈহিক আকৃতির সামঞ্জস্য বুঝিয়ে বন্ধুমহলে 'মহিষ' আখ্যায় অভিহিত হয়ে আসছিলুম, ইদানীং কিনা সেই দেবীও বিমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন!

বুঝি, এই মন-ভূমি তপ্ত দেখে তিনি এখানে নামতে ভয় পাচ্ছিলেন।

ঘুম আসছিল না বলে একখানা নভেল হাতে ক'রে, মাথার কাছে বাতি জ্বালিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল,—কাল-বৈশাখীর ঝড় ঝাপ্‌টার হুঙ্কার-শব্দও আর তেমন বোঝা যাচ্ছিল না।

হঠাৎ, ও কি ?

কপাটে কে যেন মৃদু টোকা মারছে না? তাই তো! ঠিক্,—ওই যে খুব চাপা গলায় কে যেন ডাক্‌ছে, "অনু—"

একবার, দুবার শুনলুম,—তৃতীয় বারে দেখলুম, স্ত্রী সেই জ্বর-গায়ে উঠে টল্‌তে টল্‌তে দুয়োর খুলে বেরিয়ে গেল।

কোথায় গেল, কে জানে ?

এমন হয়তো বা রোজই যায়! আমার সারাদিনকার হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পর গভীর ঘুম,—ঘুমুলে তো কিছু টের পাইনে!

ছি, ছি! এই কি আমার উদার বিশ্বাসের প্রতিদান! হায় পাষাণী!

সত্যিই কি আমার অমু এত নীচ!

উঠ্‌বো উঠ্‌বো করছি, এমন সময়ে, ডান হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছতে মুছতে স্ত্রী ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেও না যে, আমি জেগে আছি, কি ঘুমিয়ে আছি!

আচ্ছা, ঠোঁট মুছতে মুছতে আসবার মানে কি?

ওকে এত রাত্রে এসে কে ডাক্‌লে? ভাবলুম, জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, কি বলে? কিন্তু স্ত্রীর কাছে মনের এই সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিতে ভারী লজ্জা বোধ হল,—মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারা গেল না!

কেবলি ভাবতে লাগলুম। এ কি অসম্ভব বাতিক এসে আমাকে পাগল করে তুল্‌ছে! এমন তীব্র সংশয়ের পীড়ায় কি মানুষ স্থির হয়ে থাকতে পাবে?

রাতটা তো ধরতে গেলে অনিদ্রাতেই কেটে গেল। কেবলি ভাবতে লাগলুম, এর পরে কি করি? একবার ভাবলুম, রাত পোহাতেই তো অফিসে ছুটির দরখাস্ত করতে হবেই,—না হয় দিনকতক পশ্চিম-টশ্চিম ঘুরে এসে দেখি, বাতিক ঘোচে কি না?

ভোরের দিকে যদি বা একটু তন্দ্রা এসেছিল, তা বাইরে গয়লানীর ও ঘরে ছেলের চ্যাঁচানিতে সেটুকুও টুটে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম।

২

প্রচুর রৌদ্র ও ভোরের তপ্ত আলো ঘরের রুদ্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে এসে কাজের ডাক্ জানিয়ে দিচ্ছে, তবু দেখি, স্ত্রী বিছানায় শুয়ে আছে!

আমি জানি, এমন তার স্বভাব নয়! কাছে গিয়ে দেখি, জ্বর খুব বেশী-রকম বেড়ে গিয়েছে,—প্রায় অজ্ঞান বললেই হয়!

আমার ছুটী নেওয়াও হল না, কোন খানে বেরুনোও হ'ল না,—আমি স্ত্রীর সেবায় একান্তভাবে লেগে রইলুম! আর সে যে কি মনে, তা কেবল আমিই জানি,—আরে ছি, ছি, এও কি আমার কাজ? অবশ্য শয্যাগতা স্ত্রী ফেলে, এ ক'দিন শচীনের আড্ডায় যে যাওয়া হয় নি, তার দরুণ মনটা অনেকখানি সহজ ছিল বটে, কিন্তু সেই যে মৌমাছির হুলের মত সেই খোঁচার জ্বালা, সে তো একেবারে ঘোচে না! এখনও তো প্রমাণ করতে পারি নি যে, আমার সেই বাতিক শুধুই বাতিক। আর তা যতক্ষণ না পারছি ততক্ষণ কি আর স্বস্তি আছে?

প্রায় এক সপ্তাহের উপর কেটে গেলে পর স্ত্রীর জ্বর কমে তার জ্ঞান হ'ল। যাঁরা চিকিৎসা করছিলেন, তাঁরা বললেন, দুধ বালি ক'রে দেবে কে? ঝীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম যে, সে বালি তৈরী করতে জানে কি না, সে যে-ভাবে মাথা নেড়ে গেল, তাতে তার মাথা-মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলুম না!

সন্ধ্যা বেলায় ব্যাথো কোম্পানির দোকানে গিয়েছিলুম একটা ওষুধের দরকারে, ফিরে আসতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। এসে দেখি, কে একজন বিধবা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে ঝিনুকে ক'রে আমার স্ত্রীকে দুধ-বালি খাইয়ে দিচ্ছেন। আমাকে দেখে চট্‌ ক'রে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন!

আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে বললুম, "বালিটা সব খেয়েছ তো!"

এই ক'দিন আমার একটু শান্ত ভাব দেখেই হোক বা যে কারণেই হোক, আমার স্ত্রীর আর ভীত ভাবটা তত বেশী ছিল না, সে বল্‌লে, "খেয়েছি,—কিন্তু ও বালি খাইনি, আমার বালি এসেছিল,—"

"এসেছিল?"

"হ্যাঁ গো,—উনি এনেছিলেন। ঝী যে বিশ্রী বালি করে, খাওয়া যায় না। সেই প্রথম দিন যা বালি পেয়েছিলুম, সেই, তার পর এই আজ খেলুম।"

"প্রথম দিন মানে?"

"সেই যে রাত-দুপুরে দিদি এসে আমাকে ডাক্‌লেন, আমি বালি খেয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুক্‌লুম, তুমি তো জেগেই ছিলে তখন? তোমার খাবারও তো উনিই তৈরী ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন,—উনি তো আর তোমার সামনে বেরুবেন না,—বউ মানুষ!"

হতবুদ্ধিভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, "উনি কে?"

"এই যে পাশের বাড়ীর বড় বউ। আমাকে বড্ড ভালোবাসেন।"

"ও!"

অনেক দিন পরে এই রাত্রে খুব গভীর ঘুম ঘুমিয়ে নিলুম,—বুকের বোঝা যেন নেমে গেল! কি ভুল! আমি যেন পাগল হতেই বসেছিলুম!

পালিশ-করা রং আর স্থূল দেহখানির বহর দেখে বন্ধু-বান্ধবেরা দয়া ক'রে যে সব সুনাম দিয়ে থাকেন, এখন দেখি, আমার এই মাথাটিও সে-সব সুনাম পাবার অনুপযুক্ত নয়!

সকালে উঠে পুবের জান্‌লা খুলছি, এমন সময়ে স্ত্রী প্রশ্ন করলে, "হ্যাঁ গা, দেখ তো আজ কি তারিখ? বাংলা তারিখ দেখো, ইংরিজী নয়,—"

ক্যালেন্ডারে চোখ রেখে বললুম, "তাই তো! আজ যে বর্ষারম্ভ! আজ পয়লা বোশেখ।"

"হুঁ, আমিও তাই ভেবেছিলুম। বেরিয়ো না, একটু এদিকে সরে এসো, প্রণাম করবো যে!"

"প্রণাম করবে?"

শীর্ণ মুখে ভোরের কাঁচা আলোর মত হাসি ফুটিয়ে তুলে স্ত্রী বললে, "বাঃ! আজ আমাদের বিয়ের তারিখ, মনে নেই?"

বৈশাখের স্নিগ্ধ নবারুণের কিরণ-মালা আমাদের প্রণাম ও তার প্রতিদানকে অভিনন্দিত করে যেন জানিয়ে গেল—

সুপ্রভাত! সুপ্রভাত।

শ্রীনীহারবালা দেবী।

আহ্বান

মুখের হাসিতে আর
বুকের বেদনা সই
ঢেকে কত রাখ্‌বো,
জোর কোরে মন বেঁধে
আড়ালে লুকিয়ে কেঁদে
কত কাল থাক্‌বো!

যেদিন বিদায় নিলে
মনে পড়ে, বলেছিলে
'দু-দিনেই আস্‌বো',
তুমি কি ভুলিলে সই,
নেই মোর এক বই
ভাল' যারে বাস্‌বো।

হৃদয়ে রাখিয়া যায়
পলকে হারাতে, হায়!
কি দিন্‌ই সে যাপ্‌ছে,
কে বুঝিবে সেই কথা
তোমার বিরহ-ব্যথা
কি প্রাণে সে চাপ্‌ছে।

দিবানিশি দেখে তবু
দু'জনার কারো কভু
যেতো না যে তিয়াষা,
ভুবনে কি ছিল মধু,
নয়নে কি প্রেম, বঁধু
মরমে সে কি আশা!

দিবশ পবশ মাগি
আজ আমি নিশি জাগি
অধর কি তিক্ত,
হে মোর আময়, তুমি
এস,' তারে চুমি চুমি
কর সুধা-সিক্ত।

আজি দিকে দিকে প্রীতি
ভাব' ওঠে বনবীথি
চম্পক-গন্ধে,
এস তুমি অনুরাগে
নিখিল ভুবন জাগে
নব গীতি-ছন্দে।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়*

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর সে-সময়কার বড়লাট লর্ড্ হার্ডিং কর্তৃক প্রথম প্রোথিত হয়। সে-সময় উৎসবেরও আয়োজন হইয়াছিল এবং সেই উৎসব উপলক্ষে কাশ্মীর, যোধপুর, বিকানীর, কিষণগড়, আলোয়ার, নাভা, দতিয়া, ঝালাওয়াড় এবং কাশীর মহারাজা; ইউনাইটেড-প্রভিন্স, বিহার এবং

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ

উড়িষ্যা ও পাঞ্জাবের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর; সার্ জে, সি, বসু, সার্ পি, সি, রায়, ডাক্তার হেরাল্ড মান, ভারত-গভর্মেণ্টের তাৎকালিক শিক্ষাসচিব সার শঙ্করন্ নায়ার প্রভৃতি ভারতের সুধীগণ, বিভিন্ন প্রদেশবাসী রাজামহারাজগণ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুরুষ ও মহিলাবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ম্মাণকল্পে দুই মাইল দীর্ঘ এবং এক মাইল প্রস্থ ভূমি প্রায় ছয় লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়। এই স্থান কাশী হইতে একটু দূরে অবস্থিত। এই স্থানের জলবায়ু অতি সুন্দর। বিদ্যার্জ্জনের জন্য আশ্রমের পক্ষে যেরূপ নির্জ্জনতা প্রয়োজন এ স্থান তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোহর। দিগন্তবিস্তৃত আকাশের নিম্নে গঙ্গাতটান্তর্লীন এই উন্মুক্ত উদার ক্ষেত্র, প্রাচীন ঋষিগণের বেদধ্বনি-মুখরিত শান্ত-শীতল আশ্রমের কথা মনে করাইয়া দেয়।

এই ভূমিপ্রাপ্তির পর বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত বিভিন্ন ভবনগুলির নক্‌সা প্রস্তুত হয় এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাস্তা সকল নির্ম্মাণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। বিগত মহাসমরের অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন এবং

* হিন্দী সরস্বতী হইতে অনুদিত।

উপকরণাদির দুর্ম্মূল্যতা ও অভাব নিবন্ধন নানা অসুবিধা সত্ত্বেও প্রায় সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত যে প্রাসাদাবলী এ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাদের নাম:—আর্টস্ কলেজ, ফিজিক্যাল লেবরেটারী, কেমিকেল লেবরেটারী, পাওয়ার হাউস্, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্পর্কীয় কয়েকটি ওয়ার্কশপ্, দুইটি হোষ্টেল (যাহাতে ৬২৪ জন ছাত্র থাকিতে পারে) এবং অধ্যাপকগণের অবাস্থিতির জন্য কতকগুলি ভবন। বর্ত্তমান সময়ে তৃতীয় হোষ্টেল নির্ম্মিত হইতেছে। এই সকল হোষ্টেলে নয় শত ছাত্র থাকিবার মত ব্যবস্থা করা হইবে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইতেছে,—

(১) হিন্দুশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ভাষার বিশেষরূপ অনুশীলন। ইহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্র এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতার আলোচনা হইবে। এইরূপ আলোচনার ফলে হিন্দুজাতির অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধিত হইবে।

(২) কলা ও বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় বিশেষ রূপে শিক্ষাদান এবং তদ্বিষয়ক বিশদ আলোচনা।

(৩) দেশীয় শিল্পশালার উন্নতি এবং দেশের মৌলিক সম্পত্তিকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক, শাস্ত্রীয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষা দানের প্রচেষ্টা।

(৪) ধর্ম্ম ও নীতিকে শিক্ষার পূর্ণ অঙ্গ মনে রাখিয়া তদনুসারে নবযুবকগণের চরিত্র-গঠনে প্রোৎসাহন।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলির সম্পূরণার্থ এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ধর্ম্মতত্ত্ব এবং প্রাচ্যবিদ্যাশিক্ষার জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রয়োগাত্মক এবং সিদ্ধান্তমূলক দ্বিবিধ কলা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দুইটি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং খনিবিদ্যা-সম্বন্ধী প্রয়োগশালা সকল পৃথক্ ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য ট্রেনিং কলেজেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে মেকানিকেল এবং ইলেক্‌ট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ডিগ্রি প্রদানের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। প্রয়োগশালা সকলে ইন্‌ডস্‌ট্রিয়েল কেমেষ্ট্রী, মাইনিং, মেট্রলজী প্রভৃতি শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ঔষধ, বাণিজ্য এবং কৃষি সম্বন্ধীয় কলেজ-স্থাপন এখনো বিচারাধীন রহিয়াছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রয়িং ক্লাস, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংগঠন

'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়' এই নামেই ইহার বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে। হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র এবং হিন্দু-ধর্ম্ম-সম্বন্ধী শিক্ষা-দানের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ প্রকার ব্যবস্থা করা হইবে। হিন্দু ছাত্র-গণের পক্ষে ধর্ম্ম-শিক্ষা অনিবার্য্য। জৈন ও শিখ ছাত্রগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানার্থ এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জৈন ও শিখ সদস্যগণের সব্-কমিটি দ্বারা বিশেষরূপে ব্যবস্থা করা যাইবে। যে কোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সঞ্চালক কেবল হিন্দু মাত্রেই তাহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত

হইতে পারিবেন। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে হিন্দুজাতীয়ের উপরে তাহাদের বিশেষরূপ অধিকার রক্ষিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে সকল শ্রেণীর এবং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সকল জাতির স্ত্রী-পুরুষের এখানে প্রবেশাধিকার আছে। এই জন্য ছাত্রদের অবস্থা বিবেচনায় বিনা-বেতনে বা অর্দ্ধ-বেতনে পড়িতে দেওয়া, এবং মেরিট ও ফেলোশিপের সাধারণ বৃত্তিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রও শিক্ষালাভ করিতেছে; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্প। অ-হিন্দু ছাত্রগণের পক্ষে হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্বন্ধী শিক্ষা অনিবার্য্য নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক ব্যতীত জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেছেন।

সার্ব্বদেশিক প্রতিষ্ঠান

এই বিশ্ববিদ্যালয় এক সার্ব্বদেশিক প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ইহার রেক্টর। মহীশূরাধিপতি ইহার চ্যান্‌সেলার এবং গোয়ালিয়রের মহারাজ সিন্ধিয়া প্রো-চ্যান্‌সেলার। এতদ্ব্যতীত মহারাজ বরোদা, মহারাজ কাশ্মীর, মহারাণা উদয়পুর, মহারাজ জয়পুর, মহারাজ যোধপুর, মহারাজ বিকানীর, মহারাজ কিষণগড়, মহারাজ আলোয়ার, মহারাজ কোটা, মহারাজ ইন্দোর, মহারাজ পাতিয়ালা মহারাজ নাভা, মহারাজ কাশী, মহারাজ দতিয়া, মহারাজ রাওল, ডোঁগরপুর মহারাজা রাণা ঢোলপুর, মহারাজ কর্পূরতলা, মহারাজ ঝালাওয়াড় ও বোম্বাই,
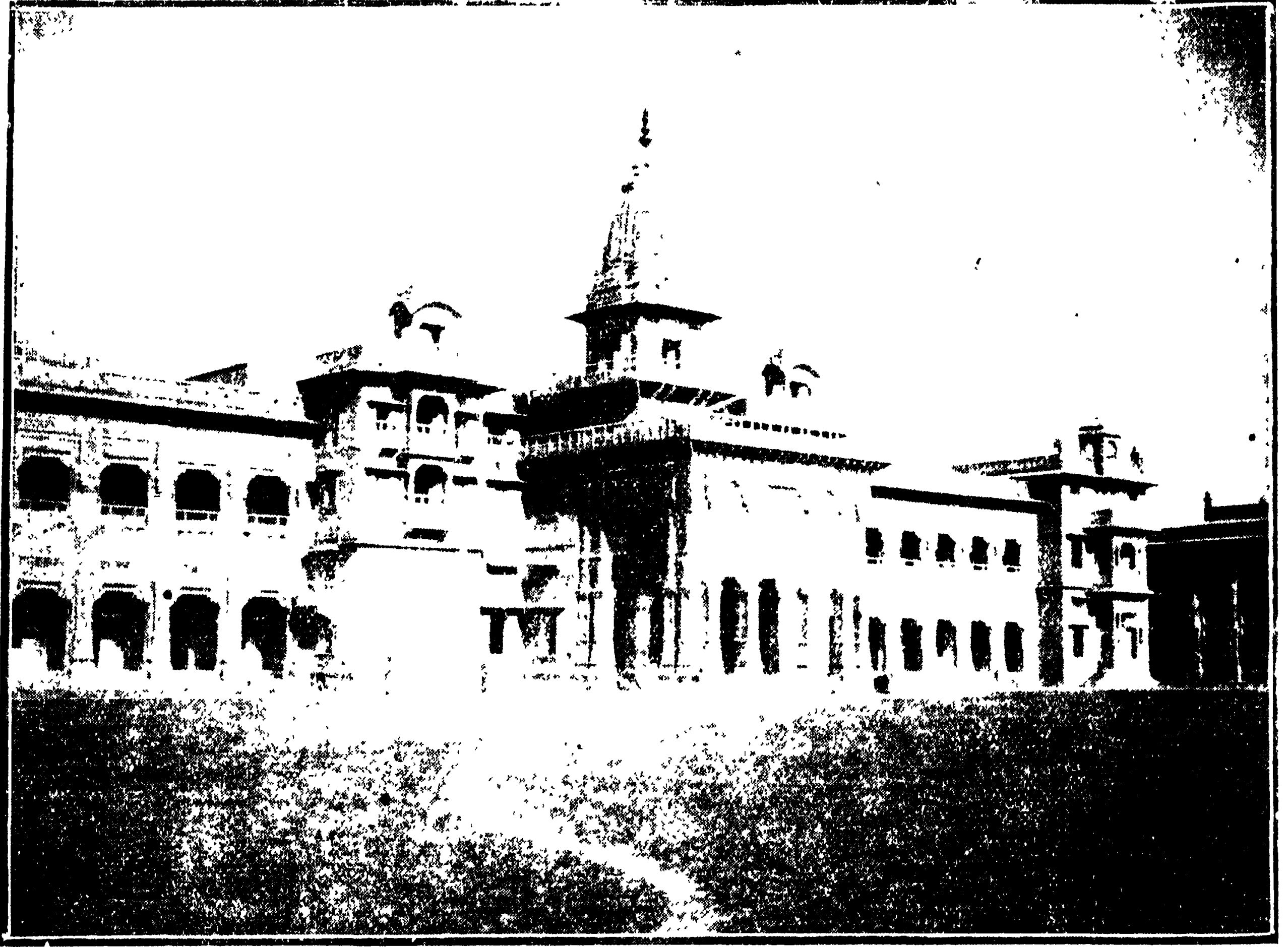
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্‌স্ লেবরেটারী

মাদ্রাজ, বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব এবং বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর এবং বৃটিশ ভারতের উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ ইহার সংরক্ষক। ইউনাইটেড-প্রভিন্সের গভর্ণর ইহার পরিদর্শক। ভারতীয় রাজন্যগণের মুক্ত হস্তের উদার দান ব্যতীত এই বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভারত গভর্মেণ্ট হইতে এক লক্ষ টাকা; যোধপুর ও পাটিয়ালা রাজদরবার হইতে চব্বিশ হাজার টাকা; মহাশূর কাশ্মীর,বিকানীর রাজদরবার হইতে বারো হাজার টাকা করিয়া বার্ষিক সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। ইহা ব্যতীত অন্য ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী দাতৃবর্গের প্রদত্ত চাঁদায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ম্মাণ এবং পরিচালন কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ইহার কোর্ট, কাউন্সিল, সিনেট এবং ফ্যাকাল্‌টির সদস্য এবং ইহার অধ্যাপক ভারতের সকল প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। বৃটিশ ভারতের কোনো প্রান্তস্থ বা কোনো দেশীয় রাজার রাজ্যান্তর্গত যে-কোনো স্কুল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দানের জন্য ছাত্র প্রেরণ করিতে পারেন। যে-সকল ছাত্র বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, এলাহাবাদ, পাঞ্জাব, পাটনা, ঢাকা, লক্ষ্ণৌ এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন অথবা কোনো ভারতীয় রাজার স্কুল-লিভিং-সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন অথবা ইউরোপীয়ান স্কুলের শেষ পরীক্ষায় কিম্বা চীফ্‌স্ কলেজের ডিপ্লোমা পরীক্ষার ন্যায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—সেই সকল ছাত্রকে সিণ্ডিকেট এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিতে পারেন। এইরূপে বহু ছাত্র ভর্ত্তি হইতেছে।

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ওয়ার্কশপ্ এবং পাওয়ার হাউস্

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা ও তাহার অধিকার

এই বিশ্ববিদ্যালয় আপনার চ্যান্‌সেলার ও প্রো-চ্যান্‌সেলার মনোনীত করিতে পারেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়

আপনার ভাইস্ চ্যান্সেলার ও প্রো-ভাইস্ চ্যান্সেলারও নির্ব্বাচন করিতেছেন। কিন্তু শেষোক্ত দুই পদের নির্ব্বাচনের সময় পরিদর্শকের স্বীকৃতি প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় তাহার ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রি পরীক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন; পরীক্ষকও নির্ব্বাচিত হইতেছে। কোনো পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের প্রত্যেক বিষয় বা বিষয়সমূহের জন্য সিণ্ডিকেট নিয়মানুসারে ন্যূনপক্ষে বাহিরের একজন পরীক্ষক গভর্ণর-জেনারেল ইন্-কাউন্সিলের কোনো আইনসমর্থিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধী পদবীর ন্যায় গভর্মেণ্টের গ্রাহ্য হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট এবং উহার সিনেট আপনার ষ্ট্যাচুট এবং রেগুলেশনের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি করিবার পূর্ব্বে পরিদর্শকের স্বীকৃতি প্রয়োজন এবং কোনো কোনো বিষয়ে গভর্ণর জেনারেলেরও
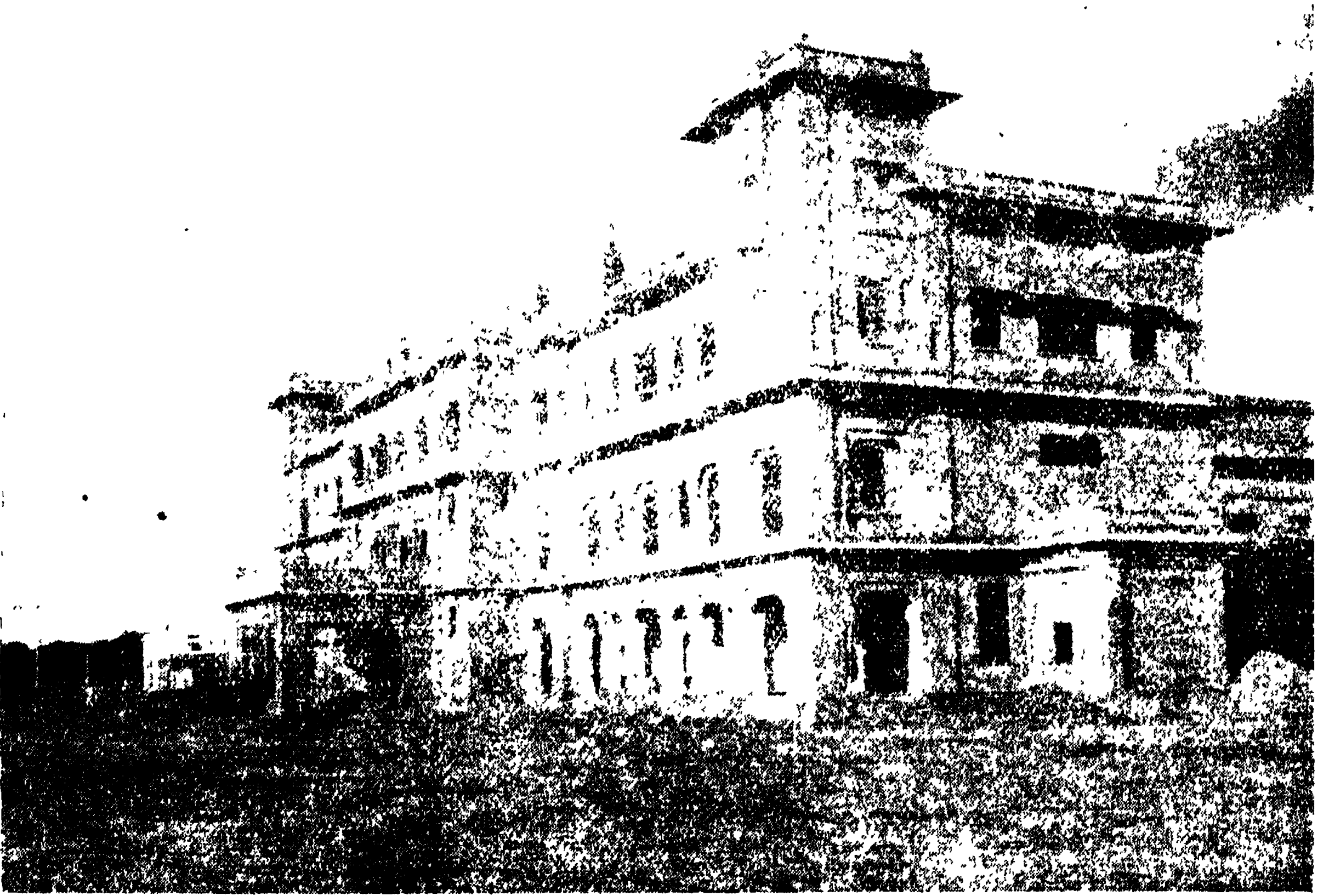
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওয়ার হাউস

নিযুক্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই চারি বর্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ২৫০ জন ছাত্রকে বি, এ, ও বি, এস, সি এবং এম, এ, ও এম, এস, সি এবং লাইসেনসিয়েট্ অব্ টীচিং (L. T.) উপাধি প্রদান করিয়াছেন। বেনারস-হিন্দু-ইউনিভার্সিটী য়্যাক্টের ১৬ ধারা এই অধিকার দিয়াছে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত কোনো ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট অথবা শিক্ষা-বিষয়ক পদবী, সম্মতি আবশ্যক। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা বৃটিশ ভারতের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী নহে এবং অন্য কোনো ইউনিভার্সিটী এত অধিক কার্য্য কারণের অধিকারও প্রাপ্ত হয় নাই। বাস্তবিকই সন্তোষের বিষয় এই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অনুরোধ বেনারস-হিন্দু-ইউনিভার্সিটীর সংগঠন-কর্ত্তাদের দ্বারা প্রথমেই

হয় স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ইহারই আদেশে পরে এখানে অন্য Teaching and Residential University রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব ও সংগঠন হয়।

বিরলা হোষ্টেল

এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থিগণের চরিত্রগঠন শিক্ষার একটি অঙ্গ বলিয়া মনে করেন; এবং এই উদ্দেশ্যে চরিত্র-গঠন প্রথায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থা

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব প্রত্যেক ... একাউন্টেন্ট দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ... গেজেটে প্রকাশিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় এ-পর্যান্ত প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই টাকার মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীয় নিয়মানুসারে স্থায়ী ভাণ্ডারে জমা আছে। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। প্রায় ১৩০০ একর ভূমি খরিদ করিতে এবং কলেজ, লেবরেটারী, হোষ্টেল ও অধ্যাপকগণের বাসভবন নির্ম্মাণে এ-পর্যান্ত প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বার্ষিক আয় সাত লক্ষ টাকার অধিক। ইহার বার্ষিক ব্যয়ের কতকাংশ বর্ত্তমান সময়ে দান হইতে নির্ব্বাহিত হইতেছে। আধুনিক Residential and teaching ইউনিভার্সিটীর সংগঠন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-কার্য্য আরম্ভ করিবার সময়েই ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। এজন্য এককালীন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দানের এবং বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা দানের আবশ্যকতা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ সংগ্রহ হইলেই এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-সংগঠন কার্য্যকে সমুন্নত করিতে সমর্থ হইবে। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলেজ সকলের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজই প্রধান। মেকানিকেল্ এবং ইলেকট্রিকেল্ ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার ডিগ্রির জন্য এখানে ছাত্র প্রস্তুত হইতেছে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বি-এস, সির ন্যায় এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায়

মেকানিকাল লেবরেটারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

উপাধিধারিগণের গৌরব আছে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটীর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য ছাত্র গৃহীত হইতেছে। এই ব্যবস্থায় তাহারা এদেশে তাহা অধ্যয়ন করিয়া উক্ত ইউনিভার্সিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। এইরূপ ক্লাসও খোলা হইতেছে—যাহাতে নানাপ্রকার শিল্প-শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। প্রায় ২৫০ জন ছাত্র এই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। ভূগর্ভ-শাস্ত্র, খনিবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার্থী ছাত্রগণের জন্য একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। মাইনিং, ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে ডিগ্রি দিবার জন্য শীঘ্রই পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হইবে। যদি সাধারণের উপযুক্ত সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া যায় তাহা হইলে এই সংস্থা বিনা আয়াসে প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত হইতে পারিবে। এই সংস্থা ভারতের সকল প্রান্তস্থ ছাত্রগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান দ্বারা ভারতীয় ছাত্রগণের এক কঠিন অভাব পূর্ণ হইল। এজন্য ইহা সকলের সাহায্য পাইবার উপযুক্ত।

কৃষি, বাণিজ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটা ফণ্ডের আবশ্যকতা আছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরী, এক ছাপাখানা, এক শিল্প ও অর্থ সম্বন্ধী মিউজিয়ম, প্রয়োগাত্মক রসায়ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখার শিক্ষাদানের জন্য এক টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট, চাঁদমারী, সিনেট হল এবং শারীরিক ও সৈনিক শিক্ষার জন্য ব্যায়ামশালা অস্ত্রশালা ও ড্রিল শেড প্রস্তুত করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। একটি রাইডিং স্কুল শীঘ্রই খোলা হইবে। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র সৈনিকের কাজ-কর্ম্ম চাহিবে সেই সকল ছাত্রকে তদ্বিষয়ক শিক্ষা দিবার প্রস্তাব এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই সকল ছাত্রকে এই বিষয়ে শিক্ষা এমন ভাবে দেওয়া হইবে যে, তাহারা সৈন্যবিভাগে রেগুলার আর্ম্মি অথবা টেরিটোরিয়েল ফোর্সে চাক্‌রী পাইতে পারে। ভারত গভর্মেণ্ট, অফিসার-ট্রেনিং কোর গঠন সম্বন্ধে প্রস্তাবটি প্রথমেই অনুমোদন করিয়াছেন।

উপরে যে-সব বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের এক সার্ব্বদেশিক প্রতিষ্ঠান। ইহা হইতে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল স্ত্রী-পুরুষ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। যাঁহাদের উপর এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভার অর্পিত হইয়াছে তাঁহারা ইহাকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র সংগঠন বিষয়ে প্রযত্ন করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশের নব-যুবকগণকে জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবে। সেই সঙ্গে তাঁহাদিগকে চরিত্র বলে এমন বলী করিয়া তুলিবে, যাহাতে তাঁহারা প্রকৃত দেশভক্ত এবং জনসেবাপরায়ণ হইতে পারেন।

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্বরলিপি

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে।
এ পথে যখন যাবে
আঁধারে চিনিতে পাবে
রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেচে মন্দিরে।

আমারে পড়িবে মনে কখন সে লাগি।
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।
ভয় পাছে শেষ রাতে
ঘুম আসে আঁখিপাতে
ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদিরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

II { পন্ধা -ধপা। পমা -গা সা I গা -মা। পধপা -মপা পমা I গা -া। -া -া -া I
দী প নি ॰ বে গে ॰ ছে ॰॰ ম ম ॰॰ ॰ ॰ ॰

(গপা পা। পা -া পন্ধা I পন্ধা -ধপা। পা -মগা -রগ) } I মগা -রা। সা -া -া I রসা
নি শী থ ॰ স মী ॰ ॰ রে ॰ ॰ ॰ ॰ ধী ॰ রে ॰ ॰ ধী

-না । সা -া -া I সা সা । সগা -া মা I পা -না । না -া -র্সা I ধা -র্সা । -র্সনা -পা
০ রে ০ ০ এ সে তু ০ মি যে ০ ও ০ ০ না ০ ০ ০

না I নধা -র্সা । র্সনা -া -জ্ঞা II
গো ফি ০ রে ০ ০

II পা পা । পনা -া না I র্সা -া । র্সা -া র্সা I পসা -র্সনা । নধা -া -র্সা I র্সনা -া ।
এ প থে০ ০ য থ ন যা ০ বে আঁ ০ ধা ০ ০ রে ০

-া -া -া I নর্সা র্সনা । র্সা -া -না I ধনা -র্সনা । নপা -া -া I পা পা । পধা -া -া I মা
০ ০ ০ চি০ নি তে ০ ০ পা০ ০ ০ বে ০০০ র জ নী০ ০ ০ গ

-া । মগা -া মা I মরা মা । মগা -া -া I গা মা । পা না -া I র্সা -নর্রা । র্রর্সা -া জ্ঞা I
ন্ ধা ০ র গ ন ধ ০ ০ ভ বে চে ম ন্ দি ০০ রে০ ০ ০

ধপা -া । মা া -া I পমা -া । গা -া -া I "এসে তুমি··· ···ফিরে, পূর্ব্বের ন্যায় II
ধী০ ০ রে ০ ০ ধী০ ০ রে ০ ০

II সা সগা । গা -া গা I গা গা । গা -া মা I রগা -রা । রপা -া -া I মপা -া ।
আ মা০ রে ০ প ড়ি বে ম ০ নে ক০ ০ থ০ ০ ন্ সে ০

মা -গা গা I গপা মা । গা -া পা I পমা গা । রগা -রা সনা I সা -া । -পা -া জ্ঞা I
লা ০ গি প্র০ ৎ রে ০ প হ বে আ০ ০ মি০ গা ০ ০ ০ ন্

পজ্ঞা -না । ধপা -া -া I পমা -গপা । পগা -া -া I পা -া । না -া না I র্সা -া । র্সা
গে০ ০ সে ০ ০ জা ০ ০ গি ০ ০ ভ য় পা০ ০ ছে শে ষ রা

-া র্সা I র্সা -না । নধা -া -নর্সা I র্সনা -া । -া -া I র্সা র্সনা । নধা -া -নর্সা I র্সনা
০ তে ধু ম আ ০ ০০ ছে ০ ০ ০ আঁ খি পা ০ ০০ তে

-া । -া -া া I পা -র্সা । র্সা র্সনা -ধা I ধপা -ধপা । মা -গা গা I গা -া । মা -া -গপা I
০ ০ ০ ০ ক্লা ণ্ ত ক ন্ ঠে ০ ০ মো ০ র সু র্ ফু ০ ০ ০

পগা -া । -া -া না I র্সা -নর্রা । র্গর্রর্সা -া -া I ধপা -া । মা -া -া I মপা -মা । মগা -া
রা ০ ০ য় ম দি ০ ০ বে০ ০ ০ ধী০ ০ রে ০ ০ ধী ০ রে ০

-া I এসে তুমি······ফিরে ; পূর্ব্বের ন্যায় II II
০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেকালের জন্তু-জানোয়ার

সেকালের জানোয়ারদের যে-সব বিকটাকার ছবি মাঝে মাঝে আমাদের চোখে পড়ে, তা দেখে আমাদের সন্দেহ হয়, এ সব জন্তু সত্যই কোনকালে পৃথিবীতে ছিল, না এ শুধু কল্পনার ছবি! কিন্তু জীব-তত্ত্বে যে-সব গভীর আলোচনা আর গবেষণা চলেছে, তাতে এ সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই বলেই বুঝেছি। হিপোপটেমাস প্রভৃতি বিকটাকার জন্তুদের যে সব ছবি এখন কাগজে বেরুচ্ছে, সেগুলো প্রকৃত জীবের, কাল্পনিক নয়। ইথিয়োসেরসের নাম অনেক দিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। কারণ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা এই প্রাণীর শরীরের গঠন-প্রণালী নির্দ্ধারণ করবার জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার করেছেন এবং সেই শ্রমের ফলে আজ ক'বৎসর হল, হিরাকডনের আকৃতির একটা প্রকৃত ছবি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মের ডাক্তার
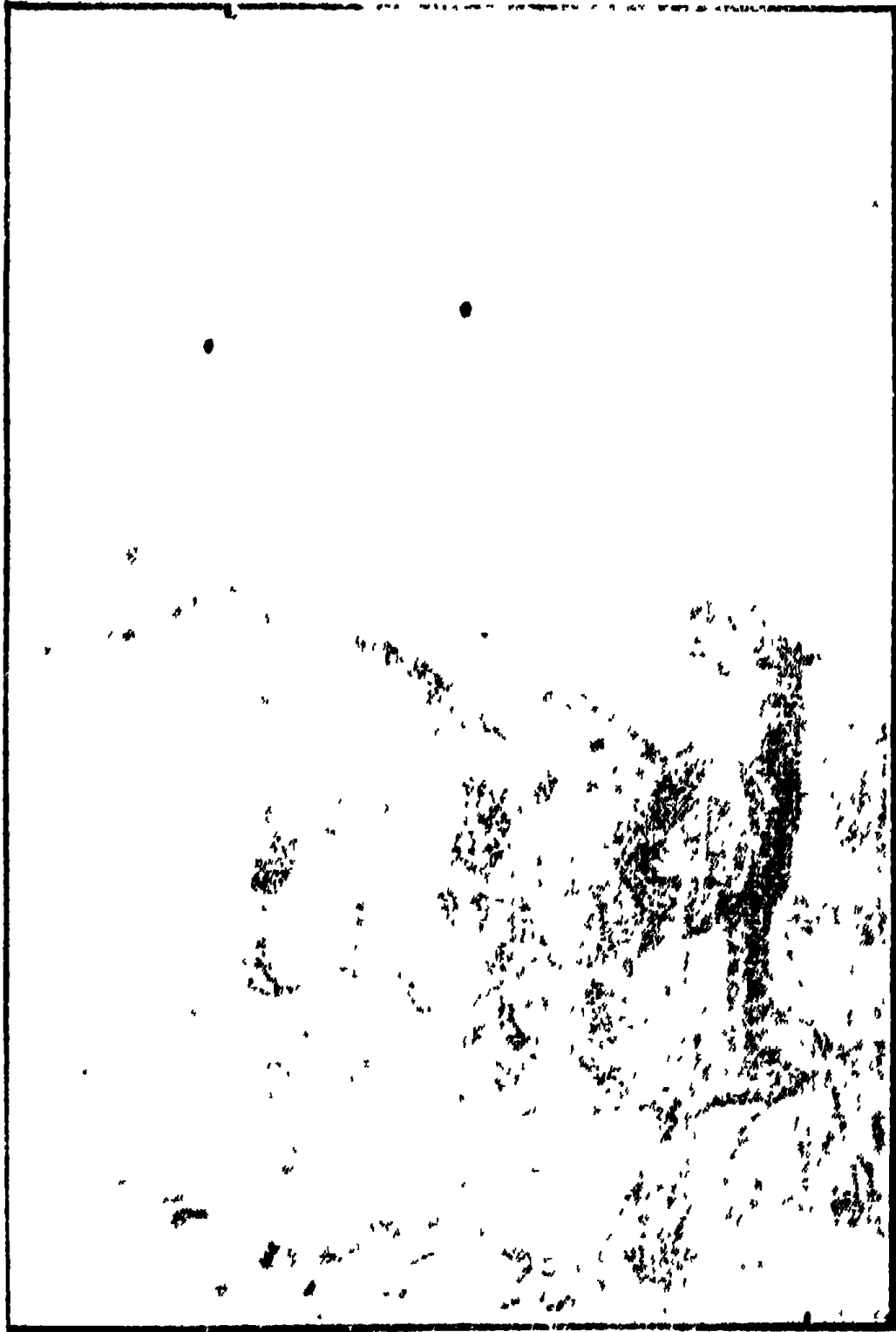
আদিম যুগের ঘোড়া

হেনরি উডওয়ার্ড, সি ডব্লিউ এণ্ড্রুজ, ও ডাক্তার রামসে ত্রাকুয়ার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের সুনিপুণ গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফলে আধুনিক সাহিত্য আদিম যুগের বিবর্ত্তনের ধারাটুকু মানুষের চোখের সামনে ধরতে পেরেছে। এখানে যে ছবি দেওয়া হলো, সেগুলি ডাক্তার হেনরি, আর, নাইপ, এফ. এল, এস্, তাঁর Evolution

শুঁওয়ালো দন্ত
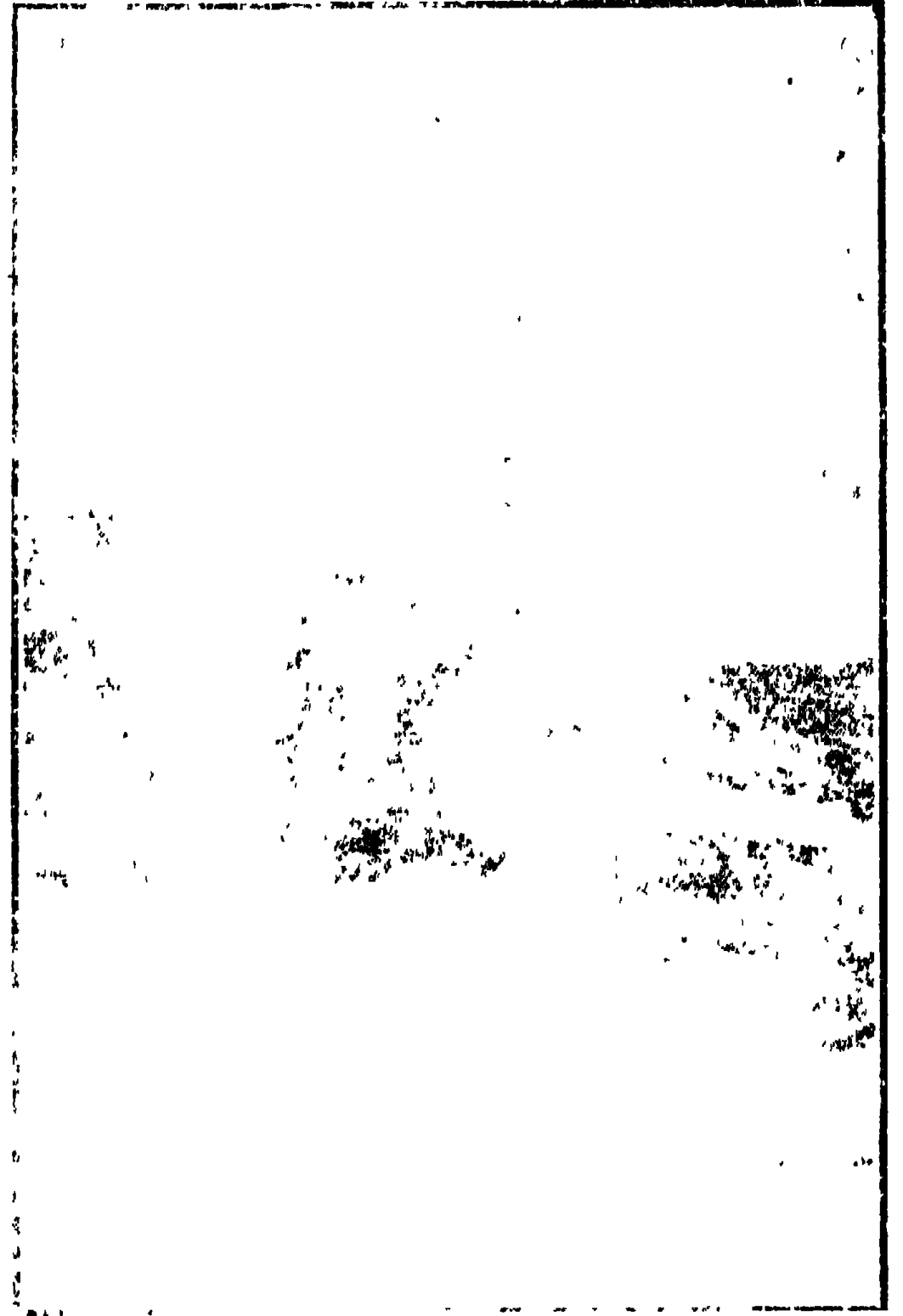
ল্যাজের জোরে এরা যুদ্ধ করত। এদের ল্যাজের ঝাপটায় অন্য প্রাণী এদের কাছে এগোনো ভার ছিল। এদের কাছাকাছি সমুদ্রের ধারে সেকালের মানুষ কি করে বাস করত, ভাবনার কথা!

of the Past নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই সব ছবি বহু গবেষকের ক্রমিক গবেষণার পুঞ্জীভূত ফল। এখন ভূ-গর্ভ থেকে কঙ্কালাদি সংগ্রহ করে উপযুক্ত স্থানে সেগুলি রাখার ব্যবস্থার ফলে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে সেকালের আর্সিনয়থেরিয়ম জন্তু আকারে অনেকটা একালের গণ্ডারের মত ছিল

'মেচর' বলেন,—Cretaceous ও Eocene যুগের পরবর্তী সময় দীর্ঘ আর তা রহস্যের কুয়াশায় আচ্ছন্ন। নাট্যালয়ে যেমন হঠাৎ সমস্ত বাতি নিবিয়ে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে আবার সেগুলি জ্বেলে দিলে পট-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে নতুন অভিনেতা-দলের আবির্ভাব দেখি,

মেগাথেরিয়ম—উদ্যানবিহারী জন্তু

এদের শক্তিও ভীষণ ছিল। [illegible] মোটরের ধাক্কার মতন মানুষকে পিষে ফেলত। এদের [illegible] এবং গাছের কচি পাতা ছিল প্রিয় খাদ্য।

এও যেন অনেকটা সেই রকম। এ সময়টা অতি রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ কিন্তু স-সব ঘটনার প্রত্যক্ষ চিহ্ন বেশীর ভাগ হয় নষ্ট হয়ে গেছে, না হয় এ পর্য্যন্ত তার আর উদ্ধার হয়নি। তবে এ যুগের ঘটনা কতকটা অনুমান করা যেতে পারে। এ সময়ে পূর্ব্ব যুগের সরীসৃপ জাতীয় জীবের ও অন্য প্রাণীদের বিলোপসাধন এবং স্তন্যপায়ী জীবের প্রাধান্য ঘটেছিল। উদ্ভিদ্‌ভোজী ও মাংসভোজী ডিনোসরাস একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, এমন কি ইগুয়ানোদন্ত্‌ যাদের ফলার মত লম্বা বুড়ো আঙুল থাকা সত্ত্বেও আর ষ্টেগোসরস তাদের

সেবাকের উট

এরা নিরীহ ছিল, মানুষ এদের পিঠে যাতায়াত ও মোট বহার কাজ সারে।

সশস্ত্র নিজের ভারের সঙ্গত থাকলেও ঐ দুই জানোয়ারই সেই জাতীয় অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে লোপ পেয়েছিল। তিন শিংওয়ালা ট্রিসেরাটপস অন্য সব প্রাণীর মত বহুদিন বেঁচে থাকলেও অবশেষে তার ভাগ্যেও এই দুর্দ্দশা ঘটে। মোট কথা, পূর্ব্বের সরীসৃপ-বংশ কালধর্ম্ম অনুসরণ করতে না পারার দরুণ একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে। Ichthyosaurs, Plesiosaurs, Mosasaurs প্রভৃতি সামুদ্রিক সরীসৃপ এমন কি উড্ডীয়মান সরীসৃপেরাও রেহাই পেলে না,—তারা সব চিরদিনের জন্য পৃথিবীর বুক থেকে লোপ পেয়েছে।

স্তন্যপায়ী যে সব জন্তু এখন আধিপত্য লাভ করেছে তারা নিজেদের বিশেষত্বে ও দলের সংখ্যায় সে যুগের আদিম প্রাণীদের চেয়ে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। সরীসৃপদের চেয়ে স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্য কেবল শারীরিক বলের দ্বারাই সম্ভব হয়নি। কারণ আদিম স্তন্যপায়ী জন্তুরা যে রণ-কুশল বা মাংসাশী ছিল, সে রকম অনুমান করবার কোন কারণ

সিংওয়ালা জন্তু

বনমহিষের পূর্ব্বপুরুষ। শ্বাসপ্রশ্বাসে এমনি ঝড় বইয়ে চলত যে সামনে কারো তিষ্ঠানো দায় হতো।

নেই। ভৌগোলিক ও আবহাওয়ার নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন এই প্রাধান্য-পরিবর্ত্তনের অনেকটা সাহায্য করলেও স্তন্যপায়ী জন্তুদের অধিক উন্নত বুদ্ধি আর নৈতিক বলই তাদের জয়-লাভের কারণ।

সেজন্য যখন এই আদিম যুগের অবসানে নবযুগের আবির্ভাব হল, তখন আমরা যে কেবল নতুন প্রাণীই দেখি, তা নয়, তখন আমরা আধুনিক খুব-বিশিষ্ট প্রাণী, মাংসাশী ও চতুষ্পদ প্রাণীদের পূর্ব্ব-পুরুষদেরও দেখতে পাই। অবশ্য এদের মধ্যে তখনও শ্রেণী-বিভাগ তেমন সম্ভব না হলেও এদের মধ্যে ক্রমিক উন্নতির চিহ্ন বিদ্যমান! উত্তর আমেরিকায় আঙুল ও অস্থিসন্ধি-যুক্ত এবং অঙ্গুলি-বিহীন প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে। পতঙ্গভোজী জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ ইউরোপে প্রচুর পাওয়া যায়। আদিম যুগের মাংসাশী ও লেমর জাতায় প্রাণীর কঙ্কাল এই দুই মহাদেশেই পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের পূর্ব্বপুরুষদের কোন চিহ্নই এ দুই দেশে নেই। সেজন্য মনে হয় যে তারা অন্য কোন দেশ থেকে এখানে এসেছিল। এসিয়া এবং আফ্রিকার স্থান-বিশেষ প্রাণীজগতে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছিল। সেজন্য বোধ হয়, যদি কখনও আদিম স্তন্যপায়ী জন্তুদের ধারাবাহিক বিবরণের হারানো সূত্রগুলির উদ্ধার-সাধন হয়, তা হলে এই এসিয়া ও আফ্রিকার অপরীক্ষিত ভূমি-স্তর থেকেই তা হওয়া সম্ভব।

এ যুগ যেমন অগ্রসর হতে লাগল, অস্থি-সন্ধি-যুক্ত প্রাণীও তেমনি নানা আকারে জন্মাতে সুরু করলে। এদের মধ্যে ফেনাডোকসই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এর চিহ্ন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা—এই দুই মহাদেশেই পাওয়া যায়। এ এক অতি কিম্ভূতকিমাকার জন্তু। এর এক-দেহে বহুবিধ প্রাণীর আকৃতি-গত সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে কালক্রমে সেগুলি একটী প্রাণীতে একসঙ্গে আর পাওয়া যেত না। হরিণ, শূকর, টাপির, ঘোড়া, বানর প্রভৃতির সঙ্গে এর অনেকটা সাদৃশ্য ছিল, আবার ওদিকে মাংসাশী প্রাণীর মত এদের লেজও ছিল।

এই শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে যেমন কতকগুলি ছোট ছোট কুকুরের মত ক্ষুদ্রকায়, তেমনি আবার কতকগুলি টাপিরদের মত বেশ বড় আকারের। সুমুখের পা দিয়ে তাদের আঁকড়ে ধরবার ক্ষমতা এবং এদের পায়ে নখযুক্ত খুর ছিল। দাঁতগুলো সর্ব্বগ্রাসী হলেও তাতে তেমন জোর ছিল না। তাদের মাথার খুলি দেখেও বোধ

লেজওয়ালা বিকটাকার জন্তু

দানবের মত ভীষণ শক্তি। যতক্ষণ না ইনি ঘুমে চোখ বুজতেন, ততক্ষণ এমনি ভীষণ ল্যাজ নাড়া দিতেন—যে সেকালের ভীষণ জানোয়াররাও পালিয়ে প্রাণ বাঁচাত।

হয় যে তাদের বুদ্ধি-বৃত্তি খুব কমই ছিল। এ সমস্ত থেকে বোঝা যায় যে এই জন্তুরা মনের আর দেহের বলে বিশেষ বলবান না থাকার দরুণ এরা Eocene যুগ শেষ হবার অনেক আগেই তাদের-মত-অন্য-সব জন্তুর সঙ্গে লোপ পেয়েছিল।

এদের প্রধান শত্রু ছিল মাংসাশী জন্তুরা। তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সংখ্যায় বাড়তে লাগল, তেমনি তারা ক্রমশঃ পাকা মাংস-খোর হয়ে উঠল। তাহলেও প্রকৃতি কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রাণীদের একেবারে নিরুপায় করেনি। সেজন্য যখন এই জন্তুরা বারবার নিগৃহীত উৎপীড়িত হল, তখন তারা পালিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচালে।

তারা যে দ্রুত গমনাগমন করতে পারত, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ তাদের শরীর হাল্‌কা ছিল; এবং যদিও তারা আধুনিক ভালুকের মত অনেকটা পায়ের পাতার উপর ভর দিয়েই চলা-ফেরা করতে পারত, তবু তাদের শরীরের গঠন-প্রণালী থেকে বেশ বোঝা যায় যে তারা যখন দৌড়ুত, তখন তারা নিজেদের শরীরকে অপেক্ষাকৃত উন্নত করে আঙুলের উপর ভর দিয়ে আধুনিক সিংহ প্রভৃতি দ্রুত-গমনশীল স্তন্যপায়ী জন্তুদের মতই দ্রুত চলতে পারত।

আফ্রিকার মাটীর স্তরে সম্প্রতি যে সব বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে, তার দ্বারা প্রমাণ হয় যে পূর্ব্বযুগের কোন কোন সরীসৃপের মত কোন কোন স্তন্যপায়ী জন্তুও সামুদ্রিক নিবাস অবলম্বন করেছিল। এদের কতকগুলি—আদিম যুগের সিন্ধুঘোটক, আধুনিক সিন্ধুঘোটক ও জল-হস্তিদের পূর্ব্বপুরুষ। এই সমস্ত অগ্রদূতেরা সম্ভবতঃ পূর্ব্বেকার জলাভূমির হাতিদের জ্ঞাত-কুটুম। তবে তারা নিশ্চয় অনেক আগেই তাদের আদিম বাসস্থান ত্যাগ করে গিয়েছিল। আজকালকার সিন্ধু-ঘোটকদের সঙ্গে তাদের বিশেষ প্রভেদ এই যে তাদের পিছনের পা ছিল। কিন্তু এই প্রভেদে আশ্চর্য্য হবার কারণ নেই। সেকালের সিন্ধুঘোটকেরা ডাঙ্গাপথেও পাড়ি দিত বলে পিছনের পা তাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক থাকায় পায়ের গড়ন এমন জোরালো হয়ে উঠেছিল—যে তাদের এই পা শীঘ্র ক্ষয় পায়নি। পর-যুগেও তাদের পিছনের পা একেবারে লুপ্ত হয়নি। অন্যান্য যে সব স্তন্যপায়ী জন্তু জলে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের দাঁত আদিম মাংসাশী জন্তুর মত ছিল; কিন্তু মাথার খুলি ছিল তিমি মাছের মত। এ সমস্ত জন্তুদের ঘাড় ছিল লম্বা আর তারা ক্রমশঃ মাছের আকার ধারণ করছিল।

প্রাচীন যুগের গণ্ডার (arsinoitherium)

খড়্গ থাকলেও এ প্রাণীটি নিরীহ ছিল। মানুষকে বহন করে তৃপ্ত থাকত এবং উদ্ভিদ আহার করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করত।

তাদের হাত-পা সম্ভবতঃ মাছের ডানায় পরিণত হয়ে ছিল। তবে এদের ফুস্‌ফুসের জায়গায় কান্‌কোর উৎপত্তির আশা করা যায় না, কারণ এদের মধ্যে এমন কোন সুপ্ত কান্‌কোর উপকরণ ছিল না, যা পরে অন্যভাবে কাজে লাগতে পারে!

এই সব জীবের পর এই যুগেই আরও অনেক প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল।

এই সমস্ত পুরাকালের তিমির আকার-বিশিষ্ট জন্তুরা বোধ হয় আধুনিক তিমি, জলশূকর প্রভৃতি জন্তুর পূর্ব্ব-পুরুষ। তাদের সম্ভবতঃ আদিম জলহস্তীদের মত ব্যবহারোপযোগী পিছনের পা ছিল। অবশ্য এখন ঐ পায়ের চিহ্ন এদের শরীরের বাহিরে দেখা না গেলেও জীবন্ত তিমির শরীরে পায়ের চিহ্ন আজও পাওয়া যায়।

এই যুগ শেষ হবার অনেক পূর্ব্বে এই সব দুঃসাহসিক ভীষণ স্তন্যপায়ী জন্তুরা অনেক দূর দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, এমন কি তারা দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার সমুদ্র পর্য্যন্ত অধিকার করেছিল। এখানে তাদের কেউ কেউ আরো প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল।

মাংসাশী কোন কোন সরীসৃপের উৎপাত বা লবণাক্ত জলে বাস করবার অধিক আগ্রহ অথবা ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্ত্তন,—এই নানা কারণের মধ্যে ঠিক কোন্‌টা যে এদের সমুদ্র-বাসে বাধ্য করেছিল, আজ বহু সহস্র বৎসর পরে তা নির্দ্ধারণ করা একরকম অসম্ভব।

শ্রীঅমরনাথ প্রামাণিক।

আঙুলের ডগায় চোখ

বাস্তবিক পক্ষে বদ্ধ-কাণা বা পূর্ণ-অন্ধ বলে কাকেও বলা যায় না। ফরাসী প্রফেসর Louis Farigoule বলেন, দৃষ্টিহীন হলেও অন্ধদের দর্শন-শক্তি লুপ্ত হয় না। আদিম মানব ও কুকুর প্রভৃতির তুলনায়, আধুনিক মানুষ তার ঘ্রাণশক্তির সদ্ব্যবহার যে খুব কমই করে, এ-কথা আমরা সকলেই জানি। মানুষের ঘ্রাণশক্তি এখনো পশুর মতনই তীক্ষ্ণ আছে; কিন্তু আমরা নানা কারণে তার পুরোপুর ব্যবহার না করার দরুণ, তা পূর্ণ-বিকাশ লাভ করতে পারে না। এইভাবে বরাবর চললে হাজার দশেক বৎসর পরে মানুষের ঘ্রাণশক্তি হয়ত একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

তেমন অবস্থায় আমাদের দেহের মধ্যে গন্ধ নেবার উপযোগী সমস্ত যন্ত্র পূর্ণরূপে বজায় থাকলেও, আমরা আ
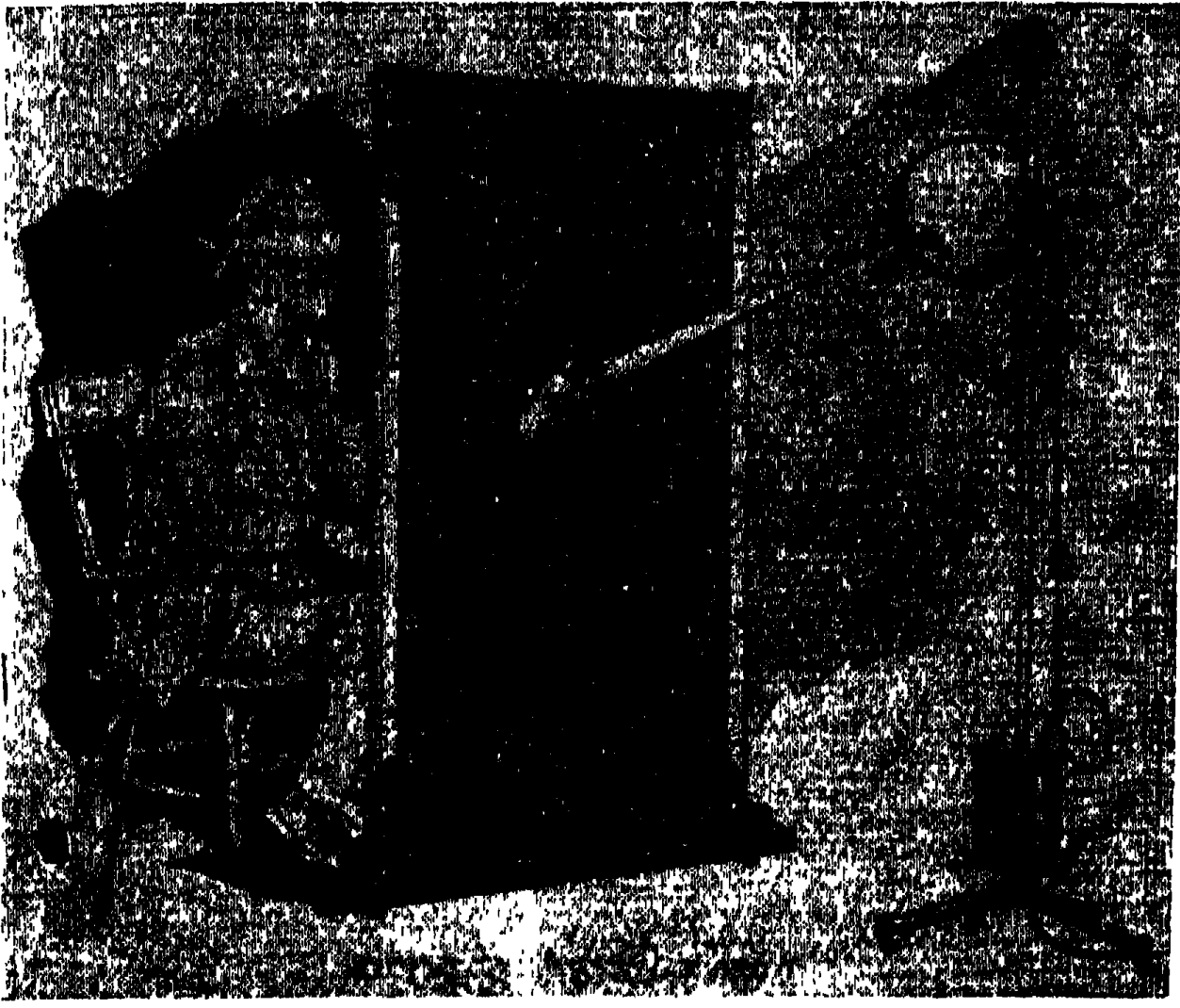
অন্ধের 'দৃষ্টি-শক্তি'

তা ব্যবহার কর্‌তে, বা তার অস্তিত্বের কথা জান্‌তেও পার্‌ব না। আসলে, যে-সব ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অজ্ঞাত নয়, "অ্যানাটমি" কেবলমাত্র তাদের নিয়েই নাড়াচাড়া ক'রে থাকে। চার হাজার বৎসর আগে মানুষ যদি ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেল্‌ত, তাহ'লে অ্যানাটমিতে আজ mucous membraneএর চমৎকার বর্ণনা থাক্‌লেও, এটা যে ঘ্রাণশক্তির সাহায্য করে, তার কোনই উল্লেখ থাক্‌ত না।

Paroptic Sense বা "ছায়াপটে"র (retina) সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য দর্শেনেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। মানুষ এখন এর অস্তিত্বের কথা জানে না, কাজেই অ্যানাটমিও একে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করে নি।

প্রফেসর Farigoule মানুষের এই অজ্ঞাত দর্শনেন্দ্রিয়কে আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন, "মানুষকে আমি আবার এই নূতন ইন্দ্রিয় ব্যবহারে অভ্যস্ত ক'রে তুল্‌ব।" কিন্তু কি ভাবে কোন্ পদ্ধতিতে, সেটা এখনো তিনি প্রকাশ করেন নি।

তিনি যদি নিজের কথা রাখেন, এবং তাঁর আবিষ্কার যদি সত্য হয়, তবে ভবিষ্যতে অন্ধরা যে চোখ না থাক্‌লেও দেখতে পাবে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, প্রকৃতি নর-দেহের প্রত্যেক স্নায়ুকেই—যেগুলি হাড় বা অস্বচ্ছ তন্তুর দ্বারা আবৃত নয়—এক-একটী আণুবীক্ষণিক চক্ষু দান করেছেন।

Flatwormরা যে ত্বকের মধ্য দিয়ে দেখতে পায়, বৈজ্ঞানিকরা তা জানেন। তাদের ত্বক-চক্ষু আছে। ত্বকের অণুকোষ ইন্দ্রিয়-অণুকোষের সাহায্য নিয়ে অনুভব কর্‌তে ও দেখতে পারে। অতএব মানুষেরও নিশ্চয় এই শক্তি আছে। সুতরাং ত্বক যেখানে সব-চেয়ে পাত্‌লা ও অনুভব-শক্তি-বিশিষ্ট—অর্থাৎ আঙুলের ডগায়, সেখানকার ত্বক-চক্ষু দিয়ে শিক্ষিত অন্ধরাও দেখতে পাবে না কেন? এর প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা সূচীভেদ্য অন্ধকার-পূর্ণ কক্ষে অন্ধদের বসিয়ে, তাদের হাতের উপরে বিশেষ একরকম আলোক-পাত করেছেন এবং অন্ধরাও সেই আলোক "দেখতে" পেয়েছে!

শিশু কার মত দেখ্‌তে

শিশু কার মত দেখতে হয়? আপনারা সবাই বল্‌বেন, "বাপ বা মায়ের মত।" কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বলেন, শিশুরা মা কি বাপ কিংবা মায়ের বা বাপের পরিবারের কারুর মত
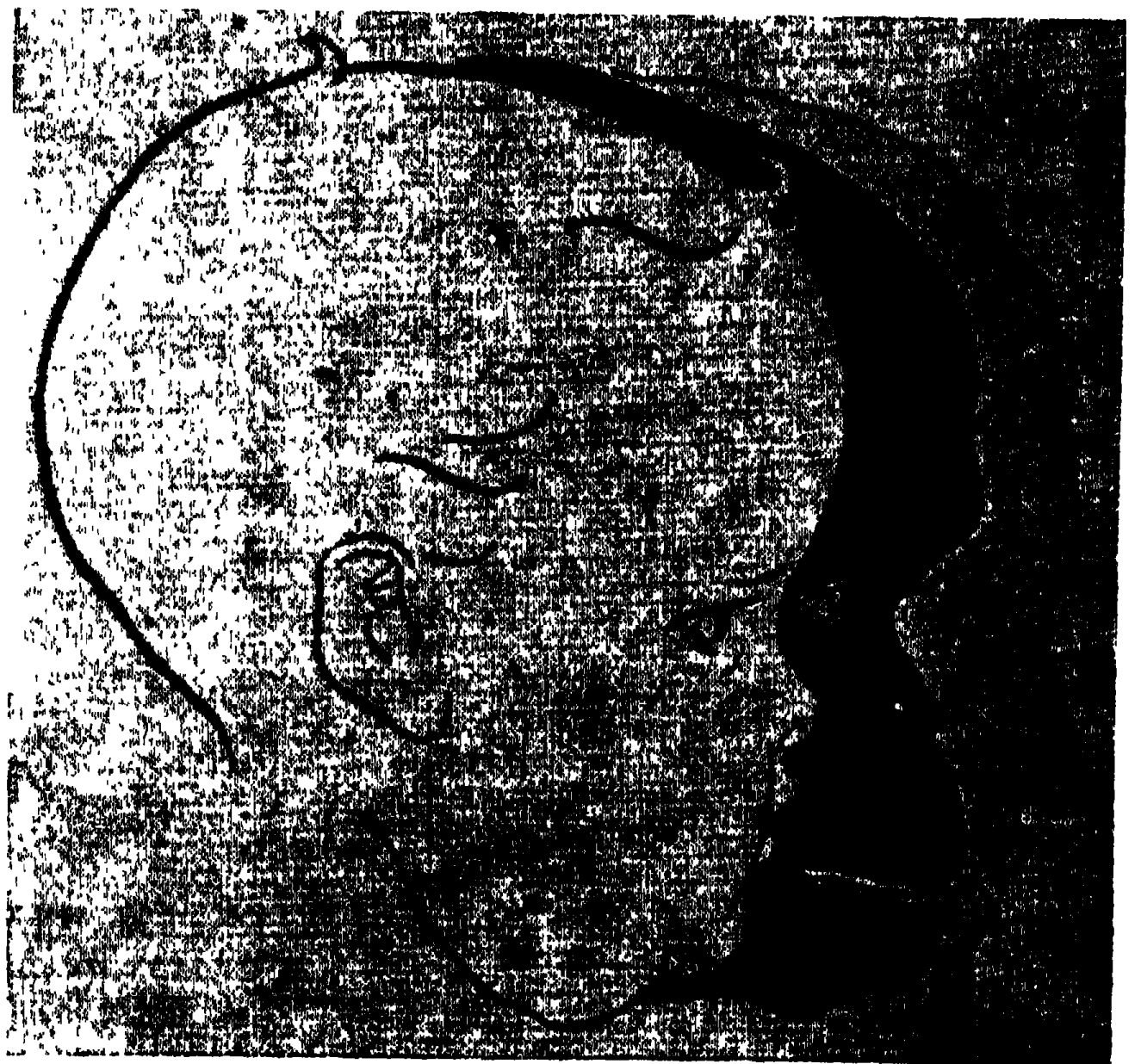
শিশু, বানর ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের মুখের পার্শ্ব-দৃশ্য। দেখুন, শিশুর মুখের সাদৃশ্য কার সঙ্গে বেশী।

দেখতে হয় না। আসলে শিশু দেখতে হয়, তার নিজের মত!

শিশুর নাককে নাকই বলা চলে না—তা একটা পিণ্ডমাত্র। কিছুকাল পরে হয়ত এই পিণ্ড থেকে পিতা বা
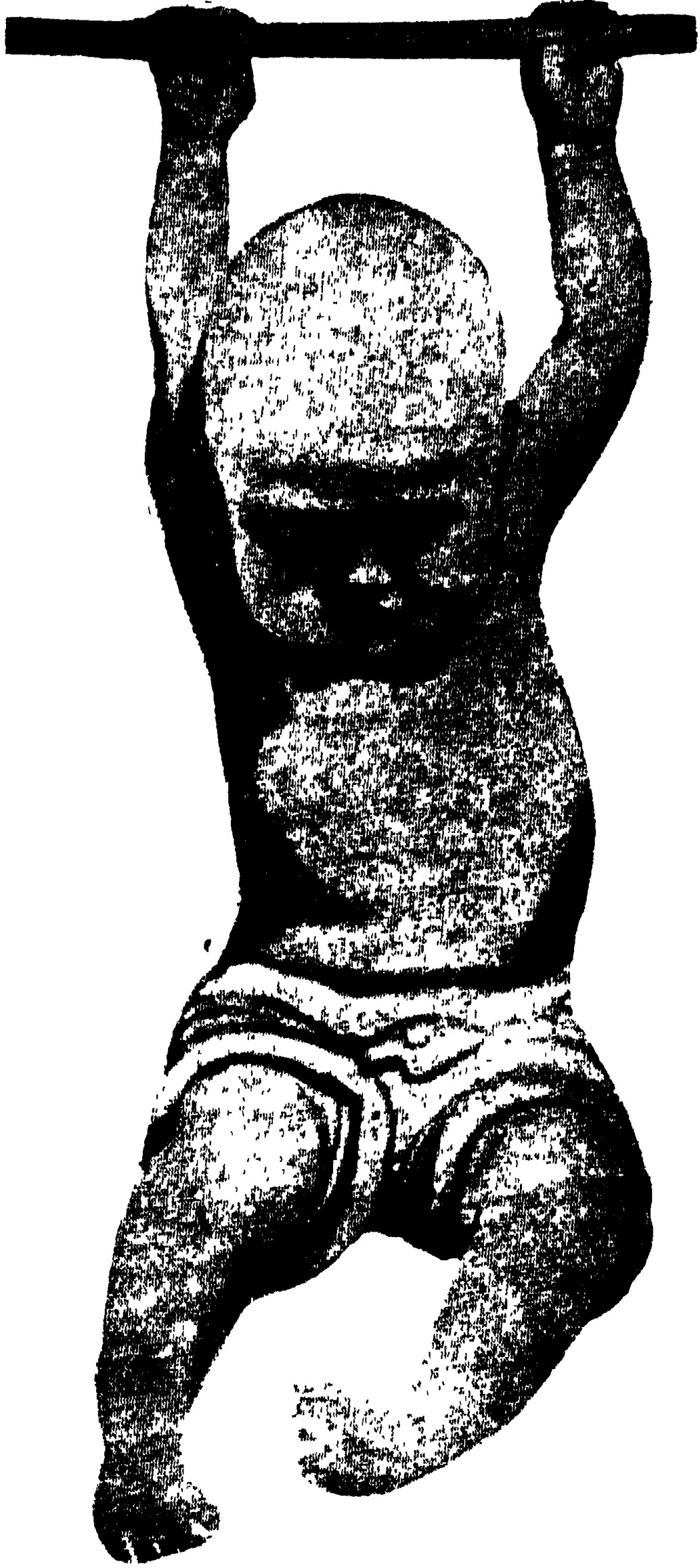
মাস-কয়েকের শিশু—সর্ব্বাঙ্গে বানরের লক্ষণ

মাতার নাকের আদর্শ-মত একটা নির্দ্দিষ্ট আকার লাভ করে। চির-জীবন ধরেই মানুষের নাকের এম্‌নি অদল-বদল হ'তে থাকে।

বৈজ্ঞানিকের মতে, শিশু সত্যিই যদি কারুর মত দেখ্‌তে হয়,—তবে সে বানরের মত! শিশুর মুখের লক্ষণ—

দক্ষিণ-সাগরের কিম্ভূতকিমাকার মৎস্য

বিশেষতঃ তার চোয়াল—বানর ছাড়া আর কারুর মত নয়। তার কপাল সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে থাকে। তার নাক চ্যাপ্টা। এগুলিও বানুরে লক্ষণ। পরিণত বয়সেই মানুষের নাক ও কপাল এমন গঠন পায়, যাতে ক'রে মনে হয়, তার চোয়ালের আকার কমে গিয়ে মানুষের মত হয়েছে।

তিন লক্ষ বৎসর আগে আদিম মানুষের চোয়াল ছিল বেরিয়ে-পড়া এবং দাঁত ছিল প্রকাণ্ড। তখন তাকে দেখলেই বানরকে মনে পড়ত। কিন্তু যুগে যুগে ক্রমোন্নতির ফলে, তার মস্তিষ্ক বৃহত্তর হয়ে উঠেছে, তার ললাট চিন্তাশীলের মত হয়েছে এবং তার চোয়াল সংকীর্ণতর হয়ে পিছিয়ে পড়েছে।

মানুষের শৈশব থেকে যৌবন পর্য্যন্ত লক্ষ্য কর্‌লে, তার মুখেও সেই ক্রমিক পরিবর্ত্তনটা দেখা যায়—লক্ষ লক্ষ বৎসরের যে পরিবর্ত্তনে মানব-জাতি বর্ত্তমান আকার লাভ করেছে।

পাতালে বসে ছবি-আঁকা

শিশুর মেরুদণ্ডের তলাটা টোল-খাওয়া। কারণ এইখানে আগে ল্যাজ ছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে এই টোল ক্রমে কমে, শেষে লুপ্ত হয়ে যায়। বানরের হাত লম্বা, পা ছোট। শিশুরও তাই। তার হাত পায়ের চেয়ে লম্বা এবং অধিকতর পরিপুষ্ট। বানরের মত শিশুর মুঠোর জোরও খুব। নবজাত শিশু একটা দণ্ড ধ'রে পনেরো থেকে ত্রিশ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শূন্যে ঝুলতে পারে। তিন সপ্তাহের শিশু এইভাবে ঝুলতে পারে এক থেকে দুই মিনিট পর্য্যন্ত। মানুষ যে আগে বৃক্ষ-বিহারী ছিল, এটা তারই প্রমাণ। বানররা মানুষের মত আঙুল ছড়িয়ে সোজা করতে পারে না; শিশুও পারে না। শিশু বক্রজানু—এতে গাছে চড়বার সুবিধা হয়। প্রথম চল্‌বার সময়ে শিশুর পায়ের তলাটা ভালো ক'রে মাটিতে ছোঁয় না। তার পায়ের আঙুল থাকে মোড়া আর গোড়ালি থাকে তোলা। গাছের ডালের উপরে চল্‌বার সময়ে বানরেরও পায়ের অবস্থা হয় এইরকম। উঁচু জায়গায় চড়্‌বার জন্যে শিশুর আগ্রহ অসীম। এম্‌নি আরো অনেক বিষয়ে বানরের সঙ্গে নর-শিশুর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।

পাতালের ছবি

মিঃ জার প্রিচার্ড চিত্র-জগতে এক বিস্ময়কর নূতনত্বের সঞ্চার করেছেন। সংপ্রতি তিনি সাগর-গর্ভে প্রবেশ ক'রে পাতালপুরের স্বভাব-শোভাকে চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ-দিকে এর আগে আর কোন চিত্রকরের কল্পনা এতদূর অগ্রসর হ'তে পারে নি।

মিঃ প্রিচার্ড ষোল ফুট থেকে পঞ্চাশ ফুট পর্য্যন্ত গভীর জলের তলায় বসে কাজ করেছেন। তাঁর ছবিগুলি খুব পুরু তেল-রঙে আঁকা, কাজেই জল লেগে তা উঠে যায় নি।

মিঃ প্রিচার্ড ছেলেবেলা থেকে সমুদ্র-ভক্ত। যৌবনে তিনি প্রায়ই পায়ে বালির থলে বেঁধে সমুদ্র-গর্ভে নেমে যেতেন—এটা ছিল তাঁর সখের খেলা। সেই সময়েই পাতাল-পুরের বিচিত্র সৌন্দর্য্য তাঁর মুগ্ধ দৃষ্টির সাম্‌নে প্রথম ধরা পড়ে। তারপর টাহিটি-দ্বীপে ভ্রমণকালে তিনি ডুবুরীর পোষাক পরে পঁয়ষট্টি ফুট জলের তলায় অবতরণ করেন।

ডুবুরীর বেশে আগে তিনি নীচে নামেন। তারপর

দক্ষিণ-সাগর গর্ভের সূক্ষ্মাগ্র পাহাড়

চিত্রাঙ্কনের উপযোগী স্থান নির্ব্বাচন করেন। জায়গাটি পছন্দ হ'লে উপরের নৌকা থেকে দড়ির সাহায্যে তাঁকে ছবি আঁক্‌বার মাল-মশলা নামিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর চিত্রপটে লিনসিড তেল মাখা থাকে ব'লে তাতেও জল বস্‌তে পায় না। ঠাণ্ডায় আর জলের চাপের দরুণ মিঃ প্রিচার্ডকে আধঘণ্টা ছবি আঁক্‌বার পরেই উপরে উঠে আস্‌তে হয়। কখনো কখনো তিনি পট ও চিত্রাঙ্কনের উপকরণগুলিকে জলের তলাতেই ফেলে আসেন। পরদিন আবার সেখানে গিয়ে ছবি আঁকা সুরু করেন। ডাঙার ছবি দেখে দেখে লোকের চোখ শ্রান্ত হয়ে পড়েছে; সুতরাং মিঃ প্রিচার্ডের আঁকা পাতালের ছবিগুলি যে সকলেরই নয়ন-মনকে মোহিত কর্‌তে পারবে, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

প্রসাদ রায়।

প্রেমাঞ্জলি

[গত অক্টোবর সংখ্যা 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় Love-Offerings নামে প্রকাশিত গদ্য-কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটির বাংলা পদ্যানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, এগুলি ঠিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ বলা চলে, মূল গদ্য-কবিতাগুলি ফার্সী কবিতার অনুবাদ]

নিশীথ স্বপনে তোমারেই হেরি,
দিবসে ভাবি গো তোমারি কথা;
বিজনে তোমার পথ চেয়ে থাকি,
খুঁজে ফিরি তোমা জনতা যথা।
তবু তুমি প্রিয়, আছো চিরদিন
কাছে কাছে—মোর ছায়ারও চেয়ে,
নিশাসের চেয়ে অন্তরতর
অন্তর মোর রয়েছে ছেয়ে!

—

চুণী টুক্‌টুকে ঠোঁট সে ত' নয়,
ছিপ্‌ছিপে কটি—করবী-লতা—
যার লাগি জলে আশক-আগুন,
যার লাগি জাগে প্রেমীর ব্যথা!
সে যে চিরদিন রহিবে গায়েব্—
চির-রহস্য হইয়া রাজে,
তার পরিচয় বড় যে গোপন—
চোখ দিয়ে দেখা চোখের মাঝে!

—

সকল ভাবনা দূর করি' দাও, বোলাও পেয়ালী
রূপসী সাকী!
জীবনের রোদ পড়ে' এল ওই মহা-নিশা সব
দিবে গো ঢাকি!

—

ভাগ্যে আমার যাই হোক্ আর
যেমনি হোক্
তাহাতেই রাজী, নাই আহ্লাদ
করি না শোক।

প্রেম বল আর অনাদরই বল
সুখ কি দুখ,
কিছুতেই মোর নাই উল্লাস,
দমে না বুক।
ঘটনা এ-সব—জলের উপরে
ঢেউএর খেলা!
আসে যায় যেন বায়ু-চলাচল
সারাটি বেলা!

—

অধর রেখেছে যে কথা রুধিয়া
পরাণ-পণে,
নিলাজ নিদয় আঁখি বলে' দেয়
মিলন-ক্ষণে!

মনোমঞ্জুষা ভরা আছে সেই
গোপন সুখ,
অতি অনুপম সেই সে গভীর
প্রেমের দুখ।

—

ভোরের বেলায় কহে বুল্ বুল্
গোলাপে মিনতি করি'—
চাঁদ ধুয়ে দেছে ও-মুখ তোমার,
জানি তাহা সুন্দরি!
তাই বলে' সখি করোনা দেমাক্—
তোমারি মতন হেসে
এই বনে গেছে কত ফুল-ঝরি'
ক্ষণিক বাসর-শেষে!

শ্রীমধুব্রত।

চল্‌তি কথা

মহাত্মা গান্ধির কারাদণ্ড—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুটো বড় বড় কাণ্ড হয়ে গেল। দুটির মধ্যে একটি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত, অপরটি প্রত্যাশিত হলেও আকস্মিক। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগুর পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা গান্ধির গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড। দুটো ব্যাপারের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগ আছে কি না তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি। অসহযোগ-আন্দোলন সুরু হবার পর থেকেই লোকে তাঁর গ্রেপ্তার প্রতীক্ষা করছিল কিন্তু আমলা-তন্ত্র এতদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করেন নি। কেন যে করেন নি, সেটা একমাত্র তাঁরাই জানেন। মহাত্মার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং বিচারে তাঁর প্রতি ছ-বছর বিনাশ্রমে কারা-দণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছে।

মহাত্মাকে গ্রেপ্তার করা ঠিক হয়েছে কিনা, তাঁর প্রতি যে-দণ্ডের ব্যবস্থা করা হলো তা ন্যায়-সঙ্গত কি না, আমরা সে আলোচনা করতে চাই না। দেশের ও দেশবাসীর দিক দিয়ে আমরা এই ব্যাপারটার আলোচনা করবো।

মহাত্মা গান্ধি আমাদের দেশের জনবিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজনীতির মধ্য দিয়ে তিনি দেশবাসীর অন্তরে সত্য, ধৃতি, ক্ষমা প্রচার করেছেন। তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা, তাঁর সাহস এবং বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-সাধনে তাঁর অদ্ভুত চেষ্টা ও পরিশ্রম জগতের শ্রেষ্ঠ লোকদের পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করেছে। রাজনীতির নামে যুগ-যুগ ধরে যে অন্যায় চলে আসছে, তিনি তার বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন। সাধারণে হয়ত মনে করতে পারে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই মহাত্মা গান্ধির চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি কথায় ও কাজে বার বার জগতের কাছে প্রমাণ করেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতাই তাঁর চরম উদ্দেশ্য নয়, তিনি পৃথিবীতে চির-স্বাধীনতা আনবার জন্য এই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মহাত্মা গান্ধি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সেখানকার শক্তিশালী শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস-যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, পৃথিবীর আর এক কোণ থেকে রাজর্ষি কাউণ্ট লিও টলষ্টয় তখন তাঁকে জানিয়েছিলেন—"ট্রান্সভালে আপনি যে কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন, জগতের মধ্যে এই কাজই শ্রেষ্ঠ কাজ—সকল কাজের চেয়ে বড় কাজ। পৃথিবীর চারদিকে এখন যে সব বড় বড় কাজ হচ্ছে, তার মধ্যে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজে আপনি হাত দিয়েছেন। আমার মনে হয় শুধু খ্রীষ্টান জাতিসমূহ নয়, পৃথিবীর সকল জাতিই এই কাজে আপনার সঙ্গে যোগ না দিয়ে থাকতে পারবে না।"

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বপ্রেমিক মনীষী গিলবার্ট মারে হিবার্ট জর্নালে মহাত্মা সম্বন্ধে এই সমস্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন—"ইন্দ্রিয়-ভোগ-সুখের লালসা যাঁর কিছুমাত্র নাই, পার্থিব অর্থ-সম্পদকে যিনি গ্রাহ্য করেন না, আত্ম-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, প্রশংসা বা পার্থিব উন্নতি যিনি চান

না, কেবল নিজে যা কর্ত্তব্য বলে বিশ্বাস করেন শুধু তাই করবার জন্য যিনি বদ্ধ-পরিকর—তেমন লোকের সঙ্গে সরকারী আমলাদের একটু বুঝে সুঝে চলা উচিত। এমন লোককে শত্রু করলে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে এবং তাঁর জন্য সর্ব্বদাই অধীর হয়ে থাকতে হয়; কারণ যিনি নিজের দেহকে তুচ্ছ মনে করেন, তাঁর দেহকে তোমরা জয় করতে পার, কিন্তু তাঁর মন যে অদম্য, অপরাজেয়! সে তুচ্ছ দেহ কিনে ক্ষতি বৈ লাভ হয় না!"

মাদ্রাজের লর্ড বিশপ মহাত্মার সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—"খৃষ্টান হয়ে এ কথা আমার বল্‌তে দুঃখ হচ্ছে বটে তবুও আমি অকপট ভাবেই স্বীকার করছি যে, সত্যের সম্মান-রক্ষা ও অপরাধীদের ক্ষমা করবার জন্য মিঃ গান্ধি যে রকম ধীরভাবে নির্য্যাতন সহ্য করেছেন, তাতে আমি মনে করি যে তিনিই যীশুখৃষ্টের প্রকৃত প্রতিনিধি। যারা তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেছে অথচ খৃষ্টানের নাম করছে—তারা নয়।"

শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট বলেন,—"আমি যেন প্রত্যক্ষ করছি গান্ধির মধ্যে সেই মৃত্যুঞ্জয় অবিনশ্বর আত্মা রয়েছে—যে নিজে নির্য্যাতন সহ্য করে পরকে মুক্ত করে এবং নিজে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে অপরকে জীবন দান করে! এমন লোকই তো মানবজাতির সমুদ্ধারকারী ও সহায়ক হয়ে থাকেন।" অসহযোগ আন্দোলন সুরু করবার পর নিউইয়র্ক কমিউনিষ্ট সম্প্রদায়ের রেভারেণ্ড জে-এইচ হোম্‌স্ মহাত্মা-সম্বন্ধে বলেছেন, "রোমা রোঁলা শ্রেষ্ঠ ভাবুক। তাঁর ভাব-প্রণালী নিখুঁত, কিন্তু সে ভাব অনুসারে কাজ করতে গেলে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। লেনিন বস্তু-তান্ত্রিক, কার্য্যক্ষেত্রে তিনি যোগ্যতা-অযোগ্যতার যাচাই করেন, কিন্তু তাঁর ভাব-প্রণালী নির্দ্দোষ নয়। আমরা এমন একজন সার্ব্বভৌমিক লোক চাই, যাঁর মধ্যে ভাব ও কর্ম্মের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটেছে; ফরাসীর ভাবতন্ত্র ও রুশের বস্তুতন্ত্র যাঁর মধ্যে সমানভাবে মিশেছে; যাঁতে উচ্চ ভাবের প্রেরণা আছে ও যিনি তা সুষ্ঠুভাবে কাজে পরিণত করতে পারেন। এমন লোক কি জগতে কেউ আছে? আমার বিশ্বাস, এমন লোক পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন। তিনিই এখন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক; তাঁর মত শ্রেষ্ঠ লোক পৃথিবীতে আর কখনো জন্মগ্রহণ করেন নি। আমি যাঁর কথা বলছি, তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। * * আমি যখন রোঁলার কথা ভাবি তখন আমার সেই টলষ্টয়ের কথা মনে পড়ে যায়, যখন লেনিনের কথা ভাবি তখন নেপোলিয়ানের কথা মনে পড়ে কিন্তু যখন গান্ধির কথা ভাবি, তখন যীশু খৃষ্টের কথা মনে হয়। তিনি খৃষ্টের মত জীবন যাপন করেন, খৃষ্টের ন্যায় নির্য্যাতন সহ্য করেন, কষ্ট স্বীকার করেন এবং হয়তো একদিন খৃষ্টের মতই জীবন উৎসর্গ করবেন।"

ভাব-জগতে যে জিনিষ কল্পনা ছিল, মহাত্মা গান্ধি তাকে নিজের জীবনে সত্য করেছেন। এমন মহাপুরুষ ছ'-বছর ভারতবাসীর চোখের আড়ালে থাকবেন! যাঁরা বলেন, তিনি দেশে আন্দোলন সুরু করায় এখানে প্রতিদিনই হাঙ্গামা হচ্ছে, তাঁরা হয়ত এ-কথা একবারও ভেবে দেখেন না যে দেশবাসীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ থাকার ফলে কত হাঙ্গামা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলন না সুরু করলে ভারতবাসী চুপচাপ বসে থাকতো, এ-কথা কেউ বিশ্বাস করেন কি? অন্ততঃ আমরা তা বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষের এই প্রকৃত নেতাকে ছ-বছর দেশবাসীকে পথ নির্দ্দেশ করতে দেওয়া হবে না। আমাদের মনে হয় যে আমাদের চোখের সম্মুখ থেকে এমন আদর্শকে সরিয়ে ফেলায় জগতেরো মহা-অনিষ্ট সাধিত হলো।

শাসন-যন্ত্র সৃজন করে সাধারণ লোকে—সাধারণের জন্য। সাধারণের এতে উপকার হয়, এটা অস্বীকার করবার যো নেই; কিন্তু জনসাধারণের ভাবের ধারার সঙ্গে প্রতিভার চিন্তাধারার কখনও আপোষ চল্‌তে পারে না। প্রতিভা তাঁর দূরদৃষ্টিতে জগতে মহা-বিপ্লবের সূচনা দেখে মানুষকে বাঁচাবার জন্য যে মত প্রচার করেন, অথবা যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেন, শাসন-চক্র তার আপাত দৃষ্টিতে তা দেখতে পায় না, তাই সে বর্ত্তমানের ধ্বংসের কল্পনায় ভয়ে অধীর হয়ে উঠে তাদের তৈরী শাসন-যন্ত্রের চাপের মধ্যে তাঁকে ফেলে দেয়। যীশু খৃষ্টকেও রাজদ্রোহের অপরাধে এই শাসন যন্ত্রের মধ্যে গলা বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল, সেজন্য জগৎ-শুদ্ধ আজও হায়-হায় করে! তাঁকে হত্যা করে মানুষ যে তার পশুত্বের পরিচয় দিয়েছিল, জগতে আজ এমন লোক নেই যে তা অস্বীকার করবে! মহাত্মা গান্ধির এই কারাদণ্ডের জন্যও একদিন মানুষ অনুতাপ করবেই। তাঁর মহামূল্য জীবনের এই যে ছটা বছর—এই ছ-বছরে তিনি জগৎকে হয় তো ছ-শো বছর এগিয়ে দিতে পারতেন! আজ যাঁরা বর্ত্তমানের ধ্বংসের ভয়ে অবশ্যম্ভাবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তাঁরা হয় তো এখন সেটা বুঝতে পারচেন না, হয়তো তাঁরা তাঁদের জীবনেও বুঝতে পারবেন না; কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এজন্য একদিন আপশোষ করবেই—যীশুখৃষ্টের জন্য আজ যেমন সকলে আপশোষ করে। মহাত্মা গান্ধির কারাদণ্ডের কথা শুনে আমাদের রোঁলার কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন—নানা দেশের শাসন-চক্র যুগ-যুগ ধরে অনেক বড় লোককে হত্যা করেছে এবং শেষে তাঁদের স্মৃতি-রক্ষার জন্য মস্ত বড় স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করেছে!

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জেব্-উন্নিসা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে।

৪৬শ বর্ষ, } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ { দ্বিতীয় সংখ্যা

বাগ্‌যন্ত্র ও তাহার ব্যবহার

ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করে সকলেই; কিন্তু পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্যের কি ভাবে কি পরিণতি হয়, তাহা সাধারণ লোকে জানে না। অন্নাদির পরিপাকের পর যখন ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তখন শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া 'কি খাব মা?' বলিয়া মায়ের নিকট উপস্থিত হয়। ক্ষুধায় বৃক্ষাদিও কাতর হয় এবং উপযুক্ত আহার পাইলেই প্রফুল্ল হয়। কিন্তু কি পশু-পক্ষী, কি বৃক্ষ-লতা, কি মানবশিশু, কেহই পরিপাক-প্রণালীর সহিত পরিচিত নহে। অথচ এই পরিপাক-কার্য্য এত সহজ-সাধ্য যে তাহার জন্য তাহাদিগকে কোন চেষ্টাই করিতে হয় না। বালকগণকে এই প্রাকৃতিক পরিপাক-প্রক্রিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তাহারা সহজে সে উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। বিনা চেষ্টায় যে কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায়, তাহা শিখিবার চেষ্টা কেহ করে না। হাঁটিবার সময়ে শরীরের ভার-কেন্দ্র কেমন করিয়া ঠিক রাখিতে হয়, তাহা কয়জন লোকে জানে, কিন্তু হাঁটিতে সকলেই পারে। সন্তরণ-কালে কি প্রাকৃতিক নিয়মে সন্তরণকারীর শরীরের দুইমণ ভার জলে ভাসমান হয়, সন্তরণকারী কি তাহা জানে?

মানব-শিশু তিন চারি বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া কথা বলিতে শিখে এবং তাহার মাতৃভাষার বর্ণমালানুযায়ী যাবতীয় অক্ষরের উচ্চারণে সমর্থ হয়। যখন কোন একটী বর্ণের উচ্চারণ করে, তখন অবশ্য সেই বর্ণ উচ্চারণ করিবার জন্য শরীরাভ্যন্তরের যে-যে যন্ত্রের যেরূপ পরিচালনা আবশ্যক হয়, তাহা সে করে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে কোন্ কোন্ যন্ত্রের পরিচালনা-দ্বারা কি ভাবে কোন্ শব্দের উচ্চারণ করিয়াছে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারে না। কেবল যে বালকেরাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না তাহা নহে। অনেক অশীতিপর বৃদ্ধও বিনা শিক্ষায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। আবার যখন আমরা ভাষা-তত্ত্বের সাক্ষ্য হইতে অবগত হই যে, মাত্র কয়েক শতাব্দী হইল, মানবজাতির মধ্যে এই বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে এবং এ-যাবৎ এ বিষয় লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা কাটাকাটি চলিয়াছে, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে চিত্রাদির সাহায্যে আমাদের সাধারণ লোকের মধ্যে এই বিষয়ের আলোচনার সূচনামাত্র করিব।

জীবন-ধারণের জন্য আমরা অবিরত শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। শ্বাস-গ্রহণ-কার্য্য সামান্য সময়ের জন্য বন্ধ হইলেই আমাদিগের জীবলীলার অবসান হয়। আমাদের নাসারন্ধ্রের পথেই শ্বাস-বায়ু শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। এ শ্বাসবায়ু

শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া যায় না, যে পথে প্রবেশ করে সেই পথেই নির্গত হইয়া যায়। আমাদের কথা বলিবার পক্ষে এই পরিত্যক্ত শ্বাসবায়ুই একমাত্র উপকরণ। যদি জীবন-ধারণের জন্য অনবরত শ্বাস-গ্রহণ ও শ্বাস-ত্যাগ আবশ্যক না হইত, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কথা বলা বা কোনও প্রকার শব্দ উচ্চারণ করা সম্ভব হইত না। শরীরাভ্যন্তর হইতে শ্বাসবায়ুর নির্গম-কালে একটা ক্ষীণ শব্দ অবিরত উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু সে শব্দ এত ক্ষীণ যে সাধারণতঃ তাহা শ্রুতিগোচর হয় না। তবে গভীর নিদ্রাকালে অনেকের নাসিকা-ধ্বনি বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন তাহা সকলেই শুনিতে পান। আমাদের ফুস্‌ফুস্ হইতে নির্গত শ্বাসবায়ুব গতির নানাবিধ সংযমন দ্বারা নানাবিধ ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

বাগ্‌যন্ত্রের প্রতিকৃতি

ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু-নির্গমনের জন্য একটী সঙ্কীর্ণ নলাকৃতি পথ আছে। ইহাকে বায়ুনলী বা trachea বলে। এই বায়ুনলী অন্ননলী বা oesophagusএর পার্শ্বে দীর্ঘভাবে অবস্থিত। বায়ুনলীর ঊর্দ্ধভাগে কণ্ঠ-গহ্বর বা larynx অবস্থিত। ফুস্‌ফুস্-নির্গত বায়ু বায়ুনলী দিয়া এই কণ্ঠ-গহ্বর বা larynxএ উপনীত হয়। সেখানে কণ্ঠ-পটহ বা vocal chords (glottis) নামে অতি সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে। এই কণ্ঠপটহ বা glottisরূপ কণ্ঠ-গহ্বরের দ্বার দিয়া বায়ু-নলী বাহিত বায়ু গল-গহ্বর বা pharynxএ চালিত হয়। এই গল-গহ্বর বা pharynx হইতে নাসিকা বা মুখপথে শ্বাসবায়ু নির্গত হয়। নির্গমকালে এই পথের সহিত বায়ুর স্বাভাবিক সংঘর্ষবশতঃ যে শব্দ হয়, জোরে শ্বাস ত্যাগ করিলে সেই শব্দ প্রবল হয়। অর্থাৎ পথে যে' পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইবে ঘর্ষণ তত অধিক হইবে এবং শব্দও তত উচ্চ ও স্পষ্ট হইবে। কণ্ঠ ও মুখ-গহ্বরে নানা স্থানের পেশী সঞ্চালন দ্বারা এই নির্গত শ্বাস-বায়ুর উপর নানাভাবে শক্তি প্রয়োগ করিলে শ্বাসকার্য্য দ্বারা বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ হয়।

কণ্ঠগহ্বর বা larynx কতকগুলি সূক্ষ্ম শুভ্র তন্তু-পূর্ণ বাদ্যযন্ত্রের বাক্সের ন্যায় (cartilaginous box)। এই তন্তু-সমূহের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ দ্বারা larynx বা কণ্ঠ-গহ্বরের আকৃতির নানারূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া দ্বারা কণ্ঠ গহ্বরকে দীর্ঘ, খর্ব্ব, উচ্চ বা নিম্ন করা যায়। বায়ুনলী হইতে কণ্ঠ-গহ্বরের দ্বারস্বরূপ যে দুইটী কণ্ঠ-কটহ বা সূক্ষ্ম পর্দ্দা (glottis or vocal choıds) আছে, তাহাদের মধ্যস্থিত গহ্বরের পরিমাণ অভ্যন্তর হইতে বাহিরের দিক পর্য্যন্ত ১৯ হইতে ২৫ মিল্লিমিটার অর্থাৎ প্রায় ৩-৪ ইঞ্চ হইতে এক ইঞ্চি। স্ত্রীলোকের কণ্ঠে এই গহ্বরের দীর্ঘতা ১ ২ ইঞ্চি হইতে ৩-৪ ইঞ্চি।

কণ্ঠ-গহ্বরের ঊর্দ্ধভাগে একটি পত্রাকার আবরণ আছে। ইহাকে epi-glottis বা জিহ্বামূল-পটহ বলে। সাধারণতঃ এই জিহ্বামূল পটহ বা epi-glottis জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগের নিম্নে দণ্ডায়মান থাকে। তাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্যের জন্য কণ্ঠ-গহ্বরের উপরের দ্বার মুক্ত থাকে। কণ্ঠ গহ্বরের অন্য কোনও বস্তু প্রবেশের আশঙ্কা সঞ্জাত হইলে epi glottisটি পড়িয়া যায় ও কণ্ঠ-গহ্বরের দ্বার রুদ্ধ হয়। আহার-কালে ভুক্তদ্রব্যকে অন্ননলী-পথে চালিত করিবার জন্য epi-glottis নিম্নমুখী হইয়া থাকে।

কণ্ঠ-গহ্বরের উপরে গল-গহ্বর বা pharynx। এই স্থানের পেশীসমূহ জিহ্বা, তালু, কণ্ঠগহ্বর প্রভৃতি পেশী-সমূহের সহিত মিলিত ভাবে সঞ্চালিত হইয়া উচ্চারিত শব্দের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে।

মুখ-গহ্বরের উপরিভাগকে (roof of the mouth) ইংরাজী হিসাবে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—কঠোর তালু (hard palate) ও কোমল তালু (soft palate)। কিন্তু আমাদের ভারতীয় উচ্চারণ হিসাবে ইহাকে মূর্দ্ধা বলা যায়। মুখ-গহ্বরের উপরে সম্মুখের দিকে যে একখানি ত্রিকোণ দীর্ঘ অস্থি আছে তাহার নাম মূর্দ্ধা বা hard palate; এবং পশ্চাদ্‌ভাগে যে অতি নমনীয় পর্দ্দা (flexible curtain) আছে, তাহাকে উপজিহ্বিকা (velum palate বা soft palate) বলে। এই উপজিহ্বিকা বা velum পেশী-নির্ম্মিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কোমল প্রকোষ্ঠে বিভক্ত (composed of muscular and cellular tissue); ইহার পশ্চাদ্দিকের ক্ষুদ্র

প্রান্তভাগকে uvula বা আল্‌জিভ বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় আল্‌জিভ জিহ্বামূলের দিকে ঝুলিয়া থাকে। উপজিহ্বিকা বা velumএর এরূপ পেশী আছে যে তাহার সঞ্চালন দ্বারা ইহাকে সঙ্কুচিত বা সম্প্রসারিত করা যায়। ইহার পশ্চাৎভাগে তালুরন্ধ্র বা nasal cavity আছে। উপজিহ্বিকার একটা কার্য্য হইতেছে এই তালুরন্ধ্র বা নাসারন্ধ্রের পথ রুদ্ধ বা মুক্ত করা। এই পথে বায়ু চালিত হইলে তাহা নাসা-পথে নির্গত হয় এবং উচ্চারণে অনুনাসিকতা সম্পাদন করে।

রসনা বা জিহ্বাই বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান উপাদান বা অঙ্গ। অসংখ্য স্থানে ও অসংখ্য ভাবে জিহ্বার সঞ্চালন হইয়া থাকে। ইহার অবস্থান ও আকারের ভেদে উচ্চারিত শব্দের অসংখ্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এইজন্য সাধারণ ভাষায় কেবলমাত্র জিহ্বারই নাম বাগিন্দ্রিয়।

মূর্দ্ধার সম্মুখের দিকে দন্ত-মাড়ি ও দন্তপংক্তি এবং সর্ব্বশেষে ওষ্ঠদ্বয় লইয়া সমগ্র বাগ্‌যন্ত্র। স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ যখন কোনও শব্দ উচ্চারণ না করে সেই অবস্থায় এই সমগ্র বাগ্‌যন্ত্রের যেরূপ অবস্থান হয়, পার্শ্বের চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল।

নাদ (voice), উচ্চতা (pitch), বিস্তার (stress) এবং আকার (timbre) ভেদে স্বরের নানা রূপ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্বাস-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বায়ু-নির্গমের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাগ্‌যন্ত্র হইতে একপ্রকার অল্পাধিক ক্ষীণ শব্দ উৎপন্ন হয়। ইহাকে নাদ-বিহীন বা শ্বাস-স্বর (noise) বলে। এই শ্বাস-স্বরের উৎপাদনে বাগ্‌যন্ত্র নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। ফুসফুস হইতে বায়ুনলী পথে কণ্ঠ-গহ্বর ও কণ্ঠ-পটহের মধ্য দিয়া যে বায়ু গল-গহ্বর ও মুখ-গহ্বর দিয়া
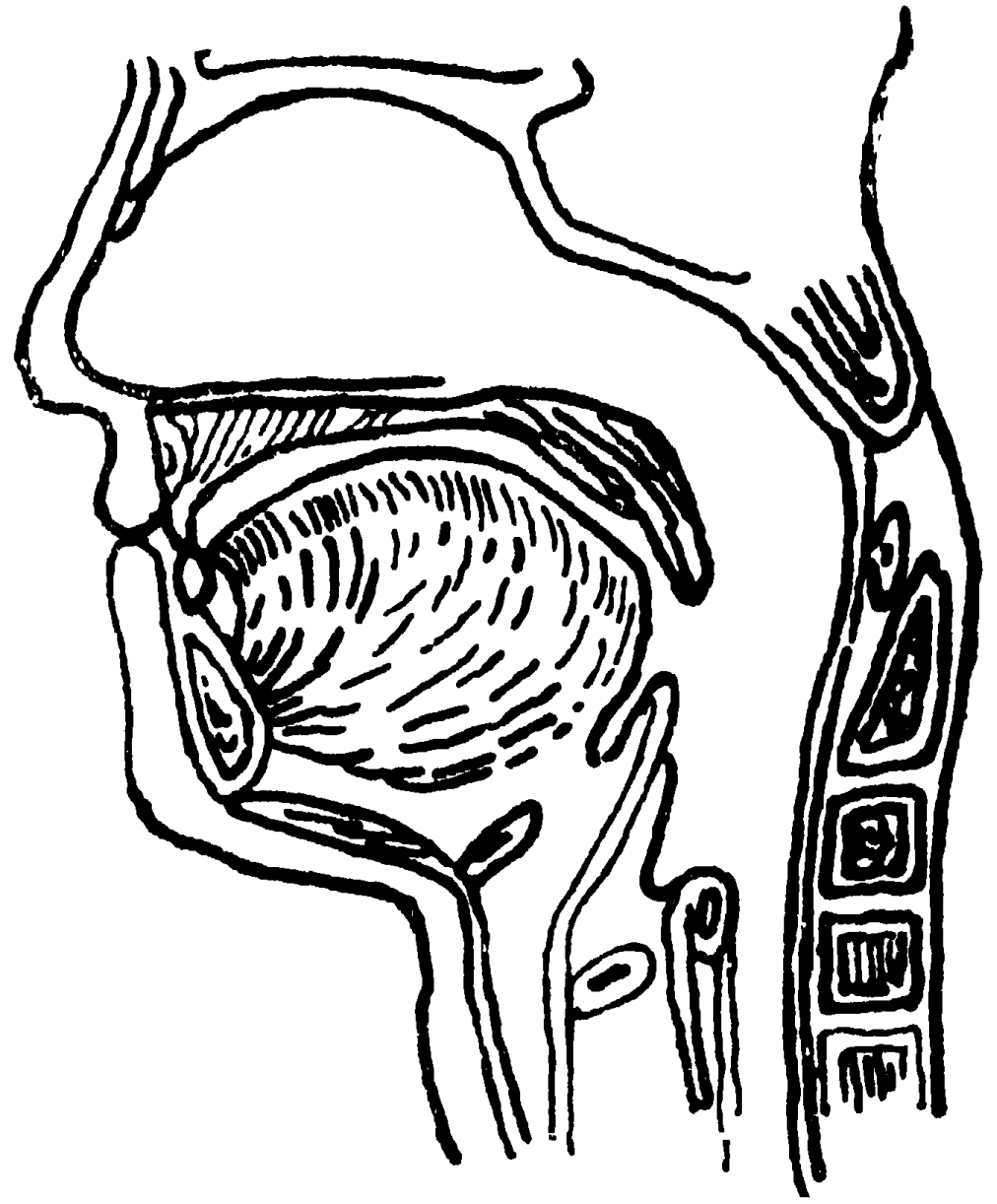
উচ্চারিত স্বর

নির্গত হয়, তাহা কোন স্থানে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য ইহা দ্বারা কোন নাদ উৎপন্ন হয় না। অনাদিত স্বরে বাক্যের উচ্চারণ হয় না। নাদ-স্বরের উচ্চারণের জন্য কণ্ঠ গহ্বরে আগত বায়ু কণ্ঠ-পটহ ও কণ্ঠ-তন্তু দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। কণ্ঠ-গহ্বরের উভয় পার্শ্বস্থ তন্তুর সঙ্কোচন দ্বারা সেখানকার বায়ু শক্তি প্রয়োগ দ্বারা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। তখন এই উৎক্ষিপ্ত বায়ু-প্রবাহের কম্পন বা vibration আরম্ভ হয়। এই কম্পন বা vibration দ্বারা নাদ (voice) উৎপন্ন হয়। চিত্র দ্বারা শ্বাস (noise) ও নাদের (voice) প্রভেদ এইভাবে দেখান যাইতে পারে :— *
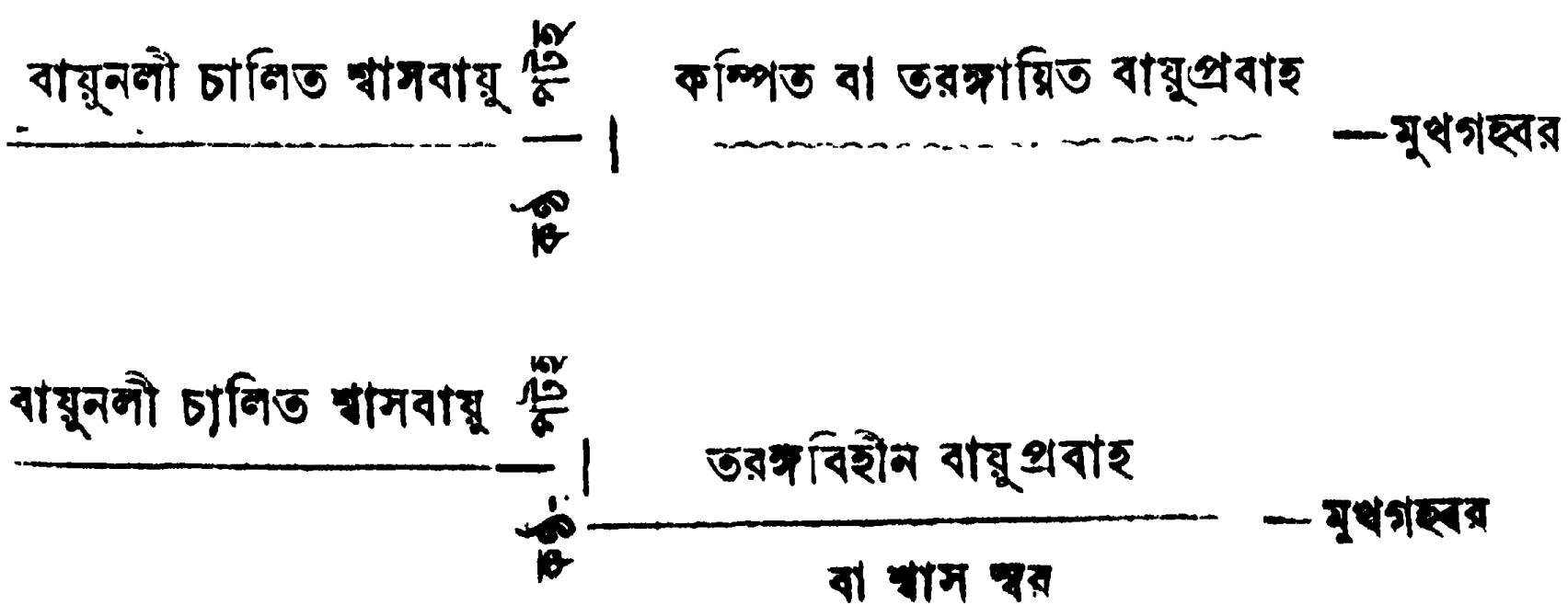
বায়ু-প্রবাহের এই কম্পন দ্বারাই নাদ বা সুর উৎপন্ন হয় এবং এই কম্পন বা তরঙ্গের সৃষ্টির জন্য কণ্ঠ-গহ্বরের পেশী-সমূহের সঞ্চালন দ্বারা শক্তি প্রয়োগ আবশ্যক হয়। সুতরাং বিনা চেষ্টায় নাদের সৃষ্টি হয় না। আবার এই কম্পন সময়মাত্রিক বা isochronous, অর্থাৎ সময়ের অনুপাত অনুসারে কম্পন-তরঙ্গের সংখ্যা নির্ণীত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, পণ্ডিতগণ এই তরঙ্গের সংখ্যা গণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উ-উচ্চারণে কম্পন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫০, ও-উচ্চারণে কম্পন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ৯০০, অ-উচ্চারণে ১৮০০, এ-উচ্চারণে ৩৬০০, এবং ই-উচ্চারণে ৭২০০। অর্থাৎ উ-বর্ণে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং ই-বর্ণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কম্পন আবশ্যক হয়। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের উচ্চারণে কেবল সময়-মাত্রের প্রভেদ; সুতরাং কম্পনেব হারের ন্যূনাধিক্য হইবে না।

স্বরের উচ্চতা, বিস্তার ও আকার

কম্পন বা তরঙ্গের প্রকৃতি অনুসারে তিন প্রকারে স্বরের শ্রেণী-বিভাগ হইয়া থাকে। কম্পনের হার বা সংখ্যা অনুসারে স্বরের উচ্চতা (pitch) বা উদাত্তাদি সুর নির্ণীত হয়; অর্থাং সে স্বরের উচ্চারণে বায়ু-প্রবাহের কম্পন-সংখ্যা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই স্বর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, এবং যাহার উচ্চারণে কম্পন-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, সেই স্বর সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন স্বর। সুতরাং কেবলমাত্র চিন্তাশক্তির সাহায্যে (theoretically) দেখিতে এই উচ্চতার হিসাবে স্বরের শ্রেণী হইবে অসংখ্য। কিন্তু এ প্রকার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমরা বাস্তব জগতে করিতেও পারি না, শ্রুতির সাহায্যে গ্রহণ করিতেও পারি না। আমাদের বর্ণমালার স্বরসমূহের মধ্যে ই-কার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্বর এবং উ-কার সর্ব্বনিম্ন স্বর। অভিন্ন অবস্থায় প্রবাহ-রেখার দীর্ঘতার ন্যূনাধিক্য অনুসারে কম্পন-সংখ্যার বিপরীত অনুপাতে ন্যূনাধিক্য হয়, অর্থাৎ কণ্ঠগহ্বরের তন্তুর দীর্ঘতা এক ইঞ্চি হইলে তাহাতে তরঙ্গ বা কম্পন-সংখ্যা যত হইবে, তন্তুর দীর্ঘতা অর্দ্ধ ইঞ্চি হইলে কম্পন-সংখ্যা তাহার দ্বিগুণ হইবে। কারণ দীর্ঘরেখা অপেক্ষা ক্ষুদ্ররেখা দ্রুতগতিতে কাঁপে। এই কারণে পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণের উচ্চারণে স্বরের উচ্চতা স্বভাবতঃই অধিক। কারণ তাঁহাদের কণ্ঠতন্তুর দীর্ঘতা পুরুষের কণ্ঠতন্তুর দীর্ঘতা অপেক্ষা অল্প।

(২) আবার তরঙ্গ বা কম্পনের বিস্তার অনুসারে স্বরের বিভিন্নতা হয়। অর্থাৎ এক একটি তরঙ্গের প্রশস্ততার তারতম্য স্বরের বিস্তার বা amplitudeএর তারতম্য হয়। চিত্র দ্বারা স্বরের বিস্তার প্রদর্শিত হইতে পারে :—
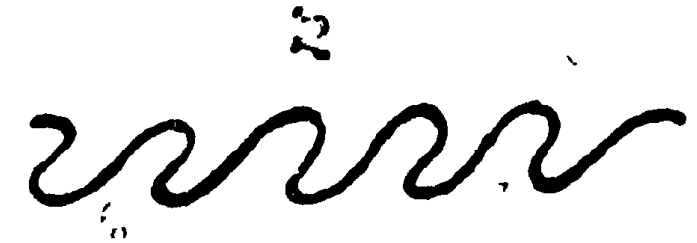
স্বরের বিস্তার

সাধারণ ভাষায় ইহাকে মোটা গলা বলা হয়। উচ্চ-স্বরকে সেই প্রকার মিহি গলা বলা হয়। স্বরের বিস্তার অধিক হইলে সেই অনুপাতে উচ্চতা অল্প হয়। রমণী অপেক্ষা পুরুষের উচ্চারণে স্বরের বিস্তার অধিক।

(৩) আবার তরঙ্গ-পংক্তির আকৃতি-অনুসারেও স্বরের উচ্চারণের বিভিন্নতা হয়; অর্থাৎ সরলভাবে তরঙ্গ হইলে যেরূপ উচ্চারণ হইবে বক্রভাবে তরঙ্গ হইলে সেরূপ হইবে না। বাগিন্দ্রিয়ের গঠন বা আকার-অনুসারে এই প্রকার বায়ুপ্রবাহ পংক্তির বিভিন্নতা হয়। সুতরাং স্বরের আকৃতি ব্যক্তিগত উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য। চিত্রদ্বারা দেখান যায় :—

স্বরের এই ত্রিবিধ প্রকৃতির প্রভেদ অনুসারে চিন্তায় (theoretically) স্বর অসংখ্য হইতে পারে। যেমন উচ্চতার বিভিন্ন ক্রম হইতে অত্যুচ্চ, অনত্যুচ্চ, মধ্যোচ্চ, অনিম্ন, অনতিনিম্ন, অতি-নিম্ন, ৪৫০ ডিগ্রি উচ্চ, ৭৭০ ডিগ্রি উচ্চ ইত্যাদি স্বর অসংখ্য, এবং সেই বিস্তার ও আকৃতিরও অসংখ্য ভেদ। সুতরাং এই তিন প্রকৃতি লইয়া স্বরের

অধিক বিস্তার স্বর

অল্প বিস্তার স্বর
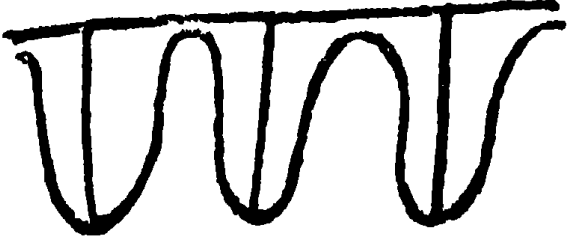
বিভাগ ও প্রভেদ নির্দ্ধারণ একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। অধ্যাপক সুইট (sweet) জিহ্বার ত্রিবিধ উচ্চতা, তিনটী সঙ্কোচন স্থান, জিহ্বার দ্বিবিধ বিস্তার ও দ্বিবিধ বক্রতা লইয়া স্বরের ৩৬ প্রকার ভেদ কল্পনা করিয়াছেন।

যদি কম্পিত বায়ুপ্রবাহ মুখগহ্বর দিয়া নির্গত করিয়া দেওয়া যায়, এবং যদি জিহ্বা স্বাভাবিক বিশ্রামের অবস্থায় থাকে ও ওষ্ঠদ্বয় কেবলমাত্র খুলিয়া দেওয়া হয় (অর্থাৎ সঙ্কোচন, প্রসারণ বা অন্য কোনও প্রকার পেশীসঞ্চালন না করা হয়), আর পশ্চাৎদিকে উপজিহ্বা উত্থিত হইয়া গলগহ্বরের পৃষ্ঠের দিকে ঈষৎ প্রসারিত হয়, তাহা হইলে যে স্বরের উচ্চারণ হয়, তাহার নাম অনির্দ্দিষ্ট স্বর বা indeterminate vowel. আমাদের অ-বর্ণের উচ্চারণ এই
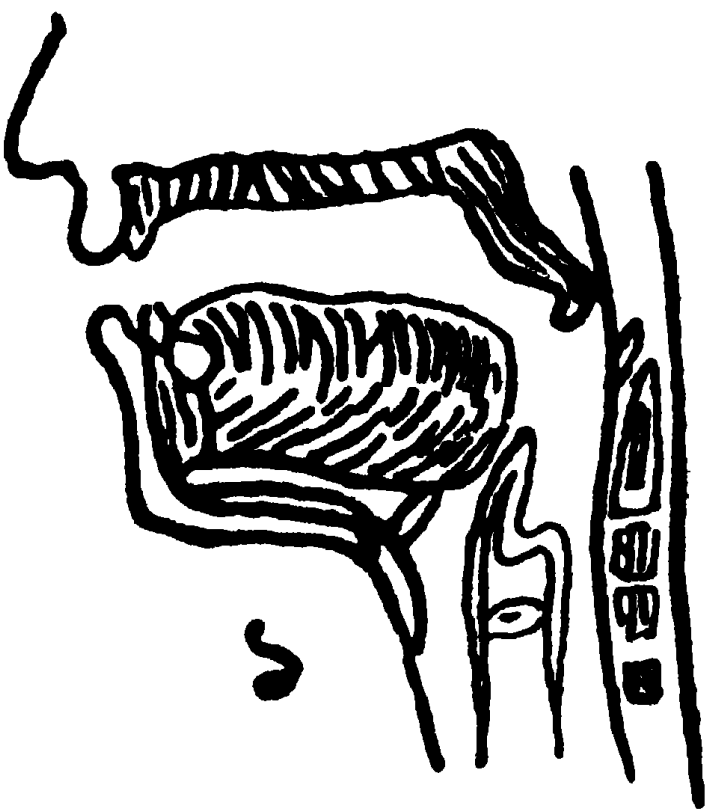
অ-বর্ণের উচ্চারণ

প্রকার। কিন্তু ইউরোপীয়গণ ইহার উচ্চারণ বক্র এ (১) বা আমাদের বাঙ্গালা 'এক' শব্দের এ-কারের ন্যায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাগ্‌যন্ত্রের এই অবস্থান হইতে অল্প আয়াসেই অন্য স্বরগুলির উচ্চারণ করা যায়। নিম্নের চিত্র দেখুন।

যদি কণ্ঠগহ্বর উন্নীত করিয়া ওষ্ঠ ও মুখগহ্বরের কোণ-সমূহ সঙ্কুচিত করা হয় এবং জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর নিকট পর্য্যন্ত উঠাইয়া বায়ুপ্রবাহের পথের দীর্ঘতা যতদূর সম্ভব কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তালব্য ই-বর্ণের উচ্চারণ হয়। এই স্বরের উচ্চতা সর্ব্বাধিক বলিয়া ইহার উচ্চারণে বাগ্‌-যন্ত্রের প্রায় যাবতীয় অংশই উন্নমিত হয়। নিম্নের চিত্র দেখুন।
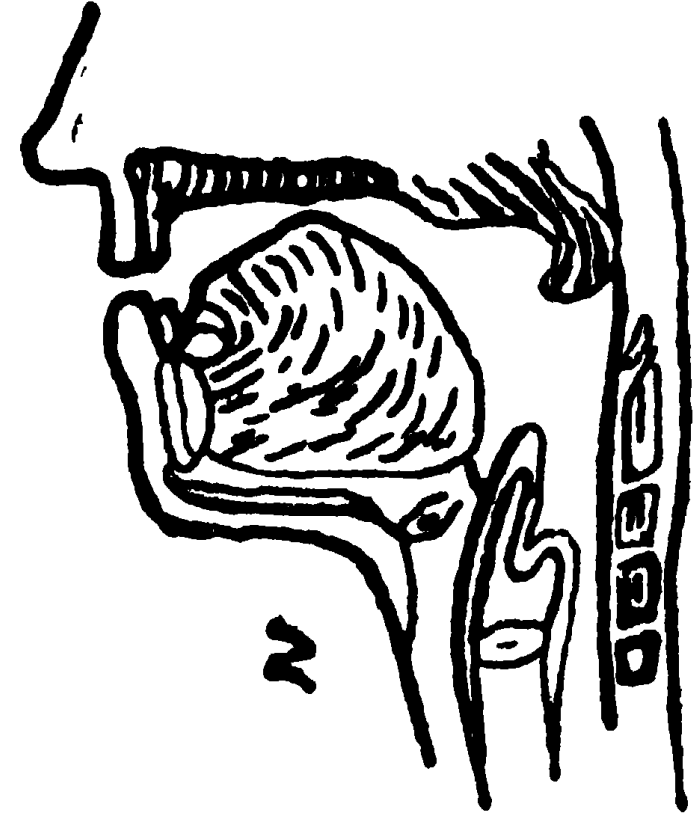
ই-বর্ণের উচ্চারণ

আবার কণ্ঠগহ্বর নিম্নগামী করিয়া ওষ্ঠদ্বয়ের সঙ্কোচন ও সম্মুখের দিকে প্রসারণ দ্বারা বায়ু-নির্গমের পথ বৃত্তাকার করিলে এবং উপজিহ্বার দিকে জিহ্বা উঠাইয়া বায়ু-প্রবাহের পথের দীর্ঘতা যতদূর সম্ভব বাড়াইলে উ-বর্ণের উচ্চারণ হয়। এই উচ্চারণের উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন বলিয়া বায়ু-প্রবাহ-পংক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ইহার উচ্চারণ ওষ্ঠ-সাপেক্ষ বলিয়া ওষ্ঠ সঙ্কোচন পূর্ব্বক বৃত্তাকার নির্গম-পথ করিয়া লইতে হয়।

অ, ই, উ এই তিনটী অতি সরল স্বর। এ-কার এবং ও-কারের উচ্চারণ ইহাদেরই মাঝামাঝি, অ-কারকে মধ্য স্বর ধরিয়া এই স্বর-সমূহের নিম্নরূপ চিত্র কল্পিত হইয়াছে :—
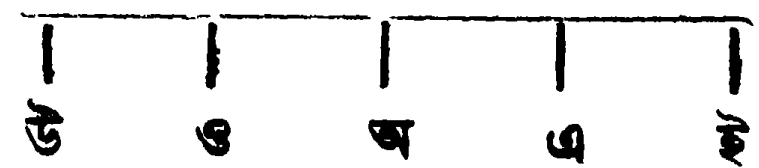
জর্ম্মণ ভাষায় এ-কার ও ও-কারের মাঝামাঝি একটী স্বর আছে, o; এবং ই-কার ও উ-কারের মাঝামাঝি একটী স্বর আছে—ü। এই দুইটীকেও সরল স্বর ধরিয়া স্বর সমূহের জন্য একটী ত্রিভুজাকৃতি চিত্র অঙ্কিত হয়:—
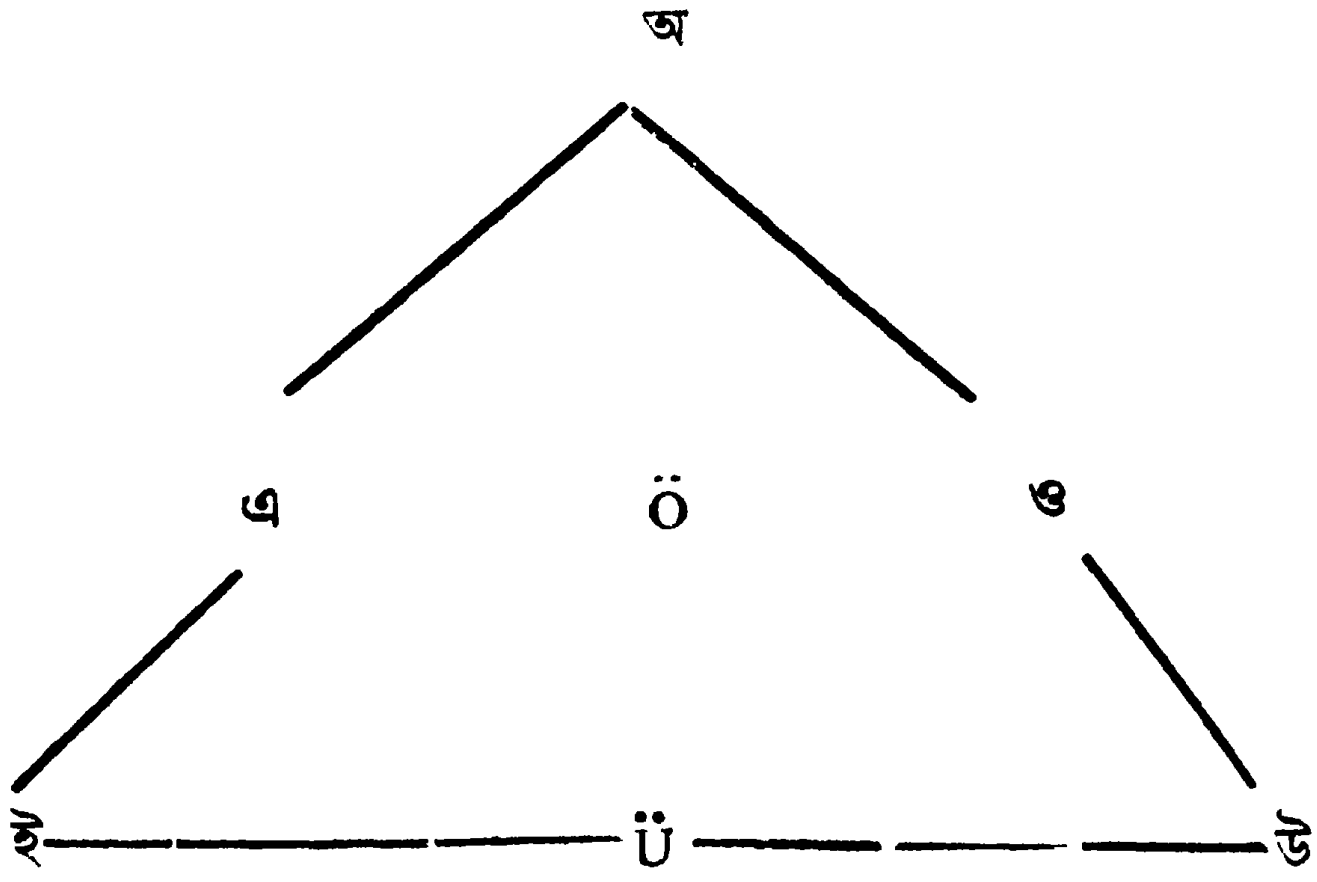
এই ত গেল অবিমিশ্র সরল স্বরের কথা। আবার প্রত্যেক স্বরেরই সানুনাসিক উচ্চারণ হইতে পারে; যেমন অঁ, ইঁ, উঁ, ইত্যাদি। সকল স্বরের উচ্চারণের জন্য নাসারন্ধ্রের মধ্যে বায়ু-প্রবাহের কম্পন আবশ্যক। ইহাদের উচ্চারণকালে বাগ্‌যন্ত্রের অবস্থান ঐ সকল স্বরের প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট অবস্থানই হইবে। প্রভেদ এই হইবে যে, গলগহ্বরের উপরিভাগ হইতে উপজিহ্বা সরিয়া গিয়া নাসারন্ধ্রের দ্বার মুক্ত করিয়া দিবে। তাহা হইলে বায়ুপ্রবাহ নাসারন্ধ্রে গিয়া কম্পিত ও তরঙ্গিত হইবে। কেবলমাত্র নাসা-পথে বায়ুপ্রবাহ চালিত হইলেই স্বরের অনুনাসিকতা প্রাপ্তি হইবে না। নাসাপথের মধ্যে বায়ু-প্রবাহের কম্পন আবশ্যক। নাসারন্ধ্রের বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া দিলে স্বরসমূহ অধিকতর অনুনাসিক হইবে।

এ, ঐ, ও, ঔ, এই চারিটী সন্ধ্যক্ষর বা diphthong। একটী স্বরের উচ্চারণের অবস্থান অবলম্বন করিয়াই যদি বাগ্‌যন্ত্র অন্য একটী স্বরের উচ্চারণের অবস্থান সত্বরতার সহিত অবলম্বন করে, তাহা হইলে সন্ধ্যক্ষর বা diphthongএর উচ্চারণ হয়। কিন্তু এই উভয় স্বরের অবস্থান অবলম্বন করিবার প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যবধান পড়িলে তাহারা পৃথক্ স্বর হইয়া যাইবে। আ-কার ও ই-কারের সন্ধি বা যোগে
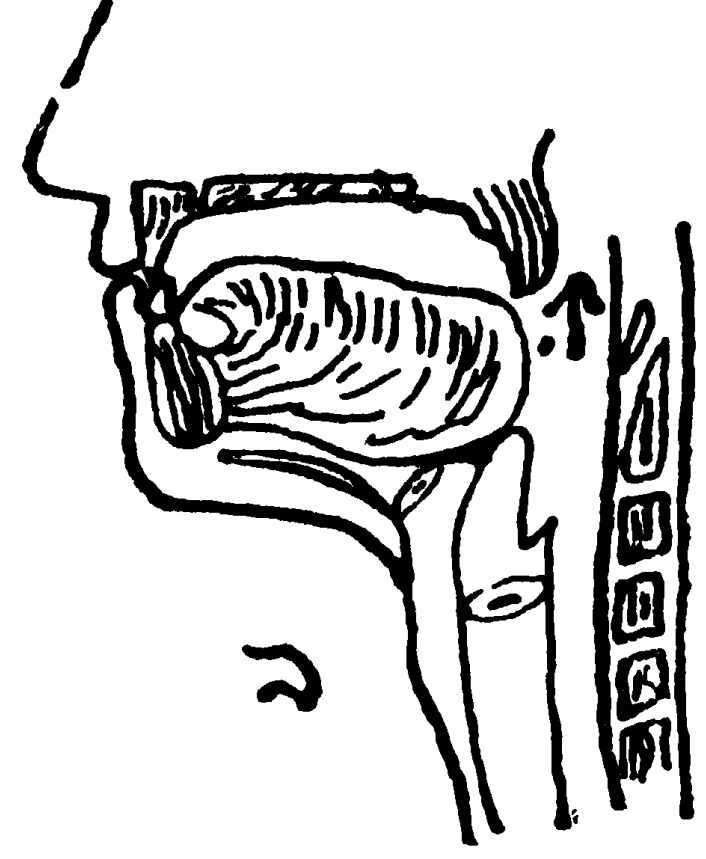
এ-কার হয় বটে, কিন্তু এ-কারে অ-কারও নাই, ই-কারও নাই; ইহা একটী স্বতন্ত্র স্বর।

ব্যঞ্জন ও অর্দ্ধব্যঞ্জন

সংস্কৃত ভাষায় ঋ, ৠ, ৯, ৡ নামে চারিটী স্বর ছিল; এবং অনুস্বারকেও অর্দ্ধ-স্বর অর্দ্ধ-ব্যঞ্জন বলা হইত। ইহাদের মধ্যে ঋ স্বর এখনও বঙ্গভাষায় আছে, যদিও প্রাকৃত ও পালিভাষায় ছিল না। অনেক অভিজ্ঞতার পর আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের বর্ণসমূহকে যে তাঁহারা স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুই শ্রেণীতে এতকাল ভাগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। তাঁহাদের এতকালের সংজ্ঞায় ব্যঞ্জন স্বরের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। কিন্তু এতকাল পরে তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের z, v, l, r, m, n অর্দ্ধব্যঞ্জন; অর্থাৎ ইহাদের স্বাধীন উচ্চারণ সম্ভবপর। তাহা হইলে সর্ব্বসমেত অর্দ্ধ-ব্যঞ্জন হইল z, v, w, y, l, r, m, n,—এই আটটী। আমাদের প্রাতিশাখ্যের মতে অর্দ্ধস্বর ছিল—য, র, ল, ব এবং অনুস্বার। সুতরাং ইঁহারা অধিক অর্দ্ধ-স্বর z ও nএর আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে, ইংরাজী even শব্দে শেষের e না থাকিলেও উচ্চারণে বাধা হয় না। সুতরাং তাঁহারা vowel ও consonant বলিয়া আর তাঁহাদের alphabetএর ভাগ করিবেন না; এখন তাঁহারা বলিবেন, sonants and consonants. এই প্রকার ভাগ হইলে পূর্ব্বোক্ত স্বর-সমূহ এবং এই আটটি অর্দ্ধস্বর

sonant শ্রেণীস্থ হইবে এবং অবশিষ্ট ব্যঞ্জন সমূহই consonant থাকিবে।* তবে sonant বর্ণগুলি নাদ প্রাপ্ত বা voiced হইলেই sonant বা স্বরবৎ স্বাধীনভাবে উচ্চারণ-বিশিষ্ট হইবে; নতুবা ইহারাও ব্যঞ্জন। আবার ই এবং উ, এই দুই স্বরও তাড়াতাড়ি উচ্চারণের ফলে ব্যঞ্জনত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বসমেত sonant বর্ণ হইল যাবতীয় স্বরবর্ণ এবং z, v, l, m, n, r, এবং ব্যঞ্জন বা consonant হইল যাবতীয় ব্যঞ্জন বা consonant এবং i এবং u. ইহাঁদের মতে আরও অনেক ব্যঞ্জনের স্বাধীন উচ্চারণ হইতে পারে, যথা s, f, th (as in *then*)। সাধারণভাবে শ্রেণী বিভাগ করিলে ইহাদিগকে sonant বলা হয় না। তবে নাদ-প্রাপ্ত voiced হইলেই স্বরত্ব বা স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হইবার শক্তি উৎপন্ন হয়, নতুবা হয় না। যেমন lascar শব্দে l ও r দুইটাই ব্যঞ্জন বা consonant, কিন্তু miserable শব্দে দুইটাই sonant বা স্বরধর্ম্মী।

ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ

শ্বাস-নাদ বা ঘোষ অঘোষ ভেদে ব্যঞ্জন দ্বিবিধ। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ভেদে আবার তাহারা দ্বিবিধ। উচ্চারণের স্থানভেদে ষড়্‌বিধ। বায়ুপ্রবাহ-পথের অবরোধ, সঙ্কীর্ণতা, উভয় পার্শ্বস্থতা ও অনুনাসিকতা ভেদে তাহারা চতুর্ব্বিধ। শ্বাস বা অঘোষ বর্ণের উচ্চারণে বায়ুপ্রবাহের কম্পন হয় না। নাদ বা পেশীসমূহের কঠোরতা সহ অধিকতর শক্তি প্রয়োগ আবশ্যক হয়। কণ্ঠগহ্বরের ঊর্দ্ধদেশে জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ ও উপজিহ্বার সঙ্কোচ দ্বারা সেই স্থানে উৎপন্ন বর্ণকে উপজিহ্বা-স্থানীয় বা velar বলে। আরব্য ভাষা q প্রভৃতি বর্ণ এই স্থানে উৎপন্ন। ইহাকেই উচ্চারণের প্রথম স্থান বলা যায়। মূর্দ্ধা বা hard palateএ উৎপন্ন বর্ণ-সমূহ কণ্ঠ্য বা palatal বর্ণ। আমাদের ক, খ, গ, ঘ, এই শ্রেণীর। মূর্দ্ধা ও দন্তমাড়ির মধ্যস্থলে আমাদের চ, জ, ছ, ঝ উৎপন্ন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে এগুলি consonantal diphthong বা দুই দুই ব্যঞ্জনের একীভাব। উপরের দন্তমাড়িতে ট, ঠ, ড, ঢ উৎপন্ন। ইহারা আমাদের মূর্দ্ধণ্য বর্ণ এবং ইউরোপীয়গণের alveolar dentals. ঊর্দ্ধ দন্তপংক্তিতে ত, থ, দ, ধ উৎপন্ন। ইহারা দন্ত্য বর্ণ dentals। ওষ্ঠদ্বয়ে প, ফ, ব, ভ উৎপন্ন। ইহারা ওষ্ঠ্য বর্ণ বা labial-।

উচ্চারণের স্থান অনুসারে ব্যঞ্জনগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। যথা :—

(১) উপকণ্ঠ্য, উপজিহ্ব্য বা velar বর্ণ-সমূহ। অঘোষ q, qh, ঘোষ—g, gh ও ng। অল্পপ্রাণ...q, g, ng; মহাপ্রাণ qh, gh, এই সকল বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ ও উপজিহ্বার নিম্নভাগের মধ্যে সঙ্কীর্ণ বায়ু-প্রবাহ প্রস্তুত করিতে হয়। নিম্নে চিত্র প্রদত্ত হইল। ঘোষ বর্ণের জন্য বায়ু-প্রবাহে কম্পন হয়। অঘোষ বর্ণে হয় না। আনুনাসিক বর্ণ ঘোষ বর্ণের অনুরূপ। প্রভেদ এই যে মুখদ্বার রুদ্ধ করিবার পর নাসাদ্বার উন্মুক্ত হয়। মহাপ্রাণ বর্ণে পেশীসমূহ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়।
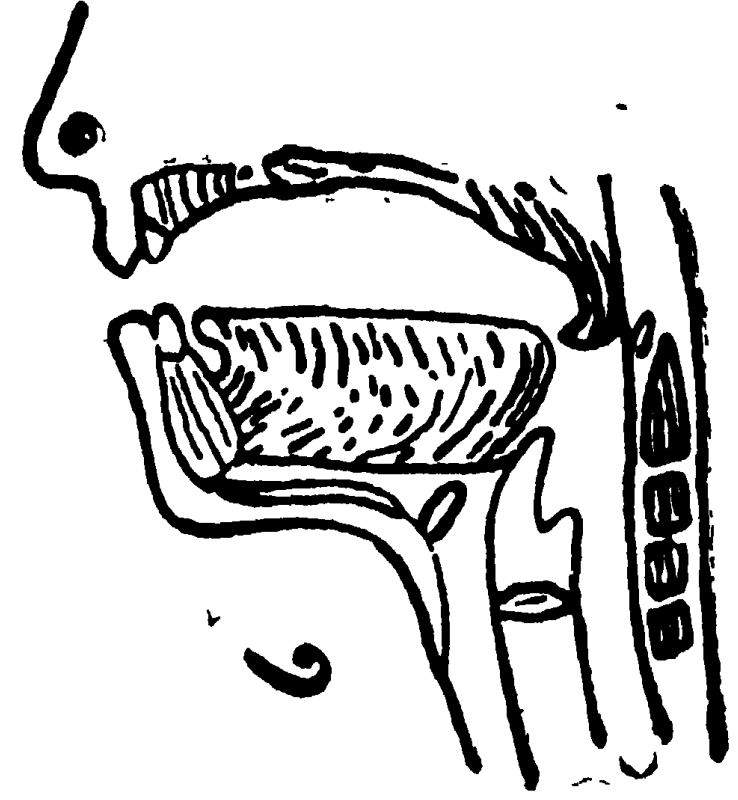
(২) কণ্ঠ্য বা palatal বর্ণসমূহ। ক, খ, গ, ঘ, ঙ। ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগে ও উপজিহ্বার ঊর্দ্ধভাগে বা palateএর মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ বায়ু-প্রবাহ-পথ প্রশস্ত করিতে হয়। অঘোষ বর্ণে কম্পন নাই, ঘোষবর্ণে কম্পন আছে। মহাপ্রাণ বর্ণে পেশী-সমূহের দৃঢ়তা হয়। অনুনাসিক বর্ণ ঘোষ-বর্ণের তুল্য, প্রভেদ এই যে মুখরোধের পর নাসাপথ মুক্ত হয়।

(৩) তালব্য বা dento-palatal বর্ণসমূহ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ,। ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বাগ্র ও দন্তমাড়ির
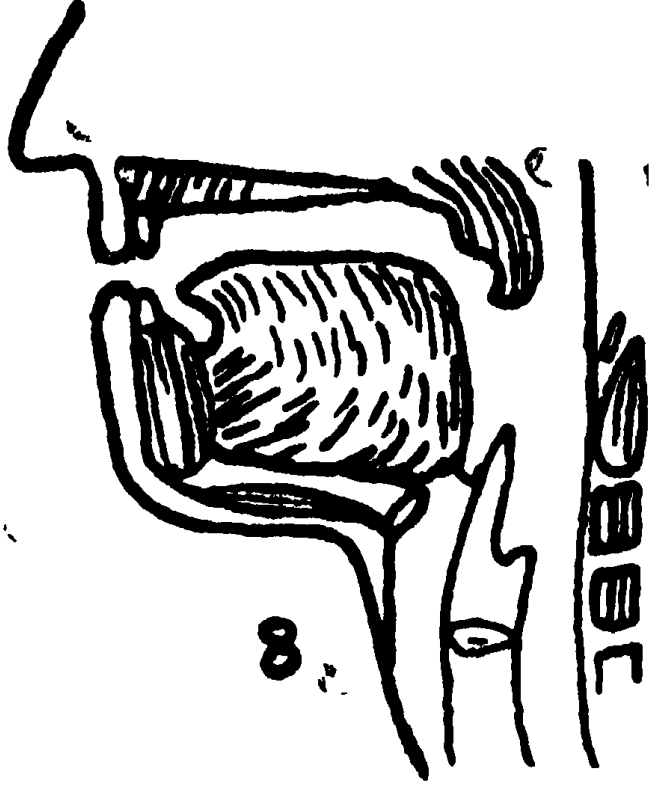
উর্দ্ধভাগ দিয়া বায়ু নিঃসারিত হয়, কিন্তু জিহ্বাগ্রের বিস্তার সঙ্কুচিত না হইয়া প্রসারিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ
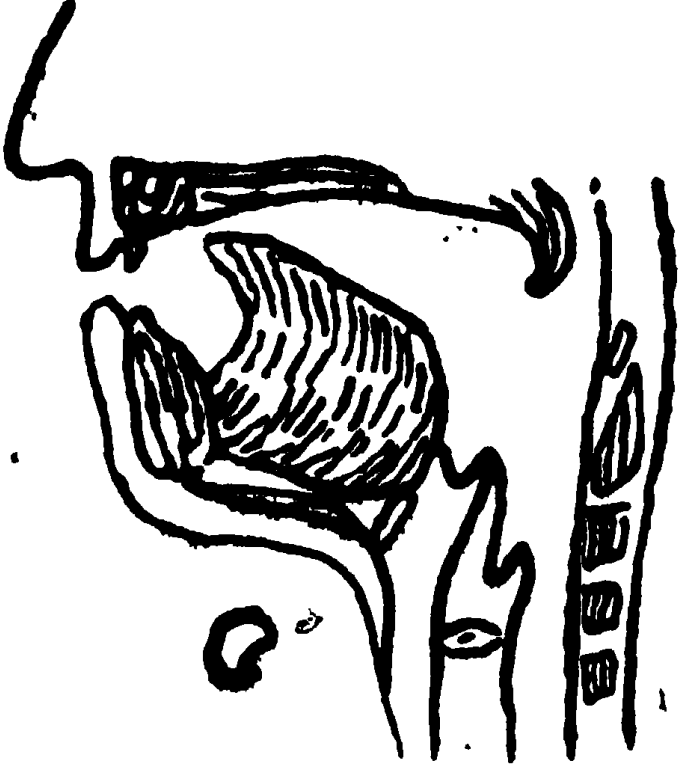
ইহাদিগকে consonantal diphthong বলিতে চাহেন তাঁহাদের মতে ত ও শ মিলিয়া চ হয়।
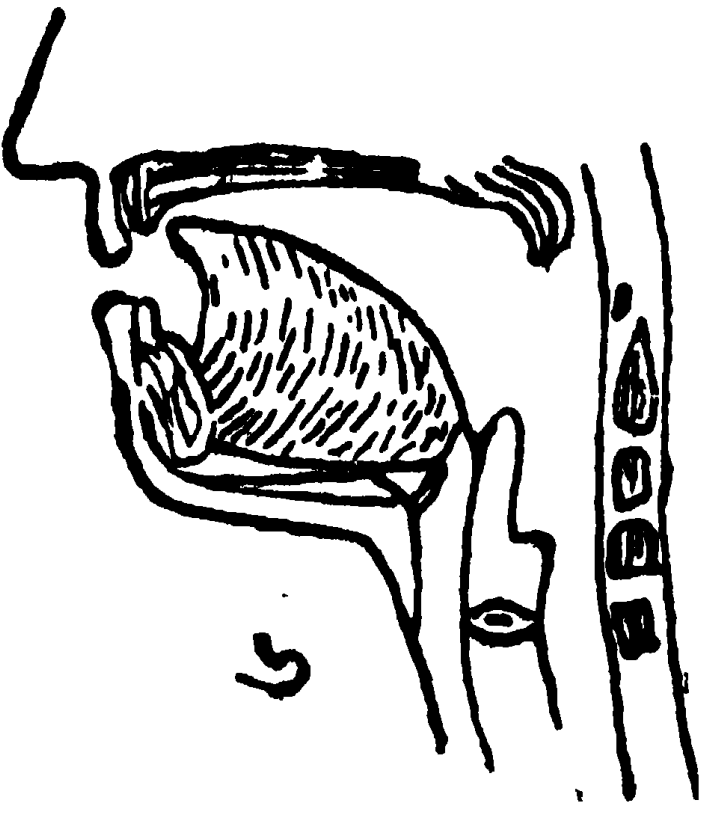
(৪) মূর্দ্ধণ্য বা alveolar dental বর্ণসমূহ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ,। ইহাদের উচ্চারণে উর্দ্ধ দন্তপংক্তির মাড়ি ও জিহ্বাগ্রের উপর দিয়া বায়ু নির্গম হয়।

(৫) দন্ত্য বা dental বর্ণসমূহ। ত, থ, দ, ধ, ন। ইহাদের উচ্চারণে বিস্তার প্রাপ্ত ও প্রসারিত জিহ্বাগ্র সম্পূর্ণভাবে উর্দ্ধ দন্ত-পংক্তি স্পর্শ করে, এবং স্পর্শের পর জিহ্বাগ্রের উপর দিয়া বায়ু নিঃসারিত হয়।
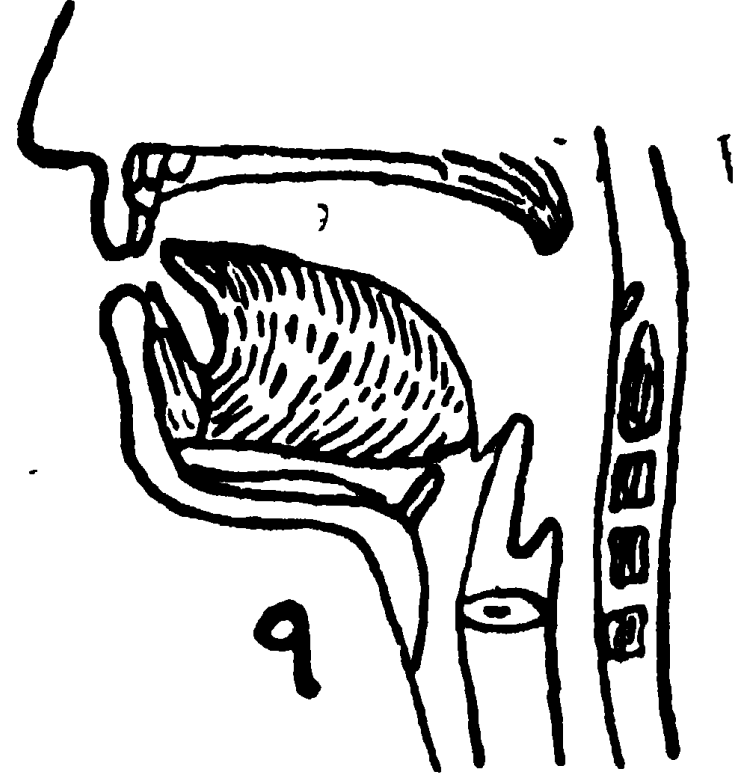
(৬) ওষ্ঠ্য বা labial বর্ণসমূহ। প, ফ, ব, ভ, ম। ইহাদের উচ্চারণে প্রথমে ওষ্ঠদ্বয় সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় এবং তাহার পরেই জিহ্বার উপর দিয়া চালিত বায়ু মুক্ত ওষ্ঠদ্বয়ের ভিতর দিয়া নিঃসারিত হয়।
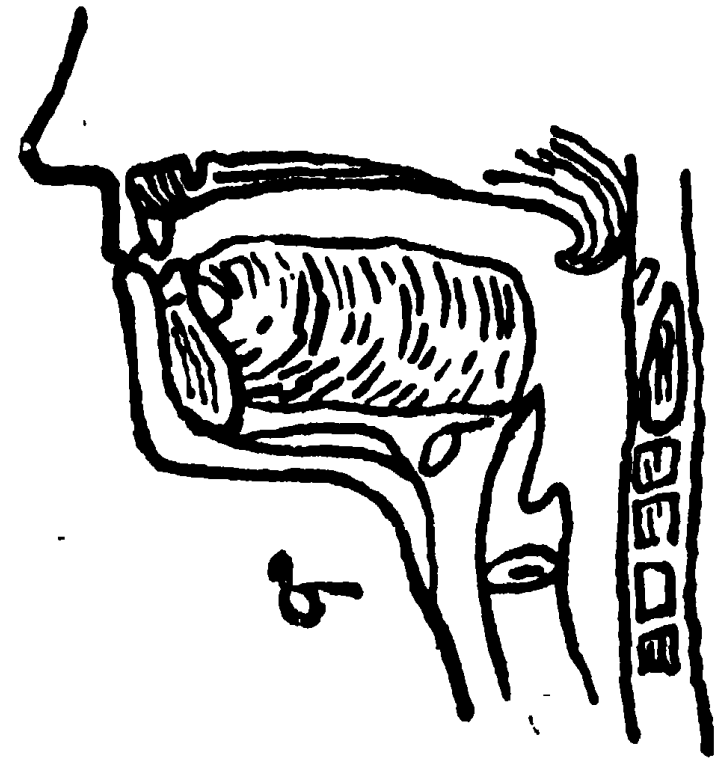
(৭) র ও ল। ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বাগ্রের মধ্যস্থল রুদ্ধ হয় এবং দুই পার্শ্ব দিয়া বায়ু প্রবাহ নিষ্ক্রান্ত হয়। মূর্দ্ধণ্য বর্ণ-সমূহের উচ্চারণ স্থানে র ও দন্ত্য বর্ণের উচ্চারণ স্থানে ল উচ্চারিত হয়। ড়, ঢ়, এই দুই বর্ণের

উচ্চারণ বিস্তৃত জিহ্বার উপর দিয়া দুই পার্শ্বের বায়ু-প্রবাহের দ্বারা সঞ্জাত হয় ; তবে এই প্রক্রিয়ায় পেশীসমূহের দৃঢ়তা সম্পাদন হয়। মহাপ্রাণ হ কারের উচ্চারণে কণ্ঠ-গহ্বরের পেশী-সমূহের দৃঢ়তা সম্পাদন পূর্ব্বক সজোরে বায়ু নির্গত হয়, কিন্তু গল-গহ্বরে বা মুখ-গহ্বরে কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় না। ঊর্দ্ধ দন্ত ও জিহ্বার মধ্য দিয়া সজোরে শ্বাস (নাদ নহে) বায়ু নিঃসারিত করিলে দন্ত্য আকারের উচ্চারণ হয়। দন্তমাড়ির নিকট জিহ্বা অবস্থিত হইলে তালব্য শ ও তদূর্দ্ধ স্থানে ষ হয়। ইংরাজী f বর্ণের উচ্চারণে নিম্ন অধর ঊর্দ্ধ দন্ত-পংক্তিকে স্পর্শ করিয়া বিস্ফোটন-ক্রিয়ার ন্যায় সজোরে বায়ু নির্গত করে। z বর্ণের উচ্চারণ দন্ত্য স ও জ এর মাঝামাঝি ; এবং z (as in *measure*) বর্ণের উচ্চারণ z ও তালব্য শ এর মাঝামাঝি।

নানা দেশে নানারূপ বর্ণমালা আছে। আমরা বিস্তৃত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রত্যাবর্ত্তন

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

হিরণের উপদেশ

সেদিন কি একটা বিশেষ কাজে জলদকে কিরণদের বাড়ী হইতে সকাল সকাল বাসায় ফিরিতে হইল। তাহার শান্ত মূর্ত্তি জানলার বাহিরে যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন পৃষ্ঠে মৃদু করস্পর্শে সচকিত হইয়া ফিরিয়া স্মিতকণ্ঠে কিরণ কহিল, "দিদি! আমি ভেবেছিলুম, কে? এমন নিঃশব্দে এসেচ তুমি!"

"নিঃশব্দে? না। আসাটা সম্পূর্ণ সশব্দেই হয়েছিল। তখন পূজারিণীর ধ্যান ভাঙ্গেনি তাই যা—। এতক্ষণ হচ্ছিল কি? কোর্টসিপ্?" বলিয়া দিদি হিরণবালা সহাস্যে ভগিনীর মুখের পানে চাহিল। কিরণের মুখ এই আকস্মিক আঘাতে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সলজ্জ বিরক্ত মুখে সে কহিল, "যাও। ও সব কি! ও আমি ভালবাসিনা।"

হিরণ কহিল, "কি ভালবাসিস্ না? কোর্টসিপ্ করা? না, সে কথা কারো বলা?" হিরণের কণ্ঠে তেমনি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর।

কিরণ মুখ ফিরাইয়া তীব্র স্বরে কহিল, "জলদবাবু রবিবারে এখানে আসেন। সবাই ওঁর সঙ্গে কথা বলেন, আমিও বলি। বাবা, মা, দাদা, কেউ ত আমায় মানা করেননি কখনো। বরং দাদাই প্রথম কথা বল্‌তে বলেন। তাতে দোষ হয় বলে জানিনা ত!"

হিরণ কহিল, "দাদা বাবার কাণ্ডই অম্‌নি! মা, খুড়ীমা ত সংসার সাম্‌লাতেই ব্যস্ত—ওদের রান্না-ভাঁড়ার ছাড়া আর কোন দিকে চোখ আছে কি?"

"ওঁদের নেই,—তোমার ত আছে!" বলিয়া কিরণ বিষণ্ণ বিরক্ত মুখে ঘরের বাহির হইতে গিয়া বাধা পাইল। হিরণ তাহার আঁচল টানিয়া ফিরাইয়া কহিল, "রাগ কর্‌লি ভাই? সত্যি বল্‌চি, তোকে কষ্ট দেব বলে আমি কিছু বলিনি। বড় বোনের বলা উচিত ভেবেই বলেচি,—তুই ত বুদ্ধিমতী, লেখাপড়াও শিখেছিস্, নিজেই বুঝে ত্যাখ্। এই যে জলদ বাবুর সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা--না দেখ্‌লে রইতে-নারি-ভাব, এ কি ভাল? অন্যেরও ত চোখে পড়ে।"

"পড়্‌লেই বা,—কি করেচি আমি—যার জন্যে যা খুসী তাই বল্‌বে—?" অভিমানে কিরণের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। বক্তব্যটুকু সে শেষ করিতে পারিল না।

হিরণ তাহার অনিচ্ছা না মানিয়া টানিয়া তাহাকে সোফার উপর পাশে বসাইল। বোনটির বেদনাহত

মুখের পানে চাহিয়া তাহার স্নেহ-তরঙ্গ উথলাইতে চাহিলেও সে স্থির হইয়া রহিল। অপ্রিয় হইলেও চিকিৎসককে অনেক সময় রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। কিন্তু সে নিষ্ঠুরতা সুধু রোগীর মঙ্গলের জন্যই। আজ সে উপদেষ্টার যে পদ গ্রহণ করিয়াছে, ইহার দায়িত্ব তাহাকে পালন করিতেই হইবে! বিচলিত হইলে চলিবে কেন? হিরণ কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—ঠিক জবাব দিবি?"

"কেন দেব না?" বলিয়া কিরণ জানলার বাহিরে একটা ফুলে-ফলে-ভরা নিম গাছের প্রতি বিষণ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল।

হিরণ কহিল, "জলদবাবু যদি হঠাৎ বদ্‌লি হয়ে এখান থেকে চলে যান? আর কখনও ওঁর সঙ্গে দেখা হবার আশা যদি না থাকে, তাহলে তুই কি করিস্?"

"আফিং খাই, কি কেরোসিনে পুড়ি—এম্‌নি কিছু করি বোধ হয়।" কিরণের কথায় ঝাঁজ থাকিলেও হিরণ বুঝিল, এইবার মনের ঠিক জায়গাটি সে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। সে কহিল,"না, অত বড় কিছু করিস্ না। তবে দুঃখ যে পাস্ খুবই, তা নিশ্চয়। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদিস্ও,—মনের ভেতরটা সব শূন্য হয়ে যায়। সত্যি কি না, ভেবে বল্ দিকি?"

কিরণ কহিল, "কেউ কোথাও গেলে কেঁদে আমি চিরকালই থাকি। তখন যদি তা করি, আমার নিজের কাছে তাতে একটুও আমি আশ্চর্য্য হব না। দেখ দিদি, আমিও কদিন থেকে দেখ্‌চি, তুমি আমায় সারাক্ষণ কেবল চৌকি দিয়ে ফির্‌চ—কিন্তু কেন বল দেখি? আমার দোষ কিছু খুঁজে পেলে কি? দাদার বন্ধু হন্, আমিও ওঁকে দাদার মত মনে করি। ওঁর সঙ্গে কথা কইলে দোষ হয়, তা আমি জানিনা।"

হিরণ ক্ষুণ্ণভাবে কহিল, "কথা বলায় দোষ কি থাকবে? তুই রাগ করচিস্—আমি কিন্তু ঠিক এভাবে বলিনি কিরণ। সব জিনিষেরই একটা সূক্ষ্ম দিক আছে কি না। আমি বলছিলুম সেই মনের দিক থেকে, ব্যবহারের দিক থেকে নয়। দাদার পথ চেয়ে যে চোখ-কাণ তোর এমন করে পথের উপর পড়ে থাকে না, তা তুইও জানিস্! আর কোন্ শাড়ীখানিতে কেমন মানাবে, চুলগুলি কোন্ ছাঁদে কেমন করে বাঁধলে মুখখানির বাহার বেশী খুল্‌বে, এ-সব গুরুতর সমস্যাও মনে ওঠবার দরকার হয় না। যদি বল, দাদার মতন নয়, প্রিয় বন্ধুর মত, তাহলেই ঠিক্ কথা বলা হয়। কিন্তু তোমার মত ছেলে মানুষের এমন বন্ধু থাক্‌লে লোকে নিন্দে করবার সুযোগ পায়। জলদবাবু একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। তাঁর ছেলে আছে, স্ত্রী আছে। নিন্দের কারণ কিছু নেই অবশ্য। তবু জান ত, ও-জিনিষটা এম্‌নি মন্দ যে সীতা-হেন সতীকেও সেজন্যে বনে যেতে হয়েছিল। লোকের কথা তত গ্রাহ্য করি না—তবে আমি ত একালের আর সেকালের অনেক নভেলই পড়েচি। সখী ঢের থাকে। কিন্তু সখা থাক্‌লেই মুস্কিল হয়! একজন নায়িকাকে তিনজন নায়কে ভাল্‌বাস্‌তে পারে। গ্রন্থকার দুজনকে সন্ন্যাসী বা যা-হয়-কিছু করে একজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে শেষ রক্ষা করে থাকেন। কিন্তু উল্টো হলেই না বিপদ! এমন বিপদে অনেকেই পড়েচেন। এখনকার দিনে ভদ্র-সংসারে দু-চারটে বিয়ে অবশ্য কেউ করে না। তাছাড়া কর্ত্তৃপক্ষও আছেন। কিন্তু আম্‌রা যে সীতা-সাবিত্রীর জাত। সুধু দেহ নয় ত,—মনকেও যে আমাদের সূর্য্যের মত উজ্জ্বল নির্ম্মল রাখতে হবে। মনের আরসিখানা যদি আজে-বাজে, যা-তা এঁকে-জুকে আগে থেকেই ভরিয়ে রাখি, তাহলে আসল ছবিই যে মনের সবখানটি জুড়ে পড়বে। হয়ত সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে কতবারই তুলনায় কত খুঁত-খুতুনি মনে উঠে তার সব শান্তিটুকুও নষ্ট করে দেবে। হয়ত এমন কত—"

কিরণ শান্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরভাবে কহিল. "তোমার বোধ হয় আমি কোন ক্ষতি করিনি?"

হিরণ স্মিত মুখে কহিল, "না, তা করনি। তুমি আমার ক্ষতি করলেও আমি তোমার ক্ষতি কখনো করতুম না। আমার স্বার্থে আঘাত লাগ্‌লে হয়ত তোমায় উপদেশ দেবার সখও আমার উবে যেত। কিন্তু তখনও আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী বড় বোন্‌ই থাক্‌তুম। এর পরে ঠাণ্ডা মাথায়

ভেবে দেখো কিরণ, অপাত্রে ভালবাসা দিতে বারণ করে খুব অন্যায় আমি করিনি।"

"যা খুসী, তাই কিন্তু বল্‌চ দিদি। কে চায়? বয়ে গেছে আমার।" বলিয়া ঝড়ের বেগে সহসা সে ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

হিরণের মনে হইল, ঝড়ের সহিত বৃষ্টিও যেন দেখা দিয়াছে! উপস্থিত সে নির্জ্জনে কাঁদিবার জন্যই পলাইয়া গেল। যাক্। ঝড়ের উদ্দাম বাতাস হাহাকারই টানিয়া আনে! বৃষ্টির শীতল ধারা তাহাকে শান্ত করে। মৃদু হাসিয়া টিপয়ের উপর হইতে সেলাইয়ের ঝাঁপিটি নামাইয়া সে মনে মনে বলিল, এ রোষ রবে না চিরদিন—বলিয়া ঝাঁপি খুলিয়া সেজ খুকার ফ্রক সেলাইয়ে পুনরায় মনঃ-সংযোগ করিল।

এই কাজটি প্রায় ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে সে আরম্ভ করিয়াছিল; এবং জলদের আবির্ভাবে ইহা উঠাইয়া রাখিয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তখন কিরণও এখানে উপস্থিত ছিল। তাহার ব্যগ্র দৃষ্টি ঘড়ি ও ঘরের আর্সিখানার পানে যতটা নিবিষ্ট হইতেছিল, তাহাতে দিদির তাঁতের কাপড়ের অসৌখীন ফ্রকের প্রতি মনোযোগ দিবার মত সুবিধাও তখন ছিল না। মানুষ মাত্রেই নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে। অল্প-বয়সীদের মধ্যে আবার এ রোগটা কিছু বেশী। দুই বোনে পাশাপাশি বসিয়া পরস্পরকে ফাঁকি দিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছিল। হিরণ ভাবিতেছিল, কিরণের মনটিকে সে এইবার ঠিক নখ-দর্পণে দেখিয়া লইয়াছে। কিরণ ভাবিতেছিল, আশ্চর্য্য মানুষ দিদি! তাই জলদ বাবুর সহিত মন খুলিয়া কথা কয় না। বরং কেন উনি নিত্য আসেন, এমন অভিযোগও উহার কথায় কথায় বিদ্রোহীর ভাবে প্রকাশ পায়। দিদির মতে একা শরৎ বাবু ছাড়া জগতে আর আদর্শ মানুষ নাই! পৃথিবীতে মানুষ ঐ একটিমাত্র! কেমন করিয়া মানুষ ভালবাসায় এমন এক-চক্ষু হইয়া যায়, কে জানে? স্বামীকে ভক্তি করিতে হয়, কর, ভালবাসিতে হয় বাস, কে মানা করিতেছে? তাই বলিয়া তাঁহার দোষ-গুণও দেখিতে পাইব না? এ কি অন্ধ ভক্তি! এমনি করিয়া পূজা দিয়াই ত আমরা নিজেদের সম্মান খোয়াইয়া বসিয়াছি। ধর, জলদ বাবু—মানুষটির ত অনেক গুণ,—তাই বলিয়া কি তাঁর সবই ভাল ভাবিতে হইবে না কি!

কিরণ মনে মনে জলদ বাবুর দোষানুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিল,—আপাততঃ কৈ, কিছুই ত স্মরণ হইতেছে না। শেষে সে সিদ্ধান্ত করিল, মন এখন চঞ্চল রহিয়াছে, তাই স্মরণ হইতেছে না, পরে ভাবিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ত্রুটি উহারও পাওয়া যাইবে। কিরণের মনে হইল, জলদ বাবু আজ অযথা বিলম্ব করিতেছেন। কাছারি হইতে ফিরিয়াছেন, সেই পাঁচটায়। এখন ছটা বাজিয়া তেরো মিনিট হইয়াছে। এখনও তাঁহার আসিবার নাম নাই! আশ্চর্য্য মানুষ! গল্প পাইলে তাঁর আর কিছুই মনে থাকে না! হয় ত কোথাও গল্পে জমিয়া গিয়াছেন। আর কি সময়ের হুঁস্ আছে? যাই হোক কিরণের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। অতঃপর সিঁড়িতে জুতার শব্দের সহিত জলদের হাসি ও কথার সুর শুনিতে পাওয়া গেল। আর সে আওয়াজটি কিরণের কাণেই আগে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মেঘ ও রৌদ্র

পরদিন নিয়মিত সময়ে যে-উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও উৎসাহের ভরে জলদ তাহার তীর্থ-মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল—ফিরিবার সময় পথে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাতেই ফিরিল। সহসা অত্যধিক আহত হইলে বা কোন প্রিয় বস্তু হারাইলে মানুষের মুখের ভাব যেমন হয়, জলদের মুখেও তেমনি বেদনা ও হতাশার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে শুনিয়া আসিয়াছে, কিরণ সেদিন সকালে তাহার মামার সঙ্গে ত্রিপুরায় চলিয়া গিয়াছে। কিরণের মাতামহ কিছু অসুস্থ, তাই কিরণ তাঁহার সেবার জন্য গিয়াছে। ত্রিপুরায় সে কখনো যায় নাই। সেখানে যাইবার লোভও তাহার মনে পূর্ব্ব হইতে ছিল। এই সময় কি একটা মকর্দ্দমা উপলক্ষে মামা আসিয়াছিলেন; হিরণ আসায় মার কাজের দোসর মিলিয়াছে, তাই সে এমন

শুভ অবসর ত্যাগ করিতে রাজি হইল না। শুনিয়া জলদ বিস্মিত হইল। কাল সন্ধ্যা বেলায় সে এ বিষয়ের কোন আলোচনা শুনিয়া যায় নাই ত! একটা রাত্রির মধ্যেই সব স্থির হইয়া গেল? না, অনাবশ্যক-বোধে এ বিষয়টা কিরণ ইচ্ছা করিয়াই তাহার কাছে কিছু বলে নাই! কিন্তু বলিলে ক্ষতি কি ছিল? জলদ ত তাহার মনের শুভ-ইচ্ছায় বাধা দিতে পারিত না। না হয় সে ক্ষুণ্ণ হইত! সে ত আজও হইয়াছে এবং চিরদিনই হইবে। তাহাতে কাহার ক্ষতি? তবু জানা থাকিলে বিদায়-ক্ষণে বাড়াতে না হয় ষ্টেশনে গিয়াও ত একবার চোখের দেখা দেখিয়া আসিত। আর সেই মধুর দৃষ্টি—মোহন হাসিটুকুই ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বলরূপে সে সঞ্চয় রাখিয়া দিত। সে যখন ফিরিয়া আসিবে, জলদ হয়ত তখন সরকারী কাজে বদলি হইয়া, কে জানে, কত দূরে চলিয়া যাইবে। হয়ত আর কখনও তাহাকে দেখিতেও পাইবে না। তাহাদের আনন্দময় বন্ধুত্বের এইখানেই হয়ত শেষ! এ দেখা না হওয়াই যে ছিল ভাল। যা এত ভঙ্গুর, এত অনির্দ্দিষ্ট, তাহার জন্য এ কি ব্যর্থ ব্যথা!

জলদের মনে হইল, নিজেকে এমনভাবে জড়াইয়া সে ভাল করে নাই। সত্যই কি কিরণ তাহার বন্ধুত্ব আর চায় না? সে কি ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে ব্যথা দিয়া গিয়াছে? তাহাদের এত দিনের তিলে-তিলে গড়া এমন যে ভালবাসার মন্দির, সে কি এমনি বিনা-বাতাসেই ভাঙ্গিয়া গেল! সবটুকুই চপলা বালিকার খেয়াল? মূলে তাহার কিছু নাই, কিছু ছিলও না? সেই যে ব্যাকুল আগ্রহে পথ চাহিয়া থাকা—যে-চাহনিতে ভিন্ন পথের পথিক সে পথ হারাইয়া বিপথে পাড়ি দিতে বসিয়াছিল, সেও তবে মিথ্যা!

সেদিন জলদ স্থির করিল, কিরণকে একখানা চিঠি লিখিয়া সে তাহার মনের কথা জানিয়া লইবে। নীতীশের কাছে ঠিকানা জানিয়া আসিল। সেই সঙ্গে কিরণের পৌঁছানো সংবাদও শুনিয়া আসিল। চিঠি লিখিবার ইচ্ছা মনে উঠিলে সে যেন ইহার মধ্যেও একটুখানি উন্মাদনার আনন্দ অতি-গোপন অন্তরের তলে-তলে অনুভব করিল। এই একটিমাত্র উপায়ে তাহাদের বন্ধুত্বকে সে এখনও বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। হারাইয়াও আবার তাহাকে কাছে পাইবে। পূর্ব্বে জলদ কোন দিন কিরণকে কোন চিঠি লেখে নাই। কিন্তু কিরণের হাতে লেখা ছোট-খাট চিঠি সে দুই-চারিখানি পূর্ব্বে পাইয়াছে। তাহাদের চাকর মধু বাজার যাইবার সময় সে-চিঠি ডেপুটি বাবুর নিজের হাতে দিয়া গিয়াছে। চিঠিতে অবশ্য কথা বেশী কিছু থাকিত না, এবং যাহা থাকিত, তাহা বৈকালে দেখা হইলে বলা চলিত, তবু কিরণের মনের তাড়া বেশী থাকায় সে সময়ের অপেক্ষা রাখিত না। পত্রের বিষয় থাকিত এমনি—সেদিন জলদ যে বইখানি আনিবে বলিয়া গিয়াছিল, তাহা যেন ভুলিয়া না যায়! অথবা অমূল্যর মেসের ঠিকানা সে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা লিখিয়া দিতে হইবে,—এমনি অনুরোধ। অমূল্য পরীক্ষা দিতে কলিকাতায় গিয়াছে।—তবু সেই ছোট চিঠির টুক্‌রাগুলি জলদকে প্রীত করিত। সেগুলি যে লেখিকার কতখানি উদ্বেগ বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহা সে কল্পনায় অনুভব করিত; করিয়া তৃপ্তির হাসি হাসিত।

কয়েক দিন ইতস্ততঃ করিয়া কাটাইয়া কিরণকে চিঠি লিখিয়া তাহার কৈফিয়ৎ লওয়াই সে স্থির করিল। কেন সে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে জলদকে জানাইয়া গেল না? মধুর হাতে দু-লাইন লিখিয়া দিলেও ত জলদ যথা-সময়ে হাজির হইতে পারিত। কি অপরাধ সে করিয়াছিল যে এমন কঠিন শাস্তি তাহার জন্য বাহাল হইল? হয়ত জীবনে তাহাদের দেখা-শোনার এই শেষ। আর হয়ত কখনও তাহারা এ সুযোগ পাইবে না। তবে বিদায়-কালের পাথেয় বন্ধুত্বের এ দাবাটুকু পূরণ করিলে কিই বা তাহার ক্ষতি ছিল! হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে এমন কি অপরাধ সে করিল, যে জন্য এই কঠিন দণ্ড! পত্রের সম্বোধনে কল্যাণীয়া ও শেষাংশে শুভার্থী লিখিয়া চিঠিখানা ডাকে ফেলিয়া উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সে তাহার উত্তরের পথ চাহিয়া রহিল। পোষ্টাপিসের ঠিকানায় চিঠির জবাব দিবার কথা লিখিয়াছিল। বাড়ীতে চিঠি আসিলে যদি সুনীতি তাহা কৌতূহল-বশে খুলিয়া পড়ে! সুনীতির নিকট গোপন করিবার এই ইচ্ছা তাহার নিজ-কার্য্যে তাহাকে লজ্জিত করিলেও নিরস্ত করিতে পারিল না।

মনকে সে বুঝাইল, এ কার্য্যের জন্য সুনীতিই অংশত

স্ত্রী। কিরণকে সে ত তাহার বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু সে ত কিরণের কথা শুনিতে চায় না। কখনো মুখ ভার করে, কখনো ছুতা করিয়া উঠিয়া যায়। তাই জলদও আর সে সব কথা তুলিত না। এই যে না বলিয়া কিরণ হঠাৎ চলিয়া গেল, সে কথা সেই রাত্রেই সে সুনীতির কাছে আগে জানাইয়াছিল; ভাবিয়াছিল, সেখানে সে সহানুভূতি পাইবে। কিন্তু হায়রে, এ যে পাথরে তাহার জল ঝরাইবার সাধ! সুনীতি শুধু অনাসক্তভাবে জবাব দিয়াছিল, "আস্‌বে এখন ফিরে।" ব্যস্! সহানুভূতির চূড়ান্ত হইয়া গেল। সে যেন কিছুই না। ছোট খোকার বা বড় খোকার কান্নার মতই সে যেন অনায়াসলভ্য নিত্য ঘটনা। তারপর সাত দিনের ভিতর একবারও সে স্বামীর চিন্তার সংবাদ লইয়াছে কি? কিছু না। কেনই বা লইবে? সে ত কিরণকে ভালবাসিত না, বরং হিংসাই করিত। বুড়া বয়সে তাহার সবই বাড়াবাড়ি! বৃথা সন্দেহে পড়িয়া নিজেও দুঃখ পায়—অন্যকেও দেয়। এ-সব কি? মেয়েগুলা মনে করে, মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিয়া স্বামী তাহাদের কেনা হইয়া গিয়াছে। কাহারও সহিত কথা কহিলে বা হাসিলে—এতটুকু এদিক-ওদিক হইলে পৃথিবী উল্টাইয়া গেল! কিরণের মত মেয়ের বন্ধুত্ব পাওয়া সে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করে। মানুষ ত আর পাখী নয় যে সে শুধু নিজের খাঁচার মধ্যেই বসিয়া থাকিবে, বাহিরের সহিত কোন যোগ রাখিবে না! এখন ত সকল শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরাই বন্ধু-বান্ধবের সহিত এমন মেলামেশা করিয়া থাকে, তাহাদের সংসারে ত এজন্য এমন বিপ্লব বাধে না। তবে কিরণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া সেই বা স্ত্রীর কাছে অপরাধী হইবে কেন?

কিছুদিন হইতে তাহার মনে একটা সংশয় জাগিয়াছে। তবে কি সত্যই সুনীতির সন্দেহের কোন ভিত্তি আছে? কিরণকে সে তাহার বন্ধুত্বের পাওনা ছাড়া কি বেশী দিয়া ফেলিয়াছে?

যদি দিয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতিই বা কি! সে ত কোনরূপ নীতি-বিগর্হিত অন্যায় কাজ কিছু করে নাই। যোগ্য ব্যক্তিকেই ভালবাসিয়াছে। সখী বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছে। ইহা কি এমনই অপরাধ! প্রতিদানে সেও কি সেখানে কিছু পাইয়াছিল? হয়ত পাইয়াছিল!

জলদ ভাবিয়া দেখিল, বুঝি দেওয়ার চেয়ে পাওয়ার তালিকাই বড় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রত্যেক কথা, হাসি, ভঙ্গিমা—সমস্তই যেন জলদের চিত্ত-বিনোদের জন্যই সৃষ্ট ছিল। তাহাকে নিজের হাতে খাবার দিয়া, বাতাস দিয়া, গল্প করিয়া ও গল্প শুনিয়া সে যেন বিশ্বের আনন্দ উপভোগ করিত। অতর্কিতে কতদিন সে তাহার এত কাছে আসিয়া বসিত—যে আপন-ভোলা জলদকেও চকিতে একবার অন্যের দৃষ্টি-পর্য্যবেক্ষণে বাধ্য হইতে হইত। প্রতিদিন বিদায়-কালে, কোন দিন আসিবার সময়েও সেই দুইটি যাদু-করা কালো চোখে কি মধুর দৃষ্টি ভরিয়াই সে তাহার পথের যাত্রা মধুময় করিয়া দিত। সে চোখের ভাষা কি ভালবাসার চোখে কখনও গোপন থাকে? যাতায়াতের পথটা ছিল অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, তাই সুবিধাও ছিল খুব। নহিলে ফিরিয়া তাকাইতে গিয়া কতবারই যে তাহাকে লোকের ধাক্কা সহিতে হইত, তাহার কি আর হিসাব ছিল! ইদানীং মা ও সুনীতির উপদ্রবে প্রায়ই তাহার প্রতীক্ষা দীর্ঘতর হইয়া উঠিত। জলদের সময়ে যাওয়া ঘটিত না, তাহাতে সে কতই না ক্ষুব্ধ হইত। "আপনাকে রোজ রোজ আস্‌তে বলে কেবল জ্বালাতন করি," "এখন আপনার গল্প কর্‌বার ত আর লোকের অভাব নেই, তাই আর আস্‌তে ইচ্ছা হয় না!" "সুনীতিদিদি বুঝি মানা করেন এখানে আস্‌তে?" এমনি সব অভিমানের কথায় অভিমানিনী নিজ অনুকূল উত্তর আদায় করিয়া তবে ছাড়িত। সে-মুখ বলিত, জলদকে সে অশ্রদ্ধা করে না। তাহার সঙ্গ তাহার অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। হয়ত,—হয়ত সে তাহাকে ভালও বাসিত।

এ চিন্তাটিকে জলদ প্রশ্রয় দিতে সাহস করিল না। ইহার যৌক্তিকতাকে সমর্থন করিতে সে কুণ্ঠা অনুভব করিল। তবু এ অস্পষ্ট চিন্তায় কত সুখ! ইহাতে যে বিষ-মিশ্রিত সুরা ছিল। ত্যাজ্য হইলেও তাহা লোভনীয়!

নীলকণ্ঠের মতই তাই সে হলাহল সে কণ্ঠমধ্যেই ভরিয়া রাখিল। কিরণ যখন কাছে ছিল, তখন তাহার আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল না। সে তাহাকে দেখিতে ও

তাহার সহিত গল্প করিতে ভালবাসিত। পাওনা যখন পুরা-মাত্রায় পাইতেছিল, তখন মনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। এখন কিরণ সহসা চলিয়া যাওয়ায় নিজের মনের ভাব সে যেন অত্যন্ত সহসা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইল। বিস্মিতই হইল, কিন্তু দুঃখিত হইল না। লোভ যে কখন্ কোন্ ছিদ্র-পথে মানুষের মনে প্রবেশ করে, তাহার গতি-নিরূপণের শক্তি যদি মানুষের থাকিত, তবে মানুষ মানুষ না হইয়া দেবতা হইতে পারিত। সংসারে নর-রূপী দেবতার অভাব না থাকিলেও সাধারণ মানুষ মানুষই! জলদের নিষ্কলুষ বন্ধুত্ব বন্ধুত্বের সীমা ছাড়াইয়া প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল কি না, তাহা সে কোনদিনই যাচাই করিয়া দেখে নাই। সে চিরদিনই ভাব-প্রবণ। সংসারের ছোট ছোট দোষ-ত্রুটি দেখিয়া বা মানিয়া চলা কোনদিনই তাহার স্বভাব নয়। মানুষের জীবনের পথ যদি চিরদিনই সুগম থাকিত, প্রলোভন যদি মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা না দিত, তবে তাহার জীবনে অনেক অসুখ-অশান্তিই জন্মিতে পারিত না!

সাধারণ মানুষের চেয়ে যাহাদের মধ্যে আবার একটু অসাধরণত্ব সংসারে তাহাদেরই জীবন-পথ আরও জটিল হইতে দেখা যায়। তাহার কারণও অসাধারণত্ব। কেহ ঘরে বসিয়া যুদ্ধের স্বপ্ন দেখিতে ভীত হয়, আবার কেহ সাধ করিয়া তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইতে চায়, এবং কখনো দু'একটা গোলাগুলির আস্বাদও হয়ত অনুভব করে। মানুষে-মানুষে এই যে বিভিন্নতা ইহা তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুসারেই জন্মায়। তাই ফলাফলের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী! যাহার জীবনের পথ বাধা বন্ধহীন, সরল ও সুগম, আমরা তাহারই প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করি এবং অপর পক্ষে বারত্ব থাকিলেও তাহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করিতে পারি না। অথচ এই শ্রেণীর লোকের যে আকর্ষণী শক্তি থাকে, তাহাতে অনিচ্ছাতেও আকৃষ্ট হইতে বাধ্য হই।

সরল-চিত্ত জলদের স্বচ্ছ মনে কোন দিনই কপটতা ছিল না। সে শুধু ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল। নূতন আকর্ষণের আনন্দ তাহাকে তৃপ্ত করিলেও সময় সময় পীড়াও যে না দিত, এমন নয়। মনে হইত, সে যেন তাহার অধিকারের সীমা ছাড়াইয়া কোন্ সঙ্কীর্ণ পথে যাইতেছে। সুনীতির সহিত অনেক সময় কিরণকে লইয়া এই সব গোপনতা সৃষ্টি করিতে হওয়ায় এই ভাবটা তাহার মনে জাগিতেছিল। কিন্তু কোন সাধারণ বিষয়ে চিন্তা করাও তাহার স্বভাব ছিল না। এ সব তর্ক মনে উঠিলেও সে তাহাকে বেশী একটা প্রশ্রয় দিত না। বর্ত্তমানকে সে পুরাপুরি দখল করিতেই ভালবাসিত। মানুষের বিচার সে নিজেকে দিয়া করিত। যে-কার্য্যে তাহার মনে সংশয় না জন্মায়, অন্যেরই বা তাহাতে সংশয় জন্মিবে কেন? তাই নিজের ব্যবহার সংশোধন না করিয়া অন্যের প্রতিই সে ক্রুদ্ধ হইত।

আজ চুনিয়া চুনিয়া অতীত দিনের কথাই তাহার মনে পড়িতেছিল। কিরণকে হারাইয়া তাহার ভালবাসার নিদর্শন গুলি সে যেন স্পষ্ট করিয়াই দেখিতে পাইতেছিল। এমন একটি দিন যায় নাই, যেদিন কিরণ তাহাদের সান্ধ্য সভায় যোগ না দিয়াছে। ঘরে যত জায়গাই থাক, কিরণ কখনও তাহার একেবারে কাছটি না ঘেঁষিয়া বসিত না। সে এত কাছে, যে তাহার সুরভি-নিশ্বাসের বাতাসটুকু জলদকে স্পর্শ করিত। ছবি দেখিতে, বইয়ের পাতা উল্টাইতে কতবারই তাহার কোমল করের মধুর স্পর্শ সে অনুভব করিয়াছে! ঠাকুর চলিয়া যাওয়ায় কোনদিন রান্নাঘরে মার কোন কাজে আবদ্ধ থাকিলে সে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মতই ছট্‌ফট করিত। ছুতা করিয়া কতবারই না ছুটিয়া আসিয়া একটু হাসিয়া, দুইটা যা-তা বকিয়া আবার কাজে চলিয়া যাইত। তাহার উৎসুক মন যে জলদের এতটুকু কথার আওয়াজ, একটু হাসির সুর শুনিলেও ব্যস্ত হইত। সে না থাকিলে সে-বাড়ীর আর কোন আকর্ষণই থাকিত না। ঘরে অন্য যাহারা কিরণের ভাই-বোনেরা থাকিত, তমোনাশী এক চন্দ্রের অভাবে সেই শত তারা জলদের অন্ধকার মনে আলো দিতে পারিত না। সেদিন জলদের হাতের নূতন আংটিটা তাহার হাত হইতে টানিয়া খুলিয়া কেমন অসঙ্কোচে সে নিজের আঙুলে পরিয়া ফেলিল। আবার জলদের ফিরিবার সময় তেমনি অবলীলায় তাহার হাতখানা টানিয়া লইয়া আংটিটা পরাইয়া দিয়াছিল! জলদ হাসিয়া বলিয়াছিল,

"কি করলে, জানো ? অঙ্গুরীয়-বিনিময় !" সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়াছিল, "বিনিময় নয়,—গচ্ছিত-প্রত্যর্পণ। গচ্ছিতও নয়, ডাকাতির মাল ফেরৎ দিলুম।" কথাটা সে অবলীলায় বলিলেও জলদের কথায় তাহার মুখখানা লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া কি মনোহরই না দেখাইয়াছিল! সে মুখের পানে চাহিয়া জলদও যেন ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। সেদিনও সে তেমনি মধুর দৃষ্টি দিয়াই তাহাকে বিদায় দিয়াছিল, উপহাসে নয়। রাগ-ভরে পথে চলিতে চলিতে যতদূর দৃষ্টি যায়, জলদ তাহার হাসিমাখা সুবেশ-সজ্জিত মূর্ত্তিখানিই যে দেখিতে পাইয়াছিল।

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের ব্যবহার মিলাইয়া সে কোন সামঞ্জস্য আনিতে পারিতেছিল না। কিরণ তাহার মামার বাড়ী গিয়াছে। কথাটা এমন কিছু আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক নয়, তবু জলদের মনে হইতেছিল, এ যেন অত্যন্ত অন্যায় রূপে তাহাকেই আক্রমণ করা হইয়াছে। আজই সে তাহার কাছে এমন অনাবশ্যক পর হইয়া গেল ? হিরণ বলিয়াছে, "সে একরকম জেদ করেই চলে গেল। যা ধর্‌বে, তা ত নড়্‌বে না।" সে তবে ইচ্ছা করিয়াই গিয়াছে! কেহ বাধ্য করিয়া তাহাকে পাঠায় নাই! "শীতটা সেখানেই থাকিবে" —গৃহিণী এমন মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন। এখন সবে এই কার্ত্তিকের সুরু শীত শেষের এখনও বহু বিলম্ব। তাছাড়া শীতের পর—আবার কোন নূতন ঘরে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে কি না, সে কথাও ত কিছু বলা যায় না। জলদও এখানকার স্থায়ী মানুষ নয়। হয় ত এ জীবনে আর কখনও তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিবে না। সে বার বার মনে মনে আবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিল,— যাহা চিরন্তন, তাহা ঘটিয়াই থাকে। ইহাতে ক্ষোভ করিবার কিছু নাই। আর পাঁচ জনের মত সেও এখানে দর্শক,— তাহার কার্য্যে চুপ করিয়া অনুমোদন করিতেই বাধ্য! তাহার স্বাধীনতার উপর জলদের কিসের দাবী! না বলিয়া চলিয়া যাওয়া সে ভাল বুঝিয়াছিল, তাই গিয়াছে—বেশ করিয়াছে।

কিন্তু তবু এই শেষের চিন্তাটিকে সে যেন কোন মতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছিল না। এই কথাটাই বারবার মনে তোলাপাড়া করিয়া ইহার গুরুত্ব পাষাণ-ভারের মতই তাহার বুকে চাপিয়া বসিতেছিল। হাস্য-কৌতুকময়ী লীলা-চঞ্চলা কিরণের মূর্ত্তি তাহার বর্ত্তমানের ধ্যান-জ্ঞান হইয়া উঠিল। সুনীতিও এ কয়দিন স্বামীর নিভৃত চিন্তায় অবসর দিবার জন্যই যেন তাহাকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া চলিতেছিল। শাশুড়ী ও শৈল চলিয়া যাওয়ায় তাহার কাজও বাড়িয়াছিল। তাই তাহার অনাসক্ত দূরত্ব-ভাব জলদকে সংশয়ান্বিত করে নাই। সে মনে করিত, এখন আর কাজের জন্য সুনীতি তাহার কাছে বড় বেশী আসিবার সময় পায় না। ইহাতে সে ক্ষুণ্ণ না হইয়া খুসীই হইয়াছিল। এখনকার মনের অবস্থায় পত্নীর মনোরঞ্জনের অক্ষমতা সে পদে পদে অনুভব করিতেছিল। ইচ্ছা করিয়া স্ত্রীকে কেন, কাহাকেও সে ব্যথা দিতে চাহে না। স্ত্রীকে সে ভালবাসে; তবে অবশ্য প্রাপ্য ঘরের জিনিষ জানিয়া, তাহার প্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ দিবার প্রয়োজন বোধ করিত না। যাই কেন হউক না, যত ত্রুটিই ঘটুক না, এখানে ত আর বাঁধন দিয়া ভাঙ্গন বাঁচাইতে হইবে না। সে যে নিজের বাঁধা ঘাটের শীতল বারি,— প্রয়োজন-কালে মিলিবেই। তাহাতে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব কিছুই নাই। তাহার সবটুকুই যে জানা, তাই তাহার রক্ষার জন্য ভয়ও ছিল না। যাহা দুর্ল্লভ, তাহাই সুন্দর! সংসারের নিয়মই এই।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সাহিত্যের প্রাণ

বাস্তব-পন্থা ও কল্প-পন্থা

সাহিত্যের যেমন লক্ষ্য বস্তু দুইটি, কর্ম্ম ও স্বপ্ন, বাস্তব ও আদর্শ, তেমনি তার পন্থাও দুইটি—একটী বাস্তব-পন্থা, এবং অন্যটি কল্প-পন্থা। বাস্তব-পথের যাঁরা পথিক, তাঁরা বাস্তব-জীবনে যেমন দৃশ্যটি দেখেন, ঠিক তেমনিটি আঁকিয়া লইতে চান, তাঁরা জীবনের কোন ব্যাপার ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তাহাতে কল্পনার রং ফলাইয়া মন-গড়া কোন নূতন চিত্র সৃষ্টি করিতে চান না। তাঁরা বিভিন্ন মানব-প্রকৃতি, বিভিন্ন মানব-সমাজ, আর ছোট-বড়, সত্য-অসত্য, সুন্দর-কুৎসিত যাহা কিছু, সবই এক-একটি করিয়া তাঁহাদের চিত্রে সন্নিবেশিত করেন। এই বাস্তব-শিল্পীগণ মানব-জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি পর্য্যন্ত যথাযথ সমাবেশ করিয়া যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা ঠিক যেন আলোক-সাহায্যে তোলা আকার-চিত্র। এখানে চিত্রিতে ও চিত্রে, আসলে ও নকলে, দেখায় ও আঁকায় কোন অংশে প্রভেদ বা অমিল থাকে না। এক কথায় তাঁহাদের চিত্র মানব, সমাজ ও প্রকৃতির অবিকল নিখুঁত চিত্র—অনুলিপি মাত্র। এই বাস্তব-পন্থীরা বৈজ্ঞানিকের ন্যায় শুধুই সংঘটিত সত্যে বিশ্বাস করেন,—যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতেই আবদ্ধ থাকেন। কল্পনার নব-সৃষ্টিতে তাঁহাদের আস্থা নাই, সম্ভাব্য সত্যে অর্থাৎ যাহা হইতে পারে, তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন না। মন যে চক্ষুর অপেক্ষা বেশী দেখে, এ কথা তাঁরা স্বীকার করেন না।

মানুষ নূতন দেশ খুঁজিয়া বাহির করে, কিন্তু মানুষের কল্পনা যে সেই নূতন দেশকে নবরূপে সাজাইয়া আরো নূতন করিতে পারে, এ কথা তাঁহারা মানিতে চান্ না। শেক্স্পীয়রের প্রস্পারো মন্ত্র-বলে শক্তিময়ী প্রকৃতিকে জয় করিয়াছিলেন, ইহা বাস্তব-পন্থীদের নিকট অলীক অদ্ভুত স্বপ্ন! কিন্তু এই অলীক অদ্ভুত স্বপ্নই সত্যে পরিণত হইয়াছে, কারণ প্রকৃতি এখন বিজ্ঞানের কাছে নানাভাবে পরাস্ত ও বশীভূত। বিজ্ঞানের এই মন্ত্র-শক্তি দৈব-শক্তি অপেক্ষাও প্রবল। প্রস্পারো সাহিত্য-গুরুর অপূর্ব্ব স্বপ্ন, যে-স্বপ্নে সত্যের বীজ গভীর-ভাবে নিহিত ছিল। বাস্তব-পন্থীরা কল্পনার এই ভবিষ্যদ্‌বাণীকে মিথ্যা প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করেন। তবে যাহা শুধু প্রত্যক্ষ, পরিচিত ও পরিমিত তাহাই গ্রহণ করিয়া নিপুণতার সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া তাঁহারা আনন্দ পান।

কিন্তু কল্প-পন্থীরা অ-পরিচিত, অ-নির্দ্দেশ্য ও অতি-প্রকৃতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চান,—একঘেয়ে স্থূল বাস্তব জীবনের সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অ-বাস্তব কল্পিত প্রদেশের মধ্যে নূতন পথ কাটিয়া লইতে চান। সেই অ-জানা অ-চেনা প্রদেশে কোন সীমার দাগ নাই; সেখানে সবই অস্পষ্ট ও বিচিত্র—আলোক যেন আঁধারে মেশা। এই অসীম অদ্ভুত দেশ কল্প-পন্থীদের বিলাস-ক্ষেত্র, কল্পনার লীলাভূমি। এখানে সবই যেন আব্‌ছায়ার ভিতর দিয়া এক অনির্ব্বচনীয়তার উদ্রেক করে। এখানে দৃশ্যপুঞ্জ একদিকে অস্পষ্ট হইলেও অন্যদিকে ভাব ও কল্পনার লাবণ্য-প্রভায় বিচ্ছুরিত হইয়া ওঠে,—ম্লান ছায়াও যেন অফুরন্ত জ্যোতি-প্রপাতে প্রদীপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু কল্পনার আলোক নিশ্চল শুভ্র আলোক নহে, চঞ্চল, তরঙ্গায়িত ও বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত। এই আলোক দীপ্ত সূর্য্যের উগ্র গম্ভীর ও স্বচ্ছ-নির্ম্মল আলোকের মত নহে, নানাবর্ণোজ্জ্বল ইন্দ্র-ধনুর আলোকের মত। কল্পনার এই বিকম্পিত চিত্রিত আলোকে একটি চিত্র যেন অসংখ্য চিত্রে ভাঙ্গিয়া পড়ে, কল্পনার এই প্রভা-বেষ্টনের মধ্যে একটি ভাব যেন অন্য ভাবপুঞ্জকে সদল-বলে ডাকিয়া আনে—একটি ভাব যেন অসংখ্য ভাবরশ্মি বিকীরণ করে! এখন তুলনাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, বাস্তব-পন্থীদের দৃষ্টি সবল ও সুস্পষ্ট, স্বভাব শান্ত ও সংযত এবং ভাষা ও রচনা নিয়ন্ত্রিত ও অনলঙ্কৃত। কিন্তু কল্প-পন্থীদের দৃষ্টি তীব্র, বক্র ও তন্দ্রাচ্ছন্ন, প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল ও উচ্ছ্বসিত, কল্পনায় উদ্ভ্রান্ত, এবং ভাবে বিভ্রান্ত, আর তাঁহাদের ভাষা আভাস-ইঙ্গিতের ভাষা এবং বাণীও অসম্বদ্ধ। এক কথায় বাস্তব-

চৈতন্যের বাল্যলীলা
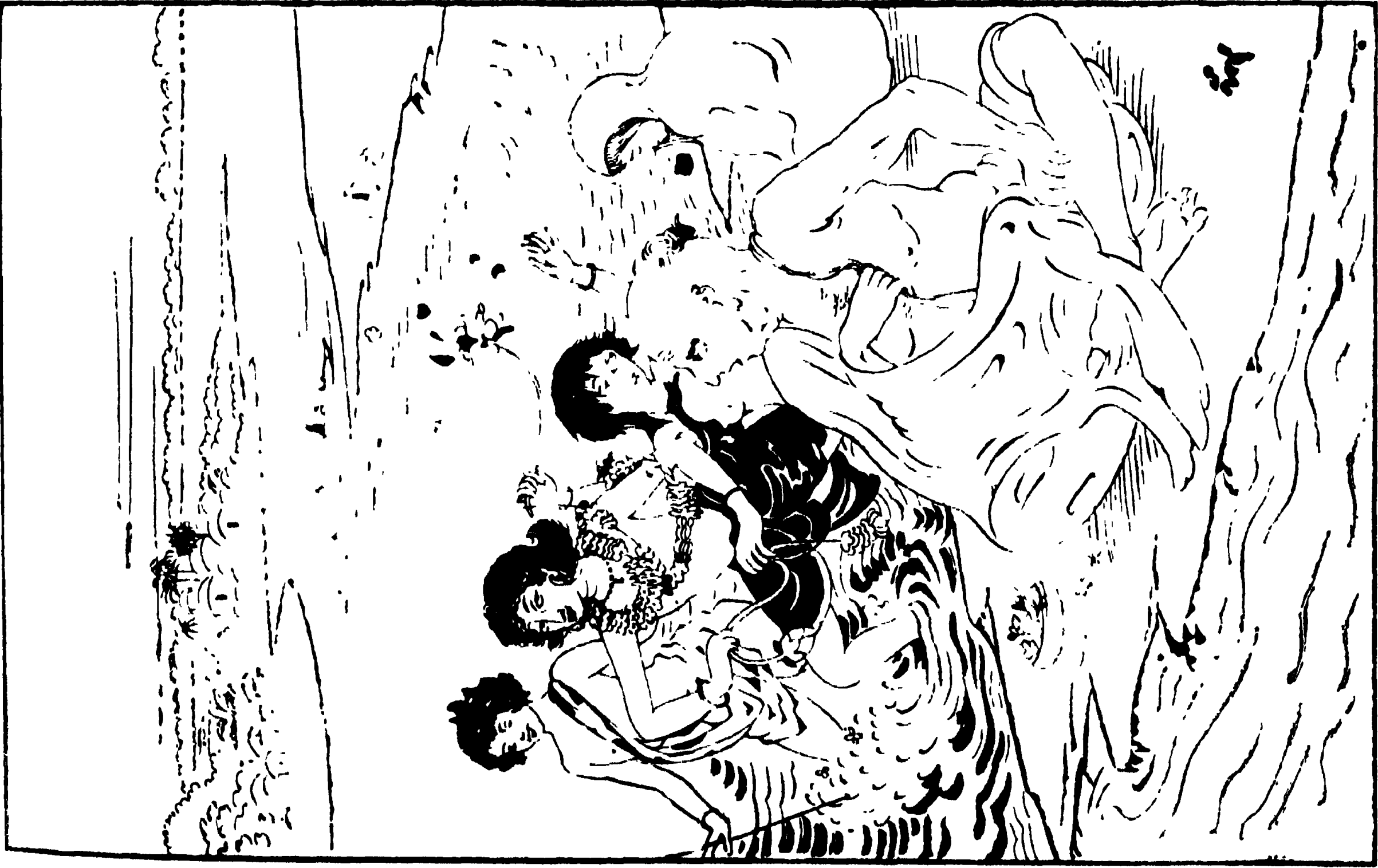
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত।
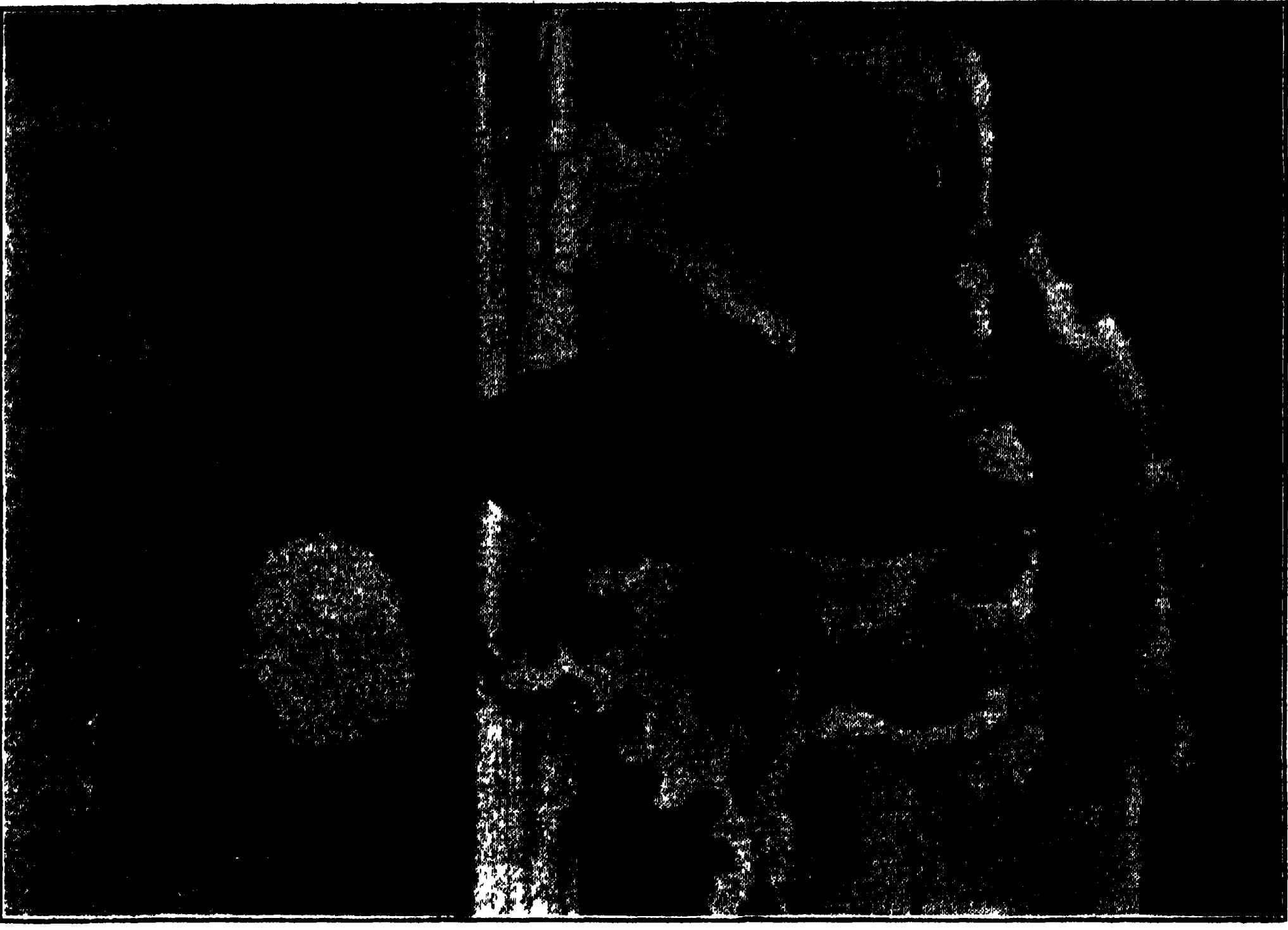
চৈতন্যের শেষলীলা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত।

পন্থীরা এই বাস্তব-জগতের, আর কল্প-পন্থীরা যেন মানস-লোকের।

কল্প-পন্থা মানুষকে দেখে কল্পনা দিয়া, লৌকিক স্থূল-দৃষ্টি দিয়া নহে! এই কল্পনা জীবনের কঠোর গুরুভার হাল্কা করিয়া দেয়, তার দুর্গম পথ সহজ ও সুগম করিয়া তোলে, মানুষকে অভ্যাসের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া ফেলে এবং নির্ম্মম বাস্তব জগত হইতে দূরে সরাইয়া আনে। কিন্তু কল্পনা যেমন একদিকে বিষম অতি-ভীষণ নীরস সত্যের পাদ-দেশ হইতে তফাৎ করিয়া দেয়, ঠিক তেমনি অন্যদিকে সুন্দর ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল সত্যের বেদীতেও প্রতিষ্ঠিত করে। ফলতঃ, সত্যের সুরম্য সপ্রেম মূর্ত্তি কল্পনারই সম্ভোগ্য, বুদ্ধির বা বাস্তব-প্রিয়তার নহে।

বাস্তব-তন্ত্রতা ও কল্প-তন্ত্রতা দুইটি শিল্প মাত্র। এই দুইটি শিল্পের মধ্যে যে বিরোধ, তাহা কেবল মানুষের দুইটি ইচ্ছা বা চেষ্টার মধ্যে বিরোধ। একটি শুধু বিধি-ব্যবস্থা নিয়ম-শাসনকে অনুসরণ করিবার ইচ্ছা, আর অন্যটি এই সব ব্যতিক্রম করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা। কিন্তু একদিকে যেমন এই দুইটি প্রয়াসের মধ্যে ব্যবধান বা সংঘর্ষ রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও রহিয়াছে। কল্পনা বাস্তবের উপর না দাঁড়াইলে কিম্বা সত্যের দ্বারা শাসিত না হইলে আপনাকে হারাইয়া ফেলে; এমন কি, আপনার মনোমত এমন কৃত্রিম চিত্র অঙ্কিত করিয়া বসে, যে সে চিত্র প্রকৃতির প্রকৃত চিত্রের কখনই অনুরূপ হইতে পারে না। এই উদ্দাম কল্পনাই কণ্টকাকীর্ণ কুসুমকে নিষ্কণ্টক মনে করে, শশিহীন নিশায় জ্যোৎস্নার নৃত্য দেখে। অর্থাৎ ইহা রূপের অজস্রতায় মুগ্ধ হইয়া সত্যকে বিদায় দিয়া আপনার আনন্দের বশে আপনি বিব্রত হইয়া পড়ে, এবং সেইসঙ্গে প্রকৃতির রূপ-কুঞ্জে বিভ্রাট ঘটায়। আবার, বাস্তব-তন্ত্রতা যদি কল্পনার দিকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুধুই বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া আপনাতেই আবদ্ধ ও মগ্ন থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সঙ্কীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। তা' ছাড়া ইহা যদি শুধুই বাস্তব-জীবন সোজাসুজি ভাবে দেখিয়াই ক্ষান্ত হয়. এবং তার বেশী আর অগ্রসর হইতে সাহস না করে,তাহা হইলে ইহা বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করিয়া বসে। কারণ, ইহা তখন ঠিক বিজ্ঞানের মতই বাস্তবের অন্তরে প্রবেশ না করিয়া তার বাহিরেই থাকিয়া যায়।

কিন্তু শিল্প যখন বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও পথ গ্রহণ করে, তখন তার অপমৃত্যু ঘটে। কারণ শিল্পের সত্য ও বিজ্ঞানের সত্য এক জিনিস নহে। শিল্প-গত সত্য সম্ভাব্য সত্য, আর বৈজ্ঞানিক সত্য সংঘটিত সত্য। একটি অনুভূতি-সাপেক্ষ, অপরটি বুদ্ধি-সাপেক্ষ; একটি হৃদয়ের উপজীব্য, অন্যটি মস্তিষ্কের উপভোগ্য। বিজ্ঞান দৈনন্দিন বাস্তব ঘটনাপুঞ্জকে নাড়িয়া-চাড়িয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিয়াই পরিতৃপ্ত; সুতরাং ইহার সত্য কেবল বাস্তবের সহিত মিল বা সামঞ্জস্য মাত্র। কিন্তু শিল্প-গত সত্য বাস্তবের সহিত যোগাযোগ নহে; বরং বাস্তব আমাদের মনে যে ভাব বা অনুভূতি জাগাইয়া তোলে, তার সহিত যোগাযোগ বা মিল মাত্র। অর্থাৎ বাস্তব-জীবনের মধ্যে কল্পনার দ্বারা প্রবেশ করিলে যে হর্ষ বা বিষাদ, আশা বা ভয়, বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সজাগ হইয়া ওঠে, তাহাই উপলব্ধি করা শিল্পের সত্য ও প্রাণ। সুতরাং বাস্তবের অন্তর এবং তার সৌন্দর্য্য, রহস্য ও অর্থ যথার্থরূপে ব্যক্ত করাই শিল্প-সত্যের প্রথম পরীক্ষা। মানব-জীবনের প্রধান প্রধান শক্তি-গুলি—অর্থাৎ প্রেরণা, প্রবৃত্তি ও আদর্শ, যাহা নর-নারী সকলের চরিত্রের অন্তরালে ক্রিয়া করে, তাহা বহন করাতেই শিল্পের কৃতার্থতা। এই প্রভাব বা সত্যগুলি যুগ-যুগান্তরের উত্থান-পতনের মধ্যেও অপরি-বর্ত্তনীয় ও অটুট থাকে, তাই শিল্পও চির-নব ও অমর। প্রকৃতি ও মানবের অন্তরের সন্ধান করিতে পারে বলিয়াই শিল্প এত গভীর। বিজ্ঞান যেমন বাস্তবের বাহিরের আলোকে প্রতিফলিত, শিল্পও তেমনি তার অন্তরের সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, বিভিন্ন রসের আবেশে সুরলয়িত।

বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী উভয়েরই চক্ষে প্রকৃতি ও মানবের জীবন লইয়াই বাস্তব-জীবন। কল্পনা এই বাস্তব-জীবনের বাহির ও অন্তর দেখিয়া লইতে পারে, ইহার উদার রঙীন্ দৃষ্টিতে বাহির ও অন্তর, বাস্তব ও কল্পিত এবং নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যায়, এক অভিনব বিশ্ব রচিত হয়, যে বিশ্বে নৈসর্গিক অনৈসর্গিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কল্পিতকে বাস্তব বলিয়া ভ্রম হয়,

বাহির ও অন্তরের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না,—তাই কল্পনা-প্রবণ হৃদয় বেশ অনুভব করিতে পারে যে, কত স্থানে কত ভাবে ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়, গোচর ও অগোচর, বাস্তব ও বিস্ময়, দৃশ্য ও অদৃশ্য এক হইয়া নবরূপে নব-শক্তিতে মানুষকে আহ্বান করে, মানুষের অন্তরের ভিতর অন্তরকে আন্দোলিত করে। এক দিকে নদ-নদীর ঐশ্বর্য্য, বন-পর্ব্বতের মহিমা, ঘনান্ধকারের গাম্ভীর্য্য, ও জ্যোৎস্নার প্রফুল্ল দীপ্তি, আবার অন্যদিকে শিশুর সৌকুমার্য্য ও মাধুর্য্য, ক্ষুদ্রের সম্মান, মানবের মর্য্যাদা, প্রাচীনের ক্ষীণালোক ও বর্ত্তমানের নব-উজ্জ্বল প্রভা—এই সব আনন্দের উৎসগুলি ভাব-ময় হৃদয়ের উপর অবিশ্রান্ত অফুরন্ত ভাবে বহিয়া চলিয়া যায়। আবার এই সব লইয়া তার অন্তরে যে স্বর্গের সৃষ্টি হয়, সে স্বর্গ শুধুই চির-সুখময় চিরালোকে বিম্বিত বিমল স্বর্গ নহে, অনন্ত প্রেম ও অমৃতে প্লাবিত অলীক কল্পনার দ্বারা আবিষ্কৃত ও বিভাষিত—অতএব মানুষের হাতে-গড়া সুখ-দুঃখের স্বর্গ, সেই স্বর্গে পৌছিতে হইলে, বাস্তবকে বর্জ্জন করিলে চলিবে না; বরং বাস্তব-জীবনের অতি সত্য কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া তার অন্তর্দেশে প্রবেশ করিতে হইবে। বাহিরের শিশু দেখিয়া তার অন্তরে সঞ্চিত মাধুর্য্যের সন্ধান লইতে হইবে—শিশুর হাসি দেখিয়া তার উৎস কোথায় তাহা খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। অর্থাৎ বাস্তবের ভিতর কল্পনার সাহায্যে প্রবেশ করিয়া, সেই কঠিন নীরস বাস্তবের বা সত্যের সৌন্দর্য্য মূর্ত্তি উপলব্ধি করিতে হইবে।

এখন বেশ বুঝা যাইতে পারে যে, মানুষ অত্যধিক বাস্তব-প্রিয়তার ফলে অতিশয় নিয়ম-পর হইয়া পড়ে, কিন্তু যে যতই মোহিনী কল্পনার অনুরাগী হয়, ততই সে চিরাগত নিয়ম-অভ্যাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এবং সমাজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে চায়না; কল্পনায় প্রলুব্ধ ও উচ্ছ্বসিত হইয়া নিয়ম-পুঞ্জের আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সুখী হয়। সেই মানুষ তখন সমাজের মানুষ নহে, প্রকৃতির প্রিয় সন্তান—যেন "স্বভাবের শিশু স্বভাবে পালিত!" সেই সরল সহজ মানুষ শুধু নিয়ম-শাসনের ক্রীড়নক বা কল মাত্র নহে; তার অনেক ঊর্দ্ধে। সুতরাং কল্প-প্রিয়তা মানুষকে সহজ স্বাভাবিক মানবতার দিকে লইয়া যায়, কল্পনার আবেশে সে স্বপ্ন দেখে, বাস্তব-প্রিয়তার বশে সে কর্ম্ম করে। এই স্বপ্নের ঘোরে সে কঠোর কর্ম্ম-জীবনের অতি-সত্য-গুলিকে বিস্মৃত হইয়া স্নেহ ও প্রেমের আদর্শ-সমূহকে ধরিতে পারে। ইহার ফলে, সে নিজেকে ছাড়িয়া নিজেকে ভুলিয়া অন্যকে আপনার স্থানে বসাইতে শিখে, অন্যের দুঃখ-দৈন্য নিজের সুখের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে পারে, কল্পনার শীত-স্পর্শ তার হৃদয়ে যে কম্পন তোলে, সে কম্পন জ্ঞানী কিম্বা স্বার্থময় সাংসারিকের হৃদয়ে ওঠে না, কেবল তরুণ যুবকের সরস-মধুর হৃদয়েই উঠিয়া থাকে; অতএব জ্ঞান-বৃদ্ধ কল্পনাকে হারাইয়া পরের দুঃখে অশ্রুপাত করায় যে সুখ, সে সুখে বঞ্চিত হয়। সরল শিশু যে সুখ পায়, জ্ঞানী সরল-শিশু না হইলে, সে সুখ পায় না। সুতরাং কল্প-পন্থীরা কল্পনা-বীণার সাহায্যে অজ্ঞ আর্ত্ত হৃদয়ের গান গাহিয়া সুখী হয়, এবং দুঃখীর বেদন-রোদন সুরের ভিতর আনিয়া সঙ্গীত-বাণীতে পরিণত করিয়া সকল হৃদয়কে নিবিড়-গভীর ভাবে স্পর্শ করে। তার কল্পনাময় হৃদয়ে যেমন মধুর বেদনা, চক্ষে যেমন অশ্রু, মনে তেমনি বিস্ময় ও প্রণয়। তার কাছে দুঃখ-দীর্ণ মানব-জীবন যেমন স্নেহের বস্তু, চির-পরিচিতা প্রাচীনা প্রকৃতিও তার ঠিক তেমনি স্নেহের বস্তু। প্রকৃতির সরসী-বক্ষে আন্দোলিত সলিল ও সরোজ, অফুরন্ত জ্যোৎস্না-প্রবাহ, তার সান্ধ্য ও নিশান্ত সমীর, তার ধূম্রগিরি-শ্রেণী ও বাষ্প যবনিকা, বালারুণ রক্ত-রাগ, রক্ত-রশ্মি-সিক্ত সুবর্ণ গোধূলি, প্রভাত-প্রসন্ন হাস্য ও ব্রততী-বিতান সকলই যেন নূতন ও অপূর্ব্ব হইয়া দাঁড়ায়। সকলেরই মুখে যেন প্রেম-বার্ত্তা—প্রেম সম্ভাষণ। এখন সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বাস্তব জীবন ও প্রকৃতি সাহিত্যের ভিত্তি-ভূমি হইলেও সাহিত্যের রম্য ভবন সৃষ্টি করিতে কল্পনাই একমাত্র সহায়। এই কল্পনার প্রভাবে সকল দেশের সকল সাহিত্যের মানুষ দিব্য চেতন লাভ করিয়া, নির্ম্মম আচার-অনাচারের শাসন-দুর্গ অতিক্রম করিতে, প্রকৃতি ও মানব-হৃদয়ের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে দেখিতে পরিশ্রান্ত দীন-দরিদ্রকে সম্মান করিতে শিখিয়াছে। এক কথায়, সেই সাহিত্য জীবিত, যার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কল্পনায়; সেই শিল্পী অমর,

যার অভিজ্ঞতা কল্পনায় দীপ্ত এবং যুবক ও বৃদ্ধ সকলকেই তৃপ্ত করিতে সমর্থ।

কল্পনা ও রুচি-ভেদে প্রকৃতি বিভিন্নভাবে বর্ণিত ও রূপান্তরিত হয়। দর্শকের ভাবুকতা ও অনুভাবকতা যেমন বিচিত্র, প্রকৃতির রূপ ও লীলা-ভঙ্গী তেমনি বিচিত্র। সুতরাং প্রকৃতি কখনও সরল-করুণ কল্যাণ-ছবি, আবার কখনও বা কঠিন-রুদ্র-মূর্ত্তিময়ী; কখনও পূর্ণ-স্থির সৌন্দর্য্যভারে অবনমিতা, আবার কখনও মলিন-ধূসর-বসনা বিষণ্ণ-মুখী কুরূপা! কখনও রূপ-মদ-মোদিতা উচ্ছৃঙ্খলা আবার কখনও লজ্জাকুণ্ঠিতা শাসন-সুবিহিতা। একদিকে বাস্তব-পন্থী প্রকৃতির নগ্ন-স্পষ্ট শোভা-সম্ভার সম্ভোগ করিয়া সরল শিশুর ন্যায় সহজেই পরিতৃপ্ত, অন্যদিকে কল্প-পন্থা এই বাহ্য প্রকৃতির অন্তরে পৌঁছিয়া তার অন্তরাত্মার গোপন সত্য ও রহস্যের অনুসন্ধান করিয়া আনন্দে পরিপ্লুত ও আত্ম-বিস্মৃত। এই কল্পনা-প্রবণ কবি যখন অতি-সামান্য নম্রমুখী পুষ্পিকার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অশ্রুপাত করিতে থাকে, তখন সেই অশ্রুর উৎস চক্ষে নহে, হৃদয়ে। এই অশ্রু প্রণয়-তৃষ্ণার্ত্ত স্নেহ-সিক্ত হৃদয়ের অশ্রু—হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন-লাভের অশ্রু হৃদয়ের সন্ধান পায়; পায় বলিয়াই এত বেদনা-বিধুর হইয়া ওঠে, তাই কবি তার হৃদয়ের প্রতিদান-স্বরূপ পুষ্পিকার হৃদয় পাইয়া এত উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। তাই যাহা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, তাহাও তার কাছে আলোক—আলোকে মণ্ডিত হইয়া ধরা দেয়। ক্ষুদ্র পুষ্পের নিভৃত আবাসে, ক্ষুদ্র বস্তুর নীরবতায় ও নিরাশ্রয়তায় তার হৃদয় যত উন্মুক্ত ও অনুরক্ত হয়, অত্যুজ্জ্বল প্রভাময় বাহ্য-শোভায় তত হয় না। প্রখর প্রদীপ্ত আলোক-মণ্ডলে তার কল্পনা আদৌ ক্রিয়া করে না, বরং বাধা পায়। সূর্য্যাস্তের আরক্তিম বর্ণ তার হৃদয়কে তত স্পর্শ করে না, যত প্রসন্ন আকাশের ঘন সুনীলতা, অনন্ত বিলীনতা ও অবিশ্রাম নীরবতা স্পর্শ করিতে পারে, তার কাছে এই শূন্য নীলাম্বর নিরালম্ব নিরালম্ব আনন্দ-ধ্বনিতে পূর্য্যমান্। তার সৃষ্টি এক অপূর্ব্ব নব-সৃষ্টি—যেন স্বর-সমন্বয়ের সৃষ্টি, যাহাতে শুধুই পিকের সরল-আকুল সম্ভাষণের মাধুর্য্য নাই, কঠোর কল্লোলের অন্তরে যে সুললিত সঙ্গীত আছে, তাহাও রহিয়াছে। অতএব কবির দৃষ্টি ও সৃষ্টির মূলে তার প্রাণ ভাব ও অনুভূতি অনেকখানি কার্য্য করে।

এইরূপে প্রকৃতির সঙ্গে যার হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে, তার কাছে প্রকৃতি অসীম শক্তি ও কল্যাণের আবাস-স্থল—প্রকৃতি তার শিক্ষয়িত্রী ও ধাত্রী। সে অতি সহজেই বিমল আনন্দ ও জ্ঞানের গোপন পথ দেখিতে পায়, তখন তার দৃষ্টি দিব্য-দৃষ্টি, তার দর্শন মানস-দর্শন। বিশ্ব তার কাছে এক অভিনব আলোকের আচ্ছাদন। তখন সকল নিগূঢ় রহস্য তার কাছে উদ্ভিন্ন, অজ্ঞাত সত্যও তার কাছে পরিব্যক্ত। সে যে আলোকের সন্ধান পায়, সে আলো কেহ কোথাও চক্ষে দেখে নাই;—সেই আলো কবির স্বপ্নময় অলৌকিক রাজ্যের আলোক—যে আলোকে সত্য ও পবিত্রতা আছে, সে আলোকে কবির প্রাণের প্রতিষ্ঠা এবং উচ্ছ্বাস ও উৎসর্গ আছে।

মোট কথা, সাহিত্য এক বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থ জটিল জীবন-গ্রন্থির দর্পণ, আসল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিদর্শন। ইহা মানব-হৃদয়ের গভীর সত্য সরল বাণী, কৃত্রিম শূন্যগর্ভ প্রতিধ্বনি নহে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাহিত্য মানব জীবনের বিভিন্ন ভাব ও অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার যে সাহিত্য জীবন্ত শিল্প, তাহা শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জীবন লাভ করিয়া থাকে। বাস্তব সাহিত্য জীবন-ব্যাপারকে সমগ্র-ভাবে না দেখিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চায়; কল্পনা অপেক্ষা বুদ্ধিতেই বেশী জোর দিয়া বসে, মানব-জীবনের গভীর অর্থ অপেক্ষা বাহিরের আকার-প্রকারের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখে। ইহা বিধি বা নিয়ম ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না, কিংবা নূতন ভাব বা আদর্শ জাগাইয়া তুলিতে পারে না,—ফলে, কল্পনায় যে সজীবতা ও স্বাতন্ত্র্যের ভাব আনে, তাহা হারাইয়া বসে। বাস্তব-সাহিত্য এই কল্পনাকে হারাইয়া তার যে প্রধান দান, উচ্ছ্বাস—আগ্রহ এবং উচ্চভাব ও সূক্ষ্ম অনুভব সে সব হইতে বঞ্চিত হয়। মোটের উপর বাস্তব সাহিত্য জীবন-ব্যাপারের আলোচনা বা পাঠ হিসাবে আমাদের কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু কল্পনার ক্রিয়ার অভাবে আমা-

দিগকে অনুপ্রাণিত ও উন্নীত করিতে পারে না। আবার অনেক সময় দেখা যায়, বাস্তব-সাহিত্যিকেরা মানব-সমাজের নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া অতি ঘৃণ্য ও কুৎসিত আদর্শ আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছে। তার পর, জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, সাহিত্য যখনি অত্যন্ত বুদ্ধিগত ও বাস্তব-প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনি কল্প-প্রিয়তার ধারা কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। তখন সাহিত্য আর বাস্তব-সমাজ ও জীবনের অনুবাদ মাত্র নহে, বরং প্রতিবাদ হইয়া দাঁড়ায়। তখন সাহিত্য সাময়িক সামাজিক আচার-অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সামাজিকতার হাত হইতে মুক্তি লাভের প্রয়াস পায়। এই যে সাহিত্য বা সাহিত্যের ধারা, যাহা স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা মাত্র, তাহা কল্প-সাহিত্য বা কল্প-পন্থা নামে অভিহিত। ইহার উপকরণ সহজ মানুষ ও প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত হয়। অকৃত্রিমতা বা স্বাভাবিকতা ইহার বিশেষত্ব; কল্পনা ইহার প্রধান সহায়। বাস্তব-সাহিত্যের লক্ষ্য বস্তু যেমন বাস্তব জীবন বা কর্ম্ম, এই কল্প-সাহিত্যের লক্ষ্য বস্তু তেমনি আদর্শ জীবন বা স্বপ্ন, যে স্বপ্নে জীবনের অতি-কঠোর অতি-ভীষণ দিক্ বা সত্যগুলি বিস্মৃত হওয়া যায়, প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান দূরে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎও আশায় রঞ্জিত হইয়া ওঠে এবং যৌবনের উচ্চভাব ও আদর্শ-সমূহ চিরন্তন সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতএব উচ্চ আশা, আদর্শ প্রভৃতি যৌবনের স্বপ্নগুলি একেবারে অমূলক নহে, কিম্বা শুধুই মনোরম নহে, বরং বর্ত্তমান বাস্তব জীবন অপেক্ষাও সত্য। ইহারাই মানবের চিরস্থায়ী সম্পত্তি, যাহা তার কীর্ত্তিস্তম্ভ-সমূহ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও অটুট অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং কল্প-সাহিত্যের মূল,—ব্যক্তির স্বাধীন অভিব্যক্তি ও ব্যক্তিগত প্রতিভার শক্তিতে নিহিত, সমষ্টির বা সমাজের অন্ধ অনুকৃতিতে নহে। প্রকৃত পক্ষে, বাস্তব-প্রিয়তা ও কল্পপ্রিয়তা উভয়েরই মূল মানবের হৃদয়ে। উভয়ই হৃদ্গত সহজ বৃত্তি হইতে প্রসূত। এই উভয় শিল্পই মানব জীবন হইতে উদ্ভূত হয় এবং তারই দ্বারা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় এবং শেষে তারই উপর ক্রিয়া করে। বাস্তব-পন্থার উৎস হৃদয়ের আনন্দে, যে আনন্দ অতি-নিকট, অতি-পরিচিত ও অতি-সত্যকে যথাযথ-ভাবে ব্যক্ত করিয়া জন্মায়। কল্প-পন্থার উৎস হৃদয়ের আনন্দে, যে আনন্দ অতি-দূর, অ-পরিচিত ও অনির্দ্দেশ্যকে লাভ করিয়া জন্মায়। সত্যকে নগ্ন ও স্পষ্ট-ভাবে দেখিবার পিপাসায় বাস্তব-তন্ত্রতার উদ্ভব; এবং সত্যকে সুন্দর ও রঞ্জিত করিবার ইচ্ছায় কল্প-তন্ত্রতার উদ্ভব। উভয়ের ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত হইলেও সীমাও যথেষ্ট আছে। বাস্তব-তন্ত্রতায় যে শিল্প, তার সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে হইবে ভাবের বা কল্পনার রং দিয়া,—আর কল্পতন্ত্রতায় যে শিল্প, তার সংযম রক্ষা করিতে হইবে, সত্যের বাঁধন দিয়া।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার বিদ্যারত্ন।

পল্লীগ্রামে বারোয়ারি

(চিত্র)

১

মিত্রপাড়া গ্রামখানি ছোট হইলেও বড়ই মনোরম। গ্রামে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই, তথাপি মনোরম, কারণ গ্রামে প্রায় ২০০।২৫০ ঘর লোকের বাস, অথচ কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। কেহ "দাদা", কেহ "খুড়া", কেহ "মামা" এইরূপ সম্পর্কে সকলেই সকলের আত্মীয়। পরের বাড়ীকেও লোকে নিজের বাড়ীর মত ভাবে; সকলেই সকলের বাড়ী অবাধে যাতায়াত করে, কেহ কাহাকেও অবিশ্বাস করে না। গ্রামের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তি রামধন মিত্র; ইহার বাড়ী গ্রামের পশ্চিম পাড়ায়। ইনি অতি সদাশয় নম্র ভদ্র লোক, সকলকেই স্নেহ করেন, বড় বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই। তাঁহার

একটিমাত্র পুত্র, নাম লক্ষ্মীকান্ত মিত্র। ইনি পিতার আদর্শেই গঠিত। ইনি গ্রামের যুবক-সম্প্রদায়ের নেতা; ইঁহার একটি ছোট-খাট রকমের সখের যাত্রার দল আছে। মধ্যে মধ্যে আমোদ-উৎসব অভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামের স্ত্রীলোকগণও পুরুষের মত সদানন্দ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-রহিত, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। মোটের উপর গ্রামখানি শান্তিময় আনন্দ-নিকেতন। কিন্তু ঈশ্বরের চক্ষে ইহা কেমন অসহ্য বোধ হইল, তাই যেন তিনি এই শান্তিনীড় নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিলেন। গ্রামে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অজন্মা হইল, তাহাতে চাষা গরীব লোকদের বড়ই বিপদ বাধিল।

অবস্থাপন্ন লোকেরা অল্প মূল্যে কিছু জমি-জায়গা সংগ্রহ করিয়া লইলেন। রামধন মিত্রের তেজারতি কারবার ছিল, তিনি যথাসম্ভব সামঞ্জস্য করিয়া লোকের দেনা শোধ করিতে লাগিলেন—দয়া করিয়া অনেকেরই কিছু সুদ ছাড়িয়া দিলেন; কাহারও সহিত কিস্তীবন্দী করিলেন। দুই বৎসর অজন্মার ফলে লোক বিপন্ন হইল সত্য, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইল না; তাহার পর ফাল্গুন মাস পড়িতে না পড়িতেই গ্রামে ভীষণ মূর্ত্তিতে কলেরা দেখা দিল। সে কি ভীষণ কাণ্ড! চারিদিকে কেবল রোগীর কাতর উক্তি, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, মৃত্যুর হুঙ্কার।

যাহারা মরিল তাহারা নিশ্চিন্ত হইল। যাহারা রহিল তাহারা ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া রহিল। অনেকেই গরু-বাছুর ছাড়িয়া দিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তেমন শান্তিময় গ্রামখানি যেন শ্মশানে পরিণত হইল। এই গ্রামখানিতে পূর্ব্বে প্রত্যহ রাত্রি বারোটা-একটা পর্য্যন্ত লোকের বৈঠকখানায় গান-বাজনা যাত্রার আখড়া, তাশ-পাসা-দাবা ইত্যাদিতে কতই আমোদ-প্রমোদ হইত; কিন্তু এখন সন্ধ্যার পর আর কাহারও সাড়া-শব্দ নাই, একলা রাস্তায় বাহির হইতে ভয় হয়, যেন কি-এক বিভীষিকা সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যাহারা গ্রামে রহিল তাহারা মরণ নিশ্চয় করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। এইভাবে ফাল্গুন মাস কাটিয়া গেল—চৈত্র মাসে দুই-এক দিন বৃষ্টি হওয়ায় রৌদ্রের প্রকোপ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইল, রোগের প্রকোপ অনেক কম পড়িল। কিন্তু লোকের শোকবহ্নি দ্বিগুণ ভাবে জ্বলিতে লাগিল; সংসারের মধ্যে যে লোকগুলি সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী সেগুলি প্রায় সবই মারা পড়িয়াছে, বিধবা স্ত্রীলোক খুব কমই মারা গিয়াছে। কোন সংসারের একমাত্র ভরসা পুরুষ, তিন-চারিটি পোষ্যকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া মারা পড়িয়াছে। তেমন সাজানো নন্দন বাগানখানি একমাসের মধ্যেই ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল।

২

যাহারা রোগের সময় স্থানান্তরে গিয়াছিল, তাহারা আবার ক্রমে সকলেই গ্রামে ফিরিয়া আসিল। প্রায় একশত জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে, গ্রাম বড়ই ফাঁকা ফাঁকা, অনেক ঘরই লোকশূন্য। পূর্ব্বে চালে চালে বসতি ছিল, এখন অনেক পোড়ো বাড়ী হইয়া গিয়াছে। আর কাহারও মনে সে আনন্দোচ্ছ্বাস নাই; পূর্ব্বেকার মত হাসি-ভরা মুখ আর কাহারও নাই; যাত্রার দলটিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—কারণ অভিনেতারা অনেকেই লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। যাই হোক, জীবন্ত মানুষ কখনও মরা মানুষের স্মৃতি বুকে ধরিয়া চিরকাল কাটাইতে পারে না। সংহার-কর্ত্তার ভুক্তাবশিষ্ট যাহারা প্রাণে রহিল, তাহারা আবার নিজ নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। লক্ষ্মীকান্ত বাবুর একটি বন্ধু ছিলেন; তাঁহার নাম সদানন্দ মুখোপাধ্যায়, ইনি কলেরায় মারা গিয়াছেন, সংসারে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন আর কেহ নাই. বৃদ্ধা মাতা এখনও মৃত পুত্রের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ নিষ্ফল চীৎকার করিয়া থাকেন। কিন্তু শোক কখনও চিরস্থায়ী হয় না, তাঁহার শোকও কমিয়া আসিল। এখন তাঁহার চিন্তা হইল, তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটিবে কেমন করিয়া? কে তাঁহার খরচ-পত্র নির্ব্বাহ করিবে? হায় সংসার! একমাত্র জীবনের অবলম্বন উপযুক্ত পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়াও বৃদ্ধা মাতাকে আবার সংসারের চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতে হইল! তিনি অনন্যোপায় হইয়া লক্ষ্মীকান্ত বাবুর নিকটে সব অবস্থা জানাইলেন। লক্ষ্মীকান্ত বাবুও শোকে বড়ই কাহিল হইয়া পড়িয়াছিলেন—সদানন্দের মাতার সাহায্য করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি সুস্থতা অনুভব করিলেন। বৃদ্ধা লক্ষ্মীকান্তকে সাশ্রুনয়নে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

মৃতপ্রায় গ্রামখানি বর্ষার নব ধারায় আবার সজীব হইয়া উঠিল। চাষীরা চাষ আরম্ভ করিল। কিন্তু গ্রামের যে ক্ষতি হইল,—তাহা আর কিছুতেই শোধ হইবার নয়। এবং কে বলিতে পারে, এই সঙ্গে গ্রামের চির- মঙ্গলময়ী শান্তি দেবীও যে প্রস্থান করিলেন না!

৩

মিত্রপাড়া গ্রামে প্রত্যেক বৎসর চৈত্র মাসের শেষদিন দেবীর পূজা হইয়া থাকে, তদুপলক্ষে সম্ভব-মত ধুম-ধামও হয়। পূর্ব্বে যখন গ্রামে লোকসংখ্যা অধিক ছিল, তখন আমোদ-প্রমোদ কিছু অধিক পরিমাণে হইত, তিন চার দিন ধরিয়া অবিশ্রান্তভাবে যাত্রা, গান, ঢপ ক্রমান্বয়ে হইতে থাকিত। গত বৎসর হইতে লোক-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ার পর আর তত টাকা ওঠে না, সেই কারণে যাত্রা ও বারুদের আমোদ কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। এ-বৎসর কি হইবে এই লইয়া একটা আলোচনা চলিতেছে। বৃদ্ধ-সম্প্রদায় অনেক সিদ্ধান্তের পর স্থির করিলেন,—গ্রামের বারোয়ারি উঠিয়া যাওয়াই গ্রামের অমঙ্গলের হেতু! আর তত বারুদ পোড়ে না, মথুর-সাহা প্রভৃতি ভাল ভাল দলের যাত্রা হয় না, এই কারণেই দেবতার কোপ হইয়াছে। ইহাতে লক্ষ্মীকান্ত বাবু ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী আরও দুই-একটি যুবক এই মতের ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা বলিলেন,—আমাদের গ্রামের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাতে এখন আমাদের আমোদ-প্রমোদ করিয়া টাকা খরচ করিবার সময় নয়! বরং কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইঁদারা কাটানো, রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্য করা হোক্। বৃদ্ধেরা এ-যুক্তি একেবারে নাকচ করিয়া দিলেন; তাঁহারা বলিলেন, "তোমরা আজ-কালকার ছোকরা, কোন দেবতা-টেব্‌তা মান না! কিসে কি হয় জান কি? গ্রাম্য দেবীর পূজা উপলক্ষে বারোয়ারি হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে অমন করে বলতে নেই, কিসে কি মঙ্গলামঙ্গল ঘটে,বলা যায় কি? – আর দেখ, যার যেদিন মৃত্যু আছে, সে সেদিন মরবেই, তা সে ইঁদারাই কাটাও, আর কলই বসাও! বরাত কখনও উল্টে দেওয়া যায় না। আর এক কথা, আমরা চিরদিন বারোয়ারি করে এসেচি। আমরা যত দিন বাঁচি আমাদের বরাত দাও। ঐ বারোয়ারির সময় ক-বৎসর বারোয়ারির অধ্যক্ষতা না করতে পেয়ে আমরা যে-কষ্টে দিন কাটিয়েছি, তা তোমরা কি বুঝবে? বুঝবে ঐ পরাণ মণ্ডল, যে নিজে বারোয়ারির অধ্যক্ষতা করেছে।"

পশ্চিম পাড়ার নেতা জীবন সামন্ত বলিয়া উঠিল—"ওহে তোমরা যদি নিজেদের ছেলে-পুলে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-করণা করতে চাও, তবে গ্রাম্য দেবীর বিরুদ্ধে কোন কথা কয়ো না, সেটা মঙ্গলজনক হবে না। আমি আজ পচিশ বৎসর নিজের হাতে বারোয়ারির পাণ্ডাগিরী করে এসেছি, সেই বারোয়ারি উঠে যাওয়া কি মর্ম্মান্তিক, তা আমি বুঝব, তোমরা তার কি বুঝবে?" মোট কথা, বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের মতই বাহাল রহিল, বারোয়ারি হওয়াই স্থির হইল। চাঁদাব ফর্দ্দ হইল। একদল বলিল, যাত্রা দুই রাত্রি হইবে,—আর একদল বলিল, ঢপ্ দুই রাত্রি হইবে; তাহাতে সর্ব্বসমেত তিনশত টাকা ব্যয় হইবে। তদনুসারে চাঁদা চারান হইল, প্রত্যেকের যথাসম্ভব বেশী বেশী ফেলিয়াও এক শত টাকার অভাব রহিল। তখন এ টাকা কোথা হইতে উঠিবে—তাহার মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। অবশেষে জীবন সামন্ত প্রভৃতি পাণ্ডারা কি একটা মতলব করিয়া সেদিনকার মত গৃহে প্রস্থান করিল।

৪

যাত্রা ও ঢপে খুব ধুম-ধামের উপর চারি রাত্রি কাটিয়া গেল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি শো টাকা গ্রাম হইতে বিনা-আপত্তিতে প্রস্থান করিল। আজ সকলের মুখেই অভিনীত বিষয়ের আলোচনা হইতেছে—"বিদুষক কি ভাবে আসরের মাঝে কদলী ভক্ষণ করিল, ক্ষেপাটী কেমন সুন্দর গান করিল"—এই সব সমালোচনা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বেই সকলে গরু বেচিয়া, ধান বেচিয়া, কেহ গহনা বাঁধা দিয়া বারোয়ারির চাঁদা মিটাইয়া দিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব পাড়ার পরেশ সাঁই লোকটি বড় বিপদে পড়িয়াছে। সে অত্যন্ত নিরীহ, গো-বেচারী লোক, আপনার সংসার লইয়াই ব্যস্ত; কাহারও কোনও কথায় থাকে না, যেখানে দুই জন

লোক একটু চীৎকার করিয়া কথা কয়, সেখানে দাঁড়ায় না, বারোয়ারি-তলায় তাহার ডাক পড়িল। সে গিয়া শুনিল, প্রায় ছয়-সাত বৎসর পূর্ব্বে তাহার এক বিধবা ভগ্নীর স্বভাব খারাপ হওয়ায় গ্রাম হইতে প্রস্থান করে, উপস্থিত সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে একশত টাকা দিতে হইবে, নতুবা সে সমাজাধিকারে বঞ্চিত হইবে। শুনিবা-মাত্র সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল, ভাবিয়া কূল পাইল না। আজ ছয়-সাত বৎসর নির্ব্বিবাদে সমাজে চলিয়া আসিতেছে, হঠাৎ কোথা হইতে তাহার সে ভগ্নীর পাপ তাহাকে আজ এমনভাবে আক্রমণ করিল? বারোয়ারি হইতে পরেশ সাঁইকে পাঁচ দিন সময় দেওয়া হইল—ছয় দিনের দিন হয় তাহাকে টাকা লইয়া উপস্থিত হইতে হইবে, নতুবা সর্ব্বসমক্ষে অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে। পরেশ ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। এত টাকা সে পাইবে কোথায়? সে যে নিতান্ত গরীব — দশটা টাকা জোগাড় করা তাহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার, একশত টাকা সে পাইবে কোথায়?

৫

পরেশ সাঁই অনন্যোপায় হইয়া লক্ষ্মীকান্ত বাবুর শরণাপন্ন হইল। লক্ষ্মীকান্ত বাবু তখনই বিপদে পড়িলেন। ইহাকে কোন উপায়ে টাকা দেওয়া হইতে নিষ্কৃতি দিলে বারোয়ারির বিরুদ্ধে দাঁড়ান হয়, অথচ তাঁহার পিতা বারোয়ারির দিকে,—তিনি কি করিয়া পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন? এদিকে কাহারও নেত্র-জলকে উপেক্ষা করা একান্তই তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, পরেশ সাঁইকে কোনও সান্ত্বনার কথাই বলিতে পারিলেন না। পরেশ সাঁইও তাঁহার পিতার বয়সী লোক, তাঁহার পায়ে ধরিয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছে, এ দৃশ্য তাঁহার কাছে বড়ই মর্ম্ম-বিদারক। তিনি পরেশ সাঁইকে বলিলেন, "আমি দিন-কতক পরে আপনার যা-হয় একপ্রকার ব্যবস্থা করচি।" পরেশ সাঁই বড়ই ভীত হইয়াছে, সে বার বার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বাবা, তুমি যা-হয় কর, নতুবা আমি মরে গেলাম।" পরেশের ক্রন্দন দেখিয়া লক্ষ্মীকান্তর হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "আপনাকে কাঁদতে হবে না। আমি যে কোন উপায়ে পারি মিটমাট করব, না পারি, শেষ আমি নিজেই আপনার একশত টাকা বারোয়ারিতে জমা দেব।" পরেশ সাঁই আশ্বস্ত হইয়া প্রস্থান করিল, কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত বাবু একেবারে চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। করুণ হৃদয়ের আবেগে তাহাকে ত অভয় দিলেন, এখন সকলদিক রক্ষা হয় কি করিয়া? লক্ষ্মীকান্ত বাবু সর্ব্বশেষে স্থির করিলেন, পিতাকে এই সমস্ত বিষয় বলা যাক্, যদি তিনি মিট্-মাট্ করিয়া দিতে পারেন।

সন্ধ্যার পর যখন রামধন মিত্র গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়া সামান্য আফিমের নেশায় নিজের মধ্যেই নিজে ডুবিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় লক্ষ্মীকান্ত বাবু পিতার চরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, "বাবা—"

হঠাৎ পুত্রের আহ্বানে মিত্র-মহাশয়ের আফিমের নেশা একটু চটিয়া গেল, ইহাতে তিনি বড়ই বিরক্ত হইলেন, একটু বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "কি, বল?"

তখন লক্ষ্মীকান্ত বাবু পরেশ সাঁইয়ের কথা বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া মিত্র-মহাশয় কহিলেন, "তুই একেবারে শেষ পর্য্যন্ত নিজে টাকা দিতে স্বীকার করেছিস?"

লক্ষ্মীকান্ত বলিলেন, "হাঁ, করেছি।"

রামধন মিত্র একটু ভাবিয়া কহিলেন, "আমি নিজে বারোয়ারির একজন পাণ্ডা—এখন কি করিয়া পরেশকে বলি যে তুমি টাকা দিয়ো না? অথচ পরেশের টাকাটা প্রকৃতই জবরদস্তি করিয়া আদায় করা হইতেছে। কি করি, জীবন সামন্ত লোকটা বড়ই জেদী, সে যা ধরে তা ছাড়ে না, অথচ চিরকার স্নেহ করি, কেমন চক্ষু-লজ্জায় উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতেও পারিনা। আচ্ছা, এক কাজ করিতে পারিলে হয়, পরেশকে বলিবে, কাল যেন সে পঁচিশটি টাকা লইয়া উপস্থিত হয়, আমি সকলকে বলিয়া উহাতেই সামঞ্জস্য করিয়া দিব"।

লক্ষ্মীকান্ত বাবু এ মীমাংসায় বেশী সুখী হইতে পারিলেন না, তথাপি উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা তাহাতে সায় দিয়া প্রস্থান করিলেন। রামধন মিত্র কথা শেষ করিয়াই

পুনরায় আফিমের মৌতাতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, হঠাৎ হাত হইতে গড়্গড়ার নলটি টক্ করিয়া পড়িয়া যাওয়ায় চমকিয়া উঠিয়া যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, চক্ষু চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া একটি হাই তুলিয়া, পুনরায় নল মুখে দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

৬

পরেশ সাঁইয়ের বাড়ী পূর্ব্ব-পাড়ায়। পূর্ব্ব-পাড়ায় অনেক লোকের বাস ছিল, কিন্তু পূর্ব্ব-পাড়া বিদ্যা-বুদ্ধি পয়সা সকল রকমেই পশ্চিম পাড়া অপেক্ষা দুর্ব্বল। অনেকবার পূর্ব্ব-পাড়ার সহিত পশ্চিম-পাড়ার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কোন বারই পূর্ব্ব-পাড়া পশ্চিম-পাড়াকে পারিয়া ওঠে নাই। পূর্ব্ব-পাড়ার পরেশ সাঁইয়ের একশত টাকা জরিমানা করায় পূর্ব্ব-পাড়া-ওয়ালারা ভারী অপমান বোধ করিল। তাহারা একবার পশ্চিম-পাড়া-ওয়ালাদিগকে বুঝিয়া লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিল। পূর্ব্ব-পাড়া-বাসী সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, তাহারা পরেশ সাঁইকে লইয়া চলিবে এবং পরেশকে জরিমানার টাকা দিতে দিবে না। এই উপলক্ষে সংঘর্ষে যদি পূর্ব্ব-পাড়াওয়ালারা সর্ব্বস্বান্ত হয়, তথাপি পিছপাও হইবে না। পরেশ সাঁই লক্ষ্মীকান্তর পরামর্শ-মত পঁচিশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু সকলেই তাহাকে নিষেধ করিল, টাকা দিতে হইবে না এবং স্বেচ্ছায় অপরাধী সাজিবারও কোন প্রয়োজন নাই। পরেশ সাঁই দেখিল, যদি তাহাকে টাকা না দিতে হয় অথচ তাহার পাড়ার সকলে তাহাকে লইয়া চলে, তবে মন্দ কি! আর দ্বিতীয়তঃ লোকটি বড়ই ভীতু, সে জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল পরের কথা শুনিয়াই কাটাইয়া আসিয়াছে, আজও পরের কথা শুনিল। সে টাকা পঁহুছাইয়া দিল না এবং দোষও স্বীকার করিল না। ইহাতে পশ্চিম-পাড়ার সম্প্রদায় হইতে সে সমাজচ্যুত হইল, কিন্তু তাহার নিজের পাড়াওয়ালারা তাহাকে সমাজে লইল।

৭

একটি পুষ্করিণীর ছ্যাঁচ লইয়া পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্বপাড়ার সহিত পশ্চিম-পাড়ার কিছু গোলযোগ চলিয়া আসিতেছিল, তবে এতদিন সেটা অনেকখানি মিটমাটের উপর চলিতেছিল। কিন্তু এ বৎসর কি হইবে, তাই একটা মহা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল। পশ্চিম পাড়ার জীবন সামন্ত প্রভৃতি সকলে এক জায়গায় সমবেত হইয়া যুক্তি আঁটিতেছে।

জীবন সামন্ত কহিল, "দেখ, তোমাদের কোন ভাবনা নেই, পরেশের টাকা যে-দিক দিয়ে হোক্ আদায় হবেই, আর ছ্যাঁচের জন্য কেন ভাবছে, জল আমরা নেবই।"

হরি কহিল, "আর পূব-পাড়াদের যুক্তি শুনেছেন? ওরা পঁচিশ ত্রিশজন লাঠিয়াল ঠিক করে রেখেছে, আমরা পুকুরের পাড়ে গেলে আর আস্ত ফিরব না।"

লক্ষ্মীকান্ত কহিলেন, "তা হবে না, আমার জীবন থাক্‌তে আমি এত বড় একটা অশান্তি হতে দেব না। যে কোন উপায়েই হোক্, মিটমাট করাবোই করাবো।"

জীবন সামন্ত কহিল, "ও-যুক্তি ভাল নয়। যা হবার একটা হয়ে যাওয়াই ভাল, ওদেরও বল-বুদ্ধি বোঝা যায়।"

এমন সময় দুখীরাম আসিয়া সংবাদ দিল, পূর্ব্ব-পাড়ারা লোকজন সঙ্গে লইয়া জল ছেঁচিতে গিয়াছে। শুনিবামাত্র সকলে মাঠের দিকে দৌড়িল। পুষ্করিণীর পাড়ে অনেক লোক জমায়েত হইল। প্রথমে ভদ্রতার উপর সামান্য বকাবকি আরম্ভ হইল, ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্ব্ব পাড়ার প্রতাপ মণ্ডল লোকটি বড়ই রাগী। পূর্ব্ব-পাড়ার মধ্যে তিনিই একটু অবস্থাপন্ন; বাড়ীতে তিন-চারিটা ধানের মরাই আছে, তিনখানি লাঙ্গলের চাষ। ইনি পূর্ব্ব-পাড়ার নেতা।

প্রতাপ মণ্ডল ক্রোধে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওহে লক্ষ্মীকান্ত, তোমাদের ভারী অহঙ্কার হয়েছে। আচ্ছা, দেখা যাবে, তোমার বাবা কত পয়সা করেছে।"

রাগে লক্ষ্মীকান্তর সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল, তথাপি তিনি অধীর হইলেন না; যাহারা শত রাগের কারণ সত্ত্বেও চেঁচামেচি করিয়া গোলযোগ করিতে ভালবাসে না, ইনি সেই প্রকৃতির লোক!

লক্ষ্মীকান্ত ধীরভাবে বলিলেন, "মণ্ডল-মশাই, যেটা অনায়াসে সুবন্দোবস্তয় হতে পারে, কেন তার জন্যে শুধু শুধু মাথা ফাটাফাটি করা, মামলা-মকদ্দমা করা? তার চেয়ে এক কাজ করুন, এক পাড়ার লোক প্রথম তিন

ঘণ্টা জল ছেঁচুক, তারপর আর এক পাড়ার লোক তিন ঘণ্টা ছেঁচবে। এই উপায়ে চল্‌লে কারও কোন অনিষ্ট হবে না, অথচ সকলকারই জল পাওয়া যাবে।”

অনেকেই সেই মতের পোষকতা করিল, অনেকে আবার কহিল, “তা হবে না, যা হবার আজই হয়ে যাক্।” ইহাতে একদিকে সুবিধা হইল, অনর্থক দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া লোকের মাথা ফাটিল না, কেহ বিপন্ন হইল না। আবার অসুবিধাও এই হইল, দুই দলই আস্ফালন করিয়া বাড়ী ফিরিল। তাহাতে লোকের আক্রোশ আরও বৃদ্ধি পাইল, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ধূমাইতে লাগিল।

৮

একে ত পল্লীগ্রামের লোক দলাদলির গন্ধে আমোদে উন্মত্ত হইয়া ওঠে, তার উপর পূর্ব্ব-পাড়ার নেতা প্রতাপ মণ্ডল ও পশ্চিম-পাড়ার জীবন সামন্ত দুইজনেই ভয়ানক জবরদস্ত। মামলা-মকদ্দমা ও জমাজমি-সম্বন্ধায় বিষয়-কর্ম্মে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছে, দুইজনেই পূর্ণ উদ্যমে দলাদলিতে মনোনিবেশ করিল। লক্ষ্মীকান্ত বাবু মীমাংসার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল।

ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্মীকান্ত বাবুর পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি একমাত্র সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি লোকজন কিছুই খাওয়ান নাই, ভাবিয়াছিলেন, এ অবস্থায় কোনরূপ একটা সামাজিক ব্যাপার করিলে দলাদলি আরও পাকিয়া উঠিবে, মিটিলে তখন যা হয় ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু মিটমাটের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না, উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। বর্ত্তমান সময়ে তিনি প্রায় গ্রামে থাকেন না; কলিকাতাতেই থাকেন। তিনি গ্রামে না থাকায় দলাদলির বড়ই সুবিধা হইয়াছে, কারণ তিনি ঐ সমস্তের বড়ই অন্তরায় ছিলেন। দেখিতে দেখিতে আবার এ বৎসর বারোয়ারি পূজার সময় হইয়া আসিল। দুই পাড়াই উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। প্রতিদ্বন্দ্বী পাড়াকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ কদর্য্য ভাষায় বিদ্রূপের গান বাঁধা হইল; বারুদ প্রস্তুত হইল, আরও অনেক রকম আয়োজন হইতে লাগিল।

প্রথমে পশ্চিম-পাড়ার দল পূর্ব্ব-পাড়ার উদ্দেশ্যে গান গাহিয়া দগড়, ঢাক, ঢোল, প্রভৃতি বাজনা সঙ্গে লইয়া নাচিয়া গেল। পরে পূর্ব্ব-পাড়াও ঐ রীতি অনুসরণ করিল। বারোয়ারি পূজা উপলক্ষে সকলেই মদে চুর হইয়াছে, কাহারও দিক্-বিদিক্ জ্ঞান নাই! ক্রমে দুই দল একত্র সমবেত হইল, পরে কথা-কাটাকাটি হইতে লাগিল। তারপর বাঁধ-ভাঙা নদীর স্রোতের মত দুই দলই পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রবল বেগে লাঠি চলিতে লাগিল। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় ব্যাকরণতীর্থ।

দেখা

দেখিবার বাসনা অপার,
তবু আমি মূরতি গড়িয়া,
তোমার অসীমখানি মুঠিতে ভরিয়া
লইব না কাছে,
দেখার আশার পাছে পাছে,
যুগে যুগে জনমে জনমে কাঁদিয়া ছুটিব বার বার
তুচ্ছ দিয়ে কভু মিটাব না, ভূমার এ আস্বাদ
আমার!

প্রেমে ভরা এ হৃদয়-মন
বেদনার কণ্টক শয়নে,
বাঁধিয়া রাখিল মোরে, হায় আজীবন!
তবু আমি ভুলে,
এ প্রেম দেব না কভু তুলে,
কারো হাতে, আর কারো গলে,
ব্যথা-দীপ্ত তপ্ত অশ্রুজলে,
জীয়াইয়া মরণে মরণে,
তোমারেই করিব বরণ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

চারখারি

নামটা একটু উদ্ভট হইলেও দেশটি বেশ। চারখারি মধ্য ভারতের বুন্দেলখন্দের অন্তর্গত একটী করদ রাজ্য। নওগাঁ হইতে ডাক্ গাড়ীতে চাপিয়া হরপালপুরে আসিয়া সেখান হইতে ট্রেণে চড়িয়া মাহোবায় পৌঁছিলাম। মাহোবা এলাহাবাদ হইতে বেশী দূরে নয়। মাহোবায় নামিয়া গাড়ী পাইলাম। ১৫।১৬ মাইল গাড়ীতে করিয়া অতিথিশালা। বন্দোবস্ত করিয়া এই প্রাসাদেই স্থান সংগ্রহ করিলাম। পোলিটিক্যাল এজেণ্টের নামে পত্র ছিল—তিনি বেশ ভদ্রলোক। এই প্রাসাদেই তিনি আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রাসাদটি দেখিলে মনে হয়, বড় দিনে কলিকাতার নিউমার্কেট হইতে কে যেন প্রকাণ্ড একখানি কেক্ আনিয়া
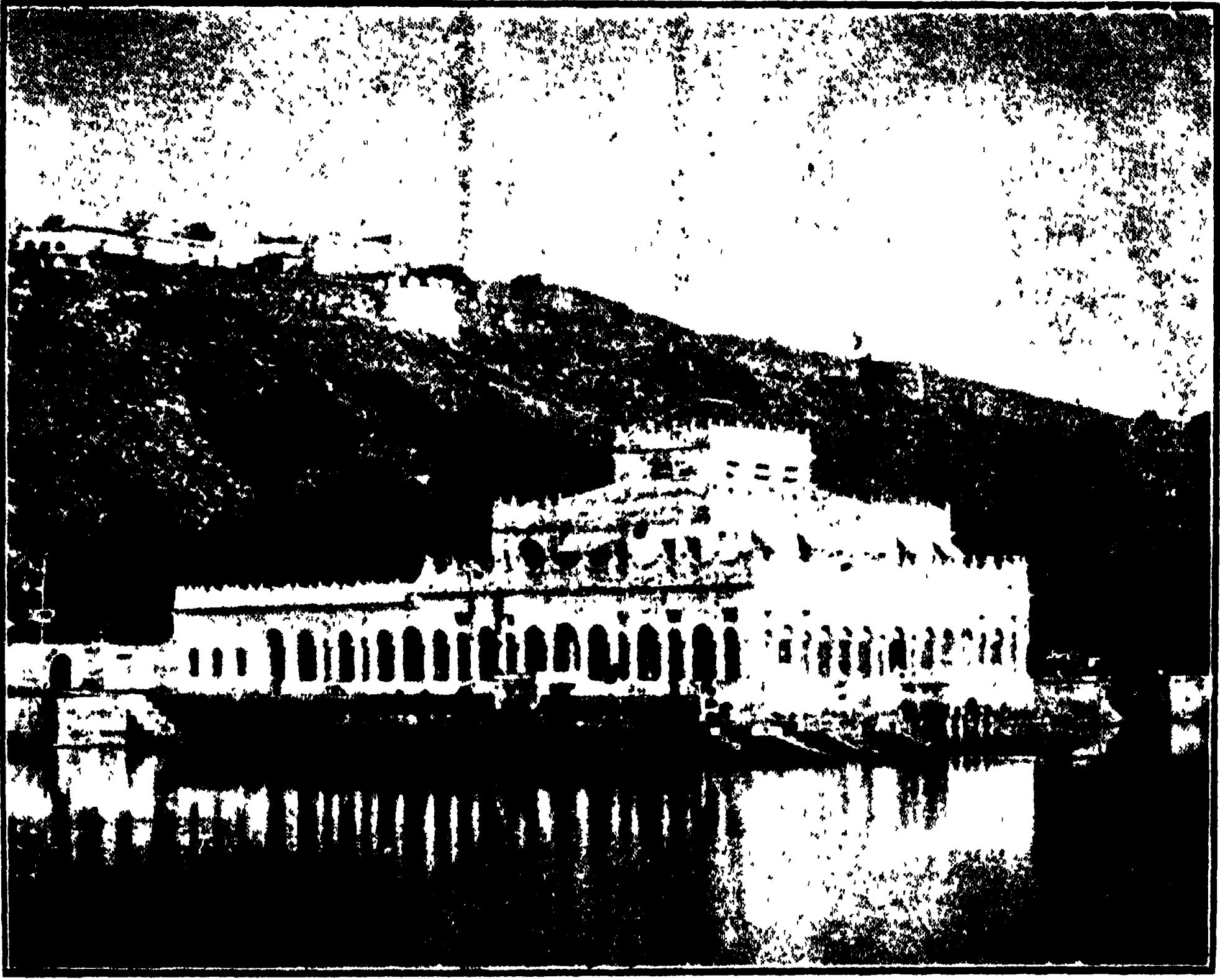
অতিথিশালা

চারখারিতে আসিলাম। পথের দৃশ্য চমৎকার। পথের শেষে একটী হ্রদ (lakc)। হ্রদের কোলে সুন্দর প্রাসাদ, তুষারের মতই শুভ্র, সুদৃশ্য।

আমরা ভাবিলাম, ঐটিই রাজপ্রাসাদ। কিন্তু সে ভুল। শুনিলাম, এটি য়ুরোপীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট গেষ্ট হাউস্, এখানে বসাইয়া রাখিয়াছে! প্রাসাদের আসবাব-পত্র খুব জমকালো। রাজার আদরেই প্রাসাদে রহিলাম।

শুনিলাম এক য়ুরোপীয় ইঞ্জিনিয়রের তত্ত্বাবধানে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রথমেই এখানকার কেল্লা দেখিতে গেলাম। কেল্লাটি

দেখিলে দুর্ভেদ্য বলিয়া মনে হয়। তাত্তিয়া তোপী যখন চারখারি দখল করিতে আসে, তখন এই কেল্লা হইতেই চারখারির নিপুণ ফৌজ সে আক্রমণ রোধ করিয়াছিল; পরে পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া তাত্তিয়া তোপীকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়া খুসী-মনে বিদায় করা হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই কেল্লায় য়ুরোপীয়েরা আসিয়া আশ্রয় লয়।

গোলাপের চাষ এখানে প্রচুর। গোলাপ-বাগানের সংখ্যা করা যায় না। একটিতে এমন সুন্দর ফোয়ারা আছে—সেই ফোয়ারায় থাকিয়া থাকিয়া জলের ধারা কেমন চপল নৃত্যে ঝরিয়া পড়িতেছে! দেখিলে মনে হয়, অন্তরালে কোনো পরী বসিয়া যেন কলকাঠি নাড়িতেছে—আর তাহারি অদৃশ্য হাতের সোনার কাঠির স্পর্শে সাড়া পাইয়া স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলের রাশি জাগিয়া অমনি

চারখারির কেল্লা

কেল্লার উপর হইতে সমস্ত সহরটিকে ঠিক ছবির মত দেখায়। পাহাড়ের মাথায় আকাশ আসিয়া ঠেকিয়াছে—পাহাড়ের গায়ে গায়ে গাছপালার ঝোপ—ধূর্জ্জটীর জটার মতই বিশৃঙ্খল, গম্ভীর।

চারখারিতে অসংখ্য বাগান আছে। মহারাণীর বাগানটি ত শোভায়-সৌন্দর্য্যে অনুপম। দেখিলে কবি কালিদাসের কথা মনে হয়—স্বর্গের একটা কোণ ছিঁড়িয়া কে যেন এখানে আনিয়া রাখিয়া দিয়াছে!

নৃত্য সুরু করিয়াছে! সন্ধ্যায় পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল,—তাহার রক্তিম বর্ণচ্ছটায় বাগান যেন আবীরের রঙে মস্‌গুল্ হইয়া হোলি খেলিতেছে!

এখানকার আর একটি দেখিবার জিনিষ—প্রাসাদ-তোরণ। প্রাচীন পদ্ধতিতে রচিত হইলেও এটি কিন্তু হালের। ডালাস্ নামে এক ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার দিল্লী ও আগ্রার আদর্শে এই তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হঠাৎ দেখিলে দিল্লী ও আগ্রার কথাই মনে হয়। সেকান্দ্রায়

কথাই বেশী করিয়া মনে পড়ে। ছাঁচ একেবারে হুবহু সেকান্দ্রার।

তোরণের পর প্রকাণ্ড উঠান--উঠান হইতে মর্ম্মরের সোপান-শ্রেণী উঠিয়া চলিয়াছে। সোপানের পরই দরবার-গৃহ। দরবারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হাউস অফ লর্ডস্ এবং হাউস্ অফ কমন্সের প্রকাণ্ড ছবি ঝুলানো।

পর্য্যালোচনাই প্রধান উদ্দেশ্য। একাই প্রায় তিনি বাহির হন্—সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজের দল হুঙ্কারের চোটে ব্যস্ত পথিককে ত্রস্ত ভীত করিয়া তাড়াইয়া দিবার অবসর পায় না। আমরা যখন বেড়াইতে গিয়াছিলাম,—সে বহুদিনের কথা—তখন এখানকার মহারাজ ছিলেন, ছত্রপাল দেব।
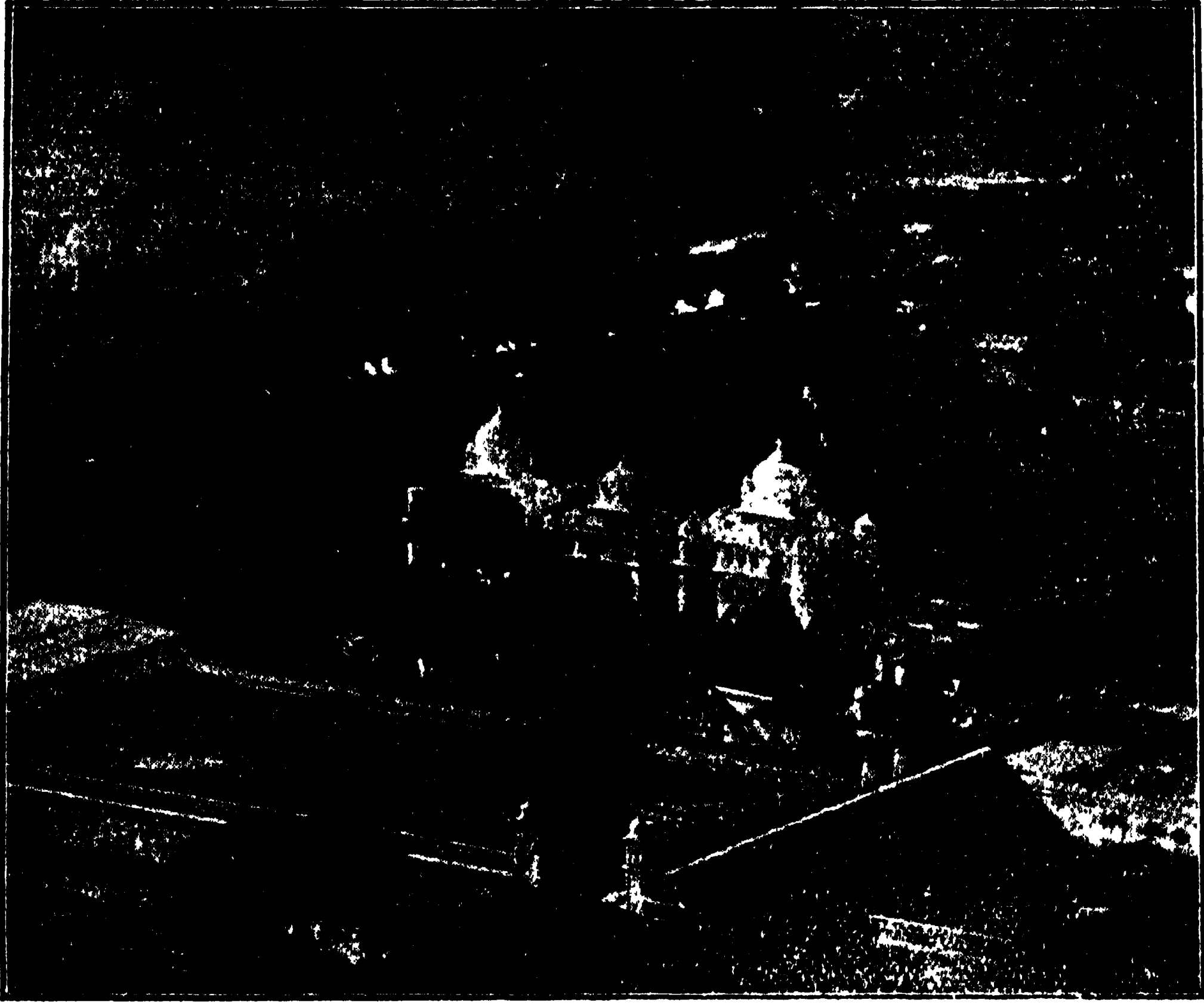
রাণী-বাগ

বংশ-ধারার গৌরব মানিলেও এখানকার মহারাজ প্রজার সত্বও মানিয়া চলিতে চাহেন! দরবারে সকলেই মহারাজের কাছে বিচার-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারে—কোন বাধা নাই। গালপাট্টা-ওয়ালা দ্বারা হুম্‌কি দিয়া কাহাকেও হঠাইয়া দিতে আসে না। মহারাজের ঘোড়ায় চড়ার খুব সখ। প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘোড়ায় চড়িয়া পথে পথে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান্—প্রজাদের অবস্থা-

দেশের অবস্থা সমৃদ্ধ। পথে-ঘাটে পথিকদের হাসি-ভরা মুখগুলি দেশের যে প্রাণ আছে, তাহারই পরিচয় দেয়। শিক্ষার বন্দোবস্তও ভাল। মেয়ে-স্কুলে পনেরো বছর বয়সের মেয়েরাও পড়াশুনা করিতেছে, দেখিলাম। হিন্দু-মুসলমানে বেশ প্রণয়; একসঙ্গে এক স্কুলেই সকলে পড়িতেছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে প্রকাণ্ড একটা করিয়া রূপার আংটি পরে,—সে একটা লক্ষ্য করিবার

জিনিষ। এই আংটি ডান হাতেই তাহারা পরে। স্কুলে হিন্দী, উর্দ্দূ পড়ানো হয়। বড় বড় মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজীও পড়িতেছে, দেখিলাম। ছেলেদের স্কুলে হিন্দী, উর্দ্দূ, ফারসী, ইংরাজী এই সব পড়ানো হয়—উচ্চ শিক্ষার প্রচলন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

চারখারিতে স্বতন্ত্র ডাকটিকিট চলে। এখানকার ডাকটিকিট আলাহিদা রকমের। সাদা কাগজের উপরে রবার ষ্ট্যাম্পের মোহর—ইহাই এখানকার ডাকটিকিট। দেশে উকিল আছে—উকিলদের আট ইঞ্চি দোয়াত একটা লক্ষ্য করিবার জিনিষ।
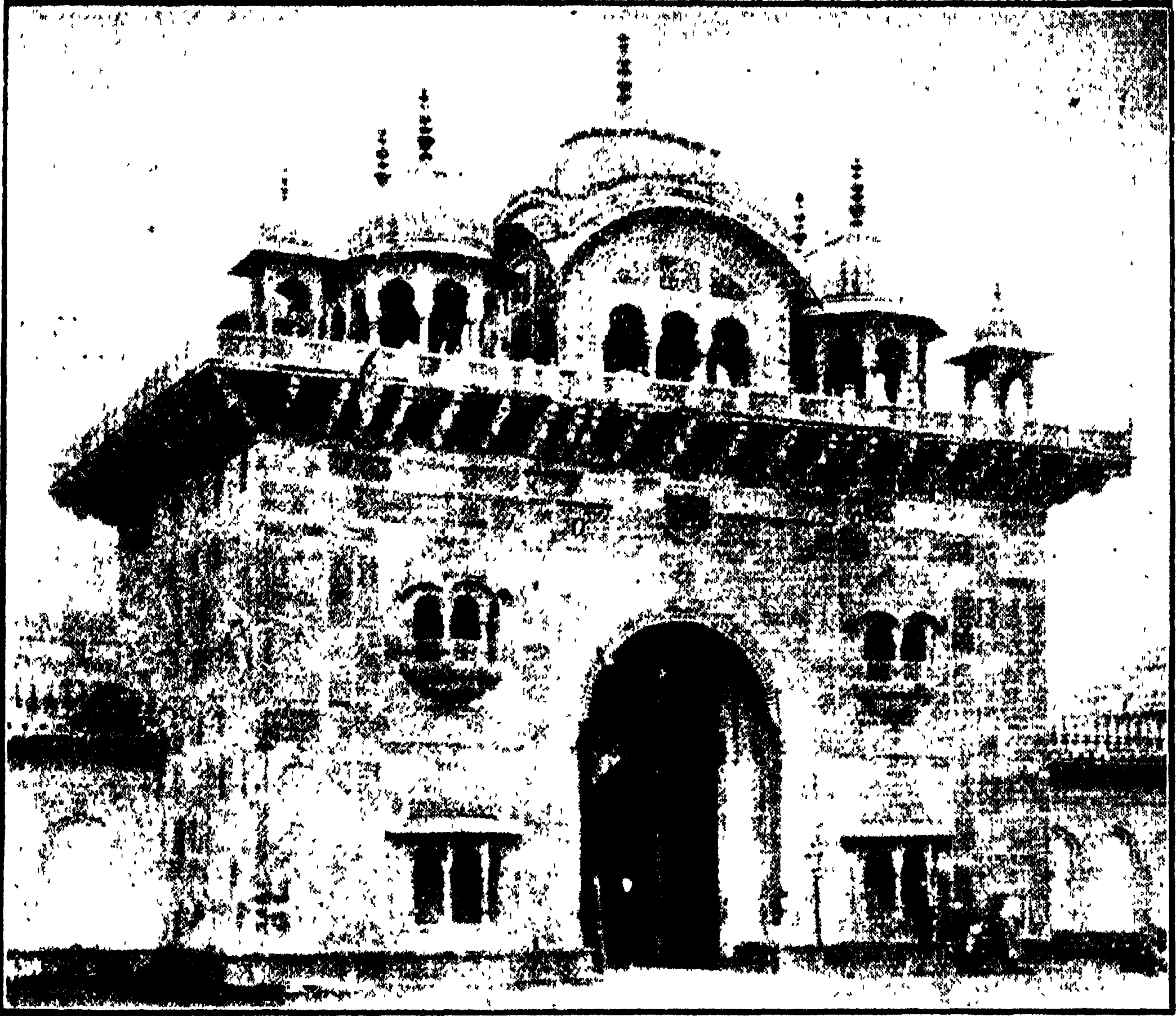
প্রাসাদ-তোরণ

চারখারিতে টেক্‌নিক্যাল স্কুলও একটি আছে। এখানে সোনালি জরির কাজ খুব ভাল হয়। এখানকার সোনালি জরির আদর-খ্যাতিও খুব। তাছাড়া কার্পেটও ভাল তৈয়ার হয়। ছোট-বড় সকল ঘরেই কার্পেট পাতা দেখিলাম। আমাদের বাংলা দেশের মাদুরের মতই এখানে কার্পেটের রেওয়াজ! ছোট মুদির দোকানেও এক টুকরা কার্পেট দেখা যায়।

বিদেশী লোক গিয়া মহারাজের দর্শন-প্রার্থী হইলে মহারাজ দর্শন দেন। আমাদের এ সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। মহারাজের স্বভাব নম্র। তিনি বেশ সদালাপী এবং নানা দেশের খবরও তিনি রাখেন। বাঙ্‌লা দেশের প্রতি মহারাজের শ্রদ্ধা খুব। মহারাজ বলেন, মস্তিষ্কের গুণে বাঙালী ভারতের বরপুত্র!

মোটের উপর চারখারি রাজ্যটি ক্ষুদ্র হইলেও সুপরি-

কেল্লা হইতে সহরের দৃশ্য

চালিত এবং জল-হাওয়া ও দৃশ্য-বৈচিত্র্যে রমণীয়। বাংলা হইতে বেশী দূরেও নয়। যিনি একবার বেড়াইতে যাইবেন, তিনিই সেখানকার অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

চোখের ভাষা

শুধু আঁখির সুধাটুকু আঁখিতে দিয়ে যাও—
লহি তা আঁখি-থালে ভরিয়া,
গড়ায়ে যাক্ তাহা অঝোর ধারা-পাতে
পরাণে কূলে কূলে ছাপিয়া।
তৃষিত চারি আঁখি নিমেষে মেশামিশি,—
বাড়ায়ে শতবাহু ছুটিয়া

তোমার প্রাণখানি আমার প্রাণে ধরে
আঁখির সীমাটুকু টুটিয়া।
গোপনে ক্ষণে দেখা,—আঁখিতে ঢেলে ভাষা
কি বল ছল-ছলি' বুঝি না,
কেবল চাওয়া-চাওয়ি বাড়ায়ে দুটি প্রেম—
অবোধ, তবু তারে ছাড়ি না।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

শোধন

(গল্প)

১

রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল। বর্ষাকালের গভীর রাত্রির আকাশে সজল মেঘস্তূপ তারা-দলের ক্ষীণ দ্যুতি ঢাকিয়া দিয়াছিল।

ঋণ-মজ্জিত, ঠাট-বজায়-রাখা জমিদার কালিদাস বাবুর একমাত্র পুত্ররত্ন বিনোদ তখন বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিল।

পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়াই পায়ের জুতাজোড়াটা ছুড়িয়া সে ঘরের এক কোণে ফেলিল। কিন্তু চট্ করিয়া হাতের কাছে চটি জুতা-জোড়াটাও পাওয়া গেল না।

হাত দিয়া মত্ত চোখদুটী ঘষিয়া বিনোদ তার ঘরের চারদিকে একবার বিস্মিত চোখ বুলাইয়া লইল। ওদিককার আল্‌নার উপরকার কতযুগ-সঞ্চিত ধুলা-বালির চাপ সরাইয়া তার চটিজুতা-জোড়াটীকে কে সাজাইয়া রাখিয়াছে!...কে রাখিল?

জুতা পায়ে দিয়া টলিতে টলিতে বিছানার কাছে গিয়া সে আর এক দফা আশ্চর্য্য হইল! তার বিছানাতে আজ এমন সযত্ন হস্ত বুলাইয়া দিল কে? বাড়ীতে কি কোন নূতন মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে?

ঘুমে তার চোখ জুড়িয়া আসিতেছিল। বিছানায় শুইতেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। তার সুপ্ত মুখে সেদিন বেশ একটী প্রসন্ন তৃপ্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল।

পরের দিন ভোরের রবি কলিকাতার সৌধ-তরঙ্গের মাথার উপর সাদা হইয়া দীপ্তোজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। তেতলার ঘরের সাম্‌নে রেলিংয়ের উপর বসিয়া কয়েকটা পাতি-কাক খুব চেঁচামেচি সুরু করিয়াছিল।

ছাদের উপরকার টবে রজনীগন্ধার সাদা ফুলভরা লম্বা শীষটি নব প্রভাতের অম্লান-শুভ্র রৌদ্রে যেন বুক-ভরা প্রেমের অর্ঘ্য লইয়া নবোঢ়া নারীর মত নত মুখে দাঁড়াইয়াছিল।

একতলায় সে-পাড়ার বিখ্যাত গয়লানী তার চাঁচা গলায় হাঁকিতেছিল, "ওগো দুধ নে যাও গো—"

বিনোদ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া পড়িল। ঘরের চারিদিকে আরও একবার আশ্চর্য্য চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া তারপর নিয়ম-মত স্নানাহার সারিতে নীচে নামিয়া গেল।

মা তখন তাঁর নিত্যকার নিয়ম-মত ভাঁড়ার ঘরের সাম্‌নের রোয়াকে তরকারির ঝুড়ি আর বঁটি পাতিয়া বসিয়া আছেন। ছেলের দিকে চোখ পড়িতেই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ওরে রামু, বিনোদকে তেলের বাটিটা চট্ করে দে রে।" মায়ের তার বড় ভয়,—পাছে বিনোদ তাঁর ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া সেখানকার শুচিতা নষ্ট করে।

চাকরের হাত হইতে তেলের বাটি লইয়া বিনোদ বলিল, "আমি তোমার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিনে।"

মা বিতৃষ্ণা-ভরা মুখ ফিরাইয়া লইলেন। বিনোদ মুখখানি ততোধিক বাঁকা করিয়া স্নান করিতে গেল। দু-এক কথায় শুনাইয়া গেল যে, দু-চারিটা পাশ করিলেই কিছু মানুষ চতুর্ভুজ হইয়া যায় না! তাই সে পাশ করে নাই বলিয়াই যে সকলে তাকে অগ্রাহ্য করিবে—

মায়ের তরফ হইতে কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। বড় বেশী দরকার না পড়িলে ছেলের সঙ্গে তিনি কথা বলিতে চাহিতেন না।

একমাত্র ছেলে যখন অধঃপাতের পথে নামিয়াছিল, সেই সময়েই বাপ-মা তাড়াতাড়ি করিয়া একটী নিরীহ বালিকার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে দশ-এগারো বৎসরের বালিকা তার স্বামীকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না, বরং আর-পাঁচজনে শিখাইয়া-পড়াইয়া যাহা করাইতেন, তার ফলে স্বামীর বিরক্তি ও প্রহারের যাতনায় অধীর হইয়া সে শ্বশুর-বাড়ী হইতে পলাইবার চেষ্টা করিত।

এম্‌নি একদিনকার নিদারুণ আঘাতে তার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তার পিতামাতা তাকে

নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া স্পষ্ট বাক্যে শুনাইয়া দেন যে, আর তাঁর মেয়ের স্বামীর ঘর করিয়া কাজ নাই।

অনেক কষ্টে সেবারে সে বালিকা বাঁচিয়াছিল। সে প্রায় বছর-দশেকের কথা। এ কয় বছরে বিনোদের গুণের খ্যাতি আরও অনেকখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে।

মর্ম্মাহত মা-বাপ্ এই কুসন্তানের নাম করিতেও লজ্জায় মুখ লুকাইবার ঠাঁই পাইতেন না। কোন্ মুখে ছেলের বউ আনিবার নাম করিবেন!

কয়দিন হইতে বাড়ীর একজন চাকর জ্বর হইয়া দেশে চলিয়া যাওয়ায় একমাত্র চাকর রামুর খাটুনি বড় বেশী হইতেছিল।

সে আসিয়া বলিল, "মা, ওই পাশের বাড়ীর বুড়ি-ঝী বলছিল যে, তাদের দেশের একজন ঝী বসে আছে, সে থাক্‌তে চায়। রাখবেন তাকে?"

গিন্নি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঝী! কেন, চাকর পাওয়া গেল না?"

"চাকর তো অনেক খুঁজচি মা, পাইনে যে! অন্য সময় কত চাকর পাওয়া যায়, কিন্তু দরকারের সময় আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না।"

"তবে নিয়ে এস ঝী,—দেখি, রাখা চলে কি না?"

ও বাড়ীর বুড়ি-ঝীয়ের সঙ্গে একহাত ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া যে আসিল, সে প্রখর যৌবন-দীপ্তা এক তরুণী নারী।

দেখিয়া গিন্নি চমকিয়া উঠিলেন। ইহাকে রাখিবেন তিনি কোন্ সাহসে?

কিন্তু তার আবেদন এত করুণ যে, তাকে তিনি বিদায় করিতে পারিলেন না। আহা, কোন্ ভদ্র-ঘরের বিপন্না মেয়েটী পথে পথে বেড়াইবে! দিন-কয়েক রাখিয়া পরে না-হয় অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিলেই চলিবে মনে করিয়া গিন্নি তখনকার মত তাকে রাখিলেন। এই মেয়েটীর নাম উমা।

উমা এ-বাড়ীতে আসিয়া সকলের চেয়ে বেশী আলাপ করিয়া লইল কর্ত্তার চাকর, বালক ভোলার সঙ্গে। ভোলার নাকি দেশে উমার মত একজন দিদি আছে, ভোলা প্রায়ই উমার কাছে তার গল্প করিত।

২

সন্ধ্যার সময় আহ্নিক সারিয়া গিন্নি বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। উমা ঘরে ধুনা দিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ কি মনে করিয়া গিন্নির মালা জপা মাথায় উঠিয়া গেল। তিনি মালাগাছি মাথায় ঠেকাইয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "ও উমা, শোনো, শোনো—"

"কি মা?"

"দেখ বাছা, তেতলার ঘরে তুমি যেয়ো-টেয়ো না। ও-ঘরে যদিই বা কিছু করতে হয়, তা সে ভোলাই করবে, বুঝ্‌লে?"

উমা ঘাড় হেঁট করিয়া হাতের গন্‌গনে আগুনভরা ধুনুচির দিকে চাহিল। তার ঠোঁটের কোণে একটু যেন সূক্ষ্ম হাসি ফুটিতে ফুটিতেই মিলাইয়া গেল। সে সেই ভাবেই মাথা নাড়িয়া জানাইয়া গেল—আচ্ছা!

কিন্তু সে যে তখনি-তখনি তেতলার ঘর-খানাতেই ধূপের সুরভি ধোঁয়া ভরাইয়া দিয়া আসিয়াছিল, সে কথা আর বলিল না।

বিনোদ সিগারেটের টিনটা খুঁজিতে ঘরে ঢুকিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এই ভোলা—"

"আজ্ঞে—"

"আমার ঘরে এমন করে ধোঁয়া ভরে দিয়ে গেল কি করতে!"

"আমি দিই নি বাবু—"

"কে দিলে তবে?...আবার চুপ করে থাকে! বল্ শীগ্‌গির, কে দিয়েচে?"

অস্ফুটস্বরে ভোলা বলিল, "নতুন ঝী।"

"নতুন ঝী! আবার নতুন একজন ঝী হয়েচে বুঝি?" ভোলা সে কথার জবাব দিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর অন্য একটা কথা মনে পড়িল। সে বলিল, "কর্ত্তা বাবুর হুকুম, সদর দরজায় চাবি বন্ধ করা হবে। আপনি একটু সকাল-সকাল ফিরবেন!"

"হ্যাঁ—সকাল-সকাল ফিরবো!—আমি পেছন দিক্‌কার পাঁচিল বেয়ে ঢুকবো অখন।"

"পাঁচিল বেয়ে? কি সর্ব্বনাশ! পড়ে গেলে যে মারা যাবেন!"

"যা, বাঁদর কোথাকার! আমি কচি খোকা কিনা, তাই পাঁচিল থেকে পড়ে মরে যাবো!"

"যদি বৃষ্টি আসে?"

"আসে আসবে—"

"ভিজে যাবেন যে! পাঁচিলে উঠবেন কি করে?"

"সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না,—রাস্কেল! তুই যা, পালা। পাঁচিলে যেন আমি আর কখনো উঠি নি!"

ভোলা যেন আপন-মনে বলিল, "রামু বলছিল যে পাঁচিলে সাপ থাকে, গোখ্‌রো সাপ্!"

বিনোদ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল: "আরে, তুই আমায় ভয় দেখাচ্ছিস্ নাকি রে? বেশ মজা তো! সাপের ভয় করতে গেলে আর বাড়ী থেকে বেরুনো চলে না!"

তারপর গুন্ গুন্ করিয়া সে গান ধরিল—

"আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া
রব বিরহ-শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।"

গাহিতে গাহিতে বিনোদ বাহির হইয়া গেল।

ভোলা তেতলা হইতে নামিতেছিল। দোতলার দালানে বসিয়া উমা সুপুরি কাটিতেছিল, ভোলাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—"ওপরে কি তর্কাতর্কি করছিলি ভোলা?"

ভোলাও হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সব শুনতে পাচ্ছিলে বুঝি?"

"পাচ্ছিলুম বই কি। দুয়োর বন্ধ করার কথা কি যেন বলছিলি! কোন্ দুয়োর বন্ধ করা হবে?"

"সদর দোর। কর্ত্তাবাবু হুকুম দিয়েছেন যে!"

"ও! আচ্ছা ভোলা, সে চাবি থাকে কার কাছে?"

"আগে তো রামুর কাছেই থাক্‌তো। সে-ই ভোরে কর্ত্তা ওঠবার আগে উঠে ঘর ঝাঁট দিয়ে বই-টই সব গুছিয়ে ঝেড়ে ঠিক করে রাখে কি না!

"ও!"

উমা আপন-মনে সুপুরি কাটিয়া যাইতে লাগিল, আর কিছু বলিল না। তার আনত মুখখানিতে কানের কাছে একটু গাঢ় রক্তের লালিমা ফুটিয়া উঠিল। বুকের ভিতরের গোপন মন্দিরে বীণার তারেও যেন একটি ঝঙ্কার খেলিয়া গেল!

দালানের সুমুখেই ফাগুন-পূর্ণিমার পূর্ণেন্দুর অম্লান জ্যোৎস্না নির্মেঘ আকাশের গায়ে কিরণ-জাল মেলিয়া ধরিয়াছিল। দক্ষিণ হাওয়া যেন প্রাণের উপর মধুর স্পর্শ বুলাইয়া যাইতেছিল। উমা নিশ্বাস ফেলিয়া একবার বসন্তের মধুমত্ত রাত্রির পানে চাহিয়া দেখিল। ব্যর্থ! ব্যর্থ! ব্যর্থ! বুকের কাছে আর-একখানি শক্তিপূর্ণ বুকের অভাবে সবই অপূর্ণ!

হৃদয়-পদ্ম শতদলে বিকশিত,—কেবল দেবতার করুণার অভাবে সে অর্ঘ্য-ভার তার ঝরিয়া শুকাইয়া যাইবে!' পাষাণের দেবতা তার, সে কি প্রাণের আকর্ষণেও প্রিয় হইতে প্রিয়তম হইয়া উঠিবে না? জীবনকে এমন করিয়া ব্যর্থ হইতে দিতে কি মানুষে পারে?

পুষ্পিত আম-গাছের ডালে লুকাইয়া কোকিল ঋতু-রাজের আহ্বান গাহিতেছিল।

গিন্নি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিয়া ডাকিলেন—

"উমা—"

"মা—"

"কোথায় তুমি,—নীচেয় কি?"

"না মা, এই যে দালানে সুপুরি কাটচি।"

"তা কাটো কাটো,—আমি বলি বুঝি সুমুখের বারান্দায় আছ। তা দেখ উমা—"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া গলাটা একবার ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া গিন্নি বলিলেন, "যদিও আমার পেটেরই শত্তুর, তবু না বল্‌লে ধর্ম্মের কাছেও একটা জবাব আছে তো,—তুমিও পরের মেয়ে, না হয় প্রাণের দায়ে আমার কাছে এসেচো—তাই বলি, কোনরকমে কিছুতেই তুমি ও ছোঁড়াটার সুমুখে থেকো না। বুঝলে ত?"

"আচ্ছা মা।"

"হ্যাঁ, তাই করো তাহলে। তুমি মেয়ে ভালো, তাহলেই আমি আমার কাছে সাহস করে তোমায় রাখতে পারি,

তোমারও কেউ নেই বল্‌চো, আমার ঘরেও আর কেউ নেই—"

"আপনার ঘরে আর-কেউ নেই ?"

"তা ছাড়া আর কি বলবো, বল! আমার অদৃষ্টে যে থেকেও নেই, নইলে পেটের শত্রু নিয়ে এত দুঃখ ভোগ করে মরি! আর সে পরের বাছা মার খেয়ে মুখে রক্ত উঠে মর্‌তে বসেছিল, তাকে আন্‌তে যাই কোন্ মুখে ?"

উমা সুপুরি-কাটা শেষ করিয়া সেগুলি টিনের কৌটায় তুলিয়া রাখিল।

গিন্নির অতি-সতর্কতা দেখিয়া তার হাসি আসিতেছিল। জীবন্ত হিংস্র জন্তুকেও বোধ হয় মানুষ এত ভয় করে না!

৩

রাত্রে সেদিন সত্য-সত্যই এমন বিশ্রী বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে, সে ঘন অন্ধকারের মধ্যে বিনোদ চট্ করিয়া পাঁচিলে উঠিতে সাহস করিল না, কপাল ঠুকিয়া সদর দুয়ারে আসিয়াই ঘা দিল, দুয়ারও খুলিয়া গেল।

আশ্চর্য্য হইয়া বিনোদ এ-দিক ও-দিক তাকাইয়া দেখিল, দরজা খুলিল কে ? কেহ তো কোথাও নাই! কিন্তু তবু যে একজন কেহ এখনি তালা খুলিয়াছে, তা ঠিক। এখনো কপাটের কড়ায় তালা ঝুলিতেছে! কিন্তু এত দয়া আজ কে করিল ?

উপরে উঠিবার সিঁড়ির মাঝামাঝি একটী পলতে-নামানো হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। বিনোদ অন্য দিন হোঁচট-খাইতে খাইতে অন্ধকারেই উপরে ওঠে, সেদিন সিঁড়িতে আলো পাইয়া মনে মনে বলিল, "বুঝেচি, এ নিশ্চয়ই মায়ের নূতন ঝীয়ের কাজ। এর দেখচি শরীরে একটু দয়া-মমতাও আছে!"

ভাগ্যে তার বারুণী-কৃপা-রক্তিম চোখের চাহনি সব দিকে পৌছিল না, তা হইলে উমার লজ্জা-রঞ্জিত মুখখানি ধরা পড়িতে দেরি হইত না,—যদিও সে যথাসাধ্য আত্মগোপন করিয়াই ছিল।

বিনোদ উপরে গিয়া দেখিল, তার ঘরখানির প্রত্যেক জিনিষেই সেই একখানি সযত্ন হাতের সেবা মাখানো। হাতের কাছেই যা-কিছু দরকারী সব সাজানো আছে। এমন কি জলের গ্লাসটী অবধি!

ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিশ্বাসে খানিকটা জল খাইয়া সে এই তৃপ্তিদায়িনীর উদ্দেশ্যে অনেকগুলি Thanks দিতে দিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ভাবিল, সকালে এই ঝীটাকে ডাকাইয়া কিছু বখ্‌শিশ্ দিতে হইবে!

পরের দিন বেলা নয়টা বাজিয়া গেল, তবু বাদলা হাওয়ার সঙ্গে টিপি-টিপি বৃষ্টির আর বিরাম নাই। মেঘলা দিনের মত মেঘ-ভরা মুখখানা করিয়া বিনোদ বিছানায় শুইয়া ছিল।

ছাতা হাতে ঘরে ঢুকিয়া ভোলা টেবিলের উপর চা রাখিল। চা দেখিয়া বিনোদ উঠিয়া বসিল। কাপ্‌টা টানিয়া গরম চায়ে চুমুক দিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, "ভোলা—"

"আজ্ঞে!"

"মা কি করচে রে ?"

"ভাঁড়ার দিচ্ছেন, আর উমা দিদির সঙ্গে গল্প করচেন।"

"উমা দিদি ?"

"হ্যাঁ, নতুন ঝী।"

"তাকে একবার ডেকে আন্‌তে পারিস ভোলা, আমি তাকে বকশিশ্ করবো।"

"তা সে আসবে না তো! মা বারণ করে দিয়েছেন যে! আমি ডাক্‌তে গেলে সে চাক্‌রি ছেড়ে চলে যাবে।"

"ও বাবা! কেন ?"

"তা কি জানি—"

"তবে থাক্, কাজ নেই বাপু—ভারি তো বুড়ী ঝী একটা, তার আবার খোসামোদ করে দর্শন পেতে হবে! নাই বা দিলুম বকশিশ্!"

বিনোদ মুখ ভার করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। ভোলা বলিল, "কাল কোন্ পথ দিয়ে ঢুকেছিলেন দাদাবাবু ? সদর তো তালাবন্ধ ছিল।"

"ছিল তো ছিল। যে পথ দিয়েই ঢুকে থাকি, ঢুকেচি তো! বাইরে তো আর পড়ে থাকি নি!"

বিনোদের খালি চায়ের কাপ্ হাতে করিয়া ভোলা চলিয়া গেল।

সেদিন, তার পরের দিন, এমনি করিয়া প্রতিদিনই বিনোদ যত রাত্রেই বাড়ী ফিরিত, সদরের তালা খুলিয়া কে তাকে পথ করিয়া দিত। যার বিনিদ্র চোখ এই কাজ করিত, সে আড়ালেই থাকিত।

কচিৎ এক-আধ দিন একখানি কাচের চুড়ি-পরা ফরসা হাত ছায়ার মত বিনোদের চোখে পড়িতে পড়িতেই মিলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে ঘোমটা-ঢাকা মুখ বিনোদ একদিনও দেখিবার সুযোগ পায় নাই।

ওই এক পলকেই বিনোদ দেখিয়াছে যে, মৃণালের মত হাত যার, সে কোনো কালে বুড়ি ঝি নয়! ও হাত কোনো গৌরাঙ্গী তরুণীর।

মাঝে মাঝে নীচের তলা হইতে তেতলায় যাইবার পথে বিনোদ দেখিত, ভোলা যেন কার সঙ্গে খুব উৎসাহে গল্প করিতেছে, হাসিতেছে, কিন্তু বিনোদেব সাড়া পাইবামাত্র সে দ্বার বন্ধ হইয়া যায়!

সে হাসিয়া মনে মনে বলিত, "এ যে দেখ্‌চি আমার চেয়ে ভোলার ভাগ্যিও ভালো!"

একদিন একটু কান পাতিয়া সে শুনিল,ভোলা বলিতেছে, "জানো উমা-দি, সেদিনে, সেই যে খুব বৃষ্টি নেমেছিল, সেইদিনে দাদাবাবু আমাকে বলেছিলেন, তোমাকে ডেকে দিতে—আর দাদাবাবু তোমাকে কি ভেবেছিলেন, জানো? ভেবে ছিলেন,—বুড়ি ঝী!"

গলা নামাইয়া ভোলা আরও কি যেন বলিল, উত্তরে কোন্ সুদূর হইতে ভাসিয়া আসা গলার সাড়া পাওয়া গেল, "হ্যাঁ, আমিও মার খেয়ে মরি আর কি!"

"না, তোমাকে মারতেন না,—মেজাজ সেদিন ভারি খুসি ছিল কি না!"

"তোর মুণ্ডু ছিল!"

বকিতে বকিতে বিনোদ নিজের ঘরে গেল। মনে মনে সে ভোলার উপর বড় চটিল। ছোঁড়াটা আস্কারা পাইয়া মাথায় উঠিয়াছে! দাদাবাবুর গল্প হইতেছে, দাদাবাবু যেন একটা গল্পের জিনিষ আর কি!

কিন্তু ভোলা সময়-অসময় অনেক উপকারে আসে বলিয়া তাকে ক্ষমা না করিলেও বিনোদের চলে না।

দিন পাঁচেক পরে একদিন মুখখানিতে বিশ্বের বিষাদ মাখিয়া বিনোদ ঘরে পড়িয়া খুব ছট্‌ফট্ করিতেছিল, গোটা দশেক টাকার তখনি বড় দরকার। না হইলে নয়, কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়! ভোলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মা তখন কর্ত্তার ঘরে আছেন, তাঁর হাতে-পায়ে ধরার সুযোগও নাই। বিনোদ কি যে করে ভাবিয়া পাইতেছিল না!

ভোলাই এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া দশটী টাকা আনিল। বিনোদ বলিল, "তুই কোথায় পেলি টাকা?"

"উমা দিদি দিলে। মাকে কিছু বলবেন না যেন! মা শুন্‌লে উমাদিদিকে বকবেন।"

উমাদিদির টাকা! বিনোদের মনটা কেমন কুণ্ঠিত হইয়া গেল। এ যে ভারী কাপুরুষতার পরিচয় দিতে হয়!

বিনোদের সুপ্ত পুরুষত্ব যেন অপরিমেয় গ্লানির বোঝা ঠেলিয়া মাথা তুলিতে চাহিল। নারীর কাছে দুর্ব্বলতা,—এ যে বড় লজ্জা!

কিন্তু তার গ্লানির বোঝা অনেক ছিল। তাই সে টাকাগুলি পকেটে পুরিয়া বাড়ী ছাড়িয়া গেল।

অন্য ঘরে উমা তখন একান্ত মনে দেবতাকে প্রণাম করিতেছিল। কোন গোপন বেদনা বা হর্ষের পীড়নে, তার স্ফীত বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে বোধ হয় তখন খুব বেশী শক্তির আধারের কাছে সাবিত্রীর মতই শক্তির প্রার্থনা জানাইতেছিল।

৪

প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। এখনো বিনোদের জন্য রোজই গভীর রাত্রে সেই বিনিদ্র চোখ জাগিয়া থাকে। এখনো টাকার দরকার পড়িলেই ভোলার উদার মুক্ত হাত টাকা বহিয়া আনে।

তবু একটা ইতর আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বিনোদকে মাতাইয়া তুলিতেছিল। সে সাহস করিয়া উমার সঙ্গে এতটুকু ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিত না, পাছে উমা চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যায়!

সে চরিত্রহীন মাতাল। তার মুখের দুটা ভাল কথাতেও

হয়তো উমা নিজেকে অপমানিতা মনে করিতে পারে। উমা হয়তো তাকে ভয় করে, ঘৃণা করে,—আর—আর!

হায়, হায়, যে ধন স্পর্শের বাহিরে, তাহাকে পাইবার তৃষ্ণা এমন করিয়া জাগে কেন?

৬

ছাতের উপর একরাশি ভিজা কাপড় শুকাইতে দেওয়া হয়, রোজই সেগুলি উমা তোলে,—রোজই উমা তার তেতলার ঘর ঝাঁট দিতে বিছানা পাড়িতে আসে, কিন্তু বিনোদ বাড়ী থাকেনা তাই দেখিতে পায় না।

সেদিন হঠাৎ বিনোদের বাংলা সাহিত্যের উপর অত্যন্ত টান পড়িয়া গেল। সে নিত্যকার বাহির-বাস ছাড়িয়া দিয়া বেশীর ভাগ সময় তেতলার ঘরেই কাটাইতে আরম্ভ করিল।

এখন সে সন্ধ্যার সময় রোজই উমার কাপড় লইয়া যাওয়া দেখিতে পাইত, তবে তার ঘর-ঝাঁট ইত্যাদি কাজ ভোলার দ্বারাই চলিত। উমা এক হাত ঘোমটা টানিয়া কাপড়গুলা তুলিয়া লইয়া যাইত কিন্তু এতটুকু মুখ ফিরাইয়া একটী চাহনিও বাজে খরচ করিয়া যাইত না।

বিনোদ মনে মনে ভাবিত, কি কৃপণ! একদিন কি একটু অন্যমনস্কও হইতে নাই, তাও তো লোকে হয়!

কিন্তু সাবধানী উমা তা হইত না। তাই দিন দিন বিনোদের আগ্রহ যেন উতল হইয়া উঠিতেছিল! ক্রমে বাহিরের নেশা তার একেবারে ঘুচিতে বসিল।

তার মন বুঝিল, যে-মানুষ রাত জাগিয়া তার দুয়ার খুলিবার জন্য বসিয়া থাকে, না চাহিতেই নিজের দুঃখ-সঞ্চিত টাকা দিয়া সাহায্য করে, সে কি আর মনে মনে একটুও অন্য কিছু রাখে না?

কিন্তু তাই যদি হয়, তবে সে এ-সব দিকেই বা এমন সাহায্য করিবে কেন? যে দিন অর্থের অভাবে বিনোদ বাধ্য হইয়া ঘরে থাকে, সেদিন না চাহিতে টাকা দিয়া তাকে ঘরের বাহির করিয়া দেয় কেন?

বিনোদ ঠিক করিল, বুঝিতে হইবে, ওই লম্বা ঘোমটার তলে কি আছে? সে টেবিল হইতে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার বই টানিয়া লইল, প্রথমেই চোখে পড়িল,—

"ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে,
কিছু নাই তোর ভাবনা
দখিন পবন দ্বারে দিয়ে কাণ
শুনেছে রে তোর কামনা।"

ভোলা আসিয়া খবর দিয়া গেল, দেশ হইতে চিঠি আসিয়াছে, কাকাবাবুর ব্যারাম,—তাই কর্ত্তা বাড়ী যাইতেছেন। বিনোদ বলিল, "মাও যাবেন?"

"হাঁ,—কিন্তু তিনি আবার কালই আসবেন।"

"মা কি করচেন এখন?"

"তিনি—তিনি—" ভোলা খুব হাসিতে লাগিল।

তার ঘাড় ধরিয়া খুব ঝাঁকানি দিয়া বিনোদ বলিল, "কেবল হাসি, বাঁদর কোথাকার! বললুম, মা কি করচে, তার জবাব হলো কেবল হাসি! দেব এই ছাত থেকে টপ্ করে নীচে ফেলে, হাসি একেবারে বেরিয়ে যাবে!"

"ওরে বাবা তা হলে যে মরে যাব।"

"সেই তো বেশ হবে। বল্, মা কি করছে?"

"মা উমাদিদিকে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছেন!"

"তাই নাকি? বাস্‌রে! ঝীয়ের আদর এত!"

সেই দিনই কর্ত্তা-গিন্নী ভোলাকে সঙ্গে করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। নিঃশঙ্ক বিনোদ কিন্তু বাড়ী ছাড়িয়া বেড়াইতে যাইবার কোনো আগ্রহই দেখাইল না।

সন্ধ্যার তখনো দেরী ছিল। ছাদের পশ্চিম দিকের আল্‌সের গায়ে পড়ন্ত রোদ ঝক্‌মক্ করিতেছিল। খাঁচার ভিতরকার কুচো পাখীগুলি পালক দোলাইয়া লাফালাফি করিতেছিল। বিনোদ বেলাবেলি গিয়া বন্ধু-মহলে জানাইয়া আসিল, তার শরীর ভারী খারাপ, জ্বর আসে বুঝি!

সোনালি মেঘের উপর অস্ত-রবির রাঙা আলোর ছটায় অপরূপ আলোকের তরঙ্গ খোলা দরজা জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। দেরাজের উপরে ফুলের তোড়ায় শিথিল-বৃন্ত ফুলগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া ঘরের মেঝেয় লুটাইতেছিল।

খানিকক্ষণ বই নাড়িয়া বিনোদ বাজনা টানিয়া বসিল। পাপোষের উপরকার ঘুমন্ত বিলাতী কুকুরটা সে শব্দে আলস্য ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিল।

হঠাৎ এই সময়ে বিনোদের পিপাসিত আঁখির পরিতৃপ্তির ধন উমা একগাছি ঝাঁটা হাতে করিয়া দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ ভোলা নাই, তাই ঘর ঝাড়া হয় নাই।

বিনোদের নিলাজ চোখের দৃষ্টি অস্ত-রাগ-রক্তিম যৌবন লাবণ্য-মাখা উমার মুখের উপর পড়িয়াছিল। সে লজ্জা-রক্ত মুখ নামাইয়া হেঁট হইয়া বসিয়া ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল। বিনোদ আসিয়া বলিল, "আজ ঘোমটা নেই যে!"

উমা একটু কাঁপিল, কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া ঘরের কুচো কাগজগুলি এক জায়গায় জড়ো করিয়া তুলিতে লাগিল।

বিনোদ কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ নামিয়া দাঁড়াইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "এই,—তুমি মুখ তোলো তো।"

উমার মুখ আরো নামিয়া পড়িল। বিনোদ বলিল, "তোলো মুখ। তাকাও আমার দিকে, আমি দেখি।"

"কেন?"

"আমি দেখ্‌বো। তাকাও।"

ভয়ে উমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। চেষ্টা করিয়াও সে মুখ তুলিতে পারিল না। বিনোদের গলাটা যেন কাঁপিতেছিল,—সে গভীর কণ্ঠে বলিল, "পারচো না চাইতে? আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ, আমি সত্যি সত্যিই বাঘ-ভাল্লুক নই, মুখ তোলো একবার!"

বিনোদ এবার উমার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "তুমি তো করুণা! নিশ্চয়ই করুণা!"

উমা ঝাঁটা ফেলিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইতে গেল। পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বিনোদ বলিল, "বল আগে, তুমি উমা নও, তুমি করুণা—"

"কি হবে তা শুনে? আমি উমা—"

"উমা! আবার তুমি উমা! গলা অত কাঁপচে কেন? না, উমা নও। তুমি করুণা। স্বীকার কর, আমি ঠিক চিনেচি কি না?"

"আমি চলে যাচ্ছি—"

"চলে যাবে? তা বই কি। জানো,—কতদিন থেকে আমাকে এই ঘরে বসিয়ে রাখচ?"

"কে আপনাকে বেরুতে বারণ করে?"

"আবার কে? সেবারে কথায় বারণ করে ফল পাওনি, তাই এবার দাসী সেজে নিজের ধনেরই ভিখিরী হয়ে—"

"ও কি বলছেন ছাই-ভস্ম!"

"আবার! বল তবে, আমার দিব্যি, বল, তুমি আমার স্ত্রী করুণা নও? তুমি উমা।"

স্বামীর দিব্য করিতে না পারিয়া সে ধরা পড়িল,— স্বামীর বাহু-বন্ধন মাঝে উপেক্ষিতা স্ত্রী বহুদিন পরে আজ বাঁধা পড়িয়া গেল।

শ্রীনীহারবালা দেবী।

সমালোচনা

শুভা।—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম, এ, ডি, এল্‌ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার বি-এ, ৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি উপন্যাস। শুভা কেরাণীর মেয়ে, লেখাপড়া বেশ জানে; লক্ষ্মীছাড়া স্বামীর হাতে পড়িয়া প্রহার অবধি খাইত—প্রহার খাইয়া মনটা পিষিয়া গেলেও গৃহিণী-জীবনে সে জীবনের সার্থকতার সন্ধান করিয়াছিল। কিন্তু নানাদিকের নানা ঘটনাচক্রে তাহার সঙ্কলিত আদর্শ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সাত বৎসরে সে দেখিল, স্বামী-দেবতাটি মাটীর ঢেলার চেয়েও অধম। অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া সে হাড়ে হাড়ে বুঝিল,—তার আদর্শ ভুয়া, আশা কেবল ফাঁকি। ঘরের মধ্যে প্রহারে ও অত্যাচারে ব্যথিত চিত্ত লইয়া সে পথের পানে চাহিতে লাগিল,—হাজার-হাজার নর-নারী পথে চলিয়াছে, কাহারো মুখে উদ্বেগের চিহ্নও নাই! সে

ভাবিল, সেও কি অমনি পথে দাঁড়াইতে পারিবে না? কিসের ভয়? বাড়ীর সম্মুখে গলির অপর পারে এক প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীর তেতলার ঘর হইতে একটি যুবক শুভাকে দেখিত—শুভাও তাহাকে দেখিত। দেখিতে দেখিতে একদিন এক দুর্দ্দম ইচ্ছা তাহাকে পাইয়া বসিল। ঘরে থাকিয়াও ত শরীর বেচিয়া বাঁচিয়া থাকা—বাহিরেও তাই। বাহিরে তবু মুক্তি আছে, স্বাধীনতা আছে, জীবনের সহস্র পিপাসা মিটাইয়া তাহাকে তবু সার্থক করিতে পারিবে সে। তখন সেই সামনের বাড়ীর যুবককে অবলম্বন করিয়া শুভা একরাত্রে পথে বাহির হইল। পথে আসিয়া দেখে, যুবা নাই! সে তখন কম্পিত বুকে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া একেবারে কমলা থিয়েটারে গিয়া হাজির হইল, থিয়েটারের ম্যানেজার অতুল বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া থিয়েটারে অভিনেত্রীর জীবন গ্রহণ করিল। থিয়েটারে তাহার বন্ধুত্ব হইল চাঁপার সঙ্গে; চাঁপাও একজন অভিনেত্রী—পতিতার গর্ভে তাহার জন্ম। মা তাহার বিবাহ দিয়াছিল; কিন্তু স্বামী ভয়ানক পাপিষ্ঠ ও মাতাল—চাঁপার মা তাই তাহাকে তাড়াইয়া মেয়েকে থিয়েটারে দিয়াছিল। চাঁপা থিয়েটারে একজন অভিনেতার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কিছুকাল পরে যখন সে বুঝিল, অভিনেতাটা অত্যন্ত পশু-চরিত্র, তখন তাহাকে বিদায় দিয়া সে পুরুষবেষিণী হইল। তারপর শুভা সেই যুবাকে দেখিল। তাহার নাম নগেন্দ্র। নগেন্দ্র শুভাকে লইয়া এক সজ্জিত বাড়ীতে গেল—এ বাড়ী শুভার জন্তই কিনিয়া সে সাজাইয়াছে। নগেন্দ্রর স্ত্রী চপলা নগেন্দ্রকে একান্ত প্রেমে একখানি পত্র লিখিয়াছিল; সেই পত্রখানি নগেন্দ্রর হাত হইতে পড়িয়া যাওয়ায় শুভা সে চিঠি দেখে; দেখিয়া তাহার আত্মগ্লানি হয়। আজ একজন নারীর গলায় সে ছুরি দিতেছে? শুভা চিন্তাশীলা, লেখাপড়া জানে—সে ইহাতে বিচলিত হইল। এমন সময় নগেন্দ্রর ভাই এটর্ণি সত্যেন্দ্র খপর পাইয়া শুভাকে চাবুক মারিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। সংবাদ পাইয়া শুভার পরিচিতা কনভেন্টের মেম্ আসিয়া পুলিশ ডাকাইয়া সত্যেন্দ্রকে থানায় দেয়, এবং শুভার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। শুভা ওদিকে চাঁপার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এলবার্ট থিয়েটারে অভিনয় করিতে ঢুকিল এবং চাঁপার স্বামীও সহসা একদিন আসিয়া চাঁপার কাছে কৃত-অপরাধের জন্ত ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে লইয়া রেঙ্গুনে চলিয়া গেল। শুনিয়া শুভা সুখী হইল। সে ক্রমে নাটক রচনা করিল—সে নাটকের সুখ্যাতিতে দেশ ভরিয়া গেল—এবং নগেন্দ্রও তাহার ভক্ত পুজারী হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিল। তখন শুভা তাহাতে 'না' বলিতে পারিল না। দুই জনে অন্তরঙ্গতা হইল। নগেন্দ্রর স্ত্রী কিন্তু সংবাদ পাইয়া থিয়েটারে চিঠি পাঠাইয়া শুভাকে গৃহে আনাইয়া স্বামীকে ফিরাইয়া দিবার জন্ত ভিক্ষা চাহিল। শুভা প্রতিশ্রুত হইয়া নগেন্দ্র, থিয়েটার, কলিকাতা—সব ছাড়িয়া কার্শিয়ঙে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া এক নূতন নারীর সঙ্গে আলাপ হইল—সে মৈত্রী। মৈত্রী খৃষ্টান, এক বাঙ্গালী বাবুর প্রণয়িনী। পরিচয়ে জানা গেল—সে বাঙ্গালী বাবুটি আর কেহই নয়, শুভার স্বামী নিবারণ। এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকায় মৈত্রীর সঙ্গে নিবারণের বিবাহ হইতে পারে না—কাজেই মৈত্রীর ও নিবারণের সুখের জন্ত শুভা নিবারণের সহিত নিজের বিবাহের বাঁধন কাটিয়া কলিকাতায় ফিরিল। সেখানে আসিয়া শুনিল, এলবার্ট থিয়েটারে কর্ত্তা সুরেশ যক্ষ্মারোগে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। সুরেশের প্রতি শুভার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। মৃত্যু-শয্যায় সুরেশ বলিল, সে শুভাকে ভালবাসিয়াছে চিরদিন—সে ভালবাসা সত্য ও নিঃস্বার্থ এবং শুভা সুরেশের প্রার্থনামত তাহার মুখের উপর বার বার চুম্বন করিল। এইখানেই উপন্যাসের শেষ। গ্রন্থকারের মনস্তত্ত্বে অসাধারণ দখল এবং সমস্ত চরিত্রগুলিকেই রক্ত মাংসের জীব করিয়া তিনি গড়িয়াছেন। কোন রকম Convention বা সংস্কারে শুভা ও চাঁপা, সুরেশ ও নগেন্দ্রর চরিত্র আবদ্ধ নয়। সমাজের মস্ত বড় কঠিন সমস্যাকে এমন জীবন্ত করিয়া তিনি সকলের সম্মুখে ধরিয়াছেন যে অত্যন্ত সংস্কার-বদ্ধ মনেও একটা প্রবল সহানুভূতি সাড়া দিয়া ওঠে। চাঁপার চরিত্রাঙ্কনে ও চাঁপার স্বামীর চাঁপাকে আবার ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার ব্যাপারে লেখক যেমন নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ লীলায় তেমনি এ দুটি চরিত্রকে লীলায়িত করিয়াছেন! শুভার intellectএর সঙ্গে জীবনকে সার্থক করিয়া তোলার যে ঝোঁক, ইহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি খাঁটি রকমের হইয়াছে। সমাজে এখন নানা দিক হইতে নানা তরঙ্গ আসিয়া লাগিতেছে, এখন আর সেই মান্ধাতার আমলের গোটা দুই তিন আদর্শ ধরিয়া চরিত্র অঙ্কন চলিতেই পারে না—সে চেষ্টাও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। উপন্যাসে আমরা জীবন্ত প্রাণবন্ত চরিত্র দেখিতে চাই—নির্ভেজাল খাঁটি মানুষ দেখিতে চাই—যে-সব মানুষ পথে ঘাটে নিত্য বিচরণ করে, এবং তাহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সংযম-দুর্ব্বলতা লইয়াই ঔপন্যাসিকের কাজ। এ উপন্যাসে সেইরূপ সব জীবন্ত চরিত্রেরই দেখা পাইয়াছি। শুভা idealistis চরিত্র হলেও তাতে প্রাণের হিল্লোল আর স্পন্দন আছে। এ উপন্যাসখানি বাস্তব কলা-রচনার দিক হইতে চমৎকার চিত্তগ্রাহী হইয়াছে। চরিত্রগুলি প্রাণে বেশ রেখাপাত করে—একবার পড়িলে মন হইতে উবিয়া মুছিয়া যায় না, এইটুকুই ইহার উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। পতিতা নারীদের চরিত্র-চিত্রণে লেখকের সংযমের বাঁধ কোথাও ভাঙ্গে নাই—ইহাও লেখকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়।

স্বরাজ সাধনা।—বা রাষ্ট্র পরিচয়। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা সাথী প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর। মূল্য বারো আনা। রাজনীতি-সম্বন্ধে এখানি পাঠ্যগ্রন্থের মতই উপযোগী। প্রধানতঃ বোয়েক প্রণীত Elements of Political Science অবলম্বনে রচিত। তবুও লেখকের চিন্তাশীলতা প্রতি ছত্রে জাজ্বল্যমান

দেখিতে পাই। অবতরণিকায় লেখক এই গ্রন্থের মূল সূত্রটুকু অতি সহজ ও সরলভাবে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—দেশ বলিতে যাহা মনে কর, তাহাকে বাস্তবিকই যদি স্বরাজে পরিণত করিতে চাও, তাহা হইলে হৃদয় হইতে বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতা মুছিয়া ফেলিয়া আজ যাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেছ, তাহাকে কোলে তুলিয়া লও, আপনার ভাইয়ের মত সম্মান কর, আর যাহার স্বাভাবিক সাধুত্বে সন্দিহান আছ এবং সেই নীচ ও অমূলক সন্দেহের বশে যাহাকে জগতের সকল সংস্পর্শ হইতে সরাইয়া রাখিয়াছ, তাহাকে অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে উদ্ধার কর এবং তাহার হিতাহিত তাহারই হাতে ছাড়িয়া দাও; অধিকন্তু নিজের দৃষ্টান্তের সাহায্যে সর্ব্বসাধারণকে শিখাও—সহযোগী যে, সে কখনও পর নহে, সে চিরকালই আপনার; তাহাকে আপনার ভাবিতে শিখাই আপনার কার্য্য করিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামাই যথার্থ মনুষ্যত্ব। আর এইরূপ মনুষ্যত্ব ভিন্ন স্বরাজ কখনও লভ্য নহে। এই স্বরাজ বা স্বরাট একটা কৃত্রিম ব্যবস্থামাত্র নয়—তাহা দেশবাসীর সুচরিত্রতার ও পরস্পর-নির্ভরতা-বৃত্তির একটা স্বাভাবিক বাহ্যবিকাশ মাত্র। তারপর বিশ্বের নানা দেশের ইতিহাস হইতে রাষ্ট্র প্রকৃতির পরিচয় এমন সম্পূর্ণভাবে দিবার চেষ্টা আর কোন গ্রন্থে দেখি নাই। ষোলটি পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি; রাষ্ট্রপ্রভু কে? রাজা না, প্রজা? আন্তর্রাষ্ট্রীয় বিধান, রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ, ব্যবস্থাপক বিভাগ, শাসন বিভাগ প্রভৃতি রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় সকল কথারই লেখক অতি নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। বাঙালী মাত্রকেই আমরা এ গ্রন্থ পাঠ করিতে বলি।

ছায়াবাজি।—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার প্রণীত। কলিকাতা, মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা। অলক্ষণা, বাইজী, ভিখারী, কেরাণীবাবু প্রভৃতি বারোটি ছোট গল্প এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলিকে ঠিক ছোট গল্প বলিতে পারি না; লেখকও তাহা বলেন না। সমাজের নানা চিন্তা, নানা সমস্যার কয়েকটা টুকরা মাত্র লেখক ছোট ছোট প্লট, চিত্র ও নক্সার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অনেকগুলি চিত্রে ছোট গল্পের মশলা আছে। বইখানি পড়িয়া লেখকের ভাবুকতার পরিচয় পাই।

সবুজ কথা।—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। সাধনা প্রেস, চন্দননগর। প্রকাশক, শ্রীরামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, বোড়াই চণ্ডীতলা, চন্দননগর। মূল্য দেড় টাকা। এখানি বিচিত্র সন্দর্ভের সংগ্রহ। ভারতবর্ষ, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অচলায়তন, পঙ্কজ, শক্তিমানের ধর্ম্ম, একটি প্রেমের গান, নারীর উক্তি, অবরোধের কথা, বীরবল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, ঘরে-বাইরে এবং নূতন ও পুরাতন—এই বারোটি সন্দর্ভ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সন্দর্ভগুলি সমাজ ও সাহিত্যের নিপুণ আলোচনা। সেগুলি কবিত্বে মণ্ডিত, ভাবুকতায় রঞ্জিত। ভাষায় লেখক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছেন,—বিচিত্র রঙে রঙীন ভাষা। তরুণ প্রাণের উৎসাহে পূর্ণ এই সন্দর্ভগুলি আশার রাগিণীতে ঝঙ্কৃত, প্রাণের স্পন্দনে লীলায়িত। চিন্তা ও তাহার প্রকাশের ধারায় লেখকের শক্তির পরিচয় পাই।

প্রাণীদের অন্তরের কথা।—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫০ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। জীব-জন্তুদের অদ্ভুত শক্তির কয়েকটি সত্য কাহিনী লইয়া এ-গ্রন্থ রচিত। ৫৭টি কাহিনী এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলি কাল্পনিক নয়, সত্য, এবং সেগুলি কৌতুহলোদ্দীপক—বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এগুলির মূল্যও প্রচুর আছে। ইতর প্রাণীদেরও যে হৃদয় আছে, মন আছে, আত্মা আছে—তাহা এই বইখানি পড়িলে বেশ বুঝা যায়। গ্রন্থে কয়েকখানি ছবি দেওয়া হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া ছেলেমেয়েরা একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ পাইবে। বইখানির ছাপা কাগজ ও বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট।

রোবাইয়াৎ।—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা এলবিয়ন প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশিং হোম্, নুর মহম্মদ লেন। মূল্য লেখা নাই। ওমর খৈয়মের কতকগুলি রোবাইয়াতের ফিট্‌জীরাল্‌ডের ইংরাজী তর্জ্জমা হইতে বাংলা ছন্দানুবাদ লেখক করিয়াছেন। ইংরাজী তর্জ্জমার ছন্দ-প্রবাহ বাংলায় রক্ষিত হইয়াছে। ছন্দপ্রবাহ বেশ সজীব হইয়াছে—ইংরাজি অনুবাদ-কবিতার মতই সরল ও সুমিষ্ট। ছন্দেও লেখকের অধিকার আছে।

নিম্ন ও পতিত জাতি।—শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, দি নিউ ইণ্ডিয়া পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা গিরিশ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা দুই আনা। নিম্ন ও পতিত জাতি, নিম্নত্ব ও পাতিত্যের অবৈধতা, নিম্ন ও পতিত জাতির প্রতি সামাজিক নির্য্যাতন, বর্ণগত বৈষম্যের অনিষ্টকারিতা, এবং নিম্ন ও পতিত জাতির উন্নয়ন—এই কয়টি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে লেখক শাস্ত্রবচন তুলিয়া এবং সমাজের নিত্য-প্রত্যক্ষ শতসহস্র দৃষ্টান্ত দিয়া পতিত জাতির নিম্নত্ব ও পাতিত্যের অবৈধতা প্রমাণ করিয়াছেন। উচ্ছ্বাস থাকিলেও সেগুলি হেলার নহে—লেখক হৃদয় দিয়া এ-বৈষম্য অনুভব করিয়া বেশ দৃপ্ত সতেজ ভঙ্গীতে সহজ-সরল যুক্তির ধারায় বুঝাইয়াছেন, জাতির উন্নতি, জাতির প্রতিষ্ঠা ঘৃণায় বা অবজ্ঞায় নয়, জাতির প্রতিষ্ঠা অভেদ্য অখণ্ড হৃদয়ের প্রকৃত-বন্ধনে। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, নানক, রামমোহন, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ—ইঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহাদের মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করায়, মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা

ও সম্মান করায়,—অভেদ-জ্ঞানে। জাতীয় উদ্বোধনের দিনে ইহাই আমাদের মন্ত্র—এ মন্ত্রের সাধনায় অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইবে, কোল-ভীল, চণ্ডাল, হাড়ি ডোম বলিয়া যে-সব মানুষকে শৃগাল-কুকুরের মত দূরে তাড়াইয়া রাখিয়াছি, ভাই বলিয়া তাহাদের বুকে তুলিতে হইবে, তবেই মুক্তি…নহিলে ভেদ-জ্ঞানের বন্ধনে জড়াইয়া আমাদের জাতিটাই একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

বসন্ত-উৎসব কাব্য।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীবাঁট। প্রকাশক শ্রীভূদেব পোভাকর, বি-এ, বি-ই, হরিপুর সারস্বত ভবন, হরিপুর, নদীয়া কলিকাতা সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র। 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' দেখিলাম, গ্রন্থকারের নাম 'শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়'। গ্রন্থখানি কাব্যগ্রন্থ, আড়াইশত পৃষ্ঠার অধিক প্রকাণ্ড গ্রন্থ। গ্রন্থের অনেক বিশেষত্ব আছে। প্রথম,—লেখক বলিয়াছেন, 'এই কাব্য যথেচ্ছ ছন্দে লিখিত—'। দ্বিতীয় বিশেষত্ব,—ভাষার ব্যবহারও যথেচ্ছ দেখিলাম। "এই শিমুলের মূলে শি (she), নাই যে তার স্থিরতা কি?"

"আচম্‌কা আসি আমার নাকের ডগায় বসি মাছি
কত রঙ্গ করে মিছামিছি—
কিসের তরে মাথা কোটে করজোড়ে কত না মিনতি করে—
জানিনে কেন যে অত তার চালাকির শীলতাগিরি—"

ইহাকে কি বলিব? ভাবে-অর্থে এই অপূর্ব্ব চীজ এ কাব্য—? না, আর কিছু? এই ত প্রথম কয় পৃষ্ঠার নমুনা—এমনি ছন্দেই রচনা চলিয়াছে অজস্র, পাতায়-পাতায়। আর অগ্রসর হওয়া আমাদের সাধ্যে কুলাইল না। এ গ্রন্থও রচনার ত্রিশ বৎসর কাল পরে প্রকাশ করিতে সাধ হয়, আর ইহার দামও ধরা হইয়াছে, নগদ আড়াই টাকা! এ বই মানুষ কিনিয়া পড়িবে—আশ্চর্য্য, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

আর্য্যজাতির আদি নিবাস।—তথা হইতে নানা দেশে গমন ও ভারতে প্রবেশ। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীনিতাইচাঁদ শীল, চুঁচুড়া। কলিকাতা চেরি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ঐতিহাসিক গবেষণার দিক দিয়া এ পুস্তিকাখানি বঙ্গ-সাহিত্যর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। শাস্ত্রীয় বিবিধ প্রমাণ-প্রয়োগে লেখক আর্য্যজাতির আদি নিবাসের পরিচয় দিয়াছেন,—প্রাচীন ভূগোলের সহিত আধুনিক ভূগোলের আলোচনা করিয়া নানা প্রদেশের আদিম ও আধুনিক নাম-রহস্যও লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন। লেখকের আলোচনার পদ্ধতি খুব সহজ সরল ও সরস। এত-বড় বিষয়টিকে আলোচনায় বেশ কৌতূহলোদ্দীপক করিয়া তুলিয়াছেন।

সুনীলা।—শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী প্রণীত। শান্তি নিকেতন প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক। মূল্য বারো আনা। সুনীলা, সুরেশের মা, এবং হতভাগ্যের স্মৃতি—এই তিনটি ছোট গল্প এই গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে। গল্প তিনটি বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। সুনীলা গল্পটিতে গল্পের মশলা কিছু ছিল—জমিবার উপক্রমও করিতেছিল—কিন্তু শেষের দিকে প্লটটি মাটী হইয়া গিয়াছে। 'সুরেশের মা' ও 'হতভাগ্যের স্মৃতি' নিতান্তই অক্ষম রচনা।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

উড়ে

শুভক্ষণে 'স্বদেশ' ছেড়ে
এ দেশ-পানে এলে ধেয়ে
এত বড় কলকাতাটার
আগাগোড়া ফেল্লে ছেয়ে!
কোথাও তুমি বামুন ঠাকুর
কোথাও তুমি ঝাঁকা মুটে,
কোথাও চাকর, বেহারা কোথা
পাল্কী কাঁধে চল ছুটে!
কে বলে নাই, বুদ্ধি তোমার?
কে বলে রে 'উড়ে মেড়া'?

ফাঁকি দিয়ে পয়সা লোটো,
তীর্থে মোদের বানিয়ে ভেড়া!
তুমি রেঁধে দিলে খাব
গৃহলক্ষ্মী পারেন না তা',
মুখ ধোব জল তুমিই দিলে
সব কাজে মোর অক্ষমতা।
তোমার হাতে এম্‌নি করে
এই যে মোদের ধরা দেওয়া—
এ আর কিছু হোক্ বা না হোক্
অধীনতা যেচে নেওয়া!

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।

অভিমন্যু ও উত্তরা

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত

পরের ছেলে

(উপন্যাস)

এও কি পারিবার কথা! তাহার মাণিক—সে আর তাহার থাকিবে না? অন্যের হইয়া অন্যের নামে পরিচিত হইবে?

মাণিক পাছে একদিন তাহার মৃতা মাতাকে ভুলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিনয় যে প্রত্যহ তাহার মাতার গল্প করিয়া সেই মৃতার ফটো নিত্য তাহাকে দেখাইয়া থাকে! স্বর্গে বসিয়া মাণিকের মা কেমন করিয়া মাণিককে দেখে, ঘুমন্ত মাণিককে কেমন করিয়া সে আদর করিয়া যায়, এই সব গল্প করিয়া যে-শিশুকে সে নিদ্রা-লোভী করিয়া তুলে, সেই মাণিক জীবন্ত তাহাকে ভুলিবে? ভুলুক বা নাই ভুলুক (কেননা তাহার শাশুড়ী এ আশঙ্কা তাহার একেবারেই অমূলক, এ কথা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন) মাণিক যে পরের সন্তান হইয়া যাইবে, ইহাতে তো সন্দেহমাত্র নাই। আর সেই কাজ কি না বিনয়কেই করিতে হইবে? বিনয়কেই হাতে তুলিয়া সেই ছেলেকে পরকে দান করিতে হইবে? এও কি তার পারিবার কথা! সর্ব্বস্ব যায়, যাক, ইহার চেয়ে পথের ভিখারী হইয়া থাকা, সেও ভাল।

কিন্তু সেই সর্ব্বস্ব যাওয়াটা তো শুধু মুখের কথা নয়। তাহার যথার্থ মূর্ত্তি কিরূপ, তাহাও বিনয় দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে অনুভব করিতে লাগিল। এই গৃহ, অট্টালিকা, সুখ, সম্পদ, মান, সম্ভ্রম, এই তাহার চিরাভ্যস্ত আয়েসী জীবন—কিছুই আর তাহার থাকিবে না। এই যে তাহার অতি-আদরের নেশার বস্ত্রখানি—যাহা এখন অতি সমাদরে বাক্‌সের মধ্যে মখ্‌মল শয্যায় শায়িত আছে—ওখানি পর্য্যন্ত তাহার আর স্পর্শ করিবার অধিকার থাকিবে না! মাতুল তো ঐ দারুণ সর্ত্ত ব্যতীত তাহার আর কোন স্বতন্ত্র দাবী স্বীকার করিয়া যান নাই। তবে! এখানকার একটা তৃণের উপরও তাহার কোন অধিকার নাই। মামীর পোষ্য-পুত্র লওয়ার পরে একেবারে ভিখারী-জীবনই তাহাকে বহন করিতে হইবে।

নিজের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিল,—কিন্তু মাণিক? তাহাকেই বা সে পালন করিবে কি দিয়া? শাশুড়ী ঠাকুরাণী তো চোখোচোখি হইলেই "তোমার ছেলে নিয়ে যাও—তোমার ছেলেকে চিরদিন আমার পোষ্‌বার কথা নেই! আমি এদেরই খাওয়াতে পারি না, তা কি করে এমন করে—" প্রভৃতি বাক্য-বাণ অবিশ্রাম বর্ষণ করিতে থাকেন, আর বিনয় পলাইতে পথ পায় না। কোন দিন মাণিককে একবার চোখের দেখা দেখিতে পায়, কোন দিন তাহারও অবসর হয় না। যেদিন দেখিতে পায়, সেদিনও দেখে, সেই নধর কোমল ফুটন্ত গোলাপের মত বালক কেমন যেন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অঙ্গে ছিন্ন বস্ত্র—কোন দিন বা সম্পূর্ণ অনাবৃত ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ। বস্ত্র এবং উপযুক্ত খাদ্যেরও যে তাহার অভাব হয়, তাহা বিনয় বেশ বুঝিতে পারিতেছে। শাশুড়ীর অবস্থা চিরদিনই দীন, ভবিষ্যতের আশায় এতদিন তিনি নিজের সন্তানদের চেয়েও আদরে নাতিকে পালন করিতেছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহার আর সে ক্ষমতা নাই! মাণিকের বাপ যে সন্তানকে এটুকুও দিতে পারিবে না, ইহা তিনি এখন সর্ব্বদা সাহঙ্কারে ঘোষণা করেন এবং বিনয়ও তাহা নতশিরে মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

এক-একবার মনে হয়, নিজে যেদিকে দু'চক্ষু যায়, চলিয়া যায়। যেখানে চক্ষু-লজ্জা পাইতে হইবে না, এমন অপরিচিত কোন স্থানে গিয়া ভিক্ষা করিয়া অথবা মজুরী করিয়া খাটিয়া খায়! কিন্তু মাণিক? তাহাকে কাহার হাতে ফেলিয়া যাইবে? এই যে বাপের এই সর্ব্ব-আপদ-হরা মঙ্গল-কামী দৃষ্টি,—এ দৃষ্টি দিনান্তে একবারও তাহার অঙ্গে না পড়িলে মাণিক কি বাঁচিবে? না, না,—তাহার মন যে

এ কথা বলে না। এই যে দিনের মধ্যে একবারও শত লাঞ্ছনা সহিয়া সে মাণিককে বুকে টানিয়া লয়, বাপের এই বুকের স্পর্শে সন্তানেরও কি সর্ব্ব-অভাব মোচন হয় না? তাহার তো সব জ্বালা জুড়ায়, তবে মাণিকেরই বা না হইবে কেন?

কিন্তু তাহা যে হইতেছে না, ইহাও সে ক্রমে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। তবু অন্ধ মন বুঝিতে চায় না। দিনব্যাপী সমস্ত অভাবের ব্যথা মাণিক যে এখন বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চাপিতে থাকে। তাহার খেলনা নাই, ভাল কাপড়-জামা নাই, পাড়ার ছেলেদের মত সে সন্দেশ খাইতে পায়না, কোন্ দিন ছোট মামা তাহার কি কাড়িয়া লইয়াছে, ছোট মাসী তাহাকে বলিয়াছে, "আমাদের বাড়ী থেকে চলে যা—"এ সমস্ত অনুযোগ এখন সে পিতার কর্ণে তপ্ত তৈলের মত ঢালিয়া দিতে থাকে। এখন সে নূতন কথাও শিখিয়াছে,—"বাবা, আমাকে সেই বড় বাড়ীতে নিয়ে চল, সেই যেখানে নতুন ঠাকুমা আছে। তিনি আমায় কত ভাল বাসেন—কত খেলনা দিয়েছিলেন—তুমি কেন তার একটাও আন্‌তে দিলে না? কেন আমায় চুরি করে এখানে নিয়ে এলে? আমার সেই রেলখানা, সেই ঘোড়া, সেই বল্, আর সেই বাঁশীটা ছোট মামাকে দেখাব, আর ছোট মাসীও হাঁ করে চেয়ে থাক্‌বে। আমি কত খাবার খাব—এখানে তার একটাও নেই। আমি এখানে আর থাক্‌ব না—তোমার কাছে আর সেই ঠাকুমার কাছে থাক্‌ব,—সেই বড় বাড়ীর ভাল ঘরে থাক্‌ব। তুমি সেখানে থাক আর ভাল-ভাল সন্দেশগুলো বুঝি একা-একা খাও? তাই আমায় নিয়ে যাওনা? না? বা রে! আমিও আজ তোমার সঙ্গে যাব।"

মাণিকের এ কথাগুলা যে তাহার দিদিমারই দিবা-রাত্রি শিক্ষার ফল, তাহাও বিনয় বুঝিতেছিল—কিন্তু উপায় কি? সন্তানকে রাখিতে তাহার তো আর অন্য আশ্রয় নাই! আর শিশু যে দিবারাত্রি তাহার শিশু-সুলভ এই অভাবের বেদনা সহ্য করিতেছে, ইহাও তো সত্য! কিন্তু উপায় কি রে—উপায় কি? তোকে চিরদিন এমনি কাঁদিতে দেখিয়াও কি সে তোকে সুখে রাখিবার জন্য পরের হাতে দিতে পারিবে! এ তো প্রাণ ধরিয়া সে পারিবে না! কোন্ বাপে তা পারিয়াছে?

তবে তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গিয়া রাখিলে হয় বটে, কিন্তু তাহাও যে প্রাণ চায় না! মাণিককে কাছে পাইলে মামীর লোলুপতা যে বাড়িয়া যায়, তাহা যে বিনয় প্রত্যক্ষ করিয়াছে। মাতুলের মৃত্যুর পর যে কয়দিন মাণিককে সে তাঁহার নিকটে দিয়া ছিল, তাহার ফল ভাল হয় নাই। মাণিককে নিকটে পাইয়াই এত শীঘ্র আবার তাঁহার সেই হীন স্নেহক্ষুধা বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই যে বিনয় মাণিককে আবার কাড়িয়া আনিয়াছে, ইহাতে তিনি যেরূপ প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার ধাক্কা সর্ব্বদাই সে অনুভব করিতেছে। আবার যদি কাছে পান্—? না, না, এ ভুল বিনয় আর কিছুতেই করিবে না। তিনি পোষ্যপুত্র লইবেন বলিয়া সর্ব্বদা ঘোষণা করিলেও এখনো তো লন্ নাই! আর লন্ যদি তো উপায়ই বা কি!

কিন্তু শীঘ্রই বিনয় মাতুলানীর নিকটে চৌধুরীদের লোকের আনা-গোনা দেখিতে পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার যত হিতার্থী বা অহিতার্থী ছিল, তাহারা একযোগে বিনয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে তার স্বরে তিরস্কার আরম্ভ করিল। এ কি তাহার স্বার্থপর স্নেহ! পুত্রকে দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন দিবার যাহার ক্ষমতা নাই, কোন্ অধিকারে সেই পিতা পুত্রের এত বড় ক্ষতি করিতে পারে? ইহার পরিবর্ত্তে সে সন্তানকে কি দিতে পারিবে?

হায়রে অভাগা পিতৃ-স্নেহ! জগতে তোমার কোন মূল্য নাই, যদি না তুমি অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হও! বিনয় স্তব্ধ হইয়া সকলের তিরস্কার শুনিয়া যাইতেছিল।

শাশুড়ী তো সেদিন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া বিনয়কে ছেলের কাছে ঘেঁষিতেই দিলেন না। বিনয় ভয়ে ভয়ে তাহার একটি শ্যালককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাণিকের আজও আবার জ্বর হইয়াছে। মিছরী এবং লজঞ্জুস না পাওয়ায় না খাইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এখন যেন বিনয় তাহার ঘুম না ভাঙ্গায়। বিনয় ম্লান মুখে ফিরিয়া গেল। আজকাল মাঝে মাঝেই সে ছেলের

কোন না কোন অসুখ লক্ষ্য করিতেছিল। অযত্নে অমনোযোগেই শিশুর স্বাস্থ্য যে এমন খারাপ হইয়াছে, তাহাও বিনয় বেশ বুঝিতেছিল।

ভাগ্য-দেবতাও এইবার যেন অত্যন্ত জেদের সহিত বিনয়ের সঙ্গে লাগিলেন। মাণিকের সেই জ্বর এবার ক্রমে গুরুতর মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে শয্যাগত করিল। মাতুল-দত্ত চেন ঘড়ি আংটী বোতাম প্রভৃতি বেচিয়া কোনরূপে সন্তানের চিকিৎসা ও ঔষধ-পথ্য চালাইয়া দুই মাস পরে যেদিন বিনয় পুত্রকে বি-জ্বর করিতে সমর্থ হইল, সেদিন সে কপর্দ্দক-শূন্য!

ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন, "বিনয় বাবু, ছেলেকে যদি এইভাবে রাখেন, তাহলে কিন্তু ছেলেকে এখনো ফিরে পাবেন না! ভাল রকম চেঞ্জের বন্দোবস্ত করুন। দার্জ্জিলিং কিম্বা শিমলের পাহাড়ের হাওয়ায় ছেলের মজ্জা থেকে এ জ্বরকে দূর করতে হবে। উপযুক্ত পথ্য, নিয়মিত ওষুধ আর ভাল হাওয়া—এ না পেলে এ-ছেলের এখনো আশা নেই, জানবেন।"

পুত্রের কঙ্কাল-সার মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনয় এইবার সহসা তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ডাকিল, "মাণিক—"

আধিক্ষীণ পুত্র চক্ষু মেলিয়া কেবল চাহিল মাত্র, উত্তর দিল না।

—"সেই বড় বাড়ীতে যাবে বাবা? সেই যেখানে তোমার কত খেলনা,—কত খাবার—?"

সেই দুর্ব্বল শিশুও সহসা একটু যেন নড়িয়া চড়িয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "যাব।"

কিছুক্ষণ থামিয়া দম লইয়া বিনয় বলিল, "আচ্ছা, ভাল হও,—তাই যেয়ো এবার।"

বালক হাত তুলিয়া বলিল, "ভাল তো হয়েছি—কবে নিয়ে যাবে?"

এই সময়ে বিনয়ের শাশুড়ী গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ওর ওপর আমারও কিছু অধিকার আছে। তুমি এমন করে ওকে কিছুতেই মারতে পাবে না, তা দেব না আমি। আমি বেহানের কাছে খবর পাঠাচ্ছি, ছেলেকে নিয়ে যেতে। যদি ওকে এখন কেউ বাঁচাতে পারে তো তিনিই পারবেন। আর যদি তুমি এবার অমত কর—"

রুগ্ন শিশু তাহার ক্ষীণ হাত দুটি তুলিয়া একটু যেন উত্তেজনা-ভরা সুরে বলিল, "দিদিমা, আমি বাবার সঙ্গে আজ সেই আমাদের বড় বাড়ীতে যাব, জান?" বলিতে বলিতে দুর্ব্বল বালক যেন হাঁপাইয়া থামিয়া গেল। বিনয় ত্রস্তে তাহার মুখে ঝিনুকে করিয়া একটু দুধ দিতে দিতে বলিল, "আর বেদানা নেই?"

"কাল থেকেই তো ফুরিয়েচে, জাননা?"

পুত্রকে একটু সুস্থ করিয়া বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মামীর কাছে আমিই যাচ্ছি।"

* * * *

ছয় মাস পরে পাহাড় হইতে বিনয় যেদিন তাহার সেই রোগ-জীর্ণ শিশুকে একটি অর্দ্ধস্ফুট পাহাড়ে গোলাপের মতই স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া লইয়া দেশে ফিরিল, তখন সকলে বিনয়ের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এ কি!"

এমন কি তাহার মামীমারও মুখ হইতে বাহির হইল, "পাহাড়ে গিয়ে লোকে সেরে আসে, দেখি, এ যে বাপু তুমি উল্টো শ্রী দেখালে, দেখচি। একেবারে পোড়া কাঠের মত শরীর হয়েছে যে। চেন্‌বার জো নেই।"

বিনয় মুখ ফিরাইয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিল, শাশুড়ী ঠাকুরাণীর একটা চাপা নিশ্বাসের শব্দ পাশ হইতে কানে গিয়া সেখানে আর তাহাকে দাঁড়াইতে দিল না।

কয়েক দিন পরেই সকলে শুনিল, জমিদার ৺নন্দকিশোর রায়ের পত্নী রাজেশ্বরী দেবী দত্তক গ্রহণ করিতেছেন। পুত্র দান করিতেছে তাঁহাদের ভাগিনেয় বিনয়কুমার চৌধুরী।

সকলে তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এ তো জানা কথা।"

৫

আত্মীয়-স্বজনের মুখ-ভারে রাজেশ্বরী দেবী ক্রমে যেন বিব্রত হইয়া পড়িতেছিলেন। সম্মুখে তাঁহার পুত্র-লাভের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, কোথায় তাহারি উদ্যোগে তিনি এক মনে নিযুক্ত হইবেন, না, অনবরত

বিনয়ের সংবাদ দিয়া আত্মীয়েরা তাঁহাকে যেন সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল। দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া সেই যে সে শয্যা লইয়াছে, আর তাহা হইতে উঠিতেই চায় না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, অসুখ,—শরীর ভাল নাই। অসুখ যে কি, তাহা অন্যে না জানিলেও রাজেশ্বরীর তা বুঝিতে বাকী নাই! তিনি তাই বিনয়ের এ-ভাবকে লক্ষ্যের মধ্যে আনিতে না চাহিয়া বরং দত্তক-গ্রহণের দিনকে আরও নিকটতর করিতেই সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছেন। এই আগত দিনের চিন্তাটা অতীতে গিয়া পড়িলে বিনয় যে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিবে, এ বিষয়ে তো তাঁহার মতদ্বৈধ ছিল না। সংসারের অভিজ্ঞতায় চুল পাকাইয়া এটুকু তিনি ভালরূপেই জানিতেন যে "পড়বে পড়বে বড় ভয়,প'ড়ে গেলে সকলি সয়।" নির্ব্বোধ বিনয় যদি এ ব্যাপারকে নিজের সর্ব্বনাশ বলিয়াই মনে করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়া গেলে আর তো তাহার এতখানি তীব্রতা থাকিবে না। সম্মুখের আগত দিনকে সে এখন যেমন বিভীষিকার মত দেখিতেছে, সে দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে তাহার অতীত স্মৃতি যে এতখানি যন্ত্রণাদায়ক হইবে না, ইহা রাজেশ্বরী ভাল করিয়াই জানেন। তখন বিনয় নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট ভাবে আবার এই সংসারেই হয়ত পূর্ব্বের মত ক্রমে হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইবে। দত্তক-দানের সর্ত্তে কর্ত্তা তাহাকে এ সংসারের কতকটা মালিক করিয়াই রাখিয়া গিয়াছেন, হয়ত ইহার পর সে রাজেশ্বরীর সঙ্গে নিজের অধিকার-সর্ত্তেই কত গণ্ডগোল, কত বাক্‌বিতণ্ডা বাধাইয়া তুলিবে। রাজেশ্বরীর মত কর্ত্তার নাবালক পুত্রের এবং তাহার সম্পত্তির বিনয়ও যে একজন ট্রাষ্টি হইয়া থাকিবে, ইহা কর্ত্তা তো স্বাক্ষরেই লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে রাজেশ্বরীরও কোন আপত্তি নাই। পরে যাহাই ঘটুক আপাততঃ মাণিককে পাইলেই তাঁহার এখনকার মত শেষ পাওয়া হইয়া যাইবে। সেই কুসুম-পেলব দেহখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মাথা-ভরা কালো চুলের গোছার মধ্যে মুখ-নাক ডুবাইয়া তাহার ঘ্রাণ লইতে লইতে তিনি এ ধন যে এখন তাঁহারই নিজস্ব, এই কথা ভাবিতে পারিলেই কৃতার্থ হইয়া যান্! বিনয়ের যে আর মাণিককে তাঁহার ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইবার অধিকার থাকিবে না, বরং তাঁহারই ধনে বিনয় যে এখন উঞ্ছবৃত্তি ভিখারী হইয়া থাকিবে, এই চিন্তাতেই তিনি অন্তরে পরম তৃপ্ত হইয়া উঠিতেছেন এবং সেই দিনটি যে কত দিনে নিকটতম হইয়া দাঁড়াইবে, এই আশায় দিন গণিতেছিলেন! কিন্তু বিনয় যে এ সুখ-চিন্তাটুকু হইতেও সময়ে সময়ে তাঁহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে! চিরকালই কি তাহার এই সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি চলিবে? সংসারে স্ত্রীই কি কাহারো মরে না, না, ছেলেকেও কেহ কখনো দত্তক দেয় নাই? সেই ছেলের সম্পত্তিতেই যে কত লোক আধা মালিক হইয়া দিন কাটায়! সংসারের এ নীতি বিনয়ের আজ মনে না পড়িলেও সংসারের অন্যান্য লোকগুলারও কি তাহা জানা নাই? তাই তাহারা অনবরত বিনয় এমনি করিয়া আছে, বিনয় অমন করিতেছে, বিনয়ের এই হইল ইত্যাদি শব্দে তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিতেছে। কেনরে বাপু, এত কেন! কত বড় বড় সর্ব্বনাশের পরও মানুষ দিন কতক বাদে আবার যা তাই-ই কি হইয়া দাঁড়ায় না? এই বিনয়েরই, ইহার পরে, না হয় কিছু বেশী দিন পরেই, যা হইবার কথা, তা কি জগতের লোক জানে না? এরূপ ব্যাপার কি তাহাদের চক্ষে অহরহই ঘটিতেছে না? তবে তাহাদের এত ন্যাকামি কেন! তাহারা যেন রাজেশ্বরীকে বলিতে চায়, এমন পোষ্যপুত্র না-ই লইতে! যথার্থ যে বংশ-ধর, তাহাকে এমনি করিয়া প্রাণে মারিয়া তাহার সর্ব্বস্ব ধন কাড়িয়া লওয়া—এটা কি উচিত!

উচিত যদি নয়ই, তবে এ ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে কেন! সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে এমন নিয়ম চলিয়া আসিতেছেই বা কিজন্য? ভগবান যাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সদয় মানুষ সদয় জগৎ তাহারো জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়াছে। মানুষেরই দয়ায় সে চিরকাল শূন্য বুকে শূন্য জগতে থাকিবে না, তাহারো আপনার বলিয়া জানিবার, বুকে-কোলে লইবার ধন জগৎ তাহাকে দান করিবে। ভগবানের চেয়ে দয়ালু এই মানুষ, এই

জগৎ এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াও কেন আজ তবে রাজেশ্বরীকে এত কথা শুনায়! সংসার যদি এখন দস্তাপহারী হইতে চায়, রাজেশ্বরীও আর তাহার মুখের দিকে চাহিবে না, তাহার ধিক্কার গ্রাহ্য করিবে না। কেন তবে তাহারা মানুষকে এমন ব্যবস্থা দান করিয়াছিল? এখন অন্য কথা কে শুনিবে!

কেহ তো রাজেশ্বরীকে বলিতে পারিতেছিল না যে, ওগো, সে ব্যবস্থা সব জায়গাতেই জগৎ চালায় নাই। যে অনিচ্ছুক, যাহার এ অবস্থায় সর্ব্বনাশই হইয়া যাইবে, সেখানে এত রকমের জাল বিস্তার করিয়া এমন করিয়া তাহার ধন কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থা মানুষ দেয় নাই। তুমি বিনয়ের দৈন্যের সুযোগে কত আট-ঘাট বাঁধিয়া তাহাকে এই জালে ফেলিয়াছ, তাহা মনে কর! ভগবানও বুঝি তোমার দলে,—নহিলে মাণিকের অমন ব্যারামই বা কেন হইবে! তা না হইলে আজ বিনয় কি মাণিককে পর করিতে রাজী হইত? তুমি মাত্র নিজের লোভে, মাত্র মাণিককেই পাইবার ইচ্ছায় এই কাণ্ড বাধাও নাই কি? বংশ ও নাম রক্ষা কিম্বা নিজের ছেলে ও বৌ সাজাইয়া একটা সংসার পাতিবার লোভে মাত্র তো এ কাজ কর নাই! তা যদি হইত তো চৌধুরীদের যাচিয়া-দেওয়া ছেলে কেন ত্যাগ করিলে? আর সে সবও তো বিনয়কে ফাঁদে ফেলিবার জাল রচনা মাত্র। মাণিক বড় হওয়ার পর - তাহার ননীর পুত্তলির মত রূপই কি তোমায় এই পোষ্যপুত্র লওয়ার চেষ্টায় নূতন করিয়া উত্তেজিত করিয়া তোলে নাই? সংসারকে দোষ দিয়ো না, তোমার অদম্য তৃষ্ণাই এখানে একমাত্র অপরাধী। বিনয়ের এখনো বিবাহ করিবার আশা আছে, সন্তান হইবার বয়স আছে, তাই,—নহিলে একমাত্র সন্তানকে যে দান করিবার বা লইবার অধিকার কাহারো নাই। জোর করিয়া বা এমন বাধ্য করিয়া লইলে হয়ত সেই জগৎ ঘাড় নাড়িতে পারে! শাস্ত্রে হয়তো এমন স্বার্থ-ময় কাণ্ড করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। পোষ্যপুত্র লওয়া অর্থে নিজের বুভুক্ষু অন্তরকে মাত্র তৃপ্ত করা নয়, তাহার অন্য উদ্দেশ্যও আছে।

কেহ না বলিলেও রাজেশ্বরীর অন্তরেও যে এই কথা গুলা উঠিতেছিল না, এমন নয়—কিন্তু তিনি সেগুলাকে সবলে ঠেলিয়া দিয়া মনকে জোর করিতেছিলেন, আমি তো জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছি না, বিনয় নিজে স্বীকার করিয়াছে। তবে লোকে আমার দোষী করিবে কেন! বিনয় সন্তানকে না দিলে তিনি যে পোষ্যপুত্রই লইতে পারিবেন না, এ কথা অন্য কেহ না জানিলেও তাঁহার তো মনে আছে। স্বামীর চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহার সে শপথ, আজও অন্তরে তাহা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া বাজিতেছে, তথাপি অনুপায়ে পড়িয়া সেই পুত্রেরই জীবন-রক্ষার জন্য বিনয় যে একবার স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে, সে-স্বীকার তিনি আর বিনয়কে কিছুতেই তো ফিরাইয়া দিতে পারিবেন না। কত কাণ্ডের পর ভাগ্যের সহায়তাতেই এ সুযোগ তিনি পাইয়াছেন! আর কি তাহা হস্তচ্যুত করিতে পারেন! ইহাতে যে-ই যাহা বলুক, বিনয় যাহাই করুক, তাহা তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত, এবং তাঁহার বিশ্বাস, বিনয়ের এ ভাবও বেশীদিন স্থায়ী হইবে না। এ দুদিনের সংঘাত সহ্য করিলে যদি তাঁহার চিরদিনের দৈন্য ঘোচে, কেন তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন।

•

পুরোহিতের ফর্দ্দ-শ্রবণান্তে তাহার বিপুল সম্ভারের আভাষ পাইয়াও যখন তিনি হাস্যমুখে কর্ম্মচারীকে যেন সমস্ত দ্রব্য পুরোহিত মহাশয়ের মনোমত হয় এইরূপ আদেশ দিতেছেন, এমন সময় একজন আত্মীয়া আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে বিনয় কাল হইতে জলস্পর্শও করিতেছে না, এবং এত দুর্ব্বল যে কথা কহিতে পর্য্যন্ত তাহার সামর্থ্যে কুলাইতেছে না! শেষে কি একটা অত্যাহিত ঘটিয়া বসিবে? ডাক্তার আনিয়াই না হয় দেখানো হউক! বিনয়ের যদি গুরুতর ব্যারামই হয়, কিম্বা কিছু একটা 'ভাল-মন্দ' কাণ্ডই যদি সে ঘটাইয়া বসে, তাহা হইলে এই আগত গুরুকার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে, গৃহিণী তাহা কি একবার ভাবিতেছেন না! এই বেলা যাহা হয় তিনি করুন, অবহেলা করিলে হয়তো বিভ্রাটই ঘটিবে।

পাংশুমুখে রাজেশ্বরী গৃহ-মধ্য হইতে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন এবং একজনকে আদেশ দিলেন,—শীঘ্র গাড়ী

সাজাইতে বল, আমি বেহানের নিকট যাইব। কে একজন বলিল, বিনয়ের কাণ্ড লোকের মুখে শুনিয়া তিনি নিজেই আজ আসিয়াছেন। এতক্ষণ তিনি জামাতাকে নানাপ্রকারে যাহা প্রবোধ দিতেছিলেন, সে তাহা শুনিয়াই আসিতেছে।

গৃহিণী ইঙ্গিতে বলিলেন, "তাঁকে আমার কাছে ডাক্।"

রাজেশ্বরী বেহানের দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "বেয়ান, বিনয় আমার ওপর 'হত্যে' দেবার উয্যুগ করেছে, আমায় সে এমনি করে জব্দ করবে। তার যখন এতই আপত্তি, এতই প্রাণান্ত পণ—মাণিককে আমায় দিতে তার এততেও যখন মন হচ্ছেনা, তখন থাক্, আমি আর চাই না। ছেলে তারই থাক্, যেমন আছে, তাই থাক্! কর্ত্তা এইজন্তেই এত আপত্তি করেছিলেন, আমি না বুঝে—যাক্, আমি চাইনা। আমায় ভগবান যেমন রেখেছেন, তাই আমি—"

গৃহিণীর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের কথা সব শেষ না হইতেই মাণিকের দিদিমা সজোরে বাধা দিয়া উঠিলেন, "বেয়ান্, বিনয়ের সঙ্গে তুমিও ক্ষেপো না। কেন ভাবচ, দুদিনে আবার যেমন তেমনি হয়ে যাবে। বিনয়কে এখনি বুঝিয়ে খাইয়ে রেখে তবে আমি আস্‌ছি। সে দেখো আর অবুঝ-পনা করবে না, তুমিও আর ভেবো না। শুভকার্য্য ঐ শুভদিনেই শেষ কর।"

গৃহিণী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "কি বুঝুলে?"

"যা ভগবানই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সবারই কপালে কি সব জিনিষ সয়! বিশেষ ছেলের মত ধন! মাণিককে কি আমরা ফিরে পেতাম যদি বিনয় মনে মনে তখনি তাকে অন্যকে দান করে না দিত! আপনার না বাঁচ্‌লে আঁতুড়েই যে তাকে পরের করে দিতে হয়, তবে যে সে ছেলে বাঁচে। বিনয় তো সেই রোগা ছেলেকেই মনে মনে পরের ছেলে করে দিয়ে তবে বাঁচাতে পেরেছে, তাকি তার মনে নেই? এখন আর তবে এ পাগলামো কেন! জোর করে এখন আপনার বলে রাখ্‌তে গেলে যদি ভগবান তা না রাখ্‌তে দেন! তখন? এই সব বলতেই বিনয় চম্‌কে চম্‌কে উঠতে লাগ্‌লো, মেয়ে-মানুষের মত সাতবার যাট্ যাট করে উঠ্‌তে লাগলো। আমি তাতেও না ভুলে তাকে ভুলিয়ে খাইয়ে রেখে তবে আস্‌চি। তুমিও এখন আর পাগলের সঙ্গে পাগলামি করো না। আর তো মাঝে তিনটে দিন মাত্র বাকি আছে—শুভকাজটা হয়ে গেলে বাঁচি।"

"তবে বেয়ান্ তুমি আর এ ক'দিন এখান থেকে যেয়ো না। বিনয় যদি আবার অবুঝ-পনা করে, কে তাকে আবার বুঝোবে! আমার তো তার সাম্‌নে যেতেও ভয় করে, আমায় দেখলেই সে চোখ্ বোজে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে বেয়ান্। আমার মা-হারা মাণিককে তার মায়ের কোলে তুলে দিয়ে মহীশ্বর করে দিয়েই আমি বাড়ী ফিরে যাবো। তবে বেয়ান—"

"সে কি বেয়ান্, যাবে কি! তুমি মাণিকের কাছে না থাক্‌লে তার মামাদের মাসীদের সঙ্গ না পেলে মাণিক কি ভাল থাক্‌বে! দার্জ্জিলিং থেকে ফিরেই তো সে মামা-মামা মাসি-মাসি কর্‌ছে। তোমায় এখন এইখানেই থাক্‌তে হবে, তা জেনো। আমিও যেমন, তুমিও তেমনি তো।"

মাথা হেঁট করিয়া মাণিকের দিদিমা বলিলেন, "বিনয়ের কথা বল্‌ছি বেয়ান, মাণিক আমার রাজা হবে, কিন্তু ও হতভাগা যে বিয়ে-থাওয়া করলে না—"

"আমি তো কনে ঠিক্ করেই রেখেচি। আমার ভাইঝী, দেখে আস্‌বে—? এই কাছেই! কেমন সুন্দরী! ডাগরও হয়েচে। বিনয়ের তো কিছুরি অভাব হবে না, সবই তো ওরই হাতে থাক্‌বে। আলাদা হতে চায়, তাও তো কর্ত্তা সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। বিনয়ের জন্যে তিনি যে অনেকই ভেবেছিলেন।"

বিনয়ের শাশুড়ী তথাপি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তুমিও একটু একটু ভেবো বেয়ান। আর বেশী কি বল্‌ব! মাণিককে নিয়ে তুমি মনের আনন্দে দিন কাটাও, রাজ-মাতা হও, কিন্তু বিনয়ের কথাটাও মনে রেখো।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী।

স্বরলিপি

সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
বিজন ভুঁয়ে
মেঠো ফুলের পাশাপাশি,
শুনেছিলেম তারাব বাঁশি।
যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি
স্বপ্নে-শোনা সে সুর এ কি
মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি।
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
আকাশ থেকে ভেসে-আসা,
এ যে মাটির কোলে মাণিক-খসা হাসিরাশি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সা II সা সা- মা। র্মা -া -া I দপা -ণা ণদা। -পা মজ্ঞা রা I মজ্ঞা -া -া।
সা রা নি ০ শি ০ ০ ছি ০ লে ম শু০ ০ য়ে

। -া -মা -পা I জ্ঞরা -মা জ্ঞা। -া জ্ঞঋা -া I সা -া -জ্ঞা। জ্ঞরা জ্ঞা -া I { জ্ঞরা -া
০ ০ ০ বি ০ জ ন ভুঁ ০ য়ে ০ ০ আ মার্ ০ মে ০

জ্ঞা। -া জ্ঞরা -া I মজ্ঞা -া -া। -া -া -ঋা I সা -া সা। -জ্ঞা ঋা -া I সা -া -জ্ঞা।
ঠো ০ ফু ০ লে ০ ০ ০ ০ র্ পা ০ শা ০ পা ০ শি ০ ০

। জ্ঞরা জ্ঞা -া } I -া। সা সা -া I -া -া সা। সা সা -া I সদা -া -া। -মপা -া -া I
আ মা র ০ য থ ন্ ০ ০ শু নে ছি ০ লে ০ ০ ০ ০ ম্

I পা -া -দা। পা -া -ণা I ণপণা -দা -পা। মজ্ঞা -া -া I -মা -া -া। -া -া ঋা II
তা ০ ০ রা ০ র্ বাঁ ০ ০ শি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সা

মা মা II মা -া ণদা। -া ণা -া I র্সা -া সর্ঋা। -া র্সা -া I না -া -া। র্সা -া -া
যথন স ০ কা ল্ বে ০ লা ০ খুঁ ০ জে ০ দে ০ ০ খি ০ ০

I র্সা -র্জ্ঞা জ্ঞা। -া জ্ঞর্রা -া। I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা। -র্রা র্জ্ঞা র্রা I র্জ্ঞা -া র্রা। মর্জ্ঞা
স্ব ০ প্নে ০ শো ০ না ০ সে ০ সু র্ এ ০ ০ কি

-া -া I -া -া -া। জ্ঞর্ঋা সা -া I সণা -া ণা। -জ্ঞা জ্ঞঋা -া I র্সা -া -া। -া -া -ণা I
০ ০ ০ ০ ০ আ মা র ০ মে ০ ঠো ০ ফু ০ লে ০ ০ ০ ০ র্

I দা -া ণদা। -া দা -া I দর্সা -া -া। -া -া -ণা I ণদা -া পা। -ণা দ্মা -া I পা -া -া।
চো ॰ খে র্ জ ॰ লে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ উ ॰ ঠে ॰ ভা ॰ সি ॰ ॰

। র্সা -া -ণা I ণদা -া দপা। -ণা ণদা -া I পা -া -া। -া -া সা II
সু ॰ র্ উ ॰ ঠে ভা ॰ সি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ সা

-া -া II র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা। -া র্জ্ঞর্ঋা -া I র্সা -া -া। -া -া -া I র্সণা -া পা। -ণা -দা
॰ ॰ এ ॰ সু র্ আ ॰ মি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ খুঁ ॰ জে ॰ ছি

-া I পা -া -া। -া -া দা I দমা -া ণদা। -া ণা -া I র্সা -া -া। সা সা -জ্ঞা I জ্ঞরা
॰ লে ॰ ॰ ॰ ॰ ম্ রা ॰ জা র ঘ ॰ রে ॰ ॰ শে ষে ॰ ধ

-া জ্ঞা। -া রা -া I জ্ঞা -রা জ্ঞা। রা জ্ঞা -া I জ্ঞমা -া মজ্ঞা। -া জ্ঞঋা -া I সা -া -া।
॰ রা ॰ দি ॰ ল ॰ ধ ॰ রা র্ ধূ ॰ লি র্ প ॰ রে ॰ ॰

। পা পা -া I পমা -া ণদা। -া ণা -া I র্সা -া র্সঋা। -া র্সা -া I র্সনা -া -া। র্সা -া
এ যে ॰ ঘা ॰ সে র কো ॰ লে ॰ আ ॰ লোর ॰ ভা ॰ ॰ ষা ॰

-দা I দা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। -া র্রা -া I র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা। -র্রা র্জ্ঞা -র্রা I র্জ্ঞা -া -র্রা I মর্জ্ঞা -া -া।
॰ আ ॰ কা শ্ ৎ ॰ তে ॰ ভে ॰ সে ॰ আ ॰ ॰ সা ॰ ॰

I -া -া -া। র্ঋা র্সা র্ঋা I সণা -া র্জ্ঞা। -া র্জ্ঞর্ঋা -া I র্সা -া র্ঋা। -া সা -া I
॰ ॰ ॰ এ যে ॰ মা ॰ টি র্ কো ॰ লে ॰ মা ॰ ণি ক্

সণা -া -া। দা -া -া I দা -পা দা। পা দা -া I দর্সা -া -া। -া -া সা II II
থ ॰ ॰ সা ॰ ॰ হা ॰ সি ॰ রা ॰ শি ॰ ॰ ॰ ॰ সা

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন

সেক্সপিয়র-উৎসব

কলিকাতায় "প্রাচ্য-কলা-পরিষদে"র গৃহে সেদিন "সেক্সপিয়র-উৎসবে"র অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সেক্সপিয়র এখন খালি বিলাতের মহাকবি নন, তিনি সারা বিশ্বের মহাকবি ;—এখন তিনি জাতিতে খালি ইংরেজ নন, তিনি সর্ব্ব-জাতীয় ;—তিনি খালি ইংলণ্ডবাসীর মনের ছবি আঁকেন নি, তিনি নিখিল মানবের হৃদয়-বাতায়নের মধ্যে সতর্ক দৃষ্টিপাত করেছেন।

এই উৎসবের ক্ষেত্র তাই আজ আর কেবল শ্বেতদ্বীপের একপ্রান্তে আবদ্ধ নয় ; এই দিনে সারা পৃথিবী ব্যেপে মহোৎসবের আয়োজন হয়—ফ্রান্সে, জার্ম্মেনীতে, অষ্ট্রীয়ায়, ইতালীতে, ডেনমার্কে, নরওয়েতে—এমন-কি আমেরিকায় পর্য্যন্ত—সেক্সপিয়রের যুগে যে নব-আবিষ্কৃত দেশের নাম খুব কম লোকেই শুনেছে। সুতরাং এমন এক স্মরণীয় দিনে প্রাচ্যের আধুনিক সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিঠস্থান বঙ্গদেশ কেনই বা সেক্সিপিয়রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কৃপণতা প্রকাশ করবে ?
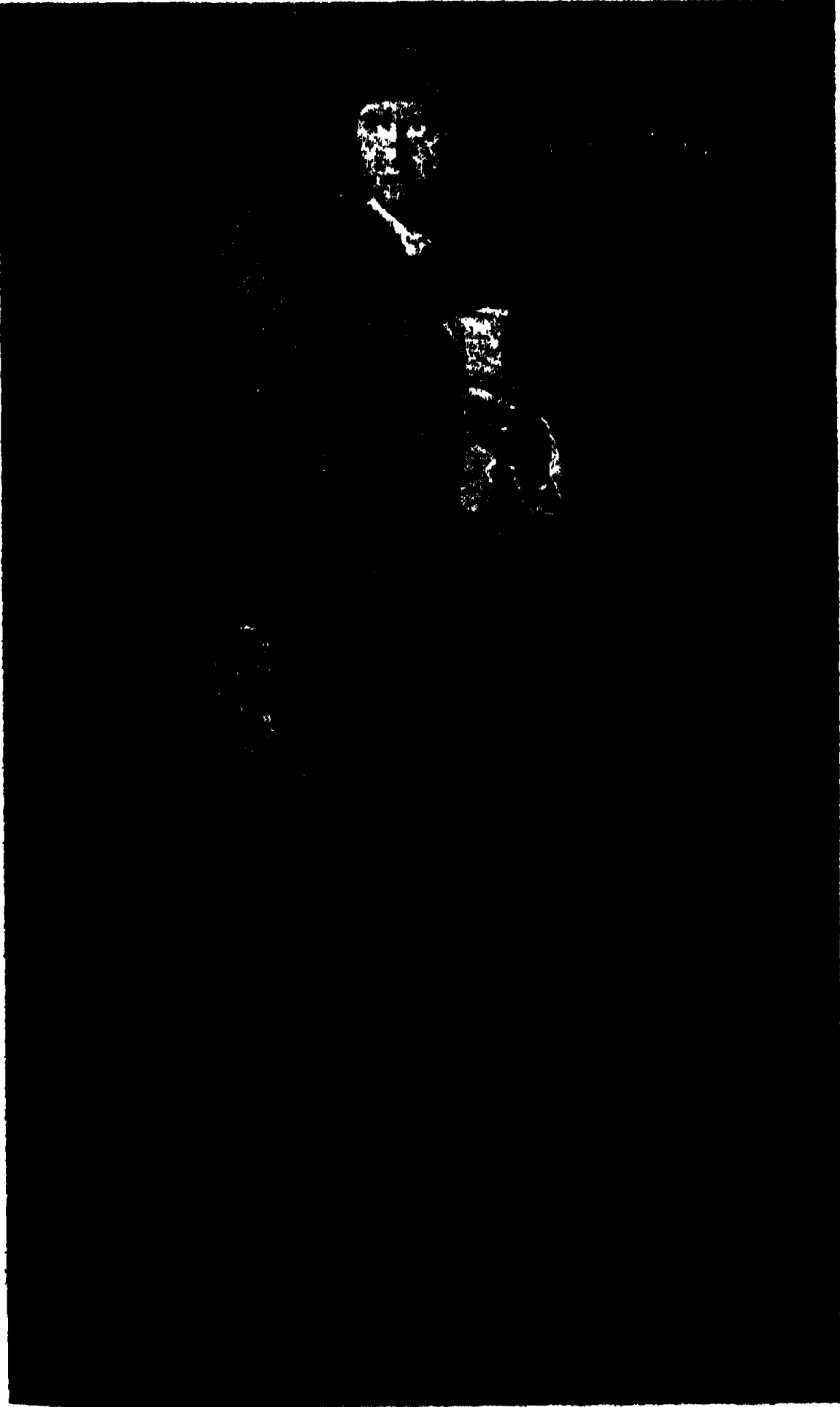
ওফেলিয়ার ভূমিকায় মিস্ গার্টউড ইলিয়ট

স্যার হার্ব্বাট ট্রি কার্ডিনাল উলসির ভূমিকায়

মিস্ এলেন টেরি ও স্যার হেন্‌রি আর্ভিং

প্রতি বৎসরেই মহাকবির জন্মস্থান ষ্ট্রাটফোর্ডে বিপুল উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার সাহিত্য-রসিক নর-নারী এই উৎসব-ক্ষেত্রে গিয়ে যোগ দিয়ে থাকে এবং অমর মহাকবির উদ্দেশে অন্তরের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে। সেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলী থেকে নানারকম উপভোগের ব্যবস্থা হয়,—কেউ নাচেন, কেউ গায়েন, কেউ অভিনয় করেন, কেউ আবৃত্তি শোনান এবং কেউ বা সরস ভাষায় তাঁর সুবিচিত্র সৌন্দর্য্য-রসের পরিচয় দেন। বিলাতের পুরাতন ও নূতন যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী সেক্সপিয়রের নাটকে ভূমিকা নিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন, রঙ্গমঞ্চের উপরে এই দিনে তাঁদেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এম্‌নি নানা ভাবের মধ্য দিয়ে উৎসব-ক্ষেত্রের সমারোহে, সকলেরই হৃদয়ের মাঝে যেন সেক্সপিয়রের অমর আত্মা নূতন রসের আবেগে পরিপূর্ণ মহিমায় জাগ্রত হয়ে ওঠে!

ষ্ট্রাটফোর্ডে সেক্সপিয়রের নাটকাদি অভিনয়ের জন্যে "মেমোরিয়াল থিয়েটার" নামে একটি রঙ্গালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবের সময় সেখানে বিলাতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, গায়ক, বাদক, নর্ত্তক ও সাহিত্য-বিশেষজ্ঞগণ দর্শক ও শ্রোতার চিত্ত-বিনোদন ক'রে থাকেন। এখানে মিসেস কারমাইকেল ষ্টোপস্ পুরাতন কাগজ-পত্র থেকে সেক্সপিয়র সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার ক'রে যে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিয়েছেন, আমরা তার কতক কতক তুলে দিলুম।

যোল শতাব্দীতে জেম্‌স্ ও রিচার্ড বার্ব্বেজ নামে ইংলণ্ডে
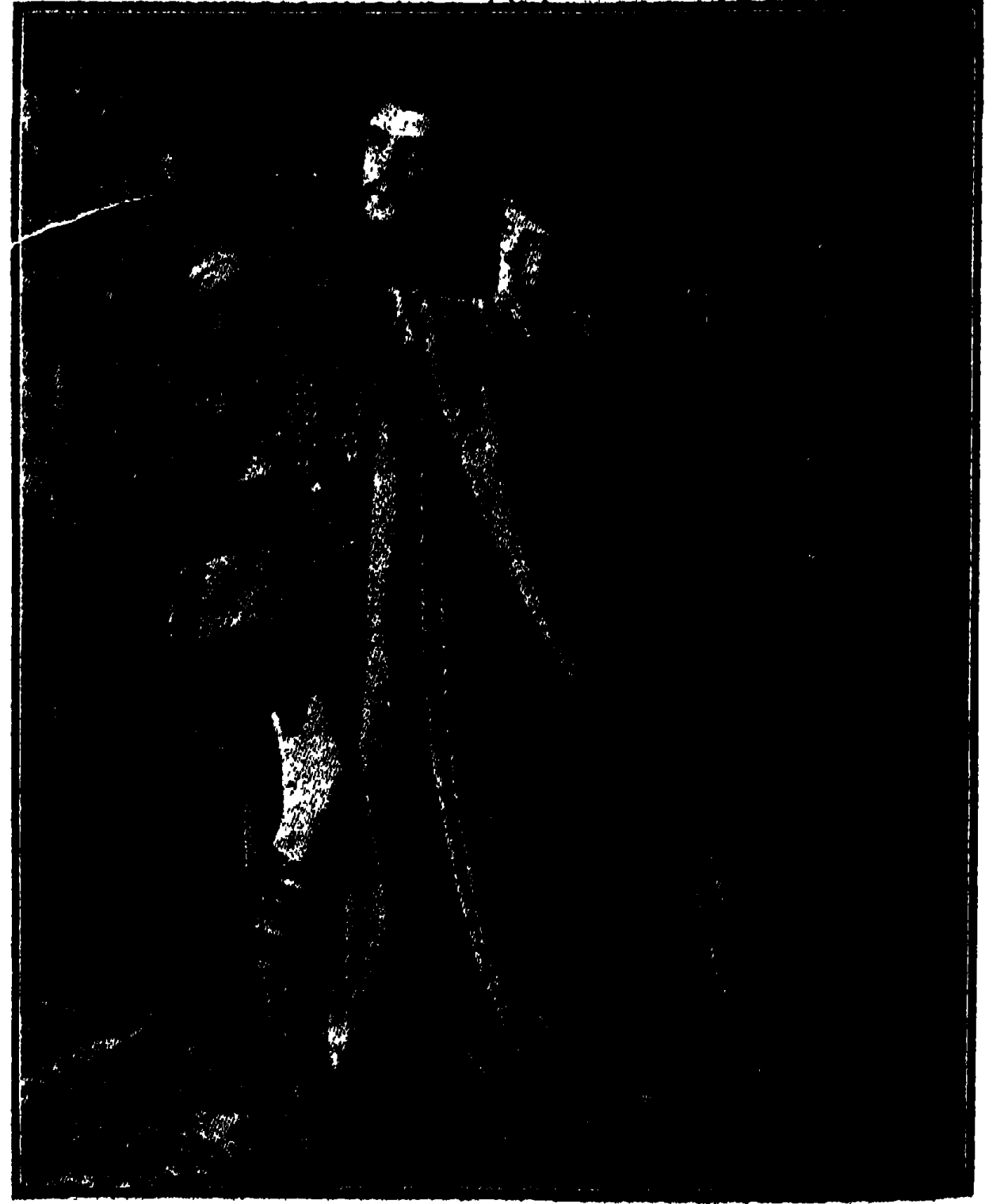
মিঃ ম্যাথেসন ল্যাং ও মিস হাটিন ব্রিটন
(ম্যাক্‌বেথ নাটকে)

"পঞ্চম হেনরি"র ভূমিকায়
স্যর এফ, আর, বেনসন

দুজন লোক ছিলেন। জেম্‌স্ পিতা, রিচার্ড পুত্র। সেক্সপিয়রের প্রতিভা-বিকাশের পক্ষে এঁরা দুজনে যে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। কবির জীবন-কাহিনীতে পড়া যায়, তিনি একদল ভ্রমণশীল অভিনেতার সঙ্গে স্বগ্রাম ত্যাগ করেন। খুব সম্ভব তিনি জেম্‌স্ বার্বেজেরই সহযাত্রী হন।

জেম্‌স্ বার্বেজ একদল অভিনেতার নায়ক ছিলেন—তারা "আর্ল অফ লিসেষ্টারের দল" ব'লে বিখ্যাত। ১৫৭৪

হ্যামলেটের ভূমিকায় মিঃ ফর্ব্‌স্‌ রবার্টসন
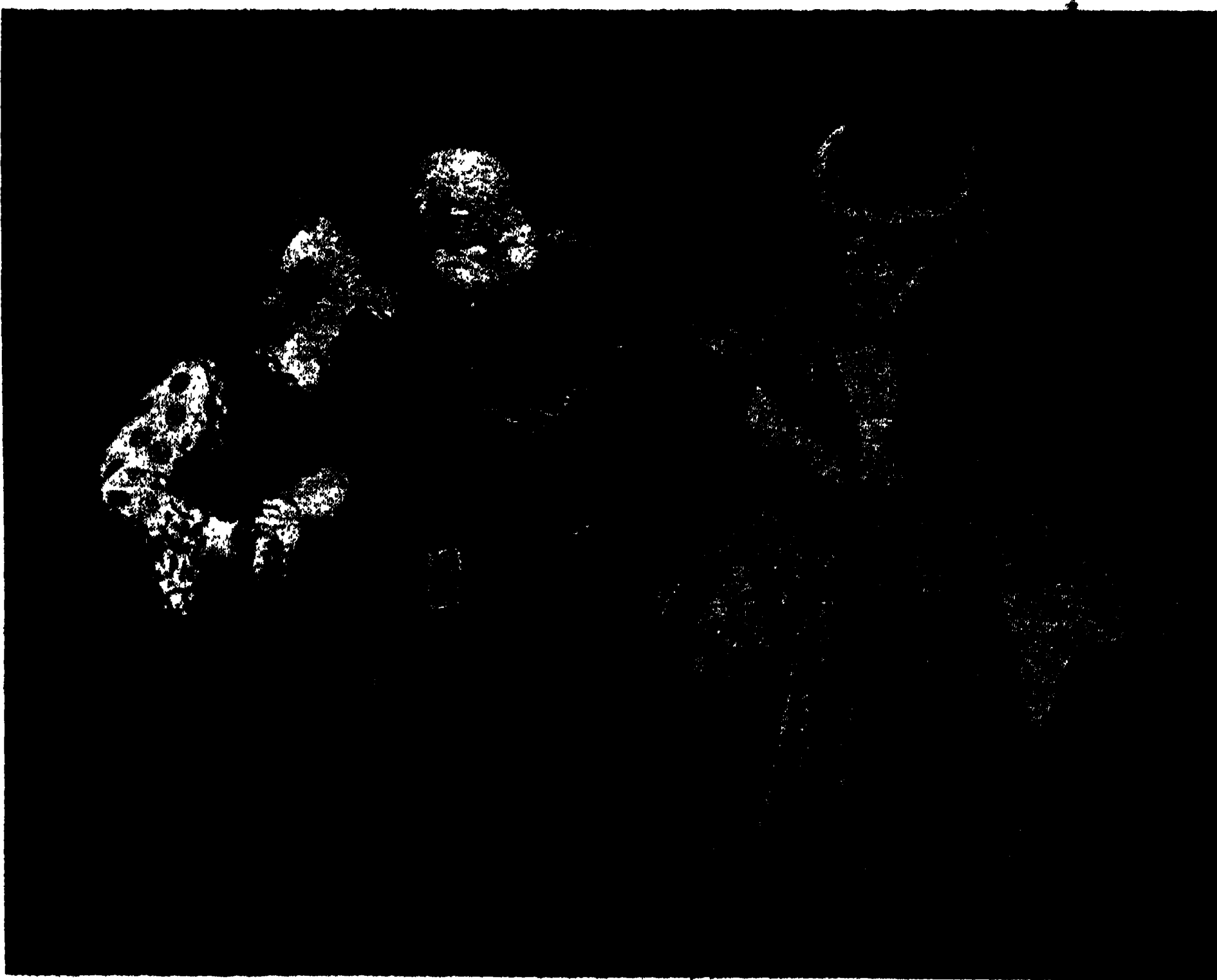
"দি মেরি ওয়াইভ্‌স্‌ অফ্‌ উইণ্ডসরে" স্যর হার্বার্ট ট্রি, এলেন টেরি ও মিসেস কেণ্ডাল

হ্যামলেটের ভূমিকায় স্যর হেনরি আর্ভিং

খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর দলকে নিয়ে সারা ইংলণ্ডে অভিনয় করবার ক্ষমতা পান। সেক্সপিয়রের বয়স তখন বত্রিশ বৎসর এবং তিনি তখন লণ্ডনে থেকে যশের পথে অল্প-বিস্তর পদার্পণও করেছেন।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্ বার্বেজ লণ্ডন সহরে একটি স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপন করেন। তার নাম "থিয়েটার"। এইটিই বিলাতের প্রথম স্থায়ী রঙ্গালয়। কিন্তু সে সময়ে বিলাতী সমাজ রঙ্গালয়ের উপরে খড়্গহস্ত ছিল। তাই বাইশ বৎসর পরেই নীতিবাগীশদের শত্রুতার ফলে "থিয়েটার" উঠে যায়,—এমন-কি রঙ্গালয়ের বাড়ীখানা পর্য্যন্ত ভূমিসাৎ করতে হয়। অভিনেতারা সহরের বাইরে গিয়ে "থিয়েটারে"র মাল-মশলা নিয়ে "গ্লোব থিয়েটার" নামে এক নূতন রঙ্গালয় স্থাপন করেন।

এই সময়ে জেম্‌স্ বার্বেজ মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর পুত্র রিচার্ড তখন সে-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা ব'লে নাম কিনেছেন। মহাকবির নাটক হ্যামলেটের ভূমিকায় তিনিই

"দি টেমিং অফ দি শ্রু" নাটকে মিঃ ম্যাথেসন ল্যাং ও হাটিন ব্রিটন

প্রথম অভিনেতা। সেক্সপিয়র হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রিচার্ড বার্ব্বেজের দ্বারা সেক্সপিয়রের আরো অনেক নাটকের প্রধান প্রধান ভূমিকা অভিনীত হয়েছিল। অভিনেতাদের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব অনুসারেই সেক্সপিয়র তখন নাটক রচনা করতেন ব'লে অনুমান হয়।

রিচার্ড বার্ব্বেজ ও সেক্সপিয়র যে পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাতেও আর সন্দেহ নেই। এ বন্ধুত্ব মহাকবির মৃত্যু পর্য্যন্ত অটুট ছিল। কারণ সেক্সপিয়র মৃত্যুকালে যে উইল ক'রে যান তাতে লেখা আছে, রিচার্ড বার্ব্বেজ ও আরো দুইজন সঙ্গী-অভিনেতাকে যেন কুড়িটাকা দান করা হয়। এই টাকায় তাঁরা আংটি কিনে স্মৃতিচিহ্নরূপে ধারণ করবেন! রিচার্ড বার্ব্বেজ যে ওথেলো আর কিং-লিয়রের ভূমিকাও গ্রহণ করেছিলেন, তারও প্রমাণ আছে।

সেক্সপিয়র-উৎসবে যে-সকল বিখ্যাত অভিনেতা ও

গুমিয়োর ভূমিকায় মিঃ হ্যারি কেন

অভিনেত্রী যোগ দিয়ে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, আমরা এখানে তাঁদের জন-কয়েকের ছবি দিলুম। এই সঙ্গে বর্ত্তমান যুগে বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা পরলোকগত স্যার হেনরি আর্ভিং (১৮৩৮-১৯০৫) প্রভৃতিরও ছবি দেওয়া গেল।

——

বীরত্ব-সূচক ভাস্কর্য্য

Antoine Bourdelle একজন ফরাসী ভাস্কর। এ কালের শিল্পী-সমাজে তাঁর অসাধারণ খ্যাতি। অনেকের মতে, পরলোকগত ভাস্কর ওগস্ত রোদাঁর অভাব তাঁর দ্বারা পূর্ণ হয়েছে।

ভাস্কর্য্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, প্রাচীন যুগের শিল্পীরা পাথরের পটের উপরে মানুষের দেহ-সৌন্দর্য্যকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করতেন, একালের শিল্পীরা তা আর করতে চান না। রোদাঁ ও মেস্ট্রোভিক প্রভৃতি ভাস্করর৷ দেহকে অনেক স্থলে

মিঃ অস্কার অ্যাস্ ওথেলোর ভূমিকায়

বিকৃত ক'রেও আত্মার রহস্যকে প্রকাশ করতে চেষ্টা পেয়েছেন। Bourdelleও শেষোক্ত শ্রেণীর ভাস্কর। অনেকস্থলে দেহকে তিনি কেবল ততটুকু গ্রহণ করেছেন, যতটুকুতে তা ভাব-প্রকাশের Symbol রূপে মাত্র ব্যবহৃত হ'তে পারে।

তাঁর ঠাকুরদাদা ছিলেন চাষা আর বাপ করতেন কাঠের উপরে খোদাই। এঁদের কাছ থেকে তিনি যে পরিপূর্ণ সবলতা ও মধুর সরলতার উত্তরাধিকারী হয়েছেন, তাঁর হাতের কাজে সর্ব্বত্র তা ফুটে উঠেছে।

Bourdelleএর রচনা-ভঙ্গি কখনো এক সীমার মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে থাকে নি—জীবনের গতি-বৈচিত্র্যে ক্রমাগতই তা পরিবর্ত্তিত হয়ে এসেছে। প্রথম প্রথম তাঁর গড়া মূর্ত্তিগুলিতে গ্রীক আদর্শের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যেত। কিন্তু আজকাল ফ্রান্সের প্রাচীন গির্জ্জা-গুলির গাত্রে-

খৃষ্ট-জননী
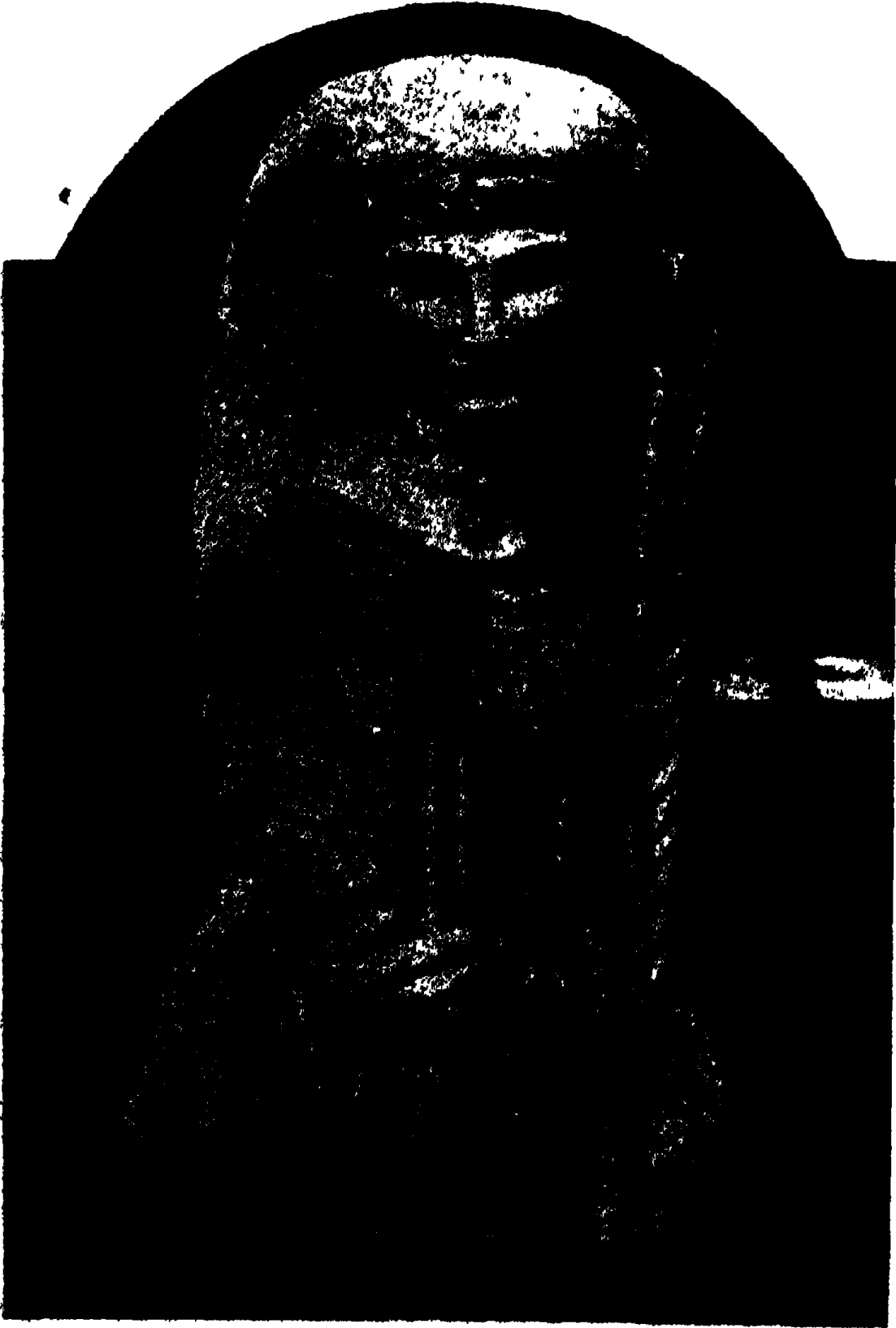
ক্ষোদিত গোথিক মূর্ত্তি-শিল্পের দিকে তাঁর ঝোঁক ক্রমেই বেড়ে উঠ্ছে। তাঁর গড়া "খৃষ্ট-জননী" দেখলে বোঝা যায়, পঞ্চদশ শতাব্দীর ফরাসী ভাস্করদের প্রভাব তাঁর উপরে কতটা মাত্রায় পড়েছে। তাঁর জোয়ান অফ আর্কও মধ্য-যুগের ভাস্কর্য্য-প্রভাবে গঠিত হয়েছে।

ভাস্কর্য্যে রূপক

একালের মধ্যে তাঁর সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাগুরু হচ্ছেন রোদাঁ। কিন্তু প্রশান্ত ভাবের অভিব্যক্তিতে তিনি তাঁর গুরুকেও পরাজিত করেছেন—এ হচ্ছে বিশেষজ্ঞ সমালোচকদের মত। Bourdelleএর নাম সব-চেয়ে বেশী বীরত্ব সূচক ভাস্কর্য্যে। এ বিভাগে এখন আর তাঁর

জোয়ান অফ্ আর্ক
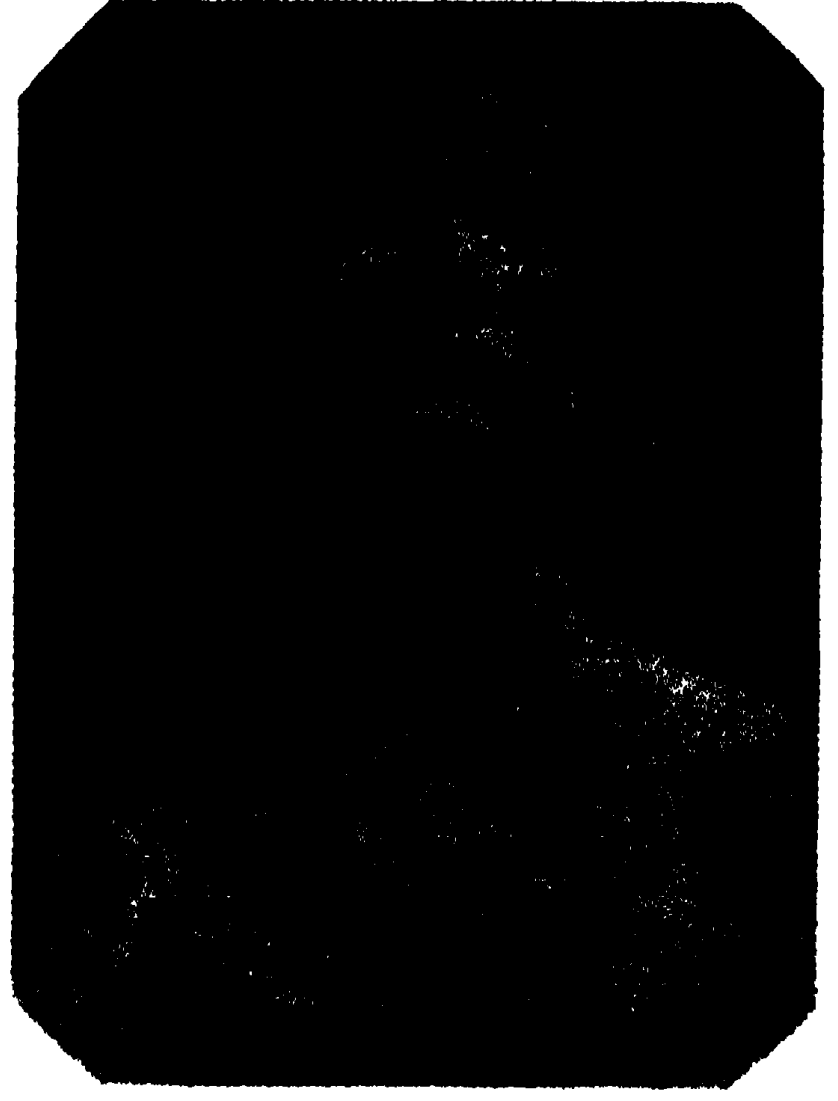
বীরত্বের প্রতিমূর্ত্তি

জুড়ী নেই। তাঁর ভাস্কর্য্যকে পাথরের উপরে লিখিত আধুনিক 'ইলিয়ড' বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা-যজ্ঞের অন্যতম প্রধান পুরোহিত জেনারেল আলভিয়ারের আবক্ষ মূর্ত্তিটিতে তিনি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছেন যে, বীরত্বের অভিব্যক্তিতে তিনি কত-বড ওস্তাদ।

Bourdelleএর হাত এখনো শ্রান্ত হয়ে পড়ে নি। সুতরাং নব নব সৃষ্টির দ্বারা তিনি যে এখনো পৃথিবীর শিল্প-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য নানাভাবে বর্দ্ধিত ক'রে তুল্‌বেন, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই।

নারী কি চায়

নারীত্বের উপরে কে সোনার-কাটি ছুঁইয়ে দিয়েছে, তাই সারা ধরায় আজ তার জাগ্রত আত্মার বিপুল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। নারী আজ তার মনুষ্যত্বের লুপ্ত শক্তি আবার ফিরিয়ে চায়,—প্রাচীন মিশরে, গ্রীসে ও রোমে যে শক্তি থেকে সে বঞ্চিত ছিল না। নারীত্বের এই আন্দোলনের ঢেউ আজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ভারতের তটে এসেও আঘাত করেছে। কিন্তু বৃদ্ধ ভারতবর্ষ

ডার্ব্বির ঘোড়দৌড়ে ঘোড়ার পায়ের তলায় মিস্ ডেভিসনের আত্মবিসর্জ্জন। ছবির বামদিকে ঘোড়া ও মিস্ ডেভিসনের দেহ মাটির উপরে পড়ে আছে

এখনো নারীকে তার ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিতে দস্তুরমত ইতস্তত করছে।

বাঙলার নারীর দল পুরুষের কাছে হেরে গেছেন—কারণ পুরুষের কাছে তাঁরা ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। অধিকার কেউ কারুকে দেয় না, ভিক্ষার দ্বারা অধিকার পাওয়াও যায় না, তা নিজের জোরে আদায় ক'রে নিতে হয়। প্রাচীন রোমের নারীরা ভোট পেয়েছিলেন কিসের জোরে?—বাহুবলে! একালে পাশ্চাত্য দেশেও নারীরা কেবলমাত্র আবেদন আর নিবেদনের পালা গেয়েই ভোটের অধিকার পান নি। এর জন্যে নারীরা কি অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ করেছেন! কত নারী জেল খেটেছেন, কত নারী লাঞ্ছিত হয়েছেন, কত নারী প্রাণ পর্য্যন্ত বিলিয়ে দিতে এগিয়ে গিয়েছেন! প্রতীচ্যের নারীরা দেখিয়েছেন, ভোটের অধিকার পাবার জন্যে তাঁরা না করতে পারেন এমন কাজই নেই। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের "ডার্ব্বি"তে "রাজার ঘোড়া"'র পায়ের তলায় প'ড়ে প্রাণ দিয়েছেন, সশস্ত্র প্রহরীদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে রাজাকে স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেবার জন্যে রাজপ্রাসাদে জোর ক'রে ঢুকতে গিয়ে নির্য্যাতিত হয়েছেন, বড় বড় প্রাসাদকে জ্বলন্ত অগ্নির মুখে সমর্পন করেছেন!

বাকিংহাম প্রাসাদে জোর ক'রে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এই অসম-সাহসিনী নারী বন্দী হয়েছেন

বিলাতের বিখ্যাত নারী লেডি রোণ্ডা এই প্রসঙ্গে বলছেনঃ—নারীরা কি চায়, তাই ভেবে পুরুষদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তারা যা চায়, তা সহজ, সরল ও যুক্তিসঙ্গত। তাদের দৃষ্টি আকাশের চাঁদের দিকে নয়, পুরুষের স্বার্থের দিকে নয়,—তা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে উন্মুখ। তাদের স্বার্থ এই ছয়টি বিষয়ে নিবদ্ধঃ—

১। আইনের যে-সব বিধি শিশুদের উপরে অত্যাচারের সুযোগ দিয়েছে, সেই-সব বিধির সুসংস্কার।

২। পোষ্য নিয়ে যে-সব বিধবা অসহায় হয়ে পড়েছে, তাদের জন্যে পেন্সন বা বৃত্তির ব্যবস্থা।

৩। অভাগিনী অবিবাহিতা মাতা ও তার শিশু যাতে সুবিচার পায়, সেইজন্যে তৎসম্পর্কীয় আইনের পরিবর্ত্তন। (এখানে কেবল হতভাগ্য মাতা ও তার শিশুর উপরেই বা কেন সামাজিক খড়্গাঘাত পড়্‌বে, আর কেনই বা পিতা সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে?)

৪। শিশুদের অভিভাবকত্ব সম্বন্ধে যে আইন আছে, তার পরিবর্ত্তন।

৫। 'সিভিল সার্ভিসে' নারী ও পুরুষের সমান অধিকার।

৬। পুরুষ শিক্ষকের মত নারী শিক্ষয়িত্রীরও সমান মাহিনা।

সম্মোহন ও অপরাধ

সংপ্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারের আদালতে একটি নূতন দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। একজন ডাক্তার আসামীকে সম্মোহন-বিদ্যার বলে অভিভূত ক'রে, তাকে অপরাধ স্বীকার করাতে চেষ্টা পেয়েছিলেন।

আর্ভিংএর দ্বারা অভিনীত The "Bells" ও ট্রি'র দ্বারা অভিনীত "Trilby" নামক বিখ্যাত নাটক-দুই-খানিতে সম্মোহনের বিচিত্র শক্তির কথা উক্ত হয়েছে। তাছাড়া কত নাটক ও উপন্যাসেই সম্মোহনের সাহায্যে চুরি ও হত্যা প্রভৃতি অপরাধের কাহিনী পড়া যায়, তার আর সংখ্যা নেই।

কিন্তু সম্মোহনের সাহায্যে এ-সব ব্যাপার কি সত্যই সম্ভব? আলোচনা ক'রে দেখা যাক্।

কারুকে সম্মোহিত করতে হ'লে প্রথমে আমার কর্ত্তব্য এই:—আমার প্রতি তার বিশ্বাস উৎপাদন করা। এখানে আমার ব্যক্তিত্ব কাজ করবে। দ্বিতীয়:—চারিদিক যাতে নিস্তব্ধ ও একঘেয়ে ভাবে পূর্ণ হয়, তার ব্যবস্থা

ট্রিল্‌বি'র সম্মোহন-দৃশ্য। সম্মোহনকারীর ভূমিকায় স্যার হার্বার্ট ট্রি

করা। তৃতীয়:—এমন অবস্থায় তাকে আনা, যাতে আমার সঙ্কেতের প্রভাবে সে অভিভূত হয়।

আমি আদেশ দিলুম, তুমি তোমার চোখ-দুটিকে কপালে তুলে শিবনেত্র হয়ে থাকো। সে তাই কর্‌লে। এতে একটা আয়াসের ভাব আসে। মুহূর্ত্তকাল পরে, চোখকে সেইভাবেই রেখে চোখের পাতাদুটিকে ধীরে ধীরে নামিয়ে মুদে ফেলবার জন্যে তাকে হুকুম দিলুম। এই সময়ে আমাকে ক্রমাগত বল্‌তে হবে, তার চোখ শ্রান্ত ও পাতাদুটি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভারি ও মাংসপেশী এলিয়ে পড়েছে প্রভৃতি। এ-সব হচ্ছে সাধারণ নিদ্রার লক্ষণ। বলা বাহুল্য, ঘুমের সময়ে চোখের পাতার তলায় চোখের অবস্থা হয় ঠিক পূর্ব্বোক্ত রূপ।

সম্মোহনের একটি সহজ পদ্ধতি। চোখ কপালের দিকে তুলে, চোখের পাতা ধীরে মুদে ফেলতে হবে

তারপর কি ঘটবে? আমি যদি ঠিকভাবে কাজ করতে পারি, তবে অপর ব্যক্তির "ওপটিক নার্ভ" শ্রান্ত হওয়ার দরুণ সে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়্‌বে এবং তার চিন্তাশক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হয়ে থাক্‌বে। আমার হুকুম ভিন্ন সে আর জাগ্‌তে পারবে না। আমি তার দৃষ্টি, শ্রবণ, আঘ্রাণ ও স্পর্শ শক্তিকে দমন করতেও পারব। আমি অনেক ব্যাপারে তাকে প্রতারিত করতে এবং আমার আদেশ-মত চালাতে পারব। আমার ইচ্ছামত সে কোন কথা ভুলে যাবে বা স্মরণ করবে। তার অচেতন মনের গতিকে আমি অস্থায়ী ভাবে রুদ্ধ ক'রে ফেলব। সে আমার কথার বিচার করবে না। চা'কে সে মদ ব'লে মেনে নেবে এবং চা পান ক'রেই মাতাল হয়ে পড়বে। আমার কথা-মত সে ব্যথা বা আরাম পাবে। আমি যদি বলি তার আঙুল ফুলেছে, তবে দেখতে দেখতে তা রাঙা ও যাতনাদায়ক হয়ে উঠ্‌বে। তার মানসিক বৈচিত্র্য হবে এমনধারা যে, ত্রিশফুট দূর থেকেও ট্যাঁকঘড়ীর টিক্ টিক্ শুন্‌তে পাবে এবং অনেক তফাৎ থেকেই খুদে খুদে হরফ পড়তে পারবে। আমার সঙ্কেত হবে তার কাছে প্রচণ্ড শক্তির মত।

সঙ্কেতের প্রভাব কত, একটি সত্য ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। একজন লোক পথ চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌লে, পায়ের তলা দিয়ে একটা সাপ চ'লে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময়েই তার পায়ে একটা কাঁটা ফুটে গেল এবং খানিক পরেই সে মারা পড়্‌ল। তার শবদেহে সর্পাঘাতে মৃত্যুর সব লক্ষণই বর্ত্তমান ছিল বটে, কিন্তু ডাক্তারের পরীক্ষায় প্রকাশ পেলে, সাপ তাকে একেবারেই দংশন করে নি!

সম্মোহনে সঙ্কেতের তীব্রতা আরো বেড়ে ওঠে। কিন্তু সে সময়ে যুক্তিদ্বারা চালিত সচেতন মন ঘুমিয়ে থাক্‌লেও সংস্কার-চালিত অর্দ্ধচেতন মন কাজ করতে পারে। সেইজন্যে, তখন হত্যাকারীকে দোষ স্বীকার করতে বল্‌লেও সে আমার হুকুম মান্‌তে চাইবে না। যারা বদ্ধ-মিথ্যাবাদী, তারা নিজেদের সচেতন মনের অজ্ঞাত-সারেই, অভ্যাস বা সংস্কার অনুসারে মিথ্যা ব'লে থাকে। সম্মোহিত অবস্থাতেও তারা সত্য বলবে না। বিশেষ, আত্মরক্ষার সংস্কার অপরাধীদের জীবনের অন্তরতম প্রদেশে শিকড় গেড়ে ব'সে যায়। এই যে ভয়ের সংস্কার, এর মহিমাতেই সম্মোহিত হ'লেও অপরাধীরা কখনোই দোষ স্বীকার করবে না। এমন ক্ষেত্রে, কোন বিপদজনক প্রশ্ন করলে, সম্মোহিত অপরাধী হয় জেগে উঠবে, নয়তো এমন গভীরভাবে নিদ্রিত হয়ে পড়বে যে, কোন-রকম সঙ্কেতেই সেখানে ফল পাওয়া যাবে না।

আগেই বলেছি, সম্মোহিত অবস্থাতেও মানুষের অভ্যাস বা সংস্কার-মূলক অর্দ্ধ-সচেতন মন অসাড় হয়ে পড়ে না। দেখা গেছে, সম্মোহিত ব্যক্তিকে যখন বলা হয়, তার হাতের পাইপটি পাইপ নয়, ছুরি,—তখন সেটা সে মেনে নেয় (কারণ, এর মধ্যে কোন বিপদের ভয় নেই)। কিন্তু সেই কল্পিত ছুরিরও দ্বারা কারুকে আঘাত করতে বল্‌লে সে হুকুম কখনোই পালিত হবে না। আবার, যদি বলা হয়, "তোমার হাতের পাইপটি পাইপ নয়,—ওটি

পালোক, "ওর দ্বারা আমার হাত চুল্‌কে দাও,"—তবে সে হাসিমুখেই কথামত কাজ কর্‌বে।

তবে সম্মোহিত অপরাধীর মনকে অপরাধ সম্বন্ধে আমার মতের দ্বারা অভিভূত করতে পারি বটে এবং তার ফলে অপরাধীর প্রশ্নোত্তরে গোলে-হরিবোলে এমন অনেক গলদ বেরিয়ে পড়ে, যা তার পক্ষে শুভকর না হওয়াই সম্ভব।

আজকাল অপরাধ-স্বীকার করাবার জন্যে সম্মোহন-বিদ্যা ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু এ চেষ্টায় বিশেষ-কিছু ফললাভ হবে না। কারণ, অপরাধীর বা যে কোন লোকেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সম্মোহিত করা একরকম অসম্ভব বল্‌লেই হয়। বাধা পেলে সম্মোহনকারী কারুকেই ঘুম পাড়াতে পারে না। আবার, শিশু, পাগল বা নিরেট বোকাদেরও উপরে সম্মোহনের প্রভাব খাটে না। কারণ যার মন একটা নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে একাগ্র হ'তে পারে না, তাকে সম্মোহিত করা সম্ভব নয়। দর্শন-মাত্র যাকে তাকে খুসিমত সম্মোহিত করার কাহিনীকে রূপকথা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা

দাঁতের প্রতি উচিতমত যত্ন করে খুব কম লোকেই। তাই পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, শতকরা পঁচাত্তর জন লোকের দাঁত ভিতরে ভিতরে খারাপ, অথচ তারা তা জানে না এবং জান্‌লেও সে জন্যে কিছুমাত্র চিন্তিত নয়। আজকাল বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাল্যকাল থেকে দন্তকে যত্ন না করলে পরিণামে তা মারাত্মক হয়ে ওঠে। অনেকে নানান রকম শারীরিক ব্যাধির কোন হদিস খুঁজে পায় না। পরীক্ষা করলে প্রায়ই হয়তো প্রকাশ পাবে যে, ক্ষুদ্র ব'লে যে দাঁতকে আমরা তুচ্ছ করি, সেই দাঁতই এই-সব ব্যাধির মূল কারণ।

আমরা এখানে যে ছবিখানি দিলুম, তার সঙ্গে মিলিয়ে নীচের অংশটি পড়ুন।:—(A) দাঁতের গর্ত্ত, এর জন্যে

দাঁতের ছবি

দাঁতের ভিতরের শাঁস নষ্ট হয়। সেই গর্ত্তে থাকে Streptococcus Viridans নামে জীবাণু। (B) মূলদেশ জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তারা পরে স্নায়ুকে (C)

আক্রমণ করেছে। এই স্নায়ুর সাহায্যে বিষ মস্তিষ্কের (D) মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। ফল, প্রথমে মানসিক অশান্তি, পরে উন্মাদ রোগ।

স্ফীত মাড়ির মধ্যে আরো থাকে পুঁজ ও বাতব্যাধির জীবাণু। তারা ধমনীর (F) সাহায্যে শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। পুঁজ মূত্রগ্রন্থিকে (I) রুদ্ধ ক'রে দেয়, ফলে "ব্রাইট্‌স্ ডিজিজে"র উৎপত্তি। বাত শরীরের নানা সন্ধিস্থলে (K) গিয়ে মানুষকে পঙ্গু ক'রে দেয়।

কোন কোন দাঁতের গর্ত্ত (G) যক্ষ্মা ও অন্যান্য সাংঘাতিক রোগের জীবাণুর বাসা হয়ে দাঁড়ায়। জীবাণুরা ক্রমে পাকস্থলীতে (H) ও অন্ত্রে (J) কিংবা ফুসফুসের বা অন্য-কোন শরীর-যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে মানুষকে একেবারে যমের দুয়ারে টেনে নিয়ে যায়।

অনেকে খারাপ দাঁত নিয়েও যে কাবু হয়ে পড়ে না, তার কারণ তাদের জীবনী-শক্তি তখনো প্রবল থাকার দরুণ, জীবাণুর বিষ ততটা অনিষ্ট করতে পারে না। কিন্তু একবার কোন গতিকে বা অন্য-কোন আকস্মিক পীড়ায় তারা কাবু হয়ে পড়লেই, জীবাণুরা বিপুল বিক্রমে তাদের আক্রমণ করবে। খারাপ দাঁত নিয়ে বেঁচে থাকার মানে সরু সুতোয় বাঁধা খোলা তরোয়ালের নীচে বসে থাকা। খুব ভালো দাঁতের মাজন দিয়ে প্রত্যেকবার আহারের— আগে নয়—পরে দাঁত মাজা উচিত। (নিদ্রা-ভঙ্গের পর প্রভাতে একবার ক'রে তো দাঁত মাজতেই হবে।) দাঁত খারাপ হ'লে তখনি তা তুলিয়ে ফেলা দরকার—নইলে একে একে অন্য দাঁতগুলিও রোগাক্রান্ত হবে।

প্রসাদ রায়

গাঁটকাটার চিঠি

আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে আমার প্রিয়ার সঙ্গে,
গোপন চিঠি দু-একখানা চল্‌ছে লেখা রঙ্গে।
মাসের পরে বিয়ের তারিখ গুন্‌তেছি দিন নিত্য,
এমন সময় প্রিয়ার লিপি করলে মোহিত চিত্ত।
দিব্য রঙীন কাগজেতে এসেচে এক পত্র,
নমুনা তার সবার কাছে করচি হাজির অত্র।

"ওগো তুমি হারিয়োনাক আমার প্রথম চিঠি,
দুটি বুকের প্রথম বাঁধন, সত্য জেনো ইটী।
রইলো গাঁথা ইহার সাথে আকাঙ্ক্ষা ও আশা,
রইলো সখা মুখের চুমা, বুকের ভালবাসা।"
পত্রখানি রুমাল মাঝে জড়িয়ে নিলাম হর্ষে
আজ্‌কে আমার প্রাণের প্রাণে সুধার ধারা বর্ষে।
শঙ্কা সদাই কখন্ পড়ে বৌদিদিদের চক্ষে
রুমাল সহ প্রেমের লিপি ঘুরছে আমার কক্ষে।

হায়রে সাঁঝে পুলের ধারে গঙ্গাঘাটে নাবছি
প্রতাপ এবং শৈবলিনীর সাঁতার-কাটা ভাবছি।
পকেটে হাত পড়লো হঠাৎ, শূন্য সবই তত্র,—
কাটা পকেট নাইকো রুমাল, নাই গোলাপী পত্র!

দারুণ বিধি বুঝতে নারি কেন এমন করলে
অভিজ্ঞানের এমন লিপি আধেক পথে হর্‌লে!
হেম-মরালের চঞ্চু হতে ছিনিয়ে নিলে পদ্ম,
করলে হরণ প্রিয়ার লিপি খাম্-ঠিকানা শুদ্ধ।
এই রূপেতে খেদ করিয়া গেলাম বাসায় রাত্রে
অনুতাপের লক্ষ সূচী বিঁধছে সারা গাত্রে।

আপন ঘরে গুম্‌রে মরি দুয়ার ক'রে রুদ্ধ
ডাকযোগেতে রুমাল চিঠি ফিরিয়ে দেছে সদ্য।
সঙ্গে তাহার সাজিয়ে লেখা একটুখানি পত্র
নিয়ে আমি দিচ্ছি তুলে তাহার কয়েক ছত্র।
"বন্ধু, তোমার প্রেমের লিপি তোমার কাছেই দামি
ধন্যবাদের সহিত তাহা ফিরিয়ে দিলাম আমি।
নইক পাগল নইতো কবি ওর বেসাতি নাই,
তোমার জিনিষ তোমার কাছে ফিরিয়ে দিলাম তাই।
আমরা শুধু গাঁট কাটি তা সবাই জানে ভাই রে,
গাঁটছড়া ত কাট্‌তে নারি তাইরে নারে নাইরে।"

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মর্ত্তিনী ও তার রক্ষা-দেবতা

(Catulle Mendes-এর ফরাসী হইতে)

১

সে সময়ে, এই দেশে, চৌদ্দবৎসর বয়সের একটি মেয়ে ছিল। তার নাম মর্ত্তিনী। তার মৃত্যু আসন্ন। সে হঠাৎ একটা রোগে আক্রান্ত হয়। এখন তার বাঁচিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। তার মা-বাপ গরীব পল্লীগ্রামবাসী। একটা ক্ষুদ্র ক্ষেত-ভূমির মধ্যে একটা পুরাতন কুটীর ছাড়া তাদের আর কিছুই ছিল না। তাদের খুবই কষ্টের অবস্থা। এই মুমূর্ষু মেয়েটিকে তারা অত্যন্ত ভাল বাসিত। বিশেষত তার মা তো ভাবিয়াই আকুল,—কেননা, তাদের কুটীর হইতে গ্রাম বহুদূরে। মৃত্যুর পূর্ব্বে, গ্রামের পুরোহিত আসিয়া পৌঁছিবেন কিনা, খুবই সন্দেহ। মা অতি ধর্ম্মিষ্ঠা; পাছে অন্তিমকালে, তাঁহার কন্যা পুরোহিতের নিকট স্বীয় গুপ্তপাপ প্রকাশ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি না পায়, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা।

এই সময়ে, পিতা-মাতার মতই সুমিষ্ট স্বরে কে-যেন এই কথা বলিয়া উঠিল:—

"এর জন্য কিছুমাত্র ভেবো না।" কষ্টে অভিভূত হইলেও কন্যার জনক-জননী এই কথা শুনিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইল।

সেই একই সময়ে উহারা দেখিতে পাইল, রোগাতুরার শয্যার পিছন হইতে, পক্ষবিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি উত্থিত হইয়াছে।

আবার সেই কণ্ঠস্বর শুনা গেল :—

—"আমি মর্ত্তিনীর রক্ষা-দেবতা; এবং আমার বিশ্বাস, কোন রক্ষা-দেবতা পুরোহিতের স্থান অনায়াসেই অধিকার করতে পারে, তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। তোমরা ঐ কোণে যাও, এদিকে মুখ ফিরিও না। আমার নিকট তোমাদের কন্যা তার গুপ্ত পাপ প্রকাশ করবে। তোমার কন্যা নিশ্চয়ই নির্দ্দোষ, মুহূর্ত্তের মধ্যেই এ কাজ শেষ হবে।"

২

কোন তরুণী একজন দেব-দূতের কাছে পাপ স্বীকার করিতেছে ইহা ত প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু একসময়ে এই দেশে এইরূপ এক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। মর্ত্তিনী আপনার ছোটখাটো দোষগুলা স্বীকার করিল। দেবদূত তাহাকে মুক্তিদান করিয়া পক্ষসঞ্চালনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাহার মনে পড়িল, গতসপ্তাহে সে একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। তার প্রতিবাসী এক রমণী একটি সুন্দর গোলাপী রংএর রেশমী গলাবন্ধ তাহাকে দেখায়, সেই গলাবন্ধ নিজের গলায় পরিবার লোভে সে উহা চুরি করিয়াছিল। দুইটা অপরাধ! এক, পুরুষের মন-ভুলাইবার বাসনা, আর এক, চৌর্য্য। "আমি ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছি না, এই অপরাধের জন্য তোমাকে ক্ষমা করা উচিত কিনা। সেই গলাবন্ধটা কোথায়?"

—"বালিসের নীচে। দেব!"

—"ওটা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

—"আমি অন্তরের সহিত রাজি আছি। কিন্তু আমি কি তা পারব? আমি রোগে কাতর,—আমি পালঙ্ক থেকেই নামতে পারি নে,—চলা ত দূরের কথা। আর, আমার প্রতিবেশিনীর বাড়ী ক্ষেতের ও-ধারে।"

রক্ষা-দেবতা বলিলেন:—

—"তার দরুণ কোন বাধা হবে না। একটা ফন্দী করা যাক্।

তোমার রোগটা আমাকে দেও, আমার স্বাস্থ্যটা তুমি নেও; তোমার বদলে আমিই তোমার রোগ-শয্যায় শুয়ে থাক্‌ব; তুমি ততক্ষণে সেই গলাবন্ধটা ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারবে। তোমার মা-বাপ কিছুই জান্‌তে পারবেন না। আমার ডানা-যোড়াটা বিছানার চাদরের নীচে লুকিয়ে রাখব।"

মর্ত্তিনী বলিল;—

"যে আজ্ঞে, আপনি যা বলবেন তাই করব।"

—"কিন্তু একটা বিষয়ে তোমায় সাবধান হতে হবে, পথে সময় নষ্ট কোরো না। ভেবে দেখ,—তোমার ফেরবার আগে, তোমার নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুকালের ডঙ্কা যদি বেজে ওঠে তখন কি হবে। তাহলে তোমার বদলে আমাকেই মরতে হবে। সেটা ত ভাল দেখ্‌তে হবে না। কেননা, আমি অমর।—"

তার ভয় নেই দেব! আমি এ-রকম মুস্কিলে আপনাকে কখনই ফেলব না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে আস্‌ব।"

দেবদূতের কৃপায় আপাতত স্বাস্থ্যলাভ করিয়া, মর্ত্তিনী শয্যা হইতে নীচে নামিয়া পড়িল, এবং যাহাতে বাপ-মায়ের মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়, নীরবে তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া বাহির হইল। উহার মা-বাপ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বালিসের উপর একটি মধুর পাণ্ডুবর্ণ মুখ ন্যস্ত রহিয়াছে, মাথায় শোনের মত কটা চুল। নিশ্চয়ই ইনি দেবদূত;—বিছানায় চাদরের নীচে বোধ হয় নিজের ডানা-যোড়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

৩

গাছ-পালার ভিতর দিয়া দৌড়িয়া, খানাখন্দ টপ্‌কাইয়া, মর্ত্তিনী যতদূর সম্ভব খুব তাড়াতাড়ি চলিল। যদিও এখন ঘোর অন্ধকার রাত্রি, তথাপি সেখানকার রাস্তা ভাল চিনিত বলিয়া পথভ্রম হইবার তাহার কোন আশঙ্কা ছিল না। সে অচিরাৎ তাহার প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, দরজায় ঘা না দিয়াই গৃহে প্রবেশ করিল, এবং একটা সিন্দুকের ফাঁকের মধ্য দিয়া সেই গোলাপী রঙের গলাবন্দটা আস্তে আস্তে ঢুকাইয়া দিল।

সৌভাগ্যক্রমে, সে সময়ে ঐ গৃহে কেহই ছিল না।—সে গলাবন্দটা রাখিয়াই নিজ গৃহাভিমুখে ফিরিল। সত্য কথা বলিতে কি, ফিরিবার সময় সে একটু আস্তে আস্তে চলিতেছিল। তবে কি তাহার রক্ষাদেবতার স্বাস্থ্য রক্ষাদেবতাকে ফিরিয়া দিতে সে ইতস্তত করিতেছিল? না, তাহা নহে। মর্ত্তিনীর পারলৌকিক সদ্‌গতির জন্য, তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য মর্ত্তিনী তাঁহার প্রতি যার-পর নাই কৃতজ্ঞ, এবং তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল। না, না, নিশ্চয়ই না—তাহার বদলে দেবদূতকে সে কখনই মরিতে দিবে না। এখন যে সে দ্রুত চলিতেছে না—তাহার কারণ, সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে গাছে একটা কোকিল ডাকিতেছিল। বৃক্ষের শাখাগুলা চন্দ্রমার রজত-কিরণে রঞ্জিত হইয়াছে, এই সময়ে কোকিলের এই সুমধুর কুহুধ্বনিতে কে না মুগ্ধ হয়? এই মধুর ধ্বনি সে একবার প্রাণ ভরিয়া শুনিয়া লইল—কেন না, এই শোনাই তাহার শেষ শোনা। তাহার মনে হইল, কালও এই চন্দ্র উদিত হইবে, এই তারাগুলা আকাশে ফুটিয়া উঠিবে, কিন্তু সে আর দেখিতে পাইবে না। কি ভয়ানক!—তাহার সেই শয্যায় সে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইবে। এই কথা ভাবিয়া তাহার মন বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু একটু পরেই, তাহার মন হইতে এই বিষাদ দূর করিয়া দিয়া সে আবার দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল এবং সেই আঁধারের মধ্যে তাহাদের ক্ষেতের সেই পুরাতন কুটীরটি দেখিতে পাইল। ঠিক এই সময়ে দূর হইতে একটা বেহালার বাদ্য শুনা গেল। একটা ক্ষেত-বাড়ীর চালা-ঘরের ভিতর, গ্রামবাসীদের নৃত্য চলিতেছিল। সে সেইখানে থামিল; এবং বিচলিত চিত্ত ও বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। মনে করিল,—খুবই ত কাছে এই ক্ষেত-বাড়াটা। এই নাচ্‌টা,—এই ছোট্ট নাচ্‌ট, শেষ হতে বেশীক্ষণ লাগ্‌বে না। কিন্তু দেবদূত আমার রোগে এখন কষ্ট পাচ্চেন—আমার জন্য অপেক্ষা করবেন, এখন বিলম্ব করাটা বড়ই খারাপ হচ্চে। কিন্তু আমার মৃত্যুকাল যতটা নিকটবর্ত্তী লোকে মনে করচে, হয়তো ততটা নয়··

৪

একটা নাচের পর, আর একটা নাচ,—আর একটা—আরও একটা; প্রত্যেক নাচের পূর্ব্বেই মর্ত্তিনী মনে করিতেছে—"এই শেষ নাচ! তার পরেই আমি চলে গিয়ে মরণকে বরণ করব"। নাচের বাজনা আবার বাজিতে সুরু হইল; তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যায় বালিকার এরূপ বল ছিল না। নিশ্চয়ই তাহার অনুতাপ হইতেছিল, কিন্তু তাহার অনুতাপও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে

লাগিল। যাই হোক, যখন ঘড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজিল তখন সে খুব দৃঢ় করিয়া আপনার মন বাঁধিল। আর মুহূর্ত্তমাত্রও সেখানে থাকিবে না। সে গিয়া তাহার মৃত্যু-শয্যার স্থান আবার অধিকার করিবে। সে নৃত্যশালা হইতে বাহির হইতেছে এমন সময় এক যুবাপুরুষ সম্মুখে আসিয়া পড়িল। যুবাপুরুষটি এমন সুন্দর যে তাহার মত সুন্দর মর্ত্তিনী স্বপ্নেও কখন দেখে নাই। এই যুবকটি চাষাও নহে, পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামের জমিদারও নহে, ইনি স্বয়ং রাজা। রাজা আজ রাত্রে মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথ হারাইয়া,—পল্লীগ্রামবাসীরা কিরূপ আমোদ-প্রমোদ করে তাহা দেখিবার অভিপ্রায়ে, অনুচরবর্গসহ এই ক্ষেত বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছেন। মর্ত্তিনীকে দেখিয়া তিনি একেবারে বিমুগ্ধ,—এই গোপ বালিকার মতো সুন্দরী, তাঁর রাজ-অন্তঃপুরেও কখন দেখেন নাই। রাজার মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ ও বালিকার মুখ একেবারে লাল হইয়া উঠিল। উভয়ের প্রতি উভয়ের মন এরূপ আসক্ত হইল যে কাহারও মুখ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। একটু নিস্তব্ধতার পর, রাজা আর ইতস্তত না করিয়া স্পষ্ট বলিলেন,—তাঁহার হৃদয় এই বালিকার হস্তে তিনি চিরকালের মত সমর্পণ করিয়াছেন; এই মনমোহিনী গোপ-ললনা ব্যতীত তিনি আর কোন পত্নী গ্রহণ করিবেন না। রাজা আদেশ করিলেন, একটা গাড়ী বালিকার নিকট লইয়া গিয়া, সেই গাড়ীতে করিয়া তাহাকে তাঁহার প্রাসাদে যেন আনা হয়। হায়! মর্ত্তিনী মধুর ভাবে বিভোর হইয়া, কোন বাধা দিতে পারিল না—রাজ-প্রেরিত যানে অবাধে আরোহণ করিল। কিন্তু—এই সময়ে তাহার রক্ষা-দেবতা হয়ত মরণোন্মুখ কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহার অন্তঃকরণ বিষাদে আচ্ছন্ন হইল।

৫

মর্ত্তিনী রাণী হইল; তাহার বাসের জন্য কত চমৎকার চমৎকার প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইল; নিত্য উৎসবের আনন্দ, রাণীর গৌরব ও রূপসী বলিয়া খ্যাতি সে উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু কঞ্চুকীদের ও রাজ-দূতদিগের চাটুবাক্য তাহার মন হরণ করিতে পারিল না; সে যে-রেশমী জরির গালিচার উপর দিয়া চলিত, গোলাপ-ভূষিত, হীরকমণ্ডিত পরিচ্ছদ পরিধান করিত—তাহাতেও তার মন ভুলিল না; কিন্তু রাজার প্রতি তাহার জ্বলন্ত অনুরাগ ও তাহার প্রতি রাজার জ্বলন্ত প্রেম—ইহা উপলব্ধি করিয়াই সে আত্মহারা হইয়াছিল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ভালবাসা তাহার আর তুলনা নাই। এই বিপুল জগতে উহারা মনে করিত, উহারা দুটি ছাড়া আর কেহ নাই। রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভাবনা তাদের খুব কমই ছিল; তারা পরস্পরের সহবাসে অবিরাম কালযাপন কর, ইহাই তাদের একমাত্র মনের বাসনা। এবং উহাদের রাজত্বকালে যুদ্ধ-বিগ্রহ না থাকায় পরস্পরকে ভালবাসা ছাড়া উহাদের আর কোন কাজ ছিল না। এ-হেন আনন্দের মধ্যে মর্ত্তিনী কি সেই দেবদূতের কথা একবারও মনে করিত, যিনি নিছক মৈত্রীর খাতিরে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছেন?—একবারও না। এই সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া ঐরূপ কোন কষ্ট অনুভব করিবার সে অবসরই পাইত না। অঙ্গীকার পালন করে নাই বলিয়া যদি কখনও তাহার অনুতাপ হইত, তখন সে এই বলিয়া আপনাকে আশ্বস্ত করিত যে,—লোকে তাহার রোগটাকে যতখানি গুরুতর বলিয়া মনে করিয়াছিল, আসলে হয়ত ততটা নহে—আর যদি বা হইয়া থাকে দেবদূত তাহা আরাম করিয়া দিয়াছেন। তাছাড়া সেই দূর-অতীতের কথা—সেই অস্পষ্ট অতীতের কথা তাহাকে বড়-একটা চিন্তাকুল করিতে পারিত না; কেননা সে প্রতিদিন রাত্রে তাহার রাজ-পতির স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইত। কিন্তু একদিন একটা ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইল। রাজা হঠাৎ কোথায় অন্তর্ধান করিলেন। আর তাঁহার দেখা পাওয়া গেল না। তাঁহার কি হইয়াছে, কেহই কিছুই জানিতে পারিল না।

৬

যখন মর্ত্তিনী একলা হইল, যখন তাহার এই দুর্দ্দশা ঘটিল,—তখন হইতে সে দেবদূতের কথা মনে করিতে লাগিল। আহা, দেবদূত না-জানি তাহার জন্য কতদিন অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। নিজে কষ্ট পাইলে পরের কষ্ট

বুঝা যায় না—পরের জন্য দয়া হয় না। সে-ই সে অমর দেবদূতের মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া আপনাকে যার-পর-নাই ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। বহুদিন হইল, নিশ্চয়ই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। একদিন মর্ত্তিনী পূর্ব্বের মতো দানদরিদ্রের বেশ পরিয়া, মাঠের মধ্য দিয়া কুটীরের দিকে চলিল। তাহার সেই মৃত্যু-শয্যা আবার অধিকার করিবে বলিয়া সে-কি আশা করিতেছিল?—না; সে জানিত, সে যে-অপরাধ করিয়াছে তাহার কোন প্রতীকার নাই। কিন্তু সে মনে করিল, অনুতাপিনী তীর্থযাত্রিণীর ন্যায়—যে-শয্যায় শুইয়া দেবদূত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলেন—সেই পুণ্যস্থানটি একবার দেখিয়া আসিবে। কিন্তু গয়্-আবাদি পতিত-জমি ক্ষেতের মধ্যে-সেই কুটীরটির এখন ভগ্নাবশেষমাত্র রহিয়াছে। মর্ত্তিনী প্রতিবাসী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ঐ ভগ্নগৃহের বাসিন্দারা, একটি আদরিণী মেয়ের মৃত্যুর পর, একেবারে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; কোন্ পথ দিয়া গিয়াছে তাহা উহারা বলিতে পারিল না। তবে একথা তারা জানে যে, পাহাড়ের ধারে যে শশ্মান-ভূমি আছে সেই ক্ষুদ্র শ্মশানভূমিতেই মেয়েটিকে কবরস্থ করা হয়। অতএব, যে সময়ে তাহার মরিবার কথা, সেই সময়ে দেবদূতেরই যে মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার বদলে দেবদূতই যে কবরস্থ হইয়াছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যাই হোক্, এখন মর্ত্তিনী সেই দেবদূতের সমাধি-স্থানে গিয়া কবরের উপর বসিয়া প্রার্থনা করিবে স্থির করিল। সে শ্মশান-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া একটি নীচু ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হইল এবং পুষ্পিত উচ্চ তৃণপুঞ্জের মধ্যে 'মর্ত্তিনী' এই নামটি পাঠ করিল। ওঃ! তাহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল!—"আমি কি অপরাধই করিয়াছি!" ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সে দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন সে একটা কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল; সে কণ্ঠস্বর এতই মধুর যে তাহার শোকাবেগ সত্বেও সে বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল:—

—"হতাশ হয়ো না মর্ত্তিনী; তুমি যতটা মনে করচ, ততটা খারাপ কিছুই হয় নি।"

সেই একই সময়ে, সে দেখিতে পাইল—ক্রুশের পশ্চাৎ হইতে পক্ষযুক্ত, একটু-অস্পষ্ট, শুভ্রমূর্ত্তি উত্থিত হইয়াছে। আবার সে এই কথা শুনিতে পাইল:—

—আমি তোমার রক্ষা-দেবতা। দেখ সবই ভাল, কেননা তুমি নিজেই এখানে সশরীরে উপস্থিত। এখন শীঘ্র এই পাথরের নীচে গিয়ে তুমি শয়ন কর;—আমি তোমার আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যাব এবং সেইখানেই তাকে বিবাহ করব।

—"আহা! তুমি আমার জন্য কতই না কষ্ট পেয়েছ, আমার রক্ষা-দেবতা! আর এতদিন এই গোরের মধ্যে থেকে না জানি তোমার সময় কতই দুর্ব্বাপ্য হয়ে উঠেছিল!"

—"দেখ, তুমি যে শীঘ্র ফিরে আস্‌বে সে বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ ছিল। এই জন্য আমি প্রথম হইতেই তার প্রতিবিধান করেছিলাম। বালিসের উপর, বিছানার চাদরের নীচে একটা অলীক মূর্ত্তি দেখে তোমার পিতামাতা প্রতারিত হয়েছিলেন। আমি তৃণগুল্ম ডাল-পালার মধ্য দিয়ে তোমার পিছনে পিছনে গেলাম। এবং যে সময়ে পুষ্পিত তৃণপুঞ্জের নীচে গোরের মধ্যে আমার নিদ্রা যাবার কথা..."

—"ওঃ! সেই সময়ে তুমি কোথায় ছিলে আমার রক্ষা-দেবতা?"

—"আমার হৃদয়-রাণী, সেই সময়ে আমি আমাদের রাজপ্রাসাদে ছিলাম। সেখানে তুমি আমাকে কি-ভালই বাস্‌তে, স্বর্গে গিয়েও তুমি আমাকে সেই রকমই ভাল বাস্‌বে!"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্কলন

পরীর পরিচয়

১

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশ বিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।

ঘটক বল্‌লে, "বাহ্লীক রাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন শাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।"

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দূত এসে বল্‌লে, "গান্ধার রাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়চে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ আর ধরে না।"

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।

দূত এসে বল্‌লে, "কাম্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোর বেলাকার দিগন্ত-রেখাটির মত তার বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।"

রাজপুত্র ভর্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগ্‌ল, পুঁথি থেকে চোখ তুল্‌ল না।

রাজা বল্লে, "এর কারণ? ডাক দেখি মন্ত্রীপুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বল্‌লে, "তুমি ত আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বল, বিবাহে তার মন নেই কেন?"

মন্ত্রীর পুত্র বল্‌লে, "মহারাজ যখন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শুনেচে সেই অবধি তার কামনা সে পরী বিয়ে করবে।"

২

রাজার হুকুম হল পরীস্থান কোথায় খবর চাই।

বড় বড় পণ্ডিত ডাকা হল, যেখানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখ্‌লে। মাথা নেড়ে বল্‌লে, "পুঁথির কোনো পাতায় পরীস্থানের কোনো ইসারা মেলে না।"

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়্‌ল। তারা বল্‌লে, সমুদ্র পার হয়ে কত দ্বীপই ঘুরলেম,—এলা দ্বীপে, মরীচ দ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েচি মলয় দ্বীপে চন্দন আন্‌তে; মৃগনাভির সন্ধানে গিয়েচি কৈলাসে দেবদারুবনে, কোথাও পরীস্থানের কোনো ঠিকানা পাই নি।

রাজা বল্‌লে, "ডাক মন্ত্রীর পুত্রকে।"

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পরীস্থানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেচে?"

মন্ত্রীর পুত্র বল্‌লে, "সেই যে আছে নবীন পাগ্‌লা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারি কাছে পরীস্থানের গল্প শোনে।"

রাজা বল্‌লে, "আচ্ছা ডাক তাকে।"

নবীন পাগ্‌লা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সাম্‌নে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে?"

সে বল্‌লে, "সেখানে আমি ত সদাই যাওয়া আসা করি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় সে জায়গা?"

পাগলা বল্লে, "তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক সরোবরের ধারে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "সেইখানে পরী দেখা যায়?"

পাগলা বল্‌লে, "দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি তাদের চেন কি উপায়ে?"

পাগ্‌লা বল্‌লে, "কখনো বা একটা সুর শুনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।"

রাজা বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, "এর আগাগোড়া সমস্তই পাগ্‌লামি, এ'কে তাড়িয়ে দাও।"

৩

পাগ্‌লার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজ্‌ল।

ফাল্গুন মাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষ ফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেচে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্ছ?"

কে কোনো জবাব করলে না।

গুহার ভিতর দিয়ে ঝরণা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেচে কাম্যক সরোবরে। গ্রামের লোক তাকে বলে, "উদাস ঝোরা।" সেই ঝরণার তলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচি পাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরা ফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বল্‌লে "আজ পাব দেখা।"

৪

তখনি ঘোড়ায় চড়ে কাম্যক সরোবরের তীর বেয়ে চল্‌ল, পৌঁছল কাম্যক সরোবরের ধারে। দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে উঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষ ফুল পরেচে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বল্‌লে, "তোমার ঐ কানের শিরীষ ফুলটি আমাকে দেবে?"

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী? ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরো ঘন কালো হয়ে নেমে এল—ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বল্‌লে, "এই নাও।"

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কোন্ পরী আমাকে সত্য ক'রে বল।"

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিন মেঘের আচম্‌কা বৃষ্টির মত তার হাসির উপর হাসি, সে আর থাম্‌তে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাব্‌লে, "স্বপ্ন বুঝি ফল্‌ল—এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।"

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে। বল্‌লে, "এস।"

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠ্‌ল, কুহু কুহু কুহু কুহু।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কি?"

সে বল্‌লে, "আমার নাম কাজরী।"

উদাস ঝোরার ধারে দুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বল্‌লে, "এবার তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও।"

সে বল্‌লে, "আমরা বনের মেয়ে, আমরা ত ছদ্মবেশ জানি নে।"

রাজপুত্র বল্‌লে, "আমি যে তোমার পরীর মূর্ত্তি দেখ্‌তে চাই।"

পরীর মূর্ত্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, "এর হাসির সুর এই ঝরণার সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরণার পরী।"

৫

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েচে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দ্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে এ সব কেন?"

রাজপুত্র বল্‌লে, "তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।"

তখন তার চোখ ছলছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্যে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েচে; আর মনে পড়্‌ল তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে বলে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনচে, আর গুন গুন করে গান গাইচে।

সে বল্‌লে, "না, আমি যাব না।"

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল, বাজল বাঁশি, কাঁসি, দামামা,—ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দ্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়িতে নামল, রাজমহিষী কপাল চাপ্‌ড়ে বল্‌লে, "এ কেমনতর পরী?"

রাজার মেয়ে বল্‌লে, "ছি, ছি, কি লজ্জা!"

মহিষীর দাসী বল্‌লে, "পরীর বেশটাই বা কি রকম?"

রাজপুত্র বল্‌লে, "চুপ কর, তোমাদের ঘরে পরী ছদ্মবেশে এসেচে।"

৬

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কিনা। দেখে যে কালো মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেচে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁৎ করে খোদা একটি প্রতিমা। রাজপুত্র চুপ করে বসে ভাবে, "পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষ রাতে অন্ধকারের আড়ালে উষার মত।"

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হল। কাজরী সকাল বেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় রাজপুত্র শক্ত করে' তার হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "আজ তোমাকে ছাড়ব না,—নিজরূপ প্রকাশ কর, আমি দেখি"

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরল না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুই চোখ জলে ভরে এলো।

রাজপুত্র বল্‌লে, "তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে?"

সে বল্‌লে, "না, আর নয়।"

রাজপুত্র বল্‌লে, "তবে এইবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় যেন সবাই দেখে।"

৭

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝ গগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতের সুরে ঝিমিঝিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা পরে' হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢুক্‌ল, পরী বৌয়ের সঙ্গে আজ হতে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় শাদা আস্তরণ, তার উপর শাদা কুন্দ ফুল রাশ করা ; আর উপরে জান্‌লা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েচে।

আর কাজরী ?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজ্‌ল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেচে। একে একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল।

পরী কই ?

রাজপুত্র বল্লে, "চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।"

বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কঃ পন্থা

কিছুদিন হতে যার সঙ্গেই দেখা হয় তিনিই জিজ্ঞাসা করেন - কঃ পন্থা।

একটা সোজা ও সিধে পথ, আমরা যে চট্‌ করে দেখিয়ে দিতে পারিনে, তার কারণ ইতিপূর্ব্বে বহু মহাজন বহু পথ দেখিয়েছেন, আর সে সব পথ যে অপথ, বহু বিজ্ঞ জন তাও আবার দেখিয়েছেন। ফলে আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা। এস্থলে পূর্ব্বাচার্য্যগণ-প্রদর্শিত গোটাকয়েক পথের উল্লেখ করা যাক।

স্বরাজের পথ কারও মতে বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে আবার কারও মতে তা দেবালয়ের ভিতরে দিয়ে। কেউ বলেন তা ছাপাখানার ভিতর দিয়ে, কেউ বলেন কারখানার ভিতর দিয়ে, কেউ আশা করেন যে তা কাউন্সিলের ভিতর দিয়ে, আবার কেউ বিশ্বাস করেন তা জেলের ভিতর দিয়ে।

এ সব মতের বিরুদ্ধে যে সব তর্ক উঠেছে—সেগুলি একবার স্মরণ করা যাক।—(১) বিদ্যালয়ের বাঙলা ত গোলামখানা। সেখানে আমরা গোলাম না বনে মানুষ হব কি করে? তারপর গোলাম কি কখনো স্বরাট হতে পারে? এ কথা কে না জানে যে এক তাস খেলা ছাড়া, জীবনের অপর কোন খেলাতেই গোলাম সাহেবের চাইতে বড় হতে পারে না। তারপর যাঁরা স্কুল-কলেজের বিপক্ষে নন, তাঁরাও বলেন যে, যদি ভারতবর্ষের আপামর-সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ না হওয়া তক্‌, ভারতবাসী স্বরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না,—তাহলে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর সে রাজ্যে প্রবেশ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটবে না। —অতএব ও পথ হয় অ-পথ নয় অনন্ত-পথ।

(২) দেবালয়ের পথ ত পুণ্যপথ। ও পথ ধরলে মানুষ যে দেবতুল্য হয়ে ওঠে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তবে কথা হচ্ছে এই যে ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোক যদি তেত্রিশ কোটি দেবতা হয়ে ওঠে, তাহলে স্বরাজ্য ত কোন্ ছাই, এ দেশ স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে। মানুষ দেবতা নয় বলেই ত তার পক্ষে স্বরাজ্য বিরাজ্য সাম্রাজ্য যা হোক একটা না একটা রাজ্য চাই। নইলে অরাজ্যাতেই ত কাজ চলে যেত। এ ছাড়া আর একটা কথা আছে। আমরা যদি সব দেবালয়ের পথ ধরি ত, হিন্দুর পথ হবে মন্দিরের ভিতর দিয়ে আর মুসলমানের মস্‌জিদের। নিজ নিজ পথ ধরে আমরা চলব কাশীতে আর ওঁরা মক্কায়। তারপর মাঝপথে দু-দলের মাথা ঠোকাঠুকিও হতে পারে। সত্য কথা এই যে এ পথ তখনই পুণ্যপথ, যখন তা হয় শূন্য পথ। কিন্তু স্বরাজ ত আসমানের নয়—জমিনের রাজ্য।

(৩) ছাপাখানা থেকে বেরয় ত এক কাগজ। কাগজের স্বরাজ্য ত তাসের ঘর। ও জিনিষ মানুষে তয়ের করে শুধু অবসর-বিনোদনের জন্য। ওটা কাজ নয়, খেলা। আমরা সাহিত্যে ও সংবাদে এ স্বরাজ্যের তাসের ঘর ত অনেক বানিয়েছি কিন্তু তাতে করে মাটির স্বরাজ্যের দিকে এগিয়েছি কি পিছিয়েছি বলা কঠিন। ইতিহাস, অর্থাৎ তা গড়ে তুলতে হয়,—কলমে নয় হাতে-কলমে।

(৪) ছাপাখানার উপর যাঁদের ভরসা নেই তাঁরা দেখিয়ে দেন কারখানার পথ। আমরা ধনী না হলে স্বরাট হতে পারব না। ধনী হব কিসে?—উত্তর—হাতুড়ি পিটে। কারখানা হচ্ছে আসলে টাঁকশালে, তাই এস সকলে মিলে, সেখানে ঢুকে লোহা পিটে সোনা তৈরি করি,—তারপর সেখানে থেকে বস্তা বস্তা মোহর মাথায় করে যেখানে আসব তারি নাম স্বরাজ। এর উত্তরে লোকে বলে টাঁকশাল হাতে না থাকলে, কারখানা চালানো যায় না। যার ধন নেই তাকে শুধু পেট-ভাতাতেই হাতুড়ি পিটতে হয়। সুতরাং কারখানার ডাক্তারখানার ভিতর দিয়ে আমরা টাঁকশালে নয় হাঁসপাতালে গিয়ে পৌঁছব।

(৫) কাউন্সিলের ভিতর দিয়ে কি করে স্বরাজ্যে যাওয়া যায় তা বাঙলার নূতন লাট ত একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন এ পারে রয়েছে অধীনতা আর সাত সমুদ্র তের নদীর পারে স্বাধীনতা,—আর কাউন্‌সিল হচ্ছে এ উভয়ের মধ্যে সেতু, এই সেতু ধরেই আমরা ওপারে গিয়ে উঠব। বিরুদ্ধ-বাদীরা বলেন—কাউন্সিল Bridge বটে কিন্তু ও Ass's bridge অতএব ও সেতু আমরা পার হতে পারব না। আর যাঁরা কাউন্সিলের পক্ষেও নন্ বিপক্ষেও নন্ তাঁরা বলেন—যে ও সেতু অবলম্বন করবার পূর্ব্বে জানা দরকার সেতুটা কতখানি লম্বা আর তা টেঁকসই কি না। যা স্থলপথ ভাবা গেছ্‌ল তা যদি জলপথ হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই ত ডুবেছি। অথবা স্বরাজ্যের সেতু যদি স্বর্গের সিঁড়ির মত অফুরন্ত হয় তাহলে তা পার হবার জন্ত চাই অনন্ত জীবন।

(৬) জেলের পথটা যে স্বরাজের রেলের পথ এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। ওখানে ঢোকা সহজ, বেরনই কঠিন, কারণ এর প্রথমটি আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ, দ্বিতীয়টি নয়। আসলে ও পথটা হচ্ছে একটা চোরা গলি। কেউ কেউ এ আপত্তিও তোলেন যে, আমরা ত শাস্ত্রের সামনে সমাজের জেলখানাতেই বাস করছি, কেউ কেউ আবার বলেন যে, আমরা ত সংসার-গারদে যাবজ্জীবন মেয়াদ খাটছি, সুতরাং ওখান থেকে বেরবার যদি কোনও পথ থাকে সঃ এব পন্থা। এ সব হচ্ছে নৈতিক ও দার্শনিক আপত্তি, রাজনৈতিক নয়, অতএব উপেক্ষণীয়।

এই সব পণ্ডিতের বিচারের ফলে দাঁড়াল এই যে, এ সব পথের কোনটা যে স্বরাজের একমাত্র পথ, এ কথা এখন আর কেউ বলতে পারে না। বলতে পারে না বলে যে ধরে নিতে হবে, যে কঃ পন্থার উত্তর "ন পন্থা" অবশ্য তাও নয়। সম্ভবতঃ উক্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হচ্ছে উপরোক্ত সব কটিই পথ। অন্ততঃ এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে যে ও-কটি পথ বন্ধ করার নাম নূতন পথ খোলা নয়।

এতক্ষণে আসল কথায় আসা যাক্। পৃথিবীতে এমন কোনও তৈরি পথ নেই যা ধরে চোখ বুজে সোজা ও চোঁচা স্বরাজে গিয়ে পৌঁছব। ও-হেন পথ শুধু যে নেই তা নয়, থাকৃতেও পারে না। তৈরি পথ মানেই পরের হাতে গড়াপথ। স্বরাজের পথ কিন্তু গড়ে তুলতে হবে আমাদের পায়ে-পায়ে অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককেই যুগপৎ পথিক ও পথকর্ত্তা হতে হবে। এক কথায় পথিক গড়ে উঠলে পথও আপনি গড়ে উঠবে।

বিজলী, ৮ই বৈশাখ ১৩২৯ সাল। বীরবল।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

৫৪১ নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো। ১৮৯৪।

ভারতের খবরের কাগজ ও তাদের সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ, তা পড়লাম। তারা যে এরকম লিখবে এ তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেক দাস জাতির মূল পাপ হচ্ছে ঈর্ষ্যা। আবার এই ঈর্ষ্যা-দ্বেষ ও সহযোগিতার অভাবই এই দাসত্বকে চিরস্থায়ী করে রাখে। ভারতের বাইরে না এলে আমার এ মন্তব্যের মর্ম্ম বুঝবে না। পাশ্চাত্য জাতির কার্য্যসিদ্ধির রহস্য হচ্ছে এই সহযোগিতা। শক্তি আর এর ভিত্তি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস আর আদরপূর্ব্বক পরস্পরের কার্য্যে অনুমোদন। আর জাতিটা যত দুর্ব্বল ও কাপুরুষ হবে, ততই তার ভিতর এই পাপটা স্পষ্ট দেখা যাবে। যতই কষ্টকল্পিত হোক, মূলে কতকটা সত্য না থাকলে কোন অপবাদই উঠতে পারে না, আর এখানে আসবার পর মেকলে ও আর আর অনেকে বাঙালী জাতকে যে ভয়ানক গালাগাল দিয়েছেন, তার কারণ কিছু কিছু বুঝতে পারছি। এরা সর্ব্বাপেক্ষা কাপুরুষ আর সেই কারণেই এতদূর ঈর্ষাপরায়ণ ও পরনিন্দা-প্রবণ। কিন্তু হে ভ্রাতঃ, এই দাসভাবাপন্ন জাতের নিকট কিছু আশা করা উচিত নয়। ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে দেখলে কোন আশার কারণ থাকেনা বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সাম্‌নে খুলেই বল্‌ছি—তোমরা কি এই মৃত জড়পিণ্ডটার ভিতর—যাদের ভিতর ভাল হবার আকাঙ্ক্ষাটা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নাই, যারা তাদের হিতৈষীদের উপরই আক্রমণ করতে সদা প্রস্তুত—এরূপ মড়ার ভিতর প্রাণসঞ্চার করতে পার? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করতে পার, যিনি একটা ছেলের গলায় ঔষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা কচ্ছেন, এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত পা ছুঁড়ে লাথি মাচ্ছে এবং ঔষধ খাবনা বলে চেঁচিয়ে অস্থির করে তুলেছে?'

.........এস, আমাদের মধ্যে—প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচার-নিষ্পিষ্ট ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি। বড় লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্ম্ম প্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি। আমি এদেশে যাদের গরিব বলা হয় তাদের দেখছি—আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকদের হৃদয় এদের জন্য কাঁদছে। কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটী নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আস্‌তে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর—এরাই তোমাদের দেবতা হোক—আর এই তোমাদের ইষ্ট হোক্। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁরা হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়? তা না হলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাদের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক। যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছেনা, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশকোটি লোক ক্ষুধার্ত্ত পশুর তুল্য থাক্‌বে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিশে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না—আমি তাদের হতভাগা বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মত গরিবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করেছে।

উদ্বোধন, বৈশাখ ১৩২৯ বিবেকানন্দ।

শিবাজীর নৌবহর

সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্ম সেনাবলের স্থায় নৌবলও প্রয়োজন। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবছত্রপতি এই সত্যটিও বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোঁকনের উপকূল ভাগ অধিকৃত হইবার পরই শিবাজী নৌশক্তি গঠনে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার সহকারী ছিলেন—পেশবা মোরো ত্রিম্বক পিঙ্গলে। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকেরা আরবসাগরে কেবল বাণিজ্য-তরী ভাসাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সেকালে ভারতের পশ্চিম উপকূলে, আরব-সাগরের তীরদেশে ও পারস্ত উপসাগরের সন্নিহিত প্রদেশে জলদস্যুর বিশেষ উপদ্রব ছিল। সুতরাং পাশ্চাত্য বণিকেরা পুণ্য-সম্ভার-সংরক্ষণের জন্ম বাণিজ্যপোতের পাহারায় রণতরীর বহর নিযুক্ত করিতেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে ভারতসমুদ্রে পাশ্চাত্যশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত জাঞ্জিরার হাবশী সর্দ্দারেরাও শিবাজীর সময় পর্য্যন্ত আপনাদের নৌশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই সকল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নিজের শক্তি কোঁকনের উপকূলে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই শিবাজী কোঁকন বিজয়ের অব্যবহিত পরেই নৌবহর নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা সাদী ও পদাতিকগণ যে অতুল সামরিক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল, তাঁহার নৌসৈনিকেরা সেরূপ যশোলাভ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ সামরিক কৌশল তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বাভাবিক সম্পত্তি; নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাহাদের মোটেই ছিল না। শিবাজী নিজে একবারের অধিক সামুদ্রিক অভিযানে যোগদান করেন নাই। সভাসদ নৌবিভাগের দুইজন অধিনায়কের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—প্রথম দরিয়া সারঙ্গ জাতিতে মুসলমান, দ্বিতীয় আরা নায়ক। ইনি জাতিতে ভাণ্ডারী বা ধীবর। খুব সম্ভব শিবাজী ধীবরদিগের মধ্য হইতেই অধিকাংশ নাবিক নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন—কারণ মহারাষ্ট্র অধিবাসীদিগের মধ্যে ইহারাই সমুদ্রগমনে অভ্যস্ত ও নৌচালনায় নিপুণ। মালবনে শিবাজীর একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির মস্তকে কোলীজাতীয় ধীবরদিগের সাধারণ শিরস্ত্রাণ। সম্ভবতঃ শিবাজীর নাবিকেরা সকলেই এইরূপ শিরস্ত্রাণ পরিধান করিত। দরিয়া সারঙ্গ ও আরানায়ক ব্যতীত দৌলত খাঁ নামক আরও একজন মুসলমান সেনাপতি শিবাজীর নৌবহরে উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন।

সভাসদের মতে শিবাজীর বহরে বিভিন্ন শ্রেণীর ৪০০ রণতরী ছিল। তিনি শিবাজীর রণতরীর মধ্যে গলিবত ও গুরবের সঙ্গে তরান্তী, তারু শিবার, মচেবা ও পগারের নাম করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাদের সকলগুলিকে রণতরী আখ্যা দেওয়া যায় না। গলিবত ও গুরব যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু সভাসদের উল্লিখিত অন্যান্য তরণীগুলিতে বোধ হয় বাণিজ্য ভিন্ন অন্ত প্রয়োজন সাধিত হইত না।

সাহিত্য, ফাল্গুন, ১৩২৯। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

মাতৃত্বের কার্য্যক্ষেত্র

পারিবারিক জীবনের বাহিরে নারীরও কীর্ত্তি আছে। রাজ্যশাসনে ও প্রজাপালনে, স্বদেশবাৎসল্য-প্রণোদিত আত্মোৎসর্গে ও শৌর্য্যে, সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ও সুকুমার শিল্পে, ব্রহ্মজ্ঞানে ও ভগবদ্ভক্তিতে কেবল যে পুরুষদেরই কৃতিত্ব ও খ্যাতি আছে তাহা নহে, মহিলারাও এই সকল বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তথাপি, ইহা বলিলে অসত্য বলা হয় না, যে নারীরা প্রধানতঃ তাঁহাদের পারিবারিক জীবন দ্বারাই বিচারিত হন। কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদের সহিত পারিবারিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াও তাঁহারা মানব-সমাজের জন্যও কিছু করিতে পারেন। অনেক নারী তাহা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা একটা অনুমান, মত, বা অভিলাষ মাত্র নহে; ইহা বাস্তব সত্য। পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া তাহার পর জগতের সেবা করা নারীরও যে কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, পুরুষদের মত তাঁহারাও তাঁহাদের শিক্ষা, জ্ঞান, সভ্যতা ও আনন্দের জন্য পিতামাতা আত্মীয় স্বজন ভিন্ন জগতের নিকটেও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে ঋণী; এবং এই ঋণ শোধ করা তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, ভগবান নারীদিগকেও আত্মা দিয়াছেন এবং নানা গুণ ও শক্তি দিয়াছেন। সুতরাং আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও এই সকল গুণ ও শক্তির সদ্ব্যবহার করা তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য। পুরুষেরা যত রকম কাজ করেন, মহিলাদের সেই সমস্তই করা উচিত, আমি তাহা মনে করি না। কিন্তু এই প্রবন্ধে সকল রকম কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা না করিয়া আমি সাধারণভাবে কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, জগৎকে আনন্দ, অনুপ্রাণনা ও শিক্ষা দিবার জন্য, মানবের দুঃখ-দুর্গতি মোচনের জন্য পুরুষেরা যত রকম কাজ করেন, মহিলারাও তাহা করিতে পারেন, এবং তাহা করা তাঁহাদের উচিত।

অনেকে ভাবিতে পারেন, জগতে পুরুষকর্ম্মী থাকিতে মহিলাদের উপর ডাক পড়ে কেন? ইহার সোজা উত্তর এই যে, এই পৃথিবী একটি বৃহৎ পরিবারের গৃহস্থালী। ক্ষুদ্র গৃহস্থালীকে যেমন পুরুষ কর্ত্তা কেবল পুরুষ সহায়কদের সাহায্যে আনন্দনিকেতন ও মঙ্গলময় করিয়া তুলিতে পারেন না, নারীর হৃদয় ও নারীর শক্তির সাহায্য লইবার প্রয়োজন হয়, তেমনই জগতের ইতিহাসের আধুনিক কাল পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, পুরুষ একা জগৎকে শুচিতা, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিতে পারে নাই, নারীর হৃদয় ও নারীর শক্তিকে

জগতের ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপকতর ক্ষেত্রেও তেমনি মাতৃত্ব করিতে হইবে। অনেক দেশে প্রধানতঃ নারীদের সমবেত চেষ্টায় ঔষধার্থ ভিন্ন সুরার উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার নিবারিত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষ নারী শিশু সকলের কল্যাণ হইয়াছে; সৈনিকদের স্বাস্থ্যের জন্য তাহাদের চরিত্র-ভ্রংশ; সুতরাং কতকগুলি অভাগিনী নারীর সর্ব্বনাশ একান্ত আবশ্যক, এই ধারণা ও তদনুরূপ নারকীয় ব্যবস্থা শ্রীমতী জোসেফিন্ বাট্‌লার প্রমুখ মহিলাদের প্রযত্নে উন্মূলিত হইয়াছে: যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকেরা যে উচ্ছৃঙ্খলতায় অভ্যস্ত হয়, তাহার ফলে সভ্যদেশ সকলে যে-সব করাল ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যুদ্ধের উচ্ছেদই যে তাহার একমাত্র প্রকৃষ্ট প্রতীকার, এই বিশ্বাসও মাতৃজাতীয়াদের সমবেত চেষ্টায় বদ্ধমূল হইতেছে; অনেক দেশে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্তা মহিলাদের চেষ্টায় শিশু-কল্যাণ প্রচেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে, এবং বিনা ব্যয়ে সূতিকাগার এবং প্রসূতিদের সেবা-শুশ্রূষা ও খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। শিশুদের ও বালকবালিকাদের যথেষ্ট সংখ্যক ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যবস্থাও অনেক দেশে মাতৃজাতীয়াদের চেষ্টায় হইয়াছে।

নব্যভারত, বৈশাখ ১৩২৯। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

দৃষ্টি ও সৃষ্টি

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ, কিম্বা দশরথের শব্দভেদ এমনি নানা রকম ভেদবিদ্যার কৌশল শিকরে পাখী থেকে আরম্ভ করে শিকারী মানুষে যখন লাভ করলো দেখলাম তখন সেই জীব অথবা মানুষ নিজের চোখ কান হাত পা ইত্যাদিকে অস্বাভাবিক রকমে অসাধারণ শক্তিমান করে তুল্লে এই কথাই বলতে হয় আমাদের। ছেলেকে অক্ষর চেনাতে শেখালে, বই পড়তে শেখালে তবে সে আস্তে আস্তে চোখে দেখতে পায়—কি লেখা আছে, বুঝতে পারে পড়াগুলো, এবং ক্রমে নিজেই রচনা করার শক্তি পায় একদিন হয়ত বা। যে মানুষ কেবল অক্ষর পরিচয় করে চল্লো, আর যে অক্ষর গুলোর মধ্যে মানে দেখতে লাগল, আবার যে রচনার নির্ম্মাণ কৌশল ও রস পর্য্যন্ত ধরতে লাগলো এদের তিন জনের দেখা-শোনার মধ্যে অনেকখানি করে পার্থক্য যে আছে তা কে না বলবে। ছবি কবিতা সুর-সার প্রভৃতি অনেক সময়ে যে আমাদের কাছে হেঁয়ালির মতো ঠেকে তা দুই দলের মধ্যে এই পরখ ও পরশের পার্থক্য বশতঃই হয়।

জেগে দেখার দৃষ্টি ধ্যানে দেখার দৃষ্টির সঙ্গে মিলতে তো পারে না যতক্ষণ না ধ্যানশক্তি লাভ করাই নিজেকে।

মোটামুটি দৃষ্টি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি এর মধ্যে মোটামুটি রকমের কার্য্যকরী দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি সমস্ত জীবেরই থাকে, তার উপরে উঠতে হলেই শিক্ষা ও অভ্যাস দিয়ে চক্ষুকর্ণের সাধারণ দেখা-শোনার মধ্যে অদল বদল কিছু না কিছু ঘটাতেই হয়। কুরু-পাণ্ডবে মিলে একশো পাঁচ ভাই, দ্রোণাচার্য্য যখন তাদের আন্দাজের পরীক্ষা নিলেন তখন দেখা গেল একশো চার ভাইয়ের শুধু চোখই আছে,—দৃষ্টি আছে কেবল একমাত্র অর্জ্জুনের। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের দিন লক্ষ্যভেদের সময় অর্জ্জুনের এই দৃষ্টি-রহস্যের হিসেব আরো পরিষ্কাররূপে পরীক্ষা হয়েছিল। পৃথিবীর ধনুর্দ্ধর একত্র হল স্বয়ম্বরে—দ্রুপ কর্ণ নানা বীর কিন্তু লক্ষ্যভেদের বেলায় কারো চোখ দ্রৌপদীর রূপের প্রভা দেখলে, কারো দৃষ্টি নিজের গলায় মণিহারের চমক্ লক্ষ্য করলে, কিন্তু লক্ষ্যভেদের আসল সামগ্রী সেটা জলের তলায় ঘূর্ণ্যমান সুদর্শন চক্রের প্রতিবিম্বের আড়ালে একটি বিন্দুর আকারে প্রকাশ পাচ্ছিল। সেটার বিষয়ে একেবারেই রাজারা অন্ধ রইলেন, একা অর্জ্জুনের দৃষ্টি সেটা লক্ষ্য করলে ও বিঁধলে। ঘড়ি যেমন শুধু ঘণ্টা প্রহর গুণে গুণে আমাদের জানিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, গ্রীষ্মের দিন কি শীতের, অথবা দিন দুই প্রহর কি রাত দুই প্রহর, এটা জানাবার সাধ্যই হয় না যেমন ঘড়ির—যতক্ষণ না ঘড়ির মধ্যে কোন একটা বিপর্য্যয় শক্তি সঞ্চার করে দেওয়া হচ্ছে, তেমনি এই চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটু অদল-বদল না ঘটাতে পারলে চোখ আমাদের ওঠা-বসা চলা-ফেরা এমনি কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট কাজের সহায় হয়ে যান্ত্রিকভাবে খবরদারি করতেই নিযুক্ত থাকে! ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে নিমেষে নিমেষে চোখ দেউড়ির ঝাঁপ খুলে বাইরেটা উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে আর নোট দিচ্ছে মানুষকে—এ হল তা হল, এ গেল সে গেল, এটা দেখা যাচ্ছে, ওটার খবর এখনো আসে নি! নিত্য নৈমিত্তিক কাজের অনেকখানি এই রকম মোটামুটি যান্ত্রিক রকমের দৃষ্টি দিয়েই চোখ আমাদের সম্পন্ন করে যাচ্ছে, এছাড়া অনেকখানি কাজ একেবারে চোখে না দেখে হাত পা ও গায়ের পরশ এবং পরখ দিয়ে এবং চোখের একটু আর সব ইন্দ্রিয়ের পরখের অনেকখানি মিলিয়ে করে চলেছি আমরা। জুতো পরায় জামা পরায়, চোখের পরখের চেয়ে গায়ের পরশ বেশী সাহায্য করে কোন্‌টা আমার জুতো বা জামা চিনিয়ে নিতে। মানুষের নিত্য জীবন-যাত্রার মধ্যে নিবিষ্টভাবে রয়ে-বসে দেখা এত অস্বাভাবিক আর বিরল যে কাযের মধ্যে হঠাৎ থমকে দাঁড়ানো, নয়নভরে কিছু দেখে নেওয়া, স্থির হয়ে কিছু উপভোগ করার সময় পায় না বল্লেই হয় সাড়ে পনেরো আনা লোকের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি, এটা অত্যন্ত অদ্ভুত কিন্তু অত্যন্ত সত্য ঘটনা। চোখে দেখলেম বাইরের পদার্থ তার রূপ রং ইত্যাদি, পাঁচ আঙুলে পরশ করে দেখলেম সেগুলো; শুনে দেখলেম বাইরের খবরাখবর, এই ভাবে জগতের বস্তু ও ঘটনার মূর্ত্তিটা

বেড়ে চল্লো মানুষ থেকে ইতর জীব তাবতেরই। মুখ চোখ কান হাত পা সব দিয়ে জীব যেন পড়ে চল্লো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ—বড় গাছ, লাল ফুল, ছোট পাতা, কিম্বা জল পড়ে, হাত নাড়ে, খেলা করে, অথবা নূতন ঘটী, পুরাণ বাটী, কাল পাথর, সাদা কাপড়—শুধু চোখের পড়া। কিম্বা যেমন মেঘ ডাকে, অথবা কাক ডাকিতেছে, বাঁশী বাজিতেছে, বেড়াল কাঁদিতেছে, মা বকিতেছে—শুধু শোনার পড়া অথবা যেমন—শীতল জল, তপ্ত দুধ, নরম গদি. শক্ত লোহা—শুধু পরশ করার পাঠ। এমন কল সব আজ কাল তৈরী হয়েছে যা চোখ যেমন করে দেখে ঠিক তেমনি করেই দেখে ও ধরে নেয় সৃষ্টির সামগ্রী চট্ করে নিমেষ ফেলতে! এতে করে মনে হয় এই সমস্ত কল মিলিয়ে একটা কলের পুতুল যদি কোন দিন ছবি মূর্ত্তি গান ইত্যাদি নানা জিনিষের সমালোচনা করতে এসে উপস্থিত হয় আমাদের মধ্যে তবে খুবই অদ্ভুত হবে সে ঘটনা কিন্তু আরো অদ্ভুত হবে কলের পুতুলের ছবি মূর্ত্তি গান কবিতা ইত্যাদির সমালোচনা। বস্তুতন্ত্রতা সেই কলের পুতুলে এত অভ্রান্ত রকমে থাকবে যে ছবি যদি প্রতিচ্ছবি, মূর্ত্তি যদি প্রতিমূর্ত্তি, গান যদি হরবোলার বুলি না হয় তো সে তখনি তার নিন্দা ও কঠিন সমালোচনা করে বসবে, কবিতা কল্পনা এ সবকে সে বলবে পাগলামি এবং ঠিক এখন সাধারণ মানুষ আমরা যেমন শিল্পশালায় সঙ্গীতশালায় বা অভিনয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে শিল্পকার্য্য যতটা মেলে ততটা তার বাহবা দিই, একটু বাস্তবিকতার ভ্রান্তি উৎপাদনের ব্যাঘাত হলে বলে বাস দূর ছাই, কলের পুতুলটিও ঠিক সেই ব্যবহারই করবে। মানুষের দেখা শোনা ছোঁয়া সমস্তই কাজ ও বস্তু এবং বাস্তবিকতার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে রইলো, নিখুঁত করে চিনে নিতে পারলে, অভ্রান্তভাবে ধরতে পারলে বাইরের এটা সেটা, এ ও তা, এমন তেমন ইত্যাদি বস্তু ও ঘটনা এই যে জ্ঞান একে বলা যেতে পারে বস্তু-বুদ্ধি বা বাস্তব-বুদ্ধি কিন্তু কিছুতেই একে বলা চলে না বস্তুর রসবোধ শিল্পবোধ সৌন্দর্য্য বোধ অথবা অর্থবোধ! বস্তু-জগতের সঙ্গে পরিচয় বুদ্ধির দিক দিয়ে ঘটিয়ে দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মানুষকে খুব দক্ষতা, চাতুর্য্য, বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা নিয়ে পাকা মানুষ কাজের মানুষ করে দেয় এটা যেমন সত্যি আবার শুধু এই গুণগুলি নিয়েই মানুষ গুণী কবি ও শিল্পী হয় না এটাও তেমনি সত্যি। সুরে কান হলেই যে মানুষ গান রচনা করতে পারে তা নয়, জহরৎ চিনলেই যে সবাই চমৎকার অলঙ্কার রচনা করতে পারে অথবা ভাল রসকবা গড়ে চল্লেই সে যে সৃষ্টির রসের রসিক হয়ে ওঠে তাও নয়। বহির্বাটীর রাস্তা ঘাট নিয়ম কানুন সমস্তই যেমন অন্দর মহলের সঙ্গে স্বতন্ত্র তেমনি বুদ্ধির প্রেরণা আর রসবত্তা বিকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। অন্দরে অথবা বৈঠকখানার গানের ও নাচের মজলিসে প্রবেশ করতে হলে আফিসের চোগা চাপকান ছেড়ে যেমন উপস্থিত হতে হয় কাজের দৃষ্টি কাজের কথা সায় কাজকে পর্য্যন্ত কড়া পাহারায় বাইরে আটকে, তেমনি রসবোধের রাজত্বে ঢোকবার কালে নিত্যকার দর্শন স্পর্শন শ্রবণের অনেকখানি পরিবর্ত্তন করে চলে মানুষ—এটা কেবল মানুষেই পারে ইতর জীব পারে না। নিত্য কাজের ব্যাপার সরিয়ে একটা জিনিষে গিয়ে মানুষের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ নিবিষ্ট হল নিবিড়ভাবে যখন তখনই মন পড়ল জিনিষে এবং মনে ধরা না ধরার কথা তখনই উঠলো। চোখ কান সমস্তকে কেবল—পাতা পড়ে, জল নড়ে, ইত্যাদি কাজের পড়া থেকে ছুটি দিয়ে সৃষ্টির জিনিষের ও ঘটনার দিকে ছেড়ে দেওয়া গেল এতে মানুষের পরখ ও পরখ করার একটা কৌতূহল দেখা দিলে কাজের জগতের বাঁধাবাঁধি নিয়মে দেখা শোনা করতে অপটু থাকে শিশুকালে সব মানুষ স্বভাবতঃই, বাপ মাকে তারা কাজে খাটায় নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর চেয়ে, কাজেই সামান্য সামান্য জিনিষকেও বড় মানুষের চেয়ে বেশী কৌতূহলের সঙ্গে শিশুরা দেখবার শোনবার অবসর পায়, মন তাদের আকৃষ্ট হয় বস্তুর উপর ঘটনার দিকে অনেকখানি এবং মন তাদের খেলেও অনেকখানি অনেক জিনিষের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অগাধ কৌতূহলে। শিশুকালের এই কৌতূহল দৃষ্টির কিছু কিছু রেশ্ মানুষের বয়সকালেও নানা জিনিষ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেখা যায়—চন্দ্রোদয় সূর্য্যোদয় শুকতারা ফোটাফুল মেঘের ঘটা বিদ্যুৎ, কিম্বা এক টুকরো হীরে অদ্ভুত গড়নের ঢেলা, অথবা বিচিত্র গড়নের অলঙ্কার কি কিছু অথবা অদ্ভুত একটা সমুদ্রের ঝিনুক ইত্যাদি নানা টুকিটাকি নিয়ে খুব বয়সেও মানুষ অনেক সময়ে নাড়াচাড়া করছে কৌতূহলের বশে দেখা যায়।

কাজের জগতে চলাচল করতে করতে এই অত্যন্ত কাজের পরকোলা এত শক্ত হয়ে আমাদের চোখে দেখা শুনে দেখা ছুঁয়ে দেখার উপরে বসে যায় যে মনে হয় চিরদিন এই ভাবে দেখে বলাই বুঝি সব মানুষেরই কাজ কিন্তু অত্যন্ত ছেলে মানুষ যারা তারা আমাদের এই ধারণা উল্টে দিয়ে যায়, কবিরা উল্টে দিয়ে যায় শিল্পীরা উল্টে দিয়ে যায় আর ঠিক সেই মানুষগুলিকেই আমরা বালক পাগল নির্ব্বুদ্ধি বলে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার দাবি সপ্রমাণ করে চলি। কিন্তু সৌন্দর্য্য ভরা, রসে ভরা, রংএ ভরা, রূপে ভরা, ভাব লাবণ্য সব দিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর করে রচনা করা এই সৃষ্টির মাঝে মানুষ কেবল বুদ্ধিমত্তার সত্তা নিয়ে বর্ত্তে থাকবে, নয়ন ভরে কিছু দেখে নিতে চাইবে না, প্রাণ ভরে মন দিয়ে কিছু শুনে যেতে চাইবে না পরশ করে পুলকিত হতে চাইবে না, মানুষ সমস্ত বিশ্বের রস, এ যিনি মানুষকে মন দিয়া সৃষ্টি করলেন তাঁর ইচ্ছে কখন হতে পারে না। এবং এই কথাই সপ্রমাণ করতে প্রথমেই

এল কাজ ভোলা কাজ ভোলানো শিশু খুব কাজের জগতে অফুরন্ত কৌতূহল অকারণ হাসি কান্না ইত্যাদি নিয়ে! সেই শিশু, কাজে কর্ম্মে দিন রাত ভরা মানুষের ঘরের মধ্যে এসে তার কৌতুক কৌতূহল যারা জাগালো—মাটির ঢেলা, কাঠের টুকরো—তাদের নিয়ে নিরিবিলি আপনার খেলা-ঘর বাঁধলে—কল্পনা পক্ষিরাজের অতি অপূর্ব্ব আস্তানা, সেখানে কাজ হয়ে গেল একেবারে খেলা, খেলাই হয়ে উঠলো মস্ত কাজ। শিশুকালের হারানো চমৎকারি-কাচ অনেক কষ্টে খুঁজে পুঁজে সেইটে বার করে সাদ সিধে কাজের চেয়ে দেখা, শুনে দেখা ছুঁয়ে দেখার উপরে যেমনি বেশ করে এঁটে দিলে মানুষ, অমনি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আবার তার কাছে তরুণ হয়ে দেখা দিলে, কৌতুকে কৌতূহলে, ভরে উঠলো সৃষ্টির সামগ্রী। যে সব ইন্দ্রিয় কেবলি দিনেদের কাজে পাহারার কাজে লেগে ছিলো তারা হয়ে উঠলো কৌতূহলপরায়ণ এবং সন্ধানী। সাদা সিধে রকমে বুদ্ধির চাষ করে চলাতেই চোখে দেখা শুনে দেখা ছুঁয়ে দেখা বদ্ধ রইলোনা, চঞ্চল দৃষ্টি এ-ফুলে ও-ফুলে উড়ে পড়তে লাগলো বটে, কিন্তু হঠাৎ দৃষ্টির চঞ্চলতার মধ্যে এক একটা সম্ আর ফাক পড়তে লাগলো, প্রজাপতি যেন হঠাৎ ডানা দুখানা স্থির করে আলোর পরশ ফুলের পাপড়ির রং এবং ফুলেরো ভিতরকার কথা ধরবার চেষ্টা করতে থাকলো। দর্শন স্পর্শন শ্রবণের যান্ত্রিকতা কতকটা দূর হয়ে তাদের মধ্যে আন্তরিকতা একটু যেন বিকশিত হল। যে সব শরীরযন্ত্রের কাজই ছিল বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাহিরের প্রেরণায় চট্‌পট্ সাড়া দেওয়া নির্ব্বিচারে, অন্তরের সঙ্গে মানুষ যেমনি তাদের যুক্ত করে দিলে অমনি ভিতরকার প্রেরণায় তারা ধীরে সুস্থে একটুখানি যত্নের সঙ্গে একটু কৌতূহল নিয়ে যেন আত্মীয়তা পাতাতে চল্লো বাহিরের এটা ওটা সেটার সঙ্গে, একটু দরদ পৌছল দেখা শোনা ছোঁয়ার মধ্যে! এ একটা মস্ত ওলটপালট ঘটলো, হাত পা চক্ষু কর্ণের কাজের স্বাভাবিক ও যান্ত্রিক ধারায়—উজান টান ধরলো যমুনায়। এই যে কৌতূহল-প্রবণতা, দরদ দিয়ে সব জিনিষ দেখার অভ্যাস, কাজের দেখার প্রায় বিপরীত উপায়ে সৃষ্টির জিনিষকে আলিঙ্গন করে পরখ করা, ছেলেবেলাকার হারিয়ে যাওয়া খেলাঘরের কাজ-ভোলা দৃষ্টি একে ফিরে পাওয়া দরকার কিনা, এ নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ দেখা যায় কিন্তু একদিনও মানুষ একটিবার সেই ছেলেবেলার দেখা শোনা খেলা ধূলোর মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছা করলেনা এমন ঘটনা মানুষে বিরল।

সখ করে নানা সৌখিন জিনিষের সাজসজ্জার দিকে অথবা বিচিত্রা এই বিশ্ব প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যের দিকে চাওয়া হল বিলাসীর চাওয়া, বেতাল পঁচিশের ভোজনবিলাসী শয্যাবিলাসী এরা সাতপুরু গদির তলায় একগাছি চুল, রাজভোগ চালে শবগন্ধ অতি সহজেই ধরতে পারতো, কিন্তু বিলাসীর দেখা প্রকাণ্ড রকম স্বার্থ নিয়ে দেখা, অত্যধিক মাত্রায় কাজের দেখা এ দৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি কিম্বা কাজ-ভোলা শিশুর সরল দৃষ্টি একেবারেই নয়, অতিমাত্রায় বস্তুগত দৃষ্টিই এটা! বিলাসীর দৃষ্টি স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে সৃষ্টির যথার্থ শোভা সৌন্দর্য্য ও রসের বিষয়ে মানুষটাকে বাস্তবিকই অন্ধ করে রাখে অনেকখানি, আর ভাবুকের দৃষ্টি কাজভোলা ছেলেবেলার দৃষ্টি সৃষ্টির অপরূপ রহস্যের খুব গভীর দিকটায় নিয়ে চলে মানুষকে।

শিশু যখন একটা কিছু ঘটনা বর্ণনা করে তখন তার মুখ চোখ হাত পা সমস্তই যেন ঘটনাটাকে মূর্ত্তি দিয়ে বাইরে হাজির করবার জন্যে আকুলি ব্যাকুলি করছে দেখা যায়, বড় হয়ে যারা আপনাদের দৃষ্টি শ্রবণ স্পর্শনের উপরে অত্যন্ত কাযের চশমা এঁটে দিয়েছে তাদের বোঝাই মুস্কিল হয় শিশুকাল অনাসৃষ্টি কি দেখছে, কিবা দেখাতে চাচ্চে, কি শুনছে কিবা শোনাচ্ছে! শিশুর হৃদয় যে ভাবে গিয়ে স্পর্শ এবং পরখ করে নেয় বিশ্বচরাচরকে একমাত্র ভাবুক মানুষই সেই ভাবে বিশ্বের হৃদয়ে আপনার হৃদয় লাগিয়ে দেখতে পারেন, শুনতে পারেন এবং অবোলা শিশু যেটা বলে যেতে পারলে না সেইটেই বলে যায় ভাবুক কবিতায় ছবিতে,—রেখার ছন্দে লেখার ছন্দে সুরের ছন্দে অবোলা শিশুর বোল, হারানো দিনগুলির ছবি। অফুরন্ত আনন্দ আর খেলা দিয়ে ভরা শিশুকালের দিনরাত-গুলোর জন্যে সব মানুষেরই মনে যে একটা বেদনা আছে সেই বেদনা ভরা রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে চলেন মানুষের মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক যাঁরা শিশুর মতো তরুণ চোখ ফিরে পেয়েছেন।

ন্যেকামো দিয়ে শিশুর আবোল তাবোল আধ-ভাঙ্গা কতকগুলো বুলি সংগ্রহ করে, অথবা শিশুর হাতের অপরিপক্ক ভাঙ্গাচোরা টানটোন আঁচড় পোঁচড় চুরি করে বসে বসে কেবলি শিশু কবিতা শিশু-ছবি লিখে চল্লেই মানুষ কবি শিল্পী ভাবুক বলাতে পারে নিজেকে এবং কাজগুলোও তার মন ভোলানো হয় এভুল যারা করে চলে তারা হয়তো নিজেকে ভোলাতে পারে কিন্তু শিশুকেও ভোলায় না শিশুর বাপ মাকেও নয়। ছেলে ভুলানো ছড়া একেবারেই ছেলেমান্‌ষি নয়, তরুণ দৃষ্টিতে দেখা শোনার ছবি ও ছাপ সেগুলি—

ও পারেতে কাল রং, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্
এ পারেতে লঙ্কা গাছ রাঙ্গা টুক্ টুক্ করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে!

অজানা কবির গান ছেলেমান্‌ষি মোটেই নয় এতে ছেলে বুড়ো সবার মন ভুলিয়ে নেয়। আমাদের খুব জানা কবি এই সুরেই সুর মিলিয়ে বাঁধলেন, এরি মত সরল সুন্দর ভাষায় ও ছন্দে আপনার কথা :—

ওই যে রাতের তারা
জানিস্ কি মা কারা?

সারাটি-খন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমন ধারা।
আমার যেমন নেইক ডানা,
আকাশেতে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে
তেমনি ওদের পা নেই বলে
পারে না যে আসতে চলে
এই পৃথিবীর পরে।

আমাদের তরুণ-চোখের নয়নতারা একদিন আকাশের তারার দিকে চেয়ে সে সব কথা ভেবেছিল কিন্তু যে ভাবনা ব্যক্ত করতে পারেনি আমাদের শিশুকাল, এতকাল পরে সেই ভাবনা ফুটে উঠলো কবির ভাষায়।

বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩২৯। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রথম চিঠি

১

বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেচে প্রবাসে।

চলে যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়ল। মন বল্‌লে "ফিরি, দুটো কথা বলে আসি।" কিন্তু সেটুকু সময় ছিল না।

সে দূরে আস্‌চে বলে একজনের দুটি চোখ বেয়ে জল পড়ে তার জীবনে এমন সে আর কখনো দেখেনি।

পথে চলবার সময় তার কাছ পড়ন্ত রৌদ্দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মত একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে সেই কথা মনে করে, বিস্ময়ে তার বুক ভরে উঠ্‌ল।

যেখানে সে কাজ করতে এসেচে সে পাহাড়। সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মত পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোট ছোট ঝরণা কা'কে যেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায়, লুকিয়ে চুরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিটিরই আভাস দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

২

আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেচে, "তুমি কবে ফিরে আস্‌বে? এসো এসো, শীঘ্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

এই আসা যাওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল একথা কে জান্‌ত? সেই দুটি আতুর চোখের চাউনির সামনে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখ্‌লে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে' উঠ্‌ল।

ভোর বেলায় উঠে' চিঠিখান নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে, আর কানে যেন সে শুন্‌তে পায়, "তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।"

মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, "এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে?"

৩

এমন সময় সূর্য্য উঠ্‌ল। পূর্ব্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে দেবদারুর শিশির-ভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠ্‌ল।

হঠাৎ চারিটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়্‌ল। কি জানি কি ছিল তার মুখে, কিম্বা তার সাজে, কিম্বা তার চাল চলনে।—বড় মেয়ে দুটি কৌতুকে মুখ একটু খানি বাঁকিয়ে চলে গেল। ছোট মেয়ে দুটি হাসি চাপবার চেষ্টা করলে, চাপ্‌তে পারলে না; দুজনে দুজনকে ঠেলাঠেলি করে খিল খিল করে হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝরণাগুলিরও সুর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে চলে আর ভাবে—"আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি?"

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল; একলা ঘরে বসে চিঠিখানি খুলে পড়লে, "তুমি কবে ফিরে আস্‌বে? এসো এসো, শীঘ্র এসো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি!"

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে ভারতের কথা

বঙ্গদেশে যখন একখানিও নাটক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই, বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাট্য-কাব্যের অভিনয় যখন কোনও বাঙ্গালী কবি কল্পনা করেন নাই, এমন কি দিল্লী ও আগ্রার মসনদের ইতিহাস পর্য্যন্ত যে সময়ে কোনও বাঙ্গালী লেখক লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই, সে সময়ে ইংরাজী রঙ্গমঞ্চে ভারতের শাসন-কর্ত্তাদের কার্য্যাবলী ইংরাজ অভিনেতৃ দ্বারা

অভিনীত হইয়াছিল, এ কথা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ড্রাইডেনের "ঔরঙ্গজেব" নামক নাট্য-কাব্য ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের গ্লোব (Globe) রঙ্গালয়ে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। বার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে (Bernier's Travels) লিখিত ঘটনাবলী অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছিল। নাট্টোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সেইজন্য প্রায় সকলেই পাঠকের পরিচিত। সাজাহান, ঔরঙ্গজেব, মোরাদ, নুরমহাল, আগ্রার শাসনকর্ত্তা অরিমন্ত, দিয়ানাত, সোলেমান, মিরবাবা, আব্বাস, আসফ খাঁ, ফজল খাঁ, মোরাদের স্ত্রী মেলিসেন্দা, নুরমহালের প্রিয় ক্রীতদাসী জায়দা ও ইন্দামোরা প্রভৃতি কুশীলবগণের মধ্যে ঔরঙ্গজেব নাটকের নায়ক ও ইন্দামোরা নায়িকারূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন। নায়িকার নামটি কবির রচিত। ইন্দামোরা (Ind+amora) কাশ্মীরের বন্দী রাণী। সাজাহান, ঔরঙ্গজেব, মোরাদ ও অরিমন্ত তাঁহাকে মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছে। ইন্দামোরা কিন্তু কেবল ঔরঙ্গজেবকে হৃদয়ের দেবতা করিলেন।

নাটকের প্রথমাঙ্কে আমরা দেখিতে পাই যে, ইন্দামোরার রূপে মুগ্ধ ঔরঙ্গজেব সম্রাটের আজ্ঞার বিরুদ্ধে বন্দীকে কারামুক্ত করিলে অরিমন্তের সহিত তাঁহার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। ইন্দামোরা যুবরাজ ঔরঙ্গজেব ও অরিমন্তের মাঝে পড়িয়া সে যাত্রা রক্তপাত বন্ধ করিলেন। দ্বিতীয়াঙ্কের সূচনাতে আমরা দেখিতে পাই যে, অরিমন্ত ইন্দামোরাকে হৃদয়ের সুমধুর বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছেন। সম্রাট সাজাহান অন্তরালে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের প্রণয় সম্ভাষণ শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। ইন্দামোরা সম্রাটকে বলিলেন যে, অরিমন্ত সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহাকে প্রেমের গাথা শুনাইতেছিলেন। সম্রাট ইহাতে শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি ইন্দামোরাকে বলিলেন যে, তিনি ঔরঙ্গজেবকে ভালবাসিতে পারিবেন না। এমন সময়ে সম্রাজ্ঞী নুরমহাল সেখানে আসিতেছেন শুনিয়া ইন্দামোরাকে তাড়াতাড়ি দৃশ্যপটের অন্তরালে সরাইয়া দেওয়া হইল। নুরমহাল সম্রাটকে অনেকগুল শক্ত কথা শুনাইয়া দিলেন। সাজাহান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিলেন। ঔরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন ও মাতার মুক্তির জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। নুরমহাল মুক্ত হইলে দ্বিতীয়াঙ্ক শেষ হইল। তৃতীয়াঙ্কে ট্রেজেডি ঘনাইয়া আসিল। মোগল রাজত্বে, বিশেষতঃ সাজাহানের সময়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা স্মরণ করিয়া কবি মোরাদ ও ঔরঙ্গজেবের মধ্যে ঈর্ষার যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক নহে। উভয়েই ভারতের রাজ-মুকুট পাইবার উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। ইন্দামোরা জানিতেন যে, বৃদ্ধ সাজাহান যদি মোরাদকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন তাহা হইলে ঔরঙ্গজেবের সমূহ বিপদ। রাজ-প্রাসাদের কক্ষাভ্যন্তরে ইন্দামোরার সহিত মোরাদের স্ত্রী মেলিসেন্দার কথাবার্ত্তা শুনিলে মেঘনাদ বধ কাব্যের সীতা ও সরমার চিত্র মনে পড়ে। ড্রাইডেন ইন্দামোরা ও মেলিসেন্দার মধ্যে সখীত্ব পাতাইয়াছেন। সংবাদ আসিল যে, ঔরঙ্গজেব সম্রাট কর্ত্তৃক অপমানিত ও মোরাদ সিংহাসনের ভাবী অধিকারী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। তৃতীয়াঙ্কে সাজাহান, ঔরঙ্গজেব, মোরাদ ও নুরমহালের কথোপকথন শুনিলে তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সাজাহানের তখনকার মনের ভাব এই যে, ঔরঙ্গজেবকে রাজ্য হইতে সরাইয়া দিলে ইন্দামোরার হৃদয় তিনি অধিকার করিয়া লইতে পারেন। সম্রাট জনান্তিকে ঔরঙ্গজেবকে বলিলেন যে যদি তিনি ইন্দামোরার প্রণয়কে উপেক্ষা করেন তাহা হইলে মোরাদের পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই তিনি রাজসিংহাসনে বসাইবেন। ঔরঙ্গজেব সম্রাটের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ইন্দামোরা ব্যতীত অপর সকলে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে মোরাদ বলিলেন যে ঔরঙ্গজেবকে হত্যা করিতেই হইবে এই কথা শুনিয়া ইন্দামোরা মোরাদকে ঔরঙ্গজেবের জীবনের জন্য কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করিলেন। শেষে মোরাদের দৃঢ়তা দেখিয়া ঔরঙ্গজেবকে বাঁচাইবার নিমিত্ত ইন্দামোরা মোরাদকে তাঁহার হৃদয়ের গুপ্ত-প্রেমের কথা ইঙ্গিতে জানাইলেন। মোরাদের পাষাণ হৃদয় প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া গলিয়া গেল। ঔরঙ্গজেব তখনকার মত রক্ষা পাইলেন। চতুর্থাঙ্ক এই ঐতিহাসিক নাটকের রক্তাক্ত ট্রেজিক ঘটনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ঔরঙ্গজেব সন্দেহ করিয়াছেন যে, ইন্দামোরা মনে মনে মোরাদকে ভালবাসেন। অরিমন্ত আসিয়া সংবাদ দিলেন, যে, মোরাদ সৈন্যগণ লইয়া রাজধানী বলপূর্ব্বক দখল করিতে আসিতেছেন। সাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের মধ্যে এইবার বুঝি প্রীতির আশা হইল। পঞ্চমাঙ্কে আমরা দেখিতে পাই যে, মোরাদ ও ঔরঙ্গজেবের সৈন্যগণের মধ্যে যে যুদ্ধাগ্নি জ্বালিয়াছিল, ক্রমে তাহা দুর্গ হইতে রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। মোরাদ আসিয়া সংবাদ দিলেন, যে, তাঁহার সৈন্যগণ দুর্গ জয় করিয়াছে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে যখন সৈন্যগণের কোলাহল পৌঁছিল ও তৎসঙ্গে নুরমহাল দেখা দিলেন তখন ইন্দামোরা রঙ্গমঞ্চ হইতে প্রস্থান করিলেন। নুরমহাল ঔরঙ্গজেবের শত্রু ও মোরাদের পক্ষপাতী ছিলেন। ঔরঙ্গজেব পলাইয়াছেন শুনিয়া নুরমহাল উদ্বিগ্না হইলেন। সাজাহান বিদ্রোহী মোরাদের আচরণে ব্যথিত হইয়াছিলেন। সম্রাট সেই কারণে নুরমহালের উপর বিরক্ত হইলেন। নুরমহাল, বারংবার বলিতেছেন যে,

ঔরঙ্গজেবকে ধৃত করা চাই, নহিলে কখন সে অকস্মাৎ আক্রমণ করিবে। মোরাদ আহত হইয়া অন্তঃপুরে আনীত হইলে ইন্দামোরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু মোরাদকে কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হইলে ইন্দামোরা তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। পরক্ষণেই বিজয়ী ঔরঙ্গজেব অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ইন্দামোরাকে মোরাদের প্রতি আসক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করাতে ইন্দামোরা মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতে লাগিলেন। নুরমহাল বোধ হয় বিষপান করিয়াছেন। তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় সেথায় আসিয়া অসংলগ্ন কথা কহিতে লাগিলেন। ইহার পর মোরাদের মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। মেলিসেন্দা মৃত পতির অনুগমন করিতেছেন সাজাহান ঔরঙ্গজেবকে রাজ্যভার ও তৎসঙ্গে ইন্দামোরার পাণি অর্পণ করিয়া রাজনৈতিক জগত হইতে সরিয়া পড়িলেন।

ড্রাইডেন মোরাদের পত্নী মেলিসেন্দাকে হিন্দু স্ত্রীর ন্যায় মৃতপতির সহগমন করিতে দেখিয়াছেন। এই ব্যাপারটি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ইংরাজ কবি তথনও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ সামাজিক পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন বার্ণিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে ড্রাইডেন যে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে চরিত্র-চিত্রণ শিল্প কিন্তু কবির তুলিকার সাহায্যে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। মেলিসেন্দার চরিত্র সম্বন্ধে ড্রাইডেন নিজে লিখিয়াছেন,—"I have made my Melisenda, in opposition to Nur-Mahal, a woman passionately loving of her husband, patient of injuries and contempt and constant in her kindness to the last and in that perhaps, I may have erred, because it is not a virtue much in use. Those Indian wives are loving fools and may do well to keep themselves in their own country, or at least, to keep company with the Arria's and Portia's of old Rome."

অর্চ্চনা, বৈশাখ, ১৩২৯।　　শ্রীপ্রিয়লাল দাস।

কাগজের কথা

অতি প্রাচীনকালে নরগণ স্মরণীয় কার্য্যকলাপ স্মরণ রাখিবার জন্য বৃক্ষাদিরোপণ বা প্রস্তর স্তূপাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিত অথবা সেই সমস্ত ঘটনাবলী জনশ্রুতিতে এবং লোকমুখে প্রচারিত হইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গহ্বরবাসী নরগণ পাথর কাঠ বা হাড়ের উপর মনোভাব প্রকাশের কোন সঙ্কেত খোদিত করিয়া গিয়াছেন কিনা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সভ্যতার প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরে চিত্রলিপি (Picture-writing) আবিষ্কৃত হইয়া রক্ষিতব্য বিষয় সকল প্রস্তরে বা কাষ্ঠে খোদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পিরামিডের গাত্রে খোদিত অক্ষর মালাই ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন। সিরিয়ার উপকূলবর্ত্তী ফিনিসিয়ায় অধিবাসীদের বর্ণমালা মিশরের অনুকরণে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণের ধারণা। Code of Hammurabi হামুরবির নিয়মাবলী, ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এক প্রকার কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর খোদিত হইয়াছিল।

যে যুগে বেদের মন্ত্র সংহিতার আকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল, সে সময়েও অক্ষর ছিল; তবে সে ঠিক কোন্ সময়ে তাহা নিশ্চিত হয় নাই। খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে। এদেশে পাথরে খোদাই লিপি মৌর্য্যদের সময় হইতেই পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বের পাথর রক্ষিত না হওয়ায় বলা দুঃসাধ্য যে কবে ভারতীয় লিপির সৃষ্টি হইয়াছে।

অক্ষরমালা পাথরে খোদাই করা অপেক্ষা মাটিতে অঙ্কিত করা সহজ; সেই কারণে কাঁচা ইঁটের উপর অক্ষর লিখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হইত। ব্যাবিলেন রাজকন্যার পাণি প্রার্থনা করিয়া ফ্যারাও (pharaos) বংশীয় জনৈক রাজা যে মৃত্তিকা-ফলক-লিপি পাঠাইয়াছিলেন তাহা বিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রেমলিপির নিদর্শন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৫৩০ সালে উক্ত লিপি লেখা হইয়াছিল, মনে হয়। ইহাও জানা গিয়াছে যে, রাজকর আদায়কারীরা খচ্চরের পিঠে বোঝাই করিয়া 'খোলাকুচি' (Potsherd) লইয়া যাইত এবং শস্যকারীরা উহার উপর আঁচড়াইয়া রসিদ দিয়া আসিত। প্রাচীন কালদীয় (Chaldean) জ্যোতির্ব্বিদ-গণ তাঁহাদের গবেষণার ফলাফল এই প্রকার ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে সীসার পাত ও পিতলের পাত পিটিয়া পাতলা করিয়া লেখারূপে ব্যবহৃত হইত এবং উহার উপর দলিলাদিও লিখিত হইত। হাতীর দাঁতের পাতও এই ভাবে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন রোমে এই সকল প্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল।

কাঠের তক্তার উপর খড়ি গোলা দিয়া লিখিবার পদ্ধতি এখনও মুদীর দোকানে দেখা যায়। ইহারা হিসাব টুকিয়া রাখিবার জন্য কাঠের উপর মোমের মিশ্রিত এক প্রকার প্রলেপ দিয়া রাখে এবং উহার উপর পেরেক দিয়া আঁচড়াইয়া হিসাব লিখে। পুরাকালে গ্রীকভাষায় অনেক পুস্তক কাঠের উপর খোদিত হইয়াছিল। সোলোনের (Solon) আইন এইরূপে খোদিত ছিল। লিখিত কাষ্ঠ ফলকগুলি একত্রে বাঁধিয়া রাখিলে একখানা পুঁথি বা (Codex) বলিয়া গণ্য হইত।

নাগরী অক্ষরের বয়স খুব অল্প; বড় জোর খৃষ্ট পরবর্ত্তী নবম শতকে। প্রায় সেই সময়েই প্রাচীন অক্ষর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের

জন্য। প্রাচীন ভারতের যে লিপি এখন পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে, তাহা খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর।

সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অনেক জাতিই বৃক্ষপত্র লেখারূপে ব্যবহার করিত। মিশরে সর্ব্ব প্রথমে তালপত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয় বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদগণের ধারণা। বৃক্ষবল্কলও লেখারূপে ব্যবহৃত হইত। পশুচর্ম্ম, এমন কি সর্পচর্ম্মের উপরও লোকে লিখিতে ছাড়ে নাই। কথিত আছে যে, টলেমিয়াস ফিলাডেলফিয়াসের সময়ে মিশরের কোন পুস্তকালয়ে হোমারের মহাকাব্য "ইলিয়াড" ও "অডেসির" এক সংস্করণ স্বর্ণাক্ষরে সর্পচর্ম্মের উপর লিখিত ছিল। যেখানে পশুচর্ম্মের উপর লিখন কার্য্য চলিত, সেখানে ছাগল ও ভেড়ার চামড়াই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। এখনও দলিলাদি লিখিবার জন্য পার্চমেণ্টের ব্যবহার আছে। প্রাচীন ইহুদীদের আইন, মেষচর্ম্মের উপর লিখিত হইয়াছিল। আধুনিক কাগজ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষবল্কলেরই অধিক প্রচলন ছিল। ব্যবহারে সুবিধা থাকাতে উহাদের আদর ছিল। অস্মদ্দেশীয় ভূর্জ্জপত্রের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। গাছের আভ্যন্তরীণ ছাল ব্যবহার করিতে করিতে কাগজ আবিষ্কারের পথ ক্রমশঃ সুগম হইয়া আসিল।

ঐতিহাসিকগণের মতে মিশর দেশের "পেপিরস" (Papyrus) নামক তৃণের মৌলিক গুণ আবিষ্কৃত হওয়ায় কাগজ শিল্পের প্রথম সূত্রপাত হয়। কোন্ সময়ে আবিষ্কার হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু প্লিনি (Pliny) তাঁহার পুস্তকে নিউমার (Numa) লিখিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। নিউমা ৬৭০ খৃষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দীর লোক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে 'পেপিরাস্' তৃণ কাগজাকারে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই তৃণের মূলদেশ হইতে প্রস্তুত কাগজই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা শরের ন্যায় নীল নদের জলা জমিতে জন্মে। প্রায় ৮।১০ ফিট দীর্ঘ হয়, কোন কোন গাছ আরও বড় হয়। ইহার পাতা কতকটা আমাদের ঝাউগাছের পাতার ধরণের। ওলের গাছের মত সরল হইয়া উঠে এবং ওলের পাতার মত ছত্রাকার ধারণ করে। গোড়ার অংশের ছাল অতি পাতলা ও মোচার খোলার মত। এই খোলা গুলি টেবিলের উপর রাখিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগে খুলিয়া লইয়া আড় ভাবে জুড়িয়া গেলেই সেকালের 'পেপিরি' প্রস্তুত হইল। যে গাছের গোড়া যতটা মোটা, 'পেপিরি' কাগজ ততটা চওড়া হইত। এক এক তা 'পেপিরি' তৈয়ার হইলে হয় হাতীর দাঁত নয় পালিশ করা পাথর ঘসিয়া উহা মসৃণ করা হইত। গ্রীকেরা অতি পাতলা 'পেপিরিকে' "হেরেটিকা" বলিত। ইহার উপরে মিশরের ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্ম কথা লিখিয়া বিক্রয় করিত। বিদেশী বণিকের নিকট পাতলা কাগজ বিক্রয় করা নিষেধ থাকিলেও হেরেটিকা বিক্রয় নিষেধ ছিল না। রোমসম্রাট্ অগস্তাসের সময় রোমকেরা মিশর হইতে হেরেটিকা ক্রয় করিয়া, এক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার উপরকার লেখা ধুইয়া ফেলিত। এই প্রকারে ধৌত কাগজ রোমক বণিকেরা 'অগস্তাস্' মার্কা কাগজ নাম দিয়া বিক্রয় করিত। তাহার পর রোমে নানা প্রকার "পেপিরি" প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। প্লিনি বলিয়াছেন যে সাধারণের এমন একটা ধারণা ছিল যে, নীলনদের জলে আঠাবৎ এমন কোন পদার্থ আছে যাহার গুণে সহজে সে দেশে পেপিরি প্রস্তুত হইত এবং সহজেই ছালগুলি জুড়িয়া যাইত। আসল কথা, পেপিরি ছাল ভিজাইলে উহা হইতে এমন এক প্রকার রস বাহির হইত যাহাতে আঠার কাজ করিত এবং শুকাইলেই দেখা যাইত যে ছাল গুলি জুড়িয়া গিয়াছে। আঠার জল দিয়াও অনেক সময় ছাল জোড়া হইত। রোমকেরা পেপিরাস্ দ্বারা অনেক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সকল কাগজের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছিল যথা—Charta hieratica, Charta Emporetica, Charta Saitica। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে 'হিরাকুলিয়ম্' ধ্বংসাবশেষ খুঁড়িয়া বাহির হইলে কমবেশী ১৮০০ চোঙ্গাকারে গুটান (rolls) কাগজ পাওয়া গিয়াছিল। পেপিরাস হইতে মিশর দেশে চাটাই, দড়াদড়ি এমন কি পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইত; কিন্তু ইহা লিখনের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় অতীতের ইতিহাস জানিবার সহায়তা হইয়াছে।

বহু গবেষণার ফলে ঠিক হইয়াছে যে চীনেরাই প্রথমে অংশুমান (Cellulose) পদার্থ হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছে। প্রথমে ইহারা বাঁশের ভিতরকার ছালের উপর শলাকা দিয়া আঁচড়াইয়া লিখিত। পরে বাঁশের ছাল, তুলা, রেশম এবং অন্যান্য গাছের ছাল, মাছধরা জালের ছিন্নাংশ ও শন, একত্র সিদ্ধ করিয়া মণ্ড (pulp) প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। চীনেরা অতি প্রাচীনকালে যে সমস্ত যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছিল তাহারই উন্নতি সাধন করিয়া ইউরোপে নানাবিধ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। "ছনরেচীন" এ কথার সার্থকতা, কাগজ উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়; আবার এসিয়া ও ইউরোপের লোকের বিজ্ঞান চর্চ্চার পদ্ধতিতে কত প্রভেদ তাহাও ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে। ভারতে কোন সময়ে হাতে-গড়া কাগজ বানান আরম্ভ হয় তাহার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। তবে খৃষ্ট জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে একপ্রকার "তুলা-চাপড়ান" জিনিষের উপর যে ব্যবসায়ীরা হিসাব লিখিত তাহার কথা পাঞ্জাব-বিজয়ী গ্রীকদিগের বিবরণে পাওয়া যায়। এই "তুলা চাপড়ান" জিনিষ এবং "তুলট" কাগজ একই জিনিষ কিনা, তাহা বলা যায় না।

নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩২৯। শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী।

পথহারা

১

আজকে আমি কত দূরে
যে গিয়ে ছিলেম চলে,
যত তুমি ভাবতে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তা'
তোমায় বলে বলে'।

২

অনেক দূর সে আরো দূর সে
আরো অনেক দূর।
মাঝ খানেতে কত যে বেত,
কত যে বাঁশ কত যে ক্ষেত
ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুর-বাড়ী
ছাড়িয়ে তালিমপুর।

৩

পেরিয়ে গেলাম যেতে যেতে
সাত কুশী সব গ্রাম।
ধানের গোলা গুন্‌ব কত
জোদ্দারদের গোলার মত,
সেখানে যে মোড়ল কা'রা
জানিনা তার নাম।

৪

একে একে মাঠ পেরলুম
কত মাঠের পরে!
তার পরে উঃ, বলি মা শোন
সামনে এল প্রকাণ্ড বন
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
গা ছম্ ছম্ করে!

৫

জাম তলাতে বুড়ি ছিল,
বল্‌লে "খবরদার!"
আমি বল্লেম বারণ শুনে
"ছ-পণ কড়ি এই নে গুনে!"
যতক্ষণ সে গুন্‌তে থাকে
হয়ে গেলাম পার।

৬

কিছুরি শেষ নেই কোথাও
আকাশ পাতাল জুড়ি।
যতই চলি যতই চলি
বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো মুখোস্ পরা আঁধার
সাজে জুজু বুড়ি।

৭

খেজুর গাছের মাথায় বসে
দেখ্‌চে কা'রা ঝুঁকি।
কা'রা যে সব ঝোপের পাশে
একটু খানি মুচ্‌কে হাসে
বেঁটে বেঁটে মানুষগুলো
কেবল মারে উঁকি।

৮

আমায় যেন চোখ টিপ্‌চে
বুড় গাছের গুঁড়ি।
লম্বা লম্বা কা'দের পা যে
ঝুলছে ডালের মাঝে মাঝে
মনে হচ্ছে পিঠে আমার
কে দিল সুড়্‌সুড়ি।

৯

ফিস্ ফিসিয়ে কইচে কথা
দেখতে না পাই কে সে।
অন্ধকারে দুদ্দাড়িয়ে
কে সে কারে যায় তাড়িয়ে
কি জানি কি গা চেটে যায়
হঠাৎ কাছে এসে।

১০

ফুরায় না পথ ভাবচি আমি
ফিরুব কেমন করে'
সাম্‌নে দেখি কিসের ছায়া,—
ডেকে বলি "শেয়াল ভায়া,
মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ
দেখিয়ে দেনা মোরে।"

১১

কয়না কিছুই, চুপ্‌টি করে'
কেবল মাথা নাড়ে।

সিঙ্গিমামা কোথা থেকে
হঠাৎ কখন্ এল ডেকে,
কে জানে, মা, হালুম করে
পড়ল যে কার ঘাড়ে।

১২

বল্ দেখি তুই, কেমন করে
ফিরে পেলেম মাকে?
কেউ জানে না কেমন করে,'—
কানে কানে বল্‌ব তোরে?—
যেম্‌নি স্বপন ভেঙে গেল
সিঙ্গিমামার ডাকে।

শ্রেয়সী, বৈশাখ, ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী
আমের মঞ্জরী
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে
পড়চে কি ঝরি?
আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে
দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি।
পূর্ণিমা চাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ সাথে আপন আলো মাখায়,
(ঐ) দখিণ বাতাস গন্ধে পাগল
ভাঙল আগল
ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি॥

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩২৯ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়
তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায়
একটি ধারে।
আমি শুন্‌ব ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায়
তার বাঁধিব বারে বারে॥
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি
সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মত
উঠ্‌বে পুরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা
উঠ্‌বে ফুটে সারে সারে॥

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩২৯ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাটির গান

ফিরে চল্ মাটির টানে;
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে
মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেচে,
হাসিতে যার ফুল ফুটেচে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে।
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে
কোল রয়েছে পাতা,
জন্মমরণ ওরি হাতের
অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা
সাগর পানে আত্মহারা রে,
প্রাণের বাণী বয়ে আনে॥

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভক্ত হরিদাস

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত।

সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত।

শেষ সুর

ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী
বাজে শেষের রাতে।
শুকনো ফুলের মালা এখন
দাও তুলে মোর হাতে।
সুরখানি ঐ নিয়ে কাণে
পাল তুলে দিই পারের পানে,
চৈত্র রাতের মলিন মালা
রইবে আমার সাথে।

পথিক আমি এসেছিলেম
তোমাব বকুলতলে,
পথ আমারে ডাক দিয়েচে
এখন যাব চলে।
ঝরা যুঁথীর পাতায় ঢেকে
আমার বেদন গেলেন রেখে,
কোন্ ফাগুনে মিল্‌বে সে যে
তোমার বেদনাতে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কেউ নয়

(জাপানী নো-নাট্য)

পাত্র। কর্ত্তা; দুই চাকর—তারো ও গিরো।

দৃশ্য। জাপানী কামরা দেয়ালের গায়ে কুলুঙ্গিতে একখানা দামী ছবি; মেঝের উপর গালার কাজ করা সুদৃশ্য বাক্স রেশমী সুতো দিয়ে বাঁধা; একধারে বড় একটা পেয়ালা।

কর্ত্তা। ওরে! তোরা আছিস ওখানে?

দুই চাকর। (পাশ থেকে) এই যে এখানে, কর্ত্তা!

কর্ত্তা। আরে এদিকে আয়না শীগ্‌গির!

[যেমন বলা, অমনি দুজনেই পড়ি-কি-মরি-ভাবে ছুটতে ছুটতে এ ওর ঘাড়ে পড়তে-পড়তে এসে হাজির]

কর্ত্তা। ওঃ, এই যে তোরা এসেছিস! কিন্তু এ রকম ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন দৌড়ে আসার কোন দরকার ছিল না ত। অত তাড়া-হুড়ো কেন?

দুই চাকর। আজ্ঞে, আপনি যে বল্লেন, শীগ্‌গির আয়!

কর্ত্তা। আচ্ছা, শোন্! আমাকে একবার বাড়ি ছেড়ে ঐ পাহাড়ের ওধারে যেতে হবে বিশেষ কাজে,—তাই তোদের ডেকেচি। বুঝলি?

চাকর। আজ্ঞে, বুঝেচি।

কর্ত্তা। কি করে বুঝলি?

চাকর। আজ্ঞে, তা না হলে ডাকচেন কেন? যখনই আপনার বিশেষ কাজে কোথাও যাবার দরকার হয়, তখনই তো আমাদের একজনকে ডাকেন। না রে গিরো, তাই নয়?

গিরো। হ্যাঁ, তাই তো। বরাবরই তো উনি আমাকেই সঙ্গে নেন। চলুন কর্ত্তা, যাই।

কর্ত্তা। না, না, এবার তোদের কাউকে সঙ্গে যেতে হবে না।

গিরো। সে কি কর্ত্তা, এবার আমাদের দুজনকেই একলা রেখে যাবেন!

কর্ত্তা। হ্যাঁ, তোরা এই বাড়ী পাহারা দিবি—দুজনে মিলে।

দুই চাকর। যে-আজ্ঞে!

কর্ত্তা। শোন্, আরো কথা আছে।

দুই চাকর। যে আজ্ঞে, হুজুর!

[কর্ত্তা উঠে সেই গালার বাক্সটার কাছে গেলেন]

কর্ত্তা। ওরে—

দুই চাকর। আজ্ঞে, এই যে আমরা এখানে—

কর্ত্তা। (বিশেষ গম্ভীরভাবে) এই বাক্সটার মধ্যে

'কেউ নয়' আছে—ভাল করে এইটীকে পাহারা দিস্।

তারো। তাই না কি! তাহলে আমাদের দুজনের বাড়ীতে থেকে পাহারা দেবার তো দরকার নেই।

কর্ত্তা। কেন?

তারো। আজ্ঞে, ঐ যে বল্লেন, বাক্সর মধ্যে একজন আছেন। তাহলে আমাদের একজন থাকলেই দুজন হবে।

কর্ত্তা। না, না, না, আমার কথা তোরা বুঝতে পারিস নি। বাক্সর মধ্যে যা আছে তার নাম কেউ নয়, ভীষণ রকমের বিষ,—এমন কি, ওর বাতাস গায়ে লাগলে লোক মরে যায়।

তারো। হুজুর, আমার একটা কথা আছে।

কর্ত্তা। বল্, শীগ্‌গির বলে ফেল।

তারো। কর্ত্তা এমন ভীষণ রকম বিষ বাড়ীতে রাখেন কেন?

কর্ত্তা। সে খপরে তোর দরকার কি? আমার দরকার আছে, তাই রেখেচি।

তারো। আচ্ছা, তাহলে আর কিছু বলবো না।

কর্ত্তা। তবে আমি চল্লুম। শীগ্‌গিরই ফিরে আসব—

দুই চাকর। আমরাও আপনার আশায় থাকবো—

[কর্ত্তা চলে গেলেন।]

তারো। যাক, চলে গেছেন!

গিরো। চলে গেছেন!

তারো। (আলস্যের ভাব দেখিয়ে) এইবার একটু আরাম করা যাক!

গিরো। (সেই ভাবে) যা বল্‌লি ভাই!

তারো। কর্ত্তার হলো কি? কখনো এই মাণিক-জোড়কে এক-জোট হতে দেন না—হয় তুই কর্ত্তার সঙ্গে যাস্, আমি বাড়ীতে থাকি, নয় আমি যাই, তুই থাকিস। আজ আমরা দু'জনেই একসঙ্গে! বাড়ীতে! বাঃ, কি মজা!

গিরো। ঠিক বলেছিস্ ভাই! দেখ্, আমার বোধ হয় পাহাড়ের ওধারে নিশ্চয় কোন সুন্দরী আছে—

তারো। ওরে, আমরা এমনি আরামে বসে কথা করে তোফা সময় কাটাবো।

গিরো। যা তোর ইচ্ছে—

তারো। 'কেউ নয়'-কে কখনো দেখেছিস?

গিরো। না, আমি তো দেখিনি—

তারো। আমিও না—

গিরো। আমি ভাবচি, সেটা দেখতে কি রকম?

তারো। নিশ্চয়, সেটা ঠিক দানবের মত দেখতে আর তারই মতই বোধ হয় ভীষণ, ভয়ঙ্কর!

গিরো। বোধ হয় তার দুটো শিং আছে—

তারো। কি বাজে বকছিস! কর্ত্তা তো নেই, চল না, আমরা দেখি ব্যাপারখানা কি?

গিরো। কিন্তু না দেখাই ভাল—এ জিনিষ দেখতে গিয়ে শেষ নিজেদেরই কি বিপদ ঘটাব!

তারো। সেটা ভাববার কথা বটে, কিন্তু দেখবার এ-রকম সুবিধে আর হবে না ভাই,—ভারি দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।

গিরো। আমারো তাই। কিন্তু তার বাতাস গায়ে লাগলে যদি মরে যাই—তাহলে কোন্ সাহসে দেখতে চাই?

তারো। কিন্তু দেখবার একটা উপায় আছে—

গিরো। কি? কি? বল্ তো—

তারো। কেন, পাখা দিয়ে বাতাসটাকে আমাদের দিক থেকে সরিয়ে দিয়ে তার পিছন থেকে ত দেখতে পারি।

গিরো। না, আমার মনে লাগছে না।

তারো। আরে, ভয় কিসের? চলে আয়—

গিরো। আচ্ছা, দেখাই যাক।

[দুজনে বাক্সটীর ওপর ঝুঁকে রইলো এবং তারো তার সুতাগুলি খুলতে লাগলো]

তারো। বাতাস করতে সুরু কর্—

গিরো। এই যে আরম্ভ করেচি।

তারো। বাতাস কর্, বাতাস কর্—

গিরো। আমি তো আরম্ভ করেছি—

তারো। (ভয়েতে পড়ে গিয়ে) ওরে—

গিরো। (দূরে সরে পালিয়ে গিয়ে) কি রে, কি হলো ?

তারো। আমি তো সুতো খুলেচি। তুই এবার যা, গিয়ে ঢাকনি খুলে ফেল্—

গিরো। আচ্ছা, বাতাস কর্—

তারো। করচি—

গিরো। বাতাস কর্—

তারো। করচি—

গিরো। বাতাস কর্, বাতাস কর্—

তারো। বাতাস তো করচি—

গিরো। ওরে, ও-ও-ও –

তারো। কি রে, কি হলো রে ?

গিরো। ঢাকনি খুলে ফেল্—

তারো। আচ্ছা, এবার আমি যাই, দেখি, ভেতরে কি আছে। সাবধানে বাতাস কর্—

গিরো। আচ্ছা, বাতাস আমি করবো।

তারো। বাতাস কর—

গিরো। বাতাস করচি—

তারো। বাতাস কর্, বাতাস কর্—

গিরো। করচি।

তারো। বাতাস কর্।

গিরো। বাতাস করচি রে, বাতাস করচি।

তারো। ও-ও-ও-রে—

গিরো। কি ! কিছু দেখতে পেয়েছিস ? কি দেখলি ?

তারো। হ্যাঁ, আমি দেখেচি, আমি দেখেচি—

গিরো। কি রকম দেখতে রে ?

তারো। ঠিক কি রকম, তা জানিনা। সাদা সাদা গোল গোল—দেখলে মনে হয়, যেন খেতে খুব ভালো!

গিরো। তোর মাথা খারাপ হলো নাকি! বলিস্ কি রে! বিষ খাবি কি!

তারো। না রে, আমি পাগল হইনি। এখনো নয়, মাঁ হয়তো আমাকে যাদু করেছে! [বাক্সের কাছে এগিয়ে গেল] একবার খেয়ে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে—

গিরো। না, সে কাজ আমি করতে দেবো না—

তারো। আমাকে ধরে রাখ্—

গিরো। একলা তোকে ধরে বেশ রাখতে পারি—

তারো। না, আমি যাব, আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, বাধা দিস্‌নে—

গিরো। না, কখনই না,—কোনমতেই না—

তারো। (গুণ-গুণ সুরে) কপালে যা থাকে, হবে, আমি তো চল্লুম।

গিরো। হায়, হায়, ঐ চল্‌ল রে! ঐ খেতে আরম্ভ করেছে! যদি খাওয়া না হয়, তাহলেই ভাল—(তারো ঠোঁটের শব্দ করছে এবং গিরো মুখ ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে সে শব্দ শুনে ভুল ভাবলে) হায়, হায়, হায়, মারা গেল, ছোঁড়া নির্ঘাৎ মরেছে রে! মরেই গেছে! হায়, হায়, ওরে, ওরে, ও তারো. কি হলো রে? তুই বেঁচে আছিস, না, মরে গেছিস ?

তারো। (খাওয়ার শব্দ করতে করতে) কে কথা কইছে ?

গিরো। আমি গিরো। তুই আছিস কেমন ?

তারো। কি রে, কি! গিরো ?

গিরো। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি—

তারো। হা, হা, হা, হা, এ যে চিনি রে!

গিরো। চিনি! চিনি! বলিস কি ?

তারো। হ্যাঁরে হ্যাঁ, চিনি। খেয়ে দেখ্ না। এই নে—

গিরো। আচ্ছা, দে, দেখি! (নিয়ে খেলে ; খেয়ে) সত্যিই ত রে! এ চিনিই যে বটে!

তারো। ঠিক বলেছিস, এ তো চিনি কেবল।

দুই চাকর (হাসতে লাগ্‌ল) হা, হা, হা, হো, হো—

তারো। খেতে ভারি সুন্দর। এ যে না খেয়ে থাকতে পারচি না—

গিরো। তোর কি হলো রে? আমায় একটু দে। দুজনে সমান ভাগ করে খাই—

[তারো বাক্সের ঢাকনিতে খানিকটা দিয়ে গিরোকে দিলে—তারা প্রাণ ভরে পেট পুরে খেতে আরম্ভ করলে]

তারো। আমি সব খেয়ে ফেলেছি—

গিরো। আমারও সব শেষ হয়ে গেছে—

তারো। একটা জিনিষ মনে পড়ছে,—বেশ ভাল সেটা—

গিরো। মনে আবার কি পড়লো? কি তোর ভালো জিনিষ?

তারো। মনিব চিনিটা লুকিয়ে রেখে আমাদের বলছিল, ওটা বিষ! কিন্তু আমরা তো সব খেয়ে ফেলেচি। আমি যে খেয়েচি, এ কথা বোধ হয় ভুলো যাবো। আর মনিব বাড়ী এলে তাঁকে ব্যাপারটা সব খুলে বলবো—

গিরো। কিন্তু বিপদে আমরা দুজনেই পড়বো—আর সেই জন্যই তো যখন তুই খেতে চাইলি, তখন আমি তোকে বাধা দিলুম। কিন্তু তুই তো প্রথমে সুতো খুললি আর আগেই খেতে আরম্ভ করলি। মনিব ফিরে এলে আমিও তাঁকে ব্যাপারটা সব খুলে বলবো!

তারো। ওরে না, না, আমি ঠাট্টা করছিলুম—

গিরো। ঠাট্টা নাকি! এই তোর ঠাট্টা!

তারো। সত্যি বলচি, ঠাট্টা—

গিরো। কিন্তু আমরা কি বলবো, বল্ দিকি?

তারো। আচ্ছা মনে কর্, তুই গিয়ে যদি ঐ ছবিখানা একেবারে ছিঁড়ে ফেলিস্—

গিরো। এমনতর একখানি ছবি কেমন করে আমি ছিঁড়্‌বো?

তারো। ছবিখানা যদি তুই ছিঁড়ে ফেলিস্, তাহলে আমরা দুজনেই এ দায় থেকে রেহাই পাই—

গিরো। আচ্ছা—(সে ছবিখানিকে ছিঁড়ে দু-টুকরো করলে)

তারো। আর একটা ভালো কথা আমার মনে পড়ছে—

গিরো। আবার কি কথা তোর মনে হলো?

তারো। 'কেউ নয়' তো ছিল কেবল চিনি—আর সে সব খেয়ে ফেলার জন্যে সহজেই পার পেতে পারি, কিন্তু ঐ ছবিখানা ওস্তাদ্ সোকির আঁকা, কাওয়ানুনের ছবি—ওখানা মনিবের বেজায় আদরের জিনিষ কিন্তু ছবিখানা ছিঁড়লি তুই—মনিব যেই ফিরে আসবে, অম্‌নি সব ব্যাপার তাঁকে বলতেই হবে যে—

গিরো। সে তো ভাল কথা। তুই বল্‌লি আমায় ছিঁড়ে ফেলতে, চিনি খাওয়ার দোষ থেকে পার পাব বলে, কিন্তু আমার তো মনে থাকবে না যে সত্যি আমিই ছিঁড়েচি! মনিব এলে আগেই আমি তাকে সব বলবো—

তারো। আমি ঠাট্টা করছিলুম রে—

গিরো। আবার ঠাট্টা! কিন্তু এ-সব করার জন্যে মনিবকে বলব কি?

তারো। আচ্ছা, মনে কর্ যদি তুই গিয়ে ঐ বাটিটা ভেঙ্গে ফেলিস্—

গিরো। ও, তুই চাস্ আমি গিয়ে ভাঙ্গি,—তাই না কি?

তারো। না, না, তা নয়, তুই একলা কেন, আমিও তোকে সাহায্য করবো—

গিরো। ওঃ তুই আমায় সাহায্য করবি ভাঙ্গবার জন্যে—তাই না কি?

তারো। নিশ্চয়। সত্যি বলচি, আচ্ছা, লে, আয়—

গিরো। চ'—

তারো। তুই ত হলে রাজী?

গিরো। খুব রাজী—

দুই চাকর। (বাটিটা উঁচু করে তুলে দোলাতে দোলাতে) এক, দুই, তিন—(সেটা ফেলে দিলে)

তারো। যাক্—

গিরো। খালাস!

দুই চাকর। (হাস্য) হা, হা, হো, হো—

তারো। একেবারে হাজার টুকরো হয়ে গেছে।

গিরো। সত্যিই ত, হাজার টুকরো হয়ে গেলো যে রে! কিন্তু এবার আমাদের কি হবে? এর জন্যে কি মনিব রেয়াৎ করবে?

তারো। মনিব বাড়ীতে এলেই তুই কাঁদতে সুরু করবি।

গিরো। কেন? তাহলে কি হবে?

তারো। আরে সে-সবের জন্যে তোকে ভাবতে হবে না, সে আমি সব বন্দোবস্ত করে দেবো—

গিরো। আচ্ছা, তাই।

তারো। এখানে বসে মনিবের জন্যে অপেক্ষা কর্—

কর্ত্তা। (বাইরে থেকে) এই আমি ফিরে এসেচি। আমার চাকর দুটী নিশ্চয় আমার জন্যে কত ভাবছে! ওরে, এই আমি এসেছি রে, [ভিতরে এলো]—এই যে আমি।

তারো। (আস্তে আস্তে) কাঁদতে সুরু কর্, কাঁদতে থাক্!

গিরো। (চুপি চুপি) আচ্ছা, তাই—(দুজনেই কাঁদতে সুরু করলে)

কর্ত্তা। কি রে, কি হলো? তোরা কাঁদছিস কেন?

তারো। গিরো, বল্ না, গিরো—

গিরো। তুই বল্ ভাই তারো—

কর্ত্তা। দেখ, খালি গোলেমালে সময় নষ্ট করে! আরে, একজন না হয় বল্, কি হয়েছে—

তারো। হুজুর, আমি সব কথা হুবহু খুলে বলচি। যে কাজটী দিয়ে গেছলেন, সেটা একটী বড় ভয়ানক কাজ। বাড়ী পাহারা দেওয়া—বাবাঃ! আমি অনেক চেষ্টা করলুম, যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি। ঘুমের জন্যে আমরা ঢুলতে সুরু করলুম কি না, সেই জন্যে ভাবলুম, একটু কুস্তি লড়ি বরং, তাহলে ঘুমটা ছেড়ে যাবে। কুস্তি লড়তে আরম্ভ করলুম, গিরো এক জন খুব ভাল কুস্তি বাজ কি না, তা সে আমার হাতের কবজী না ধরে জোরে তার কাঁধের ওপর ছুড়ে দিলে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি তাই ছবিখানিকে—

কর্ত্তা। এঁ্যা হায়, হায়—ছবিখানি আমার ছিঁড়েচো!

গিরো। আজ্ঞে, তাবো আমাকে পায়ের দিকে না ধরে এমন ঘুরিয়ে দিলে যে আমি একেবারে ঐ বাটীটার ওপরে গিয়ে পড়লুম- দেখুন, বাটীটা একেবারে হাজার টুকরো হয়ে গেছে।

কর্ত্তা। এঁ্যা, বাটীটাও ভেঙ্গেছো! ওরে পাজী, হতভাগা!—এর দাম যে তোদের জীবন ভোর খাটালেও শোধ হবে না!

তারো। হুজুর, তা আমরা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছি। তোমার বড় আদরের সব জিনিষ আমরা নষ্ট করেছি। আমরা জানি হুজুর, যে এর বদলে সাজা, আমাদের মরণ, নিশ্চত। সেইজন্যেই আমরা সেই বিষ খেয়েছি হুজুর, একেবারে বাক্স খালি করে খেয়েছি, সব বিষটুকু, কিছু রাখিনি। না রে গিরো, সব বিষটুকু আমরা খাইনি?

দুই চাকর। আমরা সব খেয়ে ফেলেছি, হুজুর। কিন্তু সে বিষের কাজ এখনও তো সুরু হলো না। তারই জন্যে আমরা বসে আছি—কখন মৃত্যু হবে—কখন মরব!

কর্ত্তা। এঁ্যা, করেছিস্ কি বেটারা! সর্ব্বনাশ করেছিস্! হায়, হায়, হায়, হায়, হায়—!

যবনিকা

সুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

পল্লীসংস্কার সমস্যা

পল্লীর হিতসাধন করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা অনেকে বিফল-মনোরথ হ'য়ে ফিরে এসেছেন। যাঁরা এখনও কর্ম্মক্ষেত্রে আছেন, তাঁদের কারো কারো মুখে নিরুৎসাহের কথাই শুনি। এঁরা সবাই বলেন, রাষ্ট্রীয় সাহায্য ভিন্ন এত কঠিন সমস্যার সমাধান হতেই পারে না—যেখানে তা' পাওয়া যাবে না, সেখানে অন্তত জমিদার ও ধনীদের সাহায্য পাওয়া চাই; কিন্তু তাঁরা ত পল্লীসংস্কারের কাজে এখনও বড় ঘেঁষেন নি!

এদিকে জাতীয় মহাসভা রাজনৈতিক আন্দোলন ও হরতালের ব্যয় সঙ্কুলন করতে গিয়ে প্রায় সমস্ত কাঠখড় পুড়িয়ে পল্লীসংস্কারের কাজে কর্ম্মীদের হাতে কিছু দিতে পারলেন না। অর্থাভাব ও লোকাভাব এই দু'য়ের মাঝখানে পড়ে একদল স্বদেশ-সেবক পল্লীতে গিয়ে কেবল দুঃখই পেলেন, কোনো কাজের পত্তন করা হলোনা!

যাই হোক্, এই অকৃতকার্য্যতাকে ক্ষতি ব'লে স্বীকার করা যায় না। এমনি ক'রেই আমাদের দৃষ্টি সমস্যার আসল মূর্ত্তি দেখতে পাবে; আমরা বুঝতে পারব কস্ক-

জীবনপ্রবাহে গতি সঞ্চার করার ব্রত সহজসাধ্য নয়। দীর্ঘকালের আবর্জ্জনা পুঞ্জীকৃত হ'য়ে উঠেছে সমাজের স্তরে স্তরে; এখানে জীবনী-শক্তির প্রকাশ নেই, তাই যা-কিছু গড়তে যাওয়া যায়, বারম্বার ভেঙে পড়ে।

কিন্তু যেখানেই বহুপ্রাচীন সভ্যতার ভিৎ সেইখানেই জীর্ণতার লক্ষণ দেখা দেয়। নানা অভ্যাস সেখানে সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়, আর কর্ম্মক্ষেত্র বহু সংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে চীনদেশের কথা মনে পড়ছে; সেখানেও দেখ্ছি প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের দ্বন্দ্ব চলেছে। জীর্ণভিতের উপর উপর বর্ত্তমানকালের উপযোগী অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থা গড়ে তোলা সে-দেশেও দুরূহ হয়ে উঠ্ল। তবু কেন ঠিক্ বল্‌তে পারিনে, চীনের রক্তমাংসে প্রাণশক্তির অভাব হয়নি। তাই এরা দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবর্জ্জনা সরিয়ে দিতে পারল, সমাজকে পুনর্জীবিত করে তুল্‌লে, আর সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিপ্লব এনে দিলে। চীনের বর্ত্তমান ইতিহাসে আমাদের শেখ্‌বার অনেক বিষয় আছে, এইজন্য এইখানে চীনের নব-জাগরণের সম্বন্ধে কিছু বলব।

য়ুরোপের ছোঁয়া লাগ্‌তেই চীন মনে করেছিল ওদের মতন সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে' পুষ্‌তে পারলেই চীন রক্ষা পাবে। কিন্তু এ উপায় খাটল না দেখে সে তার শাসন-ব্যবস্থার ওলোটপালোট করবার মতলব করলে। যেমন করে' হোক, একটা রিপাবলিক্ দাঁড়্ করালে বটে, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত তার কোনো পাকা বন্দোবস্ত হয়নি। বিরাট কল-কারখানা স্থাপন করে' চীন দেখ্‌লে, এ'তে এক ভূত ছাড়াতে গিয়ে দেশটাকে আর এক ভূতে পেয়ে বসতে চায়। এম্‌নি করে' বাইরের উপকরণ সংগ্রহ দ্বারা চীন মাথা তুলে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝ্‌তে পারলে তার মেরুদণ্ডটার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। যা'র অভাব হলে নতুন ভাবে নতুন ছাঁচে শাসনযন্ত্র ও সমাজকে ঢেলে গড়ে তোলা যায় না অন্তরাত্মার সেই উদ্বোধন চীনের বাকি ছিল। এতএব চীনের নবীন সম্প্রদায় এই দিকে দৃষ্টি দিলেন; তাঁরা দেখ্‌লেন, চীনের ভাষার পরিবর্ত্তন দরকার, দেখ্‌লেন বহু জীর্ণ সংস্কারের বাঁধন থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে না পারলে শিক্ষার সুবিস্তার হবে না; দেখ্‌লেন, সর্ব্বাঙ্গীন (universal) শিক্ষা প্রচলন না হ'লে দেশের লোককে নবযুগের বার্ত্তায় দীক্ষিত করা সম্ভবপর নয়।

আজ চীনের নব্য সম্প্রদায়ের একদল এই দিকেই সম্পূর্ণ মন দিয়েছেন। ভাষা-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এঁরা বর্ত্তমান যুগের নানা চিন্তার স্রোত দেশের মধ্যে প্রবাহিত করে দিচ্ছেন। পশ্চিমের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব সমস্তই চীনভাষার সাহায্যে দেশের ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করলে। এর ফলে চীনে যথার্থ স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে উঠেছে ও সামাজিক নানা ব্যাধির প্রতিকারের জন্য বহু চেষ্টা দেখা দিয়েছে। নব্যসম্প্রদায়ের কথা বল্‌তে গিয়ে একজন অধ্যাপক বল্‌ছেন যে তরুণ চীনেদের একদল মনে করেন, "China could not be changed without a Social transformation based upon a transformation of ideas. The political revolution was a failure, because it was external, formal, torching the mechanism of social action, but not affecting conceptions of life, which really control society." ভাবার্থ —নবভাব প্রণোদিত হ'য়ে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার যা' কিছু পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে, তার সাহায্য ভিন্ন চীন তার জীর্ণ খোলস বদ্‌লাতে পার্‌বে না। রাজনৈতিক আন্দোলন ত ব্যর্থ হ'ল; কেননা তা'তে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বহিরঙ্গটায় কেবলমাত্র ধাক্কা লাগে; সমাজের কেন্দ্রে তা' পৌঁছয় না; যে-জীবনীশক্তি সমাজের সকল কর্ম্ম-চেষ্টার উৎস সেখানে নবচেতনার স্পন্দন না পৌঁছলে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সফল হ'তে পারে না।

চীনে এঁরা কোমর বেঁধে লেগেছেন জাতীয় জীবনের ভিৎ গড়ে তোল্‌বার জন্যে, স্বাধীনতা লাভ করবার আগে এঁরা জাতির প্রাণকে জীবন্ত করে তুল্‌তে চেষ্টা করেছেন। লেখক বল্‌ছেন—"The teachers and writers who are guiding the movement lose no opportunity to teach that the regeneration of China must come by other means, that

no foundamental political reform is now possible in China, and that, when it comes, it will come as natural fruit of intellectual changes worked out in social, non-political ways"—ভাবার্থ যাদের নেতৃত্বে চীনের এই সামাজিক আন্দোলন দেশে বিস্তার লাভ করছে তাঁরা অবিশ্রাম এই কথাই প্রচার করছেন যে, চীনের অভ্যুত্থান কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের দ্বারা সম্ভব হবেনা; তা ছাড়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শাসন-পদ্ধতির বিশেষ কোনো আমূল সংস্কার হতেই পারে না। চীনের নব-অভ্যুত্থান যখন আস্‌বে, আস্‌বে চিন্তাশক্তির বিকাশে দেশবাসীর নিগূঢ়তম অন্তরাত্মাকে জ্ঞান ও ভাব-সম্পদে উদ্বুদ্ধ ক'রে। এ-কাজ করতে হবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না রেখে। আমি জানি আজকাল অনেকেই এই মতের সঙ্গে সায় দেবেন না। কিন্তু পল্লীসংস্কারের কাজে হাত দিতে গিয়ে একে একে যে-সব দুরূহ সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়, তাতে মনে হয় চীনের এই নব্যসম্প্রদায়ের কর্ম্মপদ্ধতিটাই শ্রেয়। আগে চাই মানুষ,—মানুষ না হ'লে রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থার সংস্কার করে' কি হবে? স্বরাজের প্রথম ভিত্তি হচ্চে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়, আর প্রথম ধাপ হচ্চে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনে। তরুণ-চীনেরাও এই কথা বলেন, Democracy must be realised in education and in industry before it can be realised politically."

শিক্ষা-সংস্কার করতে গিয়ে চীন দেখ্‌লে যে প্রচলিত ধর্ম্মমত ও অন্ধ-সংস্কার পথ রোধ করে' দাঁড়ায়। নব্যসম্প্রদায় বল্‌লেন, যেমন করেই হোক্ এ অচলায়তন ভাঙ্গতেই হবে।

"It has now to be worked out in adaptation to new conditions even if it involves the overthrow of Confucian forms of belief and conduct."—অর্থাৎ কন্‌ফুসিয়ান্ বিশ্বাস ও রীতিনীতি যদি নির্মূল করাও প্রয়োজন হয়, তবু তাই করতে হবে, চীনকে বর্ত্তমান কালের সঙ্গে যোগ রাখ্‌বার জন্তে।"

আজকাল শুন্‌তে পাওয়া যায় 'স্বরাজ' সাধনার অর্থ হচ্চে প্রাচীনের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বর্ত্তমান কালের সর্ব্বপ্রকার উৎপাত উপদ্রব থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করা। সনাতন আচার-বিচার, কর্ম্মপদ্ধতি, জীবনযাত্রার ধারা এই সমস্তই নাকি আমাদের আত্মরক্ষার পথ।

কিন্তু পুরাতন খোলসের মাঝে আশ্রয় নিয়ে আমাদের মুক্তি ত মিল্‌বেই না, বরং পথ আরো তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবে। এই সহজ হিসাবটা মনে রাখা দরকার যে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়েছে; সমস্ত পৃথিবীর চলার সঙ্গে আমাদের পা ফেলে চলতে হবে। মধ্যযুগের ব্যবস্থা যতই ভালো হউক, বর্ত্তমান যুগে তা' অনেকটা বাতিল হ'য়ে গেছে—যদি তার কিছু ব্যবহারে লাগে তাও ঘষে মেজে সংস্কার করে তবে কাজে লাগতে হবে।

যাঁরা পল্লীসংস্কার করতে গিয়েছিলেন তাঁরা সমাজের ঘরে বাইরে সঞ্চিত আবর্জ্জনা সরিয়ে ফেলবার শক্তি ও ধৈর্য্য অর্জ্জন করেননি, তাই তাদের হঠে আস্‌তে হ'ল। গ্রামে কি দেখ্‌তে পাই? যেন সকল কাজকর্ম্ম চল্‌চে ঘুমপাড়াবার মন্ত্রে। বাঁধানিয়ম, শাস্ত্রের শাসন, আচার বিচারের কঠোর অনুশাসন, এই-সব গ্রামবাসীর ভাল লাগে—এ'র আশ্রয়ে তারা নিজেদের নিরাপদ মনে ক'রে খুসি থাকে।

যিনি পল্লীসংস্কারের কাজে ব্রতী হবেন, তাঁকে এই বাঁধ, এই খোলস ভাঙ্গতে হবে। কাজ কঠিন, কিন্তু যদি এ অসম্ভব হয়, তবে স্বরাজও অসম্ভব।

আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন, কি-উপায়ে এই সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই মনে রাখা দরকার, যারা কর্ম্মী তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা চাই ও তাদের জানা চাই কোনো জোড়া-তালির ব্যবস্থা দ্বারা সমস্যার সমাধা হবেনা। কর্ম্মীদের মধ্যে সেই শক্তি চাই, যার উপর ভর করে' এরা দুঃখের ও অপমানের মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারে।

নিজেদের শিক্ষা ও দীক্ষা এই কাজের অনুযায়ী হলে তারপর প্রথম কাজ হবে, গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়কে হাত করা। তাদের দিয়ে গ্রামের চলাফেরার রাস্তার সুব্যবস্থা

করা সর্ব্বাপেক্ষা দরকার। এ-কাজে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য পাওয়া হয়ত অসম্ভব হবেনা। রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা হ'লে তারপর একটি কেন্দ্রস্থাপন করা—যাকে বলা যেতে পারে community centre. কেন্দ্রটি নির্ব্বাচনের সময় দেখা দরকার, পল্লার সকলের পক্ষে এখানে যাতায়াত করবার সুবিধা আছে কিনা। এমন একটি কেন্দ্র স্থাপিত হ'লে বিদ্যালয়, ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা, কৃষি ও কুটিরজাত শিল্পের উন্নতিসাধনের উপায় উদ্ভাবন, একে একে এই-সব আয়োজন করা দরকার হবে। কোন্ আদর্শে এই কেন্দ্র (community centre) গড়া প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যবস্থাগুলির পত্তন কিভাবে করতে হবে, বারান্তরে সে বিষয় আলোচনা করব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

জীবন-দেবতা

তুমি ভাবছো মনে যে ফুলে আজ করলে পূজা
চিরটা দিন তাতেই পূজা চলবে ?
যজ্ঞ হুতাশনের শিখা এ ইন্ধনে এমনি উজল জলবে ?
জাগ্রত আজ দেবতা তোমাব যে মন্তরে
কালো কি তা খেলবে ?
পরাণ-পাখী স্বরগ পানে হাজার বরণ
ডানা কি কাল মেলবে ?
নয় গো কভু নয় গো
সকল ব্যথা সকল কথা সকল পরাণ
যে তারে আজ উঠল বেজে
কাল যে তাহা নীরব হয়েই রয়গো।

জানিনা সে কোন্ পুরাতন কিসের টানে
প্রতিক্ষণে আপনারে নূতন করে গড়ে
সৃজন-স্রোতের বিপুল ধারা কোন্ আনন্দে ছুটে গিয়ে
নিমেষ হতে নিমেষ পরে পড়ে।
কাল কি শুধু শূন্য ফাঁকা আকাশ সম
গতি-বিহীন বিপুল অবকাশ ?
যা কিছু হয় সব কিছুরে গুছিয়ে নিয়ে গেঁথে রাখার
মানব মনের কল্পনারি পাশ ?
দিনের পরে দিন যে কাটে সে কেবল কি
মহামায়ার ভেল্কিবাজী ইন্দ্রজালের খেলা ?
মহাসৃজন লীলার তাঁরে মহাকাল কি
স্তব্ধ অটল বেলা ?
নয়গো তাহা নয়গো—
অসীম প্রাণের গতির বেগে নিত্যসুখের
সৃজন-লীলায় বক্ষে আপন বয়গো।

কাল যে ছিল পরম সত্য, আহ্বানে যার
তোমার নিখিল জীবন মরণ
দেহে প্রাণে উঠত বেজে সাড়া
আজকে সে নয় আর কিছু নয়
স্মৃতির মোহন মায়ায় গড়া ছায়ার পুতুল ছাড়া।
তুমিও আর সে তুমি নও,দেবতা সাধক প্রেমিক প্রিয়
সৃষ্টি-স্রোতে রইল পড়ে পিছে ;
নামটা শুধু আসছে বেয়ে আসল ভেবে
মোহের বশে মমতাতে চাপছো বুকে মিছে।
নিত্যনূতন প্রাণের লীলায় নূতন তোমার
দেবতা নূতন নূতন পূজা নূতন মন্ত্র নূতন উপহার;
অন্তবিহীন সৃষ্টি যাহার দেবতা যদি তেমনি না হয়
কোথায় তৃপ্তি অসীম সুখ বা কোথায়,
কোথায় অসীম সার্থকতা তার।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

সেক্‌স্‌পীয়র-স্মৃতি-উৎসব

গত এপ্রিল মাসে কলিকাতার 'সেক্‌সপীয়র এসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়া' বিশ্বকবি সেক্‌স্‌পীয়রের স্মৃতি-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন করিয়া-

সেক্‌সপীয়র
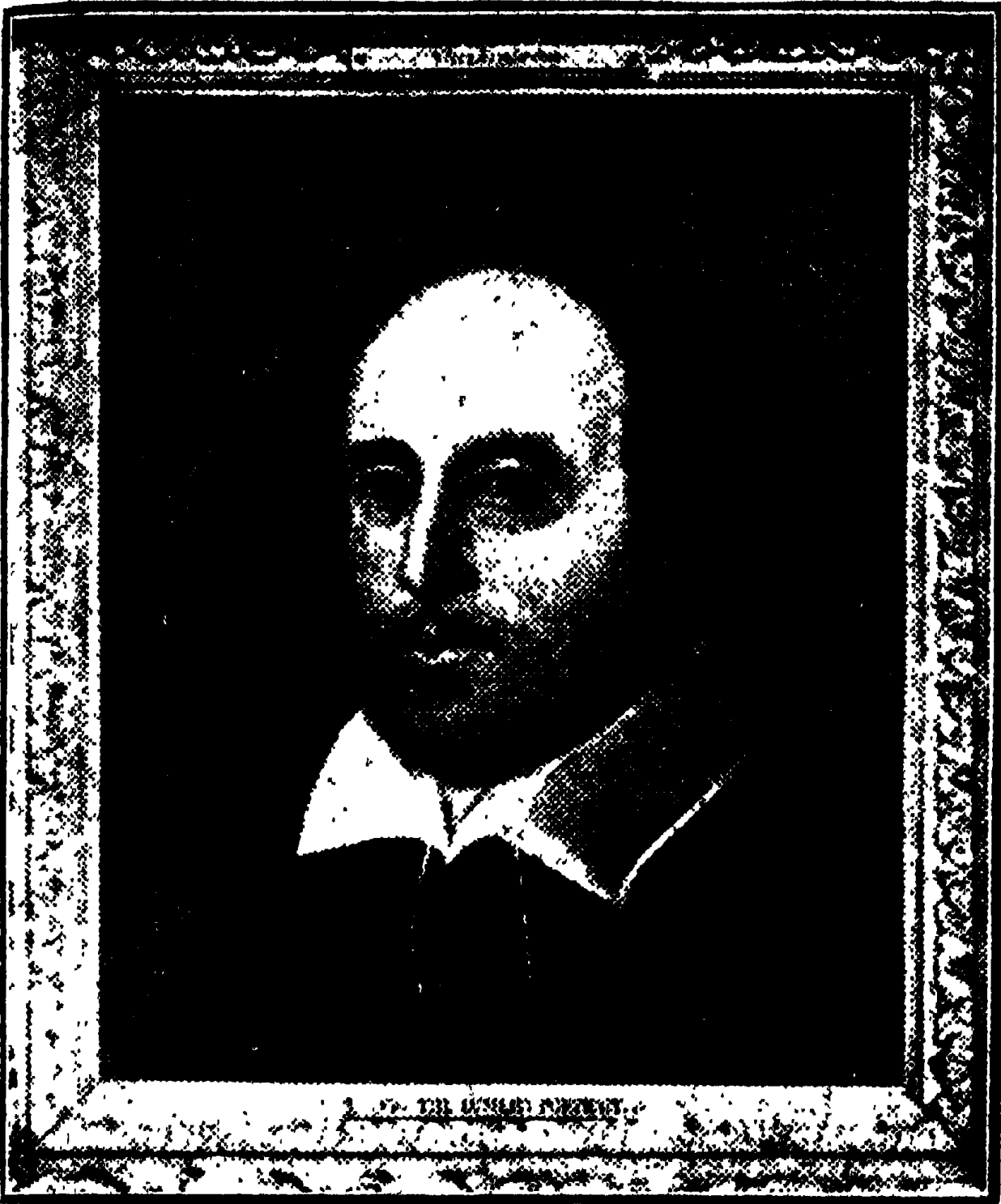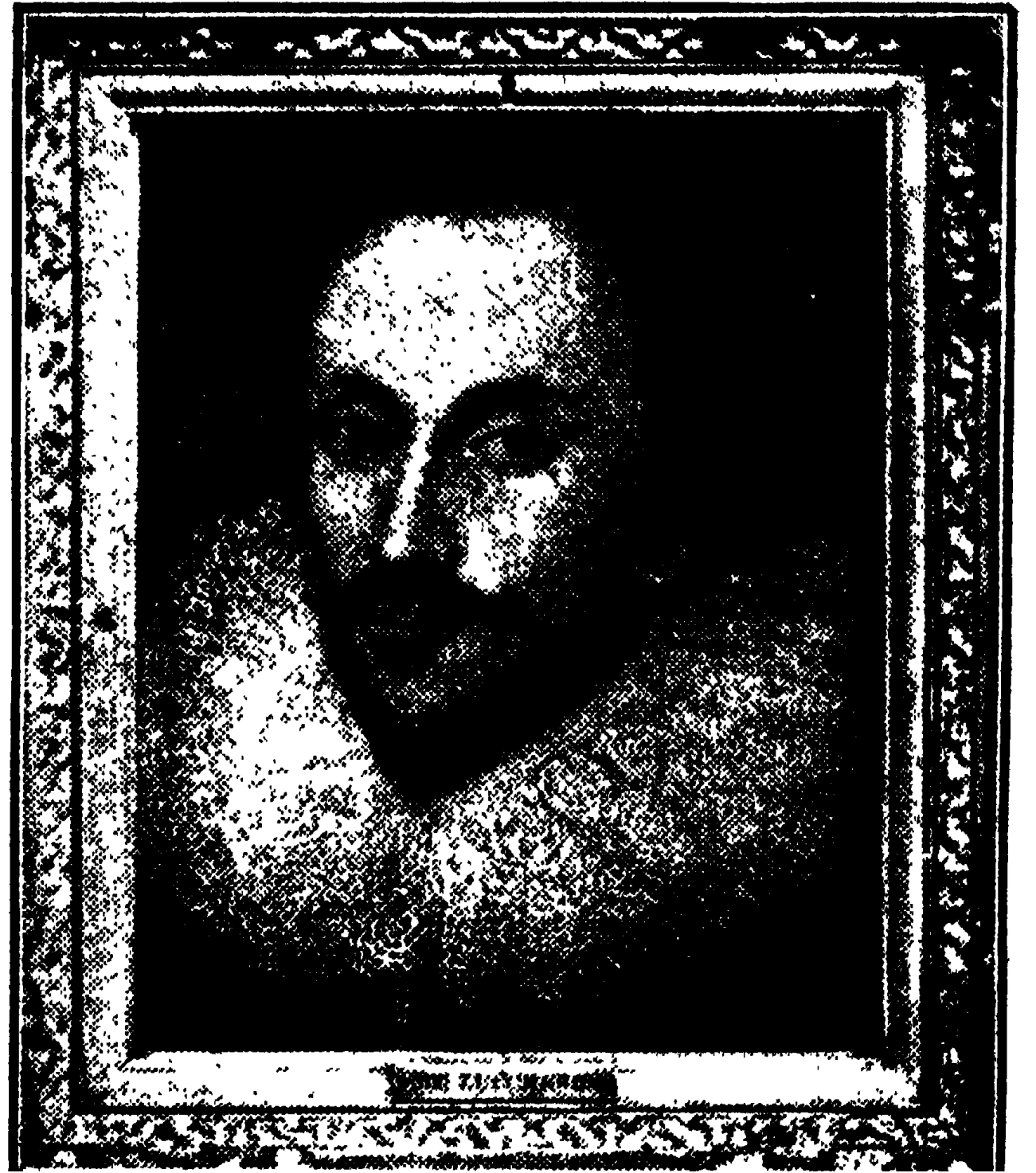
সেক্‌স্‌পীয়র—ত্রিশ বৎসর বয়সে
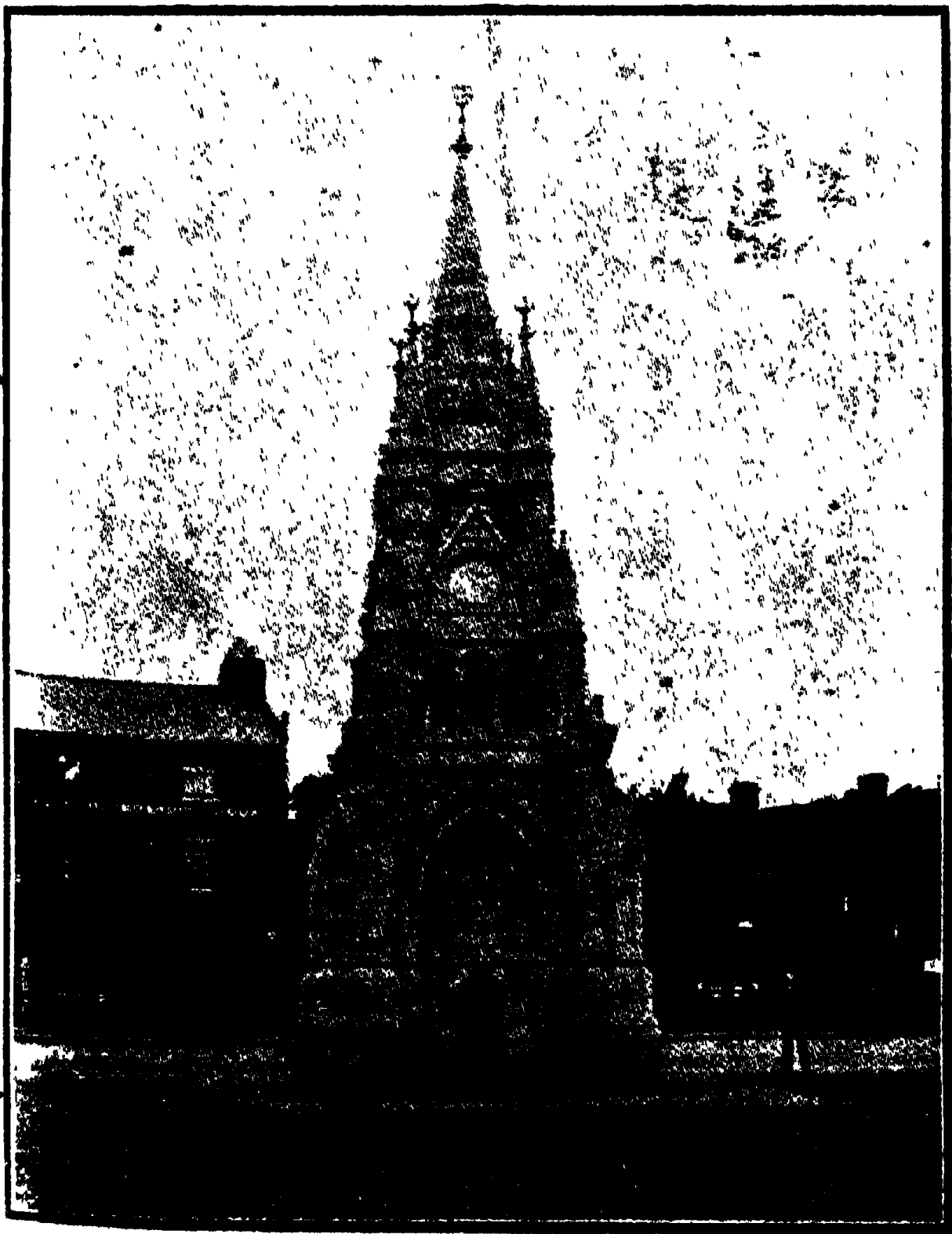
ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন—স্মৃতি-নির্ঝর

ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন লর্ড রোনালড গাওয়ার-প্রতিষ্ঠিত মনুমেণ্ট

ছেন। কবির পূজা তাঁহার কাব্যের আলোচনায়, তাঁহার কথার আলোচনায়। এই উৎসব-উপলক্ষে 'Looker-on' পত্রিকা এপ্রিল
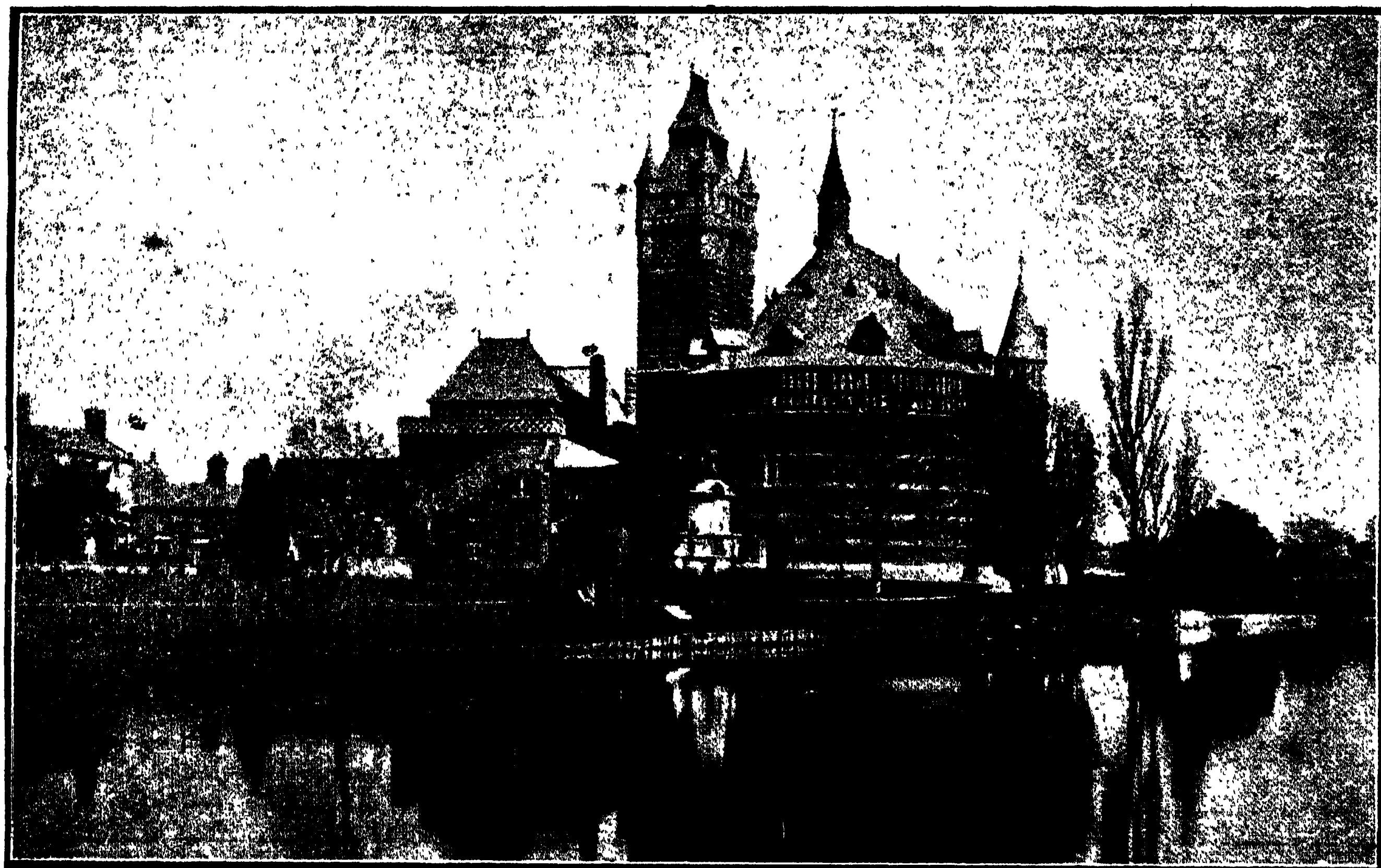
স্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন—মেমোরিয়াল থিয়েটার
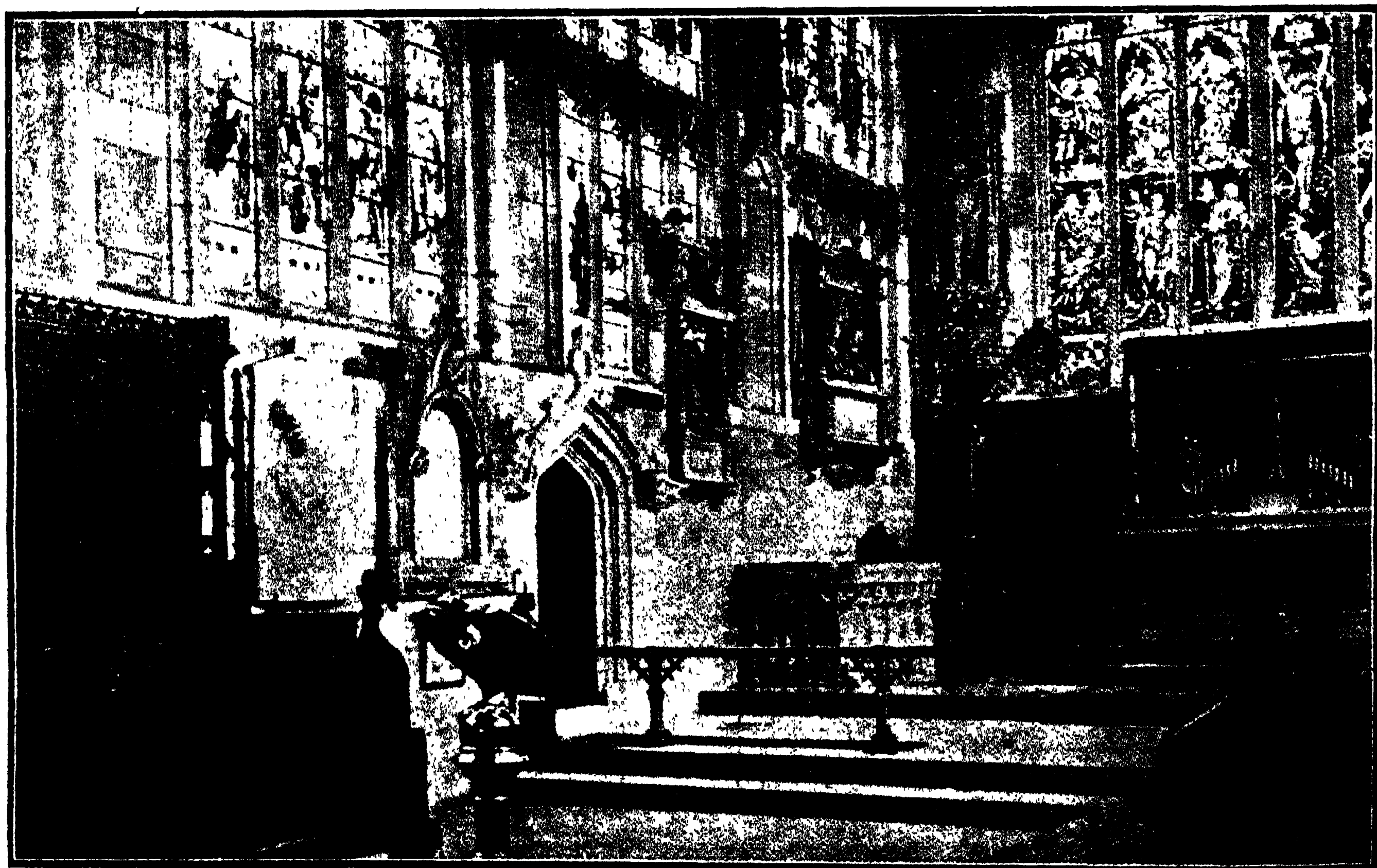
মা: গরম উপভোগ্য একখানি বিশেষ সেক্স্পীয়র সংখ্যা বাহির করিয়াছেন। সেক্স্পীয়রের কথাতেই সে সংখ্যা পূর্ণ। এই সঙ্গে তাঁহারা

ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন, হোলি ট্রিনিটি গির্জ্জাঘর,—কবির সমাধি-মন্দির
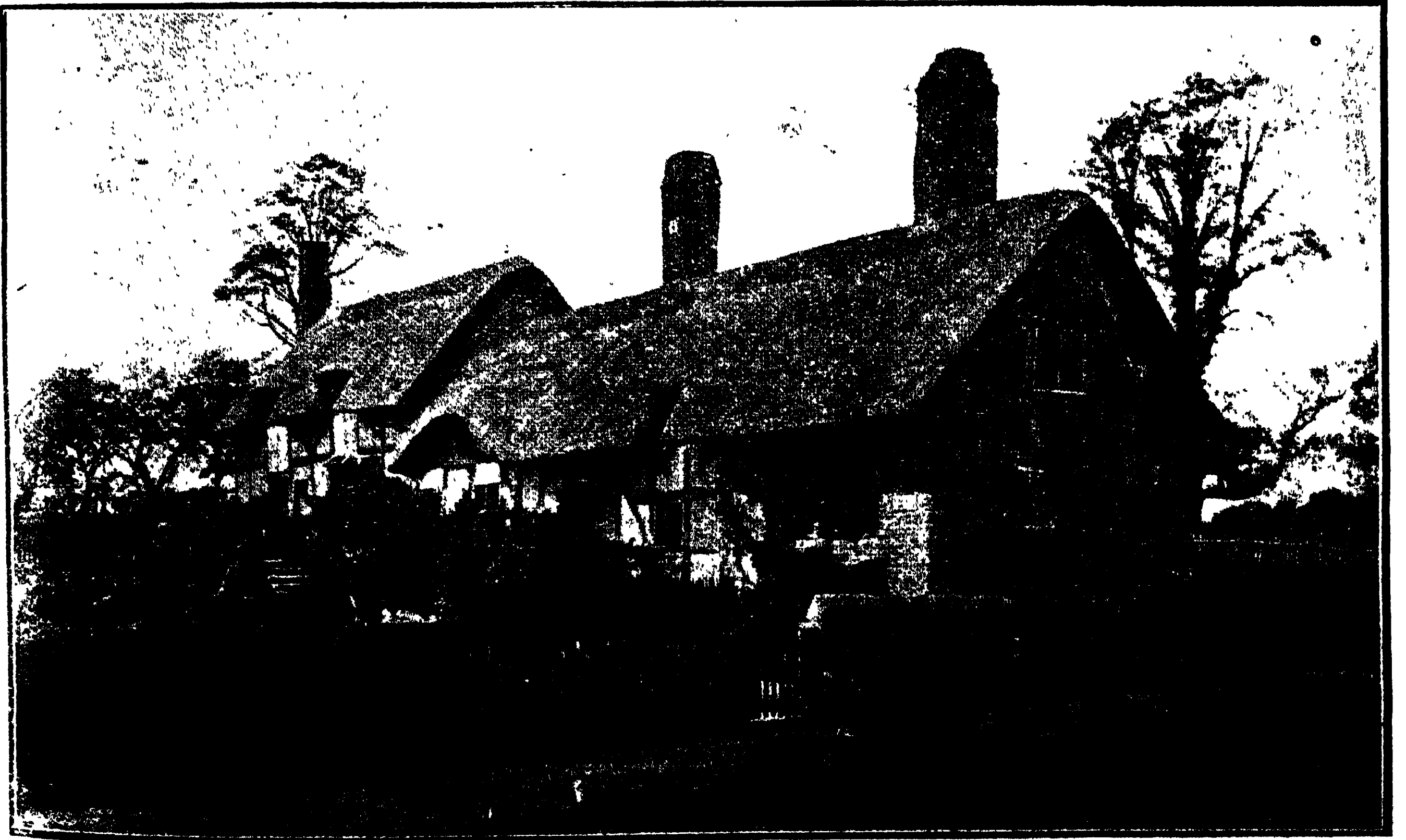
ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন, আন হ্যাথাওয়ের গৃহ; কবির প্রিয়া-ভবন

ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন, কবির গৃহ
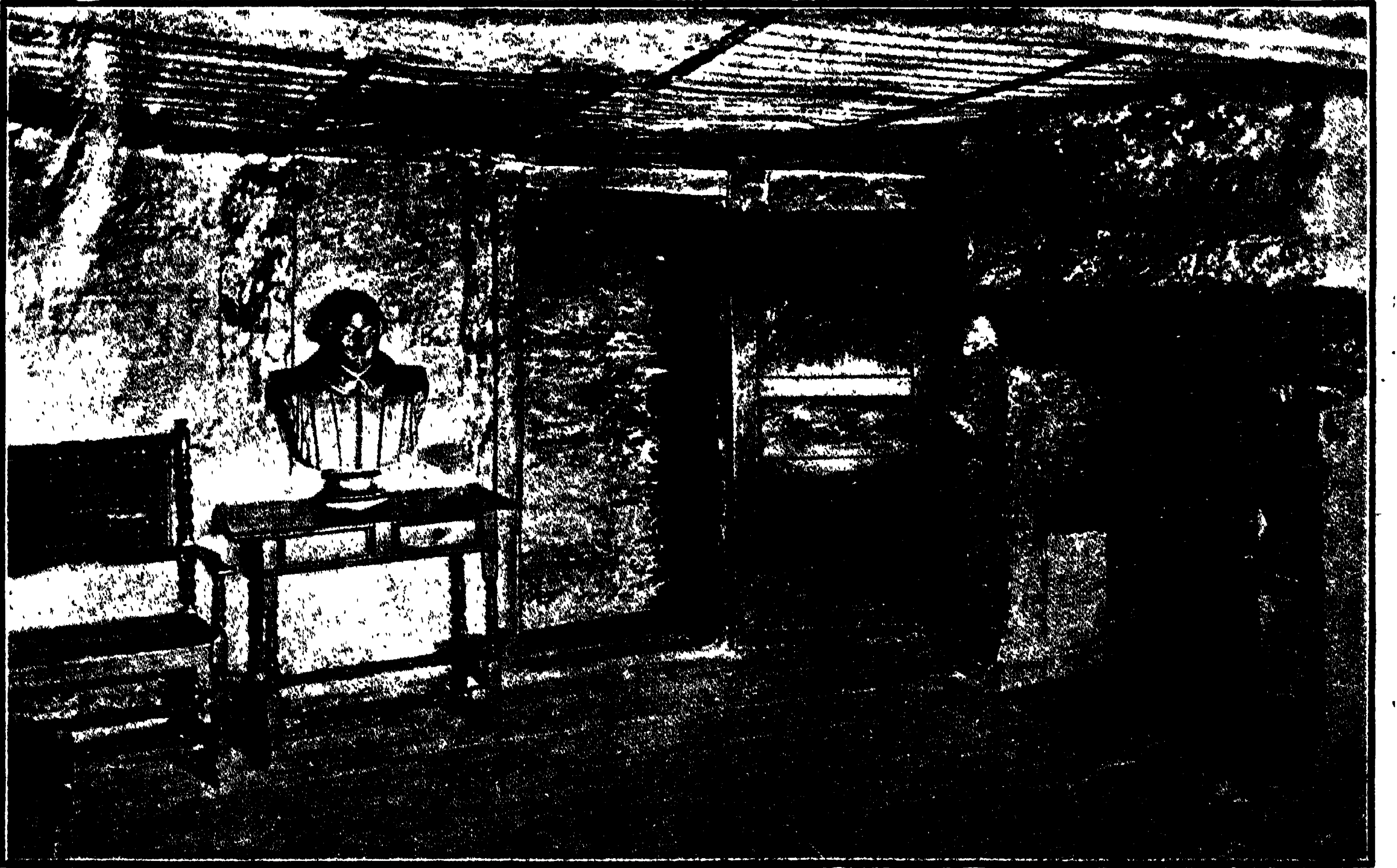
ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন, এই ঘরে কবি জন্মগ্রহণ করেন

ছবি ও সুর

বেলা তখন পড়ে আসছে। দুধারে মানুষ-ভোর মেহেদির বেড়া—তারি মাঝ দিয়ে সরু রাস্তা সোজা গিয়ে মাঠে পড়েছে। সামনেই একখানা তেঁতুল আর শাল আর মহুয়া গাছের সবুজ-ঢাকা কোল্-বস্তি, খড়ের ঘর, নিবিড় ছায়া আর সূর্য্যাস্তের আবির দিয়ে রচা একটি রূপকথা! কিন্তু মন টান্‌লো আজ তেপান্তর মাঠের পারে খোলায় আর আলোয় আর বাতাসে ঘেরা কত কালের ভেঙে-পড়া খোলার ঘরে। দুটো মাঠ পেরিয়ে সেখানে এসে সন্ধ্যা হলো, তখন জগন্নাথ-পুরের পাহাড়ের ওপারে সূর্য্য ডুবছে। ঘরখানার মধ্যে সুন্‌সান্ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝে কয়েকটা হারিয়ে-যাওয়া জান্‌লার ফাঁক, তারি মধ্য দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে—সোনার পটে কালি দিয়ে লেখা দু-তিন খানা ছবি—কালো চৌকাঠের ফর্ম্মা বাঁধা একটু একটু ছবির আভাস! চলাচলের পথ ভাঙা ঘরকে যেন পাশ-কাটিয়ে বেঁকে চলে গেছে—গ্রাম ঘুরে পাহাড়ের দিকে। খোলার ঘরে আসবার পথ কতক হারিয়ে গেছে ধুলোয় আর চোর-কাঁটায়, কতক জেগে আছে এখানে-ওখানে - একটুকরো শুক্‌নো বাগানের মাঝে দুটো বিলিতি ফুলের শুকনো ডালের ছায়া ধোরে। ওধারের ছবিতে ধূ-ধূ মাঠ, দূরে দূরে গ্রাম আর সবুজ ক্ষেতের সরু পাড়, এধারে আবার শুকনো নদীর উঁচু পাড় আর খোয়াই, তারি ধারে রাঙা মাটির সরু রাস্তা—একরাশ কালো পাথরের স্তূপে গিয়ে লুকিয়েছে। সে ধারে ঘন নীল বরিয়াতু পাহাড়, উত্তরের হাওয়ায় একঝাড় বাঁশ সেখানে দুলছে। ভাঙা ঘরের দাওয়ায় ছড়ানো এক-একখানি পুরোনো ইটের কালো ছায়া-গুলোকে ঠেলতে-ঠেলতে সন্ধ্যার আলো আস্তে-আস্তে চলে গেল। নীল পাহাড়ের শিয়রে চমৎকার ঠাণ্ডা নীলের উপরে একটি তারা দেখা দিলে, তারি নীচে লাল একটি পুটুস ফুল ভাঙা ঘরের জানলা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলে, আকাশের সিঁদুর-আলোয় তার সিঁথি রঙিয়ে দিয়ে গেছে! নীল অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তারি মধ্যে থেকে দুটি সুর শুনতে পাচ্ছি—কচি গলায় একদল কারা বলছে—'টিপ্ টিপ্' আর-একদল তারা ক্রমাগত বলে চলেছে—থির অথির। আকাশের তারা আর ভাঙা বাগানের ফুলকে ঘিরে রাত্রির শেষ পর্য্যন্ত খোলা বাতাস এই দুই সুরের ওঠা-পড়ার ঝঙ্কারে ভরপুর শুনছি!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চল্‌তি কথা

তরুণের জয়—গত মাসে চট্টগ্রামে বাংলার প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম কনফারেন্সে অসহযোগী-নন্ এমন অনেক নেতাও যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোনো প্রস্তাবই সেখানে গ্রাহ্য হয় নি। এবারকার কনফারেন্সে সব চেয়ে বড় কথা যেটা, সেটা হচ্ছে—চট্টগ্রামের অভ্যর্থনা-সমিতি একজন বাঙালী মহিলাকে সভানেত্রীত্বের আসনে আহ্বান করেছিলেন এবং তাঁরই নেত্রীত্বে সভার সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল।—তারুণ্যের লক্ষণই এই।

গৃহ-সংসারের কাজ ছাড়া বাঙালীর মেয়ে যে ঘরের বাইরে এসে পুরুষের সঙ্গে একত্রে জাতির কল্যাণকর কোনো কাজে যোগ দিতে পারেন, এবং পারলেও সেটা উচিত কি না—দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সম্বন্ধে এখনও অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। কিন্তু অসহযোগীরা দেশের নারীদের তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান করায় দেশের ভবিষ্যতে তার চেয়ে ঢের বড় সৌভাগ্য সূচিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে নারীজাতিকে অবহেলা করে আমরা যে নারীত্বের অপমান করেছি, নারীর প্রাপ্য মর্য্যাদা থেকে তাঁকে বঞ্চিত রেখে আমরা যে পৌরুষের অপমান করেছি, নারীকে অজ্ঞানের অন্ধকারে ফেলে রেখে আমরা যে মনুষ্যত্বের অপমান করেছি, মনুষ্যত্বের অপমানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে ঈশ্বরকে অপমান করেছি—জাতির মহা-সৌভাগ্যের বিষয় যে অসহ-

যোগীরা আজ সেই মূল কথাটাই ধরতে পেরেছেন ও তার প্রতিকারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হয়েছেন।—তরুণের ধর্ম্মই এই।

যাঁরা বলেন যে, বিপক্ষ দলের অসুবিধা ও নিজেদের দলের সুবিধার জন্যই অসহযোগীরা নারীকে রাজনীতির বন্ধুর পথে টেনে আনতে চায়, তাঁরা একথা হয়তো একেবারে ভেবে দেখেন না যে, শুধু একটা দলের সুবিধার জন্য নিজের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যাকে বিপদের সম্মুখে এমন ভাবে ঠেলে দেওয়া যায় না—বিশেষ, দলের সুবিধা হলে যেখানে ব্যক্তিগত সুবিধা হবার কোনো আশাই নাই! এর মধ্যে দেশ, জাতি ও জগতের যে কি মহৎ মঙ্গলের বীজ নিহিত রয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারে সেটা তাঁরা দেখতে না পেয়ে নারীকে মর্য্যাদা দেখাতে গিয়ে নারীত্বের অপমানই করে বসেন।

আজ আমরা যে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাবার জন্যই উন্মুখ হয়েছি, এমন কথা বল্লে সত্যের সম্মান রাখা হবে না। অন্ততঃ তাহলে এই জাতীয় যজ্ঞের হোতা যিনি তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয় না। সবার আগে আমাদের জাতিকে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করতে হবে। এই মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে ঘরে বাইরে নারীর সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশের নারীর মুখ দিয়েই একদিন প্রকাশ হয়েছিল—মৃত্যোর্মাংমৃতং গময়। তারপর যুগ যুগ ধরে দেশের নারীর অন্তরতল থেকে সেই একই ভাষা নানাভাবে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দেশের মৃত্যু-বধির পুরুষ-অন্তর সে কথায় কোনো সাড়া দেয় নি। কখনো বা কোন যুগে দু-একজন মহাপুরুষের প্রাণ নারীর অন্তরের এই বেদনায় সাড়া দিয়েছে, কিন্তু আমরা নিজেই মৃত বলে, অমৃতের সন্ধান আমরা নিজেই জানি না বলে ধর্ম্মনীতির দোহাই দিয়ে ধর্ম্মের কণ্ঠরোধ করেছি!

রাক্ষসের মায়াদণ্ডের স্পর্শে বহুদিন অচেতন থাকার পর দেবতার সোনার কাঠি আমাদের দেহে নবজীবনের সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। তরুণ বাংলা উচ্চ, নীচ, নর, নারী সকলকেই তার ধর্ম্মে আহ্বান করেছে, কর্ম্মে আহ্বান করেছে। তাই আজ সে নারীকে ডেকে এনে জাতীয় সভার অধিষ্ঠাত্রীর আসনে বসিয়েছে—জয় তরুণের জয়!

অস্পৃশ্যতা নিবারণ—কংগ্রেসে, কনফারেন্সে সভা-সমিতিতে সর্ব্বত্রই অন্ত্যজ জাতিকে উন্নত করবার ও অস্পৃশ্যতা দূর করবার প্রস্তাব চলেছে। সেদিনকার চট্টগ্রামের কনফারেন্সেও এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। সর্ব্বত্রই শুনতে পাই যে, অস্পৃশ্যতা নিবারণ করতে না পারলে আমাদের পক্ষে স্বরাজ লাভ অসম্ভব হবে। স্বরাজ্যের জন্য যাঁরা সমাজের এতদিনের একটা সংস্কারকে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছেন, তাঁদের দেশভক্তিকে প্রণাম করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বার বার মনে পড়ছে যে অস্পৃশ্যতা নিবারণকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটা উপায় স্বরূপ মনে করে আমরা এর মহত্বকে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করে ফেল্‌ছি।

দেশকে ভালবাসার অর্থ দেশের মানুষকে ভালবাসা। মানুষের প্রতি মানুষের যে ধর্ম্ম—অস্পৃশ্যতা প্রথা মেনে সে ধর্ম্ম পালন করা চলে না। অস্পৃশ্যতা নিবারণকে রাজনৈতিক মোক্ষলাভের উপায়-স্বরূপ অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর উপায়টার কথা মনে থাকবে বলে তো বিশ্বাস হয় না, অন্ততঃ ইতিহাস থেকে এর স্বপক্ষে কোন সন্তোষজনক সাক্ষ্য পাই না।

যে জিনিষ বিরাট এবং মহৎ তাকে সেই ভাবেই দেখতে হবে; তা না হলে তার মহত্বও আমাদের চোখে ছোট হয়ে ধরা দেবে। মনুষ্যত্বকে আমরা ছোট করে দেখেছি বলেই মানুষ আমাদের কাছে ছোট হোয়ে গিয়েছে; তাই না মানুষের কাছে—আমাদের কাছে অস্পৃশ্যতা সম্ভব হয়েছে! ধর্ম্মকে ছোট করে দেখেছি বলে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানটাই আমাদের চোখে বড় হয়ে উঠেছে, বিশ্ব-নিয়ন্তাকে ছোট করে দেখেছি বলেই বিশ্বকর্ম্মাকে আমরা মানুষের হাতে তৈরী মন্দিরের মধ্যে বদ্ধ করতে সাহস করেছি।

হিন্দু-মুসলমান-পার্শী-খ্রীশ্চানের মিলনকেও আমাদের এই দিক দিয়েই বিচার করতে হবে। যে ধর্ম্ম মানুষকে ভালবাসতে বলে, সে ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নাই। আমি হিন্দু কিম্বা আমি মুসলমান শুধু,—সেইজন্যই যে আমার ধর্ম্ম ভাল, তা নয় -আমার ধর্ম্ম মানুষকে ভালবাসতে শিক্ষা দেয়, সেইজন্যই আমি হিন্দু কিংবা মুসলমান। এই মিলনকেও যদি আমরা স্বরাজ্য-লাভের উপায়-স্বরূপ ব্যবহার করি, তাহলে বর্ত্তমানে স্বরাজ্য লাভ হয়তো সম্ভব হতে

পারে ; মিলনটা চিরস্থায়ী হবে কি না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হাত পারা যায় না। আর মিলন যদি চিরস্থায়ী না হয় তাহলে স্বরাজ্য কখনো স্থায়ী হবে না। স্বরাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরে মনুষ্যত্বের বোধও জাগিয়ে তুলতে হবে। এই মনুষ্যত্বের বোধ যদি আমাদের অন্তরে প্রবল হয়ে ওঠে—জগতের কোন পাশবিক শক্তিই তাহলে আমাদের বেঁধে রাখতে পারবে না। এই মনুষ্যত্বের জোরেই আমরা পৃথিবীর হৃদয় জয় করবো। কবির স্বপ্ন সেদিন আর কল্পনা বলে ভ্রম হবে না, বিশাল এই ধরণীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-হাত বাড়িয়ে আমরা জোর গলায় বলতে পারবো—এ পৃথিবী আমার, কারণ এর প্রত্যেক মানুষই আমার প্রিয়, কারণ মানুষকে আমরা ভালবাসি।

মালাবারের হিন্দু—মালাবারের মোপলারা ব্রিটিশ-বিদ্রোহী হয়ে অনেক হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ভেঙ্গে ফেলেছে ও সেই সঙ্গে অনেক হিন্দুকে মুসলমান করে নিয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিদের মধ্যে এই হিন্দুই বোধ হয় একমাত্র জাতি—যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাণের ভয় দেখিয়ে অথবা কোনো কৌশলে বিশেষ একটা অনুষ্ঠান করিয়ে নিতে পারলেই সে ধর্ম্মচ্যুত হয়!

ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় জনকয়েক লোক এই-সব ভাঙা মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন। তাঁরা আমাদের কাছেও কিছু সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। এঁরা আরও জানিয়েছেন যে, যে-সব হিন্দুকে জোর করে মুসলমান করা হয়েছে, তারা আবার যাতে হিন্দু হতে পারে, সে সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ডাক্তার কুর্ত্তকোটির পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। তিনি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র থেকে নজীর খুঁজে বলেছেন যে, এইসব মুসলমান প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হতে পারে। এই প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন, তাই সাধারণের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

যাঁরা এই মহৎ কাজে হাত দিয়েছেন তাঁদের প্রথমেই এই কথাটা নিশ্চয় মনে হয়েছে যে, জোর কোরে যাদের মুসলমান করা হয়েছে তাদের মধ্যে যদি কেউ আবার হতে চায় তবে তাতে কোনো বাধা থাকা উচিত নয়। বিশেষ তারা কেউ সখ করে স্বেচ্ছায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করতে যায় নি! এর মধ্যে শাস্ত্রের কচকচি কিংবা প্রায়শ্চিত্তের ভড়ংকে টেনে এনে ব্যাপারটি এমন জটিল করে তোলবার প্রয়োজনই বা কি? শাস্ত্রে যদি এদের আবার হিন্দু হওয়ার পক্ষে কোনো বিধান অথবা ব্যবস্থা না থাকতো তা হলে তাদের সম্বন্ধে কি কথা হতো? আমাদের বিশ্বাস যে খুঁজে দেখলে শাস্ত্রের মধ্যে এই বিধানের বিরুদ্ধ মতও পাওয়া যাবে।

যে পত্রে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, তাতে লেখা আছে যে, এই সব মুসলমানদের নানা অনুষ্ঠান করে বিশুদ্ধ (purificatory cere : o ies) হতে হবে। এঁরা বলতে চান যে মুসলমান হয়ে তারা অবিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে! মালাবারের মোপলারা এদের জোর করে মুসলমান করে হিন্দুত্বের প্রতি যে বিরাগ দেখিয়েছে, এই "বিশুদ্ধতার" কথা তুলে এঁরাও মুসলমানত্বের প্রতিও তার চেয়ে বিরাগ কিছু কম দেখান-নি। আসল গণ্ডগোল এইখানেই।

সাধারণ হিন্দু হিন্দুত্বের চেয়ে নিজের প্রাণকে অনেক বেশী ভালবাসে। এর প্রমাণ আজ যে শুধু মালাবারেই পাওয়া গেল, তা নয়। যতবার এর পরীক্ষা হয়েছে, ততবারই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। ধর্ম্মকে যদি তারা সব চেয়ে বড় করে দেখতো তা হলে আজকের এ সমস্যা উঠতেই পারতো না। তাদের প্রাণ-সংশয় ঘটেছিল—তারা মুসলমান হয়ে প্রাণটাকে বাঁচিয়েছে! আবার যদি তাদের জীবনে এই রকম সমস্যা উপস্থিত হয়—এই ভাবেই তারা আবার তার সমাধান করবে। এতকাল ধরে ভারতের সমস্ত প্রদেশের হিন্দুরাই এই পন্থা অনুসরণ করেছে।

দু-লাইন কল্মা পড়লে অথবা প্রাণের ভয় দেখিয়ে কেউ তা পড়িয়ে নিলে যে-ধর্ম্ম যায়, সে-ধর্ম্ম রাখার সার্থকতা কোথায়? আমাদের বিশ্বাস যে, মালাবারবাসী এই দুঃস্থ নরনারী হিন্দুই আছে। কুগ্রহবশতঃ তাদের যে-পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল, অন্য কোন প্রদেশের হিন্দুরা সে রকম পরীক্ষায় পড়লে তারাও ঠিক এমনিভাবেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতো। এরা যখন হিন্দুত্বের গণ্ডী পেরিয়ে যায় নি তখন মালাবারবাসীদের জন্যই বা এ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কেন? তারা ইচ্ছা করলে কোনোরকম প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান না

করেই যাতে আবার হিন্দু হতে পারে, সেই রকম ব্যবস্থাই হওয়া উচিত।

সাহিত্য সম্মিলন—দু-বছর পরে গত বৈশাখ মাসে এবার মেদিনাপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়ে গিয়েছে। সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চোধুরী এম-এ, বি-এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ। যতীন বাবুর যে এতগুলি উপাধি আছে, আমরা তা জানতুম না। যতীন বাবুর অভিভাষণ-পুস্তিকা ডাকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই পুস্তিকাখানির মলাটে তাঁর নামের পিছনকার খেতাবগুলি আঁটা আছে। বোঝা গেল যতীন বাবু শুধু বিদ্বান নন্, বিদ্যাভিমানীও বটে।

ষাট বছর আগেকার বাংলা ভাষায় ষাট পৃষ্ঠাব্যাপী এই অভিভাষণ পড়লে সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যতীন বাবুর জ্ঞান যে কি অপরিসীম, তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

সভাপতি মশায় বিশ্বাস করেন যে, এমন একদিন আসবে যখন আমাদের দেশে মাতৃভাষাতেই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। বাংলা দেশে বাঙালীর ছেলেকে একদিন যে বাংলা ভাষাতেই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তাই দেওয়া উচিত, এ-সম্বন্ধে যতীন বাবু কবে কোথায় ইংরেজী ভাষায় কি লিখেছিলেন, অভিভাষণের মধ্যে সেটুকুও তুলে দেওয়া হয়েছে। বোঝা গেল যে, যতীন বাবু ইংরেজী ভাষাতেও লিখতে পারেন। দেশীয় বিদ্যার প্রতি এই দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কি প্রকার যত্ন নেওয়া হতো সে সম্বন্ধে লর্ড রোনাল্ডশে কি বলেছেন তা যদি কেউ জানতে চান— অভিভাষণের মধ্যে তাও পাওয়া যাবে।

যতীনবাবু তাঁর অভিভাষণের মধ্যে অনেক কথাই বলেছেন, তার মধ্যে সার সত্য কথা যেটুকু, সেটুকু আমরা পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি। আশা করি তাঁরা উপভোগ করবেন,—"আজ আমি আপনাদের সম্মুখে সভাপতিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এই প্রকার বিদ্বন্মণ্ডলীর সভাপতিত্ব-রূপ গুরুভার গ্রহণ করিবার শক্তি আমার নাই। আমার এই কথাটা আপনারা মামুলী বিনয় ও দৈন্য বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। * * * * কবিকুলচূড়ামণি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে আসনে বসিয়া—ইত্যাদি ইত্যাদি—সেই আসনে বসিয়া আমি আপনাদের যোগ্য কোনও নূতন কথা শুনাইতে পারি সে আস্পর্দ্ধা নাই।"

সাহিত্য শাখা—সাহিত্য শাখার সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ললিত বাবুর অভিভাষণ-পুস্তিকাও আমরা ডাকে পেয়েছি। চৌত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী এই অভিভাষণের মধ্যে জীবিত ও মৃত বহু সাহিত্য-সেবীর নাম, বহু পুস্তকের তালিকা, সেক্সপীয়র ও মেকলের বুক্‌নি এবং অনেক ইংরেজি শব্দ—মোটের উপর সাহিত্যের কথা ছাড়া আর প্রায় সমস্ত কথাই এতে পাওয়া যাবে। সাহিত্যকে ললিত বাবু কি চোখে দেখেন, তাঁর অভিভাষণ থেকে এইটুকু তুল্লেই তা বোঝা যাবে—"পল্লী-সংস্কার, কুটির-শিল্প প্রচলন, কৃষক ও শিল্পীদিগের মধ্যে প্রাথমিক-শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি প্রচারকার্য্য (propaganda work) কাব্য নাটকের ভিতর দিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।"

যতীন বাবু ও ললিত বাবু দুজনেই বলেছেন যে, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় খুব ভাল লোক এবং এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সমস্ত শিক্ষাই দেশীয় ভাষায় দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, দুটিই খাঁটি কথা—কিন্তু দুটোর একটাও সাহিত্যের কথা নয়।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

চিলের ডাক

শান্ত দুপুর, কান্ত নীলে মেঘের ছুটোছুটি,
রোদের ক্ষণে লুকিয়ে যাওয়া আবার ওঠা ফুটি',
একটি দুটি ডাক্‌ছে কাকে নিকট সুদুর হ'তে,
চিলের ধ্বনি উঠ্‌ছে কেঁপে তীব্র সরু স্রোতে—

দুপুরবেলার দগ্ধ বুকে এ কোন্ ব্যথা জাগে
তপ্ত দিশির বেদন যেন কার করুণা মাগে!
মেঘের দোলা রোদকে দোলায়, নীল রয়েছে চেয়ে,
চিলের ধ্বনি অবোধ ব্যথায় বুকটা ফেলে ছেয়ে!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নুরজাহান

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

৪৬শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩২৯ { তৃতীয় সংখ্যা

নারী কেন দেবী

আমরা সবাই শুনেছি এবং তা নানা ছন্দে ও ভণিতায় কেতাবে-সন্দর্ভে লিখে থাকি, যে ভারতে নারীত্বের আদর্শ খুব বড়। খুব বড় ও জাঁকালো বটে, কিন্তু স্বরূপতঃ সে আদর্শটা যে কি, তা' বড় একটা কেউ জানিনে! মনে মনে তা' অবশ্য স্বীকার করতে লজ্জা করে, কিন্তু না করে আর উপায় নেই। ভারতের নারীত্বেরই আদর্শ শুধু নয়, ভারতের পুরুষ-নারীর গোটা জীবনের আদর্শ অবধি এই হাজার বছর ধরে ক্রমশঃ ঘোলাটে, ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে। এ জাতি এই অজ্ঞানের পাপেই আজ মৃত্যু-দেবতার দ্বারস্থ! এমনতর আত্মবিস্মৃত জাতির না ম'রে যে উপায় নেই। ভারত বল, চীন বল, জাপান বল, ফরাসী-জার্ম্মান বল, রুস-মার্কিন মোঙ্গল-মাঞ্চু যাই বল, সব দেশের ও জাতির এক-একটি আত্মা—অন্তর-দেবতা True soul আছে; দেউলে সেই দেবতা জাগ্রত থাকলেই তার জ্ঞানের ইঙ্গিতে, শক্তির প্রেরণায়, সত্তার আনন্দে, সেই সেই জাতি সিসৃক্ষু হয়। ফরাসী যা' গড়ে আর যেমন ভঙ্গীতে গড়ে, রুস তা' গড়ে না, জার্ম্মাণ যে জীবন-শিল্পের পসরা দুনিয়ার বাজারে এনে নামায়, মার্কিনের ডালিতে ঠিক তেমনটি খুঁজে পাবে না। এই জাতি-আত্মা বা দেশের অন্তর-পুরুষ অনির্দ্দেশ্য হ'লেও সত্য ও তাঁর সৃজনের মাঝে তিনি অমোঘ মৌলিকতায় দেদীপ্য-মান। এই অন্তর-পুরুষটিকে জাগিয়ে রাখা, জাতির প্রাণ ও দেহ-মন্দিরে এই শিব-চেতনার নিত্য পূজা বাহাল রাখার উপরই জাতির জীবন নির্ভর করে। এই চেতন ভাব-ঘনকে ভুললেই ভগবানের নিয়মে তার অন্ন উঠে যায়, সে জাতি তিল তিল ক'রে মরে।

সেই-ই-ই মোগল-পাঠানের তুর্ক-সওয়ারী যুগ থেকে এই গোরাঙ্গী মোটর-সাইকেলী যুগ অবধি একটা হাজার বছর ধরে অল্পে অল্পে ভারতের জীবন-সত্য হারিয়ে যাচ্ছে,—বাহিরের আক্রমণ ও বিজেতার বল সেই মরণের বাহ্য লক্ষণ মাত্র। যে পরিমাণে আমরা ভুলেছি বিশ্ব-বিধাতার জগতে ভারতের স্থান ও ভারতের দেবার স্পর্শ-মণি, সেই পরিমাণে শুধু এদেশের নারী, নয় পুরুষও মরে এসেছে। মরতে মরতে ক্রমশঃ আমরা গিয়ে দাঁড়িয়েছি সাঙ্খ্যের পুরুষে ও আমাদের অন্তঃপুরের শক্তিরূপিণীরা গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সাঙ্খ্যের প্রকৃতিতে। সাঙ্খ্যের পুরুষ খোঁড়া—হাঁটতে পারে না, ঠুঁটো—কাজ করতে অসমর্থ, আর সাঙ্খ্যের প্রকৃতি কাণা—দেখতে পায় না। সেই পঙ্গু পুরুষ প্রকৃতির কাঁধে চড়ে প্রকৃতির পায়ে চলে ও তার হাতে কাজ করে, আর অন্ধ প্রকৃতি পুরুষের চক্ষে দেখে। এ ক্ষেত্রেও তাই, আমরা যে ঠুঁটো আর ওঁরা যে অন্ধ তা' একটু পরখ করলেই বোঝা যায়। ওঁদের কেউ বা কুরঙ্গ-নয়না, কেউ বা পদ্মপলাশাক্ষী, কেউ বা পটল-চেরা-আঁখি, তা' হোক—তবু ঐ আকর্ণ-

বিশ্রান্ত অপাঙ্গেক্ষণসিদ্ধ ঢুলুঢুলু বিলোল চোখে দৃষ্টি নেই, আছে নয়নবাণ। ওঁরা জীবনে পথ দেখতে পান না, অন্দরের খোঁয়াড়ে ওঁদের যাবজ্জীবন আব দেওয়া আছে, কাজেই পথ চলবার বালাইও নেই। তাই সেদিন "বিজলী"র স্তম্ভে ৺কমলাকান্ত শর্ম্মা ভূতলোক থেকে লিখেছেন, "কর্ম্মে প্রেরণায় পুরুষ ঠুঁটো ও খোঁড়া আর জ্ঞানে চেতনায় প্রকৃতি অন্ধ। তাই পুরুষ চলেন অন্দরেরই আশে-পাশে, তাও আবার প্রকৃতির কাঁধে চড়ে; প্রকৃতি আজীবন কাঁধে ক'রে বয়ে বেড়ায় এই খোঁড়া হাবড়া অকর্ম্মার ধাড়ী পতি-পরম-গুরুটিকে। কিন্তু মায়ের আমার দু'টি হরিণ-চোখে এতদিন আঙুল পুরে দিয়ে ঐ ঘাড়ে চড়া পুরুষই আপন বাহনটিকে কাণা করে রেখেছে, পাছে সে নিজে দেখে-শুনে নিজের সুপথ বেছে চলে। এখন মা-ঠাকরুণ তাই চলেন খোঁড়ার ইঙ্গিতে—তারই চক্ষুর দৃষ্টি ধার ক'রে ক'রে, ঠুঁটোর ফরমাস খাটতেই তাঁর দশ হস্ত কাতর।" নিজের চলা তাঁর ফুরিয়ে গেছে, পরের গরজে চলাই যা' একটু বাকি আছে।

ঐ কাণা চোখের কাণা বাণে আমাদের মধ্যে যারা মরে পতি হই, তারা হরিণ-সেঁড়া হই বেমালুম শব্দভেদী বাণে। এঁরা স্বয়ম্বরা বটে কিন্তু নেপথ্যে, গাঁয়ের পাঁচজনে ও বাপ-মায়ে যাকে বেছে দেয়, এঁরা কর্ত্তব্য-বোধে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের হিসেবে তাকে বেঁধেন। আমাদের শক্তি-পূজার দেশে ঠাকুর-দেবতা সব মাটির, আর শক্তির জীবন্ত প্রতিমা মেয়েরা সব রাঙতার; মা কালীর হাতের রাঙতার খাঁড়ার মত এতেও কাটে না, রাখে না, জীবন-রণে শক্তি দেয় না; এতে চোখ ধাঁধায়, মন মুগ্ধ করে, জীবনের অভিনয়ে চমক লাগায় এবং কখনও কখনও যজায় মজায় ও ডুবিয়ে অধঃপাতে দেয়। এঁরা শক্তি বটে কিন্তু দুর্ব্বলের বল নয়, বোঝা; সবলের জ্ঞান ও আনন্দ নয়, শিকল।

"বাহুতে তুমি গো শক্তি
হৃদয়ে তুমি গো ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

কি তত্ত্বকে লক্ষ্য ক'রে কবি এ-কথা বলতে পেরেছেন তা' আজ হিন্দুনামধারী ক'জন মানুষ বোঝে? নারী শুধু মা নয়, শুধু স্ত্রী নয়, নারী শুধু দাসী নয়, বন্ধু নয়, সেই জগচ্ছক্তির বিদ্যুন্ময়ী রূপ। ভগবান এখন আমাদের কবিতার একটা মুখরোচক বিষয়, নাম ধ'রে বিনিয়ে বিনিয়ে প্রার্থনা করবার ফাঁকা আওয়াজ, তাই নারীকে আদ্যাশক্তি বলাও তথৈবচ, প্রবন্ধের বা বক্তৃতার মসলা মাত্র। শক্তিও আমরা চিনি না, শক্তিমানকেও ভুলেছি! কয়েক শ বছরের পরাধীন-তার বশে সব সত্য আমাদের ফাঁকা উপমা ও বুলিতে গিয়ে ঠেকেছে। ভগবান যে আছেন, অমোঘ সত্যে বিশ্বকে কুক্ষিগত ক'রে শক্তির লীলায় জগদ্বিগ্রহ হয়ে আছেন, তাঁকে যে দেখা যায়, পাওয়া যায়, জীবনকে যে উর্দ্ধমূল ক'রে সেই ভাস্বর সত্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তা' মানুষ ভুলেছে। শক্তিকে চিনিনা বলে নারী তাই গুটিয়ে এসে ইন্দ্রিয়-সেবার পুতুল হয়ে গেছে, বাংলার নারী তাই এত শ' বছর ধ'রে না কামিনী, আর না স্নেহ-কাতরা জননী। সে নব নব সৃষ্টির উৎস নয়, সে পুরুষকে দেবত্ব দেবার তপঃরূপিণী হোমশিখা নয়, সে মানবের সত্তার বৈকুণ্ঠে ও মর্ত্ত্যে সোনার সেতু নয়,—সে যৌবনের রাঙা চেলিপরা কনে বৌ, প্রৌঢ়ের ঝগড়া করবার আর সন্তান-প্রসবের গৃহিণী এবং বার্দ্ধক্যের কাশী ও মালা জপার সঙ্গী। এই নারী বেদ-রচয়িত্রী ঠিক কেমনটি হয়, এই অসি হাতে দেশ-রক্ষায় রণচণ্ডী সাজলে কেমন ক'রে পায়ের তলার ধরিত্রী কাঁপে, এই নারী তপস্যার দেবাসুর-যুদ্ধে সাধকের শক্তি হয়ে জীব ও ভগবানের মাঝে কি করে যোগ স্থাপন করে, তখন তার সে তপস্বিনী উমার শান্ত নিমগ্ন অকামশুদ্ধ লাবণী কেমন দেখায়, তা' এই দেশের অমৃতের অধিকারী আর্য্যপুত্ররা ভুলে গেছে। আবার সেই স্মৃতি জাগাও, সেই শক্তির তন্ত্র উদ্ধার কর, তবে নারী জাগবে, তবে মানবী দেবী ভগবতী হবে। ভারতের নারীত্বেরও আদর্শ আকাশ-জোড়া তুষার-ধবল কৈলাস-চূড়ার মত জিনিস, তার মাথা থেকে যে ভোগবতী গঙ্গা নেমে আসে, সেই পতিত-পাবনীই হ'লো মা,—মা নারীত্বের অখণ্ড মহিমার সবটুকু নয়, স্ত্রীও সবটুকু নয়।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

ভালো অপরাধ

প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি Francois Coppe-র ফরাসী হইতে

জুন মাসের কোন এক সন্ধ্যাকালে—সেই স্বচ্ছ শান্ত সন্ধ্যা, যে সময়ে মনে হয় যেন, রাত্রি আর আসিবেই না, যে সময়ে ঈষৎ-নীলাভ আকাশ দিয়া চটুল চটক-পক্ষীরা ক্রমাগত যাতায়াত করে—সেই সময় "বাবা-ভল্‌কান", গ্রামের তামাকের দোকান্‌দার, দোকানের দরজার কাছে একটা কাঠের বেঞ্চির উপর বসিয়া আরামে পাইপ-ফুঁকিতেছিল।

সে পাইপের ধূমপান করিতেছিল বলিলে, আমার কথার ভাব ঠিক বুঝা যাইবে না—আমার বলা উচিত ছিল, পাইপ মহাশয় তাহাকে ধূমপান করাইতেছিলেন। কেননা, ভল্‌কান ও তাহার পাইপ দুজনে একত্র মিলিয়া মিশিয়া কাজ চালাইত বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পাইপ-ই ছিল, কর্ত্তা। পাইপের ধূম-জালে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন থাকিত বলিয়া গ্রামের লোকেরা উহাকে বাবা-ভল্‌কান (অগ্নিদেব) বলিয়া ডাকিত।

বাবা-ভল্‌কান ছিল নিজ পাইপের একান্ত অনুগত পদানত দাস। প্রেমিকের মত সে পাইপের কত সেবা-যত্নই করিত। হাতের আস্তিনের উল্টা পীঠ দিয়া তাহাকে মুছিত, মুছিয়া আবার তাহাতে আগুন ধরাইত; -লোহার তার দিয়া নলের ভিতরটা কতবার সাফ্ করিত; এবং যখন পাইপটা তার মুখে থাকিত না, তখন বুকের কাছে জামার ভিতরকার পকেটে একটা কোষের মধ্যে বন্ধ করিয়া অতি সন্তর্পণে রাখিয়া দিত। আমাদের আপনা-আপনির মধ্যে বলিতে কি—আমার বিশ্বাস, সে মনে করিত, তাহার পাইপের প্রাণ আছে—মন আছে, ইচ্ছা আছে। পাইপে তামাক ভরিয়া, দেশলাই জ্বালাইবার আগে, আগুন ধরাইবার যেন অনুমতি চাহিতেছে এই ভাবে স্নেহ ও সম্ভ্রমের সহিত পাইপের প্রতি একবার সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। নিশ্চয় পাইপটাও কোন প্রকার দৃষ্টিগোচর ইঙ্গিত করিয়া অনুমতি দিত, অবশ্য ঐ ইঙ্গিত কেবল সেই-ই বুঝিত। পাইপের প্রথম টানেই ভাল মানুষটির মুখে একটা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটিয়া উঠিত; তাহার মুখের ভাবে মনে হইত যেন সে পাইপ-মহাশয়ের অসীম অনুগ্রহবশতই ধূমপান করিবার অনুমতি পাইয়াছে।

দশ বৎসর হইল, এই ভাবুক ধূমপায়ী, একটা তামাকের দোকান চালাইবার জন্য এই গ্রামে আসিয়া আড্ডা করিয়াছে। তামাক-দোকানের মালিক, একজন মেজিষ্ট্রেটের বিধবা পত্নী—তিনি পারী-নগরে বাস করিতেন। দোকানের অল্প আয়ে, নিম্ন-কর্ম্মচারীর স্বল্প বেতনে বাবা-ভল্‌কান (আসল নাম পিয়ের-মার্সোঁ) বেশ সুখে জীবন যাপন করিত; তাহার প্রচুর অবসর ছিল এবং সেই অবসর-মুহূর্ত্তগুলা সে পাইপের সেবাতেই উৎসর্গ করিত। যাহারা তাহার এই ক্ষুদ্র দোকানে তামাক কিনিতে কিংবা বিয়ার-সুরায় একটু গলা ভিজাইতে আসিত তাহারা এই সরল-হৃদয় রূঢ়-আকৃতি পুরাতন সৈনিকের বন্ধু হইয়া পড়িত।

কৃষক-যুবক যাহারা যুদ্ধ-কাহিনী শুনিবার জন্য আকুল—তাহাদের নিকট, যে-সব যুদ্ধে সে লিপ্ত ছিল, সেই বড় বড় যুদ্ধের বর্ণনা করিত। এবং সেই গল্পপ্রিয় লোকেরা তাহাকে একটু ভক্তিশ্রদ্ধাও করিত;—কারণ, সে তাহার দোকানে মাতালদিগকে প্রশ্রয় দিত না! যখন তাহার খদ্দেররা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় বিয়ার পান করিত, তখনি সে তাহাদিগকে বলিত:—"ভাই-সব! আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে; যাও, শুতে যাও"!

এই মধুর জুনমাসের সায়াহ্নে, বাবা-ভল্‌কান, দোকান-গৃহের দরজার সামনে বসিয়া যখন পাইপ ফুঁকিতেছিল, তখন গ্রামের রাস্তার মোড়ে, গ্রামের পাদ্রি আবে-পুলিয়েকে দেখিতে পাইল। পাদ্রি-মহাশয়, পাদ্রির পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, তাঁহার দৈনিক অভ্যাস-অনুসারে, চারি

পয়সার নস্য ক্রয় করিতে আসিতেছিলেন; অনেক দিন হইতে এই প্রবাণ ধূমপায়ী ও এই চির-অভ্যস্ত নস্য-সেবী এই উভয়ের মধ্যে একটা মমতা জন্মিয়াছিল। কেননা, দুজনেই সরল-হৃদয় খাঁটি লোক! আজিকার সায়াহ্নে পাদ্রিমহাশয়, নস্য-ভরা নস্যদানী হইতে এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিয়া, মুক্ত বায়ু সেবন ও একটু খোস্-গল্প করিবার জন্য বাবা-ভল্‌কানের পাশাপাশি বেঞ্চির উপর আসিয়া বসিলেন। কিন্তু তামাকু-বিক্রেতা মৌন হইয়া রহিল। বাবা-ভল্‌কানের কৃষি-সম্বন্ধে ঔৎসুক্য আছে জানিয়া, এই বৎসর চেরি-ফল খুব সস্তা হইয়াছে, ছোলার ফসল খুব প্রচুর হইয়াছে—ইত্যাদি কথা পাড়িয়া পাদ্রিমহাশয় কথাবার্ত্তা সুরু করিয়া দিলেন। প্রবাণ সৈনিক কথার উত্তরে শুধু হাঁ, না, বলিয়াই ক্ষান্ত হইল, এবং হঠাৎ তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল; পাদ্রির সান্নিধ্যে আসিয়া হয়ত তাহার অন্তরের অন্তঃস্তল হইতে বহুকালের কোন একটা সুপ্ত উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

সে তাহার মুখ হইতে পাইপটা অপসারিত করিয়া এক মিনিট কাল, যেন কি একটা চাহিতেছে এই ভাবে পাইপের পানে চাহিয়া রহিল, এবং সম্ভবত পাইপের নিকট হইতে মৌন অনুমোদন লাভ করিয়া, সহসা পাদ্রির দিকে মুখ ফিরাইল। সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল :—

"পাদ্রিমহাশয়! গির্জার কোন ভজন-পূজনেই আপনি আমাকে দেখিতে পান না। আপনি ইচ্ছাও করেন না, যে আমি সেখানে উপস্থিত হই। তা আপনার বিবেচনাই ঠিক্। কারণ, আপনি জানেন, বাড়িতে আমি একা, কেনা-বেচার সময়-কালে আমি ত বিক্রী বন্ধ করতে পারি নে…আসলে কিন্তু আমার ভিতরে একটু ধর্ম্মজ্ঞান আছে। যে দিন আমার একটা ভারী ব্যামো হবে, যখন মনে হবে এইবার ভব-নদী পার হবার সময় এসেছে, তখন,—নিশ্চিন্ত থাকুন—আপনাকে নিশ্চয়ই ডেকে পাঠাব, আপনি আমার জীবনের সমস্ত হিসেব নেবেন—হিসেব নিকেশ করে আমাকে আপনি স্বর্গে চালান দেবেন, পয়লা নম্বর সাধুদের মধ্যে আমার স্থান করে দেবেন—এই কথা ঠিক রইল…আমি এমন কিছু করিনি যা অমার্জ্জনীয়। আমার কথায় আপনার সন্দেহ হতেই পারে—তাতে কিছু আশ্চর্য্য নেই…তবে কি না, আমার জীবনের একটা কাজের জন্য আমার সর্ব্বদাই ভাবনা হয়, যখনই সে কথা আমার স্মরণে আসে, তখন মনে হয় আপনার সঙ্গে দেখা করি, আর সমস্ত কথা আপনাকে খুলে বলি!" বাবা-ভল্‌কান যেরূপ গুরুগম্ভীর ভাবে তাহার শেষ কথাগুলি বলিয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইয়া পাদ্রি উত্তর করিলেন :—

—"এ ত সহজেই হতে পারে। আমি প্রতি শনিবারেই ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত, পাপ-স্বীকারের কামরায়…"

কিন্তু পাদ্রির কথায় বাধা দিয়া তামাকু-বিক্রেতা বলিল :—

"তবে, ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়,—একটু জটিল ধরণের…এক এক সময় আমি ভাবি যে কাজটা আমি করেছি সেটা ভাল কাজ, না খারাপ কাজ…শুনুন পাদ্রি-মশায়! আপনাদের যে পেশা, সেই পেশার দরুণই আপনারা গুপ্তকথার এক রকম গুপ্তভাণ্ডার…যদি সেই কথাটা আপনাকে বলি,—খোলাখুলি ভাবে বলি—একটা সুপরামর্শ পাবার জন্যে একজন বন্ধু যেমন বন্ধুকে বলে সেইরূপ ভাবে যদি বলি—সে কথাটা বোধ হয় বাইরে যাবে না—যাবে কি?"

পাদ্রি বলিলেন :—

—"নিশ্চয়ই না—পাপ-স্বীকার কাম্‌রার বাইরে, কথা-বার্ত্তার সময় কি-রকম সাবধান হতে হয়, কি রকম বাক্‌সংযম করতে হয় তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে—তোমার কথাটা আমাকে বিশ্বাস করে বল্লে যদি তাতে তোমার সান্ত্বনা হয়…"

—"বেশ বেশ, তা হ'লেই হ'ল"…ভল্‌কান বলিয়া উঠিল :—"আপনার বড় অনুগ্রহ—আপনি আমার একটা মস্ত উপকার করলেন…"

তাহার পর, কণ্ঠস্বর একটু নামাইয়া আনিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল :—

"পাদ্রি-মশায়, বৃত্তান্তটা বড়ই ভয়ানক…কিন্তু তা হোক্, আমার বিশ্বাসটা আবার ফিরে এসেচে—আমার যেন মনে হচ্চে, আপনি একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে আমার বিচার করবেন…

"অবশেষে আমাকে ক্রমাগত অনুনয় করায়—তার ছেলেদের সম্বন্ধে আমার দয়ার উদ্রেক করায়—পাদ্রিমশায় শুনে আপনার আতঙ্ক হবে না ত?—সে যা ইচ্ছা করেছিল, সে কাজটা আমি করব বলে স্থির করলাম...আমি তার কথা রাখ্‌লাম! হাঁ, অন্তিম বিদায় নেবার সময়, তাকে আমার বুকে খুব চেপে ধরলাম, তার মুখ চুম্বন করলাম,—তারপর—তারপর—তার উন্মুক্ত বক্ষে ছোরাটা বসিয়ে দিয়ে আমি পলায়ন করলাম···সোন্‌-নদীর জলে আমার সেই রক্ত-মাখা ছোরা, হাত-ঘড়ি ও মাণি-ব্যাগ্ নিক্ষেপ করলাম—তারপর ঘরে ফিরে এসে, সমস্ত রাত কাঁদলাম।···পাস্‌কাল যা-যা ঘট্‌বে বলে মনে করেছিল, ঠিক তাই ঘট্‌ল। পুলিসের লোকেরা মনে করলে, টাকার লোভে একজন দস্যু তাকে হত্যা করেছে;—কোম্পানী জীবন-বিমার প্রিমিয়মটা দিলে—পাস্‌কাল-গৃহিণীর একটা অন্নসংস্থান হল,—ছেলেদের মানুষ করে' তোলবার সামর্থ্য হল।

কেবল, আমি যে-কাজ করেছি তারপর তাদের দর্শন করা আমার পক্ষে বিষম শাস্তি বলে মনে হতে লাগ্‌ল ·· ·· না! যাকে আমি বিধবা করলাম, যার আর কিছুতেই সান্ত্বনা নাই—তাকে কি করে দেখব! কি করে দেখ্‌ব সেই অনাথ শিশুগুলিকে—আমি আসবামাত্র যারা আমার কাঁধে লাফিয়ে উঠত—আর এই হাত দিয়েই তাদের এখন আদর করতে হবে যে-হাতে তাদের পিতাকে আমি হত্যা করেছি—!...না! তা কিছুতেই পারব না!···

সেই সময়েই একজন লোক এই তামাকের দোকানের তত্ত্বাবধান করবার প্রস্তাব করলে; পারী ত্যাগ করে তাদের থেকে দূরে থাক্‌বার জন্য, ঐ প্রস্তাবে আমি তখনি রাজি হলাম। এখন শুধু মধ্যে মধ্যে তাদের আমি পত্র লিখি। এখন আর তাদের তেমন দুঃখের অবস্থা নয়। আর যাই হোক্ অন্ততঃ আমার কাজটা নিতান্ত ব্যর্থ হয়নি।

সে যাই হোক্! রাত্রে যখন ঘুম হ'ত না, অনেক সময় তাদের কথাই ভাবতাম, আর ভয়ানক বিষণ্ণ হয়ে পড়তাম। তখন অনেক সময় মনে হয়েছে, পাদ্রিমশায়, দৌড়ে আপনার কাছে গিয়ে আমার সব কথা খুলে বলি। ··কিন্তু অন্য সময়ে আবার, যখন আমি ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখতাম, তখন মনে হ'ত আমার লেফ্‌টেনেন্টের ঐ অনুরোধটা কখনই আমি অগ্রাহ্য করতে পারতাম না, আমি তার বন্ধুর মতই কাজ করেছি, তখন আমার মন আবার বেশ শান্ত হ'ত···এখন আপনি মন খুলে স্পষ্ট বলুন, এ সব শুনে আপনার কি-মনে হয়।"

পাদ্রি আবে-পুলিয়ে বাবা-ভল্‌কানের কথাগুলা গভীর আবেগ সহকারে শুনিয়াছিলেন। তিনি কয়েক মিনিট স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, তারপর নস্য-দানীটা খুলিয়া—যেন তাহা হইতে উত্তরটা উদ্ধার করিবেন, এই ভাবে তাহার ভিতর তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী ডুবাইয়া দিলেন। অবশেষে মন স্থির করিয়া, খুব এক বড় টিপ্ নস্য নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইলেন। তাহার পর প্রবীণ সৈনিকটিকে বলিলেন :—

"দেখ ভায়া, যদি অনুতাপ-কক্ষে গিয়া গুপ্ত-পাপের বিচার করিতে বসিতাম, তাহলে আমার প্রথমেই আমাদের শাস্ত্রের কথাটা মনে পড়িত :—"কখনই নরহত্যা করিবে না"; তখন তোমার কৃত-কর্ম্মের জন্য "অনুতাপ কর" এই ব্যবস্থা দিতে আমি বাধ্য হইতাম···কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমি প্রীত হইয়া তোমাকে আমার হাত বাড়াইয়া দিতেছি। —"তুমি অতি সদাশয় লোক"।

এই কথা বলিয়াই পাদ্রি প্রস্থান করিলেন। পাদ্রির কথায় বাবা-ভল্‌কান খুব খুসী হইল, কিন্তু তবু একটু সন্দেহ ছিল। আকাশে এখন শুধু তারার আলোক; ভল্‌কান একাকী—নিকটে জন-প্রাণী নাই। তার পাইপ্‌টা হাতের আঙুলের মধ্যে একপাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

ভল্‌কান অনেকক্ষণ পাইপের দিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল নিরপরাধ লোকের পাইপের যেরূপ মুখের ভাব হয় তাহার সেইরূপ হইয়াছে; তাহা নিরীক্ষণ করিয়া হঠাৎ তাহার চিত্ত শান্ত হইল। পাইপের নিকট ধূমপানের অনুমতি চাহিল—শয্যা আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে এই তার শেষ ধূমপান।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুই লাইন

ঘুর্ণি হাওয়া ধুলোর ধ্বজা উড়িয়ে চল্লো, ঝড়ের মুখে শুকনো পাতা গা ভাসিয়ে বেরিয়ে গেল, ফুলের পাপড়ি পাখীর পালক বাতাসের পথ ধ'রে, উড়ে চল্লো—এই হ'ল এক রকমের চলা। আর রেলগাড়ি চল্লো, ঘুড়ি-গাড়ি চল্লো নৌকা চল্লো—দুই-দুই লাইন, দুইসারি ফুট্‌পাত্‌ বা উঁচু-নীচু দুই পাড়ের মাঝ দিয়ে বাঁধা চালে—এ হ'ল আর-একরকম চলা। লাইন-বাঁধা গতি, আর লাইন-ছাড়া গতি—এই দুই গতি। ছবিই বল, কবিতাই বল, বক্তৃতাই বল, বাঁধা দস্তুরে যেটা লেখা সে দপ্তরীর টানা রুলের মধ্যে থেকেই যায়; নিজেও সে যেমন ডাইনে বাঁয়ে এঁকে-বেঁকেও দুই লাইনকে ছেড়ে চলতে অক্ষম, তেমনি শ্রোতার ও দর্শকের মনকে বাঁধন খুলে মুক্তি দিতেও অপারগ। অবশ্য লাইন-ভাঙা ছবি কবিতা ইত্যাদি, লাইন-ছাড়া রেলগাড়ি জল-ছাড়া নৌকো ঢিলে-চাকা ছেকড়া গাড়ির মতো—ছন্নছাড়া—ছড়ানো জিনিষের সমষ্টি বই আর কিছু নয়। এর চেয়ে ঢের কাজের বলতে হবে বাঁধা দস্তুরে লেখা বলা কওয়া ও চলা। কিন্তু লাইনের চাপ সে বড় বিষম চাপ, তাকে মানলে সব লেখা সব বলা কওয়া চলা বিশ্রী রকম একঘেয়ে আর সোজা ও একটানা হয়ে পড়ে। যে লাইনে আপনার কাজ কঠিনভাবে বদ্ধ রাখে, মনের প্রসার সে নিজেও পায়না, দেয়ও না অন্যকে নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে। লাইনকে ছাড়াবো না অথচ লাইন ছাড়িয়ে যাব, এই হ'ল আর্টিষ্টের চলার ধারা। রেল সে লাইন ধ'রেই চলবে; কিন্তু উড়ে চলবে পদে-পদে দুই লাইনের বাঁধন স্বীকার এবং অস্বীকার ক'রে—এই হ'ল সব আর্টের মূল কথা।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিদ্ধাচল

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জৈনদের অনেকগুলি তীর্থ আছে। ঐ সকল তীর্থের মন্দিরসমূহ সকলেরই দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। জৈন তীর্থক্ষেত্রগুলির মধ্যে কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত পলিটানার সিদ্ধাচল সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহার প্রাকৃতিক অবস্থান ও জল-বায়ুর বৈচিত্র্য ইহাকে আরও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। মুসলমানের কাছে মক্কা মদিনা যেমন, হিন্দুর তীর্থ যেমন কেদার, বদ্রিনাথ—এ স্থানসমূহ ভক্তেরা যেমন দেখিবেই, জৈনগণও ঠিক সেই দৃষ্টিতেই পলিটানার সিদ্ধাচলকে দেখিয়া থাকেন। শক্তি ও অর্থ থাকিলে জীবনে অন্ততঃ একবার এই পুণ্যভূমিতে আসিয়া ইহার মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রসমূহ দর্শন করা জৈনগণ মহাপুণ্য বলিয়া মনে করেন। কেবলমাত্র এখানে আসিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। জৈন-গণের বিশ্বাস, এই পুণ্যভূমিতে মন্দির নির্ম্মাণ করাও তাঁহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এইরূপ বিশ্বাসের ফলে প্রায় প্রতিবর্ষেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তস্থিত বহু সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মপ্রাণ জৈন এই পুণ্যভূমিতে আসিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছেন। এই কারণেই এই পর্ব্বতশিখরের উপরে যেন মন্দিরের গ্রাম বসিয়া গিয়াছে।

সিদ্ধাচলের একুশটি নাম আছে। তাহার মধ্যে একটি নাম, শত্রুঞ্জয়। এইখানেই জৈনগণের সর্ব্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান্ আদিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই পবিত্র পার্ব্বত্য-পলিটানা আসল সহর হইতে প্রায় এক মাইল অন্তরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর চৈত্র-পূর্ণিমার সময় এখানে মেলা হয়। সেই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু জৈন নর-নারী ও অপর স্ত্রীপুরুষ-বালকবালিকা এই স্থানে সমাগত হইয়া মন্দির সকল দর্শন করেন।

সিদ্ধাচলের যে দুই শৃঙ্গে মন্দিরের গ্রাম বসিয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যস্থলে পূর্ব্বে এক অতি ভীষণ খড্ (সুগভীর নিম্নভূমি) ছিল। কিন্তু কোন সম্ভ্রান্ত জৈন তীর্থযাত্রী মন্দির-দর্শনার্থী যাত্রীদের ক্লেশ অনুভব করিয়া তাহা ভরাট করিয়া দিয়াছেন। এই কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য যে কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। ফলে, এখন আর যাত্রীদের উভয় শিখরস্থ মন্দির দর্শন করিবার জন্য সেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। সিদ্ধাচলের এই উভয় শৃঙ্গের উপর যে সকল বিপুলায়তন আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা সু-উচ্চ রাজ-প্রাসাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। ঐ আশ্রম-গুলি যেন এক একটি ক্ষুদ্র দুর্গ। সমুদ্রতল হইতে ৭৮৭৭ ফুট উচ্চ পর্ব্বতচূড়ার উপর তাহাদের নির্জ্জন অবস্থান যেমন সুন্দর এবং গম্ভীর, তেমনি ইহা মনোমুগ্ধকর ও শান্তিপ্রদ। ইহার প্রত্যেক শিখর লম্বে ও চওড়ায় প্রায় ৩৫০ গজ। এই সকল শিখর ও তাহাদের সন্নিকটস্থ উপত্যকা এক বিপুলকায় সীমান্ত-প্রাচীরে বেষ্টিত। এই আবেষ্টনের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ নির্ম্মিত নয়টি আশ্রম আছে। ঐ আশ্রমগুলিও ঐরূপ সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত। প্রত্যেক আশ্রমে প্রবেশ করিবার জন্য কারুকার্য্যসম্পন্ন এক-একটি সিংহদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল আশ্রমের মধ্যে জৈনগণের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ও নূতন সমস্ত মন্দির বিদ্যমান। ছোট-বড় মন্দিরের সংখ্যা ৮৩৯। ইহার মধ্যে শতাধিক বড় বড় মন্দির রহিয়াছে। এই সকল মন্দির-মধ্যস্থ দেবমূর্ত্তির সংখ্যা ১১,৪৭৪। ইহা ভিন্ন জৈন অর্হৎ (জৈন সন্ন্যাসী) গণের ৮৯৬১ টি পদচিহ্ন আছে।

সিদ্ধাচলের শিখর

সিদ্ধাচলে উঠিবার পথ প্রস্তর-মণ্ডিত। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনানুসারে প্রস্তর-সোপানও নির্ম্মিত হইয়াছে। যাত্রিগণের যাত্রা-পথের মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্রামাগার এবং কূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে-সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি এই সকল বিশ্রাম-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া

দিয়াছেন অথবা কূপ খনন করাইয়াছেন—সেই সকল পুণ্য-চরিত ব্যক্তিগণের নাম সেই সেই স্থানে লিখিত আছে। এই যাত্রা-পথের মধ্যে একজায়গায় অত্যন্ত উচ্চ এক চড়াই আছে। যাত্রীরা যখন সেই স্থানে উপস্থিত হন, তখন সেখানকার লোকে এই শ্লোক বলিয়া থাকে :—

'হিঙ্গলাজ নো হাদো, কদে হাথ মুকী চাধো।' অর্থাৎ

হিঙ্গলাজের চড়াই ইহা সুদুর্গম বড়।
কোমর পরে হাত বেখে ভাই ইহার উপর চড়॥

উক্ত সাধুর কাতর আহ্বানে ভগবতী অম্বিকা তথায় আবির্ভূত হইয়া রাক্ষসকে বিনাশ করেন। উক্ত রাক্ষস মৃত্যুকালে দেবী অম্বিকার নিকট প্রার্থনা করে, হে দেবী অম্বিকে! আমার মৃত্যুর পর তুমি যেন কোন তীর্থের পথে আমার নামে অধিষ্ঠিতা থাক। এই জন্য দেবী অম্বিকা হিঙ্গলের প্রার্থনানুসারে হিঙ্গলাজ নাম ধারণ করিয়া সিদ্ধাচলের পথে আসিয়া অধিষ্ঠিতা হন।

এই স্থান পার হইলেই হনুমানজীর মন্দির।
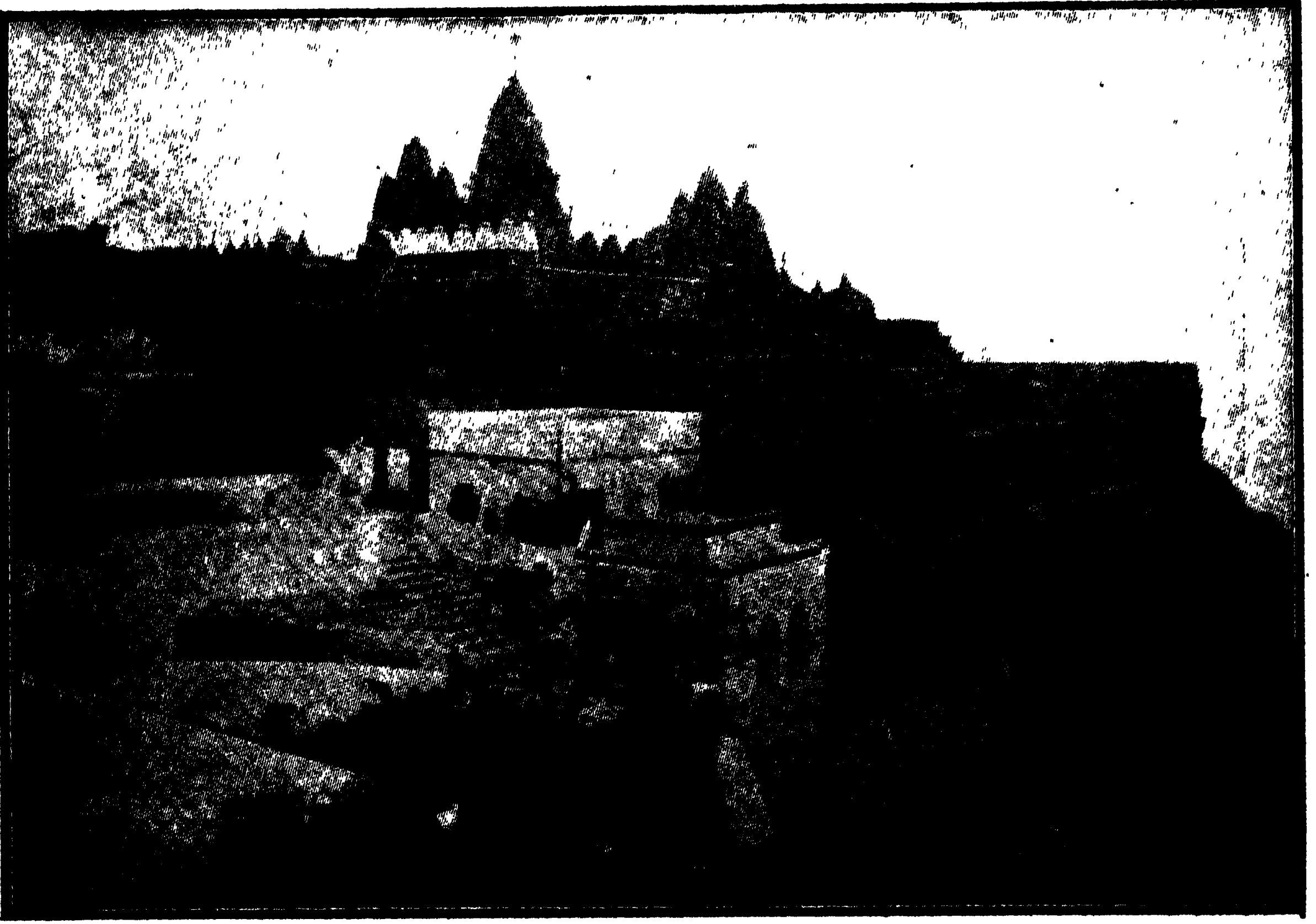
সিদ্ধাচলের উপরিস্থ এক আশ্রমের দৃশ্য

এই চড়াইয়ের উপরে ভগবতী হিঙ্গলাজ মাতার মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রাচীনকালে করাচীর সন্নিকটস্থ এক বনে হিঙ্গল নামক এক রাক্ষস বাস করিত। ঐ দুর্দান্ত রাক্ষস প্রায় সমস্ত যাত্রীকে বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করিত। একবার ঐ রাক্ষস এক সাধুকে আক্রমণ করিয়াছিল। সাধু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দানব-দলনী অম্বিকা মাতার আরাধনা করেন।

সেখান হইতে দুইটি পথ গিয়াছে। একটি পথ দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া সিদ্ধাচলের উত্তর শিখরে গিয়াছে; আর-একটি বাম দিকে উপত্যকার মধ্য দিয়া দক্ষিণ শিখরে উপস্থিত হইয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তা দিয়া যাইতে একটু দূরেই এক মুসলমান পীরের আস্তানা পাওয়া যায়। অঙ্গারশের নামে ইহার পূজা হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে, সাহাবুদ্দীন ঘোরীর রাজত্বকালে মুসলমানগণ সিদ্ধাচলের

মোট কথাটা হচ্চে এই :—একটা প্রতারণার কাজে আমি সহকারী ছিলাম, আর একজনকে খুন করেছিলাম···কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি ভালই করেছিলাম···শুনুন আমার কথাটা।"

পাদ্রি চম্‌কিয়া উঠিয়া, একেবারে বেঞ্চির শেষ প্রান্তে পিছাইয়া গেলেন। কিন্তু বাবা-ভল্‌কান তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে তাহার পাইপটা খালি করিয়া আবার সযত্নে তামাক ভরিয়া লইল, একটুও ব্যস্ত না হইয়া পাইপে আগুন ধরাইল, এবং ঈষৎ নীল আকাশের দিকে চাহিয়া কি একটা কথা ভাবিতে লাগিল। তখন আকাশে চটুল চটকদিগের আর গতিবিধি নাই—দুই চারিটা তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তায় এইরূপ বিভোর থাকিয়া বাবা-ভলকান শান্তভাবে আবার তাহার কথা বলিতে আরম্ভ করিল :—

"প্রথমেই এই কথাটা আপনাকে বলা দরকার যে আমি ১৮৬৮র কাছাকাছি এক সময়ে, যুদ্ধের পূর্ব্বেই সৈন্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েছিলাম। প্রথমে চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া সৈনিকের কাজে ছিলাম। তাহার পর আবার সৈনিকশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম, 'বোনস্‌'-মুদ্রা পাইলাম। আমার সার্জ্জেণ্ট-পদ ছিল, আর চিরকালই এই সার্জ্জেণ্ট-পদেই থাকিবার কথা। আমি বানান করিতে পর্য্যন্ত জানিতাম না। আমার পদের উন্নতি কতদূর পর্য্যন্ত হইবে তাহা একরকম পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছিল। আর একবার ছুটি, তাহার পর পেন্‌শন ও মেডেল পুরস্কার। এই রকম ভাবে সমস্তই নিয়মমত চলিয়াছিল। সেকেলে সৈন্যের মধ্যে আমার মত আবর্জ্জনা ও অযোগ্য লোক অনেকেই ছিল।

একটি যুবক সদ্‌বংশজাত—কিন্তু সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিবার মত তার অর্থ-সামর্থ্য নাই,—সৈনিক হইবার বাসনায় সে আমার রেজিমেণ্টে ভর্ত্তি হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহার ইচ্ছা, একেবারে নিম্নপদস্থ সামান্য সৈনিক হইতে, সে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে উচ্চপদে আরোহণ করে। গোড়াতেই ঝাপ্পা-ঝোপ্পা ভূষিত পরিচ্ছদধারী উচ্চপদস্থ সেনা-নায়ক হইবার তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল না। এই নবাগত ব্যক্তিকে দেখিবা-মাত্র আমার ভাল লাগিল। যুবকটির সুন্দর ফর্‌সা-রং, লাল্‌চে রংএর গোঁফ—চোখের দৃষ্টিতে যেন সাহসের আগুন জ্বলিতেছে—অথচ সকলের সঙ্গেই তাহার ব্যবহার খুব ভদ্র। কিন্তু তাহার মধ্যে কি-জানি কেমন একটা গাম্ভীর্য্য আছে যাহা দেখিয়া দর্শক এই কথা বলিতে বাধ্য হয় :—"তুমি একদিন সর্দ্দার হবে"। আমি তার শিক্ষক হইয়া, আমিই প্রথমে তাহার হাতে বন্দুক দিলাম ; এবং "বাম" "ডাইনে" এইরূপ কাওয়াজের বুলি বলিয়া তাহাকে চলা-ফেরা করাইতে লাগিলাম। বাঃ! চৌদ্দদিনের মধ্যেই দেখি, শিক্ষায় সে আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তার সামরিক বংশে জন্ম ও শিক্ষা তার শোণিতের মধ্যেই বর্ত্তমান। লুই পাস্‌কাল্‌কে (ঐ তার নাম) আমার ভাল লাগিল। প্রথম শিক্ষার বিরক্তির কিরূপে লাঘব করা যায় সেই বিষয়ে তাহাকে কতকগুলা ভাল পরামর্শ দিলাম। ছয়মাসের মধ্যেই তাহার "নায়ক" পদ হইল, শীঘ্রই তাহার পরিচ্ছদ সোনার জরিতে বিভূষিত হইল। আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব হইল। যদিও পদের হিসাবে সমকক্ষ ছিল না, কিন্তু আমি বেশ জানিতাম, সে সকল রকমেই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সে এমনি হৃদয়বান লোক যে সেটা আমাকে অনুভব করিতে দিত না, প্রবীন সৈনিক বলিয়া আমার প্রতি সম্মান দেখাইত, তাহার সৈন্যদলের ভর্ত্তি হওয়া অবধি আমি সময়ে সময়ে তাহার যে সব ছোট-খাটো উপকার করিয়াছি সে তাহা সর্ব্বদাই স্মরণ করিত। আহা, ছোকরাটি বড়ই ভাল!...আবার দেখুন, সে অনাথ দরিদ্র ছিল, একটা শিক্ষাবৃত্তি লাভ করিয়া কলেজে লেখা-পড়া শিখিয়াছিল এবং এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের নিকট হইতে খরচা হিসাবে প্রতিমাসে ১০ টাকা মাত্র পাইত। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সৈন্যদলের মধ্যে সে বেশ ফিট্‌ফাট্‌ পোষাক পরিয়া থাকিত। এক পয়সাও তাহার ধার ছিল না, বরং তাহার নিজ দলের কোন সৈনিক দায়ে পড়িলে দুই এক টাকা সাহায্যও করিত। বলিব কি, সে একটি রত্ন ছিল...আমার মত অকর্ম্মণ্য অক্ষম বুড়া, এমন গুণের বন্ধু পাইয়া সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত তাহাকে ভাল না বাসিয়া কি থাকিতে পারে...তাহার পর একদিন, তাহার সৈন্যদলস্থ আর এক সার্জ্জনের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সে তাহাকে

বেশ একটা অসির খোঁচা দিয়াছিল...আমি পাসকালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন, সে কি করিয়াছিল? সে আমাকে উত্তর করিল:—"বিশেষ কিছু না—একটা বোকামির কাজ।" কিন্তু তার পরদিনই জানিতে পারিলাম, আমি কাওয়াজের হুকুম দেবার সময় R অক্ষরটা যে রকম ঘোরালো রকমে স্রেশ্ দিয়া উচ্চারণ করি, তাই লইয়া সে ঠাট্টা করায় পাস্কাল সেই সৈনিককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। পাদ্রিমশায়, সে যদি আমাকে একটু ইঙ্গিতে জানাইত, তাহলে আমি তার জন্য আমার প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

"তাহার পর যখন জর্মাণদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইল, বিসম্বর্গে আমাদের দলই প্রথম শত্রুর সম্মুখীন হইল। তখনই আমি পাস্কালের বন্দুকগুলির অগ্নি-পরীক্ষা দেখিলাম। ওঃ, চমৎকার, কি প্রশান্ত নির্ভীকতা! ভ্রূ-যুগলের মাঝখানটা একটুও কোঁচকায় নাই। সমরে পরিপক্ক প্রবীন সৈনিকের মত অবিচলিত; যেন কাওয়াজ-শিক্ষাভূমিতে দাঁড়াইয়া বন্দুক চালাইবার নিপুণতা প্রদর্শন করিতেছে···প্রতিকূল অবস্থাতেই মানুষের প্রকৃত যোগ্যতা বুঝা যায়। যুদ্ধে হারিয়া পশ্চাৎ-যাহার সময় আমাদের ক্ষুদ্র-দলস্থ সৈনিকেরা দুই বাহু উত্তোলন করিয়া বন্দুক চালাইতে বিরত হয় নাই, পাস্কাল—অক্লান্ত অদম্য পাস্কাল—সেখানে থাকিয়া নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা সকলকে উৎসাহিত করিতেছিল। আমি পূর্ব্বেই আঁচিয়াছিলাম, ও একজন পাকাপোক্ত বাদা-দলের সেপাই,...মার্লোতে যখন ভগ্নাবশিষ্ট সৈন্যকে একত্র আনিয়া পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা হইতেছিল, তখন উহাকেই সেনানায়ক করা হইল—ইহা ঠিক্ ন্যায় বিচারই হইয়াছিল...আর তাহার সহিত "তুই-তুকারি" না করিয়া, তাহাকে "আমার লেফ্টেনেণ্ট" বলিয়া যে সম্বোধন করিতে হইত ইহাতে আমি খুব খুসী হইলাম!··কিছুদিন পরে, সেদাঁর যুদ্ধে আমরা আবার নিষ্পেষিত হইলাম। কিন্তু আমাদের দলটা ঐখান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পারীতে আবার প্রবেশ করিল—সেখানে বেশী ফরাসী সৈন্য ছিল না, আশপাশের ছোটখাটো সকল যুদ্ধেই আমাদের দলকেই সম্মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইত। শাম্পিনীতে আমার উরুদেশে একটা গুলি আসিয়া লাগিল; প্রুসিয়ানদের কর্তৃক আমি ধৃত হইলাম। যদি আমার নির্ভীক বন্ধু পাস্কাল—সেও দুইটা আঘাতে আহত হইয়াছিল—আমাকে কোলে করিয়া গোলাগুলি বর্ষণের মধ্য দিয়া পরিচর্য্যা-শকটে না লইয়া যাইত তাহা হইলে... ব্যাপারটা আপনি ত বুঝিতেই পারিতেছেন? এই লোকটিকে আমি কতই ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম, ভালবাসিতাম...শত্রুহস্তে সমস্ত সৈন্য নিরস্ত্র হইয়া আত্মসমর্পণ করিবার পর যখন আমি শুধু একটা ছড়ি হস্তে লইয়া চলিতেছিলাম, পাস্কাল ভাল্‌দে গ্রামে আমাকে দেখিতে আসিল;—দেখিলাম লেফ্টেনেণ্ট পুরস্কারের ভূষায় বিভূষিত! তাহার পোষাকে দুইটা জরির ফিতা, একটা ক্রস্—তখন বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার কোলের উপর আমি ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। বয়স ২৫ বৎসর মাত্র! ইহারই মধ্যে কর্ণেল হইয়াছে, জেনারেল হইয়াছে। না জানি আর কি হইয়াছে...দুঃখ এই যে, আর আমরা দুজনে একত্র থাকিতে পাইব না; এই নূতন পদ প্রাপ্তির পর উহাকে বোর্দোতে পাঠান হইতেছে, আমি—যে সৈন্যদলে ছিলাম, সেই সৈন্যদলেই রহিয়া গেলাম। আর তিন বৎসর পরে আমার নির্দ্দিষ্ট ছুটি পাইব।

কিন্তু লেফ্টেনেণ্ট পাসকাল তাহার পুরাতন সমর-সাথীকে ভুলিবে সে সেরূপ লোকই ছিল না। প্রতি দুই মাস অন্তর আমি তাহার নিকট হইতে চিঠি পাইতাম। তাহার ছোটখাটো দরকারী জিনিস পাঠাইবার জন্য সে আমাকে লিখিত। বড় বড় কাঁচা অক্ষরে যথাসাধ্য আমি তার উত্তর দিতাম।

কিছুকাল কাটিয়া গেল। এই দেখুন এখন আমি মুক্ত। আমি যে পেন্‌শ্যনের টাকা পাইতাম, তাহাতে কিছু অকুলান হওয়ায় আমি এক কাঠের গোলায় রক্ষকের কাজ লইলাম...একদিন অপরাহ্নে, পুরানো লোহালক্কড় গুছাইয়া রাখিতেছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, কে যেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। ফিরিয়া দেখি, আমার লেফ্টেনেণ্ট, ভদ্র গৃহস্থের পরিচ্ছদে, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

"আগেকার মতই বিনয়-নম্র। আমরা কোলাকুলি করিলাম। পাস্‌কাল আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আমি ভাল আছি কি না, নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট আছি কি না। তারপর যখন তাহাকে আমি বলিলাম —"লেফ্‌টেনেণ্ট, এই সর্ব্বপ্রথমে তোমাকে আমি ঘোরো কাপড়ে দেখিলাম।" সে উত্তর করিল ;—"ভাই, এ কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড়ে তুমি আমাকে আর কখনো দেখতে পাবে না।"

—"সে কি ? এ কথার অর্থ কি ?"...

—"আর আমি সৈনিক নই ও কাজে আমি ইস্তফা দিয়াছি।"

"আমার রক্ত চন্‌চন্ করিয়া মাথায় উঠিল। এমন ভাল সৈনিক, এমন সুন্দর সৈনিক ! সৈনিকের কাজ একেবারে ছেড়ে দেওয়া—আপনার নিশ্চিত উন্নতির পথ—জীবন-ব্যাপী জাঁকালো পদ-গৌরবের সোপান-পরম্পরা বিসর্জ্জন করা—এ কি-পাগ্‌লামি ! নিশ্চয়ই এর কোন বিশেষ-হেতু আছে। যাই হোক্, এটা একটা মর্ম্মঘাতী ব্যাপার সন্দেহ নাই। ভাঙ্গা-চুরা জিনিসে ভরা এই গুদাম-ঘরে আমার পাশে দাঁড়াইয়া পাস্‌কাল তার সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বলিল ...এক রমণী !...আমার তখনি অনুমান করা উচিত ছিল... একজন স্ত্রীলোকের দরুণ সে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। টুলুজের দুর্গ-রক্ষী সৈন্যের নায়ক পদে যখন সে টুলুজে ছিল তখন আমার লেফ্‌টেন্যাণ্ট এক পাঠশালার অধ্যাপক-কন্যার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়ে। সেখানে অধ্যাপকের সহিত সে এক গৃহেই বাস করিত। কিন্তু দেখুন, বিবাহ করিতে হইলে নিয়ম-মত দেড় হাজার টাকার যৌতুক সামগ্রী পাত্রীকে দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু সেই যৌতুক দিবার মত অর্থ-সামর্থ্য না-ছিল ঐ দরিদ্র যুবকের, না-ছিল তার ভাবী শ্বশুরের। তার পুর্ব্বেই ঝোঁকের মাথায় পাসকাল তাহার কাজে ইস্তফা দিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে, সৈনিকের পদক ভূষণাদিতে ভূষিত থাকায়, সে পারীতে এক কুঠীওয়ালার দফ্‌তরে বেশ একটা কাজ পাইল। সে খোলাখুলিভাবে আমাকে বলিল, সৈনিকের কাজ যাওয়ায় সে আদৌ দুঃখিত নহে, তার পত্নী-রত্নটিকে পাইয়া সে স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছে —আর শীঘ্রই সে একটি সন্তানের মুখ দর্শন করিবে। তাহার পর আগামী রবিবারে একটা গৃহের পঞ্চম তলায়, —তাহাদের প্রেমের নীড়টিতে তাহাদের সহিত আহার করিতে আমাকে অনুরোধ করিল।

"আমি সৈনিকের পোষাকে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এবং পাস্‌কাল-গৃহিণীকে দেখিবামাত্র, আমি আমার লেফ্‌টেনেণ্টের এই পাগ্‌লামিটাকে একটু ক্ষমার চক্ষে দেখিলাম। নিছক তরুণী, রং ফর্সা, সৌম্য বদন, নীল চোখ্ দুটিতে যেন করুণা উছলিয়া পড়িতেছে—এ-হেন রমণীর প্রেমে তার মাথা যে ঘুরিয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ! প্যাসকাল যে তাকে খুবই ভাল বাসে তা বেশ বুঝা গেল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজনও কি পরিপাটী ! এই বাড়ির এই কচি গিন্নি-ঠাকুরুণটি পুরাতন বন্ধুর মত আমার সহিত ব্যবহার করিলেন। পাসকাল তাহার পুরাতন সহ-সৈনিকের কথা নিশ্চয়ই অনেকবার তার নব বধূর নিকট বলিয়াছে মনে করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। প্যাস্‌কালের স্বাস্থ্যপান-কালে আনন্দে সুরার মাত্রাটা একটু বেশী হইয়া পড়ায়—বাড়ী ফিরিবার সময় একটু দিগ্‌ভ্রম হইতে লাগিল। আমি গুনগুন করিয়া গান গায়িতে গায়িতে চলিলাম। কিন্তু সুরার মাত্রা একটু বেশী হইলেও, সমস্ত পথটা এই নব-দম্পতার কথাই ভাবিয়াছি, উহাদের শুভ কামনা করিয়াছি, উহারা সুখী হোক্ বলিয়া কতই আশীর্ব্বাদ করিয়াছি !

"পাসকাল শীঘ্রই ব্যাঙ্কের কাজে দক্ষ হইয়া উঠিল। এমন সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে লাগিল যে, তাহার পৃষ্ঠপোষক ব্যাঙ্কের কর্ত্তা দুই বৎসরের পরেই তাহাকে আপনার অংশীদার করিয়া লইলেন। আবার সে প্রতিদিন এক্‌স্‌চেঞ্জে গিয়া টাকার খেলায় বিস্তর টাকা লাভ করিতে লাগিল। যেমন বাহিরে তেমনি ঘরেতেও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইল। তিন বৎসরের মধ্যে তিনটি সন্তান। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেগুলি কি সুন্দর ! প্রকৃত প্রেমিকেরই সন্তান বটে ! প্রতিমাসের রবিবারে—একেবারে স্থিরনির্দ্দিষ্ট—আমি উহাদের ওখানে গিয়া উহাদের সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতাম। সৌভাগ্যের মত্ততায় উহাদের হৃদয়ের একটুও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সামান্য গরীব

বন্ধুকে দেখিয়া স্বামী স্ত্রী কেহই লজ্জিত হইত না। আর এখন উহারা গৃহের পঞ্চম তলায় বাস করে না। প্রথম তলায় একটা মহল লইয়া বাস করে। একজন সুবেশী খানসামা খাবার সময় পেলেট্ বদ্‌লাইয়া দেয়। আমি সামান্য গরীব লোক, পাস্‌কালের বাড়াতে আমি কি আদর-যত্নই পাইয়াছিলাম! পাসকাল বেশ একটু আবেগ-ভরে আমার করমর্দ্দন করিত, সুন্দরী পাসকাল গৃহিণী হাসি-মুখে আমার সহিত কথা কহিতেন, ছেলেগুলি আসিয়া আমাকে চুম্বন করিত। বলুন দেখি পাদ্রিমশায়, এ রকমের ধনী লোক কি সচরাচর দেখা যায়?

"১৮৮০ সালের শীতকাল পর্য্যন্ত সব বেশ ভালোয়-ভালোয় চলিল। অনেক সময়, যখন দেখিতাম পাসকাল জাঁকালো গাড়ী করিয়া বেড়াইতেছে, তখন মনে মনে ভাবিতাম, পাসকাল সৈনিকের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ভালই করিয়াছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম রবিবারে, পাসকালকে দেখিলাম যেন একটু বিমনস্ক ও চিন্তিত এবং মধ্যে-মধ্যে,—একটা ভাবনা হইলে পূর্ব্বে যেরূপ অভ্যাস ছিল—তাহার দীর্ঘ লাল্‌চে গোঁপের প্রান্তভাগটা দাঁতের মধ্যে পূরিয়া চিবাইতেছে। আমি ওখান থেকে প্রস্থান করিয়া মনে ভাবিতে লাগিলাম, না জানি ওর কি হয়েছে। পাসকাল যখন তার স্ত্রীর পানে চাহিত তখন তার চোখদুটি যেন প্রথম-প্রেমের সেই "পূর্ব্বরাগের" মধুর রসে ভরিয়া উঠিত··· কাজকর্ম্মে কোন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে কি?···তবে কি না, রূপচাঁদ বড়ই পাজি জিনিস; ওর ঠিক্-ঠিকানা কিছুই নেই।

"আমার ঐ রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না।· দেখুন, প্রকৃত বন্ধুত্বের ভালবাসা ব্যারোমেটরের বিষয় নয়···তার পরদিনও সমস্ত দিনটা আমার মন ব্যাকুল ছিল· যেন কি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে তারই পূর্ব্বাভাস পাইলাম...

"রাত্রি দশটার কাছাকাছি, শুইতে যাইবার পূর্ব্বে আমার লণ্ঠনটা জ্বালাইলাম এবং প্রতিদিনের মতই কাঠের গোলায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তখন হাওয়াটা বড়ই ভিজে ভিজে। আকাশে একটিও তারা নাই। হঠাৎ লোহার গরাদে ঠন্‌ঠন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। আমি বিস্মিত হইলাম। এত রাত্রে কে না জানি আসিল! আমি গরাদের দ্বার খুলিয়া দিলাম, এবং আমার লণ্ঠনের আলোতে আমার লেফ্‌টেনেণ্টকে চিনিতে পারিলাম। পালোর-বস্ত্রের গাত্রাবরণে মুড়িসুড়ি দিয়া আসিয়াছিল। বুঝিলাম, একটা কোন গুরুতর ব্যাপার আছে। তার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, ভ্রূর মাঝখানে কুঞ্চিত বলি-রেখা। কোন গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া প্রথমেই আমাকে বলিল;

—"মার্সো, তোমাকে আমার দরকার—তুমি আমার সঙ্গে আসিতে পার কি?···এখনি?···"

—আমি ইতস্তত না করিয়া উত্তর করিলাম:—

—"নিশ্চয়ই পারি।"

—"বল দেখি ভাই, কাঠের গোলা ছেড়ে এখন আসতে পার কি? দুই ঘণ্টা পরে আবার এখানে ফিরে আস্‌বে—কেউ যেন দেখ্‌তে না পায়, কেউ যেন কোনরকম সন্দেহ না করে।"

—"তা খুব সহজেই হতে পারে। আমি আজ রাত্রে এখানে একা·· এ অঞ্চলটা এখন জনশূন্য, রাস্তায় একটা বেড়ালও নেই।" লেফটেনেণ্ট শুষ্ককণ্ঠে বলিল:—

—"তবে চল। এই লণ্ঠনটা নিবিয়ে দেও। এই গরাদেটা বন্ধ কর, চাবিটা তোমার পকেটে রেখে দেও··· এখন, আমার সঙ্গে চল।"

আমি তার কথা-মতই সব করিলাম। যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তার পর গোলা হইতে বাহির হইলাম। পাস্‌কাল এত দ্রুত চলিতেছিল যে তার পাশাপাশি চলা আমার পক্ষে কষ্টকর হইল। আমাদের মধ্যে কথা নাই। হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছি। এক একবার তার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—তার গোঁপের আগাটা মুখের ভিতর গুঁজিয়া চিবাইতেছে। আমি মনে করিলাম, একবার জিজ্ঞাসা করি, আমরা কোথায় যাইতেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। অনেক দূর চলিয়া গিয়া তারপর আমাকে বলিল:—

—"তুমি শ্রান্ত হও নি ত?···"আতুরাশ্রমের" ময়দান পর্য্যন্ত এই ভাবে চল্‌তে হবে—সেইখানেই আমাদের কাজ।"

—"যতদূর তোমার ইচ্ছা চল—আমার আপত্তি নেই।"

"আ! এই পথ-চলাটা আমি কখনই ভুল্‌ব না! এক দুই···এক দুই···জিম্‌ন্যাষ্টিকের মত পা-ফেলা একটা ঘাট তারপর আরও কতকগুলা ঘাট—কালো নদীর বুকে গ্যাসের আলোকচ্ছটার প্রতিবিম্ব পড়েছে···ঘরের বাহিরে জনপ্রাণী নাই···এখানে ওখানে দুই-একটা ভাড়াটে গাড়ী··· দুই-একজন পথ-চল্‌তি লোক ব্যস্তসমস্ত হইয়া চলিয়াছে··· তাহার পর কখন কখন—একটা অম্‌নিবস্‌-গাড়ী গদাই-লস্করি চালে ঘুমন্ত ভাবে চলিয়াছে—না [illegible] দলের মুখে কি-কথা শুনিব। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করিতেছে।

"অবশেষে সেই আতুরাশ্রমের ময়দানে আমরা আসিয়া পড়িলাম। একেবারেই জনশূন্য। একটা দূরস্থ ঘড়িতে পৌনে-এগারোটা বাজিল শুনিতে পাইলাম। পাশেই একটা উপবন। পাস্‌কাল একটা গাছের তলায় আসিয়া থামিল। সেখানকার গাছগুলা পত্রহীন; তবু গাছে গাছে অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে। একটা বেঞ্চে ঠোকর লাগিল। পাসকাল, শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া সেই বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল এবং ভীতি-জড়িত কণ্ঠে আমাকে বলিল :—

—"বোসো ভাই।"

আমি তার পাশে বসিলাম। তখন সে দৃঢ়-মুষ্টিতে আমার হাতটা ধরিল—তার হাতের মুঠো ভয়ানক গরম বলিয়া মনে হইল। তখন সে আমাকে বলিল :—

—"তুমি ভাই আমাকে ভালবাসো—না?"

—"এও কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়?—"

—"তুমি আমার জন্যে একটা গুরুতর কাজ করবে বলে তোমার কাছে আমি দাবী করচি।"

—"এ ত বন্ধুত্বের দাবী—কর্‌তেই ত পার।"

—"আচ্ছা, তবে শোনো ভাই···আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!···"

—"পাদ্রি-মহাশয়, বল্‌ব কি, এই কথাটা শেলের মত আমার বুকে বাজলো।"

—"হাঁ, সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমি এখন একেবারে নিরুপায়!"

—"কেন আমি সেই দরিদ্র সেনানায়কের পদেই রহিলাম না? মাসের শেষে, আমার পকেটে তখন ২০ টাকাও থাকিত না—কিন্তু আমি তবু তাতেই বাড়ী ভাড়া, খাইখরচ, ধোপা দর্জ্জির বেতন—সব খরচই দিয়ে এসেছি।...যাই হোক্‌, "যা ঘটেছে তা ঘটেছে"···ভেবে দেখ, আমার সেই অংশীদার ক্রিবেলমান্‌, একটা পাকা জুয়াচোর, সে আমার স্বাক্ষরের অপব্যবহার করেছে—অতি জঘন্য রাশি রাশি মিথ্যা কথা বলে আমারও নাম কলঙ্কিত করেছে—এই সব মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রতারণার ফলে, একমাস কি দুই মাসের মধ্যেই একটা মহাসঙ্কট উপস্থিত হবে,—ফেল্‌ হতে হবে, কথা রাখ্‌তে না পেরে আমরা দু-জনেই অবমানিত হব।... আমি আসলে অপরাধী ছিলাম না—আমি শুধু দুর্ব্বল-চিত্ত ও অন্ধ ছিলাম। কাগজ-পত্রে যখন আমার নাম দিয়েছি, তখন অবশ্য আমি দায়ী...এখন অনেক টাকা কম্‌তি পড়েছে...কিন্তু সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক! তোমার লেফ্‌টেনাণ্ট পাওনাদারদের দেউলে হবার ছলে ফাঁকি দেবে না।...আজ রাত্রে, ক্রিবেলমানের কাছে যখনি আমাদের এই ভয়ানক অবস্থার কথা শুনিলাম, তখনি বাড়ী ফিরে গিয়ে আমার রিভল্‌ভারে গুলি ভরিলাম।"

পাসকালের এই কথা শুনিয়া আমি বিস্ময় ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমি বলিয়া উঠিলাম :—

—"তুমি আত্মহত্যা কর্‌বে নাকি?"

পাসকাল উত্তর করিল :—"আমাকে গেরেফ্‌তার কর্‌বে, আমাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত কর্‌বে, আমার সামরিক সম্মান-ভূষণগুলো আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে—এইটিই কি তুমি তবে বেশী ভাল বলে মনে কর?...

···কারণ এই রকমই ত হবে,—আমায় সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ কর্‌তে হবে...এখন ভাবুকতার সময় নয় ভাই···আমি জানি, একজন পুরুষের কাছে আমি এই কথা বলেছি—স্ত্রীলোকের কাছে নয়! তুমি ভাই জান্‌বে, গুলি খেয়ে মরা ছাড়া আর আমার গত্যন্তর নাই।"

দেখুন পাদ্রিমশায়, আমার লেফ্‌টেনাণ্টকে আমি ভাইয়ের মত ভালবাসিতাম। কিন্তু আগে মান, তারপর

অন্য কিছু। যখন ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছে, তখন ওতে অনুমোদন করা ছাড়া অর্থাৎ মৌন অনুমোদন করা ছাড়া আর আমার কোন উপায় রইল না।

তখন পাস্‌কাল বলিল :—

—"তবে, এটা ত ঠিক হয়ে গেল। এখন—তোমাকে এখনি যা করতে বল্‌ব, তা যদি তুমি না কর, তাহলে আমি বাড়ী ফিরে যাব—বাড়ী গিয়ে আমার ডানদিকের রগে বন্দুকের গুলি মার্‌বার সময় আমার শুধু এই মর্ম্মান্তিক যাতনা হবে যে, আমি আমার স্ত্রী-পুত্রদের জন্য একটি পয়সাও রেখে যেতে পারলেম না—তাহাদিগকে দুঃখ-সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে গেলেম। ভাই মার্সো, তুমি ইচ্ছা করলে, এই যাতনা থেকে আমাকে অব্যাহতি দিতে পার।"

এই কথা শুনিয়া আমার মনে হইল পাসকালের মাথা খারাপ হইয়াছে, তাই আমি সহজ ভাবে বলিলাম :—

—"সে আবার কি ?"

কিন্তু একটা কল্পনা আমার লেফটেনেণ্টের মনকে তখন অধিকার করিয়াছিল—সে ভয়ানক কল্পনাটা যে কি—তাহা আপনাকে বলিতেছি শুনুন।

পাসকাল আমার আরো নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল :—

—"কয়েক বৎসর হইতে, তুমি ত ভাই জানই—সে আমার হাতে অনেক টাকা দিয়েছে। আমি কিছুই সঞ্চয় ক'রে রাখিনি। আমি মনে ভেবেছিলুম, এইরূপ সচ্ছলতা বুঝি চিরকালই থাক্‌বে; এখনো হাতে অনেক সময় আছে।

তারপর—যাদের আমি ভালবাসতাম, তাদিগকে সুখ সুবিধা ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রীতে সর্ব্বদা বেষ্টন করে রাখ্‌তে আমার কি-ভালই লাগ্‌ত! তবু আমি পূর্ব্ব হতেই একটু সতর্ক হয়েছিলাম। আমার স্ত্রীর নামে একটা জীবন-বিমার বন্দোবস্ত করেছিলাম...আমি যদি মরি—আর সেটা যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়,—(কেননা, এ অবস্থায় আত্মহত্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়)—তাহলে ওরা আমাকে একলক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হবে...এখন আমি যা বল্‌চি, কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও···এই লও একটা ছুরি···আমি আমার হাত-ঘড়ি ও মাণি-ব্যাগ্‌টা তোমাকে দিচ্চি...ঐ ছুরিটা আমার বুকে বসিয়ে দেবে—এক ঘায়েই আমাকে হত্যা করা চাই··· তারপর আমার কাপড়-চোপড় গুলো খুল্‌বে, যেন টাকা আছে কিনা জান্‌বার জন্য ঐ কাপড়গুলা তুমি হাতড়িয়েছিলে···আর ঐ ছুরিটা নিয়ে, শীঘ্র নীচে নেমে তোমার কাঠের গোলায় ফিরে যাবে ..দেখো, যেন ছুরিটা নিয়ে যেতে ভুলোনা ..কাল ওরা এখানে একটা খুনের লাস্‌ দেখ্‌তে পাবে—তখন কোম্পানী জীবন-বিমার টাকাটা দেবে, আমার পরিবার এক মুটো অন্ন খেয়ে বাঁচবে!...আমি বেশ জান্‌চি, আমি কোম্পানীকে ঠকাচ্ছি, কিন্তু কোম্পানীর ধনের অভাব নেই। তাছাড়া এটা হচ্চে আমার নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির কথা—এ-বিষয়ে ভগবানের সঙ্গে আমার বোঝা-পড়া—এর কৈফিয়ৎ আমি ভগবানকে দেব—যদি কোন করুণাময় ভগবান্ থাকেন...তোমার কাছে শুধু আমার এই প্রার্থনা,—তুমি তোমার বন্ধুর—তোমার সহ-সৈনিকের এই অন্তিমকালের শেষ-উপকারটুকু করবে... এখন আমার কথাটা বুঝ্‌লে ত ভাই ?"

"হাঁ, বুঝেছি।" কিন্তু আমার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেল। আমার নিজের হাতে হত্যা করব? আমার লেফ্‌টেনেণ্টকে! আমার একমাত্র বন্ধুকে! না, না!···এরূপ প্রবৃত্তি আমার কখনই হবে না!...কিন্তু পাস্‌কাল আমার হাতটি ধরে অনুনয় করতে লাগল, আমার কাঁধের উপর টস্‌ টস্‌ করে তার চোখের জল পড়তে লাগল, ছোট ছেলেটির মত আমাকে কত আদর আবদার করতে লাগল!···হতভাগ্য মনে মনে বুঝেছিল, অবশেষে তার কথায় আমি সম্মতি দেব, তাই সে তার স্ত্রীকে পূর্ব্ব হতেই বলিয়া রেখেছিল যে, সে ঘূর্ণি-রোগে কষ্ট পাচ্চে; রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সে দীর্ঘ পথ ধরে খুব খানিকটা বেড়িয়ে আস্‌বে···অন্ধকার রাত্রে এক নিঃসঙ্গ পথিককে আক্রমণ করে' হত্যা করা কিছুই অসম্ভব নয়···সেই জন-শূন্য স্থানে সেই বেঞ্চের উপর আমি বসে; আর পাস্‌কাল ফোঁপাতে, ফোঁপাতে, তাকে হত্যা করতে আমাকে বার বার অনুরোধ করচে—এ দৃশ্য,—এ কথা,—আমি কস্মিন্‌-কালে ভুলব না।···

পবিত্রতা নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছিল। ঐ সময়ে ভগবান্ আদিনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণকারী মুসলমান-সেনাপতিকে ক্রোধানলে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। সেই সময় হইতে তাঁহার পূজা চলিয়া আসিতেছে। এই স্থান অতিক্রম করিলেই সিদ্ধাচল-শিখরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থানই যত ধর্ম্মবিশ্বাসী জৈনের ভক্তি অশ্রুসিক্ত পুণ্যভূমি সিদ্ধাচল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ—সুন্দর মন্দিররাজি-শোভিত মূর্ত্তিমান জৈন-ধর্ম্ম। কাল্পা

করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনাদের তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন তাঁহারা তথাকার প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করিয়া কত যে পুলকিত হন, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

সিদ্ধাচলের প্রধান সিংহদ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলে সর্ব্বপ্রথমে ভগবান্ আদিনাথের প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই এই তীর্থক্ষেত্রের প্রধান মন্দির। সিদ্ধাচলের প্রসিদ্ধ রথযাত্রা-উৎসব এই মন্দিরের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমাহিত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ অথবা দুর্ব্বল

রথযাত্রা

যখন জৈন-তীর্থ-যাত্রিগণ এই পার্ব্বত্য মন্দির-বহুল নগরের তোরণ-দ্বারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের অন্তঃকরণ উক্ত স্থানের বিস্ময়-মিশ্রিত বৈচিত্র্যে পূর্ণ হইয়া যায়। তথাকার নির্জ্জন শান্তি ও সৌন্দর্য্যের প্রভাবে সংসারতপ্ত প্রাণিগণের হৃদয়-কমল উৎফুল্ল হইয়া যায়। শত বৎসর ধরিয়া কত ধর্ম্মপ্রাণ জৈন মহানুভবের ভক্তি-অশ্রু-পবিত্র কত পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত এই পুণ্যভূমি দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রিগণের হৃদয় বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া যায়। যখন দর্শকগণ তথাকার সীমান্ত-প্রাচীরের উপর আরোহণ

বা অনবসর যাত্রিগণের সিদ্ধাচল-তীর্থদর্শন এইখানেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু যে-সকল যাত্রী সুস্থ সবল, অথবা যাঁহাদের সমস্ত মন্দির-দর্শনের সময়াভাব হইবে না, তাঁহাদের তীর্থ-দর্শন এইখান হইতেই আরম্ভ হয়। তাঁহারা সিদ্ধাচলের উপরিস্থিত আশ্রমের প্রধান প্রধান মন্দির ও মূর্ত্তি সকল দর্শন করেন। এই তীর্থস্থানে যে-সকল মন্দির আছে, তন্মধ্যে আদিনাথ, কুমারপাল, বিমলা শাহ ও চৌমুখনামক মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চৌমুখনামক মন্দির এত বিশাল ও উচ্চ যে, তাহা

জৈন ভিক্ষুণীগণ

তাহার অনেকগুলিই খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পরে নির্ম্মিত, তথাপি ভাস্কর-শিল্পে ও সৌন্দর্য্যে কোনটিই হীন নহে। এই পবিত্র ভূমিতে আধুনিক কালের ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নিদর্শন জৈন ধনিগণের লক্ষ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে স্থায়িরূপে এই সকল মন্দির-গাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে।

সিদ্ধাচলের তীর্থস্থানে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়-ভুক্ত জৈনগণের প্রাধান্য দেখা যায়। সেজন্য এইস্থানে এই শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জিন ভিক্ষুণীগণের দর্শন-লাভও ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা এই তীর্থে পবিত্রতা-রূপিণী দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। এই ভিক্ষুণীগণের মধ্যে অধিকাংশ ভিক্ষুণীই বিধবা জৈনমহিলা। দিগম্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণের মন্দির এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাতে শান্তিনাথ তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতীত

প্রায় ২৫ মাইল দূর হইতে পরিদৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান মন্দির ১৬১৯ সংবতে মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের শাসন-কালে আহমদাবাদের প্রসিদ্ধ ধনী শিবসোমজী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মন্দিরে ভগবান্ আদিনাথের চতুর্মুখ বিশাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জন্য এই মন্দিরের নাম চৌমুখ মন্দির। এই মূর্ত্তি দশ ফুট উচ্চ। এত-বড় মূর্ত্তি এখানকার অন্য মন্দিরে নাই। এই মন্দির-নগরের অধিকাংশ মন্দির যদিও আধুনিক এবং

একটি শিব মন্দিরও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই তীর্থক্ষেত্রের পূজারী শৈব ধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং তাঁহার উপাসনার জন্য এখানে শিবমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রকারে সিদ্ধাচলের শান্তি-রাজ্য নানাধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারীগণের প্রাণারাম সার্ব্বজনিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। *

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

* সরস্বতী। এপ্রিল—১৯২২।

দুই দিক

(গল্প)

ভোর হইতেই ঘরের দ্বার খুলিয়া নীলিমা বাঙ্‌লার বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পূবদিকে তখন তরুণ উষার আলোয় এমন একটা গোলাপী আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সে রঙের ছটা দেখিয়া নীলিমা মুগ্ধ হইয়া গেল। নির্ম্মল নীল স্বচ্ছ আকাশ! চিরকাল কলিকাতায় বাস করিয়া এমন আকাশের কল্পনাও সে কোনদিন করিতে পারে নাই। মুগ্ধ বিস্ময়ে নীলিমা ডাকিল, ঠাকুরপো, ও ভাই, শীগ্‌গির এসো এখানে দেখে যাও, দেখে যাও।

সে-আহ্বানে সতেরো-আঠারো বৎসর বয়সের একটি ছেলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। চোখে তাহার তখনো ঘুমের ঘোর জড়ানো। বেচারা সবেমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিবার চেষ্টা করিতেছিল। বৌদি, না জানি, কি মজার জিনিষই দেখিতে ডাকিতেছে, ভাবিয়া তীব্র আগ্রহে সে বাহিরে বৌদির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—কি ভাই বৌদি?

নীলিমার মন মুগ্ধ বিস্ময়ে তখনো টলমল করিতেছিল। সে কহিল,—কেমন পরিষ্কার আকাশ দেখেচ! আর ঐ পূব দিক থেকে ফিকে গোলাপী রঙের কি সুন্দর আভা ফুটে বেরিয়েছে, ছাখো!

এই দেখিতে ডাকা! বিনয়ের মনটা মুষ্‌ড়াইয়া গেল। তাচ্ছিল্যের স্বরে সে বলিল,- এই! আমি বলি, বৌদি, না জানি, বাঘ দেখেচে, না, ভাল্লুক দেখেচে! ও ত সূয্যি উঠচে, তারি আলো!

নীলিমা বলিল,—তা নয় গো মশাই! এমন আকাশ, এমন আলো তোমার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে কখনো চক্ষে দেখেচ কোন দিন?

বিনয় হাসিয়া বলিল,—তুমি দেখনি, দেখ। একে ছেলে-মানুষ তায় আজন্ম কলকাতার ধোঁয়ায় বাস করচ! আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক—সাত-আট বৎসর পাড়াগাঁয়ে কাটিয়েওচি, আমরা ও আলো ঢের দেখেচি।

নীলিমা বলিল,—ওঃ, কি আমার মাতব্বর মুরুব্বি-মশাই এলেন! বয়সের গাছ-পাথর নেই, উনি ঢের দেখেচেন!

—দেখেছিই ত। জানো না ত বৌদি, ছেলেবেলায় দেশে বাগানে-বাগানে কত আম কুড়িয়ে জাম কুড়িয়ে বেড়িয়েচি! ভোর না হতেই দল বেঁধে সব বেরুতুম—আকাশ এমনি ফিকে লাল্‌চে রঙে ভরে থাকৃত—! আর শীতকালে ঘাসের উপর শিশির পড়ে ছোট ছোট হীরের কুচির মত কি যে সে জ্বল্‌ জ্বল্‌ করত! সত্যি, কি চমৎকারই দেখতে লাগত! তার পর তোমাদের পাল্লায় পড়ে কলকাত্তাই হলুম, আর চোখের সামনে থেকে সবুজ গাছপালা, ফর্সা আকাশ সব উবে গেল। এখানে সকালে মর্ণিং-ওয়াকে বেরুলুম যদি ত ময়লা-গাড়ীর হটর হটর, নয় ফক্‌ফড় করে উড়ের দল রাস্তায় জল দিয়ে কাদায় কাদা করেঁ দিচ্ছে! রামচন্দ্র—কলকাতাতেও আবার মানুষে থাকে!

নীলিমা বলিল,—তোমার দাদা ত কলকাতা ছাড়তে বল্‌লে প্রমাদ গণেন! এই যে আজ তিন বছর ধরে তাঁকে কত সাধছি, কলকাতা ছেড়ে বাইরে এক পা বেরুতে পারলেন কি!

বিনয় বলিল,—কি করে বেরুবে বল, বৌদি? রূপেয়ার মোহে জগতের সব রূপ যে ঢাকা পড়ে যায়।

নীলিমা বলিল,—ছাই রূপেয়া!

বিনয় হাসিয়া বলিল,—ছাই বলো না। দাদার এই রূপেয়ার জোরেই ত তুমি আজ এখানে এই নীল নির্ম্মল নভোমণ্ডল আর উষার রক্তিম আভা দেখতে পেয়েচ।

এ কথায় নীলিমা একবারটি চুপ করিল। অনেক কথাই অমনি তাহার মনে পড়িল। টাকার কথার ইঙ্গিতেই তাহার গায়ে কেমন হুল ফোটে!

সে গরীব কেরাণীর মেয়ে। কলিকাতায় জীর্ণ অট্টালিকার স্যাঁৎসেতে ঘরের মধ্যেই তাহার বালিকা-কাল নিরাড়ম্বরে কাটিয়াছিল! ভগবান অর্থ দেন নাই,—কিন্তু একটা ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলেন, সে রূপ। নীলিমার রূপের

খ্যাতি ঐ স্যাঁৎসেতে ঘর ছাড়াইয়া লোকের মুখে-মুখে এমন বহুদূর অবধি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে সেই খ্যাতির জোরে অনেক মেয়েকে হারাইয়া এ-বাড়ীর বৌয়ের আসনটুকু পরম আদরে সে দখল করিতে পারিয়াছিল! শ্বশুরবাড়াতে এই রূপের গৌরবেই সে চিরদিন গৌরবিনী হইয়া আছে! তাহাকে যে দেখিত, সেই বলিত, হাঁ, রূপসী বটে! গরিব বাপ তাহাকে একখানিও অলঙ্কার দিতে পারে নাই। এখন তাহার সিন্দুক-ভরা অলঙ্কারের রাশি - সে সবই শ্বশুরের দেওয়া, স্বামীর দেওয়া। স্বামী বিজয় তাহার এ রূপে প্রথমটা কেমন বিভোর হইয়া ছিল। এই রূপের পূজারী হইয়া দুই-দুইবার সে এগ্‌জামিন ফেল করিয়া বসে। তারপর কোথা হইতে কি যে হইল, নীলিমাকে সরাইয়া রাখিয়া একদিন সে বই লইয়া এমন মাতা মাতিল যে তাহার নেশা সে আর ছাড়িতে পারিল না! এখন সে এটর্নিগিরি করিতেছে—দিবারাত্রি মক্কেল আর আইন-পত্রের কেতাব লইয়াই ব্যস্ত থাকে। রূপসী পত্নী এই তরুণ যৌবনে রূপের পশরা লইয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকে—কোনদিন সে রূপ হয় ত বিজয়ের চোখে পড়ে, আবার কোনদিন তা পড়েও না!

আগে তাহার একটা আবদার মুখের কথায় খসিতে না খসিতে বিজয় অমনি তাহা মিটাইবার পথ পাইত না। আর এখন? সহস্র আবদার স্বামীর ঔদাসীন্যের ঘা খাইয়া দারুণ বেদনায় ঝরিয়া মরিতেছে, স্বামী তাহাতে দিব্য অটল! পয়সা যেখানে নাই, স্বামীর মন সেদিকে ঘেঁষ দিতেও জানে না! এই যে তিন বৎসর ধরিয়া নীলিমা নিত্য স্বামীকে কত সাধিয়াছে,—ওগো, এবারে পূজোয় চল না একবার বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসিগে। -তা সে কথাটা বিজয় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতে চায় না! হাসিয়া বলে,—পাগল! বিদেশে গেলে রোজগার একেবারে বন্ধ যাবে। হাওয়া খাবার সময় কোথা, বল? কাজ-কর্ম্ম সেরে বুড়ো বয়সে যখন অথর্ব্ব হয়ে পড়ব, তখন হাওয়া খেতে যাব। এখন টাকা রোজগারের সময়—!

টাকা! টাকা! এত টাকায় কাজ কি! ভগবান অভাব ত কিছু দেন নাই—তবুও টাকার এত গোলামি কেন! এই কথাটা নীলিমার মনে সর্ব্বদাই যেন ঝড়ের সুরে গর্জ্জন করিতে থাকে! এমন ত নয়, যে, দুইদিন একটু বিশ্রাম লইলে বাড়ীতে সকলে না খাইয়া মরিবে!

সেবার পূজার ষষ্ঠীর দিন ঠিক সন্ধ্যাবেলায় সোনালি জরির বোনা খুব দামী একখানা বেনারসী শাড়ী আনিয়া বিজয় নীলিমার হাতে দিয়া বলিল,—পাঁচ হাজার টাকার কাজ করা গেল, নীলিমা, তোমার ভাগ্যে। এই শাড়ী তাই তোমায় নজর দিচ্ছি। সুন্দর মানুষ, এ শাড়ীতে তোমায় খাসা মানাবে—! যেন হেম-জড়িতা দামিনী!

এ কথায় নীলিমার দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছিল। এ সাজ কাহার জন্যই বা করিব? তুমি কি দেখিবে? আমি যদি তোমার রূপসী ভার্য্যা না হইয়া রূপেয়া-ওয়ালা মাড়োয়ারী মক্কেল হইতাম, তবেই আমার আদর হইত তোমার কাছে! আবার ঠাট্টা করিয়া কবিত্ব হইতেছে, হেম-জড়িতা দামিনী! এটুকুও প্রথম মিলনের সেই কাব্য-চর্চ্চারই স্মৃতি—কি নিষ্ঠুর স্মৃতি!

নীলিমাকে গম্ভীর নিরুত্তর দেখিয়া বিজয় বলিল,—কি, কথা নেই যে! এ নজরে তুষ্টা নও, রুষ্টা প্রিয়তমা?

ঝড়ের একটা ঝাপটার মতই নীলিমা বলিয়া উঠিল,—না।

বিজয় বলিল,—বেশ, কি চাও, বল? তোমার ভাগ্যেই যখন এ টাকা পেয়েচি, তখন যাতে তোমার তৃপ্তি হয়—! জানো না, লোকে বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন!

নীলিমা বলিল—ছাই ভাগ্য! এর চেয়ে একটা জিনিষ দাও দিকি, যা বলি,—

বিজয় বলিল,—কি জিনিষ?

নীলিমা বলিল—পশ্চিমে চল না গো একবার, লক্ষ্মীটি, তোমার দুই পায়ে পড়ি। রেলগাড়ী চড়ে একবার চারধার দেখে নি—জগৎ-সংসারে কোথায় কি আছে! লোকের মুখে কত গল্পই শুনি—কবে শেষ মরে যাব, তখন তোমার আপশোষ হবে, তা কিন্তু বলে রাখচি!

এ কথায় বিজয় শুধু ছোট্ট একটু নীরস জবাব দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল,—পাগল! কার সঙ্গে যাবে?

—কেন, তোমার সঙ্গে।

—তা হয় না, নীলি। আমার যাওয়া হয় না। এখানে

পঞ্চাশ রকমের কাজ। ব্যবসার এই উঠতি-মুখে গর-হাজির থাকলে কোথায় শেষে তলিয়ে যাব!

আবার সেই টাকা! আঃ!

নীলিমা আর সে কথা তোলে নাই। তাই এবার দেবর বিনয়ের সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়া সে শেষে নাছোড়বন্দা হইয়া পড়িয়াছিল।—বিনয়ও বায়না লইয়াছিল। কাজেই বিজয় বাধ্য হইয়া তাহাদের দুইজনকে মিহিজামে পাঠাইয়াছে। মিহিজামে এক মাড়োয়ারী মক্কেলের বাড়ী আছে ষ্টেশনের কাছে,—কুঞ্জ-কুটীর। একমাস এখানে থাকিয়া নির্বিবাদে হাওয়া খাইয়া লও। বিজয় কথা দিয়াছে, তাহাদের ফিরিবার সময় একটা রাত্রি এখানে আসিয়া সে বাস করিয়া যাইবে।

২

রেলোয়ে ষ্টেশন, ট্রেণ, সন্ধ্যার সেই ঝাপ্‌সা আলো-আঁধারের মধ্য দিয়া যাত্রা,—এ-সব নীলিমার যেন স্বপ্নের মত মনে হইয়াছিল। গাড়ীতে চড়িয়া সেই যে সে জানলাটির ধারে বসিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল—তেমনি একাসনে বসিয়াই সে বরাবর মিহিজামে আসিয়াছে। রিজার্ভ-কামরায় দেবর কত তামাসা করিয়াছে, চোখে অবিরল কয়লার গুঁড়া লাগিয়া চোখ কর্‌কর্‌ করিয়াছে, দুই চোখ রগড়াইয়া জল বাহির করিয়া তবুও সে ঐ জানলার ধারটিতে বসিয়া বাহিরের দিকেই চাহিয়াছিল! একটু নড়ে নাই!

তারপর বাঙলায় আসিয়া যখন পৌঁছিল, তখন রাত্রির অন্ধকারে চারিধার ভরিয়া গিয়াছে। কিছুই দেখা হয় নাই। শুধু ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে মাঝে মাঝে ঐ বড় আলোগুলা, আর পথে চলন্ত পথিকের হাতে টিম্‌টিমে গোটাকতক ল্যাম্প জোনাকির মত সরিয়া সরিয়া চলিতেছে—সবটা আগাগোড়া যেন স্বপ্নের মত! রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাল করিয়া সে ঘুমাইতে পারে নাই—কেবলি ভাবিয়াছে, কখন্ সকাল হইবে, দিনের আলোয় পশ্চিমের পথ-ঘাট গাছ-পালা কেমন, তাহা সে চক্ষে দেখিবে!

তাই ভোর হইবামাত্র সে অস্থির চিত্তে বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দাঁড়াইয়া চারিধারের যে দৃশ্য চোখে পড়িল, তাহাতে সে একেবারে বিভোর হইয়া উঠিল। বাঙলাখানিও চমৎকার। সাম্‌নে মস্ত বাগান, লাল-নীল নানা রঙের ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া রাখিয়াছে। এই মুক্ত কাননে ফুলের রাশি,—জীবনের কি হিল্লোলই না বহিয়া চলিয়াছে! ইহার কাছে কলিকাতার বাড়ীর টবের গাছের সেই ফুলগুলা, সে যেন চাঁদের কাছে হারিকেনের আলোর মতই,—তেমনি ম্লান, তেমনি নির্জীব!

নীলিমা বলিল,—চল না ভাই ঠাকুরপো, একটু বেড়িয়ে আসি।

বিনয় বলিল,—যাব। ধাঁ করে আমায় এক পেয়ালা চা আগে খাওয়াও দিকি, আর কালকের সে কলকাতার বাসি লুচিও কিছু পড়ে আছে, না? দাও তো, খেয়ে নি। তুমিও কিছু খাও। তার পর এসো, টক্কর দিয়ে বেড়াতে বেরুই,—কে কত হাঁটতে পারে, দেখা যাবে।

বিজয় মুখ-চোখ ধুইতে চলিয়া গেল, নীলিমাও অধীর আগ্রহে ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল গরম করিতে বসিল।

তার পর চা খাওয়া হইলে দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইল। সরল পথ। দুইধারে বাগান, কুটীর—ঐশ্বর্য্যের কোন আড়ম্বর নাই। প্রকৃতির কোলে নয়ন-মনের তৃপ্তিকর এমন রাশি রাশি ছবি ছড়ানো রহিয়াছে! দূরে মাঝে মাঝে ধূম্র পাহাড়। পাহাড়ের কোলে সূর্য্যের রক্ত ছটা! পল্লী ছাড়াইয়া পথের দুইধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কোথাও খাদ। খাদে লতাগুল্ম,—কি বিচিত্র তাদের আকার আর বর্ণ! দুইজনে গল্প করিতে করিতে অনেক দূর বেড়াইয়া আসিল।

বাড়ী আসিয়া নীলিমা বলিল,—বিকেলে আবার যাব ভাই, কেমন?

বিনয় বলিল,—ধাপে ধাপে ওঠো বৌদি। একদিনে অত দৌড় সহ্য করতে পারবে না!

নীলিমা বলিল,—খুব পারব। বাজি—

—বাজি! বলিয়া বিনয় একটু থামিল, পরে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—বেশ, বাজি বাজিই। গুণে আমায় পঞ্চাশ খানি লুচি ভেজে খাওয়াবে, আর গরমা-গরম কাট্‌লেট।

নীলিমা হাসিয়া বলিল,—এই! আচ্ছা।

৩

সেদিন বেড়াইতে গিয়া পথে একটা চমৎকার বাগান চোখে পড়িল। কলিকাতার চাটার্জ্জি কোম্পানির নার্শারি। নানা রঙের ফুলের বাহার, পাতার বাহার গাছ খোলা ফটকের মধ্য দিয়া চোখে পড়িতেছিল। ওধারে লতায় পাতায় ঢাকা হট-হাউস্। দুইজনেরই ইচ্ছা হইতেছিল, একবার ভিতরে গিয়া বেশ করিয়া বাগানখানা দেখিয়া আসে।

নীলিমা বলিল,—কেউ নেই? জিজ্ঞাসা কর না ভাই ঠাকুরপো, বাগানটা দেখতে দেয় কি না।

বিনয় বলিল,—হ্যাঁ, দেখতে দেবে না আবার! এখানে ত এই সব গেঁয়ো লোক, আমরা কলকাতা থেকে এসেচি, বাগান দেখতে চাইছি শুনলে মাথায় করে দেখাবে'খন।

—তবে চল না।

—এসো। বলিয়া বিনয় আগাইয়া গিয়া বাগানে ঢুকিল। মুখে দম্ভ করিয়া সে ঢুকিল বটে, কিন্তু ফটকের মধ্যে পা দিতেই গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। যদি অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়! যদি পুলিশ ডাকে—!

আবার ভাবিল,—না, হাজার হোক্, বৌদি একজন মহিলা সঙ্গে আছে, মহিলা বাগান দেখিতে চলিয়াছে, মহিলার অপমান করিবে কি!

দুইজনে বাগানের মধ্যে খানিকটা আসিতেই এক মালীর সঙ্গে দেখা হইল। মালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিনয় পরিচয় লইল, বাগানে কে থাকে।

মালী বলিল, চাটার্জ্জি বাবুদের এক আত্মীয় বাগান তদারক করেন। তিনিই ম্যানেজার। তা ম্যানেজার বাবু এখন কলিকাতায় গিয়াছেন। তার বাড়ীর মেয়েরা বাগানের মধ্যে ঐ ছোট বাঙ্‌লাটায় থাকেন।

নীলিমা বলিল,—মেয়েরা আছেন?

মালী বলিল,—আছেন।

নীলিমা বিনয়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—গিয়ে আলাপ কর্‌লে হয় না?

বিনয় বলিল,—না। কি রকম লোক, কে জানে!

নীলিমা বলিল,—দোষ কি! খেয়ে ত আর ফেল্‌বে না।

বিনয় বৌদির পানে চাহিল,—মুখে কিছু বলিল না। ভাবিল, কাহার বাড়ী, কি রকম লোক, কেই বা জানে! সেখানে কাহার বাড়ীর মধ্যে বৌদিকে সে পাঠাইয়া দিবে! না, তা হয় না।

যাইতেও হইল না। বিনয় যখন এমনি ভাবিতেছে, তখন ভিতর দিক হইতে বিনয়ের বয়সী একটী ছেলে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল,—আপনারা কি চান?

মালী বলিল,—বাবুরা বাগান দেখতে এসেছেন।

ছেলেটি নীলিমার পানে একবার চাহিল, লজ্জায় নীলিমার মুখ অমনি রাঙা হইয়া উঠিল। শাড়ীখানা তার পার্শী মেয়েদের ধরণে পরা ছিল, চট্ করিয়া মুখে ঘোমটাও টানিতে পারিল না, তারপর পাও খালি নয়, পায়ে ছিল দিল্লীর জরিদার নাগরা! এ বেশে ঘোমটা টানাও নেহাৎ অশোভন দেখায়! ঘোমটা দেওয়ায় অভ্যস্ত হাত ঘোমটা টানিবার জন্য অধীর উদ্যত হইয়া উঠিলেও সে ঘোমটা টানিতে পারিল না। লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া নেহাৎ অপ্রতিভভাবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

ছেলেটি বলিল,—আসুন না, বাগান দেখবেন।

তারপর বিনয় ও নীলিমাকে লইয়া সে বাগান দেখাইয়া দিল। বাগান দেখা হইলে বলিল,—আমাদের বাড়ীতে যাবেন? ওখানে আমার মা আছেন, দিদি আছেন—আমরা ঐখানেই থাকি।

বিনয় চোখের ইঙ্গিত করিল, নীলিমা তাহার অর্থ বুঝিল। সে বিনয়ের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল,—না, আজ থাক্। দেরী হয়ে গেছে বড্ড।

তার পর বিনয়ের সঙ্গে ছেলেটির আলাপ হইল। এখানে কোথায় থাকে, কলিকাতার কোথায় বাড়ী, বিনয় কি করে? ছেলেটি নিজের পরিচয়ও দিল—মাথার অসুখ করিয়াছিল বলিয়া ডাক্তারের কথায় লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে, এখানে এখন নার্শারির কাজ শিখিতেছে—প্রত্যহ কলিকাতায়, এলাহাবাদে ও দিল্লীতে প্রচুর ফুল চালান দেয়। ছেলেটি নাম বলিল, সুধীর। বিনয় ও নীলিমা চলিয়া যাইতে চাহিলে সুধীর চকিতে হট্ হাউসে ঢুকিয়া নানা

রকম অর্কিডের ফুল আনিয়া নীলিমার পানে চাহিল, কহিল—একে বলে পারিজাত। আপনি এই ফুলের খুব সুখ্যাতি করছিলেন না? এই নিন্।

লজ্জায় নীলিমা মুখ আর তুলিতে পারিল না। বাঙালীর ঘরের অন্দরে বন্দী বৌ,—কলিকাতার আকাশের সূর্য্য যাহার মুখ দেখিতে পায় না—এখানে একজন অপরিচিতের হাত হইতে সে ফুল লইবে! সে ভারী অপ্রতিভ হইল। সুধীরও একটু অপ্রতিভ হইল। সে বিনয়কে বলিল,—আপনি নিন্।

বেচারার আতিথ্যে বৌদির এই ব্যবহার তাহার চোখে নেহাৎ যেন তাচ্ছিল্যের মত ঠেকিল। বিনয় একটু কুণ্ঠিতও হইল। সে বলিল,—নাওনা বৌদি, ফুল। উনি দিচ্ছেন।

নীলিমা সলজ্জভাবে তখন ফুলটি গ্রহণ করিল।

ফটক অবধি আসিয়া সুধীর তাহাদের আগাইয়া দিল। তারপর বিজয় ও নীলিমা গমনোদ্যত হইলে সুধীর বলিল,—একদিন যাবো আপনাদের বাড়ী। কোন্ কুটীরে আপনারা থাকেন, বললেন? কুঞ্জকুটীরে, না?

বিনয় বলিল,—হাঁ। বেশ ত, যাবেন। নেহাৎ এখানে একলাটি আছি আমরা। গেলে ভারী খুসী হব।

৪

পরদিন ভোরে উঠিয়া বেড়াইবার জন্য সজ্জিত বেশে নীলিমা বাহিরে আসিয়া বাঙলার বাগানে ফুল তুলিতেছিল,—বিনয়ের এখনো সাজ হয় নাই—সে আসিলেই দুইজনে বেড়াইতে যায়। এমন সময় হঠাৎ ফটকে কাহার সাড়া পাওয়া গেল। ও কে আসে, না? হাঁ। ও যে কালিকার সেই সুধীর।

সুধীর আসিয়া একেবারে নীলিমার সম্মুখে দাঁড়াইল,—তাহার হাতে ছিল হাঁসের মত এক বিচিত্র ফুল। নীলিমা লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া পড়িল—নড়িতে পারে না, অথচ মুখে কিছু বলিয়া অতিথির মর্য্যাদা রাখিবে, তাহাও পারে না। সে ভারী বিব্রত হইয়া পড়িল। বাঙলার দিকে চাহিল, বিনয়ের উপর রাগ হইল,—দেখ দেখি, এখনো সে এত দেরী করিতেছে! আসুক না বাপু!

সুধীর কিন্তু নীলিমার এ অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করিল না। ফুলটি দেখাইয়া সে বলিল,—এই নিন্। এটিও পারিজাত ফুল। কেমন চমৎকার বাহার দেখেছেন!

নীলিমা কিন্তু ফুলটি লইতে গিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল নিশ্চয় এ ছেলেটি মনে করিয়াছে, তাহারা ব্রাহ্ম—কিম্বা ব্রাহ্মদের মতই স্বাধীন মহিলা, তাই এমন অসঙ্কোচে নীলিমার সঙ্গে আলাপ করিতেছে। কিন্তু সে ত জানেনা

ফুল লইয়া কিছু যে বলা দরকার, তাহা সে বুঝিতেছিল, কিন্তু কি বলিবে! কেমন করিয়াই বা বলিবে? বুক দুর্ দুর্ করিতেছে,—গলায় স্বরও বাহির হইতে চায় না! এ যে ভারী বিপদে পড়িল সে!

এমন সময় ভগবান রক্ষা করিলেন। বিনয় হঠাৎ আসিয়া সুধীরকে অভ্যর্থনা করিল। সুধীর বিনয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—বেড়াতে বেরুচ্ছেন না কি? চলুন না, পাহাড়ে চড়বেন।

বিনয় বলিল,—পাহাড়! এখানে আবার পাহাড় কোথায়? ঐ উঁচু-উঁচু ঢিপিগুলো!

সুধীর বলিল,—না, পাহাড় বৈকি।

বিনয় বলিল,—চলুন, যাব। এসো বৌদি, পাহাড়ে চড়বে ত।

নীলিমার পা তখন এমন ভারী হইয়া উঠিল যে নড়িবার শক্তি একেবারে লোপ পাইল। বিনয় তাড়া দিল,—এসো। তারপরে ফুলটা দেখিয়া বলিল,—ও, এটা রয়েচে! আচ্ছা, দাও। আমি ফুলদানীতে রেখে আসি। বাঃ, চমৎকার ফুল ত! বলিয়া বিনয় ঘরের মধ্যে ফুলটা রাখিতে গেল। সুধীর তখন নীলিমার পানে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল,—কালকের ফুলের চেয়ে আরো ভালো ফুল এটা। তাতে খালি রঙের বাহার। এর গন্ধ আছে। গন্ধটুকু ভারী চমৎকার।

নীলিমা এ কথার কোন জবাব দিতে পারিল না। জবাব দিবার চেষ্টায় মুখ তুলিতেই সুধীরের সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল—লজ্জায় চোখের পাতা অমনি কাঁপিয়া মুদিয়া পড়িল।

বিনয় আসিয়া বলিল,—ভারী সুন্দর ফুল কিন্তু।

আপনাদের নার্শারিটি চমৎকার। দেখে আমারো ফুলের চাষ করবার ইচ্ছা হচ্ছে। একটু-আধটু শিখিয়ে দেবেন?

তিনজনে তখন বেড়াইতে চলিল। বেড়াইয়া নীলিমার তেমন আরাম হইল না। সুধীরের সান্নিধ্য পদে পদে কেমন বেড়া রচিয়া ধরিতেছিল। সুধীর ও বিনয় দুইজনে কত কথা কহিয়া চলিয়াছে—সে কথায় তাহাকে যোগ দিতে বলারও ইঙ্গিত ছিল প্রচুর, তবু কথা বাহির হইতেছিল না। অতি সংক্ষেপে একটা হাঁ কি না বলিয়াই সে যেন হাঁফ ফেলিতেছিল। বিনয়ের উপর রাগ হইতেছিল—দেখ দেখি তার আক্কেল! দুইজনে কেমন বেড়াইতে যাইতাম, কোথা হইতে ইহাকে আবার সাথী করিয়া সঙ্গে লইল!

৫

সুধীরের উপর এ কিন্তু-ভাব শীঘ্রই কাটিয়া গেল। সে এমন গায়ে-পড়া ছেলে যে তাহাকে এড়াইয়া যাইবার জো কি! বেড়ানোর সময় ও দুপুর বেলায় সে ত হাজির থাকিতই —তা ছাড়া দমকা হাওয়ার মত এমনি অতর্কিতে যখন-তখন বাড়ীতে আসিয়া উদয় হইত যে নীলিমা সর্ব্বক্ষণ কেমন তটস্থ থাকিত। এত আসা-যাওয়া করিলেও নিজের সলজ্জ কুণ্ঠিত ভাবটকে সে কাটাইতে পারে নাই। কখন্ নীলিমা হয়ত মোহন-ভোগ তৈরী করিতেছে—মাথায় কাপড় নাই, ভিজা চুলগুলি পিঠ বহিয়া ঝরাইয়া দিয়াছে, এমন সময় বৌদি বলিয়া সুধীর দুম্ করিয়া আসিয়া হাজির! আবার শুধুই কি হাজির হওয়া! সামনে বসিয়া এমনি রাজ্যের গল্প জুড়িয়া দিল যে, আর কিছুরই হুঁস রহিল না! নীলিমা যদি কাজের ছল করিয়া অন্য ঘরে উঠিয়া গেল, সেও অমনি পাছু পাছু চলিল। বিনয় যদি কোনদিন বাড়ীতে না থাকিল ত তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না। সেদিন তাহার গল্পের উৎসাহ যেন আরো বাড়িয়া উঠিত। প্রতিদিন সকালে সে ফুল লইয়া আসিত,—কোনদিন গোলাপের প্রকাণ্ড তোড়া, কোনদিন বা নানা রঙের সিজন্ ফ্লাওয়ার, কোনদিন বা কোন মনোহর অর্কিডের ফুল। নীলিমা ফুল ভালবাসে। ফুল পাইয়া তাহার চিত্ত সুধীরের দিকে ক্রমেই একটু একটু করিয়া আকৃষ্ট হইতেছিল। আবার শুধুই কি সে ফুল লইয়া আসিত। তার উৎপাতও ছিল বিলক্ষণ! একদিন দুই কাঁধে দুই কাঠ-বিড়ালী লইয়াই হাজির। নীলিমার গায়ে সেদিন একটা কাঠ-বিড়ালীই ছাড়িয়া দিল। নীলিমা ভারী রাগ করিয়াছিল—হাজার হোক্, অত বড় ছেলে, কি বলিয়া একজন অপর-মহিলার সঙ্গে এমন রঙ্গ করিতে সে সাহস পায়! নীলিমার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া সুধীরও বুঝিয়াছিল, কাজটা অন্যায় হইয়াছে। তাহার চোখ অমনি অনুতাপের ক্ষুব্ধ বেদনায় ছলছলিয়া আসিয়াছিল। কি একটা অছিলা তুলিয়া নীলিমা অন্যত্র চলিয়া গেল—আর সুধীর কেমন হতভম্বের মত মৌন বসিয়া রহিল। তাহার সে বিষণ্ন মুখ আর অনুতপ্ত ম্লান ভাব নীলিমার প্রাণেও কাঁটার ব্যথার মতই বাজিয়াছিল। তাই সে-ই আবার ফল ছাড়াইয়া হাতের তৈয়ারী জেলি খাইতে দিয়া সুধীরের মনের সে-ভাব মুছিয়া দেয়!

সেদিন বিনয় হঠাৎ মহা-উৎসাহের সুরে বলিয়া উঠিল—বৌদি, জান না ত, কি গ্র্যাণ্ড ডিস্কাভারি আমি করেচি! সুধীর বাবু কবি। তাঁর এই খাতাখানি আমি চুরি করেচি। পড়বে?

সুধীর নিতান্ত অপরাধীর মত হাত বাড়াইয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—না, না, ছি, ও সব ছেলেমান্সী আর বৌদিকে দেবেন না। সত্যি—! লজ্জায় সে এতটুকু হইয়া গেল।

নীলিমা বলিল,—না, না, দিয়ো না ভাই ঠাকুরপো। ছেলেমানুষে ছেলেমান্সী করেছ, তা দেখতে দোষ কি, শুনি? বিশেষ বৌদি বলে ডাকো যখন, আমি হলুম, বৌদি—

নীলিমা বাংলা বইয়ের পোকা। গল্প উপন্যাসের চেয়ে কবিতাই সে বেশী পড়িতে ভালবাসে। নিজেও দুই-একবার কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিল—সে বহুদিনের কথা। কিন্তু সে কাব্য-রচনায় বিনয়ের উৎসাহ আর উল্লাস এমনি ভীষণ চীৎকারে ফুটিয়া বাহির হইত যে ঠাট্টার ভয়ে কবিতার চর্চ্চা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল।

বিনয়ের হাত হইতে তাড়াতাড়ি খাতাখানা লইয়া নীলিমা বলিল—তুমি লেখো পদ্য? এ খাতার সবগুলো তোমার লেখা? কথাটা বলিয়া সুধীরের পানে চাহিতেই সে দেখিল, কি করুণ অসহায়তা সুধীরের চোখের দৃষ্টিতে মাখানো! যেন

অতি-গোপন প্রাণের কথাটুকুকে তার পবিত্র আবরণ ভাঙ্গিয়া লোক-চক্ষে কে ধরিয়া দিয়াছে, আর সেখানকার তাচ্ছল্য-অপমানের ভয়ে বেচারা সারা হইয়া উঠিয়াছে! তেমনি দুমড়ানো মুষড়ানো মূর্ত্তি! দেখিয়া নীলিমার মন গলিয়া গেল। সে বলিল,—আমি দেখতে পারি কি ভাই ?

এই সস্নেহ মিষ্ট প্রশ্নে সুধীরের সমস্ত ভয়েব উপর যেন কার প্রসাদ হস্তের পরশ লাগিল। আনন্দ-দীপ্ত নেত্রে সে বলিল—আপনি পড়বেন? বেশ ত, পড়ুন। কিন্তু ঠাট্টা করবেন না।

বিনয় বলিল,—ওহে, ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়। কবি হতে গেলে এ-তিনটে ত ছাড়তেই হয়, তাছাড়া পৃষ্ঠ-চম্ম আর চক্ষু-চর্ম্ম আজ-কাল রীতিমত কড়া করা দরকার। যে রকম সমালোচকের দৌরাত্ম্য!

নীলিমা বলিল—ভয় নেই ভাই, আমি এ খাতা লুকিয়ে পড়ব, আর কাকেও দেখাব না।

বিনয় বলিল,—বা, কি স্বার্থপর! যে ডিস্‌কাভার করলে, কলম্বস্—সে দেখ্‌তে পাবে না?

নীলিমা হাসিয়া বলিল,—না। কাঠখোট্টা লোকদের কবিতার পড়বার অধিকার নেই।

—আচ্ছা, দেখা যাবে। বলিয়া বিনয় জলখাবারে মনঃসংযোগ করিল।

নীলিমার মন অধীর হইয়া উঠিল। আঁচলের তলায় পাখীর মতই খাতাখানা যেন ঘুমাইয়া পড়িয়া আছে! বিনয় সুধীর খাইতে বসিয়াছিল,—কখন্ খাওয়া শেষ হয়! অমনি আঁচলের ঢাকা খুলিয়া এই অচিন পাখীটিকে বাহির করিবে! পাখী তখন কি বিচিত্র সুরেই না জানি গান সুরু করিয়া দিবে!

একটু ফাঁক পাইতেই সে খাতা খুলিল। কবিতা পড়িয়া অবাক হইয়া গেল। লেখা বেশ—ভারী মিঠে ভাব! প্রথম কবিতা,—ফুলের রাণী। সুধীর লিখিয়াছে,—ফুলগুলা আর কিছুই নয়, তরুণীর রূপের বিচিত্র বিকাশ শুধু। মুখের হাসি, নয়নের দিঠি, যৌবনের হিল্লোল, অধরের গোলাপী রঙ—ইহারাই মিলিয়া ফুল হইয়া ফুটিয়াছে! কেহ দিয়াছে কোমল দল, কেহ দিয়াছে গন্ধ, কেহ দিয়াছে রূপশোভা, আবার কেহ বা দিয়াছে ছন্দ! বেশ লিখিয়াছে, বাঃ! তার পর আরো কতকগুলা কবিতা পড়িয়া নীলিমা বুঝিল, এ কবিতার উৎস একজন কেহ নিশ্চয়ই আছে! কবিতাগুলি আগা-গোড়াই যেন এক রূপসী তরুণীকে কেন্দ্র করিয়া নানা সুরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে! নীলিমা ভাবিল, নিশ্চয় সুধীরের বিবাহ হইয়াছে, নহিলে এ-সব ভাব সে কোথা হইতে পাইবে!

৬

পরদিন বেড়াইতে গিয়া বিনয় মাতিয়া উঠিল, এক বুনো খরগোস লইয়া। খোলা মাঠে একটা খরগোস দেখিয়া তাহার পিছনে এমনি তাড়া করিয়া সে ছুট দিল যে কাহারো নিষেধ গ্রাহ্য করিল না। বিনয় যখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইতে না পারিয়া সুধীর আসিয়া তখন নীলিমার কাছে বসিল। নীলিমা একটা পাথরের উপর বসিয়া সুধীরের খাতা পড়িতেছিল। খাতাটা সে সঙ্গে আনিয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগে এই তরুণীর মুখে কি অপূর্ব্ব শ্রীই যে ফুটিয়াছিল—! দেখিয়া সুধীর একবারে উদ্ভ্রান্ত বিভোর হইয়া উঠিল। অপূর্ব্ব রূপ! সুধীরের মনে হইল, এই রূপ হইতে যেন এক সুমধুর পুষ্পসুরভি উঠিয়া মাথার উপরকার নীলাকাশকে অবধি নেশায় বুঁদ করিয়া দিয়াছে!

সুধীর ডাকিল,—বৌদি—

নীলিমা খাতাখানা বন্ধ করিয়া বলিল,—তোমার লেখা বেশ ত! আমার ভারী ভাল লাগচে। সুধীর কোন জবাব দিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, তাহার কবিতা লেখা সার্থক হইয়াছে! সে চুপ করিয়া রহিল। নীলিমা বলিল,—একটা কথা ঠিক বলবে ভাই?

সুধীর বলিল—কি?

—তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, না?

একটা ঢোঁক গিলিয়া সুধীর বলিল,—না। তারপর একটু হাসিয়া বলিল,—কেন ও কথা বলচেন, বলুন ত?

নীলিমা হাসিয়া বলিল—পড়ে মনে হচ্ছিল। বিয়ে হয়নি? সত্যি?

—না। আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি ?

—তা যদি না হয়ে থাকে ত লভ্‌ হয়েছে নিশ্চয়, না ? ঠিক কথা বল দিকি ভাই—

সুধীরকে অপ্রতিভ ও নিরুত্তর দেখিয়া নীলিমা আবার বলিল,—কেমন, ঠিক ধরেচি কি না! আজকালকার ছেলে ত—ঐ যে মুখ নীচু করলে! না হলে এ সব কবিতা কি মানুষ লিখতে পারে কখনো!

নীলিমার মুগ্ধ চিত্তের সাম্‌নে নিজের জীবনের অতীতের একটা পৃষ্ঠা জল্‌-জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। একটা সত্যকার কিছু না থাকিলে কি প্রাণে ভাব আসে! সেই যে স্বামীর প্রণয় নিবিড়ভাবে যখন সে লাভ করিয়াছিল, স্বপ্নের মধ্য দিয়াই যখন তাহাব দিনরাত্রিগুলা কাটিত, তখন কি বিচিত্র ভাবেই না তাহার মনও পূর্ণ থাকিত! চাঁদের আলো, দখিণ হাওয়া, ফুলের গন্ধ, এ সমস্তই যেন স্বামীর আদরের শত সহস্র রূপ ধরিয়া স্বামীর সোহাগের বিচিত্র পরশ লইয়া ধরা দিত! সেই কথাটা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন ক্রমে বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। হায় রে, এই ত সবে তাহার উনিশ বৎসর মাত্র বয়স। এই বয়সেই স্বামীর সে প্রণয়ের উচ্ছ্বাস চলিয়া গিয়াছে! প্রেম বলিয়া জিনিষটারো আর কৈ দেখাও সে পায় না! এখন শুধু সংসার আর কাজ! হায় বিধি!

হঠাৎ সুধীর একটা নিশ্বাস ফেলিল। নীলিমার স্বপ্ন অমনি সে নিশ্বাসে ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল,—কাউকে ভাল বেসেচ, না ? বল না, তোমাদের বাড়ীতে বলব না। বল—

সুধীর ডাকিল—বৌদি—

কথাটা আর বলা হইল না। ওদিকে বিনয় হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। বলিল—কি, তোমাদের কাব্য-চর্চ্চা হচ্ছে না কি! বেড়ে জুটেচ দু'জনে! বলিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতেই বলিল,—এমন ছুট্‌ করিয়েছে খরগোসটা! আঃ—

নীলিমা বলিল,—খরগোসের সঙ্গে বাজি রেখে কথামালার কচ্ছপও জিতেছিল, আর তুমি সে কূর্ম্ম অবতারেরও পরে দাঁড়ালে তাহলে,—এঁ্যা ?

বিনয় বলিল,—কি আর করা যায়, বল ?

সুধীর হঠাৎ বলিল,—আচ্ছা, আর একদিন বলবো'খন বৌদি, সব। আপনি যখন শুন্‌তেই চাচ্ছেন—

বিনয় বলিল,—কি ?

নীলিমা তাড়াতাড়ি বলিল,—ও ওর কবিতার কথা হচ্ছে। তারপর বিনয়কে কহিল,—শীকার হলো না তাহলে ?

—না। বলিয়া বিনয় একটা বিশ্রী মুখভঙ্গী করিয়া মাটীতেই শুইয়া পড়িল এবং তিনজনেই চুপচাপ রহিল। বিনয় ভাবিতেছিল, কলিকাতার বাহিরেই যা-কিছু জীবনটাকে উপভোগ করা যায়! স্বাধীনতার মুক্ত হিল্লোল,—কোথাও এতটুকু বাধা নাই, বন্ধ নাই—এই যে খরগোসটার পিছনে সে ছুটিয়াছিল, নেহাৎ শিশুর মতই! এটা কি কলিকাতায় করিতে পারিত! সুধীরের প্রাণে বাজিতেছিল, বিচিত্র ঝঙ্কারে কত সে সুর! রূপ, রূপ, দুনিয়া রূপের নেশায় পাগল হইয়া আছে! এই রূপই মানুষকে যা-একটু শান্তি দিতে পারে। এত বড় পৃথিবীটা, রূপ না থাকিলে, রৌদ্রতপ্ত শুষ্ক মাঠের মতই খাঁ খাঁ করিত! নীলিমা সুধীরের খাতা খুলিয়া কবিতা পড়িতে লাগিল। সুধীর এক জায়গায় লিখিয়াছে,—আকাশ ঘনঘোর মেঘে ভরা। তরুণী প্রিয়া আজ ঘন-কৃষ্ণ চিক্কণ কেশের রাশি ঝরাইয়া দিয়াছে। কালো কাদম্বিনী আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়া কি অভিমানে বসিয়াছে ? ঐ মেঘ ডাকিল—ও কি প্রিয়ার অশ্রুরুদ্ধ চাপা কণ্ঠস্বর! ঐ চপলার চমক—ও কি প্রিয়ার হাসি গো! এমনি অনর্গল সে লিখিয়া গিয়াছে। কোনটা ভাবের সহিত খাপ খাইয়াছে, আবার কোথাও বা নেহাৎ অর্থহীন কতকগুলা শব্দ উদাসীর প্রলাপের মতই গাঁথিয়া গিয়াছে! শেষে প্রিয়াকে এক জায়গায় সে নীল, নভ-নীলবরণী বলিয়া আহ্বান করিয়াও ফেলিয়াছে। সেটুকু পড়িয়া নীলিমা কেমন চমকিয়া উঠিল। সন্দিগ্ধভাবে একবার সুধীরের পানে চাহিল। সুধীর তখন চোখে কেমন এক দৃষ্টি লইয়া তাহারি পানে চাহিয়া আছে! সে দৃষ্টি কাঁটার মতই নীলিমাকে বিঁধিল। নীলিমা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

৭

পরদিন সকালে বেড়াইয়া আসিয়া নীলিমা বিজয়ের পত্র পাইল। বিজয় লিখিয়াছে, বড়দি আসিয়াছে। মেয়ের অসুখ, ডাক্তার দেখাইবার জন্য। এ সময় সে ও বিনয় বাড়ী আসিলে ভালো হয়।

স্বামীর নিঃসঙ্গতার কথা তখন নীলিমার মনে পড়িল। আহা, একা সারাদিন খাটিয়া-খুটিয়া ঘরে আসিয়া বসিলে কেই বা তাহাকে সেখানে খাবারটুকু গুছাইয়া ধরিয়া দেয়! কেই বা অফিসে যাইবার সময় পাণের ডিপাটি হাতের কাছে আগাইয়া দেয়, পোষাক-পরিচ্ছদ ঠিক ঝাড়া হইল কি না, দেখে! ঘাড়ের কাছে হয়ত ধুলা জমিয়া আছে, সেই ধুলা লইয়াই অফিসে চলিয়া যায়—রুমালখানা ময়লা হইয়া গিয়াছে, ঠিক সময়ে সেটা বদলাইয়া দেওয়া হয় না। সে ত বিজয়কে জানে,—কি-রকম তার এলোমেলো ঢিলা স্বভাব—কোনদিকে দৃষ্টি নাই, শুধু টাকার পিছনে উন্মাদের মতই ছুটিয়াছে!

বিনয়কে ডাকিয়া সেই রাত্রেই সে কলিকাতায় ফিরিবার ঠিক করিল। সন্ধ্যার পর ট্রেণ। ভোরে গিয়া পৌঁছিবে। বড়ঠাকুরঝি আসিয়াছে, মেয়ে অমলার অসুখ। কি অসুখ, কে জানে!

সুধীর আসিয়া সেদিন দুপুরবেলাতেও নিত্যকার মত অতিথি হইল। নীলিমা তখন জিনিষ-পত্র গুছাইতে ব্যস্ত।

সুধীর বলিল,—আজ আপনারা সত্যই তাহলে চল্‌লেন, বৌদি?

সংক্ষেপে—হাঁ ভাই—বলিয়া সে আবার রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। গিয়া ঠাকুরকে বলিল,—ওবেলার জন্যে লুচিগুলো ভেজে তরকারী করে কতক বাইরে রাখবে, আর টিফিনবাক্সে কিছু ভরে দেবে ঠাকুরপোর জন্যে। ট্রেণে সে খাবে, যদি খিদে পায়।

সুধীর একটু ক্ষুণ্ণ হইল। কাল যে কথাটা শুনিবার জন্য নীলিমা অতখানি আগ্রহ দেখাইল, তাহার কথা আজ মনেও নাই! সে যে অনেক ভাবিয়া একটা হেঁয়ালি-ভরা জবাবও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল! যাক্! সে বিনয়ের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। তাহার প্রফুল্ল মনে বিষাদের মেঘ দেখা দিয়াছিল। কেমন হাসি-গল্পে দিন কাটিতেছিল, জীবনে একটা পুলকের চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল, সে সব শেষ হইয়া গেল! কাল হইতে দিনের আলো নিবিয়া যাইবে, আবার সেই একান্ত নির্জীব অতীতের দিনই ফিরিয়া আসিবে। মালীদের পিছনে ঘুরিয়া কাজের তদ্বির করা, নিত্য সেই ফুল চালান্ দেওয়ার হাঙ্গামা—নিতান্ত একঘেয়ে, নিতান্ত নীরস কাজ!

সন্ধ্যার পর নীলিমা ও বিনয় ট্রেণে গিয়া চড়িয়াছে, অমনি সুধীরও কোথা হইতে ঝুড়ি-ভরা ফুলের রাশ আনিয়া ট্রেণের কামরায় নীলিমার কোলের উপর ঢালিয়া দিল। গন্ধে বর্ণে ট্রেণের কামরায় যেন নন্দনের শোভা ফুটিল। ব্যস্ত হইয়া ফুলগুলা কোল হইতে সরাইতে গিয়া একটা গোলাপের কাঁটা নীলিমার হাতে ফুটিল। উঃ—বলিয়া হাসিয়া নীলিমা হাত তুলিল।

সুধীর বলিল—কাঁটা ফুটল বুঝি! ঐ ত দোষ, এমন সুন্দর ফুল! কাঁটার ঘা বাদ যায় না! এই দেখুন বৌদি, নিজের হাতে ফুল তুলেচি কি না, কাঁটায় বিঁধে আঙুলগুলোর কি দশা হয়েচে, দেখুন।

সুধীর হাত দেখাইল। নীলিমা দেখিল, আঙুলের আগাগুলা তাহার ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। আহা—বলিয়া নীলিমা তাহার পানে চাহিল, এমন সময় ট্রেণের ঘণ্টা পড়িল। নীলিমা বলিল,—কালকের কথা মনে আছে ত? কলকাতায় গেলে আমাদের ওখানে যেয়ো। বাড়ার নম্বর মনে আছে?

—আছে। বলিয়া সুধীর স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিনয় জিনিষ-পত্র গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। কতক বাঙ্কের উপর ঠাসিয়া দিল, কতক বেঞ্চের নীচে গুঁজিল।

নীলিমা বলিল,—বাসনের থলেটা চাকরদের কামরায় দিলে, না, গার্ডের ব্রেকে?

—সে সব ব্রেকে দিয়েচি।

তারপর সুধীরের হাত ধরিয়া সজোরে সেকহ্যাণ্ড্ করিয়া বিনয় বলিল,—তাহলে নিশ্চয় যাবেন। মনে থাকে যেন, কথা দিয়েছেন।

—নিশ্চয় যাব—বলিয়া সুধীর একটু সরিয়া দাঁড়াইল। আলো-আঁধারের মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিতে সুরু করিল—ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইল। নীলিমা জানলা দিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল, ঐ যে মাটীর পুতুলের মত সুধীর দাঁড়াইয়া আছে! ওদিকে সুধীরের চোখের সামনে হইতে আলো, আলো, সব আলো নিবিয়া গেল। ট্রেণ যেন তাহার হাড়-পাঁজরাগুলাকে মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

৮

তারপর তিন-চার মাস কাটিয়া গেছে। সুধীরের কথা, মিহিজামের কথা নীলিমার মনে অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র রংয়ের একরাশ ফুল লইয়া বিনয় আসিয়া নীলিমাকে ডাকিল—বৌদি—

নীলিমা তখন ঠাকুর-ঘরে ঠাকুরের বৈকালি সাজাইতেছিল। চোখ না তুলিয়াই সে বলিল,—কি ভাই ঠাকুরপো?

বিনয় বলিল,—এই দেখ, কি এনেচি।

নীলিমা ফিরিয়া হাসিয়া বলিল,—কি, ফুল? মিউনিসিপাল মার্কেটে গেছলে বুঝি? কেন এত পয়সা খরচ করে বাবুগিরি করা, বল দিকি? এত ফুল নিয়ে কি করব আমি? এ ফুলে ঠাকুর-পূজোও হবে না।

বিনয় হতাশার অভিনয় করিয়া বলিল,—এইজন্যেই বলে, নারী চির-অকৃতজ্ঞ। কিনে আন্‌বো কেন? এ ফুল দেখেও চিন্‌তে পারছ না? এ যে সেই মিহিজামের নার্শারির ফুল।

মিহিজামের ফুল! নীলিমা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

—হাঁ। সুধীর বাবু এসেচেন এ ফুল নিয়ে। প্রায় দেড় ঘণ্টা আমার সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে তিনি কথা কইচেন। এইবার চলে যাবেন।

—জলখাবার দিয়েচ?

—না।

—দাও গে।

—তুমি দেখা করবে না, একবার তার সঙ্গে?

—পাগল! বলিয়া নীলিমা কেমন অস্বচ্ছন্দভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।—আমি দেখা করব কি! বৌ-মানুষ—

বিনয় জ্বলিয়া গেল। সে বলিল,—বৌ-মানুষ, তা কি হয়েচে? মিহিজামে তাকে নিয়ে একসঙ্গে বেড়ানো, বসা-দাঁড়ানো, গল্প করা,—হাজার হোক্, একটু আলাপ-পরিচয় আছে ত। আর এখানে একেবারে পর্দ্দার বিবি বন্‌লে! কেন, কথা কইতে দোষ কি, শুনি?

লজ্জিত কুণ্ঠিতভাবে নীলিমা বলিল,—সে হল বিদেশ, তাই পথে-ঘাটে বেড়িয়ে বেড়াতুম। এখানে বৌ-মানুষ—কোন সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে অম্‌নি দেখা করব? তা হয় না ভাই! লোকে বলবে কি?

বিনয় রাগিয়া ফিরিবার উপক্রম করিল। ফুলগুলা তুলিয়া লইয়াই সে যাইতে উদ্যত হইল।

নীলিমা বলিল,—জলখাবার আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, চা তৈরী করেও পাঠাচ্ছি। তাকে বসাও গে একটু।

বেশ একটু ঝাঁঝালো সুরেই বিনয় বলিল,—থাক্, আর অত দরদে কাজ নেই। একটু সন্দেশ কি এক পেয়ালা চায়ের কাঙাল হয়ে সে তোমার দোরে আসে নি। বলিয়া বিনয় ফুলগুলা লইয়া চলিয়া গেল।

নীলিমা অপ্রতিভ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দার চিকের পিছনে দাঁড়াইল। সেখান হইতে বিনয়ের ঘর দেখা যায়। ঐ যে বিনয় আর সুধীর। সুধীর উঠিয়া যাইতেছে।

পনেরো মিনিট পরে বিজয় আসিয়া ডাকিল,—নীলি—

নীলিমা আসিয়া বলিল,—কি?

বিজয় বলিল,—ও ছেলেটীর সঙ্গে দেখা করলে না যে!

নীলিমা কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার চোখের সাম্‌নে জাগিয়া উঠিল, সুধীরের সেই উদাস দৃষ্টি,—কেমন ব্যাধের ক্ষুধা যেন তাহাতে জড়ানো থাকিত! আর সেই কবিতা,—সুধীর কাহাকে ভালবাসিয়া সেই সব কবিতা লিখিয়াছে! ক্ষুদ্র একটা সন্দেহ সেইদিন হইতেই নীলিমার বুকে বিঁধিয়াছিল। তারপর সেই কথা,—ফুলের সঙ্গে কাঁটা থাকে! এ-সব কি কথা!—এ কথার মানে?

বিজয় হাসিয়া বলিল,—ওর সঙ্গে কথা কইছিলুম। ছেলেটি ভালো। তুমি ফুল ভালবাস বলে কোথা থেকে তোমার জন্যে এই ফুলের রাশ বয়ে এনেচে, দেখ দিকি। একটু মাথা-পাগলা আর কি! তোমায় রূপ দেখে লভে পড়েচে— নয় কি? বলিয়া সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এ সন্দেহ যে নীলিমার মনেও কাঁটার মত বিঁধিয়া ছিল! কি স্পর্দ্ধা! সে তাহাকে ছোট ভাইটির মতই মনে করিত যে—বিনয়কে যে-চোখে দেখে, ঠিক সেই চোখেই দেখিত ত! আর সে কি না—কি লজ্জা! আর আজ স্বামীও ঐ কথা বলিতেছে! কথাটা কাঁটার মতই তাহার বুকে বিঁধিল। সে অশ্রু-রুদ্ধ স্বরে বলিল,—ছি, ও কি বল্‌চ! ও রকম ঠাট্টা করে কখনো!

বিজয় সস্নেহে নীলিমাকে তুলিয়া বুকের কাছে টানিয়া হাসিয়া বলিল,—তুমি পাগল হলে! এই কথায় কাঁদ্‌চ! ...কিন্তু একবার দেখা করলে না কেন? আহা বেচারা! ও যদি তোমায় দেখে খুসীই হয়—!

নীলিমার দুই চোখে জল ঝরিয়া পড়িল। বিজয় হাসিয়া বলিল,—আমি ত জানি, তোমার ও মনের দোর কি রকম শক্ত আগড়ে বাঁধা, সেখানে মহা-পরাক্রান্ত রাজপুত্রেরও প্রবেশাধিকার নেই!

কাঁদিয়া নীলিমা বলিল,—না, না, ও কথা তুমি অমন করে বলো না গো। নীলিমা বিজয়ের বুকে মুখ গুঁজিল। সে ফোঁপাইতে লাগিল।

বিজয় নীলিমার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিল,—কথা কওয়ায় কোন দোষ ছিল না, নালি। এটা নিষ্ঠুরতা হলো না কি? বেচারী মুখখানি চূণ করে চলে গেল।

একটা ঝঙ্কার দিয়া নীলিমা বলিল—যাক্‌গে!

নীলিমার সেই তাচ্ছিল্যের ফুৎকারে বিশ্বের আলো ক্ষণেকের জন্য ম্লান হইয়া গেল না কি?—কে জানে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কথা-পাখী

মানুষ　যে-সব কথা বলে
　　　　তারাই পাখী কি?
　সকল-সময় তারাই কি দেয় তান?
আমার ত তাই হচ্ছে মনে,—
　　　　ভেবেও দেখিচি,—
সব-　কথার মাঝেই শুন্‌চি পাখীর গান।
　　　কা'র বা সতেজ কণ্ঠ মিঠি
　　　চুম্‌কুড়িতে মার্‌চে শিটি,
আবার　　শিষ্ তুলে কেউ
　　　　দেয় প্রাণে ঢেউ,—
　　　　　জুড়িয়ে দে' যায় কান।

পিঞ্জরে　কেউ কপ্‌চে' পড়ে
　　　　শেখানো-বুলি;
　কোন্‌টি ওড়ে উদার আকাশ-মাঝ;
উধাও　চাতক গাইচে ভালো;
　　　　চেঁচায় পেচকগুলি;
বনে　চীৎকুরি দেয় শীক্‌রে এবং বাজ।
　　　কোথাও কোকিল কুহু-গানে
　　　নন্দনেরি নিকট আনে,—
সখি!　　মধুর সুরে
　　　　স্বপন-পুরে
　　　　　টান্‌চ যেমন প্রাণ!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

ত্রয়ী

(মাতা জায়া ও কন্যা)

মেয়েরা যে তাহাদের শ্বশুরবাড়ী (অর্থাৎ স্বামীগৃহ) গিয়া কষ্ট পাইবে, ইহা আমাদের দেশে স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যখন তাহারা সেখানে গিয়া আপনাদের নবীন জীবন আরম্ভ করে, তখন সকলে তাহাই যেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ঠিক বলিয়া মনে করেন, তাহার বিপরীত হইতে দেখিলে সকলে সুখী হন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা যেন একটা অভাবনীয় সৌভাগ্য ও আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়াই ধরা হয়। সেখানে তাহারা ঘোমটায় জড়সড় হইয়া সর্ব্বদা আতঙ্কিত অপরাধীর মত থাকে, এমন কি তাহাদের পিতামাতারাও আপনাদিগকে সেইভাবে দেখিয়া থাকেন। ইহাতে মেয়ের জন্মই যে একটা অপরাধ বলিয়া মনে করা হয়, তাহাই চোখে পড়িয়া যায়। তবে অনেকেই অবশ্য চিন্তা করিয়া কিছু করেন না, উত্তরাধিকার-সূত্রে যে সকল সংস্কার পাইয়া থাকেন, তাহা দ্বারা চালিত হইয়াই দিন কাটাইয়া দেন। এ দিকে আবার মেয়ের দুঃখে ইঁহারাই দয়া প্রকাশ ও আপনার ক্ষেত্রে হইলে হাহাকারও করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও পুত্রকে "স্বকা তনুঃ" বলিয়া মেয়ের বেলায় দুহিতা "কৃপণম্ পরম্" মাত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু দুহিতার ঐ কৃপণাবস্থা দূর করিতে গেলে সকলেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন। ইহাতে আমাদের দেশে বাপ-মায়েরা মেয়েদের বিবাহের পরেও সর্ব্বদা যেরূপ সাহায্য ও স্নেহ প্রকাশ করেন, তাহার সহিত য়ুরোপীয়দের তুলনা করিয়া অনেকে যে আমাদের মেয়ের প্রতি ভালবাসার আধিক্যের কথা বলেন, তাহার মূল ধরা পড়ে। সমাজ তাহাদের "কৃপণম্ পরম্" করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই বাপ-মায়ের চিরদিনই তাহাদের টানিতে হয়। স্বামীর গৃহে তাহার অবস্থাটাও ইহাতে ভালরূপে ধরা পড়ে। বাস্তবিক স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধই স্ত্রী-পুরুষের প্রধান সমান সম্পর্ক; সেই ক্ষেত্রে যদি সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে মেয়েদের সম্বন্ধে ন্যায়-বিচারের ত কোন অর্থই থাকে না। মেয়েদের বিষয়ে কিছু বলিতে গেলেই আমাদের দেশে মাতার সম্মানের কথা সগৌরবে জাহির করিয়া মুখবন্ধ করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সত্য ঢাকা পড়িবার নহে। মাতা পুত্রের সম্বন্ধ সমান নহে, সেখানে পুত্র ত তাঁহাকে মানিয়া চলিবেই, তাহাতে অত ঘটা করিয়া দেখাইবার কিছু নাই। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা, সমান দাবী ও অধিকার দিতেই প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাহা চাপা দিয়া মাতার সম্মানের কোন মূল্য নাই।

তার পর ভাল করিয়া দেখিতে গেলে তাহার মধ্যেও অনেক গলদ সহজেই বাহির হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ মাতার গৌরব, তিনি পুরুষের জন্মদান করেন বলিয়া—এই একটী ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর কাছে ঠেকিতে হইয়াছে—যাহা সে কিছুতেই কাড়িয়া লইতে পারে না। কাজেই ইহার কিছু সম্মান তাহাকে সংস্কার-বশেই দিতে হয়। জন্মদান ব্যতীত শৈশবে মাতার কাছে বহুদিনের একান্ত অসহায় অবস্থার স্মৃতিও এক কালে লোপ পাইবার নহে। কিন্তু ইহাকেও কি যতটা-সম্ভব সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত করিয়া রাখা হয় নাই? মাতার সম্মান প্রধানতঃ স্ত্রীর সম্বন্ধের হীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্মানের নামে স্ত্রীর প্রতি যে নিগ্রহ প্রচলিত ছিল এবং অধিকাংশ স্থলেই এখনও আছে, তাহাকে ঐ নাম দিতেই কুণ্ঠা জন্মে। মাতা সঙ্কীর্ণ-হৃদয় ও অশিক্ষিত হইলে বধূর প্রতি তাঁহার একপ্রকার ঈর্ষা থাকে, তাহাতে আমাদের সমাজে তাহাকে যেরূপ অসহায় করিয়া তাঁহার চরণেই সমর্পণ করা হয়, তাহাতে অধিকাংশ মাতাই মাথা ঠিক রাখিতে পারেন না। যে যত কষ্ট সহ্য করে, সেই যে অনেক স্থলেই তত অত্যাচারী হইয়া উঠে, ইহাও জানা কথা। সুতরাং আপনার বধূজীবনের দুঃখের শোধ তিনি স্বভাবতঃই পুত্রবধূর

উপর দিয়া মিটাইয়া থাকেন! বাস্তবিক আমাদের দেশের বধূর (অর্থাৎ স্ত্রীর) যেরূপ নিরুপায় অবস্থা, তাহাতে তাহার উপর অত্যাচারের প্রলোভন সম্বরণ করা কঠিন। তাহার উপর অধিকাংশ মাতারই তাহার প্রতি ভিতরের ঈর্ষার ভাব ভিন্ন প্রকৃত ভালবাসা থাকে না। বধূর প্রতি যা-কিছু সদ্ভাব, তাহা ছেলের জন্য মাত্র। কিন্তু জামাইয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের শুভাশুভ তাহার উপরই নির্ভর করে বলিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর তাহার সম্বন্ধে যে প্রকৃত হিত-কামনা থাকে, বধূ একান্ত সুলভ সামগ্রী বলিয়া তাহা হইতে পায় না।

একটী প্রথা আছে, ছেলে বিবাহ করিতে যাওয়ার সময় ছেলেকে বলিতে হয়, "মা, তোমার জন্য দাসী আনিতে যাইতেছি।" ইহাতে অনেকে আমাদের মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গদগদ হইয়া পড়েন। বাস্তবিক মানুষের মনের সকল রকম দুর্ব্বলতার খোরাক যোগাইয়া, এমন কি সদ্বৃত্তির সুযোগ লইয়াও "divide and rule" নীতিতে আমাদের সামাজিক প্রথাগুলি মেয়েদের দমন করিবার পক্ষে এতটা যে কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহার কৌশল দেখিলে অবাক হইতে হয় বটে! প্রথমে মাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার সাহায্যেই স্ত্রীর দমন, তার পর স্ত্রী বয়স্কা হইলে আবার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইলে তাহাকে সহধর্ম্মিণীর সম্মানের প্রলোভন দেখাইয়া ব্যাপারটিকে সহজ করা,—স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী শোকে অধীর হইয়া যখন প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তখন সেই অবসরে সতীদাহে যথার্থই তাঁহার প্রাণ লইবার আয়োজন, তাহার অভাবে চিরজীবনের মত জীবন্ত শবদেহ ধারণের ব্যবস্থা — সব তাতেই বুদ্ধি-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে সন্দেহ নাই!

এদিকে যে কথায়-কথায় মাতার সম্মানের নজীর দেখান হয় প্রকৃতপক্ষে তাহা কত দূর সত্য? স্ত্রীর সম্মান না থাকিলে মাতার সম্মান হইতেই পারে না। কারণ স্ত্রী না হইয়া কেহ মা হইতে পারেন না। স্ত্রী যখন সন্তানের জননী হইতে থাকেন, তখন তাহাদের উপর তাঁহার কতটুকু হাত থাকে? প্রথমতঃ তাঁহাকে তখনও বালিকা এবং অশিক্ষিতা রাখায় তাঁহার কর্ত্তব্যের দায়িত্ব-গ্রহণের মত অবস্থাই থাকে না, তার পর তখনও তিনি বধূ থাকায় সন্তানদের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই নিজ ইচ্ছামত করিতে পারেন না। বাড়ীতে মার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া ছেলে-মেয়েরাও অনেক সময়েই তাঁহাকে সম্মান করিতে শেখে না। এমন কি, অনেক স্থলে "মা"র মত সম্মানের ডাক বধূর প্রতি প্রয়োগ করাও অনেক শাশুড়ী ভিতরে ভিতরে সহিতে পারেন না, ও কৌশলে শিশুদের নিজ-মাতাকে "বউ" বলিতে শেখান হয়। বাস্তবিক স্ত্রীর সম্মান না থাকিলে কোন্‌খানে তাহাকে "স্ত্রী" বলিয়া দমন এবং কোন্‌খানে বা তাহাকে "মা" বলিয়া সম্মান করিতে হইবে, তাহার সীমারেখা টানা সহজ নহে। যদি কাহারও বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সধবা থাকার সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলে ত তিনি চিরজীবনই "স্ত্রী" থাকিয়া থাকিবেন, মাতৃত্বের দুর্লভ সম্মান-লাভ তাঁহার কখন্ ঘটিবার সুযোগ হইবে? ঐ সময়ে উপযুক্ত পুত্রের সংসারে গিয়া কখন কখন তাঁহার তাহা লাভ ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু স্বামীকে ছাড়িয়া তিনি তাহা করিতে পারেন না, স্বামীরও জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান থাকিলে সহজে তিনি গলগ্রহ হইতে চাহিবেন না, ও তাহা যে কোন পক্ষেই সুখকর হইবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িল। যত ভাল জিনিষই হউক অন্যায়ভাবে বাড়াইয়া তুলিলে তাহার গৌরব নষ্ট হয়। গুরুজনের প্রতি ভক্তির যে রকম দাবী আমাদের সমাজে গড়িয়া তোলা হইয়াছে, তাহাতে আজকালকার লোকের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের দাবী বজায় রাখিয়া তাহা মেটানো সম্ভব নহে। কাজেই এখনকার লোকে একটু সুবিধা পাইলেই তাহা হইতে পলায়নের চেষ্টা করে। তাহাতে তাহারা গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান নহে বলিয়া গালি দেওয়া হয়, কিন্তু প্রকৃত কারণ কেহ তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করেন না। বাস্তবিক "আমনোবর্ত্ম নঃ পরম্" সকল বিষয়ে "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" করিতে করিতে সংস্কারমুক্ত হইয়া সত্যের সম্মুখীন হইতে আমাদের যে অসামর্থ্য ঘটিয়াছে, তাহার পরিমাণ দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। পূর্ব্বেই যে স্ত্রীর ব্যয়ে মাতার সম্মানের কথা বলা হইয়াছে,

তাহা দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, ঐ ব্যবস্থা ও সংস্কার থাকিতে স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি কর্ত্তব্য যাঁহারা করিতে চাহেন, তাঁহাদের কেন মাতার সহিত থাকা সম্ভব নহে। মার সহিত থাকার ব্যবস্থাই যখন এত কঠিন, তখন পিতার সম্বন্ধে তাহার দাবী যে আরও কি বিষম গুরুতর, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। বাস্তবিক গুরুজনের প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে এইরূপ অসম, মধ্যযুগোচিত ব্যবস্থা থাকিতে তাঁহাদের যাহা পাওয়া উচিত, তাঁহারা যে তাহাও হারাইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। পুত্র যতদিন মা, বাপের ছেলে থাকিয়া ঘনিষ্ঠরূপে তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে, ও যখন তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপদেশ তাহার অবশ্য-প্রয়োজনীয়, তখন তাঁহারা অন্যের (পিতার পিতা-মাতার) অধীন থাকিয়া তাহাদের প্রতি ঐ সকল কর্ত্তব্য ঠিকমত করিতে অশক্ত হইবেন। আর সে যখন নিজে স্বামী ও পিতা হইবে, তখন তাহার সে সকল কর্ত্তব্যে বাধা জন্মাইয়া তাঁহারা পিতৃমাতৃ-ভক্তির দাবী করিবেন, ইহা কেমন করিয়া চলিতে পারে, বোঝা কঠিন। মার অধিকারের সময় ঠাকুরমার দাবী—এবং স্ত্রীর অধিকারের সময় মার দাবী—এরূপ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা আজকালকার দিনে হাস্যকর মাত্র। তবে পুত্র উপযুক্ত হইয়া স্বামী ও পিতার কর্ত্তব্য পালন করিলেই যে তাহার আপন পিতামাতাকে অবহেলা ও তাঁহাদের বৃদ্ধবয়সে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইতে হইবে এমন নহে। যাহা যথার্থ ভাল জিনিষ,—সুতরাং করণীয়, আদর্শের পরিবর্ত্তনেই তাহার কর্ত্তব্যতা যাইতে পারে না। আমাদের দেশে পুত্রের অন্য কর্ত্তব্যের বাধা জন্মাইয়া পিতা-মাতার অন্যায় বাধ্যতার দাবীর বিরুদ্ধেই বলা হইতেছে মাত্র। তবে পিতামাতার কর্ত্তব্যই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থত্যাগের দাবী করে, তাঁহারা স্বভাবতঃই পুত্রের নিকট হইতে কোনরূপ প্রতিদানের আশা না রাখিয়াই আপনাদের কর্ত্তব্য করিয়া যাইবেন। তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত, পুত্র ও পুত্রবধূর সংসারে অতিথি-ভাবে মধ্যে মধ্যে গিয়া আমোদ, আহ্লাদ ব্যতীত নিতান্ত নিরুপায় না হইলে বরাবর না থাকাই ভাল। পিতার অভাবে মারও ঐ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা উচিত। তিনিও আপনি স্বতন্ত্র থাকিয়া এক এক সময়ে এক-একটী ছেলে মেয়ে ও নাতি নাতনিদের আপনার কাছে লইয়া গিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবেন ও সময়ে সময়ে এক একটী ছেলে মেয়ের কাছে গিয়া কিছুদিন করিয়া থাকিয়া আসিবেন। এই বিষয়ে তাহার "স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রাখিতে পারিলেই মার অনেক অধিক সম্মান লাভ ঘটিবে, অথচ তাহাতে কাহারও ন্যায়সঙ্গত আত্মপ্রসারে বাধা জন্মিবে না। এই বিষয়ে পিতার সম্পত্তি তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্রের হাতে না গিয়া মাতার-হাতে থাকিলেই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এই সম্মানলাভ ঘটিতে পারে। পিতা কিছু রাখিয়া যাইতে না পারিলে বা তাহা পর্য্যাপ্ত না হইলে পুত্রদেরও সকলে মিলিয়া সাহায্য করিয়া মার এই স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান বজায় রাখিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এখনকার মাতৃভক্তি এইদিকে পরিচালিত হওয়া উচিত। তাহাতে মাতা ও স্ত্রী উভয়েরই যথার্থ সম্মান-লাভের সুযোগ ঘটিবে। মেয়ের বিবাহও তাহা হইলে এতটা বিভীষিকা ও দুঃখময় হইবে না। স্ত্রীর যন্ত্রণা-লাঘবের সহিত মেয়ের বিবাহের পরের দুঃখও কমিয়া দুহিতা কেবল "কৃপণম্ পরম্" হইয়া থাকিবেন না। মাতার অত্যাচার নিবারিত হইলেই যে স্ত্রীর সকল দুঃখ দূর হইবে, এমন নহে। তবে স্ত্রী যেমন আপন পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করিয়া আসেন, স্বামীরও যে তাঁহার জন্য (অন্ততঃ কতকটা) তাহা করিয়া তাঁহাকে নূতন গৃহের কর্ত্রীত্ব দান করা কর্ত্তব্য, সেই প্রথম সর্ত্তমাত্র ইহা দ্বারা পালিত হইতে পারে।

দুহিতাও কেবল স্বামীর গৃহে কষ্ট ও অন্যায় ব্যবহারের জন্যই যে "কৃপণম্ পরম্" হইয়া থাকেন, তাহা নহে। তাঁহাকেও উপরে যেমন ভালবাসার আতিশয্য দেখান হয়, এদিকে উত্তাধিকার-ক্ষেত্রে তেমনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া স্বামীর গৃহে তাঁহার লাঞ্ছনার পথও সহজ করিয়া রাখা হইয়াছে! তাহার প্রতিকার না হইলেও তাঁহার দুর্দ্দশা ঘটিবার নহে। এই সকল কথা বলিতে গেলে অনেকে বলিয়া থাকেন, তবে আমাদের দেশে কি কন্যা ও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা অন্য দেশ অপেক্ষা কম?

ইহার উত্তরে বলিতে হয়, ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য তাহা নহে। কিন্তু সংহত পুরুষ-মনের মেয়েদের সম্বন্ধে যে সকল ঈর্ষা ও সঙ্কীর্ণতামূলক অন্যায় বিধি-ব্যবস্থা সকল দেশেই কম-বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশে তাহার কঠোরতাও যেমন উগ্র, আবার তাহার সহিত ধর্ম্মের আবরণ যুক্ত হইয়া তাহা তেমনি শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। ইহাতে আমাদের দেশের মেয়েদের সাধারণ অবস্থা বাহিরের কতকগুলি চাকচিক্য সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা অনেকাংশেই হীনতর করিয়া রাখিয়াছে, সন্দেহ নাই। তাঁহারা বহুকাল হইতে যে সকল অধিকার বিনা প্রশ্নেই উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, আমাদের সেগুলির জন্যও কাঁদুনি গাহিতে হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সর্ব্বাগ্রে পর্দ্দার নাম করা যাইতে পারে।

ইহার সহিত এ কথাও বলা উচিত, পাশ্চাত্য দেশের সকল বিধি-ব্যবস্থা—বিশেষতঃ সাধারণ মানুষের মন যখন আমাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট বা উন্নততর নহে, তখন আমাদের দেশের অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত ও ইংরাজী-ভাবাপন্ন লোকের মধ্যে যে মেয়েদের সম্বন্ধে কতকগুলি বিলাতী কুসংস্কার নূতন করিয়া দেখা দিতেছে, তাহাও নিতান্তই দুঃখের বিষয়। মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখা ও তাঁহাদের একপ্রকার পুতুল করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিলাতী কোন ভাব আমাদের দেশে পৌঁছিতে অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর লাগে, সুতরাং আমাদের শিক্ষিতেরা এখন বিলাতের ভিক্টোরিয়া যুগের অনুকরণ করিতেছেন। কিন্তু আজকাল মেয়েরা কতকগুলি সত্য অধিকার লাভ করায় সেখানে মেয়েদের সম্বন্ধে সাধারণ পুরুষ-মনের যে সকল নীচতা আবরণমুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও অবশ্য কোন অংশেই অনুকরণ-যোগ্য নহে। য়ুরোপীয় আদর্শে কিছু করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা ও যত্নের সহিত সে দেশের শ্রেষ্ঠ নর-নারীদের পূর্ব্ব ও আধুনিক সকল অভিমত ভালরূপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

বঙ্গনারী।

প্রত্যাবর্ত্তন

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভুল ভাঙ্গা

নিঃশঙ্ক পথিক চলিতে চলিতে সহসা পথ হারাইয়া একটা প্রকাণ্ড খাদের ধারে আসিয়া পড়িলে যেমন ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে, জলদও তেমনি ভাবে সুনীতির কাছে কিরণের লেখা চিঠিখানির পানে চাহিয়া রহিল। এই চিঠিখানির জন্য যে সে সপ্তাহ-কাল কাতর আগ্রহে কম্পিত বক্ষে পথ চাহিয়া বসিয়াছিল—সে কথা এখন আর যেন তাহার মনেই রহিল না। এই ত সেই প্রার্থিত উত্তর! সেই পরিচিত হাতের সুছাঁদের অক্ষরগুলি! তবু অধিকারী-ভেদে এ যেন অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল! কিরণ তাহার অভিযোগের উত্তর তাহাকে ত দেয়ই নাই—সে আবার উত্তর দিয়াছে সুনীতিকে। বামাল-শুদ্ধ আসামী যদি ধরা পড়িয়া যায়, তাহার অবস্থাও বোধ হয় এমনি শোচনীয় হইয়া উঠে। সুনীতি খোলা চিঠিখানা প্রসারিত অবস্থাতেই টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল, "তোমার কিরণের চিঠি।"

চোখ মেলিলেই চিঠিখানি দেখা যায়। জলদ প্রথম দৃষ্টিপাতেই দেখিতে পাইল, সম্বোধনে পূজনীয়া সুনীতি দিদি লেখা। চিঠিখানি কিরণের হাতেরই লেখা বটে। জলদ যে কিরণকে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা সুনীতি তবে জানিয়াছে? আজ আর এ জানায় যে সে ভ্রূক্ষেপও করে না—সে কথা কিন্তু মনে করিতে পারিল না। বরং একটা কুণ্ঠিত অপরাধের ভাবেই তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। জোর করিয়া মুখে একটু হাসি আনিয়া মনের অপ্রতিভ ভাবটাকে জোর

করিয়া তাড়াইয়া দিবার জন্যই যেন সে বলিল, "তুমি যে কিরণের চিঠি পেয়েচ, দেখ্‌চি। বাঃ!" কথাটা সে সাধারণ-ভাবেই বলিতে গেল, কিন্তু উচ্চারণে কণ্ঠস্বর বেসুরা বাজিল।

সুনীতি একটি কথাও না বলিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে জানিত, স্বামীর হাতে এইমাত্র সে যাহা দিয়া আসিল, তাহাতে আর যাহাই থাক, আনন্দ বা সান্ত্বনা ছিল না। নিজের দুঃখে ব্যথিত হইলেও স্বামীর দুঃখও যে সে সহিতে পারিত না! এমন দুর্ব্বল মন লইয়াই সে জন্মিয়াছিল!

চিঠিখানায় বেশী কথা কিছু লেখা ছিল না। কিরণ লিখিয়াছে, "জলদবাবুর পত্রে বুঝিলাম, তাঁহাকে না জানাইয়া এখানে আসা আমার অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার নিকট অনুমতি লওয়া যে আমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। আপনার স্বামীকে বলিবেন, তিনি যেন ক্ষমা করেন। দাদামহাশয় বেশ ভালই আছেন। তাঁহার নিকট পড়াশুনার খুব সুযোগ পাইতেছি। জায়গাটিও ভারী সুন্দর। আমার ইচ্ছা, অনেক দিনই এখানে থাকি।" উপসংহারে কাহারও কুশল যাচ্ঞা করিয়া পত্রের একটা উত্তরও সে প্রার্থনা করে নাই। "প্রণতা কিরণ" বলিয়া নাম সহি করিয়াছে।

চিঠিখানা সুনীতির নামে, তবু এ কাহাকে লেখা, দৃষ্টি-মাত্রেই জলদ তাহা বুঝিল। সম্পূর্ণ বাহুল্য-বর্জ্জিত উত্তর। ইহাকে রূঢ় বলা চলিতে পারে—কিন্তু মিথ্যার অপবাদ দেওয়া যায় না। জলদের ব্যথিত অন্তর বলিতে চাহিতেছিল, এমন অপ্রিয় সত্য না বলিয়া একটু মিথ্যা বলিলেই বা ক্ষতি কি হইত? এতদিন ত এই মিথ্যা খেলাতেই তাহারা ভুলিয়াছিল। জলদের যে সেখানে কিছুই পাইবার বা চাহিবার ছিল না, সে কথা সেও ত কোনদিন কোন ব্যবহারে তাহাকে বুঝিতে দেয় নাই। কর্ত্তব্যজ্ঞান যদি তাহার এতই প্রখর, তবে তাহা দুদিন আগে প্রয়োগ করিলেও ত চলিত। তা হইলে সেও তাহার কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটিতে দিয়া চিরদিনের শান্তি-সুখ হারাইয়া বসিত না। অভিমান তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিলেও, তাহার বিচার-বুদ্ধি বলিতেছিল, কিরণ ভালই করিয়াছে। এই তাহার উচিত প্রাপ্য! সত্যই সে তাহার অধিকারের বাহিরে পা বাড়াইয়াছিল। কিরণের উপর তাহার লোকতঃ ধর্ম্মতঃ কোন দাবীই ত ছিল না। তবে এমন প্রবলরূপে সে কেন তাহাকে ভালবাসিতে গিয়াছিল? শুধু বন্ধুত্ব? সত্যই কি তাই—? তাহার ত বন্ধু-বান্ধবের অভাব নাই। কৈ, এমন আকর্ষণ ত সে কাহারো উপর কোনদিন অনুভব করে নাই। তবে এ কি! রূপের মোহ? এ কথা মনে করিতে সে নিজের কাছেও যেন লজ্জিত হইল। সে স্বাধ্বী স্ত্রীর স্বামী—সন্তানের পিতা। নিজেও কখনো চরিত্রে কোন দুর্ব্বলতা পোষণ করে নাই। কিরণের সহিত বন্ধুত্ব যে ক্রমে তাহাকে মোহাবিষ্ট করিতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। পারিলে হয়ত কখনই সে এ ব্যবহারে অগ্রসর হইত না। সে স্থির করিল, যে ভুল করিয়াছে, তাহা পুরুষের মতই এবার সংশোধন করিবে। যে অগ্নি নিভাইতেই হইবে, তাহাতে ইন্ধন যোগাইবার প্রয়োজন কি! কিরণের সকল সংস্রব সব চিন্তা ত্যাগ করিয়াই তাহার প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সে আজ উদ্যত হইল।

জলদ ভাবিয়া দেখিল, কিরণের প্রতি অজ্ঞাতে সে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে। তাহার কুমারী-হৃদয়ে না বুঝিয়া সে হয় ত অনুরাগের বীজ বপন করিয়া বসিয়াছে! অত্যন্ত অকস্মাৎ জাগ্রত মনের এ লজ্জাকর সমস্যার মীমাংসা করিতে তাহার সাহস হইল না। তবে এটুকু সে বুঝিল যে কিরণের সহসা এমন নূতন ব্যবহারের নিশ্চয় কোন অর্থ আছে। হয়ত অমনি একটা কিছু আভাষে শুনিয়া বা বুঝিয়া সে তাহার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিয়া লইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে হয়ত এমন কোন কথা উঠিয়াছিল, যাহা ওঠা উচিত ছিল না। কিরণকে এমন কঠোরতার মধ্যে ফেলিবার উপলক্ষ্য হওয়ায় সে নিজেকে দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিল। কিন্তু অনুশোচনা ছাড়া অতীতের জন্য কিছুই আর তাহার করিবার নাই! দ্বিতীয়বার পত্র লিখিবার কথা সে মনেও ঠাঁই দিল না।

সে বুঝিয়াছে, কিরণ তাহার সহিত সকল সম্বন্ধই ত্যাগ করিয়াছে।

সারাদিন এই একই চিন্তায় জলদের মনটা বিব্রত রহিল। কখনো কিরণের তাচ্ছিল্য-অনুভবে বেদনা, কখনো বা নিজের চিত্তের দুর্ব্বলতায় ক্রোধ জন্মিতেছিল। অথচ এ কথা আলোচনা করিবার উপায় ছিল না। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সুনীতিকে সে তাহার মনের সব কথা খুলিয়া বলে; বলিয়া মনের এ পাষাণ-ভার লঘু করিয়া লয়। সে ক্ষমাময়ী, এখনি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে। কিন্তু সে ক্ষমা করিতে পারিলেও জলদ তাহা চাহিবে কেমন করিয়া? কেমন করিয়া সে তাহাকে বলিবে, কিরণের রূপে মজিয়া তাহাকে আমি ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলাম গো! এখন ভুল বুঝিয়াছি, অতঃপর এমন ভুল আর করিব না! এ কথা তাহার মনের কথা হইলেও যাহাকে জানাইবে, জলদের নিজের মুখে এ কথা শুনিলে সে কি শিহরিয়া উঠিবে না? সে কি মনে করিবে না, ধরা পড়িয়া গিয়াছি,—সে এখন হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাই এ সন্ধির প্রস্তাব? ছি! কাল ত এ ধর্ম্ম-বুদ্ধি দেখা দেয় নাই। তবে? সে ভাবিল, কার্য্যের দ্বারাই সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

প্রতিদিন যদি কাহাকেও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিত্য দেখাটাই আমাদের অভ্যাসে দাঁড়ায়। দৈবাৎ কোনদিন যদি ঐ মানুষটিকে দেখিতে না পাই, কোন বিশেষ কারণ না থাকিলেও দৃষ্টি অজ্ঞাতসারে যেন সেই নিত্য-দৃষ্ট স্থানটিতেই ঘুরিয়া বেড়ায়। অভ্যাস মনে মনে কেবলি যেন তাহাকে খুঁজিতে থাকে। কেন সে আসিল না? না জানি, তাহার কি হইল! এমনি একটা অকারণ ব্যাকুলতা মনের মাঝে ঘুরিতে থাকে। জলদের মনে হয়ত এমনি একটা অভ্যাসের ভাব জন্মিয়া গিয়াছিল, যাহার অস্ফুট ব্যগ্রতা রহিয়া রহিয়া কিরণের সংবাদ লইবার আশায় সে বাড়ীখানার পানে তাহাকে ফিরাইয়া দিত। কিন্তু মনের সে আবদার সে রক্ষা করিত না। জানিয়া ভুলের পথে যে সে আর চলিবে না, ইহা নিশ্চিত। ক্রমে অনভ্যাসে কিরণের চিন্তা তাহার মনে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। দিনান্তে হয়ত সব দিন আর মনেও পড়িত না। এখন সে ক্লাবে অনেকের সহিত পরিচিত হইয়াছে। কেহ কেহ তাহার বন্ধুও হইয়াছে। অতীতকে সে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকখানি অস্পষ্ট করিয়া আনিতে পারিল।

এমন সময়ে সে অরুণের একখানি চিঠি পাইল। পত্রে অরুণ প্রফুল্লদার সংবাদ জানিতে চাহিয়াছে। সে নিজে তাহার কোন সংবাদই পায় না, জলদ যদি জানে, তবে যেন আবলম্বে জানায়। চিঠিখানা পড়িয়া জলদ মনে মনে লজ্জিত হইল। এখানে আসিয়া অভিনব বন্ধু-লাভে সে যে তাহার বহুদিনের বন্ধুদের ভুলিয়াছিল, সে কথা সে মনের কাছেও অস্বীকার করিতে পারিল না। রমণী-রূপ-মোহের এই বিচিত্রতায় সে বিস্মিত হইল। উত্তরে সে অরুণকে জানাইল, প্রফুল্লর সংবাদ সেও কিছু জানেনা। অরুণ তাহার সংবাদ পাইলে যেন তাহাকে জানায়।

সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা জলদের স্বভাব। দুঃখ বিষাদকে গভীরভাবে সে কখনও গ্রহণ করিতে পারিত না। কিরণের আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়াই সে মুগ্ধ হইয়াছিল। হতাশ প্রেমিকের অনুকরণে দুঃখকে বিষাদের ভাবে বুকে পুষিয়া লালন করা তাহার স্বভাবে সম্ভব হইল না। আত্মজ্ঞানীর ন্যায় নিজের দিককার ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া মনকে ধিক্কার দিয়া সে কিরণের চিন্তা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হিমানী-সান্নিধ্যে

আলোকনাথের অযাচিত প্রস্তাবে মুক্তা ঠাকুরাণীর মনে মনে পূর্ণ সম্মতি থাকিলেও মুখে স্পষ্ট একটা উত্তর তিনি দিতে পারেন নাই। মেয়ের মাকে না জানাইয়া তিনি ত আর এত বড় একটা দায়িত্বের ভার ঘাড়ে লইতে পারেন না। ইহাই তাঁহার উত্তর।

তা স্পষ্ট করিয়া মুখে তিনি যাই বলুন, বাড়ীর লোকেরা সকলেই জানিয়া ছিল, এ বিবাহ হইবেই। এ সময় প্রফুল্ল বাড়ী আসার আলোচনা একটু মন্দা পড়িয়াছিল মাত্র।

হাঁক-ডাক থামিয়া কানাকানি চলিতেছিল। উপযুক্ত পৌত্রের বিবাহ না দিয়া, বধু-বর্ত্তমানে ছেলের দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন গৃহিণার মনেও যেন একটু বিসদৃশ ঠেকিতেছিল, তা ছাড়া নাতির মতি-গতির খবরও তাঁহার কিছু জানা ছিল। লোকে যাহাকে বলিবে ন্যায়, উহার চোখে তাহাই হইবে অন্যায়! লোকে যদি চলে সোজা রাস্তা দিয়া ত সে হাঁটিবে উল্টা পথে—এমনি সে অবাক-করা ছেলে। তাই গৃহিণীর কড়া হুকুমে নূতন আলোচনা আর মুখে মুখে তেমন ফিরিতে পারিতেছিল না।

ইহাতে হিমু একটু আশ্বস্ত হইলেও, অন্য পাঁচজনের অস্বস্তির সীমা ছিল না। স্বয়ং আলোকনাথও এ অস্বস্তির হাত এড়াইতে পারে নাই। যে-ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভুলাইয়া দুইদিন কাছে রাখিতে পারিলে তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না; সেই এখন যেন তাহার সুখের পথে কণ্টক হইয়াছে! হিমানীর তল্লাসে দ্বিতলের কক্ষে দৈবাৎ আসিয়া পড়ার-ছলে একবার ঘুরিয়া যাওয়াও আর চলে না। তাহার জন্য কোন নূতন উপহার পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে আর সাহস হয় না। তবু সে সোনার অঙ্গে সোনা কেমন মানায় দেখিবার ইচ্ছায় যে নূতন চুড়ি জোড়াটি কলিকাতা হইতে অনেক মূল্যে ক্রয় হইয়া আসিয়াছে, সেগুলি নিজে হাতে করিয়া তাহার হাতে দিবার সাধটুকুও আপাততঃ চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে।

মেয়েটাও আবার এমন বেয়াড়া যে বিবাহের কথা হওয়া পর্য্যন্ত সাম্নে ত আর আসেই না, বরং ডুমুর ফুলের ন্যায় একেবারেই অদৃশ্য হইয়া থাকে! সেদিন বুক-ভরা সাধ লইয়া নিজের হাতে তোলা ফুলের রাশি উপহার দিয়া যে প্রতিদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা কোন প্রেমিকের চিত্তেই আনন্দ দিতে পারে না।

আলোকনাথ ভাবিয়া পায় না যে, ও মনে করে কি? তাহার সহিত বিবাহে যে উহার চতুর্দ্দশ পুরুষ কৃতার্থ হইবে, এ কি ও বোঝে না? এতই বোকা! রূপের গর্ব্বে মনে করে, বোধ হয় কোন যুবরাজই বা উহার সঙ্গে মালা বদল করিতে চাহিবে! তা গর্ব্ব করিবার রূপ বটে! সে কথা আলোকনাথ অস্বীকার করে না। তবে কিনা সংসারটা ভিন্ন রুচিতে তৈয়ারী। সুধু রূপের ত এখানে আদর নাই। সঙ্গে চাই রূপচাঁদ। নহিলে এমন রূপের ডালি মেয়েরও আবার বিবাহ হয় না? আর বিবাহ হইবেই বা কেমন করিয়া? বিধাতা যে নির্জ্জনে গড়া তাঁহার এই মানস-প্রতিমাকে ভাগ্যবান্ আলোকনাথের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন! নহিলে এই কয়দিনের দেখা-শুনাতেই এমন করিয়া সে তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিবে কেন? আর এ অতর্কিত দেখা-শুনার সংযোগও কি সেই অদৃশ্য মিলন-কর্ত্তারই ইঙ্গিত নয়? নহিলে কোথায় কোন্ অজানা কুটীরে দরিদ্র-গৃহে এ মহামূল্য মণি খনিগর্ভে লুক্কায়িত রত্নের মত লুকানো থাকিত, আলোকনাথ তাহার বার্ত্তাও জানিতে পারিত না।

মুক্তা ঠাকুরাণী বলেন, মেয়েটি অত্যন্ত আদরে একটু বেয়াড়া হইয়া গিয়াছে। তা হউক, আলোকনাথ ভালবাসার বশীকরণ-মন্ত্র দিয়া উহার চঞ্চল মনকে একদিন যে বাঁধিয়া ফেলিবে, এ ভরসা তাহার বিলক্ষণ আছে। এখন ভালয় ভালয় শুভ কর্ম্মটি সম্পন্ন হইয়া গেলেই হয়। অনেক সময় প্রফুল্ল কোথায়, সে কি করিতেছে, এ খবরও সে লয়। মেয়েটার চাঁদ-পানা মুখ দেখিয়া ছেলে না আবার ভুলিয়া যায়! হায়রে, স্বার্থপর স্নেহ মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করে।

কার্য্যের অভাবে হিমুকেও এখন অনেক সময় তাহার নির্দ্দিষ্ট শয়ন কক্ষটিতেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সে যখন এ বাড়ীতে আসে, পড়িবার জন্য সে একখানি "সদালাপ, তৃতীয় ভাগ" সঙ্গে আনিয়াছিল। বইখানি অরুণ দিয়াছিল। সে বইখানিও সে লাইব্রেরী-ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছে। পাছে প্রফুল্লর সঙ্গে দেখা হইয়া যায়, এই ভয়ে সেখানি আর আনা হয় না।

সকালবেলা খোলা জানলা দিয়া রোদ আসিয়া হিমুর মুখে মাথায় পড়িয়া ছিল। জানলার ধারে বসিয়া হিমু বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। বাহিরে অদূরে খিড়কীর পুকুর। দাসীরা কেহ বাসন মাজিতে, কেহ কাপড় কাচিতে, কেহ বা চাউল ও শাক ধুইতে আসিয়াছে। হাতে কাজ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মুখে গল্পও চলিতেছিল। কেহ মনিবের,

কেহ রাঁধুনীর, কেহ বা অপর চাকরাণীর নিন্দা করিয়া সকালবেলাকার সভাটিকে বেশ সরস করিয়া তুলিয়াছিল। তীরস্থিত সজিনা গাছের পাতা অনবরত ঝরিয়া পড়িয়া জলের তিনভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এখন বাতাস ভিন্ন মুখে বহিতেছিল, তাই এপারের জলটুকু বেশ স্বচ্ছ দেখাইতেছিল। তীরে ঘাসের বিছানায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া একটা কুকুর মাঝে মাঝে জিহ্বা লেহন করিয়া আলস্য জ্ঞাপন করিতেছিল। গলায় দড়ি বাঁধা বাছুর দুইটী ছাড়া পাইয়া কখনো লাফাইয়া কখনো ঘাস খাইয়া আপন-মনে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। পুকুর-পাড়ের আমড়া গাছ দুইটা মুকুলের মধুর গন্ধে দিক পূর্ণ করিতে ছিল। হিমু বসিয়া এই-সব দেখিতেছিল। হঠাৎ ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছায়া পড়ায় সে ঘাড় ফিরাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত হইল। এ কি প্রফুল্ল! প্রফুল্ল আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার হাতে হাতে সদালাপ বইখানি। বইখানি দিবার ছলেই প্রফুল্ল তবে তাহার সহিত যাচিয়া কথা কহিতে আসিয়াছে!

কিন্তু হিমু এখন ঠেকিয়া শিখিয়াছে। সে প্রফুল্লর সম্বন্ধে কিছু জানিলেও এ-বাড়ীর লোকদের আর কাহারো সঙ্গে কথা কহিবে না। তাই মুখ ফিরাইয়া সে আবার তাহার অনভিপ্রেত দৃশ্যাবলীতেই ক্লান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

প্রফুল্ল ঘরে ঢুকিয়া বিনা ভূমিকায় একেবারেই কহিল, "তুমি হিমানী? অরুণের বোন্? ঝালুদায় তোমার বাড়ী?"

অরুণের নাম শুনিয়া হিমু কিন্তু তাহার ঔদাসীন্য বজায় রাখিতে পারিল না। তাহার সহসা মনে হইল, এই প্রফুল্ল বাবুই অরুণদার সেই প্রফুল্লদা নন্ ত? নিশ্চয়ই তাই! আনন্দ ও কৌতুক-পূর্ণ চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়া সে কেবল ঘাড় হেলাইয়া এক কথায় তাহার সব কথার উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

প্রফুল্লর মুখ মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "এই বইখানায় অরুণের নাম দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল। অরুণ জানে, এ সব কথা? এতে তার মত আছে?"

অরুণের কোন্ বিষয় জানার কথা প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিতেছে বুঝিতে না পারিয়া হিমু বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। প্রফুল্ল একটু হাসিয়া কহিল, "অরুণ আমায় প্রফুল্লদাদা বলে। আমায় তুমি তার মতই বিশ্বাস করতে পার।"

প্রফুল্ল হয়ত মনে করিয়াছিল, হিমু তাঁহার প্রশ্নে সন্দিগ্ধ হইয়া উত্তর দিতে অনিচ্ছুক। হিমু কহিল, "আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি। অরুণদা আপনাকে খুব ভালবাসে।"

প্রফুল্ল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কাকার সঙ্গে এই বিয়েয় তোমার মত আছে?"

হিমু জানিত, নিজের বিবাহের সম্বন্ধে কোন কথা কওয়া মেয়েদের পক্ষে অপরাধ। লোকে তাহাতে নির্লজ্জা বলে। তাছাড়া এই কয়দিনের ঘটনাবলী তাহার মনেও একটুখানি সংসার জ্ঞান আনিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সে ভাবিয়া দেখিল, প্রফুল্ল বাবু অরুণদার বন্ধু। উনি এ বাড়ীর লোক হইলেও ইঁহাকে বিশ্বাস করিতে আপত্তি নাই। সে ইঁহার অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছে, লজ্জা করিবে কি না—দ্বিধা গ্রস্ত হইয়া ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া প্রফুল্ল পুনরায় কহিল, "যা বল্‌বার থাকে, আমায় তুমি অসঙ্কোচেই বল্‌তে পার। অরুণের মত আমায় তুমি তোমার বড় ভাই বলেই মনে করো।"

এমন ঢালা হুকুম পাইবার পর লজ্জার কারণ আর হিমুর মনে কি থাকিতে পারে? সে মুক্তির আনন্দে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আমায় আপনি বাড়ী পাঠিয়ে দিন। আমি ওঁকে কখনোই বিয়ে কর্‌ব না।"

"কর্‌বে না কেন? উনি খুব বড় মানুষ ত! খুব সুখে রাখ্‌বেন, ঢের গহনা কাপড় খেলনা দেবেন।"

প্রফুল্লর কণ্ঠস্বরে তাহার মনের ভাব বুঝা গেল না। হিমু কহিল, "উনি হেমলতাদির স্বামী। আমি বড় মানুষ হতে চাই না।"

সে যে কেন আলোকনাথকে বিবাহ করিতে চায় না, এই অল্প কথাতেই তাহা এমন স্পষ্ট প্রকাশ হইল যে, প্রফুল্ল মনে মনে মেয়েটির প্রতি একটুখানি করুণ কৃতজ্ঞতা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। ঐশ্বর্য্যের লোভে মুগ্ধ হইয়া সে

তাহার দিদি-আখ্যায়িতা নারীর প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে চাহে না, ইহা মনে হওয়ায় প্রফুল্ল খুসী হইয়া কহিল, "তাহলে এ বিয়ে বন্ধ হওয়ায় তোমার অমত নেই?"

হিমু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, "একটুও না।"

এইবার সত্যই তাহার লজ্জা করিতেছিল। মাগো, কেবল কেবল নিজের বিয়ের কথা কি বলা যায়? কি কুক্ষণেই যে সে বাড়ীর বাহির হইয়াই যুগী ধোপানীর মুখ দেখিয়াছিল। দিদিমা অপ্রসন্ন মুখে তখনই দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া ছিলেন। সে কিন্তু তাহা করে নাই। সে অরুণের কাছে শুনিয়াছিল, ও সব মানুষের কুসংস্কার! এইবার দেখা হইলে সে তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে যে লেখা-পড়া শিখিলেই শাস্ত্র শেখা হয় না! দিদিমার মত শাস্ত্রজ্ঞান হইতে তাহার এখনও বিশ বৎসর বিলম্ব আছে।

প্রফুল্ল কহিল, "আমি কাকাকে আগে বুঝিয়ে বলি, তিনি যদি মত বদল করেন, ভালই। না হলে"—বলিয়া সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হিমু পরবর্ত্তী উপায়টা কথা শুনিবার জন্য উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

প্রফুল্ল কহিল, "না হলে তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। কিন্তু কি করে তা হয়, তাই আমি ভাব্‌চি। কাকা হয়ত যেতে দেবেন না।"

হিমু সিংহিনীর ন্যায় মাথা হেলাইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ইস, দেবেন না! কার সাধ্যি আমায় জোর করে রাখে? রাখুক দিকি! আমি ঠিক্ চলে যাব।"

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল, "সাধ্য অনেকেরই আছে! আচ্ছা, তুমি যদি দিদিমার সঙ্গে মেলা দেখ্‌তে যাও, আর সেখান থেকে অরুণ তোমায় বাড়ী নিয়ে যায়,—দিদিমা কি তাহলে ভারী রাগ্ কর্‌বেন?"

হিমু কহিল, "কি করে সে জান্‌তে পার্‌বে?"

প্রফুল্ল কহিল, "আমি তাকে খবর দেব। ব্যাপার শুন্‌লে সে নিশ্চয় আস্‌বে। আচ্ছা, অরুণ কি তোমার আপন ভাই?"

হিমু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে আস্তে আস্তে কহিল, "না, মার পেটের নয়, আপনও নয়। ও কে, তা ও নিজেই জানে না। কে একজন বড়লোক ওকে জল থেকে তুলে এনে মানুষ করেছিল। হঠাৎ সে বড়লোক মারা গেলে ও দিদিমার কাছে থাক্‌ল। আপন না হলেও অরুণদা এখন আমাদেরই।"

এ সব কথা প্রফুল্ল পূর্ব্ব হইতেই জানিত, তবু হিমুর মুখে শুনিতে চাহিল। কি জানি পর বলিয়াই অরুণের কাছে সে নিজের বাড়ীর কথা তেমন করিয়া কিছুই কখন বলিত না। অরুণেরই ঐশ্বর্য্যে যে তারা রাজভোগে থাকিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে, এই ভাবের প্রেরণাতেই সে অরুণের নিকট নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করিত। আশা ছিল, সুদূর ভবিষ্যতে সে তাহাদের এই অন্যায় আচরণের প্রায়শ্চিত্তও একদিন করিবে। কিন্তু এখন ভাগ্যলিপি তাহার বদল হইয়া গিয়াছে। কাকা যখন বিবাহের সখে মাতিয়াছেন, তখন ইহাকে না পান, অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন, নিশ্চয়। এ সংসারের নিকট তাহার আর কোন মূল্যই নাই। সে এখানে এখন অনাবশ্যক ভার মাত্র! তাহাতে ক্ষতি অবশ্য তাহার কিছুই নাই। কেবল এই শয্যাশায়িনী খুড়িমার মরণ পর্য্যন্তই তাহার এখানকার বাঁধন! তারপর সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। হাঁ, আরও এক জায়গায় কিছু কর্ত্তব্য তাহার আছে বটে। সে তাহার মা। যে মাকে সে কোনদিনই বোঝে নাই,—এবং তিনিও তাহাকে বুঝিতে চাহেন নাই। হয়ত ত্রুটিটা তাহার তরফেই অধিক হইয়া থাকিবে। নহিলে, কুপুত্র হইলেও কুমাতা ত কখনো হন না। হতভাগ্য সে-ই তবে সে অমূল্য মাতৃ-স্নেহে চিরবঞ্চিত রহিয়া গেল কেন?

অতি শৈশবে কাকা যখন তাহাকে মাতৃক্রোড়-চ্যুত করিয়া লইয়া আসে, তখন অবশ্য এই আশা করিয়াই আনিয়াছিল যে সন্তান-বাৎসল্য সকল অভিমানের উপরে জয় লাভ করিবে। কিন্তু সেটা কাকা ভুল করিয়াছিল। মা সন্তান ছাড়িলেন—তবু সংকল্প ছাড়িলেন না। তারপর অদ্ভুত ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে আলোকনাথ যখন রাজ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইল, তখনও প্রফুল্লর

মাকে সে ভুলিয়া যায় নাই! বরং সেবার প্রফুল্লই নায়েব ও দাসদাসী সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিল। তখনও মা আসিলেন না। দিদিমা তখন মরিয়া গিয়াছেন। মামা রাজদ্রোহ-অপরাধে অননুভূত নির্য্যাতনে মরণাধিক শোচনীয় অবস্থায় জেলখানা হইতে মুক্তি পাইয়া বাড়ী আসিয়াছেন। নিম্নাঙ্গ তাঁহার পক্ষাঘাত-গ্রস্তের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছিল। মা সেই অর্দ্ধমৃত ভাইয়ের সেবাতেই শরীর-মন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাই ছেলের ডাক্ তাঁহার কানে পৌঁছাইল না। প্রফুল্ল মামাকে বাড়ী লইয়া গিয়া ভাল রকম চিকিৎসা করাইতে চাহিল। মা তাহা অস্বীকার করিলেন। যদি সমানে সমানে কুটুম্বিতা হইত—তবে ইহা অনায়াসে চলিতে পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়। তাঁহার জীবন্মৃত ভাইকে তিনি ধনী আত্মীয়ের উপহাসের লক্ষ্য হইতে দিতে পারেন না। নায়েব অনেক বুঝাইল। প্রফুল্ল রাগ করিল, চোখের জল ফেলিল, ফলে কিন্তু কিছুই হইল না। ঘোর অভিমানে প্রফুল্ল মনে করিল, মা তাহাকে কোনদিনই ভাল বাসেন নাই। দুইদিন কাছে থাকিয়া যাইবার জন্য মার করুণ অনুরোধও সে তাই উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

ইহার পর সে তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া লইল। লেখাপড়ায় প্রবল অনুরাগ থাকায় পূর্ব্বেও সে তাহা করিত। এখন ইহাকেই সে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া লইল। সময় সময় বিপন্নের ডাকও তাহার কাণে পৌঁছিত—। সে নিজে দুঃখী, তাই দুঃখীর প্রতি তাহার সমবেদনা জন্মিত। স্থান-কাল-অবস্থা সব ভুলিয়া সে তাই দশের কাজে নিজেকে সঁপিয়া দিত। এ লইয়া আলোকনাথের সহিত কতদিন মনান্তর হইয়াছে, হেমলতা কান্নাকাটি করিয়াছে, ঠাকুমা নিজ মৃত-মুখ দর্শনের ভয় দেখাইয়া দিব্য দিয়াছে, তবু তাহাকে কেহ কোনদিন ফিরাইতে পারে নাই। আজও তাহার বিবেক যখন বলিল, হিমুকে বিবাহ করা কাকার অন্যায়, তখন সারা অন্তঃকরণ দিয়াই সে তাহার মনের যুক্তির অনুমোদন করিল! বিশেষতঃ এই হিমু, এ তাহার বন্ধুর আত্মীয়। তাহার অজ্ঞাতেই এ বিবাহ ঘটিতেছে! এ বিবাহ কখনোই সে ঘটিতে দিবে না।

প্রফুল্ল স্থির করিল, মালতী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে তাঁহাকে এ সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবে। মেয়ের বিয়ে হয় না, এ আবার একটা কথা না কি? মানুষ এখন মনুষ্যত্বের দিক্ হইতে সাড়া দিতে শিখিয়াছে। দেশের জন্য লোকে হাসি-মুখে কত মহৎ দুঃখ বরণ করিয়া লইতেছে, এও ত সেই দেশেরই কাজ, মায়েরই সেবা! গরীবের অপরূপ রূপসী কন্যাকে বিনা-পণে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করা, এ কি এমনই ভয়ঙ্কর স্বার্থত্যাগের বিষয় না কি? বিবাহের জন্য ভাবনা নাই। সে ভার প্রফুল্ল লইবে। এখন উঁহাদের মতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে হয়! খুড়ীমার স্থান—তাও আবার হিমুকে দিয়া দখল করাইতে, সে কিছুতেই দিবে না। ইহাতে কাকা রুষ্ট হন, হইবেন। কর্ত্তব্য-পালনে সে ত কখনও ভয় পায় নাই—আজও পাইবে না। কাকার বিরুদ্ধাচরণ করা অবশ্য তাহার অনুচিত। তাই সে স্থির করিল, প্রথমে তাঁহাকে ও সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার সে চেষ্টা করিবে। উচিত কথা ত তিনিও কাহারও মুখে শুনিতে পান না। যত সব স্তাবকের দল। প্রফুল্লর অনুরোধে অন্ততঃ কাকিমার বাঁচিয়া থাকা পর্য্যন্ত ত কথাটা রাখিতে পারিবেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খুড়া-ভাইপো

দুপুর বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া সদর ও অন্দরের মাঝখানে একখানা সুসজ্জিত ঘরে খাটের বিছানায় তাকিয়ায় অর্দ্ধ হেলান দিয়া শুইয়া আলোকনাথ রূপার গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিল। ঘুম ছাড়িয়া গেলেও তন্দ্রার ঘোর তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই। অর্দ্ধমুদিত চোখের কাছে হিমুর পুষ্পিত-যৌবন দেহ ও ঢল-ঢল মুখখানিই ভাসিতেছিল। এখন নিভৃত অবসরে সেই মুখখানির ধ্যান করাই আলোকনাথের কাজ হইয়াছিল। সেই রূপাধিকারিণী কবে যে তাহার পার্শ্ব-সঙ্গিনী হইয়া পরমানন্দ দান করিবে, কল্পনায় তাহাই অনুধাবন করা তাহার এখন প্রধান সুখের মধ্যে

দাঁড়াইয়াছে। পায়ের শব্দ করিয়া প্রফুল্ল আসিয়া ঘরে ঢুকিলে আলোকনাথের আনন্দ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানায় যথেষ্ট স্থান থাকিলেও সে ঘরের কোণ হইতে একখানা চৌকি টানিয়া আনিয়া কাকার কাছে বসিল। এ ব্যবহার নূতন। আলোকনাথ লক্ষ্য করিলেও কথা কহিল না।

দুইজনের মনেই মেঘ জমিয়াছিল। কথা কহিবার মত কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই কাটিয়া গেল। প্রফুল্লর বলিবার কথা এত অধিক ছিল যে তাহার চাপে সূত্র সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। আলোকনাথের বলার কথা কিছুই ছিল না। যা ছিল – সে ত সেই প্রথম সাক্ষাতে কুশল প্রশ্নেই ফুরাইয়া গিয়াছে। নূতন কথা আর কি আছে? হাঁ, একটা ছিল,- -"কবে যাচ্চ?" এই প্রশ্নটাই এখন প্রধান। আপদ বিদায় হইলেই বাঁচা যায়!

ইতস্তত-ভাবটা কাটাইয়া প্রফুল্লই প্রথমে কথা কহিল। সে বলিল, "কাকিমার জ্বর ত দেখ্‌চি আর বন্ধই হয় না। আনুসঙ্গিক উপদ্রব সমস্তই 'ত রয়েচে। বরং গতবারে যা দেখে গেছি, তার চেয়ে বেড়েচে। এখন উঠে বস্‌তে-টস্‌তেও পারেন না।"

আলোকনাথ মুখের নল না সরাইয়া অনাগ্রহভাবে কহিল, "হুঁ।"

"কিন্তু তার জন্যে কোন ব্যবস্থাই ত হয়নি। কবিরাজী ওষুধ উনি আর খাচ্চেন না। কবিরাজ মশায় বল্লেন, হাত-টাতও দেখান না। উপকার নাহ'লে অনেক দিন ভুগ্‌লে রোগী অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, তা বলে বাড়ীর লোক হাল-ছাড়া হলে ত চলে না। আমার মনে হয়, একবার কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে ওঁকে ভাল করে দেখানো উচিত!"

"উচিত, তা কর না বাপু। কেউ ত বারণ করে রাখেনি, আমায় ও-সবের ভেতর জড়িও না শুধু। বারোমাস রোগ আর রোগ—ক্ষেপিয়ে তুলেচে যেন! দুদিন সরে গেলে ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।" বলিয়া আলোকনাথ গড়গড়ার নলটা ফেলিয়া দিয়া অপ্রসন্ন মুখে ডাকিল, "রেধো—এই বেটা রেধো।"

"আজ্ঞে যাই।" বলিয়া বাবুর খাস-খানসামা রাধানাথ সজ্জিত কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ঘরে ঢুকিয়া কলিকা বদ্‌লাইয়া দিয়া চলিয়া গেলে আলোকনাথ পুনরায় গড়গড়ার নল মুখে তুলিয়া অন্যমনস্কভাবে টানিতে লাগিল।

প্রফুল্ল বিপদে পড়িল। খুড়িমার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের মীমাংসা ত হইয়াই গেল। কিন্তু এ মীমাংসার পরিণাম তাঁহার রোগোপনোদনের ভেষজ হইবে কি না, কে জানে! হয়ত এই সুযোগে গৃহকর্ত্রীর শূন্য স্থান পূর্ণ হইয়া এই বিদায়ই গৃহলক্ষ্মীর চিরবিদায়ের আয়োজনে দাঁড়াইবে। বিজয়ার পূর্ব্বেই বিসর্জ্জনের পালা সাঙ্গ হইবে। আর ঘটনার উপলক্ষ হইবে সে নিজে! না, এ ব্যবস্থায় সে এখন আর সম্মতি দিতে পারে না। সে শান্তভাবে কহিল, "এখনই ত ওঁকে নিয়ে যেতে পারা যাচ্চে না। তার আগে একবার কোন বড় ডাক্তারকে আনিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। যাতে যাবার কষ্ট সহ্য করতে পারেন, তাই আগে করা চাই। হরিশ আজই যাক্‌, ডাক্তার সান্যালের কাছে। তিনি যাঁকে বলবেন, তাঁকেই নিয়ে আস্‌বে।"

আলোকনাথের ললাট ও ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, এ আবার এক গ্রহ জুটিল। যে মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে শান্তিতে মরিতে দাও,—তা না—কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাও! পয়সার শ্রাদ্ধ করাও! তার পর সত্যই যদি বাঁচিয়া ওঠে, তখন? তাহার ঝক্কি সামলাও। কেন রে বাপু, তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

আলোকনাথের মনে পড়িল না যে অভাগিনী রুগ্নার নিকট একদিন তাহারাও কত পাইয়াছে! মা ছাড়া প্রফুল্ল অকৃত্রিম মাতৃ-স্নেহই সেখানে পাইয়াছে,—সে অনুপাতে কি-ই বা সে দিয়াছে বা করিয়াছে! আর সে নিজে? কিছুই কি পায় নাই? দুঃখের দিনের সঙ্গিনী,—সেবা-যত্ন, প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়া সে কি আলোকনাথকেও দেবতার মত পূজা করে নাই? রোগে পড়িয়া এখনও সে কি তাহারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান-কল্পে মনোযোগী হইয়া নাই? তরুণ জীবনে বসন্তের নববল্লরীর মত বেষ্টন করিয়া একদিন যে মুঞ্জরিত লতাটি সুগন্ধে সৌন্দর্য্যে তাহাকে পুলকিত পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, আজ সে শীত-শীর্ণ মরণাতুর, তবু তার মধুর স্মৃতিটুকুও কি আর মনে

স্থান দেওয়া চলে না? জীর্ণ লতা এখনও যে সেই দাবী রাখিয়াই বাঁচিয়া আছে! এ আশ্রয় হইতে চ্যুত হইলে সে আর বাঁচিবে কি লইয়া? এ প্রশ্ন আলোকনাথের মনে উঠিল না! বুঝি, এমন অবস্থায় কাহারও তা ওঠে না।

আলোকনাথ বিরক্ত স্বরে কহিল, "অনর্থক ফের কতক গুলো পয়সা জলে ফেলা বৈ ত নয়। সে সব চেষ্টাও ত গোড়ায় গোড়ায় ঢের করা গেছে। আর কেন বাপু? এখন ওর পরকালে কিছু সুবিধে হয়, এমন কিছু করাতে হয়ত কারিয়ে দাও। আস্‌চে জন্মে আর এমন করে না ভুগে মরে!"

কথাগুলি রূঢ়! তবু শেষের দিকটায় যেন একটু স্নেহের উচ্ছ্বাসে আর্দ্র হইয়া বাহির হইল।

কাকার কথায় প্রফুল্ল ক্ষুব্ধ হইলেও আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "সে সব যা করতে হয়, আপনারা করাবেন। আমি এখনই হরিশকে চুণী ডাক্তারের কাছে পাঠাচ্চি। তাছাড়া আর একটা কথা আমার বলবার আছে।"

আলোকনাথ অসহিষ্ণুভাবে কহিল, "যা বল্‌বার থাকে, চটপট বলে ফেল। কেনই যে বলা, তা তুমিও জান। কর্ত্তা ত দেখ্‌চি তুমি। তোমার ইচ্ছাতেই যখন কাজ, তখন অনুমতি চেয়ে অনর্থক আমার অপমান না কর্‌লেই ভাল হয় না? দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করো, ডাক্তার বলেচে, ও রোগ সার্‌বার নয়।"

প্রফুল্ল উঠিয়া আলোকনাথ পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া অনুতপ্ত স্বরে কহিল, "আমায় মাপ্ করুন, কাকা। আমি বড় অবাধ্য। কিন্তু এটায় আমায় অনুমতি দিন, আপনি নৈলে আমি শান্তি পাচ্চি না। সত্যি আমারই ত ত্রুটি। আমি ত এতদিন তেমন করে মন দিই নি—সেবা করিনি—কিছুই না। আপনার তরফ থেকে অনেক হতে পারে। আমার ত কিছুই হয় নি।"

আলোকনাথ কথা কহিল না, তাম্রকূট-সেবনে মনোযোগী হইল। প্রফুল্লর কথায় তাহার মনের মধ্যে হয়ত ক্ষণিক একটা দুর্ব্বলতা আসিয়াছিল। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহাকে কাছে টানিয়া দুইটা মিষ্ট কথা বলে, কিন্তু কিছুই বলা হইল না। মনে পড়িল, উহার আরও একটা দাবী মজুত এবং এখনই তাহা শুনিতে হইবে। আর সে দাবীটা খুব সম্ভব তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য চিন্তার ফল নয়। উহারই স্বার্থরক্ষার অর্গল। এই কথাটা মনে উঠিবামাত্র স্বার্থপর আলোকনাথের মনের ক্ষণিক দুর্ব্বলতাটুকু দূর হইয়া গেল। মনে হইল, সংসারে স্বার্থপর কে নয়? এই যে উচ্চ-শিক্ষিত প্রফুল্ল। দেশবন্ধু প্রফুল্ল! পরোপকারী স্বার্থত্যাগী প্রফুল্ল! যাহার প্রশংসা-বাণী সাধারণের মত একদিন তাহাকেও মুগ্ধ করিয়াছে, পুলকিত করিয়াছে। সেও কি অপর সাধারণের মত স্বার্থ রক্ষায় ব্যাকুল নয়! এই যে খুড়ীর জন্য এত উদ্বেগ, এত ঐকান্তিক যত্ন, এ-সব এতদিন ছিল কোথায়! ছেলে দেশোদ্ধার করিয়া গ্রামে গ্রামে তাঁত বসাইয়া চরকা চালাইয়া প্রচার-কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। তাই ঘরের খবর লইবার তাহার অবসর হয় নাই! স্বীকার করি, রোগের বাড়াবাড়ি খবরটা সে পূর্ব্বে জানিত না। কিন্তু জানিতেই বা মানা করিয়াছিল কে? জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না কি? দেশের খবর রাখিতে পার, আর ঘরের খবর রাখিতে পার না, বাপু? ও-সব চালাকি। এবার স্বার্থে ঘা লাগিতে চলিয়াছে। তাই মরা গাছে জল ঢালিবার এত আয়োজন হইতেছে। যাহাকে যমে লইবে, তাহাকে কি মানুষ বাঁচাইতে পারে? পাগল! আলোকনাথও মানুষ। প্রফুল্লর ন্যায় হৃদয় জিনিষটা তাহারও বর্ত্তমান। কৃপণও সে নয়। তাহার ত আর বাপ-পিতামহের উপার্জ্জনের কড়ি নয় যে 'যখ্' দিবার ব্যবস্থা করিবে। পয়সা খরচ করিতেও সেও জানে। জমাদার-গৃহিণীর অবশ্য-প্রাপ্য চিকিৎসা-সেবা কিছুরই ত্রুটি এখানে হয় নাই। বরাতে তাহার সুখভোগ নাই, লোকে তাহার করিবে কি? কে তাহাকে মরণে সাধিয়াছিল? তবু ভাগ্যবানের হাতে পড়িয়াছিল বলিয়া মরণ-শয্যাটাও রাণীর মত ঘটিয়াছে। তবে আবার চোখ রাঙ্গাইতে আস, কিসের জন্য বাপু! আসল কথা ঐ রক্ষা-কবচ গলায় ঝুলাইয়া আত্মরক্ষা করা। সে আর হয় না গো—শ্মশান-যাত্রীর পথ তাকাইয়া সে তাহার বাকী জীবনটা আর ব্যর্থ হইতে দিবে না। স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বকালে ছিল

বটে—কিন্তু স্ত্রীর চিতায় স্বামার পুড়িবার ব্যবস্থা কোন কালের কোন শাস্ত্রই দেয় নাই।

খুড়ার চিন্তাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া প্রফুল্ল দ্বিতীয় আবেদন নিবেদন করিতে ইতস্তত করিতে লাগিল। অথচ সেটাই যে উপস্থিত প্রয়োজন। বিলম্ব করিলেও চলিবে না। কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর দ্বিধা কাটাইয়া সে কহিল, "আমি শুন্‌ছিলুম, আপনি আবার—আবার বিয়ে কর্‌বেন! এ কি সত্যি?"

আলোকনাথ বারকতক জোরে জোরে তামাকের ধোঁয়া টানিয়া তাহা ছাড়িয়া দিয়া অন্য দিকে চাহিয়া দ্রুত উচ্চারণে কহিল, "সত্য হলে বোধ হয় অদ্ভুত কাণ্ড কিছু হবে না! আমার ছেলে নেই, মা যখন ধরেচেন, তখন তাঁর উপরও আমার একটা কর্ত্তব্য আছেত?"

প্রফুল্ল ক্ষুব্ধভাবে কহিল, "কাকামার শরীরের এই অবস্থার উপর এটা খুব সাংঘাতিক আঘাত হবে না কি?"

আলোকনাথ উদাসীনভাবে কহিল, "বল্‌তে পারি না। মেয়েদের হিংসে শুনেচি, খুব। হতেও পারে।"

প্রফুল্ল কহিল, "আমায় কিছুদিন যত্ন-চিকিৎসার ভার নিয়ে দেখ্‌তে দিন। যদি না সারে, তখন—।" তখন যে কি হইতে পারে, প্রফুল্ল তাহা কতক লজ্জায় কতক ক্ষোভে ঠোঁটের বাহির করিতে পারিল না।

আলোকনাথ ক্রুদ্ধ ক্রূর দৃষ্টিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের বিষাদ-মণ্ডিত মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "ডাক্তার বলেচে, এ রোগ কখনই সারবে না। হতে পারে, দু'বছর পরে যাবে,—হতে পারে, দু দিনেও তা ঘট্‌তে পারে। হঠাৎ হার্ট ফেল করেও যেতে পারে। এখনও কি বল্‌বে, ঐ মৃত্যুকে আঁক্‌ড়ে আমায় চিরদিন বসে থাকতে হবে? আমার দিকটা দেখ্‌চ কি?"

প্রফুল্ল জানিত, খুড়িমা শয্যা লইবার পর—না কাকা, না সে, কেহই তাহারা তাঁহাকে আঁকড়িয়া বসিয়া নাই। এবং তাঁহার অভাবে কাকার কোন সখ, কোন আমোদ-প্রমোদও এ পর্য্যন্ত বন্ধ হয় নাই। বরং রুগ্না কর্ত্রীর কর্ত্রীত্ব না ফুরাইতেই এ ঘটনাটি এখন অবাধ আনন্দলাভের সুযোগেই দাঁড়াইয়াছিল। তবু সম্বন্ধের গুরুত্ব মনে রাখিয়া সে নম্র কণ্ঠে কহিল, "তাহলে ও-সব হাঙ্গাম বন্ধ রাখাই ভাল নয় কি? যদি দুবছরটা—আমরা দু'দিনেই ডেকে আনি?" উদ্বেগে ও আশঙ্কায় তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। এই মাত্র ঐ পাষাণ পুরুষের কণ্ঠোচ্চারিত যে নিষ্ঠুর মন্তব্য ডাক্তারের বাণী-রূপে সে প্রাপ্ত হইল, তাহার কঠোরতা সে তখন সারা মনে-প্রাণে অনুভব করিতেছিল। ইহার পরেও মানুষ যে এমন করিয়া কাহারও সম্বন্ধে অবিচার করিতে পারে, এ যেন সে ধারণাই করিতে পারিতেছিল না। তাহার তরুণ হৃদয় সেই একমাত্র পরম স্নেহশালিনী, অসাধারণ ধৈর্য্যময়ী নারীর চরম দুর্গতির কল্পনাতেও শিহরিয়া উঠিতেছিল। সে পুনরায় কহিল, "না, না, এ আমি কখনই হতে দেব না। তিনি বেঁচে থাক্‌তে তাঁর জায়গায় আর কেউ এসে বস্‌তে পাবে না। কিছুতেই না।"

আলোকনাথের মুখে ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিল। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে সে কহিল, "কেন বল দেখি? এত জোর খাটাবার সত্যি অধিকার তোমার কি কিছু আছে এখানে? স্বার্থে ঘা পড়্‌চে বলে জ্ঞান হারিও না। তুমি যেমনই হও, আমি উচিত-কর্ত্তব্যই করব। ভবিষ্যতে জমীদার হতে না পাও—ভাতের ব্যবস্থা তোমার থাক্‌বে—ভয় নেই। হিংসেতে তুমি যে মেয়েদেরও ছাড়ালে, দেখ্‌চি।"

প্রফুল্ল উদ্বেগ-বর্জ্জিত শান্ত মুখে কহিল, "না কাকা, জমিদারি হারাবার ভয় আমি একটুও করিনা। কারণ আপনার কৃপায় দরকার হলেই টাকা হাতে আসায় ও ভাবনাটা শিখতেও পারিনি। আজ যখন মনে করিয়ে দিলেন, আর আপনার মনেও যখন এটা উঠেচে, তখন আপনার জমিদারী, সম্পত্তি, অর্থ, যা-কিছু—আমি যদি তার কণামাত্রও কখনো গ্রহণ করি, তবে যেন মাতৃঘাতীর দেশদ্রোহীর মহাপাতকে পাতকী হই! এর বাড়া বড় শপথ আমি আর কিছু জানি না।"

আলোকনাথ এক সময় প্রফুল্লকে যথার্থই ভাল বাসিয়াছিল। ঐশ্বর্য্যের সহিত রুচি-পরিবর্ত্তনে খুড়া-ভাইপোয় বছর কয়েক হইতেই খিটিমিটি, মতভেদ প্রায়ই উপস্থিত হইত। তবু স্ত্রীর উপর তাহার যে বিদ্বেষের ভাব জন্মিয়াছিল, প্রফুল্লর উপর তেমন কোন বিদ্বেষ-

ভাব তাহার ছিল না। ঘ প্রণয়ের রঙিন চিন্তায় বাধা-স্বরূপ সে যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মনে করিয়াছিল—অর্থের প্রলোভনে তাহাকে ভুলানো চলিবে। ধর্ম্মতঃ উহার প্রাপ্য কিছুই নাই! ছেলেও শিক্ষিত! অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা সে অবশ্যই মানিয়া লইবে। সত্যই ত, তাহার ফুলুকে সে কিছু আর অন্ন-কষ্ট দিতে পারিবে না।

দু-একখানা ছোট-খাট তালুক বরং লিখিয়া দিলেই চলিবে। ইহাতে পাকা খেলোয়াড়ের মত বোড়ের চালও চালা হইবে। চাই কি, ভবিষ্যতে তাহার নাবালক পুত্রদের বিষয়-সম্পত্তি ওই দেখিতে শুনিতে পারিবে। ছোঁড়া আর যাই হউক, মিথ্যা বা চুরি উহার দ্বারা কখনো সম্ভব হইবে না। এটুকু চরিত্রাভিজ্ঞতা তাহার জন্মিয়াছে। ভবিষ্যতের জন্য এইরূপ একটা মানসিক দলিল লিখিয়া রাখিয়া আলোকনাথ প্রফুল্লর সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্তই হইয়াছিল। কিন্তু আজ অতর্কিত ভাবে প্রফুল্লর মুখে এই অনাবশ্যক গর্ব্বিত ত্যাগের মন্ত্র তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বুকে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতের দোলা দিয়া শরীরটাকেও আমূল নাড়া দিল। ঐ গর্ব্বিত, অবাধ্য দুর্ব্বিনীত যুবা এই মাত্র যে কঠিন শপথ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইল, তাহাকে কিছুতে কোনমতেই যে আর কেহ তাহার গন্তব্য পথ হইতে ফিরাইতে পারিবে, সে সম্ভাবনা মোটেই নাই!

আলোকনাথ ইহা ভালই জানে। বাঘকে পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া তাহার সম্মুখে প্রচুর আমিষ খাদ্য রাখিয়া যদি তাহা স্পর্শ করিতে না দেওয়া হয়, তাহাতে সে যেমন ভীষণ হইয়া ওঠে—আলোকনাথও ক্রোধে নিরুপায় ক্ষোভে ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া তেমনি ভীষণ হইয়া উঠিল। তাহার মুখে তখনও তেমনি ক্রূর হাসি; চোখে তখনও তেমনি ঈর্ষার তীব্র জ্বালা! কণ্ঠস্বরে সে জ্বালা ঢালিয়া দিয়া সে কহিল, "তুমি মস্ত লোক, বিষয়ের লোভ তুমি করনা! তবে সত্যটা কি, বল্‌বে কি? আমার চোখের দিকে চেয়ে সত্য বল্‌বার সাহস যদি থাকে,—তোমার মনের কথা?"

প্রফুল্লর দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য বিপন্ন ও বিমূঢ়ের মত দেখাইল। খুড়িমার স্বার্থ রক্ষা ছাড়া আর কি অভিযোগ তাহার আছে বা থাকিতে পারে? হাঁ, আছে বই কি, এখনই সে কথা ভুলিলে চলিবে কেন। সেই যে একটি নিরপরাধিনী রক্ষক-হীনা বালিকাকে সে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে, তাহার কথা সে ত ভুলিয়া বসিয়া আছে! এই যে কাকার সহিত অপ্রিয় আলোচনা, ইহার মূলে সেই—কি না? তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই না সে কাকার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছিল! হিমানীর অনিন্দিত মূর্ত্তিখানি মনে পড়ায় প্রফুল্লর মুখে একটা কোমল মাধুর্য্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল। শুধু মরণ-প্রার্থিনীর জন্যই নয়—জীবন-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণাঙ্গী তরুণীর জন্যও সে আজ বিচার-প্রার্থী! এইমাত্র ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার যে পাথেয় সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিল, তাহাতে সুধু বিসর্জ্জনের বাদ্য নয়—আগমনীর সুরও তাহার অজ্ঞাতে বাজিয়াছে! আজ সে রিক্ত হয় নাই, ধন্য হইয়াছে!

প্রফুল্লর মুখে যে মেঘ ও রৌদ্রের দ্রুত নর্ত্তন-লীলা ঘটিয়া গেল, তাহা চতুর আলোকনাথের হিংসা-কুটিল দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। তাহার মনে হইল, এইবার ঠিক্ রাস্তা সে ধরিতে পারিয়াছে। আঁতে ঘা লাগিয়াছে, তাই বাছাধন একেবারে অবোল হইয়া গিয়াছে। মুখে ত আর সে খই ফুটিতেছে না! আলোকনাথ ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "কৈ, জবাব দাও! ভারী যে সত্য কথার গুমর কর! আজ সত্য বল দেখি, পরোপকার পরম ধর্ম্মটা ছেড়ে দিয়ে বাকী যেটুকু নির্ছাক সত্য তাই বলত বাপু।"

কাকার অতর্কিত অদ্ভুত প্রশ্নে প্রফুল্ল প্রথমটা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত খেই-হারা হইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আবার তাহারই চোখের ঈর্ষা-বিদ্রূপ-ভরা কুটিল ক্রূর দৃষ্টি, শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠস্বরে আত্মস্থ হইয়া নিজের উত্তর সে সহজেই খুঁজিয়া পাইল। নিজ অচঞ্চল চোখের দৃষ্টি আলোকনাথের চোখের উপর স্থির রাখিয়া, মৃদু অকম্পিত কণ্ঠে সে কহিল, "আপনি যাঁকে বিয়ে কর্ত্তে চেয়েছিলেন, তিনি আমার নমস্যা। আমার বন্ধুর বোন্ তিনি, তবু আমি বলছি, হিমু আমার মা! আর সেই জন্যেই অরুণের অমতে তাঁর বিয়ে হবে না। অরুণের বিষয় আম্‌রা ভোগ কচ্ছি, কিন্তু তার বেশী অন্যায় আর ঘটতে দেওয়া হতে পারে না।"

আলোকনাথের ক্রুদ্ধ ঈর্ষা-কাতর দৃষ্টি সহসা লজ্জিত নত হইয়া পড়িল। বিস্ময় তাহার মনের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে ছিল। মনে হইল, মানুষ কখনো এত উদার, এমন ত্যাগী হইতে পারে? এমন অপ্সরীতেও মুগ্ধ না হইয়া বিচার করিয়া চলিতে শেখে? ইহাকেই না তাহারা কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে? তবে ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই কেন? মানুষ এই জন্যই ঘরের ঠাকুর ফেলিয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হয় রে! ফুলু-যে সেই ছেলে বেলার সেই ফুলুই আছে, তাহারই চোখে হিংসার আগুন জ্বলিয়া ছিল, বলিয়া তাহার সত্য মূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সে তবে করিবে কি? ছেলে যে দর্প করিয়া সকল তাতেই জিতিয়া যাইবে, আর সে সেই অপমানের বোঝা অবনত মাথায় তুলিয়া লইবে, এও কিছু উচিত বা সম্ভব নয়! চিন্তিত ভাবে আলোকনাথ মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিল। দূরে সাদা চুণকাম-করা কাছারি-বাড়ীর ছাদের আলিসার উপর দুইটী সাদা পায়রা পরস্পরের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারই অনতিদূরে কয়েকটি কালো পায়রা যেন সাদা-কালোর পার্থক্য রাখিয়া চুপ চাপ বসিয়াছিল। মুখ না ফিরাইয়া উদাসীন অনাগ্রহের ভাবে সে কহিল, "সেই চেষ্টাই করে দেখ তবে।"

প্রফুল্ল আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "না, সে ভার আপনার উপরই রইল। আপনিই তাকে মুক্তি দেবেন। সে আমার বন্ধুর বোন, আপনার অতিথি। আমার এখানকার সব কাজই ফুরিয়ে গেছে।" বলিয়া সে অর্দ্ধ নত-ভাবে আলগোছে আলোকনাথকে একটা প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

আলোকনাথের গড়গড়ার নল অনেকক্ষণ হস্তচ্যুত হইয়াছিল—এবং কলিকার আগুনও নিভিয়া গিয়াছিল। এইবার অবকাশ পাইয়াই কলিকার অবস্থা পরীক্ষান্তে অবসন্ন-ভাবে তাকিয়ার উপর হেলিয়া পড়িয়া বিরক্তির স্বরে সে ডাকিল, "রেধো, এই বেটা রেধো—"

"আজ্ঞে কর্ত্তা, যাই।" বলিয়া উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই রাধাচরণ নিঃশব্দে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

বিনি তারের সুর

পণ্ডিত 'এমার্সন্' বলেছিলেন যে ভগবান জগতে যখন কোন প্রতিভাশালী লোককে পাঠান, তখন জগতের লোকের একটু সাবধানে থাকা দরকার। কারণ সে রকম লোকের হঠাৎ পৃথিবীতে এসে জন্মাবার কি উদ্দেশ্য, সেটা সব সময় ঠিক বোঝা যায় না। বিশ্ব-জগতের বিধি-ব্যবস্থার যখনই একটা কিছু ওলোট-পালোট হতে দেখা যায়, তখনই আমরা দেখতে পাই যে তার মূলে কোন এক অসাধারণ প্রতিভা কায করছে! জগতের ইতিহাসে বার-বার এ সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে! কখনও বা দীপ্ত অগ্নি-শিখার মত সহসা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে কোন কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অকস্মাৎ ধরণীর প্রচলিত ধারার একটা বিষম অদল-বদল করে দিয়েছেন, কখনও বা তাঁরা আবার তুঁষের আগুনের মতো ধিক্ ধিক্ করে জ্বলে ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ধরে জগতের এক মহা পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন! কি ধর্ম্মনীতি-ক্ষেত্রে, কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে, কি সমাজ-সংস্কারে, কি দর্শন-বিজ্ঞান বা রসায়ণ-তত্ত্বে, আমরা এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাই।

ইটালির বোলোগ্‌না প্রদেশের সন্নিকটে যেদিন শিশু মার্কনী জন্ম গ্রহণ করেছিল, সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে এই অপোগণ্ড বালকই একদিন জগতে এমন একটা কিছু আবিষ্কার করবে, যার চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি! সমস্ত বিশ্ব-মানব আজ বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখ্‌ছে—এ কোন্ যাদুমন্ত্রে সে আজ

শূন্যের এক অদৃশ্য মহা-শক্তিকে করতলগত করে অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার সংসাধন কর্‌ছে!

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে হেন্‌রী হার্টজ্ (Heinrich Hertz) নামে একজন জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথম তাড়িত শক্তির কতকগুলি আশ্চর্য্য গুণ আবিষ্কার করেন। তারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত না হয়েও তাড়িত শক্তি যে দূরস্থ কোন পদার্থের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এ তথ্য তখনকার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কারো কারো জানা থাক্‌লেও এ বিষয় নিয়ে কেউ সে সময় তেমন মাথা ঘামান নি! তড়িৎবহ তারের নিকটে থাক্‌লে নাবিকের দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটা কেন যে অকারণ খানিকটা ঘুরে গিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতো, এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেও কেউ তখন এর একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেন নি। হেন্‌রী হার্টজ সবার আগে তড়িতের এই শক্তিটাকে কাযে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রথমে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ-নির্গমন-কারী একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, তারপর সেই যন্ত্র থেকে খানিকটা দূরে,—একটা তার গোল করে বেঁকিয়ে সেই কুণ্ডলী মত-করা তারের শেষের দুটো মুখ ঈষৎ ফাঁক রেখে ঝুলিয়ে দিয়ে দেখান্ যে তাঁর যন্ত্র থেকে যতবার তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, ততবারই দূরের সেই গোলাকার তারটির অসম্বদ্ধ মুখের ফাঁকেও একটুখানি স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রে ওঠে! এ ছাড়া আরো কতকগুলি পরীক্ষা দ্বারা তিনি দেখিয়েছিলেন যে বিনা-তারেও তড়িৎ-প্রবাহ শূন্যের উপর চলা-চল করতে পারে, আর এটাও তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে বায়ুর চেয়েও স্বচ্ছ একটা কোন-কিছুর স্রোত নিয়ত শূন্য মার্গে তরঙ্গ হিল্লোলের মত প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু সেটা যে কি পদার্থ, তা তিনি ঠিক্ নির্দ্দেশ করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর অপর বৈজ্ঞানিকেরা সেটাকে 'ঈথর' বলে নির্দ্দেশ করেছেন।

বিমান-যানে বে-তার গৃহ

এই উড়ো জাহাজখানির মধ্যে বেতার আলোকের সরঞ্জাম খাটানো রয়েছে, এর সাহায্যে আকাশে অনেক দূর উড়ে গেলেও যখন ইচ্ছে নীচের লোকের সঙ্গে কথা বলা চলবে।

হেন্‌রী হার্টজের উদ্ভাবিত যন্ত্র হতে বিনির্গত তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ দূরের সেই তারের কুণ্ডলীর বিযুক্ত মুখে ঠিক্‌রে ওঠার কারণ আর কিছুই নয়—ওই স্ফুলিঙ্গ-নির্গমন-জনিত একটা তড়িৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে শূন্যের উপর প্রবাহিত হতো এবং সেই ঢেউ গিয়ে পূর্ব্বোক্ত তারের মুখে আট্‌কে আবার একটি ছোট স্ফুলিঙ্গ হয়ে ঠিক্‌রে উঠ্‌তো! এই যে তড়িৎ-তরঙ্গ, এর গতি ঠিক আলোক-স্রোতের মতই দ্রুত, প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল হিসাবে ভ্রমণ করতে পারে!

দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প দিনের মধ্যেই হার্টজের মৃত্যু হয়। তিনি যে মানুষকে কি এক মহাসম্পদের সন্ধান দিয়ে গেছেন, এ কথা তিনি নিজে জেনে যেতে পারেন নি। ঐ যে তাঁর তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ-জনিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ শূন্যের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাওয়ার সংবাদ—ঐ থেকেই সর্ব্ব প্রথম বে-তার-বার্ত্তার জন্ম হয়, কিন্তু তিনি এ কথাটা কোন দিনই মনে কর্‌তে পারেন নি—যে তাঁর এই আবিষ্কারে নিখিল মানবের কি বিরাট কল্যাণ সাধিত হবে! বিদ্যুৎ-তরঙ্গ কিসের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে

এইটে স্থির কর্ব্বার জন্যেই তিনি এমন ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর পরীক্ষাগারে এ ঘর থেকে ও ঘরে ছুটে গিয়ে যে তড়িৎ-প্রবাহ সাড়া দিয়ে আসছে, সে যে দেশ থেকে দেশান্তরেও ছুটে যেতে পারে, এ তত্ত্বটি তাঁর মাথায় একবারও প্রবেশ করবার সময় পায়নি! অথচ তখন সুদূর ইটালির লেগহর্ণ সহরের এক স্কুলের এক বালক ছাত্রের মাথায় সে সন্ধান এসেছিল!

সমুদ্রকুলের বে-তার-ঘাঁটি

মার্কনী বলেন,—যেদিন প্রথম আমাদের ক্লাসের বিজ্ঞান-শিক্ষক এসে হার্টজের আবিষ্কৃত তড়িৎ তরঙ্গ প্রবাহের ব্যাপারটা আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, সেইদিনই তৎক্ষণাৎ এইটে আমার মাথায় এসে ঢুকেছিল যে এ যদি সত্য হয়, তবে ঘরে বসে আমি সকল দেশের সাড়া পাবনা কেন?

১৮৯৫ সালে তিনি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পরীক্ষা সুরু করেন। তাঁর আলোচনা শুধু বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে আবদ্ধ ছিল না—তিনি তামার তার আর যন্ত্র-পাতি নিয়ে বাইরে মাঠের উপর চলে এসেছিলেন,—সেখানে বড় বড় খোঁটা পুঁতে, তারই মাথায় তার লটকে ছোট বড় নানা আকারের ধাতু-নির্ম্মিত যন্ত্রের বাক্স এঁটে ক্রমাগত চেষ্টা করছিলেন, কি ক'রে তড়িৎ-প্রবাহকে দূর হতে আরও দূরে পাঠানো যায়। ১৮৯৬ খৃঃঅব্দে তিনি এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হয়ে তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে ইংলণ্ডে আসেন। তার পরের বৎসরেই ইংলণ্ডে একটি বে-তার-বার্ত্তা ও সঙ্কেত-বহ কোম্পানি (Wireless and Telegraph Signal Co Ld) স্থাপিত হয়। মার্কনীর নেতৃত্বে এই কোম্পানিই জগতে সর্ব্বপ্রথম বে-তার-বার্ত্তা-প্রেরণের সূচনা করে। তাড়িত-বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে উদ্ভাবিত বিদ্যুৎ-প্রবাহের এক অদ্ভুত শক্তিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের অসাধারণ কাযে লাগিয়ে তিনি জগতের সভ্যতাকে অনেকখানি উচ্চতর স্তরে তুলে দিয়েছেন। পৃথিবীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে আজ বিংশ শতাব্দীটা চিরস্মরণীয় হয়ে গেল—কারণ ১৯০১ সালেই মার্কনীর বে-তার-বার্ত্তাবহ যন্ত্র সর্ব্বপ্রথম অতলান্ত মহাসাগরের ওপারের সংবাদ এনে দিতে পেরেছিল। সংবাদটি কর্ণবাল থেকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে পাঠানো হয়েছিল। নির্ব্বিঘ্নে সে সংবাদ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে পৌছে সেখান থেকে আবার কর্ণবালে চক্ষের নিমেষে তার উত্তর এনে দিয়েছিল। এ খবর যখন চারিদিকে রাষ্ট্র হল, তখন এক বিপুল বিস্ময়ে বিশ্বের লোক চমৎকৃত হয়ে উঠ্‌ল!—কেউ কেউ ও কথা বিশ্বাসই করতে পারলে না! বৃদ্ধেরা বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বললেন, এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন জোচ্চুরি আছে! কিন্তু তরুণের দল এগিয়ে এসে নিজেরা হাতে-কলমে সব দেখে-শুনে এমন জোর গলায় এর প্রশংসা করতে লাগ্‌ল যে অবিশ্বাসীদের ক্ষীণ কণ্ঠ তাদের সমবেত জয়-ধ্বনিতে একেবারে চাপা পড়ে গেল! সমস্ত পৃথিবী

জুড়ে মার্কনীর নামে ধন্য ধন্য রব উঠ্‌তে লাগল! মানুষের বুদ্ধি আজ আবার প্রকৃতির একটা মস্ত বড় বাধাকে অতিক্রম ক'রে দেশ-কাল-জয়ী হয়ে গেল, এই গর্ব্বে মানুষ সেদিন নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ ক'রে পরম আত্ম-প্রসাদ লাভ করলে!

জাহাজে সংবাদ-গ্রহণ

জাহাজের বে-তার-ঘরে রাত্রে যেমন যেমন সংবাদ এসে পৌঁছচ্ছে বে-তার যন্ত্রীরা অমনি তৎক্ষণাৎ সেটা জাহাজের ছাপাখানা বিভাগে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

এইত গেল বে-তার-বার্ত্তার একুশ বছর আগেকার কথা! ১৯০১ সালের পর থেকে প্রতিবৎসরই নূতন নূতন দিক দিয়ে এই বে-তারের নব নব উন্নতি সংসাধিত হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটাই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর! অবশ্য এ কথা ভুল্‌লে চলবে না যে বে-তারের অগ্রণী মার্কনী বটে, কিন্তু আজ এই বে-তার-বিজ্ঞান যে রকম উন্নত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়েছে, সেটা কেবল ঐ একজনের চেষ্টায় হয়নি, অনেক দেশের অনেক বৈজ্ঞানিকের অনেক দিনের সাধনা ও চেষ্টার ফলে এমনটি হতে পেরেছে। মার্কনী-প্রবর্ত্তিত প্রথা ছাড়া বে-তার বার্ত্তা প্রেরণ ও গ্রহণের আজ আরও অনেক রকম উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে। মার্কনীর প্রথা হচ্ছে, শূন্যে প্রবাহিত তড়িৎ-তরঙ্গ ধরবার জন্য নদী সমুদ্রকূলে একটা কোনও ফাঁকা জায়গায় খুব দীর্ঘ কতকগুলি খুঁটি পুঁতে তার মাথার উপর তারের জাল বুনে রাখা। ঐ তারের প্রত্যেকটি বে-তার-বার্ত্তা-গ্রহণ-যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ঐ অদ্ভুত যন্ত্রটির সাহায্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে আসা সংবাদগুলি শব্দে রূপান্তরিত হয় এবং শিক্ষিত যন্ত্রী সেই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করে দেন। ঐ গগন-চুম্বী খোঁটাগুলোর উপরে বাঁধা তারের জাল যেন অদৃশ্য বাহু বিস্তার ক'রে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত দেশের সঙ্গেও আমাদের একটা গোপন সংযোগ স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছে, পরস্পরকে পরস্পরের সংবাদ আদান-প্রদানে অক্লান্তভাবে দিবারাত্রি সাহায্য করছে!

ছাপাখানায়

জাহাজের ভিতর ছাপাখানায় রাত্রে সংবাদপত্র ছাপা হচ্ছে।

একবার চোখের পাতা ফেল্‌তে যতটুকু সময় লাগে, তার চেয়েও শীগ্‌গির বে-তার-বার্ত্তা লণ্ডন থেকে নিউইয়র্কে গিয়ে পৌঁছতে পারে। আমেরিকায় কোন একটা কিছু বিশেষ ঘটনা ঘট্‌লে এক ঘণ্টার মধ্যে সে খবরটা বিলাতের সংবাদ-পত্রে ছাপা হয়ে যেতে পারে। বিলাতের কোন খ্যাতনামা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যদি আজ মারা

চায়ের টেবিল

সকালবেলা জাহাজের যাত্রীরা জাহাজের ভিতর চায়ের টেবিলে বসে জাহাজে ছাপা খবরের কাগজ পড়ছে।

অল্প দূরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই,—এখন একটা বে-তার ঘাঁটি থেকে পাঠানো তড়িত-তরঙ্গ যাতে ১২০০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়ে যেতে পারে, সেই রকম ব্যবস্থা হয়েছে, কাযে-কাযেই হার্টজের যন্ত্রের শক্তি অপেক্ষা কত সহস্র গুণ বেশী জোরের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, এটা বোধ হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করতে পারবেন। সেই জন্য আগেকার যন্ত্রটীও তদনুপাতে একটু বিরাট গোছের ক'রে নির্ম্মাণ করতে হয়েছে। তাই আজ,—যে অষ্ট্রেলিয়ায় সমুদ্র জাহাজে পৌঁছতে পাঁচ সপ্তাহ লেগে যায়,—উড়ো জাহাজে গেলেও তিন চার হপ্তার আগে যাওয়া যায় না—এমন কি তারের খবরও যেখানে সোজা গিয়ে পৌঁছবার উপায় নেই,—অনেকে ঘুরে দেরীতে গিয়ে পৌঁছয়—সেখানে এই বে-তার-বার্ত্তা আজ চক্ষের নিমেষে গিয়ে হাজির হচ্ছে!

জাহাজে চড়ে যাদের প্রায়ই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হয়, দীর্ঘকাল সহরের মুখ দেখতে না পেয়ে সমুদ্র-বক্ষে জাহাজের খোলের মধ্যেই আট্‌কে থেকে তাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। চারিদিকে ক্রমাগত জল দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের মন অবসন্ন হয়ে যায়, আর দেশের

যান, তাহলে সেই মুহূর্ত্তেই এক সেকেণ্ডের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যে যে সহরে বে-তারের ঘাঁটি (wire-less station) আছে, সেইখানেই সে খবর গিয়ে পৌঁছবে!

তড়িৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করবার অন্য উপায় পরে উদ্ভাবিত হওয়া সত্ত্বেও হার্টজ যে স্ফুলিঙ্গ-নির্গমনকারী যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, তার কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকায় এখনও অনেক দেশে সেই প্রথার অনুসরণেই বে-তার-বার্ত্তার কায চলছে, তবে হার্টজের নির্ম্মিত যন্ত্রের অনেক অদল-বদল ক'রে নিতে হয়েছে; কারণ এখন আর সেটা এ ঘর থেকে ও ঘরে পাঠানোর মত
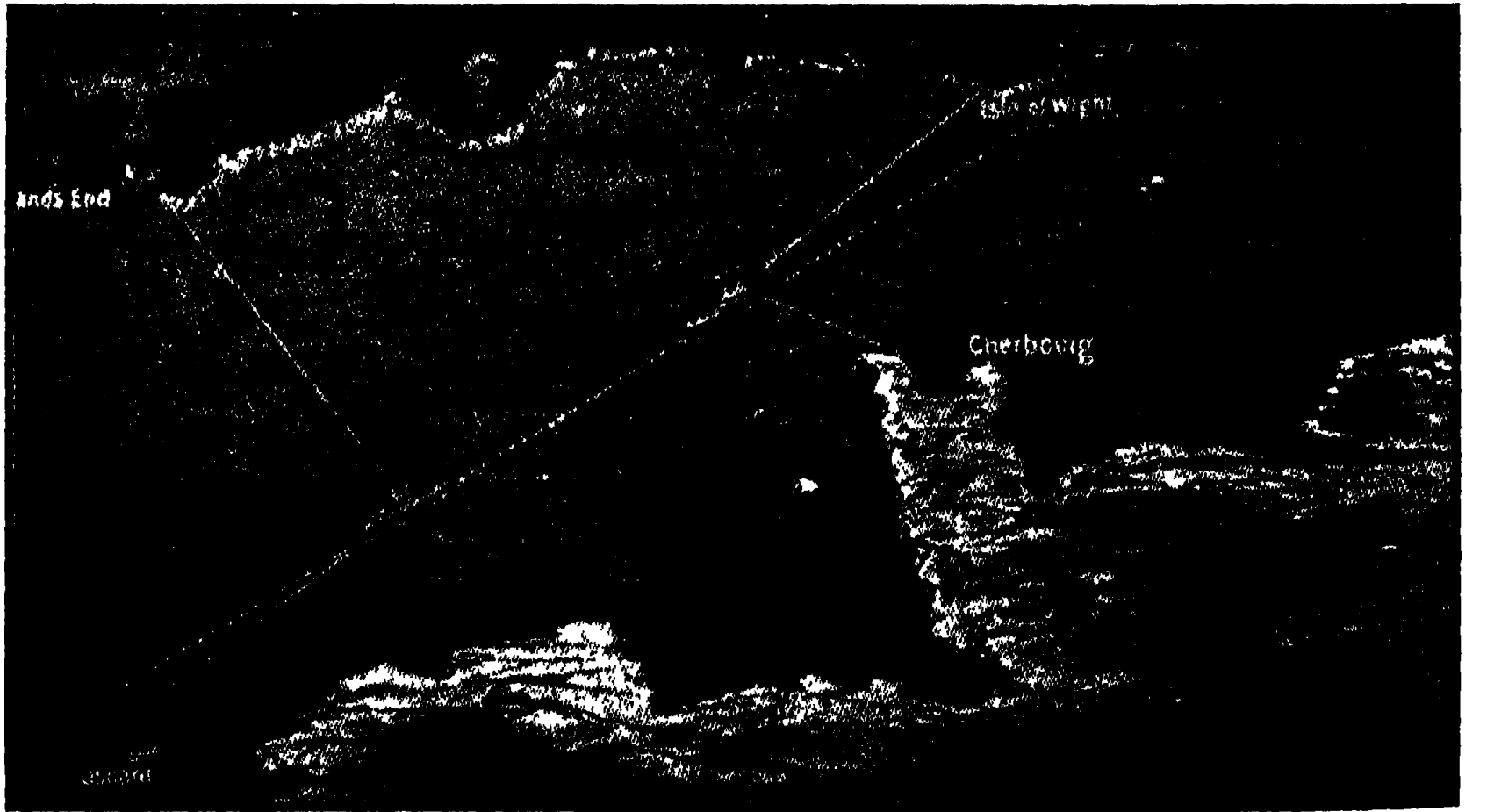
পথ-হারা পোত

কুয়াসা-ঢাকা মেঘলা দিনের অন্ধকারে জাহাজ পথ চিন্‌তে না পারলে আশ-পাশের বে-তার ঘাঁটি তার পথ নির্দ্দেশে যে তাকে কতদূর সাহায্য করে, এই ছবিখানি দেখলেই সেটা বুঝতে পারা যাবে।

সমস্ত রাত ধ'রে খবরের কাগজ ছাপার কাজ চলে, ভোর বেলা জাহাজের আরোহীরা সকলেই ঠিক বাড়ীর অভ্যাসের মতই চায়ের পেয়ালার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিত্য-নৈমিত্তিক খবরের কাগজ পড়ার সুবিধাটুকুও ভোগ করতে পান্।
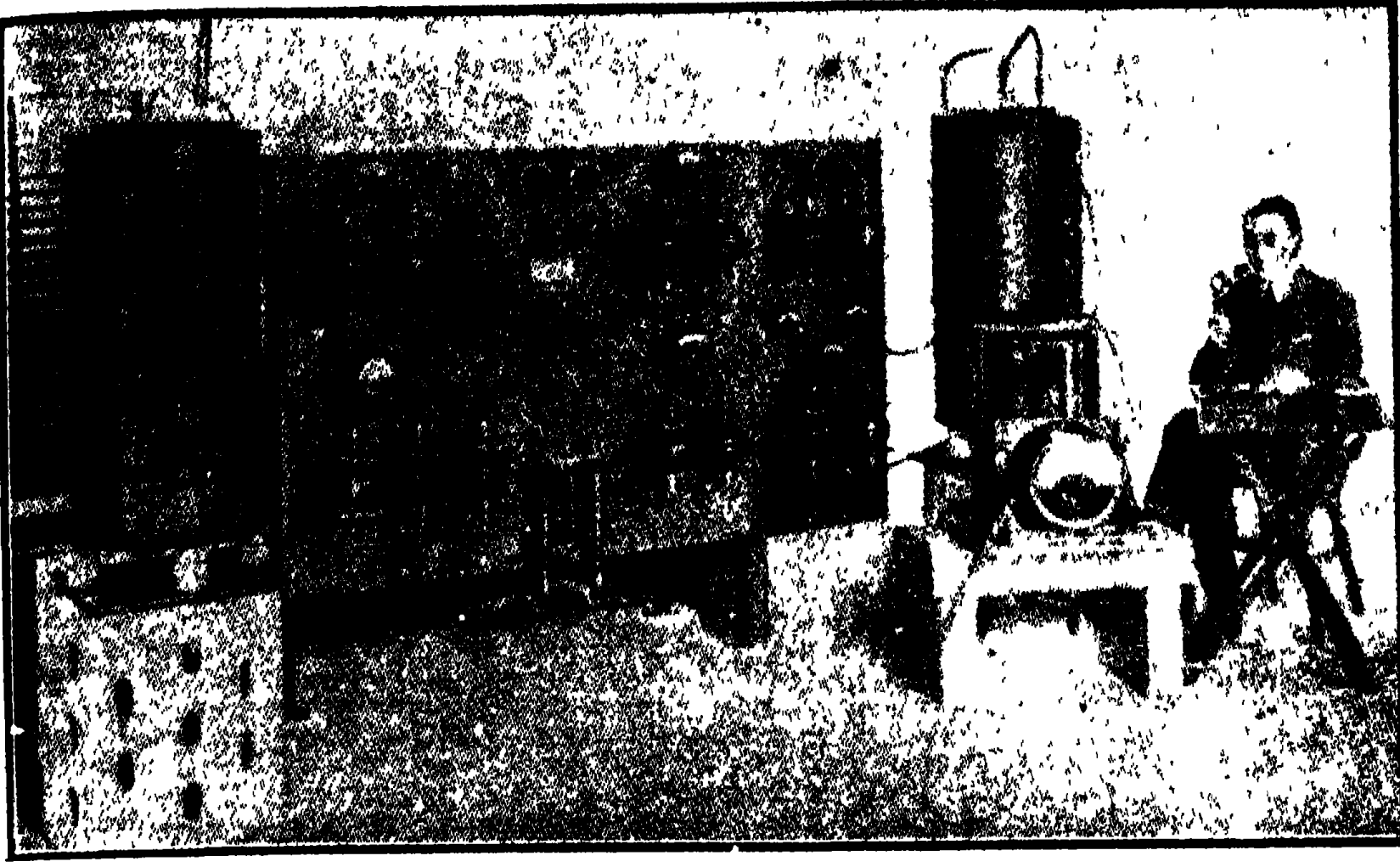
বে-তার-আলাপ বড় ঘাঁটি

এই বিরাট বে-তার আলাপের যন্ত্র সাহায্যে হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষের সঙ্গেও কথা কওয়া চলে।

আমরা অনেকেই জানি যে জাহাজের কর্ণধার নাবিকেরা সূর্য্য ও নক্ষত্রের সমাবেশ লক্ষ্য ক'রে জাহাজের গতি নির্ণয় করে, কিন্তু অনেক সময় এমন ঘন কুয়াশা-ঢাকা নিরবিচ্ছিন্ন মেঘলা দিন আসে যে সূর্য্য বা তারকার চিহ্নমাত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ঐ সময় অধিকাংশ জাহাজের দিক্ ভ্রম হয়, প্রায়ই তারা বিপথে পড়ে, না হয়ত চড়ায় বা চোরা-পাহাড়ে ঠেকে জলমগ্ন হয়! কিন্তু আজকাল বে-তার-বার্ত্তার কল্যাণে তাদের আর সে রকম বিপদে কখনো পড়তে হয় না,—কারণ যখনই দরকার হয়, তখনই তারা বা বহির্জগতের কোন খবর জান্‌তে না পেরে তারা অত্যন্ত হাঁফিয়ে ওঠে, কিন্তু বে-তার-বার্ত্তা উদ্ভাবিত হওয়ার পর থেকে তাদের কষ্টের অনেক লাঘব হয়েছে! তারা এখন প্রতিদিন জাহাজে বসেই দেশের হাত-নাগাত সব খবর পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ছে! জাহাজের নাবিকেরাও তাদের বিপদে বে-তারে অপ্রত্যাশিত সাহায্য পাচ্ছে—কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্রের মাঝখানে দিঙ্-নির্ণয় করতে না পার্‌লে এই বে-তার বার্ত্তা তাদের পথ নির্দ্দেশ করে দিচ্ছে! এই বে-তার বার্ত্তার কল্যাণে এখন আর তারা সাগরের বুকে অসহায় অবস্থায় ভেসে বেড়ায় না, প্রতিদিনই তারা দূরের বা নিকটের—অগ্রবর্ত্তী বা পশ্চাদগামী-যে কোন জাহাজের সঙ্গে—আশে পাশে যত বন্দরের সঙ্গে—এমন কি আকাশ-পথে উড়ে-যাওয়া বিমান যানের সঙ্গেও একটা ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চল্‌ছে!

কর্ণবাল প্রদেশের পোল্‌ধু অঞ্চলে মার্কণীর যে বে-তার-ঘাঁটি আছে, প্রতিদিন রাত্রে সেখান থেকে সমস্ত দিনের যা কিছু খবর সেগুলি জড় ক'রে জাহাজের উদ্দেশে পাঠানো হয়; সমুদ্রের উপর থেকে জাহাজের বে-তার যন্ত্রীরা সেই সংবাদগুলি ধ'রে লিখে নিয়ে তখনি জাহাজের ছাপাখানা বিভাগে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে

নৌ-বিহার 'বে-তার'

সহরের রঙ্গমঞ্চে গান হচ্ছে, কিন্তু গানটা বেতারে বাইরেও পাঠানো হবে শুনে এরা দুই বন্ধু সেখানে না ঢুকে সহরের বাইরে নদীর ওপর বেড়াতে বেড়াতে বে-তার-যোগে সেই গান শুনছে। ভিজে সুতো বাঁধা একখানা ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়ে এরা বেতার বিদ্যুৎ-প্রবাহ আকর্ষণের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে।

জাহাজে 'বে-তার'

বন্দর আপিস থেকে জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে বেতার আলাপে একটা প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে, জাহাজ হয়ত তখন বন্দর ছেড়ে অনেক মাইল দূরে চলে গেছে

মোটর গাড়ীতে 'বে-তার'

ইনি একজন বড় ডাক্তার। নিজের মোটর গাড়ীতেই বে-তার-বার্ত্তার সরঞ্জাম লাগিয়ে নিয়েছেন; বাড়ীতে কোন ডাক এলো কি না, সেটা তিনি গাড়ীতে বসেই জান্‌তে পারেন।

বেতার লিপিযন্ত্র
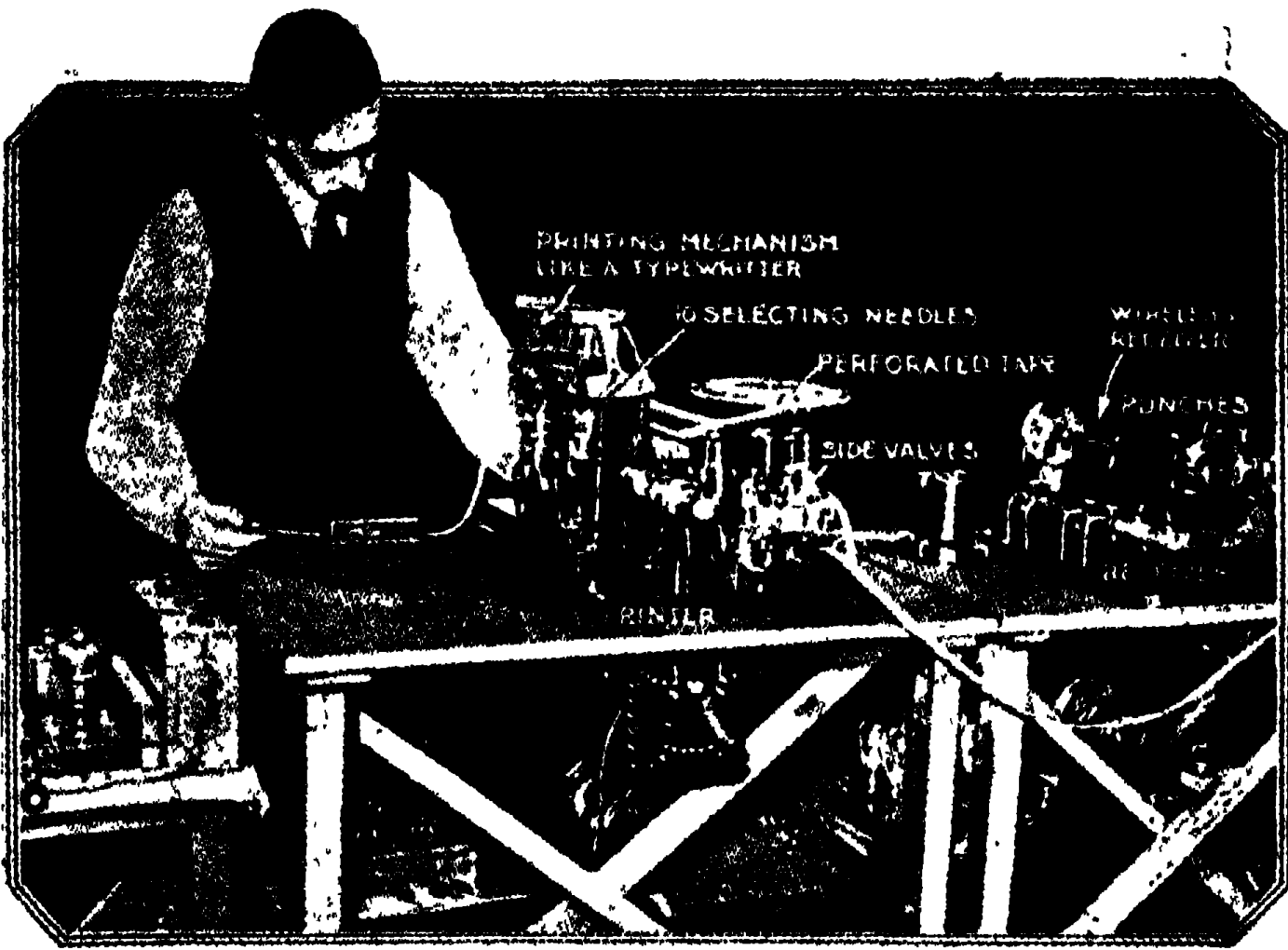
যে কোন সাঙ্কেতিক ভাষাতেই বেতারবার্ত্তা আসুক না এই নব-উদ্ভাবিত বে-তার লিপিযন্ত্রে আপনা-আপনিই সেটা ছাপা হয়ে যাবে। বে-তার যন্ত্রীকে আর সেজন্য পরিশ্রম করতে হবে না।

কাছাকাছি কোন একটা বেতার ঘাঁটিতে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠায়, যে নিরক্ষ বৃত্তের উত্তর দক্ষিণ বা পূর্ব্ব পশ্চিমে কতটা দূরে তারা রয়েছে। সেই ঘাঁটির যে বেতার যন্ত্রী—সে তার যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই বুঝ্‌তে পারে যে কোন্ দিক থেকে আর কত মাইল তফাৎ থেকে এই প্রশ্ন ভেসে আস্‌ছে, তখন সে একখানি সমুদ্রের নক্সা দেখে অনায়াসে জাহাজের প্রকৃত অবস্থান নির্দ্দেশ ক'রে দেয়। বেতার-বার্ত্তার সাহায্যে জাহাজ পরিচালন করা এত সহজ হয়ে গেছে, যে এখন চোখ বুজিয়ে অন্ধকারের মধ্যেও জাহাজ এসে যে কোন ছোট অল্প-পরিসর বন্দরে ঢুকে জেটিতে ভিড়্‌তে পারে।

বেতার-বার্ত্তার নানা অদ্ভুত শক্তি করায়ত্ত করে মানুষ যতটা বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিল, তার চেয়েও ঢের বেশী খুসি হ'ল যখন সে ঐ বেতার-বার্ত্তা থেকে ক্রমে বেতার-আলাপ (wireless telephone) করবার সন্ধানটাও পেলে! বাড়ী ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে এলেও এখন আর বাড়ী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে হয় না,—যেখানেই যাওনা কেন, বেতার তোমার পরিবারের সঙ্গে যোগ রক্ষা করবে। স্ত্রী বা পুত্র-কন্যার সঙ্গে যেদিন যখন ইচ্ছা বেতার-আলাপে তুমি কথাবার্ত্তা কইতে পারবে। প্রচলিত তারের আলাপে (ordinary telephone) যত না কথাবার্ত্তার সুবিধা, বেতার আলাপে তার চেয়ে ঢের বেশী সুবিধা হয়েছে, কারণ বেতারে কথা বেশ স্পষ্ট শোনা যায় এবং গলার স্বরও বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। বেতার আলাপে আমরা এখন লণ্ডন থেকে রোম, কিম্বা বার্লিন থেকে প্যারির লোকের সঙ্গে অনায়াসে কথা কইতে পারি; ঘরে বসে আমরা উড়ো জাহাজে অবস্থিত কোন আকাশ-বিহারী অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে অথবা দূরদেশগামী কোন রেলযাত্রী বা জাহাজের আরোহী আত্মীয়ের সঙ্গে অনায়াসে কথা কইতে পারি। কিন্তু এ ব্যাপারটা এখনও অনেকের কাছে আরব্য উপন্যাসের গল্পের চেয়েও গাঁজাখুরি বলে মনে হয়। তারা হাতে-কলমে কোন জিনিস না দেখ্‌লে বিশ্বাস করতে চায় না। আমাদের দেশ এ-সব শুনেই বিশ্বাস করে নেয় বটে, কিন্তু এর জন্যে পশ্চিমকে বাহবা দিতে চায় না। আমরা নাক সিঁট্‌কে বলি, ও আর এমন কি ওরা বিশেষ একটা নতুন কীর্ত্তি করেছে! ও-সব ভারতবর্ষে এককালে ঢের হয়েছিল! সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেখাতেও ছাড়িনে।

বেতার আলাপের যন্ত্রে যে কাঁচের বৈদ্যুতিক বাতিগুলি আঁটা থাকে, সেইগুলিই আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মতো কোন্ মায়া-দৈত্যের প্রভাবে শত শত যোজন তফাতের দুই অদর্শন-ব্যাকুল বিচ্ছেদ-কাতর অন্তরের মুহূর্ত্তে যোগ সাধন ক'রে তাদের পরস্পরের মধুর আলাপের সুযোগ ক'রে দিয়ে জগৎকে আজ বিস্মিত আনন্দিত ও চরিতার্থ করছে! এই অঘটন-সংঘটন-কারী বৈদ্যুতিক বাতিগুলোর কাঁচের ফানুষ সাধারণ তাড়িত-দীপের তুলনায় আকারে একটু বড় বটে, কিন্তু দেখ্‌তে একই রকম। কেবল প্রভেদের মধ্যে এগুলোর ভিতরে তারের জাল বোনা থাকে

জলে স্থলে বে-তার

ডাক্তার লী ডি, ফরেষ্ট সমুদ্রে একখানি যুদ্ধ-জাহাজের নৌসেনাদের কাছে একটা বক্তৃতা করেন। ঠিক ঐ সময়ে নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারেও হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে বেতার যোগে তাঁর ঐ বক্তৃতা শুনেছিল। যুদ্ধ জাহাজ থেকে ডাক্তার ফরেষ্টের বক্তৃতা বেতার বার্ত্তা প্রবাহে ভেসিয়েত্রনে টাইমস স্কোয়ারের শ্রোতাদের শোনাবার জন্য সেখানে প্রথম একটি তারের বড় জাল খাটাতে হয়েছিল তারপর একজন বেতার যন্ত্রী একটা প্রকাণ্ড শিঙের ভেতর দিয়ে ডাক্তারের বক্তৃতা শ্রোতাদের কর্ণগোচর করে দিয়েছিল।

আর এক-এক টুকরো ধাতু-নির্ম্মিত পাত সংযুক্ত থাকে। ঐ তারের জাল আর ধাতুর পাতটুকু আঁটা থাকায়—ঘরের বিজলী-বাতি আজ শুধু আলো দিয়েই ক্ষান্ত নয়—আলোর সঙ্গে আলাপের সুবিধাও ক'রে দিয়েছে! কারণ এই বাতির ভিতর দিয়েই প্রবল তাড়িত তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে শব্দকে দূরে বহন ক'রে নিয়ে যায়। এই বাতির সাহায্যে বেতারে এমন জোর সাঙ্কেতিক শব্দ ধ্বনিত করা সম্ভব যে একটা প্রকাণ্ড হলের ভিতরের সমস্ত লোক সে আওয়াজটা স্পষ্ট শুন্‌তে পাবে। তারের জাল ও ধাতুর পাত সংযোগে বিজলী-বাতির কাঁচের ফানুষের এই আশ্চর্য্য রূপান্তর মানুষের আর এক অদ্ভুত কীর্ত্তি! বিশেষ ক'রে এগুলোর বেতার-বার্ত্তা গ্রহণের শক্তি এত বেশী—যে এখন আর শূন্যে প্রবাহিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধরবার জন্য মার্কনী সাহেবের সেই আকাশ-ছোঁয়া খোঁটা আর লম্বা লম্বা তারের ফাঁদ পেতে রাখবার দরকার হচ্ছে না! কেবল খানিকটা তার গোল
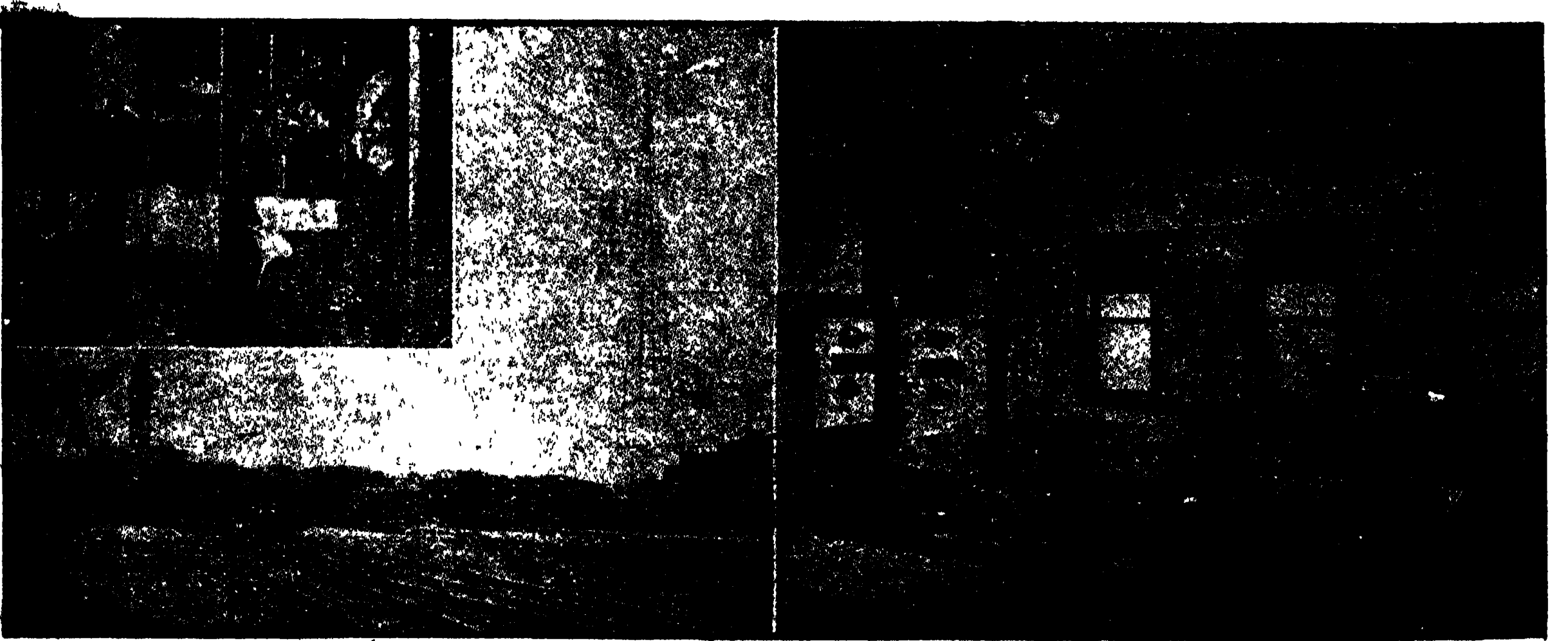
রেলওয়ে ষ্টেশনের বেতার ঘাঁটি

রেলগাড়ীতে বেতার

ক'রে গুটিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা কাঠের কাঠামোয় ঝুলিয়ে রাখলেই শূন্যে তরঙ্গায়িত বেতার বার্ত্তা প্রবাহকে ওই বাতি-সংযুক্ত বেতার আলাপের যন্ত্র চুম্বকের মত আকর্ষণ ক'রে আনে। ঐ বিজলী বাতি আঁটা বেতার-বার্ত্তাগ্রাহী আস্‌বাবের সঙ্গে কাঠের ফ্রেমে জড়ানো খানিকটা তার সঙ্গে নিয়ে যদি মোটর গাড়ী ক'রে বেড়াতে যাওয়া হয়, তাহলে পথে যেতে যেতেই এমন কি সহরের বাইরে চলে গেলেও সহরের সব খবর রাখ্‌তে পারা যায়। লণ্ডন বা নিউইয়র্কের বড় বড় ডাক্তার, চারিদিক থেকে অনবরত যাঁদের ডাক্‌ আসে, তাঁরা অনেকেই নিজেদের মোটর গাড়ীতে এই বেতার যন্ত্র এঁটে নিয়েছেন, প্রতিবার বাড়ী ফিরে আর তাঁদের ডাকের সন্ধান নিতে হয় না, পথে গাড়ীতে বসেই পরের ডাকের খবর পান!

বেতারের আর একটা কায হচ্ছে, জাহাজের কর্ণধারদের নির্ভুল সময় নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া। সমুদ্র-পথে জাহাজ পরিচালন-কালে নাবিকদের সময়ের অতি সূক্ষ্মতম অংশটুকুও সঠিক জান্‌বার একান্ত দরকার হয়। তাই জাহাজের ঘড়ির একেবারে পল, অনুপল, বিপল পর্য্যন্তও কাঁটায় কাঁটায় নির্ভুল মিল হওয়া চাই, সেই জন্যে চতুর্দ্দিকের বন্দর সন্নিকটস্থ বেতার ঘাঁটি থেকে দিনে দু'তিনবার ক'রে জাহাজের উদ্দেশে নির্ভুল সময়-নির্দ্দেশক সঙ্কেত পাঠানো হয়। প্রত্যেক প্রসিদ্ধ মান-মন্দিরের সময়-নিরূপণ যন্ত্রের সঙ্গে বেতার-বার্ত্তা-প্রেরক যন্ত্রের এমন ভাবে সংযোগ স্থাপন ক'রে রাখা হয়—যে ঘড়ির কাঁটা কোন নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার উপর এসে দাঁড়ালেই আপনা হ'তে বেতার-বার্ত্তা যন্ত্রের কাজ সুরু হ'য়ে যায় এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি 'বিন্দু' এসে জাহাজের বেতার যন্ত্রীর ঘরে ঠিক সময়টি জানিয়ে দেয়। 'বিন্দু' ও 'রেখার' সমষ্টিই হচ্ছে বেতার বার্ত্তার গোড়াকার সাঙ্কেতিক ভাষা। এখন আরও অন্যান্য নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা এমন কি বেতারের বর্ণমালা পর্য্যন্ত প্রচলিত হয়েছে! নব-উদ্ভাবিত বেতারবার্ত্তা যন্ত্রে যন্ত্রীরও প্রয়োজন নাই, কলে আপনিই সংবাদ গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছে। অবশ্য এ কথা বলা বোধ হয় বাহুল্য মাত্র যে বেতার-আলাপে এই বিন্দু ও রেখা সম্বলিত বা অন্য কোন প্রকার সাঙ্কেতিক ব্যবহারের কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ 'বেতার আলাপে' মানুষ যে যার নিজের ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কইতে পাবে। জাহাজে দিনে দু'তিনবার ক'রে যখন বেতারে ঐ সময়-জ্ঞাপক 'বিন্দু' সঙ্কেতটি আসে, তখন প্রতিবারই 'টুক্‌' ক'রে একটি মৃদু শব্দ হয়, জাহাজের কৌতূহলী যাত্রীরা অনেকেই মনোযোগী হ'য়ে কান পেতে রেখে সে শব্দটা স্পষ্ট শুন্‌তে পায়। সঠিক সময়ের এই সঙ্কেত পাবামাত্র অমনি জাহাজের

বেতার ঘড়ি

এই বেতার-পরিচালিত ঘড়িটিতে সিকি সেকেণ্ড সময়ও কখনও ভুল হয় না।

'ক্রনোমিটার' ঘড়িটি সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক ক'রে নেওয়া হয়। অনেক সময় জল, ঝড়, দম্‌কা বাতাস, ঘূর্ণী হাওয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সংবাদও বেতার যন্ত্রযোগে জাহাজে পাঠানো হয়—যাতে জাহাজের কর্ণধারেরা পূর্ব্বাহ্ণেই সেটা জান্‌তে পেরে জাহাজখানাকে বাঁচিয়ে সেগুলো এড়িয়ে চল্‌তে পারেন।

বেতার-বার্ত্তার ব্যাপারটা যাঁরা ঠিক বুঝ্‌তে চান, এটা তাঁদের সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে যে বেতার তরঙ্গ হাওয়ার উপর ভেসে দেশ থেকে দেশান্তরে প্রবাহিত হয় না, হাওয়ার চেয়েও পাতলা একটা স্তর,—যাকে বৈজ্ঞানিকেরা 'ঈথর' নামে অভিহিত করেন, সেই 'ঈথরের' উপরই তরঙ্গায়িত হ'য়ে বেতার-বার্ত্তা চক্ষের নিমেষে দেশ থেকে দেশান্তরে প্রবাহিত হ'য়ে যায়।

হাওয়ার অস্তিত্ব আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারি, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েও মানুষ ঈথরের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বহু চেষ্টায় কেবল এইটুকু মাত্র জান্‌তে পেরেছেন যে ওটা হাওয়ার চেয়েও হাল্‌কা অতি স্বচ্ছ ও সূক্ষ্মতম একটা পদার্থ এবং সেটা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ওতঃপ্রোতো ভাবে বিরাজ করছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই 'ঈথরের' অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'ঈথরের' মতো কোন পদার্থ শূন্যে আছে কি না তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না! প্রাচীন বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এখনও তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে বলেন—যে যখন শূন্যে বায়ুতরঙ্গ, অলোকতরঙ্গ ও বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রভৃতি প্রবাহিত হতে দেখ্‌চি—তখন কি ক'রে 'ঈথরের' অস্তিত্ব অস্বীকার কর্ব্ব! তরঙ্গ ত' আর শূন্যে উত্থিত হতে পারে না! সমস্ত শূন্য পূর্ণ করে-এমন একটা কিছু অদৃশ্য অননুভূত পদার্থ আছে—যেটাকে অবলম্বন ক'রেই সব তরঙ্গ-হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে, অতএব যতদিন না সুনিশ্চিত ঠিক হচ্ছে যে সেটা কি, ততদিন আমরা ওটাকে 'ঈথর' নামেই অভিহিত করবো।

পূর্ব্বেই বলেছি আলোক-তরঙ্গ ও বেতার-বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল ভ্রমণ করে। উপরোক্ত তরঙ্গ ছাড়া অন্যান্য তরঙ্গও ঈথরের উপর প্রবাহিত হতে দেখা যায় এবং সে তরঙ্গগুলিই ওইরূপ ভীষণ বেগে ছোটে। আলোক ও উত্তাপও ঐ ঈথরের তরঙ্গ-প্রসূত। এখানে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—যে কোন কোন তরঙ্গের ফলে আলোক, কোন কোন তরঙ্গের ফলে উত্তাপ, আবার কোন কোন তরঙ্গের ফলে তাড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয় কেন? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে তরঙ্গের হ্রস্বতা ও দৈর্ঘ্যের অনুপাতেই এই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। বেতারবার্ত্তা-বাহী বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যন্ত্রের শক্তি-অনুযায়ী ৪০০ ফুট থেকে আরম্ভ করে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। যেতে পারে। জাহাজের বেতার-বার্ত্তা-প্রেরক যন্ত্র থেকে প্রায়ই ২০০০ ফুট লম্বা তরঙ্গ নিঃসৃত হয় কিন্তু নদী বা সমুদ্র কূলের বড় বড়
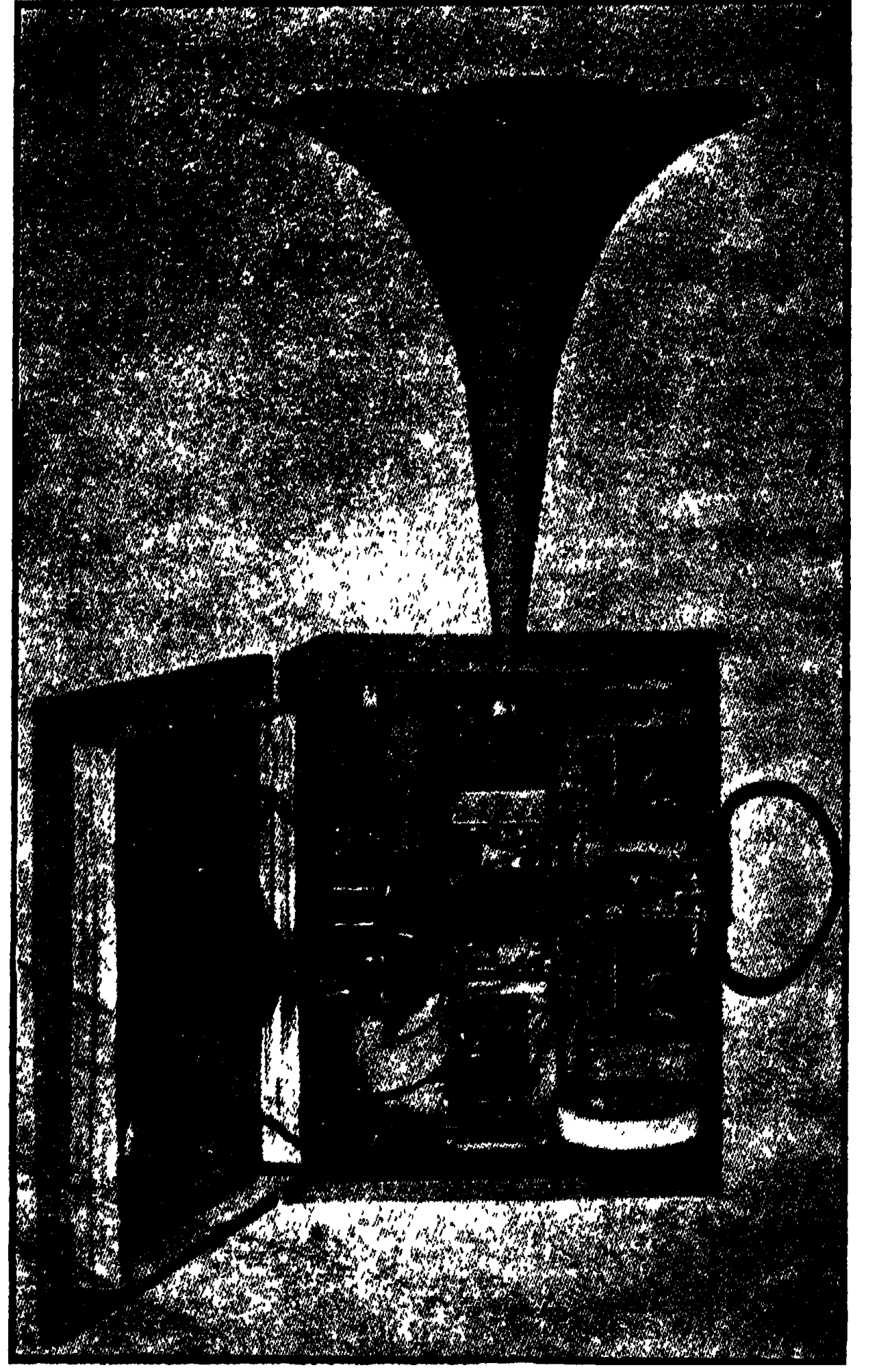
বেতার শ্রবণ-যন্ত্র

এই যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে বসে ১৫।২০ মাইল দূর থেকেও গান বাজনা বক্তৃতা—বা কথাবার্ত্তা শোনা যায়।

বেতার ঘাঁটি থেকে ১০।১২ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ তরঙ্গও উত্থিত হচ্ছে! ঈথরের যে তরঙ্গ থেকে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, সেগুলি এত ছোট ছোট যে তার পরিমাপ সাধারণ অঙ্কের দ্বারা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তরঙ্গগ্রাহী বেতার যন্ত্রেও এগুলি ধরা যায় না। আলোকবাহী তরঙ্গ আবার উত্তাপবাহী তরঙ্গ অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর, সুতরাং তার পরিমাপ বোঝানো আরও কঠিন। উহা এক ইঞ্চিরও নাকি কত লক্ষ-কোটীতম ভাগের চেয়েও কম! ঈশ্বরের তৈরি এই মানুষের চোখ দুটি ছাড়া আজ পর্য্যন্ত এমন কোন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয় নি—যার দ্বারা এই ক্ষুদ্রতম অলোক-তরঙ্গগুলি
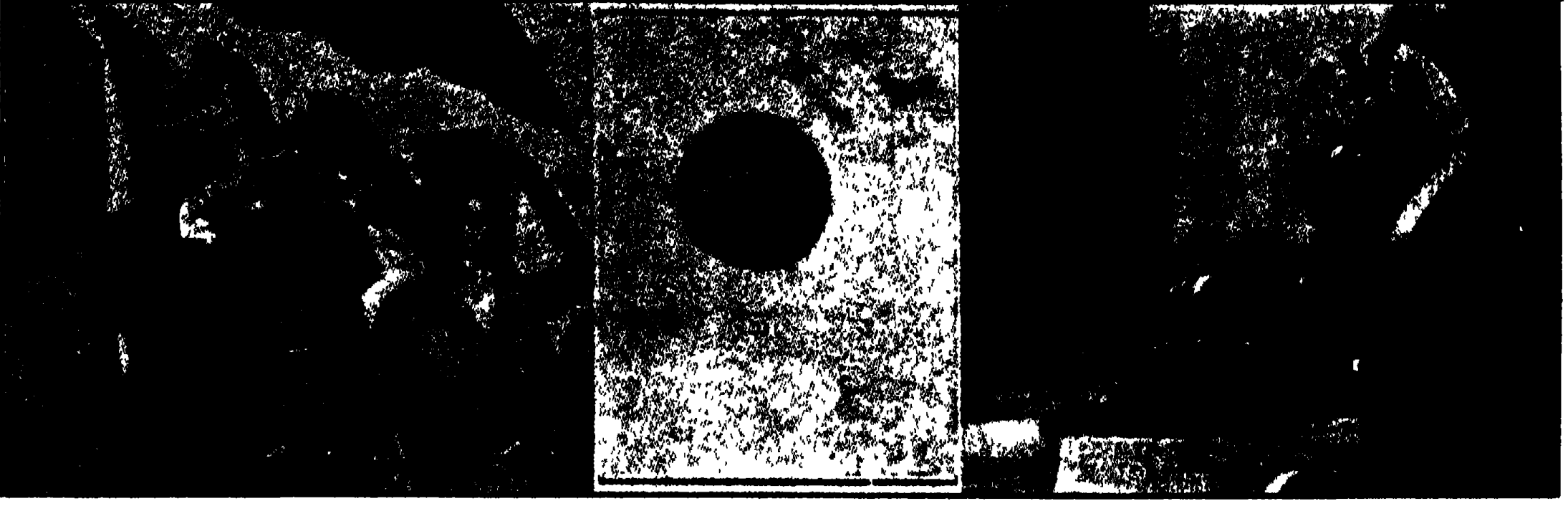
বেতারে বিবাহ

একজোড়া খামখেয়ালী বর-কনে বেলুনে চড়ে বিয়ে করছে। কিন্তু পুরোহিত ঠাকুর বুড়োমানুষ, বেলুনে চড়তে রাজি হন নি; তিনি তাঁর গির্জ্জেয় বসে বেতারে মন্ত্র পড়ছেন, আর বর-কনে আকাশে উড়তে উড়তে বেতারে সেই মন্ত্র শুনে পরস্পরের সঙ্গে পরিণীত হচ্ছে।

ধরা যেতে পারে! বেতার-বার্ত্তা-বাহী তরঙ্গের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে কোন রকমের কিছু বাধা একে আটকাতে পারে না! কিন্তু আলোক ও উত্তাপের তরঙ্গকে সহজেই বাধা দিয়ে আটকানো যায়। বেতার-বার্ত্তা বাহী তরঙ্গ, পর্ব্বত, বৃক্ষরাজি, বড় বড় অট্টালিকা, সমস্ত বাধাই ভেদ ক'রে প্রবাহিত হতে পারে। এই সুবিধাটুকু থাকার জন্যেই আমরা ঘরের ভিতর বসেও বেতার-বার্ত্তা শ্রবণ করতে পারি। কোন কোন সৌখীন লোক নিজের পকেটের মধ্যেই ছোট ছোট বেতার-বার্ত্তা-গ্রাহী আস্‌বাব নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা হাতের ছড়িতে খানিকটা তারের কুণ্ডলী লটকে সেটাকে শূন্যে প্রবাহিত বেতার-বার্ত্তার তরঙ্গ আকর্ষণ করে নেবার খোঁটা-স্বরূপ ব্যবহার করেন। মেয়েরাও অনেকে তাঁদের মাথায় দেওয়া খোলা ছাতার গায়ে তার জড়িয়ে আর হাতের সেই হাত ব্যাগের মধ্যে বেতার-বার্ত্তা-গ্রাহী যন্ত্রটি ঝুলিয়ে নিয়ে বেশ পথে বেড়াতে বেড়াতেই বেতার-বার্ত্তার সুযোগ উপভোগ করেন।

এমন দিন আস্‌ছে, যখন বড় বড় জাহাজ মাল আর আরোহী নিয়ে সমুদ্র ছেড়ে কেবল আকাশ-পথেই বায়ুতরঙ্গের উপর যাতায়াত করবে। সঙ্গে সঙ্গে বেতার বার্ত্তার কল্যাণে বোধ হয় পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাফ অফিস গুলি সব উঠে যাবে, কারণ যে লোক—যতদূরেই থাকুক না কেন, তাকে পত্র লেখবার বা 'তার' করবার আর প্রয়োজন হবে না। যখন ইচ্ছা, বেতার আলাপে তার সঙ্গে যেখান থেকে খুসি কথা কওয়া চল্‌বে। ভবিষ্যতে বেতার-বার্ত্তা থেকে মানুষের আরও কত রকমের যে কত কি সুবিধা হতে পারে তা' বলে শেষ করতে পারা যায় না। প্রতিবৎসরই আমরা বিনি তারের নূতন নূতন সুরের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়্‌ছি! বৈজ্ঞানিকেরা আশা ক'রছেন ক্রমে এই বেতার-বার্ত্তা-প্রবাহের সাহায্যেই পৃথিবীর সমস্ত কায-কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত হবে!

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

টবের গাছ

বন্দী আমি বারেন্দাতে টবের চারাগাছ,
খাঁচায় পোষা ময়না-পাখী, চৌবাচ্চার মাছ,
উজল রবি-চন্দ্র-করে
নাই নীলাকাশ মাথার 'পরে
পাইনে হাওয়া পাইনে শিশির পাইনে আলোর আঁচ!

মায়ের বুকের স্তন্যরসের অধিকারী নই
মাতৃহারা শিশুর মত দাইয়েব কোলে রই।
বোতল-ভরা দুধের মত,
ঝারির বারি পাই যা' যত
তাতে আপন মায়ের দুধের তৃষ্ণা মিটে কই?

আহা, যদি ঐ মাটীতে নীল আকাশের তলে
একটুখানি জায়গা পেতাম তরুলতার দলে,
আহ্লাদে তার অসীম আশায়
আলো-হাওয়ার ভালোবাসায়
ঝনঝনিয়ে বেড়ে যেতাম, শোভন ফুলে ফলে।

আহা, যদি ঐ কাননে একটু পেতাম ঠাঁই,
ঘনশ্যামল হর্ষে যথা দুলছে সকল ভাই,
শাখায় শাখায় গলাগলি,
মনের কথা বলাবলি
কতই হতো, ভাবতে গেলে পুলকে চম্‌কাই!

বনের পাখী শাখায় বসি গাইত কত গান,
কুলায় রচি করত মুখর আমার শ্যামল প্রাণ,
হয়ত কোনো লতা মোরে
জড়াইত বাহুর ডোরে,
বিতান রচি করত তাতে মৌচাকো-নির্ম্মাণ।

জানি আমি করকাঘাত, গ্রীষ্মদাহ, ঝড়,
শ্রাবণধারা সহ্য করা কঠিন, জানি, বড়।
জানি আমি ঝড়ের দাপে
ভাঙে শাখা, পরাণ কাঁপে,
তবু সকল দুখেও স্বাধীন জীবন প্রিয়তর।

ছিঁড়ত পাতা ভাঙত শাখা; নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
দপ্‌দপিয়ে ছুটত শোণিত আনন্দ-উচ্ছ্বাসে।
ভেঙে-চুরে দ্বিগুণ জোরে
অটুট জীবন উঠত গড়ে'
সকল ক্ষতি ডুবিয়ে দিতাম প্রচণ্ড উল্লাসে।

স্বপ্ন সবি—ও-সব কথা বলে' কি আর হবে?
বামন-জীবন বইতে হবে গণ্ডী-ঘেরা টবে।
বাধা পেয়ে শিকর যথা
ফিরে এসে জানায় ব্যথা,
জানি না এ টবের জীবন শেষ হবে বা কবে!

তবু আমায় হাসতে হবে, নেইক পরিত্রাণ,
উৎসবেতে করতে হবে আনন্দেরি ভাণ।
বুকের রুধির নিঙ্‌ড়ে হেসে,
ফুল ফুটাতে হবে শেষে,
সব দণ্ডের চেয়ে ইহাই কাতর করে প্রাণ!

শ্রীকালিদাস রায়।

ভুল ভাঙা

(গল্প)

ঠিক আমার পাশটিতে এসে সে দাঁড়িয়েছিল,—সেদিন তাকে চিন্‌তে পারিনি। আমি তখন কোন্ স্বপ্নের মোহময় সাগরে আপনাকে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। আমাকে ধরা-ছোঁয়া তখন বাস্তব জগতের কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। ছেলেবেলা থেকে উপন্যাসের কল্পনা-জগতের সোনার কাঠি আমায় যে-স্বপন-পথের পথিক করেছিল, ভেবেছিলাম, সেই স্বপনই বুঝি সত্য, আর এই বাস্তব জগৎ, এই মাটির জগৎ —এ বুঝি মিথ্যা! আমি সেই স্বপনের ঘোরেই খুঁজে বেড়াতাম আমার মনের মানুষকে। ভাবতাম, উপন্যাসেরই মত এক জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে উপন্যাসেরই এক রাজপুত্র এসে বুঝি আমার হাত ধরে দাঁড়াবে! আর তার মোহন কণ্ঠের মোহন স্বর বেজে উঠ্‌বে—ওগো, তোমায় আমি ভালবাসি! চারধারে কোকিলের কুহুস্বর রণিত হয়ে উঠ্‌বে, মলয়ের মৃদুশ্বাস আমার এলোচুলের গুচ্ছ নিয়ে খেলা করবে, আকাশের মধুচন্দ্র মধুধারা ঢেলে দেবে, আর সবার মাঝে আমার মন-প্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে থাক্‌বে, আমার হৃদয়-জগতের রাজপুত্রের মোহন কণ্ঠস্বরের ধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে! ওগো, তোমায় আমি ভালবাসি!

মনে মনে ভাবতাম, যাকে ভালবাস্‌ব তাকে চোখের এক-পলকেই চিনে ফেলতে পারব। উপন্যাসের নায়িকার মত আমারও বুকে সেই সুর ফিরৃত—আমি জানিনা, আমার রাজপুত্রের কি রঙ্! আমি জানিনা সে মোটর-কারে চেপে আস্‌বে, কি ট্রামের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আস্‌বে! আমি জানি না, সে দানের পাত্র নিয়ে আস্‌বে, কি ভিক্ষার পাত্র নিয়ে এসে আমার দরজায় দাঁড়াবে! কিন্তু আমি জানি, সে আস্‌বে—এবং সেই আশার সুরে বাঁধা আমার জীবন-বীণার তার, তা'র সেই আসার দিনে বেজে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে!…

এমনি করে কল্পনার রথ আমার কত দূর-শূন্য বেয়েই ছুটত, মাটির বাস্তব স্বর্গ ছেড়ে দূর শূন্যের কল্পনা-স্বর্গের দিকে!…

তাই যেদিন সে তার নির্ম্মল শুভ্র প্রাণের পবিত্র কামনা নিয়ে এসে দাঁড়াল আমার পাশে,—বল্‌লে, 'এস, আমাদের দু'জনের জীবন-তার এক সুরে বেঁধে নিয়ে আমাদের জীবন-যাত্রা সার্থক করে তুলি'—তখন তার দিকে চাইবার অবসর আমার হয়নি। তার আগ্রহ, তার স্নেহ, তার প্রেম আমার প্রাণকে তার পায়ে সর্ব্বস্ব সঁপে দিতে অধীর ক'রে তুলেছে। মনকে চোখ রাঙিয়ে বলেছি —ও ভুল! ও স্নেহ ভুল, ও প্রেম ভুল, নিজেকে বিসর্জ্জন কর্ব্বার এ আগ্রহ ভুল! আর এই ভুলের মোহে আজ যদি ওর কথায় কাণ দাও, তাহলে যখন চিরকালের রাজপুত্র এসে দ্বারে আঘাত করবে—ওগো প্রতীক্ষমানা, কি রেখেচ আমার জন্যে সাজিয়ে,—কি বলবে তাকে? ভুল করে জীবন-ভরা ব্যর্থতাকে কুড়িয়ে নিয়েছ?

কথার মোহে তাই তাকে আঘাত করে এসেছি, চিরদিন। সে তার প্রেমের ডালি এনে ধরেছে আমার সামনে—আমি প্রত্যাখ্যান করেচি সদর্পে! আর কি আত্মপ্রসাদ অনুভব করেচি, সেই প্রত্যাখ্যানের গর্ব্বে! হায়রে গর্ব্ব! বুক ফুলিয়ে বলে বেড়িয়েচি—বুক আমার প্রতীক্ষার ক্ষতের রক্তে রাঙা!

সে ছিল আমার আত্মত্যাগীর সর্ব্বস্ব-ত্যাগের গর্ব্ব!

আঘাতের পর আঘাত পেয়ে তার স্নেহপ্রবণ প্রাণ মুচড়ে পড়েছিল। প্রতিদানের আশা ব্যর্থ হয়ে হয়ে তার হৃদয়কে ব্যথাতুর করে তুলেছিল। বড় অসহ্য যখন হয়েছে তার এই ব্যর্থতার ব্যথা—তখন সে চলে গিয়েছে! যাবার সময় বলে গিয়েছে মুখ ফুটে—বেশী কিছু ত চাইনি তোমার কাছে! কিন্তু সেই অতি-অল্পও তোমার কাছে পেলাম না, আমার সকল দানের বিনিময়ে!…

তার যাবার সময়ের সেই করুণ সুর আমি শুন্‌তে পাচ্ছি দিবস-রজনী অবিচ্ছেদে। সে যে আমার কতখানি পূর্ণ করেছিল, তা আমি আজ বুঝতে পাচ্ছি তীব্রভাবে, যখন তার সে পূর্ণতা আজ অভাবের রিক্ততায় ভরে উঠেচে! আমার বুক যে না-বলা ব্যথায় কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে। আমার বুকের রাজা, কেমন করে জানাব তোমায়, কি ভুল আমি করেছিলাম? কেমন করে জানাব?

ওগো, তুমি ত পুরুষ! তুমি ত শক্তিশালী! জোর করে কেন আমায় আমার কল্পনার ফাঁকি, শূন্যতা বুঝিয়ে দিলে না? তোমার যাবার আগে আঘাত দিয়ে কেন বুঝিয়ে দিয়ে গেলেনা যে তুমি না হ'লে আমার এক-মুহূর্ত্ত চলে না, সে যতই না কেন কথার বড়াই করি!

শ্রীসোমনাথ সাহা।

আলোচনা

নারীর কথা

স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা ছাড়িয়াই দিই, স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে আজ-কাল বেশ একটু আলোচনা চলিতেছে। ইহা অতি শুভ লক্ষণ। এই যে স্ত্রী-শিক্ষার দিকে লোকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন, এ মত এখন যতই ক্ষুদ্রসীমায় আবদ্ধ হউক না কেন, ইহাকে কেহই প্রতিহত করিতে পারিবেন না। তরঙ্গ যত প্রবল হউক, যত বেগশালী হউক, সমুদ্রতলস্থ ভূমি যখন উচ্চ হইতে আরম্ভ করে, শতবার তাহা তরঙ্গাঘাতে ডুবিয়া যাক, জলস্রোতে ভাঙিয়া যাক, সে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর হইবেই; তেমনি যে সত্য এতকাল ধরিয়া মানুষের অন্তরে জাগরূক হইয়াছে, এখন তাহা অতি ক্ষীণ শিশু হইলেও পরে যে বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্ত্রী-শিক্ষার বহু অন্তরায় আছে। অনেক বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণও ইহার বিরোধী। ইহা যে কতখানি দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু নারীদেরও যখন ইহার বিরোধী দেখি, তখন আশ্চর্য্য হই। অবশ্য, ইহাও সত্য যে, যখন আমেরিকা হইতে দাসত্ব-প্রথা বিলোপের চেষ্টা হইয়াছিল, তখন সর্ব্বপ্রথমে দাসেরাই তাহার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিল। যে জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে দাসত্বের বন্দীশালায় আবদ্ধ রহিয়াছে, সহসা শিক্ষা বা স্বাধীনতার কথা শুনিলে তাহারা যে চমকিত হইবে, ইহা বিচিত্র নয়। আপনাদিগকে অধীন ও অশিক্ষিতরূপে দেখিবার অভ্যাস যাহাদের মজ্জাগত হইয়াছে, পুরুষ-সেবায় যাহারা আপনাদের জীবনের সার্থকতা বুঝিয়াছে, তাহারা স্বাধীনতা বা শিক্ষা পাইতে কি চাহিতেই পারে না।

"ভারতবর্ষে" একজন লেখিকা বলিয়াছেন যে, "পুরুষ তোমার দেহকে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা কি হারাইতে বলিয়াছিল?" কি অদ্ভুত কথা! ইহাও কি বলিয়া দিতে হইবে যে, কেহ যাহার বন্দী—অর্থাৎ কাজে ও বাক্যে যে অন্যের অধীন, তাহার মনও স্বাধীন থাকিতে পারে না; ক্রমে ক্রমে দেশের সহিত মনও বিজেতার অধীনতা স্বীকার করিবেই!

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী পৌষের ভারতবর্ষে যাহা লিখিয়াছেন, সে যে কতখানি অদ্ভুত কথা, একটু আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। একজন নারী বলিতেছেন, "যাহার এরূপ একখানা বাড়ী নাই, স্ত্রীকে যে এরূপ সুখে রাখিতে পারে না, তাহার গলায় মালা দেওয়া অপেক্ষা নিজের গলায় দড়ি দেওয়া ভাল।" কে এ কথা বিশ্বাস করিবে যে,—শিক্ষিতা কেন, অশিক্ষিতাও এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারে না? নারী কি পুরুষ সকলেই স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন। পরের বিত্ত দেখিয়া চিত্তে যদি ঈর্ষা-দুঃখই বোধ হয়, তবে তিনি তাহা চাপিয়াই থাকেন, দশজনের নিকট মুখে প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হন না। মুখরা স্ত্রীলোক হইলে বাড়ীতে স্বামীর নিকট ঝাল ঝাড়িয়া থাকেন। যিনি এ কথা বলিয়াছিলেন, তিনি শিক্ষিতাই হউন বা অশিক্ষিতাই হউন, তিনি যে অতিশয় নির্ব্বোধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিংবা তাঁহার মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ ছিল কি না, তাহাও বিবেচ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? জ্ঞান লাভ করা। সেকালের নারী অতিথি-আশ্রিত-বৎসলা বা ব্রত-চারিণী ও নিষ্ঠাবতী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান কতখানি ছিল, তাহা একবার চিন্তা করা দরকার। ভৃত্যাদি না রাখিয়া গৃহকর্ম্ম চালাইতে পারিলেই বা ব্রত-উপবাস করিয়া অনাহারে থাকিলেই কি মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়া থাকে? ব্রতের সার্থকতা কি? ইহাতে মানসিক কোন্ উন্নতি লাভ হয়? স্বাস্থ্য

হিসাবে ইহার যত উপকারিতাই হউক না, কেন, ইহাতে জ্ঞান বা ধর্ম্মের কি সাহায্য হয়? যদি তর্কচ্ছলে বলা যায় যে, স্বাস্থ্যলাভই বা মন্দ কি? তবে বলি, তাহাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সোজাসুজি স্বাস্থ্য-হিসাবে করিলেই হয়। ধর্ম্মের তক্‌মা লাগাইবার চেষ্টা কেন? সন্তানের জন্য বুক চিরিয়া রক্ত বা কালীর নিকট পাঁঠা বলি দেওয়ায় মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহাতেও জ্ঞান বা ধর্ম্মের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি? এ সকল অন্ধতার ভিত্তি কোথায়? অশিক্ষাই মানুষকে অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য, মনুষ্যত্বের বিকাশ। নারীগণ কেবল শিক্ষার অভাবেই এরূপ অন্ধকারে ডুবিয়া আছেন। যদি নারীকে সুশিক্ষিত করা যায়, তবে বিনা-চেষ্টায় তাঁহাদের মজ্জাগত কুসংস্কার দূর হয়। অনেকে এই ভয় করিয়া থাকেন যে, শিক্ষা বা স্বাধীনতা পাইলে নারী স্বেচ্ছাচারিণী হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, খ্রীষ্টান-ব্রাহ্ম-সমাজের স্বাধীনা নারী ও সর্ব্বসাধারণ পুরুষ, এই উভয়ের মধ্যে কে স্বেচ্ছাচারী? কাহার দ্বারা স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়? পার্শী মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি স্বাধীন নারীগণ কি স্বেচ্ছাচারিণী, না, চরিত্রহীনা? তাঁহারা কি গৃহকর্ম্মে উদাসীন, না, স্বামী-পুত্রের সেবা করেন না? স্বাধীনতার লীলাভূমি ইয়োরোপ বা আমেরিকার স্ত্রী-সমাজ কি উচ্ছৃঙ্খল, না, তাঁহাদের নৈতিক জীবন হীন? দুই-একজনকে দেখিয়া বিচার হইতে পারে না। সকল জিনিষেরই ভাল মন্দ আছে।

তবে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা এখন উঠিতে পারে না। কারণ বাঙালী পুরুষই পরাধীন। যখন তাঁহারা আত্মরক্ষায় সক্ষম হইবেন, যখন বিদেশীর নিকট লাঞ্ছনার ভয় থাকিবে না, যখন তাঁহারা নারীকে উপযুক্তরূপে গঠন করিতে পারিবেন, তখন যেন নারীকে তথাকথিত স্বাধীনতা প্রদান করেন। যখন অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত হইবে (সে সুদূর ভবিষ্যৎ কি কল্পনাতেই থাকিবে?), তখন পুরুষ দেখিবেন যে, স্বাধীনতার দ্বারা নারীর গৌরব ক্ষুণ্ণ না হইয়া বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। পুরুষগণ যদি নারীকে সম্ভ্রম করিতে শিখেন, তবে নারীর বিপদ হইবে কেন? পুরুষ নারীর প্রতি যেরূপ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া থাকেন, তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহারা কখনও স্ত্রীলোক দেখেন নাই। তাঁহাদের অসম্ভ্রম-কলুষিত দৃষ্টির সম্মুখে সকল নারীই সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। পুরুষ যেন একবার চিন্তা করিয়া দেখেন যে, নারীকে স্বাধীনতা দিয়া সম্মান রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদেরই শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রয়োজন। প্রথমে আপনাদের নিকট হইতে রক্ষা করিয়া পরে যেন বিদেশীর হস্ত হইতে নারীকে তাঁহারা রক্ষা করিতে যান। যাহা সর্ব্বদা দেখা যায় না, তাহার প্রতি মানুষের অধিক লোভ আসে। অনায়াস-লব্ধ বস্তুর আকর্ষণ কমিয়া যায়। স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচলন হইলে পুরুষের চক্ষুর পিপাসাও যথেষ্ট কমিয়া যাইবে, আশা করা যায়।

স্ত্রী-স্বাধীনতার কথায় চমকিত হইয়া যাঁহারা বলেন যে, স্ত্রী-স্বাধীনতায় তাঁহাদের সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব? যে-বস্তুর বিশুদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ আছে, যাহা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইবে, পুরুষের নিকট সে-বস্তুর মূল্য কি? পুরুষ কি নারীর সতীত্বকে এতই ভঙ্গুর মনে করেন যে, গোপনে তাহা লুকাইয়া রাখা প্রয়োজন? নারী কি সতীত্বের মর্য্যাদা কিছুই বোঝেন না যে, সেজন্য পুরুষের খবরদারীর প্রয়োজন? মহাজ্ঞানী বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়াছেন যে, "সতীত্ব ভারতনারীর মজ্জাগত। ঈষৎ মাত্র তাহা জানাইয়া দিয়া জগতের মধ্যে স্বাধীনভাবে নারীকে বিচরণ করিতে দিয়া দেখ, কেহই তাহাকে টলাইতে পারিবে না।"

পুরুষেরই পবিত্রতা ও সাধুতা শিক্ষার প্রয়োজন। তাঁহারা সৎ হইলে নারীর কোন ভয় নাই। এ বিষয়ে পৌষের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সমীচীন কথা আর থাকিতে পারে না। পুরুষ যতদিন পর্য্যন্ত সাধু ও সংযমী হইতে না পারেন, ততদিন নারীর সতীত্ব বিষয়ে দাবী করিতে তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার নাই।

নারীত্বের বিকাশ পত্নীত্বে ও মাতৃত্বে সত্য, কিন্তু নারী কেবল পত্নী বা মাতাই নহেন। নারী ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারাও মানুষ, সুতরাং তাঁহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ যাহাতে হয়, সেই চেষ্টাই করা উচিত। শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ক্রমে বর্দ্ধিত করিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ না হইয়া যায় না। মনুষ্যত্ব বিকশিত করিবার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে। আর মনুষ্যত্ব বিকশিত হইলে যে নারীত্ব ও মাতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে, তাহা নয়। কারণ নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি কিছুতেই রুদ্ধ হইবার নহে।

তারপর বৈধব্যজীবনের কথা। হিন্দু পুরুষ বিধবার বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্যই অধিক সঙ্গত মনে করেন। কিন্তু নারীকে কি তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের উপযুক্ত কোন শিক্ষা দিয়া থাকেন? ব্রহ্মচর্য্য করিবার জন্য যে জ্ঞান, মানসিক যে শক্তির প্রয়োজন, নারীর মধ্যে তাহা আছে কি? পতির মৃত্যুর পর কি জন্য তাঁহারা বৈধব্য জীবন যাপন করেন, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করেন, তাহাও অনেকে জানেন না। যাঁহারা বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষপাতী, তাঁহাদের উচিত, পরলোক বিষয়ে নারীকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া যে, যাহাতে নারী পরলোকের প্রতি আস্থাবতী হইয়া সেই মৃত পতির প্রতীক্ষায় সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন। পরলোকের প্রতি কেবল অন্ধবিশ্বাস গতানুগতিকতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া জ্ঞান দ্বারা আপনাদের অন্তরে

পরলোকের সত্য অনুভব করিতে পারিলে বৈধব্যের কষ্টকে কেহই আর কষ্ট বলিয়া মনে করিবেন না।

পরলোক বিষয়ে সাধারণ নারীগণের যে কিরূপ অভিজ্ঞতা তাহা দেখা যাউক। সদ্য-বিধবা একটি নারীকে অপর একটি নারী এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন, "দেখ, কেঁদে কি করবে? যার জন্যে কাঁদছো, সে কি একবার তোমার কথা মনে করছে? সে তোমার মায়া কাটিয়ে চলে গেছে, তোমাকে দেখতে পাচ্ছেনা।" যদি ইহাই সত্য হয়, তবে তো বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের কোন কারণ বা কোন প্রয়োজন নাই! তবে কোন্ যুক্তিতে বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য করিতে বলা হয়? যে সকল মনীষি পরলোক লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহারা কেহই এ কথা বলেন না যে, মৃতের আত্মা একেবারে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যায়, বা আমাদিগকে দেখিতে পায় না। তাঁহারা বলেন যে, দেহ-মুক্ত আত্মাও আমাদেরই ন্যায় প্রিয়জন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অতিশয় দুঃখ পায় কিছুকাল প্রিয়জনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং মৃত্যুর সময় তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রও এ-কথা বলেন এবং এইজন্যই বিধবা ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্যই এই যে, ইহলোকে সেই একজনেরই থাকিয়া পরলোকে পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইব।

একবার একটি পারলৌকিক বৈঠকে একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি নারীর আত্মা মিডিয়মের দ্বারা আনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই জীবিত স্বামী পত্নীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন। নারীর আত্মারা বলেন যে, স্বামীর পুনরায় বিবাহের জন্য তাঁহারা অতিশয় দুঃখ অনুভব করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া একজন বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতিনী মহিলা বলিয়া উঠেন যে, "তবে তো বিধবারও বিবাহ হওয়া উচিত নয়।"

আমাদের পূজাপদ্ধতি যে-ভাবে চলিতেছে, তাহাতে পূজার সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ শতকরা নিরানব্বই জনই বুঝেন না। কি বলিতেছে, কি করিতেছে, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, শুধু কলের পুত্তলিকার ন্যায় পূজা করিয়া যাইতেছে! বিধবার ব্রহ্মচর্য্যও সেই দশায় দাঁড়াইয়াছে। সে যাহা করিতেছে, পূর্ব্বতনের অনুসরণ করিয়া, অন্ধভাবে চোখ বুঁজিয়া,—জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়া নহে। কিন্তু এরূপ গতানুগতিকতার কোন মূল্য নাই। বিধবাগণকে এ-ভাবে বাধ্য না করিয়া যদি বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা তাঁহাদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাঁহারা ধীর ও শান্তভাবে প্রিয়জনের ধ্যানে অনায়াসে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে পারেন। ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইলে এইভাবেই করা উচিত। বিধবাকে জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, কি জন্য তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য করিতেছেন। কার্য্যের সত্য উদ্দেশ্য বুঝিয়া যে কার্য্য করা যায় তাহাতে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, অন্ধতায় আচ্ছন্ন করিয়া বা ভয় দেখাইয়া কার্য্যে, প্রবৃত্ত করা অপেক্ষা যে জন্য কাজ করিতে হইতেছে, তাহা বলিয়া দেওয়াই ভাল।

শ্রীমতী উষাপ্রভা সেন।

বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য

বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য, এই তিনের মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতবাসী অন্যান্য জাতির তুলনায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, স্ফূর্ত্তির অভাবে ও দুশ্চিন্তায় এ জাতির জীবনীশক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কিসে দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে এ বিষয়ে বর্ত্তমানে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার সাধন ও বিদেশে খাদ্য-সামগ্রীর অবাধ রপ্তানি বন্ধ দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে জাতীয় দারিদ্র্যের অনেক পরিমাণে প্রতিকার হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহার ফল স্থায়ী হইবে না, যদি নিঃসম্বল বিবাহ ও অকাল-মাতৃত্ব চলিতে থাকে। এ বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের ফলে আমাদের পারিবারিক অশান্তি, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা ও অকালমৃত্যু দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক স্থলেই দেখা যায়, বর ও কন্যা উভয় পক্ষই কেবলমাত্র পদ-পর্য্যাদা ও ধনের মোহে আকৃষ্ট হইয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, এবং সে অবিবেচনার ফলও তাঁহারা অচিরেই হাতে হাতে পাইয়া থাকেন। শিক্ষার সার্থকতা কি, যদি তাহা মানুষকে সুবিবেচক ও চরিত্রবান করিয়া না তোলে? ক্রোধের বশীভূত হইয়া অপরের সামান্য অশান্তির কারণ ঘটাইলে, সমাজে আইনানুযায়ী দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কেহ যদি রিপুর উত্তেজনায় সন্তান-উৎপাদনের নামে স্ত্রী বা সন্তানের প্রাণ-নাশের কারণ হয়, বা ভবিষ্যৎ বংশকে ক্ষীণজীবী, বংশগত-রোগাক্রান্ত, দুর্ব্বল ও দরিদ্র করে, তবে সমাজ কি সে পাপে উদাসীন থাকিবে? একটী সামান্য চাকরীর জন্য কত না যোগ্যতার নিদর্শন উপস্থিত করিতে হয়! কিন্তু পিতৃত্বে ও মাতৃত্বে কি কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নাই? কোন দায়িত্ব নাই? স্বার্থপরতা ও দায়িত্ব-বোধহীনতা দাম্পত্যজীবনের পরমশত্রু। প্রাচীনকালে, এক সময়ে হয়ত জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন "জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি" দরিদ্রদেশে এই দায়িত্বহীন, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সমাজে কত না অনিষ্ট সাধন করিতেছি! পণ্ডিত প্রবর John Stuart Mill বলিতেছেন—"Little improvement can be expected in morality until the producing of large families is regarded with the same feeling as drunkenness or any other physical excess."

স্ত্রীর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আর্থিক অবস্থানুযায়ী বংশবৃদ্ধি কিরূপে

সম্ভব হইতে পারে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত সমাজে এ বিষয়ে নির্দ্দোষ বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন, জন-সংখ্যার দ্বারাই জাতি জনবলে শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অনাহার-ক্লিষ্ট, রুগ্ন, দুর্ব্বল ও হীনচরিত্র জনসমষ্টি দ্বারা কোন জাতিই কখনো শ্রীমান্ বা শক্তিমান্ হইয়া উঠিতে পারে না, বরং তাহার বিপরীত ফলই অবশ্যম্ভাবী।

মহাত্মা গান্ধি, Tolstoy, Plato, Malthus, Darwin, Aristotle, Mill, Huxley, Annie Besant ও Herbert Spencer প্রভৃতি মনীষিগণ সমাজের কল্যাণের জন্য অবাধ বংশ-বৃদ্ধির ও অযোগ্যের বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবকে লজ্জা করিলে ঠকিতে হয়। বীরবল বলিয়াছেন, "আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়"।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পরের ছেলে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহাসমারোহে স্বর্গীয় নন্দকিশোর রায়ের দত্তক-গ্রহণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। অনেকে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক্, যা হবার তা তো হয়ে গেল, এখন ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্!"

রাজেশ্বরী দেবী মহা-ধুমধামে তাঁহার মানসিক মানতের যা-কিছু পূজা, সব একে একে শোধ করিতে লাগিলেন। গ্রামের যেখানে যে দেবতাটি আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটে এক এক দিন এক একটা পর্ব্ব আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। গ্রামের ভদ্র-শূদ্র তো প্রায় মাসাবধিকাল বাড়াতে কেহ হাঁড়ি চড়াইল না। বাজনার শব্দে আর লোকের কল্-কলানি রবে গ্রামখানি কিছুকাল ধরিয়া মুখর হইয়াই রহিল।

বলিদানের কাল দীর্ঘতর হইলে বধ্য জীবের যে-রকম অবস্থা চলে, বিনয় ঠিক সেই অনুভবের মধ্যে পড়িয়াছিল। এ বিষয়ে অবশ্য রাজেশ্বরীর বেশী দোষ ছিল না। তিনি বিনয়কে দিয়া যে-যে কাজ না করাইলে নয়, তাহাই শুধু করাইলেন, তাহার বেশী একচুলও তাহাকে উৎখাত করেন নাই। পুত্রকে দান করিয়া যজ্ঞ-সমাপনেরও অপেক্ষা না করিয়া বিনয় যখন একেবারে শয়ন-কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, তখন তিনিই কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া কাহাকেও তাহাকে বিরক্ত করিতে দেন নাই। তাহার পর মাণিক যখন বাপকে না দেখিয়া ক্রমে অধীর হইয়া উঠিতেছিল, তখন তাহাকেই বিনয়ের দ্বারদেশে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন। পুত্রের পুনঃ-পুনঃ করুণ সাশ্রু আহ্বানে যখন বিনয় দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া তাহাকে কোলে লইল, তখন ভাগিনেয়ের হাত ধরিয়া তাহাকে ভোজন-পাত্রের নিকটে বসাইতে গিয়া রাজেশ্বরীর চোখ হইতেও কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল। বিনয়ের মুখখানা এমনি হৃত-সর্ব্বস্বের মত দেখাইয়াছিল যে যে-কোন দর্শকই তাহার পানে চাহিয়া চোখের জল রোধ করিতে পারে নাই। তারপর এই সব পূজা-পর্ব্বে বিনয়কে লইয়া টানাটানি করিতে তাঁহার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু মাণিক যে কিছুতেই বাপের সঙ্গ নহিলে কোথাও যাইতে চায় না! এত আদর আহ্লাদ বেশ-ভূষা বাদ্য-ভাণ্ড লোকজন সব যে তাহাকে ঘিরিয়াই চলিতেছে, তাহা সেই পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশুরও বুঝিতে বাকি ছিল না। কিন্তু ইহাতে সে যেন কেমন ভড়কাইয়া যাইতেছিল। বলিদানের পশুর মতই সে স্তব্ধ বিস্মিত ভাবে তাহার সেই কমল-পলাশের তুল্য নয়ন বিস্ফারিত করিয়া ব্যাপারগুলা দেখিতেছিল এবং

মাঝে মাঝে পিতার দিকে প্রশ্ন-সূচক দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিতেছিল,—বাবা!

পিতা তখন অন্য দিকে মুখ ফিরাইতেছিল। যে সময় তাহাকে লইয়া বড় বেশী টানাটানি চলিতেছিল, সে সময়েও সে এক-একবার তাহাদের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া পিতার বক্ষে আসিয়া লুকাইয়া পড়িতেছিল এবং তাহাকে লইয়া কেন যে সকলে এমন করিতেছে, সেজন্য প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া পিতাকে বিব্রত অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। এখনো এই সব পূজা-পর্ব্বে পিতার সঙ্গ নহিলে সে কিছুতেই যায় না। কাজেই বিনয়কে রাজেশ্বরীর টানাটানি না করিয়া উপায়ও ছিল না—কিন্তু সেজন্য তিনি মনে মনে বিব্রতই হইতেছিলেন। ছেলে বেশীদিন বাপের এতখানি 'ন্যাওটো' হইয়া থাকিলে তাঁহাকে তো শীঘ্রই একটু শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, নহিলে মাণিক তাঁহার হইবে না! বিনয় যদি ছেলের এই আবদারের সুযোগে তাহাকে এখন বেশী করিয়া কাছে টানিয়া লয়, তাহা হইলে যে আবার তাহাকে আঘাত দেওয়াও অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু সেটা রাজেশ্বরীর বড় ইচ্ছা নয়। আর যে বিনয়কে কোন বিষয়ে কষ্ট দেওয়া হয়, ইহাও তাঁহার মন একেবারেই চাহে না। কিন্তু ছেলে যদি এমনি করিয়া বাপের কোলের মধ্যেই ঢুকিয়া থাকিতে চায়, তাহা হইলে হয় তো সেই উভয় পক্ষেরই অপ্রীতিকর ব্যাপারের পুনরভিনয় হইতে চলিবে। মাণিক তাঁহারই, মাত্র এইটুকু চিন্তা করিয়া তো তাঁহার মন ভরিবে না। ছেলে যদি তাঁহার অনুগত না হয়, তাহাকে বুকে করিয়া যদি তাঁহার বুক না ভরে, তবে ত এ সবই বৃথা! ইহার চিন্তামাত্র রাজেশ্বরী সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না—মন তাঁহাকে দিনকতক ধৈর্য্য ধরিতে উপদেশ দিলেও তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিতেছিল। তিনি তো মাত্র বংশ-রক্ষার জন্য কিম্বা নাম-লোপের জন্য মাণিককে এমন যুদ্ধ পণ করিয়া গ্রহণ করেন নাই! তাঁহার ক্ষুধা যে অন্যরূপ, তাঁহার অভাব যে তাঁহার নিজের কাছে—পিণ্ডলোপ প্রভৃতি চিন্তার চেয়ে তা' অনেকখানি বড়। তাই তাঁহার দুইদিনের প্রসন্ন মুখে প্রশস্ত ললাটে আবার চিন্তার মেঘ ধীরে ধীরে ছায়া ফেলিতেছিল।

কিন্তু কয়েক দিন পরেই তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বিনয় তাঁহার আশঙ্কার দিক দিয়াও হাঁটিল না! সে নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়া উঞ্ছবৃত্তির মত আর হাত পাতিয়া দ্বারে বসিল না, বা একটু-আধটু যাহা পায়, তাহাই কুড়াইয়া ফিরিল না। রাজার মত দান করিয়া সে দিক হইতে নিজেকে একেবারে টানিয়া সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। মাণিক অনেক সময়ে কাঁদিয়াও তাহাকে কাছে পাইত না। বিনয়ের চিরকালের নেশার বস্তু সেই বেহালা খানা—এই পোষ্যপুত্রের হাঙ্গামা উঠার পর হইতে এতদিন সে যাহা আর স্পর্শও করে নাই—সেইখানা টানিয়া লইয়া তাহার ধূলা ঝাড়িয়া বিনয় এখন দিনরাত তাহারি কান মোচ্‌ড়াইতেছে আর মাঝে মাঝে ছড়ি চালাইয়া তাহাতে সুর বাঁধিতেছে। যদিও এখনো সে তেমন করিয়া বেহালাখানাকে সঙ্গীতের ভাষায় মুখর করিয়া তোলে নাই, তথাপি সে যে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, রাজেশ্বরী তাহা বুঝিতেছিলেন। এ তো জানা কথা এবং ইহা যে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি জানিতেন! সেটা সর্ব্বসমক্ষে আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহার সেই বয়স্থা সুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে তাহার পিতা-মাতার সহিত আর চলিয়া যাইতে দেন নাই। এবং বিনয়ের সহিত যে তাহার বিবাহ দিবেন, এ কথাও এখন সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। এ কথা বিনয়েরও কানে উঠুক এবং সকলে এ কথার আলোচনা করিয়া তাহাকে এ বিষয়ে প্রস্তুত করিয়া তুলুক, কিম্বা বিনয় মেয়েটিকে দেখিয়া ক্রমে বিবাহে ইচ্ছুক হইয়া উঠুক, এ চেষ্টাও তাঁহার মনে ছিল। আর দিন কতক পরে বিনয় যে বিবাহে আপত্তি করিবে না, কিম্বা যদিই চক্ষু-লজ্জার দায়ে একটু-আধটু করে, তাঁহাকে অভিভাবকের পদ লইয়া এবং মাতুলানীর উপযুক্ত স্নেহের সঙ্গে একটু জোর প্রকাশ করিয়াই না হয় সে কার্য্যটা সম্পন্ন করিতে হইবে। লোকেও বুঝিবে যে এই পোষ্য-পুত্র লওয়ার ব্যাপারে তাহাদের বিনয়ের জন্য অতখানি হা-হুতাশে কেবল আহাম্মকি ভিন্ন আর কিছু প্রকাশ পায় নাই। বিনয়ের বিষয়ে আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইয়া রাজেশ্বরী

তবে মাণিকের দিকে মনকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করিতে পারিলেন। এতদিন তাহাকে পাইয়াও ঐ সব ভাবনায় তাঁহার স্বস্তি ছিল না।

সন্ধ্যাবেলায় দুধ ও খাবার খাওয়াইয়া তাঁহার খাস দাসী যখন মাণিককে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল এবং মাণিক বাবার কাছে ঘুমাইবে বলিয়া বায়না ধরিয়াছিল, তখন রাজেশ্বরী তাহার শয্যায় গিয়া বসিয়া দাসীকে বলিলেন, "তুই যা, আমি ঘুম পাড়াচ্ছি।"

মুক্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া রোহিণী দাসী সরিয়া বসিতে বসিতে বলিল, "তুমি কি পারবে মা? যে আব্‌দেরে ছেলে!"

"তা হোক্,--তুই ওঠ্।"

"দাদাবাবু যে কোথায় বেরিয়েছেন, রতনাকে দিয়ে বামাকে দিয়ে এত খোঁজ করানু সেই থেকে,—তা তাঁর দেখাই পেলে না তারা! ছেলে যখন কিছুতে ঘুমোয় না, তখন কেন বাপু এ সময়ে বেড়াতে যাওয়া—?"

গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন, "তা বলে সে একটু বেড়াবে না? চিরদিন কি তাকেই ছেলে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যেতে হবে! কেন?"

গৃহিণীর চিরদিনের আদরের দাসী রোহিণী তাঁহার এ ধমকে দমিল না, বলিল, "এখন যতদিন না বশ মানে, ততদিন তো দেক্। ছেলে যার বলে দিদিমায়ের কাছেই ঘুমোয় না, তার—"

"তুই বক্-বক্ থামা দিকি, মাথার কাছ থেকে! ঘুমোও তো বাবা মাণিক—বাবা ব্রজকিশোর, ঘুমোও তো আমার কোলে।"

"না ব্রজকিশো না, বাবা আস্‌বে।"

"তোমার বিনয়-বাবা যে বেড়াতে গিয়েছে ধন, তুমি ঘুমোও লক্ষ্মী ছেলে।"

"বিনয়-বাবা না—আমার বাবা। আমি ঘুমোব না।" বালক ক্রন্দন জুড়িল।

"দ্যাখো দেখি, ঘুমে চোখ্ চাইতে পারছে না, তবু জেদ্ ছাড়বে না! আমি যে তোমার মা হই ব্রজকিশোর, আমার কথা শুন্‌বে না?"

"মা না—তুমি ঠাকুমা আর সেই দিদিমা! আমি দিদিমার কাছে যাব। মাসির কাছে যাব—ছোট মামার কাছে যাব—"

রোহিণী বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে বলিল, "এখন কটা জেদ্ সাম্‌লাবে, সাম্‌লাও! ছি খোকা, তুমি মায়ের কথা শুনছ না?"

"কই মা?" নিদ্রা-জড়িমা-ভরা চক্ষু পূর্ণ বিস্ফারিত করিয়া বালক দেওয়ালের দিকে চাহিল। "সেই দিদিমার ঘরে কাঁচের ছবির মধ্যে মা বসে আছে, আর আমি ঘুমুলে মা স্বগ্‌গ থেকে চুমু খেতে আসে। এ ঘরে মা নেই—এ ঘর ভাল না, বিচ্ছিরী।"

"এই তো আপন-মা, এই তো তোমার ঘর। এই সব বাড়ী, আর এর যত ঘর, যত জিনিষ-পত্তর—সব তোমার, জানো ব্রজবাবু?"

বালক আবার চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিল, "ব্রজবাবু না—মাণিক।"

"ব্রজ বাবুই তো ভাল নাম তোমার, খোকন! মাণিক নাম তো পুরোনো হয়ে গেছে, এখন তাই নতুন নাম হয়েছে। জান খোকাবাবু, ঐ যে আস্তাবলে যত ঘোড়া, যত গাড়ী, যত লোক-জন চাকর-বাকর আছে, সব তোমার।"

বালক আবার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেন আনন্দের সহিত বলিল, "আর সেই কালো ঘোড়া? সেটা বাবার। বাবা সেটায় চড়ে কেমন বেড়াতে যায়। আর সেই ছোট কালো ঘোড়া—যেটা বাবার টমটমে জোতা থাকে—?"

"সে সব তোমার খোকাবাবু, সব তোমার। এই তোমার মা, আর ঐ যে দেওয়ালে কাঁচের মধ্যে মস্ত ছবি, ঐ তোমার বাবার। তুমি যখন বড় হবে, তখন দেখ্‌বে, সব তোমার। তুমিই—"

"আমার বাবা ভাল বাবা, কাঁচের বাবা নয়। আমি বাবার কাছে যাব—"

বালক এবার এমন ক্রন্দন জুড়িল যে রাজেশ্বরী বাধ্য হইয়া শেষে বিনয়ের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। সেবারে সে লোক বিনয়কে সঙ্গে করিয়াই ফিরিল।

বহুকষ্টে বহু সান্ত্বনায় পুত্রকে ঘুম পাড়াইয়া বিনয় ধীরে ধীরে তাহাকে মৃত নন্দকিশোর রায়ের পালঙ্কে রাজেশ্বরী দেবীর পার্শ্বে শোয়াইয়া দিয়া চোরের ন্যায় সে ঘর ত্যাগ করিল।

"বাবা—" বেহালার কান মোচড়াইয়া মোচড়াইয়া তাহাকে দুই-তিন বার জখম করিয়া এবং পুনঃ-পুনঃ সারাইয়া লইয়া এবার বিনয় যখন সেটিকে সযত্নে তাহার কাষ্ঠ-কফিনের মধ্যে পুরিয়া মনে মনে তাহার চির সমাধির ব্যবস্থা করিতেছিল, তখন সহসা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মাণিক একেবারে তাহার কোলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া মুখ লুকাইয়া ডাকিল, "বাবা—"

বিনয় তড়িতাহতের মত প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, মাণিক ঠিক যেন কাহার হাত ছিনাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে! কে সে? রাজেশ্বরী দেবী স্বয়ং কি? মাণিকের সঙ্গে সঙ্গে এখনি ঘরের মধ্যে তিনি আসিয়া পড়িবেন! তিনি যদি মাণিকের এই আশ্রয়-গ্রহণ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন্? তিনি যদি ভাবেন, বিনয় তাঁহার ছেলেকে পর করিয়া রাখিবারই চেষ্টায় আছে? বিনয় স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর খানিকক্ষণ কাটিয়া গেলেও যখন কেহ আসিল না, দেখিল, তখন একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পুত্রের দিকে চাহিল।

পিতা কথা কহিতেছে না দেখিয়া বালক এইবার মুখ তুলিল এবং একটু অবাক্ হইয়া যেন ফ্যাল ফ্যাল্ চক্ষে পিতার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার শিশু-চক্ষেও সে যেন এই কয়দিনে পিতার ভাবান্তর ধরিয়া ফেলিয়াছে। কি চেহারায়, কি ভাবে, এ যেন মাণিকের সে বাবা নয়! সন্দেহাকুল ভীত চক্ষে ধীরে ধীরে পিতার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বালক আবার মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা—"

পুত্রের চোখের এই ভীত সঙ্কুচিত বিহ্বল দৃষ্টি মুহূর্ত্তে বিনয়কে অসংযত করিয়া তুলিল। সহসা দুই হস্তে পুত্রকে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইয়া পাগলের মত চাপিতে চাপিতে অসংযত নিশ্বাসে রুদ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল, "মাণিক—আমার মাণিক—।"

সে যে আজ কত দিন মাণিককে এমন করিয়া একা এমনভাবে পায় নাই। উন্মাদের মত মাণিকের মুখে চুম্বন করিতে করিতে তাহার অঙ্গের ঘ্রাণ নাসিকা-পথে অন্তরের মধ্যে প্রেরণ করিতে করিতে বিনয় আবার ডাকিল, "আমার মাণিক—আমার যাদু,—কি বল্‌ছ বাবা?"

চিরাভ্যস্ত আদরে মাণিকের সন্দেহ ক্রমে যেন কমিয়া আসিল। তবুও যেন একটু দ্বিধার সহিত সে প্রশ্ন করিল, "বাবা—"

এই ডাক্ এমন করিয়া বিনয় যেন কত কাল শোনে নাই! পুত্রের মুখে মুখ দিয়া বিনয় উত্তর দিল, "কেন বাবা?"

"আমার মা স্বর্গের মা, ছবির মা—না, এই ঠাকুমা মা?"

হারে ভাগ্য! বিনয়ের মুখ দিয়াই ইহার উত্তর বাহির হইবে! পাছে মাণিক তাহার মাকে ভুলিয়া যায় বলিয়া সে না রাজেশ্বরী দেবীর স্নেহ-পাশ হইতেও এ কয়দিন ছেলেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। মৃতা জননীর ছবি দেখাইয়া বালকের মাতার স্মৃতি চির-জাগরূক করিয়া রাখিতে চাহিত! তাই কি ভাগ্যের এই পরিহাস! বিদীর্ণ হৃদয়ে বিনয় বলিল, "ঠাকুমা নন্, ইনিও মা, ছবির মাও মা।"

"ছবির মা কি আর স্বর্গে নেই? স্বর্গে ছবির বাবা আছে? বাবা, ছবির বাবা কেন? সে বাবা ভালো নয়—আমি তাকে বাবা বল্‌ব না।"

যেন কোন্ দূরতর স্থান হইতে বিনয় উত্তর দিল, "বল্‌বে বৈকি বাবা, তিনিও যে তোমার বাবা।"

"আর তুমি?"

"আমি! মাণিক—মাণিক—" ঊর্দ্ধস্বরে যেন অচেতনের মধ্যে চীৎকার করিয়া বিনয় পুত্রকে আবার বুকে চাপিয়া ধরিল। মাণিক নিজ মনে বলিয়া যাইতে লাগিল,— "বাবার নাম তো বিনয়—বিনয়ভূষণ চৌধুরী। আমার নাম মাণিকলাল চৌধুরী—নয় বাবা?"

মূঢ়ের মত বিনয় বলিল, "হ্যাঁ।"

"তবে কেন সবাই বলে, বাবার নাম নন্দকিশোর রায়?

তবে কেন সবাই বলে, ঐ ছবির বাবা আমার বাবা ? ও বাবা আমি নেব না—ও বাবা ভাল নয়, বিচ্ছিরি। আমার বাবা তো তুমি—নয় বাবা ?"

উত্তর কি রে—ইহার উত্তর কি! এবং এ উত্তর বিনয়কেই দিতে হইবে! হাঁ, হইবে,—নহিলে আর স্বর্গগত স্নেহময় মাতুলের সমস্ত ঋণ বিনয় কি দিয়াই বা আর পরিশোধ করিবে? তাহার পরীক্ষার ইহাও একটী অঙ্গ !

বিনয় ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ৷ মাণিক, উনিও তোমার বাবা।"

"উনিও বাবা, তুমিও বাবা ? তুটো বাবা ?"

"না—উনিই তোমার বাবা।"

"তবে তুমি, বাবা ?"

"আমি !—আমি !" একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া বিনয় গৃহের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল। "আমি আর তোর বাপ নই, মাণিক—ঐ তোর বাপ, ঐ তোর মা—আমি কেউ নই।"

"এ কি ছেলেমান্‌ষী কর্‌চো, বিনয়! এতটুকু ছেলে, তাকে মুখে ভোগা দিয়ে থামিয়ে দেবে, তা না, তার কথাতে এমনি কাণ্ড কর্‌ছ? একে লোকে কি বলে? সবই বাড়াবাড়ি!"

কণ্ঠস্বরে মাতুলানীর আগমনের আভাষ পাইয়া বিনয় আর্ত্তস্বরে চেঁচাইয়া বলিল, "মামীমা তোমার পায়ে পড়ি—ওকে আমার কাছে আস্‌তে দিয়ো না। হয় ওকে নিয়ে তুমি কোথাও চলে যাও-নয় ত বল, আমিই সরি। এতদিন যেতাম, কেবল—"

"কি যে বল বাছা ছেলেমানুষের মত! এখনো একবার একবার যখন তোমার কাছে আসার ঝোঁক ধরে, তখন কেউ কি ঠেকাতে পারে! অন্য জায়গায় নিয়ে গেলে যদি আবার হেদিয়ে অসুখ করে, তখন কি হবে, বল ত? এই তো এখনো এক বছর হয়নি, মরে বেঁচে উঠেচে! আবার যদি তেমনি ব্যায়রাম হয়?"

মুহূর্ত্তে বিনয় সঙ্কুচিত হইয়া ধীরে ধীরে অশ্রু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। রাজেশ্বরী দেবী তখন বলিলেন, "কিশোর, যাও তো বাবা, ছাখ গে, কেমন তোমার নতুন পোষাক এসেছে! কেমন খেলনা, কত বড় বল, কেমন ছোট-ছোট রেল, ইষ্টিমার—যাও তো ধন! কিশোর বড় লক্ষ্মী ছেলে—যাও তো।"

খেলনা পোষাকের নামে উৎফুল্লভাবে গমনশীল বালক ঘাড় বাঁকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিশোর না—আমার নাম মাণিক—নয় বাবা? আমার বাবা ছবির বাবা নয়—এই আমার ভাল বাবা।"

কুণ্ঠিত অবনত শিরেও বিনয় অনুভব করিল, সে কি উত্তর দেয়, তাহা শুনিবার জন্য রাজেশ্বরী দেবী উন্মুখভাবে দীপ্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া আছেন। যখন তিনি ছিলেন না, তখন সে মাণিককে যা বলিয়া উত্তর দিয়াছে, এখন সে কথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন, কিন্তু হায়, এখনই কেন তাহা এত তুরূহ লাগিতেছে! বুঝি, প্রাণ ফাটিয়া যায়! তবু যন্ত্রের মত ধীরে ধীরে সে উচ্চারণ করিল, "কিশোর তোমার ভাল নাম, আর নন্দকিশোর রায়ই তোমার বাবা, মাণিক। তাঁরই ছেলে তুমি—এঁরই ছেলে তুমি।"

মাণিক আর প্রশ্ন করিল না, নিঃশব্দে স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে সে চলিয়া যায় দেখিয়া রাজেশ্বরী তখন আদর করিয়া তাহার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমার তুটো বাবা,—বুঝ্‌লে কিশোর? আর তুটো নাম—কেমন?"

"তুটো বাবা ভাল নয়।" গম্ভীর মুখে এই কথা বলিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির মত ধীর গমনে মাণিক চলিয়া গেল। বিনয় স্তব্ধ কাষ্ঠপুত্তলির মত কেবল চাহিয়া দেখিল মাত্র, আদর করিয়া বালকের মনোভঙ্গের বেদনা দূর করিয়া দিবারও তাহার ক্ষমতা হইল না। সে অধিকার তাহার কোথায়!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"বিনয়—মেয়েটি কেমন রে? সুন্দরী নয়?"

বিনয় সচকিতে মুখ তুলিয়া দেখিল, একটি সুসজ্জিতা সুন্দরী কিশোরী তাহার সম্মুখে জলখাবারের থালা রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে। অপরিচিতা তরুণীকে এত নিকটে দেখিয়া অপ্রতিভভাবে বিনয় মাথা নামাইল। মাতুলানী

পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "কি রে, আমার ভাইঝীটি কি সুন্দর নয়? উত্তর দিচ্ছিস্‌নে যে?"

"এটি কি তোমার ভাইঝী, মামিমা?"

"তাও এক-বাড়ীতে থেকে এতদিন জানিস্‌ না? আচ্ছা ছেলে তো!...বল্‌ না, কেমন দেখ্‌লি?"

"ভালই। এটি কি এইখানেই এখন আছে?"

"ওমা তাও দেখিস্‌ নি? বেশ যাহোক্‌! খুব লোককে আমি মত জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি!"

"কিসের মত, মামিমা? মেয়েটি সুন্দর কি না?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! শোনো, এইবার স্পষ্ট কথা বলি—মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। তাই আমার দাদা আমায় ধরেছেন, মেয়েটি তোমায় সম্প্রদান করবেন।"

"আমায় সম্প্রদান করবেন!" অত্যুগ্র বিস্ময়ে বিনয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। "আমায় কন্যা সম্প্রদান? কি আছে আমার? পথের ভিখিরীকে তোমার দাদা কন্যা সম্প্রদান করতে চেয়ে বস্‌লেন যে, হঠাৎ?"

রাজেশ্বরী দেবী ঈষৎ আহত হইয়া একটু যেন ক্ষোভ-বিদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তুমি নিজেকে ভিখিরি বলে জানলেও লোকে তো তা জানে না। লোকে জানে, কর্ত্তার ভাগ্‌নে, ছেলের মত!"

তীব্রস্বরে বিনয় বাধা দিয়া বলিল, "সে ছিলাম যখন তিনি বেঁচে ছিলেন। এখন তাঁতে আমাতে সম্বন্ধ কি? তাঁর ছেলের পূর্ব্ব-পিতা, এই তো সম্বন্ধ? ভিখিরী নাহলে কি কেউ ছেলে বেচে? ছেলেকে খেতে দেবার যার ক্ষমতা নেই—" বলিতে বলিতে রুদ্ধস্বরে বিনয় থামিল।

রাজেশ্বরী দেবী গূঢ় অভিমানে গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আচ্ছা, তাইই যদি হয়—ছেলে দেবার জন্য তোমার মামা তোমায় বিষয়ও তো দিয়ে গিয়েছেন। কিশোরের সংসারেও তুমি সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে থাক্‌তে পার, আর ইচ্ছা করতো-"

"ইচ্ছা করি তো মাণিককে বেচা টাকা দিয়ে আবার আমি নিজের বাবুগিরি চালাই, বিয়ে করি, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করি! না?"

বিনয়ের দীপ্ত চক্ষুর সম্মুখে একটু নতশির হইয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "এ কি জগতে কেউ করে না?"

"না—না—কেউ করে না। তুমি যা করলে এ কেউ করে না! এমন করে একটিমাত্র সর্ব্বস্বকে কেউ কেড়ে নেয় না! যাক্‌, তা নিয়েছ—ভিখিরির ছেলেকে রাজা করেছ, বেশ করেছ, কিন্তু সে ভিখিরিকে নিয়ে আবার কেন তোমার এই খেলা, এ বিদ্রূপ? এ মতলবেই বুঝি এখন ঘন ঘন আমায় কাছে ডেকে খাওয়াও? কথা কও? আমি বলি, বুঝি, আমার ওপর একটু দয়া হয়েছে তোমার! কপাল দেখে বুঝি এতদিন পরে একটু মায়া এসেছে! তা না—এই মতলব? ভাইঝী গছাবার চেষ্টা? বটে!"

রাজেশ্বরী দেবী বিনয়ের উন্মত্ত ভঙ্গীতে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তুমি এমনি অকৃতজ্ঞ চিরকালই—এ জেনেশুনেও এ অপমান কপালে ছিল বলেই আমার এ মতি ঘটেছিল। তোমায় থিতু কর্‌বার জন্যে তোমার ভাবনায় তোমার শাশুড়ী কেঁদে মরে —নিজেও হাভাতের মত চির-জন্ম বেড়াতে, তাই দেখে—"

জোড় হাত করিয়া বিনয় সবিনয়ে বলিল, "তোমায় সাত দোহাই মামিমা, আমায় তুমি সেই অকৃতজ্ঞ বলেই জেনে রাখো। এত ভাবনা আমার জন্যে আর ভেবো না,—তোমার দোহাই। যদি ছেলেটাকে আমায় দিনান্তেও একবার দেখ্‌তে দিতে চাও, তাকে এইটুকু কাছেও থাক্‌তে দিতে চাও, তাহলে আর তোমার সুন্দরী ভাইঝী বোনঝী এনে আমায় দেখাতে এসো না! আর নয় ত বল—আমার পথ আমি বেছে নিই। ছেলে এখন তো আর আমার জন্যে হেতুবে না। সে এখন দিব্যি নিজের সব চিন্‌তে শিখেছে—বাধ্য হয়েছে, আর আমার না থাক্‌লেও তোমার কোন ক্ষতি নেই—বরং গেলেই বালাই দূর হয়! বল, আমি কি কর্‌ব?"

রাজেশ্বরী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাপু—আমার ঘাট হয়েছে, আমি মেনে নিলাম। আর তোমায় কখনো যদি কিছু বলি—"

বিনয়েরই শুভাকাঙ্ক্ষার জন্য বিনয় তাঁহাকে যেরূপ অপমান করিল, তাহাতে তাঁহার অন্তর ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রোহী হইয়া বিনয়কে বলিতে চাহিতেছিল—আচ্ছা, তুমি যাহা

ইচ্ছা করিতে পার—যাইতে চাও, যাও।" বিনয়ের তেজ ভাঙ্গিবার, দর্প চূর্ণ করিবার এ অস্ত্র তাঁহার হাতেই ছিল,—কেননা তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, ঐ অকর্ম্মণ্য বিনয় কি নিজের জীবিকার সংস্থান করিতে পারিবে? না। নিজের দর্প বজায় রাখিবার জন্য তিনি কিন্তু এমন কথা একবারও জিহ্বাগ্রে আসিতে দিলেন না। স্বামীর ইচ্ছা, স্বামীর আদেশ তাঁহার যে অক্ষরে অক্ষরে মনে ছিল। মাণিককে দত্তক না দিলে আজ বিনয়েরই যে সর্ব্বস্ব, আর এই পুত্র-দানের জন্যও যে সে এই সম্পত্তির, বহু অর্থের অধিকারী! রাগ করিয়া যদি সে তাহা নাও লয়, তথাপি রাজেশ্বরীকে তো সে কথা মনে রাখিতে হইবে! ছলে তাহার পুত্র কাড়িয়া লইয়া আবার তাহাকেই তাড়াইয়া দেওয়া! না—না-বিনয় হাজার অপমান করিলেও রাজেশ্বরী তাহা পারিবেন না।

ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সঙ্কলন

সিদ্ধি

১

স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না এই তার পণ। তাই কঠিন সন্ধানে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েচে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে করে তার জন্যে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরণার জল।

ক্রমে তপস্যা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয় না, পাখীতে এসে ঠুক্‌রে খেয়ে যায়।

আরো কিছু দিন গেল। তখন ঝরণার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুখে ওঠে না।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, "এখন আমি করব কি? আমার সেবা যে বৃথা হতে চল্‌ল।"

তারপর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে যায়, তপস্বী জান্‌তেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে' ধরে' ছায়া করে' দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তপস্বীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপসের কোন ভয়ের কারণ নেই তবু সে পাহারা দেয়।

২

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হ'লে নবীন তপস্বী স্নেহ করে জিজ্ঞাসা করত, "কেমন আছ?"

কাঠকুড়নি বল্‌ত, "আমার ভালই কি আর মন্দই কি! কিন্তু তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই? তোমার মা? তোমার বোন?"

সে বল্‌ত, "আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কি? তারা কি আবার চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?"

কাঠকুড়নি বল্‌ত, "প্রাণ থাকে না বলেই ত প্রাণের জন্যে এত দরদ।"

তাপস বল্‌ত, "আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মানুষকে আমি অমর করব।"

এই বলে' সে কত কি বলে যেত, তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথার মানে বুঝবে কে?

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্তু আকাশে নব মেঘের ডাকে ময়ূরীর যেমন হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পরে আরো কিছুদিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পরে আরো কিছু দিন যায়। তপস্বীর চোখ বুজে এল, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল সে আর ঐ তাপসের মাঝখানে যেন তপস্যার লক্ষযোজন ক্রোশের দূরত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হয়ে একটুখানি কাছে আস্‌বার আশা নেই।

তা নাই বা রইল আশা। তবু ওর কান্না আসে, মনে মনে বলে, দিনে একবার যদি বলেন, কেমন আছ, তাহলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে যায়, একবেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তাহলে অন্নজল ওর নিজের মুখে রোচে।

৩

এদিকে ইন্দ্রলোকে খবর পৌঁছল, মানুষ মর্ত্ত্যকে লঙ্ঘন করে' স্বর্গ পেতে চায়—এত বড় স্পর্দ্ধা!

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বল্‌লেন, "দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহুবলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল, মানুষ স্বর্গ নিতে চায় দুঃখের বলে, তার কাছে কি হার মানতে হবে?"

মেনকাকে মহেন্দ্র বল্‌লেন, "যাও তপস্যা ভঙ্গ করগে।"

মেনকা বল্‌লেন, "সুররাজ, স্বর্গের অস্ত্রে মর্ত্ত্যের মানুষকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতেও স্বর্গের পরাভব। মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই?"

ইন্দ্র বল্‌লেন, "সে কথা সত্য।"

৪

ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হাওয়ার দোলা লাগ্‌তেই মর্ম্মরিত মাধবীলতা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তেমনি ঐ কাঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দন বনের হাওয়া এসে লাগ্‌ল। আর তার দেহ মন একটা কোন্ উৎসুক মাধুর্য্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। তার মনের ভাবনাগুলি চাক-ছাড়া মৌমাছির মত উড়তে লাগল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েচে।

ঠিক সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হ'ল। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জ্জন গিরিগুহায়। তাই সে চোখ মেলল।

সামনে দেখে, সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি খোঁপায় পরেচে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুসুম্ভ ফুলে রং করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন জানা সুর, যার পদগুলি মনে পড়চে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা কেবল রেখায় টানা ছিল—চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রং লাগিয়েচে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল। বল্‌লে, "আমি দূর দেশে যাব।"

কাঠকুড়নি জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কেন প্রভু?"

তপস্বী বল্‌লে, "তপস্যা সম্পূর্ণ করবার জন্য।"

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বল্‌লে, "দর্শনের পুণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত করবে?"

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেকক্ষণ ভাবল, আর কিছু বল্‌ল না।

৫

তার অনুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির বুকের একধার থেকে আর একধারে বারে বারে যেন বজ্রসূচি বিঁধতে লাগ্‌ল।

সে ভাব্‌লে, "আমি অতি সামান্য, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘট্‌বে?"

সে রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে বসে তার নিজেকে নিজের ভয় করতে লাগল।

তার পরদিন সকালে সে ফল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। সুখে তার মন ভরে উঠ্‌ল।

কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষ গাছের ছায়ায় তার চোখের জল আর থামতে চায় না। কি ভাব্‌লে কি জানি!

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে বল্‌লে, "প্রভু, আশীর্ব্বাদ চাই।"

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

মেয়েটি বল্‌লে, "আমি বহুদূর দেশে যাব।"

তপস্বী বল্‌লে, যাও, "তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক্।"

৬

একদিন তপস্যা পূর্ণ হল।

ইন্দ্র এসে বল্‌লেন, "স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেচ।"

তপস্বী বল্‌লে, "তা হলে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।"

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও?"

তপস্বী বল্‌লে, "এই বনের কাঠকুড়নিকে।"

সবুজ পত্র,
মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৮। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুনরাবৃত্তি

১

সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন।

দেখতে পেলেন প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে' খেলা করচে একটি ছোট ছেলে, আর একটি ছোট মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমরা কি খেল্‌চ?"

তারা বল্‌লে, "আমাদের আজকের খেলা রাম-সীতার বনবাস।"

রাজা সেখানে বসে' গেলেন।

ছেলেটি বল্‌লে, "এই আমাদের দণ্ডক বন, এখানে কুটীর বাঁধ্‌চি।"

সে একরাশ ভাঙা ডালপালা খড় ঘাস জুটিয়ে এনেচে, ভারি ব্যস্ত। আর মেয়েটি শাকপাতা নিয়ে খেলার হাঁড়িতে বিনা আগুনে রাঁধচে; রাম খাবেন, তারি আয়োজনে সীতার একদণ্ড সময় নেই।

রাজা বল্লেন, "আর ত সব দেখ্‌ছি, কিন্তু রাক্ষস কোথায়?" ছেলেটিকে মান্‌তে হল তাদের দণ্ডকবনে কিছু কিছু ত্রুটি আছে। রাজা বল্লেন, "আচ্ছা, আমি হব রাক্ষস।"

ছেলেটি তাঁকে ভালো করে' দেখ্‌লে। তার পরে বল্লে, "তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।"

রাজা বল্লেন, "আমি খুব ভালো হার্‌তে পারি। পরীক্ষা করে' দেখ।"

সেদিন রাক্ষসবধ এতই সুচারুরূপে হতে লাগ্‌ল যে, ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশ-বারোটা রাক্ষসের মরণ একলা মর্‌তে হল। মর্‌তে মর্‌তে তিনি হাঁপিয়ে উঠ্‌লেন।

ত্রেতা যুগে পঞ্চবটীতে যেমন পাখী ডেকেছিল সেদিন সেখানে ঠিক্ তেমনি করেই ডাক্‌তে লাগ্‌ল। ত্রেতাযুগে সবুজ পাতার পর্দায় পর্দায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক্ সেই সুরই বাঁধ্‌লে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল। মন্ত্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "ছেলে মেয়ে দুটি কার?"

মন্ত্রী বল্লে, "মেয়েটি আমারই, নাম রুচিরা। ছেলের নাম কৌশিক, ওর বাপ গরীব ব্রাহ্মণ, দেবপূজা করে' দিন চলে।"

রাজা বল্লেন, "যখন সময় হবে, এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হয় এই আমার ইচ্ছা।"

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস কর্‌লে না, মাথা হেঁট করে' রইল।

২

দেশে সব-চেয়ে যিনি বড় পণ্ডিত, রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়্‌তে পাঠালেন। যত উচ্চ বংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে রুচিরা।

কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অন্য সকলেও লজ্জা পেলে। কিন্তু রাজার ইচ্ছা। সকলের চেয়ে সঙ্কট রুচিরার। কেন না, ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয়, সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে, সে উত্তর করে না।

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ।

মনে হল সেটা খুব সহজেই ঘট্‌বে, কারণ, কৌশিক পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয়। তার সাঁতার কাট্‌তে মন, তার বনে বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভৎর্সনা করে' বলেন, "বিদ্যায় তোমার অনুরাগ নেই কেন?"

সে বলে, "আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও নানা জিনিষে।"

অধ্যাপক বলেন, "সে-সব অনুরাগ ছাড়।"

সে বলে, "তাহলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ থাকবে না।

৩

এমনি করে' কিছুকাল যায়।

রাজা অধ্যাপককে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"

অধ্যাপক বল্লেন, "রুচিরা।"

রাজা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আর কৌশিক?"

অধ্যাপক বল্লেন, "সে যে কিছুই শিখেচে এমন বোধ হয় না।"

রাজা বল্লেন, "আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ ইচ্ছা করি।"

অধ্যাপক একটু হাস্‌লেন, বল্লেন, "এ যেন গোধূলির সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব।"

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, "তোমার কন্যার সঙ্গে কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত হয় না।"

মন্ত্রী বল্লে, "মহারাজ, আমার কন্যা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।"

রাজা বল্লেন, "স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়!"

মন্ত্রী বল্লে, "তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্চে।"

রাজা বল্লেন, "সে কি মনে করে, কৌশিক তার অযোগ্য?"

মন্ত্রী বল্লে "হাঁ, সেই কথাই বটে।"

রাজা বল্লেন, "আমার সাম্‌নে দু-জনের বিদ্যার পরীক্ষা হোক্। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।"

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বল্লে, "এই পণে আমার কন্যার মত আছে।"

৪

বিচার-সভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে বসে' কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে। স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন। আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে প্রণাম ও রুচিকে নমস্কার কর্‌লে। কৌশিক রুচি দৃক্‌পাতও কর্‌লে না।

কোনো দিন পাঠশালার রীতিপালনের জন্যেও কৌশিক রুচির সঙ্গে তর্ক করেনি। অন্য ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে তাকে তর্কের অবকাশ দেয়নি। তাই আজ যখন তার যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীরের ফলায় আলোর মত ঝিকমিক্ করে উঠল তখন গুরু বিস্মিত

হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির রাখ্‌তে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

ক্রোধে অধ্যাপকের বাক্‌রোধ হল, আর রুচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

রাজা মন্ত্রীকে বল্‌লেন, "এখন বিবাহের দিন স্থির কর।"

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে বল্‌লে, "ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আমি করব না।"

রাজা বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "জয়লব্ধ পুরস্কার গ্রহণ করবে না?"

কৌশিক বল্‌লে, "জয় আমারই থাক্‌, পুরস্কার অন্যের হোক্‌।"

অধ্যাপক বল্‌লেন, "মহারাজ, আর এক বছর সময় দিন; তার পরে শেষ পরীক্ষা।"

সেই কথাই স্থির হল।

৫

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে' গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায় কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এদিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু রুচির সমস্ত মন কোথায়?

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, "এখনো যদি সতর্ক না হও, তবে দ্বিতীয় বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে।"

দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্যেই যেন সে তপস্যা করতে লাগ্‌ল, অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়্‌দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন কি, কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে' বল্‌লেন, "কপিল-কণাদের নামে শপথ করে' বলচি আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না। বেদ-বেদান্তের পার পেয়েছি, স্ত্রীজাতির মন বুঝ্‌তে পারলেম না।"

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বল্‌লে, "ভবদত্তর বাড়ি থেকে কন্যার সম্বন্ধ এসেচে। কুলে শীলে ধনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কন্যা কি বলে?"

মন্ত্রী বল্‌লে, "মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়?"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তার চোখের জল আজ কি রকম সাক্ষ্য দিচ্চে?"

মন্ত্রী চুপ করে' রইল।

৬

রাজা তাঁর বাগানে এসে বস্‌লেন। মন্ত্রীকে বল্‌লেন, "তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

রুচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

রাজা বল্‌লেন, "বৎসে, সেই রামের বনবাসের খেলা মনে আছে?"

রুচিরা স্মিতমুখে মাথা নীচু করে' দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বল্‌লেন, "আজ সেই রামের বনবাস খেলা আর একবার দেখ্‌তে আমার বড় সাধ।"

রুচিরা মুখের একপাশে আঁচল টেনে চুপ করে' রইল।

রাজা বল্‌লেন, "বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু শুনচি বৎসে, এবার সীতার অভাব ঘটেচে। তুমি মনে করলেই সে অভাব পূর্ণ হয়।"

রুচিরা কোনো কথা না বলে' রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।

রাজা বল্‌লেন, "কিন্তু, বৎসে, এবার আমি রাক্ষস সাজ্‌তে পারব না।"

রুচিরা স্নিগ্ধ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাজা বল্‌লেন, "এবার রাক্ষস সাজ্‌বে তোমাদের অধ্যাপক।"

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লেখা

মাঝে মাঝেই শুনতে পাই লোকে জিজ্ঞাসা করে—"লিখে কার কি উপকার করা হয়?" থেকে থেকে এ প্রশ্ন নিজের মনেও উদয় হয়। বিশেষতঃ যে যুগে অসংখ্য লোক লেখে ও নিত্য লেখে, সে যুগে এই রাশি রাশি ছাপা কাগজের যে বিশেষ কিছু মূল্য আছে সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন। এ পৃথিবীতে মানুষ বহুদিন মোটে লেখেই নি, এবং অক্ষর আবিষ্কারের পরেও বহুদিন, অতি অল্প লিখেছে। আমার মনে হয়, পৃথিবীর অতীত সাহিত্য যে classics অর্থাৎ অমূল্য হয়ে উঠেছে, তার একমাত্র কারণ অতীতে বই লিখ্‌বার রেয়াজ ছিল না। যদি প্রাচীন গ্রীসে ছাপাখানা থাকত ত "ইলিয়াড" অমূল্য রত্ন হয়ে উঠ্‌ত না। কালিদাসকে যদি দৈনিক পত্রের এডিটারি করতে হত, তাহলে তিনি "মেঘদূত" রচনা করতে পারতেন না একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। আমাকে জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলেছিলেন যে একালে আমরা যাদের এডিটার বলি—সেকালে লোক তাদের পুরাণকার বলত। কথাটা শুনে প্রথম আমার একটু চমক্‌ লাগে। মনে হল পণ্ডিতমশার ঠিক বলেছেন। এডিটার ও পুরাণকার উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, লোক শিক্ষা দেওয়া, আর উপায়ও ত এক, রূপকথাকে স্বরূপ কথা বলে চালিয়ে দেওয়া। পরে ভেবে দেখ্‌লুম এই দুই দলের ভিতর একটা মস্ত প্রভেদ

আছে। পুরাণকারেরা লিখ্তেন অতি অল্প আর এডিটারেরা লেখেন অতি বেশী। এ যুগের একদিনের সংবাদপত্র, সেকালের অষ্টাদশ পুরাণের চাইতে বেশী কাগজ জোড়ে। ফলে, পুরাণ আমরা আজও পড়ি কিন্তু কাল্‌কের খবরের কাগজ আজ কেউ পড়ে না। লেখার এই অপর্য্যাপ্ত আমদানী দেখে King Solomon এর সেই পুরোণো কথা মনে পড়ে যায়—"Of making many books there is no end and too much study is weariness to the flesh—" অথচ Solomonএর সময় শুধু বই ছিল, খবরের কাগজ ছিল না, তা থাক্‌লে বোধ হয় তিনি "পত্রানল" করতেন। লেখা জিনিষটে অনর্থক হলেও ত টি'কে আছে, শুধু তাই নয়, অসম্ভব রকম বেড়েও চলেছে। যে হিসেব থেকে তিনি লেখার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়েছিলেন, সে হিসেব থেকে শুধু লেখা কেন, মানুষের সকল কাজই অনর্থক হয়ে পড়ে। অনন্ত কালের দিক থেকে দেখ্‌লে মানুষের সকল কর্ম্ম সকল চেষ্টা ধূলো হয়ে যায়। তখন বল্‌তে হয়, vanity of vanities, all is vanity; ভাষান্তরে, জগৎ মিথ্যা অথবা "দুনিয়া ফানা হ্যায়।"

দুনিয়ার দিক থেকে নয়, নিজের দিক থেকে দেখ্‌ছি যে আমি যত বেশী লিখ্‌ছি, লেখার উপর তত আমার বিতৃষ্ণা জন্মাচ্চে। কলম ধর্‌লেই আমরা আর সহজ মানুষ থাকি নে, তখন যে কথা আমাদের মুখে টপ্ করে আসে, সে কথা আমরা চট্ করে বল্‌তে পারি নে। মুখের কথার চাইতে কলমের কথার পরমায়ু কিঞ্চিৎ বেশী। লেখকদের কথার এই স্থায়িত্ব মূলেই তাঁদের মনে একটা বিশেষ দায়িত্বজ্ঞান জন্মায়। ফলে, তাঁরা তাঁদের কথা প্রথমত সাজিয়ে গুছিয়ে বল্‌তে চান তারপর সে কথার সত্যতা সম্বন্ধে নানারূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন। লেখক মাত্রেরই বিশ্বাস যে তাঁরা লোকসমাজের স্বেচ্ছাসেবক-শিক্ষক অতএব তাঁদের কলমের মুখ দিয়ে এমন কথা বেরনো উচিত যার আর মার নেই। এই অমর কথা বল্‌বার লোভেই তাঁরা তাঁদের মনকে জড় কর্‌তে বাধ্য হন, কেন না এ বিশ্বে একমাত্র জড়-পদার্থই মৃত্যুর অধীন নয়। মনের জ্যান্ত ভাবকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবার একমাত্র উপায় যে, জন্মাতে না জন্মাতে সেটিকে মারা, এই বিশ্বাসই হচ্চে আমাদের সকল লেখার পাকা বনেদ। এই সত্যটা যখন মনে পড়ে, এবং আমার তা নিত্যই মনে পড়ে, তখন কলম ধরবার প্রবৃত্তি আর থাকে না। সাহিত্যের বাণী যে জজের রায় নয়, পাণ্ডিতের বিচার নয়, পুরোহিতের মন্ত্র নয়, প্রভুর আদেশ নয়, গুরুর উপদেশ নয়, বক্তার বক্তৃতা নয়, এডিটারের আপ্তবাক্ নয়—এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে না পার্‌লে লেখকের আর মুক্তি নেই। আর পাকা কথা বল্‌তে গেলেই আমাদের কথা উপরোক্ত বাক্যাবলীর এক কোঠায় না এক কোঠায় পড়ে যাবে। সম্ভবত তা' একসঙ্গে ঐসব কোঠায় পড়ে যাবে, অতএব না লেখাই শ্রেয়ঃ।

বেতাল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯। বীরবল।

মুখস্থ-বিদ্যা

আমরা এ দেশে যে সব মুখস্থবিদ্যাক্লিষ্ট মানুষ দেখতে পাই, যারা আচার্য্য হবার জন্যে কিম্বা একটা বড় চাকরী পাবার জন্যে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানা রকম পরীক্ষা আর প্রতিযোগিতা করে' আসছে—তারা যখন অভীপ্সিত স্থানে উপস্থিত হয়, তখন তাদের নতুন কিছু করবার আর শক্তি থাকে না। পড়া ঘুষে ঘুষে তাদের মনটা একেবারেই মরে গেছে—জগতের, সে রকম লোকের নিকট থেকে কিছু আশা করাই বৃথা।

আমাদের দেশের লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা দিয়েই একমাত্র শিক্ষার বহরটা মাপে। তাই তারা শিক্ষা-পদ্ধতির আবার ভালমন্দ কি তা বুঝতে পারে না। কিন্তু শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পেলেই ত শিক্ষার প্রমাণ হ'ল না—জীবনে সে শিক্ষা কি ফল প্রসব করে সেইটা দেখেই তবে শিক্ষার ভাল মন্দ বিচার করা যেতে পারে। জীবন কি হবে সেটা জীবনের সংস্কারের ও চরিত্রের উপরই নির্ভর করে। এই বিশিষ্ট সংস্কার সৃষ্টি করবার জন্যে বিশিষ্ট-শিক্ষা পদ্ধতি দরকার। এই শিক্ষা-পদ্ধতির ভালমন্দর উপর তাই সত্যই জীবনের ভাল মন্দ নির্ভর করছে—কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতি যাই হ'ক উপাধি পাবার সময় তাতে কিছু এসে যায় না, এবং সেইজন্যে কি উপাধি পেলুম তাতে জীবনেরও কিছু উন্নতি অবনতি নির্ভর করে না।

পরীক্ষায় পাশ করতে কতদিন দরকার হয়?—অর্থাৎ কতদিন পাঠগুলি মনে থাকলে শিক্ষাগারে বেশ ভাল করে' উত্তর দেওয়া যায়?—দুই পাঁচ দিন, দশ দিনের বেশী ত নয়। এই অল্প সময় পড়াটা আয়ত্ত করে' রাখবার জন্যে স্মৃতি অর্থাৎ মুখস্থ বিদ্যেটাই যথেষ্ট—আর এই উপায়টা সহজ। তা ছাড়া শিক্ষা শেষে কেমন চরিত্র, সামর্থ্য বা জ্ঞান হ'ল সেগুলো পরীক্ষা করবার আমাদের দেশে যখন কোন ধারাই নেই তখন সেই চরিত্র, সামর্থ্য বা উপলব্ধি পাবার যে কিছু আবশ্যক আছে তা আমাদের দেশের লোকে বুঝতে পারে না।

ইংরাজরা সম্প্রতি একটা মজার ঘটনার ভেতর দিয়ে এই পরীক্ষা প্রতিযোগিতার গোড়ায় কি গলদ রয়েছে তা বুঝতে পেরেছে। তারা বুঝেছে পাশ করার সঙ্গে চরিত্রের কোন সম্বন্ধই নেই। কিছুদিন পূর্ব্বে সিভিল সারভিস অধিকার পাবার জন্যে ভারতের কাগজগুলারা এমন চীৎকার আরম্ভ করলে যে কর্ত্তৃপক্ষকে এইজন্য একটা পরীক্ষা প্রতি-

যোগিতার সৃষ্টি করতে বাধ্য হতে হ'ল। সেই প্রতিযোগিতায় যে উত্তীর্ণ হ'ত সেই সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা বড় রকমের শাসন-ভার পেত। এখন শেষে হল কি যে বাঙ্গালী বাবুরা—তাদের স্মৃতিশক্তি এমন ক্ষুরধার—তারা মুখস্থ করেই সব ইউরোপীয়দের পিছনে ঠেলে পরীক্ষায় প্রধান স্থান অধিকার করতে লাগল। কিন্তু শেষে তাদের কর্ম্মের মধ্যে যখন সততা, বিচারশক্তি অথবা শাসন-সামর্থ্যের নাম-গন্ধ পাওয়া গেল না—যখন দেখা গেল, এই রকম লোকের হাতে দেশের শাসন-ভার থাকলে ভারত শীঘ্রই গোলমালের লীলা-নিকেতন হয়ে দাঁড়াবে, তখন ইংরাজদের অনেক ঘোরফের করে তবে এই বাঙ্গালী বাবুদের হাত থেকে সাম্রাজ্যটাকে উদ্ধার করে', তাদের মৌখিকতঃ দেশের সকল শাসন-ভার গ্রহণ করবার অধিকার থাকলেও কার্য্যতঃ তাদের শাসন কর্ম্ম থেকে দূরে রাখতে হ'ল। ইংরাজ উপনিবেশ সমূহের (ইংরাজ) সৌভাগ্যের একমাত্র কারণ তাদের শাসনপদ্ধতি—একথা যে ইংরাজ উপনিবেশ দেখেছে সে কিছুতেই না বলবে না। এটা খুব ঠিক কথা যে বই পড়ে মানুষের সেই গুণগুলো জন্মায় না যাতে করে' বড় শাসন-কর্ত্তা হওয়া যায়—যাতে করে' রাজ্যচালন-সামর্থ্য ফুটে ওঠে, অব্যর্থ বিচার শক্তি হয়, পুস্তক কখনই সেই সব মানুষের জন্ম দেয় না যারা ঠিক ভাবে লক্ষ্য কোটী মানুষকে চালাতে পারে—যারা একটা বিপদসঙ্কুল অভিযানকে সুসম্পন্ন করতে পারে।

পরীক্ষা-প্রতিযোগিতা থেকে কখনও মানুষের চরিত্রটা বুঝতে পারা যায় না। এমন কি বুদ্ধি-শক্তিরও এখানে মাপ পাওয়া শক্ত। এখানে কেবল মাপ পাওয়া যায় স্মৃতি-শক্তির। তাই জার্ম্মাণরা, বহুদিন থেকে, পরীক্ষার ফল দেখে কোন কর্ম্মচারীরই নিয়োগ করে না—শিক্ষক নিয়োগও নয়। তারা ব্যক্তিগত কর্ম্ম, সৃষ্টি, আবিষ্কার, ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাস দেখেই ভবিষ্যৎ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করে। এই উপায়েই এখানকার শিক্ষকবাহিনীটা জগতের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আর আমাদের শিক্ষকতা সেই যেখানে সেইখানেই পড়ে আছে।

'শিক্ষামনস্তত্ত্ব', প্রবর্ত্তক, বৈশাখ ১৩২৯।

অনুবাদক—শ্রীহারাধন বক্সী।

সাদীর গার্হস্থ্য-জীবন

সাদীর শৈশব-কাল সুখের ক্রোড়ে অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু পিতামাতার অকাল মৃত্যু তাঁহার বাল্যকালের সমস্ত সুখ অপহরণ করিয়াছিল। তিনি একটি গজলে বিলাপ করিয়া লিখিয়াছেন, যদি অনাথ বালক দুঃখে চোখের জল ফেলে, তবে কে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে? যদি সে বালক অশান্ত হইয়া উঠে, তবে কে তাহার সে খেয়াল সহ্য করিবে? তোমরা অনাথ বালকের দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্ন করিও; কারণ অনাথের ক্রন্দনে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠে। এক সময়ে আমি পিতার বুকে মাথা রাখিতে পারিতাম, সে সময় আমার মস্তক মুকুট-শোভিত রাজার মস্তকের ন্যায় উন্নত ছিল। একটি সামান্য মক্ষিকা আমাকে দংশন করিলে সমগ্র পরিবার ভীত হইত, কিন্তু এখন শত্রু আমাকে বন্দী করিলেও উদ্ধার করিবার জন্য বন্ধু কেহ নাই।

তাঁহার হৃদয়ে মাতার স্মৃতিও অতি উজ্জ্বল ছিল, তিনি গোলেস্তার একটি গজলে লিখিয়াছিলেন, একদিন বাল্যসুলভ চাপল্যবশতঃ আমি মাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, মা আমার, আমার কটুবাক্যে ব্যথিত হইয়া গৃহকোণে বসিয়া চোখের জল ফেলিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন, তুমি শৈশবকালের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, তাই আমাকে কটু বাক্য বলিতেছ। একজন বৃদ্ধা তাঁহার পুত্রকে ব্যাঘ্রের মত শক্তিশালী এবং হস্তীর মত অজেয় দেখিয়া ঠিক বলিয়াছিলেন, তোমার কি সেই শৈশবকালের কথা মনে পড়ে, যে সময় অসহায় শিশু তুমি, আমার বুকে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে? এখন আমি বৃদ্ধা হইয়াছি, আর তুমি সিংহের মত বীর হইয়া উঠিয়াছে, আমাকে বর্ব্বরোচিত ক্রোধ-সংকারে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে।

শেখ সাদীর দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি দাম্পত্য জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম পত্নীর বিবরণ আমরা গোলেস্তান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

আমি দামস্কাস নগরে বাস করিতেছিলাম, তথাকার বন্ধুদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পবিত্র তীর্থ জেরুজিলাম গমন করি এবং সেখানে নির্জ্জনবনে বাস করিতে থাকি। ইহার পর ফ্রাঙ্কদের হস্তে বন্দী হই। তাহারা আমাকে কতিপয় ইহুদিসহ ট্রিপলিতে মৃত্তিকা খনন কার্য্যে নিযুক্ত করে। এই সময় আলিপোর একজন সামন্তের সহিত আমার দেখা হয়। পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এ কি! কিরূপে তোমার এ দশা হইল? আমি উত্তর করি, কি বলিব? আমি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনে, পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, পরমেশ্বরই আমার ভরসা, আর কোন ভরসা নাই। আমি পশুতুল্য লোকের সহিত একত্র বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি, আমার কি দশা হইবে, তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন। অপরিচিত লোকের সঙ্গে উদ্যান ভ্রমণ অপেক্ষা সহচরের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বাস সুখকর। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি দুঃখিত হন এবং দশ দিনার দিয়া ফ্র্যাঙ্কদের হাত হইতে আমাকে মুক্ত করেন। তারপর আমাকে গৃহে লইয়া যান এবং একশত দিনার যৌতুক-সহ তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেন। আমি শীঘ্রই এই রমণীকে কলহ-পরায়ণা এবং দুর্ম্মুখ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম,

তাহার ক্রূর স্বভাব এবং দূষিত বাক্য ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল, তাহাতে আমার সমস্ত গার্হস্থ্য সুখ বিনষ্ট হইয়া গেল। শান্তি-প্রিয় লোকের কলহ-কারিণী পত্নী ইহলোকেই নরকের সৃষ্টি করে, হে প্রভো! দুর্দ্দান্ত গৃহ-বাসিনীর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, সাবধান কর। যন্ত্রণা, নরক অথবা অগ্নি হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। একদিন এই রমণী যথার্থ ভাবে তিরস্কার করিতে করিতে আমাকে বলিল, আমার পিতা কি তোমাকে ফ্র্যাঙ্কদের হস্ত হইতে দশ দিনার জরিমানা দিয়া মুক্ত করেন নাই? আমি উত্তর করিলাম, তুমি সত্য বলিয়াছ, তিনি আমাকে দশ দিনার দ্বারা বন্দীর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া তোমার নিকট একশত দিনারের জন্য দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি যে, একবার একজন শ্রদ্ধাভাজন এবং শক্তিশালী ব্যক্তি ব্যাঘ্রের কবল হইতে একটি মেষ-শাবককে উদ্ধার করিয়াছিল। কিন্তু তারপর সেই রাত্রিতে নিজেই তাহার গলায় ছুরি বসাইয়া দিয়াছিল। ইহার পর মেষ-শাবকের আত্মা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলে, তুমি আমাকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলে। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, তুমি নিজেই আমার সহিত ব্যাঘ্রের মত ব্যবহার করিয়াছ।

শেখসাদী তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী সম্বন্ধে স্বীয় কাব্যে কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার কবিতাবলীর স্থানে স্থানে স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে যেরূপ বিরূপতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে অনুমান করা যায় যে এই পত্নীও তাঁহাকে সুখী করিতে পারে নাই।

শেখসাদী পত্নী লাভ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই। বন্ধু লইয়াও তাঁহার অদৃষ্টে অসুখ ঘটিয়াছে।

চতুর্দ্দিকের দুর্ব্ব্যবহার এবং অপ্রীতির মধ্যে একবার সাদীর অদৃষ্টে বিদ্যুচ্ছটার মত সুখ-লাভ ঘটিয়াছিল, তিনি পুত্র-মুখ সন্দর্শন করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দের আস্পদ পুত্রও অকালে ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

এই সময় হইতে সাদী ফকিরের মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া অথবা দরবেশের মত নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। এই ভাবে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইয়াছিল। সাদী সরল প্রাণে লিখিয়া গিয়াছেন, আমার দুরদৃষ্ট নীরবে সহ্য করিতেছি, একদা আমি অর্থাভাবে পাদুকা ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, নগ্ন পদে বেড়াইতেছিলাম, এরূপ সময়ে একজন খঞ্জকে দেখিয়া জ্ঞানলাভ করিলাম, পরমেশ্বরকে তাঁহার কৃপার জন্য ধন্যবাদ দিয়াছিলাম।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বৈশাখ, ১৩২৯। শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

বাঙলার একখানি প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার

অল্পদিন হইল প্যারিসের জাতীয় পুস্তকাগার (Biblio-theque Nationale) একখানি অদ্বিতীয় প্রকাণ্ড হস্তলিপি পাইয়াছে, যাহাতে ১৬০৮ হইতে ১৬২৪ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার বিস্তৃত সম্পূর্ণ ও অমূল্য সমসাময়িক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বইখানির নাম "বহারিস্তান-ই ঘাইবী"। মির্জা সহন্ (বা সহিন্) আলাউদ্দীন্ ইস্ফাহানী ইহার রচয়িতা। জহাঙ্গীর তাঁহাকে শিতাব খাঁ উপাধি দেন; মুসলমান জগতে প্রায় প্রত্যেক কবি ও গ্রন্থকারই একটা ছদ্মনাম (তাখাল্লুস্) লইতেন; ইঁহার ছদ্মনাম "ঘাইবী" ছিল। ইঁহার পিতা মালিক আলি সম্রাটের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং ইহতমাম খাঁ উপাধি পান। মির্জা সহন্ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু পারসীক জাতীয় "ইস্ফাহানী" বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধেক মির্জা সহনের বঙ্গদেশে যুদ্ধের বিবরণে পূর্ণ, সুতরাং ইহাকে "শিতাব খাঁর আত্মকাহিনী" নাম দিলে মন্দ হয় না।

বহারিস্তান চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। সমগ্র গ্রন্থে ৬৫৬ পৃষ্ঠা, প্রতি পৃষ্ঠায় ২১ পংক্তি। প্রথমভাগে ২৮২ পৃষ্ঠা, ইহাতে ইস্লাম খাঁর সুবাদারীর অর্থাৎ ১৬০৮ হইতে ১৬১৪ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার বিবরণ। দ্বিতীয়ভাগে কাসিম খাঁর সুবাদারীর ইতিহাস (১২০ পৃষ্ঠা।) তৃতীয়ভাগে ইব্রাহিম খাঁর বঙ্গ শাসন এবং যুবরাজ শাহজহানের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে (১৮০ পৃষ্ঠা)। চতুর্থভাগে বিদ্রোহী শাহ জহান কর্তৃক বঙ্গ অধিকার এবং তাঁহার পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন নিবদ্ধ আছে (৭৪ পৃষ্ঠা)।

বঙ্গের জমিদারগণের এবং কুচবিহার কুচহাজো (অর্থাৎ কামরূপ) আসাম এবং ত্রিপুরার রাজগণের অতি বিস্তৃত ও নূতন বিবরণে এই গ্রন্থ অমূল্য করিয়াছে।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৯। শ্রীযদুনাথ সরকার

দৃষ্টি ও সৃষ্টি

ভাবুক যাঁরা সচরাচর যান্ত্রিক দৃষ্টি যাঁদের নয় তাঁদেরই পক্ষে সহজ হয় শিশুদের মতো হৃদয় দিয়ে আত্মীয়ভাবে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে বিশ্বের গোপন কথা বলা।

কাযের দৃষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সৃষ্টির জিনিষকে জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থ ভাবে সৃষ্টির সামিগ্রী স্পর্শ করে। কাযের মানুষ দেখে কেম্বিসটা পর্দা কি ব্যাগ অথবা জাহাজের পাল প্রস্তুতের বেশ উপযুক্ত, কিন্তু ভাবুক অমন মজবুত কাপড়টা একটা ছবি দিয়ে ভরে দেবারই ঠিক উপযোগী ঠাউরে নেয়। সাদা পাথর, কাযের দৃষ্টি বলে সেটা পুড়িয়ে চুণ করে

ফেল, ভাবুক দৃষ্টি বলে সেটাতে মূর্ত্তি বানিয়ে নেওয়াই ঠিক। নির্ম্মম স্বার্থদৃষ্টি কাযের চোখ নিয়েই সাধারণ মানুষ নিজের মুঠোয় ফুটন্ত ফুলগুলোর গলা চেপে ধরে বলির পাঁঠার মতো সেগুলোকে বাগানের বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পূজোর ঘরের দিকে চলে, আর ভাবুক যে দৃষ্টি নিয়ে ফুলের দিকে চায় তাতে স্বার্থের ভার এত অল্প যে প্রজাপতি কি মৌমাছির পাতলা ডানার অত্যন্ত লঘু অতি কোমল পরশও তার কাছে হার মানে। অতি মাত্রায় সাধারণ অত্যন্ত কাযের দৃষ্টি সেটা ফুলের গুচ্ছকে পরকালের পথ পরিষ্কারের ঝাঁটা বলেই দেখছে, ছেলেবেলার কৌতূহল দৃষ্টি যেটা রাঙ্গা ফুলের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে ডাকাতের মতো বাগান থেকে বাগানের শোভাকে লুটে নিয়ে খেলতে চাচ্ছে, কিম্বা বিলাসের দৃষ্টি যেটা ফুলগুলোর বুকে সূঁচ বিঁধে বিঁধে ফুলের ফুলশয্যা রচনা করে তার উপরে লুণ্ঠন বিলুণ্ঠন করে ফুলের শোভা মলিন করে দিয়ে যাচ্ছে এদের চেয়ে ভাবুকের দৃষ্টি কতখানি নিঃস্বার্থ নির্ম্মল অথচ আশ্চর্য্যরকম ঘনিষ্ঠভাবে ফুলকে দেখলে, ভাবুকের লেখাতেই ধরা রয়েছে—

চল চলরে ভঁবরা কঁবল পাস
তেরা কঁবল গাবৈ অতি উদাস।
খোজ করত বহ বার বার
তন বন ফুল্যো ভার ভার॥ কবীর

কবি কালিদাস এই দৃষ্টি দিয়েই দুষ্মন্ত রাজাকে দেখালেন শকুন্তলার রূপ—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ···মধুনবমনাস্বাদিতরসম্!

কিন্তু রাজার বিদূষকের ইন্দ্রিয়পরায়ণ দৃষ্টি অত্যন্ত মোটা পেটের মতনই মোটা ছিল কাযেই রাজার কাছে শকুন্তলার বর্ণন শুনে সে পিণ্ডি খেজুর আর তেঁতুলের উপমা রাজাকে শোনাতে বসে গেল। রাজা বিদূষককে ধমকে বল্লেন—

অনবাপ্ত চক্ষুঃ ফলোঽসি, যেন ত্বয়া দ্রষ্টব্যানাং পরং ন দৃষ্টম্॥

দিন রাতের মধ্যে যে সব ঘটনা হঠাৎ ঘটে কিম্বা আকস্মিক ভাবে উপস্থিত হয় প্রতিদিনের বাঁধা চালের মধ্যে সেগুলোকে মানুষ খুব কাযে ব্যস্ত থাকলেও অন্ততঃ এক পলের জন্যেও মন দিয়ে না দেখে থাকতে পারে না। পাড়ার যে ছেলেটা প্রতিদিন বাড়ির সামনে দিয়ে ইস্কুলে যায় তাকে দুএকদিনেই চিনে নিয়ে চোখ ছেলেটার দিকে ফেরা থেকে ক্ষান্ত থাকে, কিন্তু সেই ছেলেটা হঠাৎ বাঁশি বাজিয়ে বর সেজে দুয়োর গোড়া দিয়ে শোভা-যাত্রা করে যখন চলে তখন নয়ন মন শ্রবণ সবাই দৌড়ে দেখতে চলে, আর সেই দেখাটাই মনের মধ্যে লুকোনো রস জাগিয়ে দেয় হঠাৎ। তাং রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো, নার্য্যোনজগ্মু র্বিষয়ান্তরাণি তথাপি শেষেন্দ্রিয় বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরৈব প্রবিষ্টা। বিশ্ব জগৎ একটা নিত্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে ভাবুকের কাছে দেখা দেয় এবং সেই দেখা ধরা থাকে ভাবুকের রেখার টানে, লেখার ছন্দে, বর্ণে ও বর্ণনে, কাযেই বলা চলে বুদ্ধির নাকে চড়ানো চলতি চশমার ঠিক উল্টো এবং তার চেয়ে ঢের শক্তিমান চশমা হল মনের সঙ্গে যুক্ত ভাবের চশমা খানি।

সন্ধ্যা কতদিন ধরে যার সঙ্গে দেখা শোনা হয়ে আসছে তাকে এমন করে দেখা কজন দেখলে? নিত্য সন্ধ্যার হাওয়াটা গড়ের মাঠে গিয়ে খেয়ে এসে এবং পূজো বাড়িতে গিয়ে শাঁখঘণ্টা শুনে এসে আমরা পুঁথিগত ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্র গুলোর চেয়ে একটুও অধিক দেখতে শুনতে পেলেম না কিন্তু কবীর তিন ছত্রে সমস্ত সন্ধ্যার প্রাণটি এক মুহূর্ত্তে টেনে আনলেন আমাদের দিকে—

সাঁঝ পড়ে দিন বীতরে
চকরী দীন্‌হা রোয়।
চল চকরা বা দেশকো
জঁহা রৈন ন হোয়॥

এ কোন্ অগম্য দেশের খবর এসে পৌঁছল: রাত্রির পরপারে যুগল তারায় রাজত্বে যাবার সকরুণ ডাক, ভীরু-পাখীর গলার সুর ধরে এ কোন চিরমিলনের বাণী অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছল —যারা দেখেও দেখছে না শুনেও শুনছে না ধরেও ধরতে পারছে না তাদের কাছে।

অভিনিবেশ করে বস্তুতে ঘটনাতে নিবিষ্ট হবার শিক্ষাও সাধনায় আপনার কার্য্যকরী ইন্দ্রিয় শক্তি সকলকে নতুনতরো শক্তিমান করে তুল্লেন যে মুহূর্ত্তে ভাবুক—সৌন্দর্য্যে অর্থে সম্পদে সৃষ্টির জিনিষ ভরে উঠলো, জগৎ এক অপরূপ বেশে সেজে দাঁড়ালো মানুষের মনের দুয়ারে, বারমহল ছেড়ে অভ্যাগত এল যেন অন্দরের ভিতর ভালবাসার রাজত্বে। রসের স্বাদ অনুভব করলে মানুষ যেটা সে কিছুতে পেতে পারতো না যদি সে ইন্দ্রিয় সমস্তকে কেবলি প্রহরী ও মজুরের কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখতো বুদ্ধির কোঠার দেউড়িতে: এই নতুন শিক্ষা নতুন সাধনা যখন মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো লাভ করলে, তখন মানুষের কণ্ঠ শুধু বলা কওয়া হাঁক ডাক করেই বসে রইলো না সে গেয়ে উঠলো, হাতের আঙুলগুলো নানা জিনিষ স্পর্শ করে নরম গরম কঠিন কি মৃদু ইত্যাদির পরখ করেই ক্ষান্ত হল না, তারা সংযত হয়ে তুলি বাটালি সূঁচ হাতুড়ি এমনি নানা জিনিষকে চালাতে শিখে নিলে, বীণা যন্ত্রের উপরে সুর ধরতে লাগলো হাত, আঙুলের আগা শুধু লোহার তারকে তার মাত্র জেনেই ক্ষান্ত হল না, সুরের তার পেয়ে যন্ত্রের পর্দ্দায় পর্দ্দায় বিচরণ করতে থাকলো আঙুলের পরশ গুন্ গুন স্বরে ফুলের উপরে ভ্রমরের মতো, কোলের বীণার সঙ্গে যেন প্রেম করে চল্লো হাত কান শুনতে লাগলো প্রেমিকের মতো কোলের বীণার প্রেমালাপ। সরু সূঁচের, সোনার সুতোর, রংএ

তরা তুলির সজীব ছন্দ ধরে তালে তালে চল্লো আজ্ল, হাতুড়ি বাটালির ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য করতে শিক্ষা নিলে শিল্পীর হাত কাযের ভিড় থেকে মানুষের চোখ হাত সেই সঙ্গে মনও ছুটী পেয়ে খেলাবার ও ডানা মেলাবার অবসর পেয়ে গেল।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে এই অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি এইটুকুই ভাবুকের সাধনার চরম হল তা তো নয়, সৃষ্টির বাইরে যা তাকেও ধরবার জন্যে ভাবুক আরো এক নতুন নেত্র খুল্লেন—চোখের দৃষ্টি যেখানে চলে না দূরবীক্ষণের দূরদৃষ্টিরও অগম্য যে স্থান মানুষ আর এক নতুন দৃষ্টির সাধনার বলীয়ান হয়ে নিজের মনের দেখা নিয়ে বিশ্বরাজ্যের পরপারেও সন্ধানে বেরিয়ে গেল—সেই রাজত্বে যেখানে সৃষ্টির অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করে স্রষ্টা রয়েছেন গোপনে!

"যথাদর্শে তথাত্মনি:যথাপ স্বপরিব তথা গন্ধর্ব্ব-লোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে।"

এই ব্রহ্মলোক যেখানে ছায়া-তপে সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে, গন্ধর্ব্ব-লোক যেখানে রূপ ও সুর উভয়ে জলের উপরে যেন তরঙ্গিত হচ্ছে, এবং আত্মার মধ্যে যেখানে নিখিলের সমস্তই দর্পণের মতো প্রতিবিম্বিত দেখা যাচ্ছে সমস্তই দিব্য দৃষ্টিতে পরশ ও পরখ করে নিলে মানুষ। দর্শকের ও শ্রোতার জায়গায় বসে মানুষ দেখবার মতো করে দেখলে, শোনবার মত করে শুনে নিলে। দেখা শোনা পরশ করার চরম হয়ে গেল তার পর এল দেখানোর পালা। মানুষ এবারে আর এক নতুন অদ্ভুত অনিয়ন্ত্রিত অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টি সাধন করে গুণী শিল্পী হয়ে বসলো। এই দৃষ্টি বলে আপনার কল্পনালোকের মনোরাজ্যের গোপনতা থেকে মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি বার করে আনতে লাগলো যে এতদিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক, স্রষ্টা হয়ে বসলো দ্বিতীয় স্রষ্টা। অরূপকে রূপ দিয়ে অসুন্দরকে সুন্দর করে অবোলাকে সুর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ, রংহীনকে রং দিয়ে চল্লো মানুষ—

"প্রেমের করুণ কোমলতা
কুটিল তা'
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে!"

বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯।   শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নববর্ষ

আজ আমাদের নববর্ষের উৎসবের দিন। যিনি চিরনবীন তিনি গ্রহতারালোকিত মহারথে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চির-জীবনের পথে সংসারকে নিরত বহন করে নিয়ে চলেছেন। আজ আমরা সেই অমৃতস্বরূপের আশীর্ব্বাদ অন্তরে গ্রহণ করে জীবনকে মৃতসঞ্জীবনীরসে অভিষিক্ত করব।

আমরা আজ বাইরের জগতের দিকে চেয়ে নূতনের উৎসবকে দেখতে পাচ্ছি। প্রকৃতিতে পুনঃ পুনঃ নূতনের আবর্তন হচ্ছে। পৃথিবী যেখান থেকে সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ সুরু করেছিল আজ বৎসরান্তে সেখান থেকেই আবার তার যাত্রার আরম্ভ হল। এই আবর্ত্তনের মধ্যে বিচ্ছেদ নেই। যে সব ফুল গত বৈশাখে ফুটেছিল আজ আবার সেই চাঁপা-বেল-জুঁই, নূতন ঋতুতে সব আনন্দের সরসতার আবির্ভূত হল। তাদের ক্লান্তি নেই, অবসাদ হয় না, তারা বিনষ্ট হয় নি; তারা মহাপ্রাণের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত ছিল, তাই আবার ফিরে এল। তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের ললাটে জরার বলীরেখা নেই—আজ চারিদিকে শুনতে পাচ্ছি নূতনের জয়ধ্বনি।

কিন্তু মানুষের জীবনে নবীনতার অর্থ আরো গভীর। পুনরাবৃত্তির মধ্যেই তার জীবন-লীলার পরিচয় নয়। আমরা বাইরের বিশ্বে চেয়ে দেখি, গাছের মধ্যে তার প্রকাশ একটা পূর্ণতায় এসে ঠেকেছে, তাই সে ক্রমাগত একই ফুলকে জন্ম দিচ্ছে ফোটাচ্ছে, একই ফলকে ফলাচ্ছে। এর চেয়ে বেশী তার কাছে দাবী নেই। কিন্তু মানুষের প্রাণপুরুষের বিশ্রাম নেই, সে তার গন্তব্যে এসে পৌঁছয়নি। সে যে অর্ঘ্য সাজিয়ে দেবতাকে পূজা করবে তার আয়োজন এখনও বাকী আছে, তার উপকরণ এখনও সংগ্রহ হয়নি, তার রচনা এখনো অসমাপ্ত। যদি তার আত্মপ্রকাশ কোনো একটা ক্ষুদ্র সীমায় এসে পূর্ণ হতে পারত, তবে প্রকৃতিতে আজকার গাছপালার উৎসবের মতই তার উৎসব এমনি সুন্দর হতে পারত—তার ফুলের সাজি তার ফলের ডালি এমনি সহজে ভরে উঠ্‌ত। সে বলত, "আমার উদ্যোগ সারা হয়ে গেছে—এখন থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী একই চক্রপথে বিনা চিন্তায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে প্রবৃত্ত থাকব।" কিন্তু আমাদের অন্তর যে তাতে সায় দেয় না, আমরা ত কিছুতেই বলতে পারি না একটা জায়গায় এসে ঠেকে গিয়েছি। আমাদের মন বলে, "জীবন বীণার সব তার এখনো চড়ানো হয়নি, সব সুর এখনো সাধা হল না। আমাকে যে দেওয়ালি উৎসব করতে হবে; একটা একটা বাতিতে ত আমার কুলাবে না; দিকে দিকে মহলে মহলে যে আমাকে অন্ধকার দূর করতে হবে।" তাই আমরা যে নবীনতার সাধনা করব সে ত পুনরাবৃত্তির দ্বারা নয়, সে অসীমের আবরণ উদ্ঘাটনের দ্বারা। তাইত আমাদের উদ্যোগের আর বিরাম নেই। মানবের অন্তরে যে তপস্যার হোমাগ্নি জ্বলেছে তাতে নিয়তই আহুতি দিতে হবে, বেদনা দাহনের শান্তি নেই। তাই আমাদের নববর্ষের উৎসব হচ্ছে তপস্যার হোমহুতাশনে নূতন আহুতি দান।

তবে আজ বর্ষারম্ভের দিনের প্রভাতে এই যে শান্তি এই যে সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির কর্ম্মের অভ্যন্তরের এই যে গভীর বিরাম এর সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায়? আছে যোগ। চারিদিকের প্রকৃতিতে আমরা পূর্ণতার যে রস পাচ্ছি এর থেকে সরল ভাষায় আমরা অসীমের একটা পরিচয় পাই। সেটি যদি না পেতুম তাহলে আমাদের

চিত্ত পরিপূর্ণতার সাধনায় আস্থা লাভ করতে পারত না। তানপুরার চারটি তারে চারটি মূল সুর বাঁধা সারা হয়েচে সেই মূল সুর কয়টি কানের কাছে বার বার ফিরে ফিরে আসচে। সেই জন্তেই গানে আমাদের নতুন নতুন যে তান লাগাতে হবে সেই তানগুলি মূল সুরের বাঁধন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় না। আমাদের চারিদিকে গাছপালার মধ্যে অসীমের যে সহজ সুর রয়েচে, যে সুরের কেবলি প্রভাতে সন্ধ্যায় ঋতুতে ঋতুতে আবৃত্তি হচ্ছে, সেইগুলি আমাদের সাধনাকে আনন্দ-লোকের পথ নির্দ্দেশ করে আমাদের জীবন সঙ্গীতকে উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে নিরস্ত করে।

যা সহজে পেয়েচি এই আমার সমস্ত সম্পদ নয়, ত্যাগের দ্বারা তপস্যার দ্বারা আমাদের সম্পদকে নিত্যই নূতন করে আবিষ্কার করতে হবে। প্রভাত সূর্য্যের আলোক-অভিঘাত আমাদের দ্বারে এসে পৌঁচেচে, তার বাণী এই:—হে যাত্রী, এখানে নিদ্রা নয়, অবসাদের জড়তা নয়, গম্যস্থান এখনো বহু দূরে। কঠিন পথে চলতে হবে। মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে কণ্টকের উপর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। শ্যামল বসুন্ধরার অঞ্চলে যে মর্ত্তলোকের তপস্বীরা তাদের আসন পেতেচে তাদের কাছে নববর্ষের এই বার্ত্তা এসেচে—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

মানুষ কি এই বাণী শুনতে পায়নি? সে যে ইতিহাসের আরম্ভ থেকেই এই বার্ত্তাকে মেনে নিয়েচে, তাই সে বেঁচে গেছে। সে বলেছে—"আমি থামব না, ক্ষুধা তৃষ্ণাকে মানব না, রোগ দুঃখের মূল উচ্ছিন্ন করব, অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে নব নব জ্ঞান লাভ করব। সুদূর লক্ষ যোজন দূরে যে গ্রহনক্ষত্রে আলোর স্পন্দন হচ্ছে তাদের নাড়ীর পরিচয় পাব,—যা প্রয়োজন, যা অপ্রয়োজন, সমস্ত বস্তুকেই জেনে নেব। মানুষ তাই যাত্রা করেচে, তার নিদ্রা নেই, আরাম নেই, সে জ্ঞানের, কর্ম্মের, বিত্তের তপস্যা করে চলেছে।

শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে একদিন ভারতের ব্রহ্মবাদী গুরু বলেছিলেন, "অন্নং ব্রহ্ম।" অর্থাৎ এই অন্নময় স্থূল বস্তুজগতেও অসীমের প্রকাশ আছে। যারা অন্নময় জগতে অসীমের সাধনা করতে প্রবৃত্ত হয়েচে তারা কেবলই বস্তুর বাধাকে অতিক্রম করে করে শক্তি সম্পদের অসীমতার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেচে। অন্নজগতের অসীমের তাপসদের কাছে অন্নজগতের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার তার নতুন নতুন মহল কেবলি উদ্ঘাটিত করে দিচ্চে। তারা বলেনি আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ করতে হবে। তারা কোন বিঘ্নকে কপালের লিখন বলে স্বীকার করে নেয়নি। তাদের ললাটে যে অনন্তের জয়তিলক আঁকা রয়েছে, কোথাও তাদের অধিকারের শেষ নেই, এই কথা মেনে তার কোনো দারিদ্র্যকে কোনো রোগ-তাপকে চরম বলে, বিধি-নির্দ্দিষ্ট বলে গ্রহণ করে নি। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি আধিব্যাধিকে ভাগ্যদোষের দোহাই দিয়ে শিরোধার্য্য করে নিলে তাতে মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করা হল। কারণ বিধাতা যে মানুষকে বলেছেন, 'তুমি এত মৃত্যুদণ্ডকে সহজ মেনে নেবে না, তোমাকে সকল অভাবের উপর জয়ী হতে হবে।'

তাই আজ পশ্চিম মহাদেশে মানুষ কেবলমাত্র রোগের চিকিৎসার কথা ভাবচে না, সে রোগের গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাতে চেয়েচে। তারা শুধু বড়ি পাঁচনের কথা ভাবে নি তারা বল্‌চে রোগের যেখানে উৎপত্তি সেইখানে গিয়ে তাদের আক্রমণ করব। দূরত্বের ব্যবধানকে তারা সীমা পিঞ্জরবদ্ধ জীবের অবশ্যস্বীকার্য্য বলে গ্রহণ করে নি। একদা মানুষ নিজের দুই খানি পা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল—কিন্তু তার মনের ভিতরে মন্ত্রটি আছে যে, অন্নং ব্রহ্ম, সেই জন্যই অন্য জন্তুর মত কেবল মাত্র বিধিদত্ত নিজের পায়ের উপরেই সে ভর করে দাঁড়াল না। গরুকে হাতিকে ঘোড়াকে উঠকে নিজের বাহন করে নিজের পদবৃদ্ধি করে চল্‌ল। তাতেও থাম্‌ল না, বাষ্পকে তড়িৎকে লাগাম দিয়ে বাঁধল—স্থলে জল-তলে আকাশে কোথাও সে অসাধ্যকে স্বীকার করলে না, অন্নজগতে অসীমকে নিরন্তর লাভ করতে লাগ্‌ল।

কিন্তু অপরদিকে আমাদের একথা মনে হতে পারে যে মানুষ তো নানা তপস্যার দ্বারা অন্নজগতের ঐশ্বর্য্যকে লাভ করতে থাক্‌ল কিন্তু তাতে হল কি? এর ফলে কি ধনী নির্ধনকে কষ্ট দিচ্ছে না, শক্তিমান্ দুর্ব্বলকে আঘাত করছে না? পৃথিবী কি কলকারখানায় কণ্টকিত কলুষিত হয়ে উঠচে না, যন্ত্র কি মানুষের লোভের বাহন ক্রোধের বাহন হয়ে মানুষকে দেশে দেশে দলিত করচে না? তা তো করচে। তার কারণ, অন্নই ব্রহ্ম এই কথাটা তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। শিষ্যের প্রশ্নের শেষ উত্তরটাকেও আমাদের জানতে হবে—সে হচ্ছে, আনন্দই ব্রহ্ম। সেই আনন্দ লোকের ব্রহ্মকে সাধনা করতে হলে তারো ত কোথাও সীমা মানলে চলবে না। এই সাধনার বাধা যে আমাদের রিপু। সেই রিপুর সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করে তাকে অল্পস্বল্প ঠেকিয়ে রাখাই ত আমাদের তপস্যা নয়,—তার সম্বন্ধেও অসাধ্য সাধন করতে হবে—তাকে সমূলে বিনাশ করা যায় এই শ্রদ্ধা মনে রাখতে হবে—সেই শ্রদ্ধার অসীমতাকে মেনে নিয়ে ফলের অসীমতাকে পাবার সাধনা করতে হবে।

আনন্দ ব্রহ্মের সাধনা কি অন্নব্রহ্মের সাধনাকে অ-স্বীকার করে তবেই সম্ভবপর হয়? সত্যের একদিককে বাদ দিলেই কি সত্যের অন্যদিককে লাভ করা যায়? অন্নলোকের ব্রহ্ম এই উভয়কে একত্র করে জানলে তবেই কি মানুষ পরিপূর্ণ সত্যকে লাভ করে না? এবং সত্যের এই পরিপূর্ণতা ছাড়া আর কিছুতেই কি বাঁচাতে পারে? ভারতবর্ষ অনন্তকে আনন্দ লোকেই উপলব্ধি করতে চেয়েচে, তাতে অন্নলোকে তার পরাভব ঘটেচে, সে আজ রোগে দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে মরতে বসেছে। য়ুরোপ অনন্ত অন্নলোকে সাধন করতে

প্রবৃত্ত,—জলে স্থলে আকাশে তার অধিকার বিস্তৃত হচ্ছে—বিশ্বের শক্তিরূপকে প্রতিদিনই সে বিরাটতর করে জানতে পারচে। এমন কিছু আশ্চর্য্য নয় যে একদিন আমরা খবরের কাগজ খুলেই জানতে পারব যে পশ্চিমের মনীষীদের সাধনার ফলে পরমাণুর মধ্যে যে বন্দিনা শক্তি ছিল সে কারামুক্ত হয়ে মানুষের তপস্যার সহচরী হল। কিন্তু বস্তুবিশ্বকে জয় করবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরের দুঃখ তো ঘুচল না, শান্তি লাভ তো হল না। আধিভৌতিক জগতে বাইরের বাধাকে অপসারিত করে মানুষ যেমন বস্তু-বাধা থেকে মুক্তিসুখ অনুভব করছে, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে অন্তরের বাধাকে দূর করে দিয়ে ব্রহ্মের আনন্দরূপ উপলব্ধি করতে হবে, তবেই ত সকল মানসিক অশান্তির ও অবসাদের অবসান হতে পারবে। আমাদের তখনই যথার্থ ব্রতের পারণ দিন আসবে যে দিন বাহিরে অন্নের ভাণ্ডার ও অন্তরে আনন্দের ভাণ্ডার মুক্ত হয়ে, ব্রহ্মের বাহ্য অন্তর দুই স্বরূপকে পূর্ণ করে দেখাবে।

সমস্ত মানবের যজ্ঞকে আমরা যদি আজ একক্ষেত্রে দেখি তা হলে জানতে পারব যে, এই এক যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অংশের নির্বাহ ভার বিশেষ ভাবে এক এক জাতির উপর রয়েছে। সেই অংশগুলিকে যতক্ষণ আমরা মিলিত করে না দেখতে পারি ততক্ষণ তার অসম্পূর্ণতা আমাদের আঘাত করে। কিন্তু যখন তাদের আমরা সজ্ঞানে মিলিয়ে দেখি তখন আমাদের অগৌরব দূরে যায়। আনন্দই ব্রহ্ম এই মন্ত্রই যদি ভারতের সাধন মন্ত্র সত্য হয় তাহলে পৃথিবীতে এই অমৃতরসের পরিবেষণ ভার কি ভারতবর্ষকে নিতে হবে না? আলোক শিখার পরিচয় এই, যে তার দীপ্তি তার প্রদীপকে ছাড়িয়ে চলে যায়, তেমনি অমৃতের পরিচয় এই যে, সে তার আপন আধারের মধ্যে কিছুতেই বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। ভারতবর্ষ অমৃতের অধিকারী এই গর্ব্বোক্তি যদি সত্য হয় তবে এই অধিকারকে সমস্ত মানুষের অধিকার করে তোলবার চেষ্টাতেই সেই গর্ব্ব সার্থক হবে।

বুদ্ধদেব যখন তপস্যায় ক্লান্ত, তখন সুজাতা পায়সান্ন প্রস্তুত করে তাঁর ক্লান্তি দূর করেছিলেন। আজ পশ্চিমের তাপসদের আত্মার ক্ষুধা মেটাবার অন্ন কি আমরা সংগ্রহ করেচি? তাদের তপস্যাও যে আমাদের তপস্যা। পশ্চিমের সাধনাকে আমার বলে স্বীকার করব না—একথা বলবার মত মনুষ্যত্বের এত বড় অবমাননা আর নেই। আমাদের দিক থেকে তাকে পূর্ণ করে তুলতে হবে এই কথাই আমাদের বলবার কথা। পশ্চিম তার অন্নব্রহ্মের সাধনায় অভাবনীয় শক্তির অধিকারী হয়ে উঠ্‌চে—আমরা আনন্দ ব্রহ্মের সাধনা যদি নিষ্ঠাপূর্ব্বক করি, রিপুর বাধাগুলিকে যদি মূল ঘেঁসে উচ্ছেদ করতে পারি তাহলে অধ্যাত্মলোকে মানুষের জন্যে যে পরমাশ্চর্য্য সম্পদের উদ্ঘাটন হতে পারে কোনোখানেই তার সীমা নেই। কেন না ব্রহ্মের "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ"—জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার স্বাভাবিকতাই হচ্ছে অনন্ত স্বরূপের ধর্ম্ম—বাহ্য প্রকৃতিতে যেমন অনন্তের সাধনায় এই জ্ঞান, শক্তি ও কর্ম্মের স্বাভাবিক উৎসকে সন্ধান ক'রে বাহির করা হচ্চে, আমাদের অন্তর প্রকৃতিতেও তেমনি ব্রহ্মের সাধনায় এই জ্ঞান, শক্তি ও কর্ম্মের স্বাভাবিক উৎসকে সন্ধান করে পাওয়া যায়। রিপুর আক্রমণে ও আবরণেই এই স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে, তখন আমাদের কর্ম্ম ভয় ক্রোধ লোভের উত্তেজনাতেই কৃত হয়, সুতরাং সেই কর্ম্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে প্রকাশ করি না—সেই কর্ম্মের মধ্যে চিরদাসত্বের গ্লানি—সেই কর্ম্ম কিছুতেই আমাদের আনন্দের মধ্যে নিয়ে যায় না। যতই না নিয়ে যায় ততই বিরোধ বিদ্বেষ অশান্তি। তাই উপনিষৎ বলেচেন, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌," আনন্দ যদি ভোগ করতে চাও তবে ত্যাগ কর, লোভ কোরো না।

হে ভারতবর্ষের তপস্বী, অন্তরকে পবিত্র কর, অমৃতমন্ত্রে দীক্ষিত হও। "ভূমৈব সুখং" এই সত্যকে গ্রহণ কর। সেই ভূমা সকল দেশকে গ্রহণ করে' সকল দেশকে অতিক্রম করে সকল মানুষের ইতিহাসকে অধিকার করে বিরাজ করেন। "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ"—তিনি বিশ্বের আদি অন্তে পরিব্যাপ্ত, "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"—তিনি শুভবুদ্ধিদ্বারা আমাদের সকলকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।

শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

প্রখর তপন তাপে
আকাশ তৃষায় কাঁপে
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘ পথের শেষে
ডাকি মন্দিরে এসে,
খোলো, খোলো, খোলো দ্বার।
বাহির হয়েছি কবে
কার আহ্বান রবে,
এখনি মলিন হবে
প্রভাতের ফুল-হার।
খোলো, খোলো, খোলো দ্বার।
বুকে বাজে আশাহীনা
ক্ষীণ-মর্ম্মর বীণা,
জানিনা কে আছে কিনা,
সাড়া ত না পাই তার।
আজি সারাদিন ধরে'
প্রাণে সুর ওঠে ভরে',
একেলা কেমন করে',
বহিব গানের ভার?
খোলো, খোলো, খোলো দ্বার।

প্রেয়সী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পল্লীগ্রামে বারোয়ারি

৯

লক্ষ্মীকান্ত বাবু কলিকাতার বাসায় একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া একখানি সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করিয়া পল্লী-সংস্কার বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে একটুও সুখ নাই—এবার বারোয়ারি পূজায় তিনি গ্রামে আসেন নাই। পূর্ব্বে বারোয়ারি পূজা-উপলক্ষে তাঁহার সখের দলের অভিনয় হইত। অভিনয় যতই খারাপ হোক, কি প্রাণ-ভরা আমোদই তিনি উপভোগ করিতেন! গ্রাম ছাড়িয়া স্বর্গে বাস করিতেও তাঁহার প্রাণ ছট-ফট করিত! যে গ্রামের শান্তিময় ছায়ায় স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতেন, আজ সেই গ্রামকে তিনি শত্রুপুরীর মত উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে কত ঘটনাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল!

না জানি, কোন্ রাক্ষসীর অভিশাপে গ্রামের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়াছে! আবার ভাবিলেন, ইহাতে দেবতার দোষ দেওয়া মিথ্যা! মানুষ নিজেই নিজের বিপদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে, শেষে দেবতার ঘাড়ে তাহা চাপাইয়া বরাতের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। সংবাদ পত্রে মনোনিবেশ হইতেছিল না, তথাপি জোর করিয়া মনঃ সংযোগের চেষ্টা করিতেছিলেন এমন সময় পিয়ন আসিয়া একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্রে লেখা ছিল—

শ্রীশ্রীহরি

শরণম্

মিত্রপাড়া

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

বাবু, বারোয়ারি পূজা উপলক্ষে গ্রামে ভয়ানক মারা মারি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দুই-তিন জন লোকের হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তিন-চার জন জখম হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ প্রাণে মারা যায় নাই। আপনি সত্বর আসিবেন। আসিয়া যা হয় ব্যবস্থা করিবেন। ইতি

অধীন শ্রীহরকালী ঘোষ।

হরকালী ঘোষ লক্ষ্মীকান্ত বাবুর কর্ম্মচারী। লক্ষ্মীকান্ত পত্র পাইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। সেইদিনই রাত্রের ট্রেনে দেশে রওনা হইলেন। বাড়ী আসিয়া ব্যাপার শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। সকলকে বলিলেন, "আপনারা দলাদলি করিয়া শুধু শুধু বিপদকে আহ্বান করেন কেন? মিটমাট করিয়া ফেলুন।"

জীবন সামন্ত বলিল, "ওরা আমাদের জব্দ করিবার চেষ্টা পাইবে, আর আমরা মিটাইতে যাইব? এ হইতে পারে না। খবর শুনেছ কি? ওরা নালিশ করেছে, তোমাকে আর আমাকে আসামী করেছে— পরেশ সাঁই আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দেবে যে তুমি লাঠী দিয়ে একজনকার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছ।"

শুনিয়া লক্ষ্মীকান্ত অবাক হইয়া গেলেন। যে-পরেশকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি পিতার অমতে এক শত টাকা নিজে দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তার এই কাজ? সেই পরেশ তাঁহারই বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে? ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন, পরেশকে গিয়া একবার বলিবেন।

১০

সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মীকান্ত বাবু ধীরে ধীরে পরেশ সাঁইয়ের প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উঠান হইতে দেখিলেন, তাহার ঘরের মেঝেয় একটি প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। উঠানে অল্প অন্ধকার হইয়াছে। তুলসী তলাতেও একটি প্রদীপ অতি মৃদুভাবে কিরণ দিতেছে। উঠানে জুতার শব্দ শুনিয়া মনোরমা ঘর হইতে বলিল, "কে গা?"

এই মনোরমার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। মনোরমা পরেশের কন্যা। বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইবে। পরেশ সাঁই ও রামধন মিত্র পরস্পরকে হাস্য-পরিহাস করিতেন এবং "বেয়াই" বলিয়া ডাকিতেন। একদিন পরেশ কি একটা উদ্দেশ্য চাপিয়া রাখিয়া রামধন মিত্রকে বলিয়াছিল, "ভাই, তুমি কেন আর আমাকে বেয়াই বলিয়া লজ্জা

দাও—তোমরা জমীদার লোক, আমরা দান-দুঃখী দরিদ্র। যা হবার নয়, তার আর নাম করিয়া কেন আমাকে লজ্জিত কর?"

রামধন মিত্র বলিয়াছিলেন, "কেন, এটা কি একেবারেই অসম্ভব, তোমরা আমাদেরই স্বজাতি। ঘর ভাল, কেবল পয়সা নাই বলিয়া হইবে না? আচ্ছা, আমি স্বীকার করিতেছি, যদি বিধাতার ইচ্ছায় সেই কাজই হয়, তবে আমি লক্ষ্মীকান্তর বিবাহে এক পয়সাও লইব না।

মনোরমাও এ সংবাদ জানিত এবং মনে মনে একটি কল্পনার রাজ্য সে গড়িয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু পরেশ সাঁই লোকটির চিরদিনই পরের কথা শুনিয়া চলা অভ্যাস। এ দিকে পরেশের এক আত্মীয় নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার এক অপগণ্ড পুত্রকে পার করিয়া লইল। মনোরমা শ্বশুরবাড়ী গিয়া যত অধিক পরিমাণে জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করিত, ঠিক সেই পরিমাণেই লক্ষ্মীকান্তর উপর তাহার রাগ হইত। এ রাগের কারণ কি, লক্ষ্মীকান্ত কোন্ অংশে দোষী, তাহা সে খুঁজিয়া পাইত না, তথাপি লক্ষ্মীকান্তর উপর হাড়ে হাড়ে সে চটিয়া গিয়াছিল। বিবাহের অল্পদিন পরেই মনোরমা বিধবা হইল এবং নিশ্চিন্ত হইয়া পিত্রালয়ে আসিয়া রহিল—। সেই অবধি মনোরমা লক্ষ্মীকান্ত বা রামধন মিত্রের সম্মুখে বাহির হইত না। মনকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছে, মনকে প্রবোধ দিয়াছে, উহারা গ্রামের সাধারণ লোক মাত্র, উহাদিগকে লজ্জা করিবার কি আছে? কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই, তাহাকে দেখিলেই লুকাইতে সে বাধ্য হইয়াছে। আজি চিনিতে না পারিয়া বলিল, "কে গা?" অন্ধকারে ভাল চেনা যাইতে ছিল না, সেজন্য ঘর হইতে প্রদীপটি আনিয়া যেমন দাওয়ায় আসিয়া লক্ষ্য করিল—বলিতে যাইতেছিল, "বাবা বাড়া নাই"—হঠাৎ প্রদীপটি ছুড়িয়া সে ঘরে গিয়া লুকাইল। লক্ষ্মীকান্ত কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে আস্তে আস্তে দাওয়ায় গিয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে একখানি আসন দাওয়ার উপর আসিয়া পড়িল। লক্ষ্মীকান্ত বাবু "থাক, থাক, আর আসনে কাজ নেই - আসনে কাজ নেই—" বলিতে বলিতে নিজেই আসনখানি বিছাইয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "দেখ মনোরমা, তোমার বাবার আক্কেল দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। আমি তোমাদের কোনও অপকারই করি নাই, বরং যথাসাধ্য ভালই করিয়া আসিয়াছি। আমি আগাগোড়া শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিলাম, শেষে তার প্রতিফল এই হইল! এইটেই বড় দুঃখের বিষয়।" লক্ষ্মীকান্ত ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, ভাবিলেন, কোন উত্তর পাইব, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। উত্তর দিবে কে? মনোরমা লক্ষ্মীকান্তর কথার এক বর্ণও শোনে নাই। সে লক্ষ্মীকান্ত আসিবামাত্রই তাঁহাকে আসনখানি ফেলিয়া দিয়া ঘরের মেঝেয় পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল। লক্ষ্মীকান্ত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কোন উত্তর না পাইয়া বলিলেন, "মনোরমা, তবে আমি আসি।" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মীকান্ত চলিয়া যাওয়ার পর মনোরমা নিজেকে খুব খানিক ভৎর্সনা করিল। এ দুর্ব্বলতা তার কোথা হইতে আসিল?

১১

জীবন সামন্ত লোকটি ভারি মামলা-বাজ। এমন ভাবে মকর্দ্দমার তদ্বির করিল যে নিজেদের কোন শাস্তি হওয়ার বদলে পূর্ব্ব পাড়ার পরাণ মণ্ডলের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইয়া গেল এবং আরও দুই-তিন জনেরও কিছু দণ্ড হইল। পরেশ সাঁই সাক্ষ্য দিতে গিয়া বেশ সুবিধা জনক জবাব দিতে না পারায় লক্ষ্মীকান্ত বাবু বেকসুর মুক্তিলাভ করিলনে।

আজ পশ্চিম পাড়ার লোকদের ভারি আমোদ। তাহার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মকদ্দমার ফল হাতে হাতে পাইয়াছে। আজ রাত্রে একটি বৈঠক বসিয়াছে। তাহাতে অনেক রকম কথা বার্ত্তা হইতেছে। জীবন সামন্ত বলিয়া উঠিল, "ওহে তোমরা ভয় খাচ্ছিলে,—দেখলে? হাইকোর্ট বল—ছোট আদালত বল—সবেরই আইন আমার পেটে পোরা আছে।"

সকলে বলিল—"তা ঠিক। এবার তুমি না থাকলে আর আমাদের বাঁচোয়া ছিল না। পরাণ মণ্ডল যে-রকম সাক্ষী সাবুদ সাজিয়েছিল, আমাদের ভারি ভয় হয়েছিল।"

অনেকক্ষণ নানারূপ আলাপের পর সভা ভঙ্গ করিয়া যে যার বাড়ী চলিয়া গেল। হঠাৎ রাত্রি তিন চারিটার সময়

আগুন আগুন চীৎকারে সারাগ্রাম কম্পিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, প্রবল বেগে অগ্নিদেব জীবন সামন্তর ঘরখানিকে আক্রমণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে! ভীষণ চীৎকারে গ্রাম কম্পিত হইয়া উঠিল। দলে দলে লোক আগুন নিভাইবার জন্য ছুটিল। কিন্তু কার সাধ্য, সে আগুনের কাছে যায়! দশ বারো জন যুবক ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং ঘরের ভিতর হইতে জীবন সামন্ত, তাহার পত্নী ও তিন বৎসর বয়স্ক একটি বালিকাকে টানিয়া বাহির করিল। তিনটি প্রাণীই অজ্ঞান, শরীরের অধিকাংশ স্থানই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে জন কয়েক তাহাদের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল বাকী কয়েক জন অদম্য উৎসাহে আগুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। নীচে হইতে অনবরত জল তুলিয়া চালের উপর ঢালা হইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপারে তিন-চার ঘণ্টা অতিবাহিত হইল ক্রমে কাক কোকিল ডাকিতে সুরু করিল ভোর হইল। সেই ঘরখানিকে ভস্মসাৎ করিয়া অগ্নি রণে ভঙ্গ দিলেন। সকলে শ্রান্ত দেহে কালি মাখিয়া যে যার ঘরে প্রস্থান করিল।

১২

আজ লক্ষ্মীকান্ত বাবুর এক বাল্য বন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। কলিকাতার একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া পরস্পরে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। লক্ষ্মীকান্ত বাবু তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। অনেক রহস্যালাপের পর পল্লীগ্রাম সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে লাগিল। এই বন্ধুটির নাম সুরেশচন্দ্র মিত্র। ইনি বি, এ পাশ করিয়া অনেক দিন একটা স্কুলে হেড মাষ্টারি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কোনও স্বাধীন জীবিকা চাষ বা ব্যবসায় করিবার মতলবে লক্ষ্মীকান্ত বাবুর সহিত যুক্তি করিতে আসিয়াছেন। সুরেশ বাবু বলিতে লাগিলেন "লক্ষ্মীকান্ত, তোমরা সবাই যদি পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে, তবে পল্লীগ্রাম বন হইয়া যাইবে না ত কি হইবে? যদি বড় লোকেরা সব পল্লীগ্রামকে ঘৃণা করিয়া সহরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল, তবে পল্লীগ্রাম ত হতশ্রী হইবেই! কয়টা গরীব লোকের সাধ্য কি যে পল্লীগ্রামকে জমকাইয়া রাখে? তার চেয়ে তোমরা যদি সবাই সেই পল্লীর সংস্কার করিয়া সেইখানে বাস করিতে পারিতে সেইটায় বেশী বাহাদুরী হইত। ভয়ে পলাইয়া আসিয়া পৌরুষের কাজ কর নাই। যাহারা পড়িয়া আছে, তাহাদের কথা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি।"

লক্ষ্মীকান্ত বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি জানি। তোমায় আর বেশী বলিতে হইবে না। যাহারা পড়িয়া আছে, তাহাদের জন্য আহা করিবার কিছুই নাই। পল্লীগ্রাম এমন সাংঘাতিক জায়গা যে, আমার সাধ্য নয় তার বর্ণনা করি। লোকে কেন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়া বাস করে, এখন আমি তাহা বেশ বুঝিয়াছি; পল্লীগ্রাম এমন হু-হু করিয়া অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে যে কার সাধ্য গতিরোধ করে! আর যে-কয়টি লোক গ্রামে আছে—প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হিংসায় অন্ধ। আমি অনেকবার শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আমাদের গ্রামে সে ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। মোটের উপর আমার এখন ধারণা হইয়াছে, পল্লীগ্রাম ভদ্রলোকের বাসের উপযোগী নয়, তা তুমি যাই বল! আমি এখানে বেশ আছি। এখানে কাহারও সহিত কাহারও আত্মীয়তা নাই, বিবাদও নাই। এ সম্পর্ক-শূন্য হইয়া বেশ আছি। আর বীরত্বের কথা যাহা বলিলে, তাহার উত্তর এই, আমার বিশ্বাস যে এমন বীর এখনও কেহ জন্মায় নাই যে পল্লীগ্রামের গণ্ডমূর্খগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে।"

সুরেশ কহিল, "উপস্থিত তুমি তোমাদের গ্রাম্য বিবাদ লইয়া ধাক্কা পাইয়াছ—তাই ও কথা বলিতেছ। বাস্তবিক পল্লীগ্রাম কিন্তু বড় রমণীয় স্থান। তার শোভা—"

লক্ষ্মীকান্ত বাধা দিয়া বলিলেন, "তবে শুনবে—দিগন্তে অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিমাভা শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজির উপর নিপতিত হইয়া, আহা, কি অপূর্ব্ব চিত্রকলার সমাবেশ করে! দূরাগত রাখাল বালকদের সঙ্গীত-ধ্বনি মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া স্তূপীকৃত শান্তির আস্বাদ জানাইয়া দেয়! এই রকম কত শুনবে পল্লীগ্রামের শোভার কথা? ও-সব বাজে কথা বাদ দাও। ও সব ত সংসারের কোন

কাজে লাগবে না। ও সব কেবল বইয়ের কলেবর-বৃদ্ধির মশলা মাত্র। আদত জিনিষ লোকের ব্যবহার—তাই যদি খারাপ হলো, তবে আর পল্লীগ্রাম ভাল কিসে? আগে আমারও কতক ও-রকম কবিত্বের খেয়াল ছিল বটে, কিন্তু সংসারে হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেছে! এখন বুঝেছি, যারা সহরে বসে পল্লীর বর্ণনা লেখে, তারাই পল্লীর সব লেখে ভাল। একবার বর্ষাকালে গিয়ে পল্লীগ্রামের কাদা, ম্যালেরিয়া এবং লোকের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখতে পার, তবে বোঝ আদত ব্যাপার।"

সুরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "যাক্ তুমি ত খুব খানিক লেকচার দিলে—আমারও যেন কেমন মাথা গুলিয়ে গেল! আচ্ছা, একটু ভেবে দেখবো।"

১

এ বৎসর চৈত্র মাস আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামে কলেরা দেখা দিল—আবার হত্যার অভিনয় চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম রোগীর তদ্বির ও মৃতের সৎকার চলিতে লাগিল। ক্রমে যখন হু-হু শব্দে রোগের প্রকোপ বাড়িয়া উঠিল, তখন আর মৃতের সৎকার হয় না! কে কাহাকে দেখে? সকলেই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত। ঘরে উঠানে পুকুরে যে যেখানে রোগাক্রান্ত হইল, সে সেইখানেই মরিল। গ্রামের লোক ভয়ে অস্থির হইল, অনেকে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। যাহাদের পৈত্রিক ভিটার উপর অগাধ মায়া, তাহারা বিনা আপত্তিতে মরিতে লাগিল—গ্রামখানি একেবারে ছন্নছাড়া হইয়া গেল।

লক্ষ্মীকান্ত বাবু শুনিলেন, পরেশ সাঁই রোগাক্রান্ত হইয়াছে; মনোরমা একলা পিতাকে লইয়া বড়ই বিপন্ন। শুনিয়া তাঁহার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। মনোরমার উপর রাগও হইল। একবার সংবাদ দিতে কি তাহার এত অপমান বোধ হইল! লক্ষ্মীকান্ত বাবু পরেশ সাঁইয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, গিয়া দেখিলেন, মনোরমা একলা রোগীর বিছানার পাশে বসিয়া কাঁদিতেছে। পরেশ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। লক্ষ্মীকান্তবাবু হঠাৎ গিয়া মনোরমার মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন; পরে কহিলেন, "মনোরমা, তুমি আমায় একবার খবর দিতে পার নি? তাতে কি কিছু অপমান হতো?"

মনোরমা আজ আর লজ্জা করিতে পারিল না মাটীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আপনার ত একবার খোঁজ লওয়া উচিত ছিল।"

লক্ষ্মীকান্ত রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অবস্থা বড় ভাল নয়। ক্রমে অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। লক্ষ্মীকান্ত বাবু দুই-এক জন লোক ডাকিবার জন্য গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে দুই জন লোক সঙ্গে করিয়া ফিরিলেন। বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র মনোরমা লক্ষ্মীকান্ত বাবুর পদতলে আছাড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগল। লক্ষ্মীকান্ত বাবু মনোরমাকে ধীরে ধীরে তুলিয়া বসাইলেন; এবং ঘর হইতে পরেশ সাঁইকে বাহির করিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধের শরীরে তখন প্রাণ নাই। তখন সেই লোক দুইটীর উপর মৃতের সৎকারের ভার দিয়া মনোরমাকে লইয়া তিনি নিজ বাটীতে ফিরিলেন। মনোরমা ভাবিবার আর সময় পাইল না- মন্ত্রমুগ্ধের মত লক্ষ্মীকান্ত বাবুর সহিত তাঁহার বাটীতে গমন করিল।

১৪

লক্ষ্মীকান্ত বাবু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার পুত্র নিশিকান্তকে বাঁচাইতে পারিলেন না। তারপর স্বহস্তে পুত্রের সৎকার নিজেই সম্পন্ন করিয়া আসিলেন। আসিয়া পত্নীকে বলিলেন, "আর কেন সংসার করা? যথেষ্ট হয়েছে। চল, এইবার দুজনে যে কয়দিন বাঁচি কাশীতে বিশ্বনাথের চরণে মনের জ্বালা জানিয়ে নিশ্চিন্ত হইগে। আর আমার যেন সব বিষ বোধ হচ্ছে। এক মুহূর্ত্তও এ পাপ পুরীতে থাকতে মন সরছে না।"

লক্ষ্মীকান্ত বাবুর পত্নীও অতি আগ্রহের সহিতে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। মনোরমা সাশ্রু নয়নে কহিল, "আমায় কার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন?" লক্ষ্মীকান্ত বাবু কহিলেন, "তোমায় লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাতে—" লক্ষ্মীকান্ত বাবুর পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন, "মনোরমাকে নিয়ে যেতেই হবে। ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।" অগত্যা মনোরমার যাওয়াও স্থির হইল। লক্ষ্মীকান্ত বাবু হরকালী ঘোষকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে

বলিয়া বাক্স হইতে একখানি এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া লইয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করিলেন।

জন্মভূমির নিকট চির-বিদায় লইবার সময় তাঁহার চক্ষু জলভারাকুল হইয়া আসিল। বাড়ীর পাশের আম গাছটি মাথা আন্দোলিত করিয়া যেন তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিল। গ্রামের প্রত্যেক বস্তুটির সহিত তাঁহার চিত্ত জড়িত,—এককালে বিচ্ছিন্ন করিতে বড়ই বেগ পাইলেন। হরকালীর উপর সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া তিনটি প্রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। মাঠ দিয়া গাড়ী যাইবার সময় যতদূর দেখা যায়, গ্রামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। যখন আর দেখা যায় না, তখন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। গাড়ী গ্রাম ছাড়িয়া কিছুদূর আসার পর একটি লোক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আপনি পরেশ সাঁইয়ের জরিমানার দরুণ একশত টাকা দিয়া আসিলেন—সকলে বলিল, ও টাকা লওয়া হইবে না, তাই আমাকে দিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন।" লক্ষ্মীকান্ত বাবু অন্যমনস্ক ছিলেন, হঠাৎ লোকটির কথা কানে যাওয়ায় বড়ই বিরক্ত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, "না নেয় ফেলে দিতে বলগে, যাও।" লোকটি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না—গাড়ীও অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চ ঋষি

রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বজয়ী, ভাবুক, কবি,
চক্ষে আঁকা স্বর্গ-ছবি;
জগৎপূজ্য বঙ্গবাণী,
আজ মরুতে বহাও পানি!
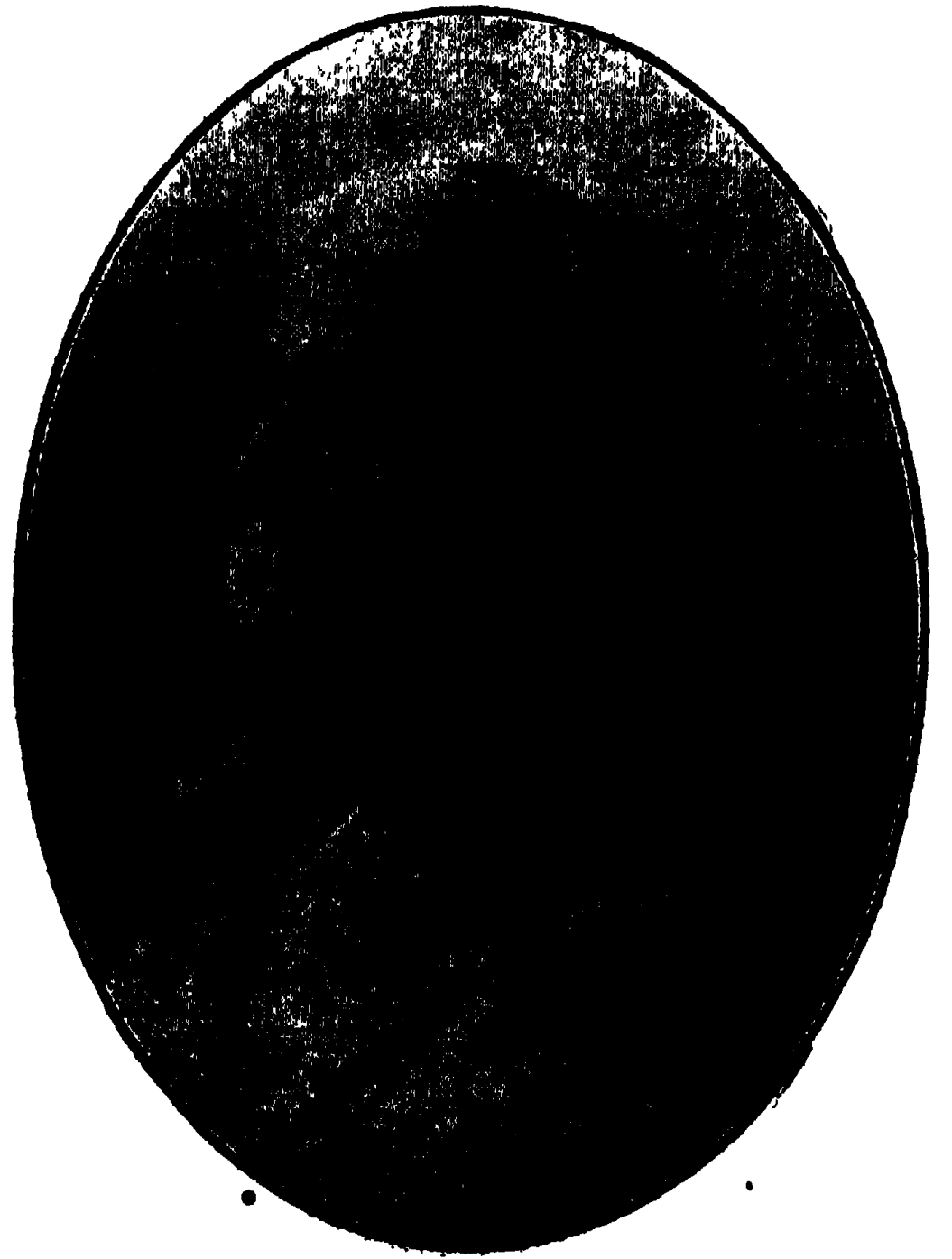
বর্ষাবিহার।
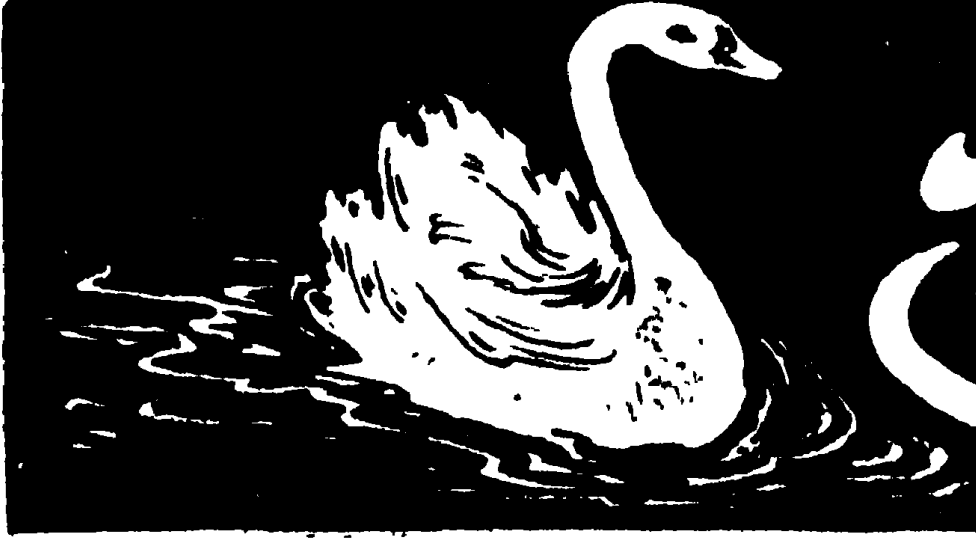
৪৬শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩২৯ { চতুর্থ সংখ্যা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলিপরে?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টীকা; কবি, আজ হ'তে সে কি
বারে বারে আসি' তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি'
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি'
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছে ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-পরে
একটি অপূর্ব্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি'; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি!

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে' গেলে দান
দূরকালে। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হ'তে, হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে', অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যু-তরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আজি
নবসূর্য্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে? সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা; কতবার তারি সারি-গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্য্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা
মেঘে ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি,
ঝরে'-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়াপরে করি' ভর,
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে;
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত-প্রভাতে,
নব মল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায়; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে?

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি', সর্ব্ব আবরণ করি' লীন
চিরন্তন হ'লে তুমি, মর্ত্ত্য কবি, মুহূর্ত্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে? যেমনি অপূর্ব্ব হোক নাকো,
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
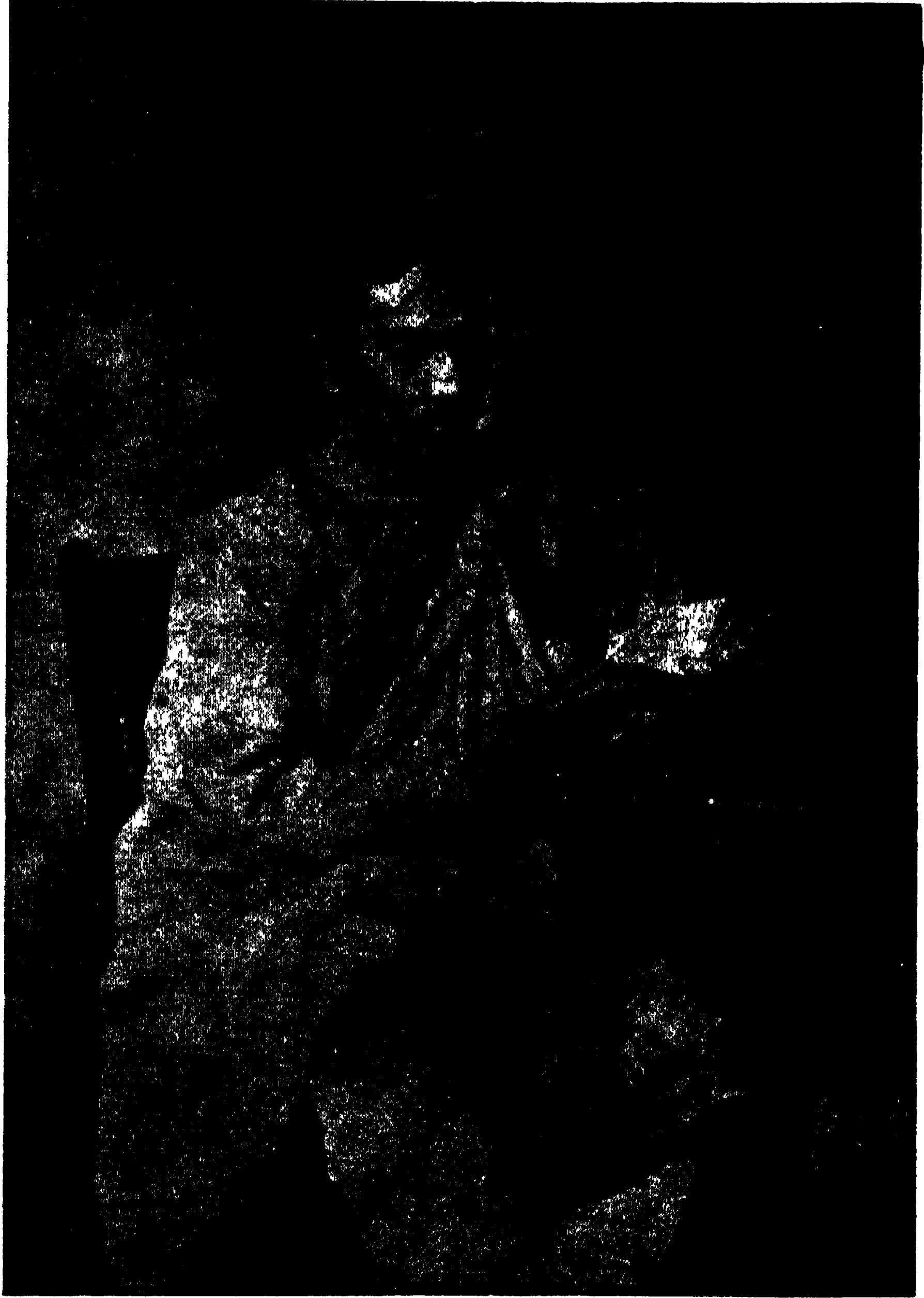
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্র

স্মৃতি সে মনের,—আপনার ;—অন্যের নয়, অন্যের জন্যেও নয় ! মনের গোপন-কোণে ঘরের স্মৃতি, পরের স্মৃতি, আনন্দের স্মৃতি, দুঃখের স্মৃতি বেদনার সোনার কৌটোতে ধরা থাকে, লুকোনো থাকে—যতনের সব রতন-মাণিক ; কৌটো বাইরে খোলেনা কেউ ! হারানো-কবি সত্যপরায়ণ সত্যচেতা সত্যেন্দ্রের অকাল-মৃত্যু ভাঙা ফুলদানির টুকরোটুকুর মতো ভিতরে বিঁধে রইলো ;—থেকে-থেকে সে বেদনা দেবে ; আর তার স্মৃতি—এই ক'দিনের এতটুকু স্মৃতি—ঘুমের পুরে রাজকন্যার মতো ঘুমিয়ে রইলো, —অপেক্ষা কোরে রইলো গুণীর হাতের সোনার পরশ। তাকে সবার সামনে আনবে ! জাগিয়ে তোলার মন্ত্র কেউ জানো ? এক সত্যের প্রেমে প্রেমিক—তারি ক্ষমতায় কুলায় স্মৃতিকে জাগানো ; —আমারও নয়, তোমারও নয়। তাই বলি গোপন জিনিষ - বুকের জিনিষ—সে আড়ালেই থাক। প্রতীক্ষা করুক প্রেমিকের স্পর্শ যা নিশ্চয় আসবে, ষড়ঋতুর ছন্দ ধরে আলো কোরে, বাতাস কেটে, কাঁটাবনের ফুলে সেজে, সবুজ সুরে বাঁশি বাজিয়ে। মনের কোটরে কুলুপ-দেওয়া থাক্ না তার স্মৃতি ! ত্বরা কিসের তাকে বাইরে আনতে ? সত্য-প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করে থাক—সে আসছে গোপন যা, তাকে ব্যক্ত করতে। ঘুমন্তকে জাগ্রতের মধ্যে নতুন কোরে বরণ করে নিতে। সে যে এসে যায়নি তাই কি বলতে পারি ? ক্ষণিক বিরহের অশ্রুজলের বৃষ্টিবিন্দু সে যে মিলিয়ে দিয়ে যায়নি সত্য-মিলনের আনন্দ-নির্ঝরের বিপুল ধারায় এরি মধ্যে—তাই বা কে বলবে !

সত্য-কবি ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন তাঁর মনের ফুলের সমস্ত ফসল পৃথিবীর বুক জুড়ে ; বইয়ে দিয়ে গেলেন ছন্দের ধারা শত-শত শরতের মধ্যে দিয়ে—যার ভরপুর জোয়ার চলবে মন থেকে মনে, এক সকাল থেকে আর এক সকালে, এসেছে যারা তাদের দিকে, আসবে যারা তাদের দিকে, আসেওনি যারা তাদের জন্যে ! সেই সত্য-কবি—সে কি সামান্য কবি যে তার স্মৃতি এত ছোট হবে যে আজকের বিরহের রাত্রে আমাদের মানস-কমল সমস্ত পাপড়ি যত্নে বন্ধ কোরে তাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না, কালকের প্রভাতের প্রথম যে, শ্রেষ্ঠ যে, সত্য যে, প্রেমিক যে, আলো যে, জীবন যে, আনন্দ যে, তার জন্য ! এপারের বন্ধু, সে তো ওপারেরও বন্ধু—ছন্দসহচর। তাকে যে দেখতে পাচ্ছি কবিতার সঙ্গে অভিন্নরূপে ! তার স্মৃতি গোপনে রাখ, ধরে দিয়ো একদিন তারি পায়ে যে সত্য-প্রেমিক সত্য-কবি ও সত্যাশ্রয় ; যার পরিচয় সত্যেন্দ্রই আমাদের দিয়ে গেলেন নিজের সমস্ত জীবনকে তার দিকে প্রণত কোরে। মন দৃঢ় কর—সত্য-দেবতাকে নতি দেবার জন্যে দৃঢ় কর ; সত্যের স্মৃতি ধরে রাখ কমলদলের নির্মল বেষ্টনে, অপেক্ষা কর তারি জন্য দিন যাকে প্রণতি দিয়েছে, রাত যাকে প্রণতি দিয়েছে, আমাদের কবি যাকে প্রণতি দিতে চলে গিয়েছে ব'লে—

"—কার কাছে তুই অমন ক'রে নোয়ালি মাথা !
—নয় সে গুরু, নয় সে পিতা, নয় সে তো মাতা !
নয় সে রাজা, নয় সে প্রভু,
দিগ্বিজয়ী নয় সে কভু,
পরাজয়ের ধূলায় ও যে তার আসন পাতা !
নয় সে স্বদেশ, সমাজ সে নয় নয় রে,
নয় সে বজ্র, নয় সে ভীষণ ভয় রে,
নয় সে সূর্য্য, নয় সে আকাশ,
নয় সে গোপন, নয় সে প্রকাশ,
সত্য-স্বপন ব্যক্ত-গোপন তার মাঝে গাঁথা !"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ

ওগো ছন্দের খেয়ারি, তোমার
এ আবার কোন্ অশেষ অপার ছন্দ!
পশ্চিমাকাশে রবি ডুবে' যায়,
অন্ধ কারায় ধরণী হারায়
এই ত সময়—এরি মাঝে খেয়া বন্দ!
কবিদল তব কাব্যের তীরে
অশ্রুনেত্রে চাহে ফিরে'—ফিরে'
সন্ধ্যা-আঁধারে মনে লাগে মহাধন্দ;
পারের সময় অপারগ কারি' ছন্দে করিলে বন্দ।

নূতন তানের তানসেন, তুমি,
স্বচ্ছন্দের তুমি যে ছন্দরাজ;
মৌন নিরাশা করিবারে দূর
রুদ্র দীপকে ধরেছিলে সুর—
দহিয়া তোমারে হ'ল তা বন্দ আজ!
সে সুর-সুরভি হিয়ার পাতায়
জাগরণ হানি' তাতায় মাতায়
গীতনিকুঞ্জে তুমি যে গন্ধরাজ;
সকল ছন্দে হারাইল তব মরণ-ছন্দ আজ।

কোন্ নন্দনে চলিলে, বন্ধু,
ছন্দসুরের চিরতরে কাটি' বন্ধন?
ফুলের ফসল ছাড়ি' এ ধরার
বন্দিছ আজ কোন্ অমরার
পারিজাত আর মন্দার হরিচন্দন?
বান্ধবদল এ পারের তীরে
হের সবে আজি তিতি আঁখিনীরে
পাঠায় তোমারে অভিমানে ভরা ক্রন্দন!
ছন্দসুরের সঙ্গে সবারি নিমেষে কাটিলে বন্ধন!

বঙ্গজননী, যারে তুমি, কবি,
সদাজাগ্রত বচনে মনে ও কর্ম্মে,
সবার অধিক করিয়াছ সেবা
প্রাণেরও অধিক ছিল তব যে বা—
একক দেবতা ছিল যে তোমার ধর্ম্মে;
সেও আজি, হের, বিয়োগ-অধীর—
আষাঢ়ের মেঘে ঝরে আঁখিনীর,
তাহারো মমতা কাটিলে কঠিন মর্ম্মে—
বঙ্গজননী একক দেবতা ছিল যে তোমার ধর্ম্মে!

তবে তাই হোক্—যাও তুমি, কবি,
সরস্বতীর চরণকমল কুঞ্জে;
চির-কুহুকেকা বিরাজে যেথায়,
তীর্থের রেণু বহে মলয়ায়
কবিদল যেথা গুণ গুণ গাহে গুণ যে!
মায়ের মুখের প্রসন্ন হাসি
যেথা নিশিদিন আছে পরকাশি';
ভক্তেরা সেই চিরসুধাধারা ভুঞ্জে—
অমর-সমান লভ যশোমান বাণীর চরণকুঞ্জে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সত্যেন্দ্র-স্মরণে

দু'পুরে বাজিল একি আলো-শেষ পূরবী।
গেল কবি বেণুবীণা নীরবি'।
ক্ষ্যাপাইয়ে দখিণায় আর না ঝরিবে হায়
সুরে সুরে অমরার-সুরভি।
অকালের কুয়াসায় মূরছিয়া কেঁদে চায়
ফাগুনের দুলালী সে মাধবী;
পারিজাত উপবনে চুপি চুপি তার সনে
ফুরাল কি শেষ কথা, হে কবি।

হাহা করে' ওঠে হাওয়া আষাঢ়ের ভাষাতে,
ডাকে দেয়া সব-শেষ নিশাতে,
তব শিথানের 'পরে দেবীর নূপুর ঝরে,
পিইলে প্রসাদী সুধা, তৃষাতে।

আজি, অতল-পরশে কোন্ সুগোপন পাথারে
আথাল-পাথাল নীল বিথারে,
লুকানো মুকুতা পাঁতি মুকুটে লইতে গাঁথি'
ডুব দিলে হে ডুবারি সাঁতারে।

জ্বলে গো যুগের ধুনী চিতানলে রাঙিয়া
নিমেষের শেষ ভুল ভাঙিয়া,—
কত মঠ চুরমার, অভিযোগ নাহি তার!
চলে যায় হাহাকার হানিয়া,
চলে যায় যে যাবার,　কাঁদি মোরা অনিবার
জীবনের বিষামৃত ছানিয়া।

যায় কি রে ধরে' রাখা,　যায় ডুরি ছিঁড়িয়া,—
উড়ো পাখী আসে না কি ফিরিয়া?
এ কি সখা সবি ফাঁকি! প্রীতি-রেশ থাকে না কি?
মিছে মরি ডাকাডাকি করিয়া।
এখনো যে কত গীত,　বাকি আছে হে সুহৃৎ,
আরতির মণিদীপ ধরিয়া।

কবি-লোকে আগমনী, বাজে বাঁশী সাদরে,
কাঁদে চিত স্মৃতি-ঝরা বাদরে;
কি ক্ষতি করুণ সুর সারাপ্রাণ পরিপুর,
স্ফুরিল না বাণীরূপে অধরে।
অমর মাধুরী লুটি'　তুমি যে উঠেছ ফুটি'
মেল' আঁখি জাগরণ-সায়রে।

কত কুহু কত কেকা মুখরিত খেলাতে,
স্বপনের অপরূপ বেলাতে,
বসি' ভ্রাতঃ নিরালায় মনে মনে দুজনায়
মিলিয়াছি কত আলো ছায়াতে;
কত আশা, নাহি তুল,　ফোটা কুঁড়ি, ঝরা ফুল,
গেঁথে গেছ অতীত সে উষাতে।
ছিলে তুমি মধুব্রত, দিলে দিল্ ভোলায়ে,
লুকোচুরি খেলে গেলে পলায়ে,
গুঞ্জ রাটি গর্বার সুর-বাহারের তার
রঙে রসে দেছ হিয়া গলায়ে।

হের হয় ভাঁটা সুরু, আঁধিয়ার দরিয়া
প্রভাতী ছটায় গেল ভরিয়া,
হেথা অমা-যবনিকা ফ্যালে কোন্ সাগরিকা
আকাশের সীমা যায় সরিয়া।
পরাল বিজয় টীকা থির মেরু-দামিনী;
পাড়ি দিলে ছায়াপথ-গাঙিনী।
মরতে অমিয়া যাহা,　জিনিয়াছ তুমি তাহা,—
নব চোখে পোহাইল যামিনী।

প্রণমিয়া গরীয়সী জননীর চরণে,
দাঁড়াইয়া দেউলের তোরণে,
বাজালে মিলন-শাঁখ, দিকে দিকে দিলে ডাক,
বাজে বাণ্ সমাধির গহনে।
যাও প্রিয়, প্রিয়তম ভবনে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সত্য

তুমি যাবে, স্বপ্নের অতীত,
তবুও স্বপনে এসে বলে গেলে মোরে
তখনও আঁধার চারিভিত,
উষার আলোক উঁকি দেয় নাই ভোরে!

সত্য গেল—কোন্ সত্য, আহা কেন যাবে?
কাঁদিয়া চোখের জলে উঠিলাম জাগি;
ব্যথায় ভরিল বুক, কাহার অভাবে?
এ মোর মায়ের মন, কাঁদে কার লাগি?

উঠিয়া খুলিনু বাতায়ন,
কাঞ্চন-শৃঙ্গের শিরে কনক আভাস,
চেয়ে দেখে মানস-নয়ন,
মানসের সরোবরে কমল উল্লাস!

অঝোরে ঝরিছে ঝোরা, ঝাউ নুয়ে পড়ে,
তুষারের শিশিরের নিশ্বাসের ভারে,
গোলাপ উঠিছে ফুটি চোখে জল ভরে'!
পাখী যেন কেঁদে কারে, ডাকে বারে বারে!

সব যায়, সত্য শুধু থাকে,
সুখ হোক, দুঃখ হোক শুধু তারি জোরে,
মানুষ যে প্রাণে করে রাখে,
স্মৃতির আগুনটুকু বুকের পাঁজোরে!

সেই স্মৃতি নিয়ে আজ যাই ফিরে ফিরে,
তোমার স্মরণ-ভরা গুটিকত দিনে,
তোমার সে স্বল্প-ভাষ প্রাণে আসে ফিরে,
আরো কিছু এনো দেয় শুধু দুঃখ বিনে!

সত্য বটে, স্বর্গ নয় ধরা,
জন্ম নিয়ে তোমরাই স্বর্গ করো তারে,
আপনি যে স্বর্গ দেয় ধরা,
মুখের কথায় আর, পরাণের তারে!

তোমা তরে নয় শুধু সুখ,
চাহিনা শুধুই যশ, অমর অক্ষয়,
তোমার সে সত্য সবটুক্
বেঁচে থাক্, চায় প্রাণ এই বরাভয়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সত্যেন্দ্র-বিয়োগে

'শরৎ-আলোর সোনার হরিণ' ছুট্‌ল না ত' গগন-পারে—
কে ভুলালো তোমায় কবি, অমানিশার অন্ধকারে?
পারের পারিজাতের স্বপন ছাইল নয়ন-দুইখানিতে,
সারাভুবন পেরিয়ে গেলে কোন্ অচেনার হাতছানিতে?
হঠাৎ বুঝি পড়্‌ল চোখে মেঘের কোলে মরাল-সারি—
মানস-সরোবরের পথে চল্‌লে উড়ে' সঙ্গে তারি?

হায় কবি হায়, ফুলের ফসল ফুরায় নি যে!—দিন ফুরালো!
শিউলি-বকুল সবগুলি ওই হাত দু'খানি কই কুড়ালো?
মনের বনের যে-সব কুঁড়ি ফুট্‌ল না আর গানের বোঁটায়,
দূর-বাগানের হাস্নুহানার গন্ধ হ'য়ে হাওয়ায় লোটায়!
আঁধার-রাতের হাস্নুহানা!—হাস্‌বে না আর জ্যোৎস্নারাতে!
মরণ-সাপের গরল-নিশাস জড়ায় যেন কেয়ার পাতে!

বঙ্গবাণীর প্রাণের দুলাল!—বুক-জুড়ানো কোলের ছেলে!
মায়ের আঁচল-বাঁধা প্রসাদ সবটুকু সে তুমিই পেলে।
ঘুমপাড়ানি-গানের ছড়া শিখ্‌লে তুমি ঘুম না গিয়ে—
বাংলা-বুলির বুল্‌বুলি গো!—হাজার সুরে সুর মিলিয়ে!
মায়ের মাথার সিঁথির পাটি, মায়ের হাতের পৈঁছা-খাড়ু,
অবাক হ'য়ে দেখলে চেয়ে. ভর্‌লে হাতে মিঠাই নাড়ু!

তাপস তুমি! তপের বলে আন্‌লে সকল বিঘ্ন নাশি'
ছন্দ-ভাগীরথীর ধারা—উঠ্‌ল জীয়ে ভস্মরাশি।
মৌন-মৃত যাদের বাণী সংস্কৃতের পাতালপুরে—
জয়জয়ন্তী গাইল তারা নূতন করে' তোমার সুরে!
শব্দ-সাগর যেথায় ছিল, মিলিয়ে দিলে সেই মোহানায়
ঘুম্‌তি সাথে পাগ্‌লা-ঝোরা, সরযূ সাথে শোণ-যমুনায়!

আন্‌লে ভরে' ভাষার ঘটে সকল জাতির তীর্থ-সলিল,
ভুবন-জোড়া ভাবের হাটে পৌঁছে দিলে দাবীর দলিল!
তোমার মুখে বেণুর আওয়াজ সোনার বীণায় হার মানালো!
'কুহু-কেকা'য় ফুল-ফাগুয়ায় চম্‌কে ওঠে বিজ্‌লী-আলো!
'অভ্র-আবীর' অঞ্জলিতে রঞ্জিলে যে চরণ তুমি—
শোভায় তাহার ধন্য হ'ল 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'!

পুরাতনের বিপুলপুরী—ভিতর-আঁধার দেব-দেউলে,
মণিকোঠার দুয়ার ঠেলে ধর্‌লে স্মরণ-দীপটি তুলে!
যুগান্তরের যবনিকায় লুকায় যে সব যুগ-সারথি—
তোমার কবি-চিত্রশালায় নিত্য তাদের ধূপ-আরতি!
কোন্ সে-কালের রাজবধূরা চুলগুলি দেয় 'ধূপের ধোঁয়ায়'—
তাদের বসন-ভূষণ-ছটায় উচ্চশিরও কুবের মোয়ায়!

বাদল-দিনের দুই-পহরে আকাশ-ঘেরা মেঘের তলে,
শুন্‌ছি তোমার কাজ্‌রী-গাথা—মন্‌-আঁধারে মাণিক জ্বলে!
কান্নাসুরে প্রাণের বেদন মধুর করে' তুল্‌ছে কারা?
কাজল-নয়ন সজল তাদের, কণ্ঠে সুখের সুর-ফোয়ারা!
বাদল-বায়ে দুলিয়ে দোলা, লুটিয়ে বেণী পিঠের 'পরে,
তোমার দেয়া গানের ধুয়া বছর-বছর এম্‌নি ধরে!

গৌড়্‌সারং বাজবে না আর? গান-গাওয়া কি থাম্‌ল তবে!
শুক্লা তিথির গান-দশমী অর্দ্ধরাতেই আঁধার হবে!
সেই কথা কি জান্‌তে তুমি?—প্রহর-শেষের মরণ-ছায়া
ঘনিয়ে আসে, দেখলে চেয়ে?—তাই সে এমন করুণ মায়া
ফুটিয়ে দিলে চাঁদের মুখে, সবার-সেরা গর্‌বা-গানে—
প্রাণের নিসুত্‌-নিদ্‌-রাগিণী গাইলে চেয়ে তারার পানে!

ছাতিম-গাছের তলায়-তলায়, পঞ্চমুখী-জবার বনে,
পাপ্‌ড়ি কে আর গুণ্‌বে কবি, মন্দ-মধুর গুঞ্জরণে?
টিয়ার-পালক-সবুজ ক্ষেতে উড়্‌বে যখন শালিক ফিঙা,
ভাদর-ভরা গাঙের কূলে ভিড়্‌বে মকরাঙ্গী ডিঙা—
মা যে তোমার নামটি ধরে' যুগে-যুগেই ফির্‌বে ডেকে!
—গানের মাঝেই মিল্‌বে সাড়া ভাগীরথীর দু'পার থেকে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

কবি সত্যেন্দ্র

অসত্য যত রহিল পড়িয়া সত্য সে গেল চ'লে
বীরের মতন মরণটারে দু-চরণের তলে দ'লে।
যে ভোরের তারা অরুণ রবির উদয়-তোরণ-দোরে—
ঘোষিল বিজয়-কিরণ-শঙ্খ-আরাব প্রথম ভোরে,—
রবির ললাট চুম্বিল যার প্রথম রশ্মি-টীকা
বাদলের বায়ে নিভে গেল হায় দীপ্ত তাহারি শিখা!
মধ্য গগনে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন-হারা,
নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকুল-ধারা,
গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই, নিবে গেছে সব বাতি
হাঁক দিয়া ফেরে ঝড়-তুফানের উতরোল মাতামাতি,

হেন দুর্দ্দিনে বেদনা-শিখার বিজলী-প্রদীপ জ্বেলে
কাহারে খুঁজিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে?
বারে বারে তব দীপ নিবে যায়, জ্বালো তুমি বারে বারে,
কাঁদন তোমার সে যেন বিশ্বপাতারে চাবুক মারে।
কি ধন খুঁজিছ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগুণ্ঠিতা?
তুমি কি গো সেই সবুজ-শিখার কবির দীপান্বিতা?
কি নেবে গো আর? ঐ নিয়ে যাও চিতার দুমুঠো ছাই,
ডাক দিয়োনাক, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই!
ডাক দিয়োনাক, মূর্চ্ছিতা মাতা ধূলায় পড়িয়া আছে,
কাঁদি ঘুমায়েছে কবির কান্তা জাগিয়া উঠিবে পাছে!

ডাক দিয়োনাক, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই,
গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই!
আসিলে তড়িৎ-তাঞ্জামে কে গো নভতলে তুমি সতা?
সত্য-কবির সত্য-জননী ছন্দ-সরস্বতী?
ঝলসিয়া গেছে দুচোখ মা তার তোরে নিশিদিন ডাকি,
বিদায়ের দিনে কণ্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি'
সাত কোটি এই ভগ্নকণ্ঠে; অবশেষে অভিমানী
ভর দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী।
ডাকিছ কাহারে আকাশ-পানে ও-ব্যাকুল দুহাত তুলে?
কোল মিলেছে মা শ্মশান-চিতায় ঐ ভাগীরথী-কূলে!

ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁঝের তারায়,
কা'ল যে আছিল মধ্য-গগনে আজি সে কোথায় হারায়?
সাঁঝের তারা সে দিগন্তরের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ত-তোরণ-পার সে দেখায় কিরণের ইসারায়।
মেঘ-তাঞ্জাম কার চলে আর যায় কেঁদে যায় দেয়া,
পরপার-পারাপারে বাঁধা কার কেতকীপাতার খেয়া?
হুতাশিয়া ফেরে পুরবীর বায়ু হরিৎ হুরির দেশে
জর্দ্দাপরীর কনক-কেশর কদম্ব-বন-শেষে।
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ কবি সে আসিবেনা আর ফিরে,
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে।

'তূণির লিখন' লেখা যে এখনো অরুণ রক্ত-রাগে
ফুল্ল হাসিছে 'ফুলের ফসল' শ্যামার সবুজা-রাগে,
আজিও 'তীর্থ-রেণু ও সলিলে' 'মণি-মঞ্জুষা' ভরা,
'বেণু-বীণা' আর 'কুহু-কেকা' রবে আজো শিহরায় ধরা,
জ্বালিয়া উঠিল 'অভ্র-আবিরী' ফাগুয়ায় 'হোম-শিখা,'
বহ্নি বাসরে টিটকারি দিয়ে হাসিল 'হসান্তিকা,' —
এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
সত্য-প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যেটা হ'ল ছাই!
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহা-শূন্যে মিলাল ফাঁকা,
সৃজন-দিনের সত্য যে, সে-ই রয়ে গেল চির-আঁকা!

উন্নত-শির কাল-জয়ী মহাকাল হয়ে যোড়-পাণি
স্কন্ধে বিজয়-পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি।
আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি-মাঝে,
খেয়ালী বিধির ডাক এলো তাই চলে গেল আন-কাজে।
ওগো যুগে-যুগে কবি, ও মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান!
ধরায় যে বাণী ধরা নাহি দিল, যে গান রহিল বাকী
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে সত্য সে নহে ফাঁকি।
সব বুঝি ওগো, হারা-ভাতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি,
হয়ত যা গেল চিরকাল তরে হারানু তাহার দাবী।

তাই ভাবি আজ যে শ্যামার শিষ, খঞ্জন-নর্ত্তন
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুনঃ কোন্ নন্দন-বন!
চোখে জল আসে হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এ দেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।
আষাঢ়-রবির তেজোপ্রদীপ্ত তুমি ধূমকেতু-জ্বালা,
শিরে মণি-হার, কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণী-মনসার মালা,
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি তুমি আসিলে হে নির্ভীক,
মরণ-শয়নে চমকি চাহিল বাঙালী নির্নিমিখ।
বাঁশীতে তোমার বিষাণ্ মন্দ্র রণরণি ওঠে, জয়
মানুষের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয়।

করনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়ায়নি মাথা চির-জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নিক কভু তাই
বল-দর্পীর দণ্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই!
যশ-লোভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্ঞান ভীরু-দলে
তুমিই একাকী দামা-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।
মেকীর বাজারে আমরণ তুমি রয়ে গেলে কবি খাঁটী।
মাটীর এ দেহ মাটী হ'ল, তব সত্য হ'ল না মাটী।
আঘাত না খেলে জাগে না যে-দেশ, ছিলে সে দেশের চালক,
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে তূর্য্য-বাদক বালক।

কে দিবে আঘাত? কে জাগাবে দেশ? কই সে সত্য-প্রাণ?
আপনারে হেলা করি' করি মোরা ভগবানে অপমান!
বাঁশী ও বিষাণ নিয়ে গেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,
লোক-দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি!
যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখনি খাতির-দারী,
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করনি, হওনি রাজার দ্বারী।
অত্যাচারকে বলনিক দয়া, বলেছ অত্যাচার,
গড় করনিক নিগড়ের পায়, ভয়েতে মাননি হার।
অচল অটল অগ্নি গর্ভ আগ্নেয়-গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য করেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।

হে মহা-মৌনী, মরণেও তুমি মৌন মাধুরী পিয়া
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছল-করা গীতি নিয়া।
তোমার প্রয়াণে উঠিলনা কবি দেশে কল-কল্লোল,
সুন্দর, শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কোল!
স্বর্গে বাদল-মাদল বাজিল, বিজলি উঠিল মাতি;
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি-প্রসূন সারাটি রা-তি।
কেহ নাই জাগি' অর্গল-দেওয়া সকল কুটীর দ্বারে,
পুত্র হারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে!
নিশীথ শ্মশানে অভাগিনী এক শ্বেত-বাস-পরিহিতা,
ভাবিছে তাহারি সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালাল ঐ চিতা!
ভগবান! তুমি চাহিতে পার কি ঐ দুটী নারী পানে?
জানিনা তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে!

কাজী নজরুল ইস্লাম।

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ

তরুণ-তনু উষা অরুণ-মঞ্জুষা পরশে সবে এসে অঙ্গ,
তখন চুম্বনে নয়নে ঘুম্ বোনে মিলন সুনিবিড় সঙ্গ !
কমল নীল-নীরে মেলিছে আঁখি ধীরে, বিহগ তরুশিরে গুঞ্জে,
সজল সমীরণ তুলিছে শিহরণ, প্রাবৃট জাগরণ কুঞ্জে—
মাদল বাজে মেঘে বাদল চঞ্চল বরষা অঞ্চল মুক্ত,
সরসী বিহ্বল কোমল ধরাতল শ্যামল-তৃণ-দল-ভুক্ত
কানন কুন্তল আকুল করি বহে পবন শীতবারি-সিক্ত,
সজল নীল-আঁখি ঝরিছে থাকি থাকি কাজল রেখা সম্পৃক্ত !
মরাল ভরা জলে ভাসিছে কুতূহলে ললিত গ্রীবা করি উচ্চ ;
দাদুরী দূরে ডাকে, নাচিছে নীপ-শাখে ময়ূর মেলি মণি-পুচ্ছ ;
কমল কেতকীর সজল ফুলরেণু, মিলনাকুল বেণু-রন্ধ্র,
তপন জ্যোতিহীন গোপন সারাদিন, গগনে ঘন-মেঘ-মন্দ্র ;
দামিনী বাতায়নে হাসিছে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে চমকিয়া বিশ্ব,
সভয়ে ফিরে চায় শূন্য আঙিনায় তরুণী বিরহিণী নিঃস্ব !
রেচন জলদের সেচন ক'রে বারি উশীর-সুরভিত ক্ষেত্রে ;
নীরবে বনবীথি স্মরিছে কার স্মৃতি দাঁড়ায়ে অবনত নেত্রে ;
মুক্ত বেণী কূলে বীণাটি ল'য়ে ভুলে মুগ্ধ কবি গায় স্তোত্র,
সকল তারে তার তুলিয়া ঝঙ্কার নিখিল মিলনের শ্রোত্র !
সহসা আসি কোন্ রুদ্র ত্রিলোচন করাল শূলপাণি ঝঞ্ঝা
করিল অঙ্কিত ভাল-ত্রিপুণ্ড্রকে কাল-কলঙ্কিত-পঞ্জা !

* * *

তরুণ কবি গেছে বিদায় ল'য়ে আজ— না হ'তে যৌবন ছিন্ন,
উজল মণিহার গিয়াছে ফেলি তার অমর-প্রেম-স্মৃতি-চিহ্ন ;
বেণু ও বীণা যার বেজেছে বার বার কত না কবিতার ছত্রে,
এঁকেছে অবনার মোহন তসবীর তুলির লেখা শতপত্রে ;—
ভুলায়ে গেছে সবে কুহু ও কেকারবে ফুলের ফসলে সে নিত্য,
চীনের ধুপ জ্বালি অগুরু সৌরভে ভরিয়া গেছে শত চিত্ত ;
জ্বালায়ে হোম-শিখা দিয়াছে রাজ-টীকা তীর্থ-সলিলে যে ভক্ত,
স্বদেশ-গাথা যার শুনিলে প্রতিবার শিয়রে শিহরিত রক্ত ;
কাহিনী কথা গান কবিতা অফুরাণ—নাট্য-অবদান হাস্য,—
নবন রস রাগে জীবনে সদা জাগে, ভারতী মাগে যার দাস্য,
কল্প-কলা-বিদ্ কলাপে অবহিত —বাঙালী ধনী যার গর্ব্বে
ভ্রমিয়া দেশে দেশে তীর্থরেণু যে সে কুড়ায়ে, বিলায়েছে সর্ব্বে ;
ভাষা ও ভাবে যার স্বর্গ-সুষমার অসীম অনুপম ঋদ্ধি
ছন্দ-যাদুকর শব্দ-সুর-ধর সুতান লয়ে যার সিদ্ধি,
রচিতে রস-কলি-খচিত পদাবলী যে ছিল সুনিপুণ যন্ত্রী,
ত্রিদীব সংগীতে ক'রেছে ঝঙ্কৃত রঙ্গ-মল্লার তন্ত্রি
অভ্র-আবীরে যে খেলেছে হোলি-খেলা হসন্তিকা সখী সঙ্গে
শ্রাবণ হিন্দোলে আবেশে ছিল ঢ'লে উদাস প্রেম-রাস-রঙ্গে,
প্রতিভা আপনার অটুট ছিল যার পরশি রবি-রথ-চক্র
অমৃত-কণা ভুলি গরল-ফণা তুলি—করে'ন শির কভু বক্র ;
হেরিলে অবিচার শাসিত বার বার বিরূপ নব কবিরত্ন
ব্যঙ্গ কশাভারে দুর্মতি দানিবারে ধৃষ্টে—ছিল যার যত্ন ;
ধূপের ধোঁয়া যার দেবীর কেশভার করেছে সুচিকণ স্নিগ্ধ,
টুটিতে বন্ধন অটুট যার মন—ছিল না কভু সন্দিগ্ধ,
মহান মানবের—যে ছিল ঋত্বিক, চারণ-বীরগণ-কীর্ত্তি,
শ্রদ্ধা-চন্দনে স্তুতি ও বন্দনে ত্যাগীর পূজা যার বৃত্তি—
বিগত-গৌরব কীর্ত্তি অতীতের কহিয়া পতিতের কর্ণে
ঘোষিল যার শ্লোক স্বজাতি সব লোক, অলীক ভেদাভেদবর্ণে—
মানব-সেবা সার, অচলা মতি যার মাতৃচরণারবিন্দে
উদার মহামনা অমিত গুণপনা শত্রু নাহি যারে নিন্দে,
শান্ত দৃঢ়মতি শিষ্ট সুধী অতি সুজন কৃতি সুচরিত্র,
সাহসী সংযত জগত-হিতরত সতত প্রিয়ভাষী মিত্র !
গিয়াছে চলি আজ কঠিন-গুরু-বাজ হানিয়া অসময়ে বক্ষে,
অসহ বেদনায় কাতর কোটী প্রাণ-উতল আঁখিধারা চক্ষে ;
জনম-দুঃখীদের যে মণি-মঞ্জুষা—দিয়াছে উপহার কাব্যে—
আঁকড়ি তাই বুকে বিরস ম্লান মুখে নীরস দিন তারা যাপ্‌বে !

* * * *

চলিয়া গেল কবি ফেলিয়া ছন্দাভি না হ'তে সঙ্গীত পূর্ণ ;
সজল আঁখিতারা বাণী যে বীণাহারা গলার গজমতি চূর্ণ !
মুদিত শতদল, অলস অঞ্চল, নূপুর-নিক্কণ স্তব্ধ,
নীরব এস্রাজ, থেমেছে পাখোয়াজ, মুরলী মূক ভুলি শব্দ ;
সত্যপথচারী ফিরিল গৃহে তারি সত্য ছিল যার দৌত্য, --
সুবাসে দিক্ ভরি পড়িল ফুল ঝরি মধুপে দিয়ে তার মৌত্ব !
মরণ-মেঘরথে চলিল প্রিয়-পথে বিরহী অলকার যক্ষ,
ভুলিয়া দু'দিনের স্বপন-লোকমেলা আমোদ-হাসি-খেলা-সখ্য !

শ্রীনরেন্দ্র দেব ।

সত্যেন্দ্রনাথ

অকস্মাৎ শুনিলাম, তুমি বিশ্বে নাই,
কাঁদিয়া উঠিল হিয়া হাহাকারে ভরি দিয়া
সত্যেন্দ্র চলিয়া গেছে অসময়ে হায়,
ভারতীর বীণাধ্বনি, থামিয়া গেল অমনি,
ছন্দের সুবর্ণ হার ছিঁড়ে গেল তায়!
মিলেব মিলনতার, বাজিবেনা পুনর্ব্বার,
সুললিত ঐক্যতানে নানা ভঙ্গিমায়!
ছন্দে চির-নবীনতা ভাবে নিত্য সজীবতা
বিবিধ বরণ চিত্র, বিবিধ ভাষায়!
বাণীর সেবক ছিল, মা তারে ডাকিয়া নিল,
আপনার কবি-কুঞ্জে, "ফুলের ফসলে"
পূর্ণ সেথা, সুবাসিত, বর্ণ-গন্ধে আমোদিত
ঝরে নাহি যায় সেথা, সে কুসুমদলে,
প্রস্ফুটিত বারোমাস, বসন্তের বসবাস
আজীবন কবি কণ্ঠে সঙ্গীত উচ্ছ্বাসে
রাগ রাগিণীর মেলা, কুহু কেকা সারা বেলা,
গায় গীত, চীন-ধূপে আরতি প্রকাশে।
কত রত্ন আহরণ, বিশ্বে কত বিতরণ
করে গেছে মুক্ত, করে রাখেনি সঞ্চয়;
সে সব রতন-মণি, একে একে নাম গণি
পরিচয় কিবা দিব খ্যাত সর্ব্বময়!
ধীরশান্ত মিতভাষী, সরল শৈশব হাসি,
উজল করিয়া ছিল প্রফুল্ল আনন,
মুছিয়া যাবেনা স্মৃতি, ঝরিবে নয়নে নিতি
অকাল-বিয়োগ ব্যথা তোমার কারণ!
পুত্র-হারা জননীর, কে মুছাবে আঁখিনীর
হৃদয়ে শোকের বহ্নি অনন্ত দাহন।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

সত্যেন্দ্র-তর্পণ

(মন্দাক্রান্তা ছন্দে)

বাংলার সত্যেন অকালে গেল আজ, রইলো স্থান তার অপূর্ণ!
অশ্রুর তর্পণ চলেছে বাঙালীর, বক্ষ-পঞ্জর বিচূর্ণ!
নিষ্ঠুর সংবাদ ছেয়েছে সারা দেশ, হায় কি আফশোষ অশান্তি!
বুঝতাম কয়জন কি ছিল সে মোদের!
হায় রে হায় হায় কি ভ্রান্তি!

অন্তর কাৎরায়, পাব কি খুঁজে আর নব্য বঙ্গের এ-রত্ন!
সত্যিই দেশ্‌ময় জীবনে কবিরাই পায় না সম্মান সে' যত্ন!
প্রাণ্‌বান্‌ দেশপ্রাণ সে ছিল সুমহান্‌ কীর্ত্তিমান্‌ মা'র সুপুত্র!
ছন্দের সম্রাট্‌ বাঙালী-যশোমান হায় রে যায় আজ অমুত্র!

বন্ধুর গৌরব করেছি এতদিন, রইছি হর্‌দম প্রসন্ন!
প্রেম তার পুষ্‌তাম হৃদয়ে অনিবার, আজকে প্রাণ মন বিষণ্ণ
ছন্দের ওস্তাদ ছিল সে আমাদের, রাস্তা বাৎলায় অনন্ত!
কিম্মৎ বুঝবার ক্ষমতা ছিল কই! কই সে হিম্মৎ শ্রীমন্ত!

শব্দের ঝঙ্কার ছিল কি সুমধুর, ভাব কি সুন্দর সুস্পষ্ট!
টল্‌টল্‌ নিৰ্ম্মল ভাষা কি বেগবান্‌, কুঁচ্‌কে হয় নাই আড়ষ্ট!
সত্যের জয়-গান করেছে দুনিয়ায়, চিত্ত নির্ভয়, কি শৌর্য্য!
'তুল্‌-তুল্‌ টুক্‌-টুক্‌' ভাষাতে ছিল ফের্‌ বজ্র-গর্জ্জন অধৈর্য্য!

শব্দের ভাণ্ডার ছিল যে অফুরান্‌, হায় কি অদ্ভুত কবিত্ব!
দেখতাম নির্ব্বাক্‌ কবিতা-পিরামিড্‌, কাব্য-লক্ষ্মীর কৃতিত্ব!
আর্‌বির ফাসির ফরাসী কবিতার করলো মৌ-পান আকণ্ঠ!
সুরতাল মন্থন করেছে একেলাই, বঙ্গে সে-ই এক শ্রীকণ্ঠ!

সজ্জন বন্দন পেয়েছে খুবি তার, শাস্তা ভণ্ডের প্রচণ্ড!
বাম্‌নাই হর্‌দম দাপটে হুঁসিয়ার, কাঁপতো নির্ম্মম পাষণ্ড!
মানুষের একটুক্‌ গুণে সে শতমুখ, দিল্‌ যে খুব তার প্রশস্ত!
চণ্ডাল ব্রাহ্মণ পেয়েছে একাসন, রইতো দাম্ভিক দুরস্ত!

হয় নাই বাংলায় এ হেন কবি আর, ধন্য সার্থক তপস্যা!
ফুর্সৎ পায় কই? বুঝালো তবু সব বর্ত্তমান-যুগ-সমস্যা!
বিহ্বল চঞ্চল হতো সে কি-আশায় উঠ্‌লে মুক্তির প্রসঙ্গ!
জিঞ্জীর্‌ মঞ্জীর কে চাহে? তোলে তাই "গান্ধীজীর" জয়-তরঙ্গ!

দুশ্‌মন দোস্তের সে ছিল খাঁটি এক বন্ধু সুন্দর-চরিত্র!—
"চরকার গান" গায়, "আরতি" করে তার, মঞ্জু গুঞ্জন বিচিত্র!
"গর্‌বার গান" তার সে-কিরে মজাদার!
"ছন্দ-হিন্দোল" অতুল্য!
ফিট্‌ফাট্‌ আঁট্‌সাঁট্‌ "কিশোরী" সদা মোর·করলো যৌবন প্রফুল্ল!

কাব্যের-সম্রাট্-মনীষা-মধুকর বিশ্ব-বাংলার বরেণ্য !
তার সব নির্ঝর্-কবিতা-মাধুরীর সঞ্জীবন্-প্রেম্ স্মরেণ্য !
আত্মার "ইজ্জৎ" বাড়ালো হয়ে সে-ই আত্মনির্ভর নিশঙ্ক !
"আম্‌রা"ই একসাথ করেছি "চিঠি" পেশ, ঘুচবে নিশ্চয় কলঙ্ক !

সেই এক "অক্ষয়", তাঁহারি নাতি এই বঙ্গগৌরব প্রদীপ্ত !
বুকভর্ বিশ্বাস, মেটেনি আশা তার, ছাড়লো শেষ শ্বাস অতৃপ্ত !
এই এক আফ্‌শোষ, অকালে গেল হায় শক্তিধর্ সেই অদম্য !
তার কাছ ঘেঁসবার ক্ষমতা আছে কার ?
সেই তো যুগ যুগ প্রণম্য !

ভরপূর মজ্‌লিস্—সহসা ছিঁড়ে আজ একটা এস্রাজ নি-শব্দ !
আস্‌মান গুল্‌জার—কোথা সে ছিল মেঘ ?
একটা চাঁদ আজ কি স্তব্ধ !
অর্ণব-গর্জ্জন নিশীথে হোলো আজ একটা নিশ্চুপ নিতান্ত !
চুল্‌বুল্ বুল্‌বুল্ আলাপে সমাকুল, একটা 'লিপ্তে'ই প্রাণান্ত !

এদ্দিন পর আজ হোলো রে ধূলিসাৎ একটা তাজ'মল, কি কষ্ট !
বাজ্‌নায় মশগুল ছিঁড়েছে পাখোয়াজ, একটা সঙ্গত্ বিনষ্ট !
বিশ্বের বিস্ময় প্রতিভা-হিমালয় একটা চুরমার প্রকাণ্ড !
হায় হায় সব শেষ ! থেমেছে ধারাপাত একটা নাগ্রার ;
কি কাণ্ড !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

পরলোকে সত্যেন্দ্র

বীণাপাণি দেছে বহ্নির টীকা ভালে,
সুরবালা দেছে গলায় কমলমালা ;—
পূজা-উপচার বহিয়া সোনার থালে
দাঁড়ায়েছে তারা স্বর্গ-ভুবন আলা !

পথে পথে শত মেঘের তোরণ খাড়া,
দিকে দিকে ছোটে তড়িৎ-আতসবাজি,
মুহুমুহু আসে ঐরাবতের সাড়া,
নারদের বীণা তার সাথে উঠে বাজি !

'মর্ত্ত্যের কবি স্বর্গের কবি আজি !'—
শূন্য মুখর 'সত্যের' জয়-রবে !
নিয়ে ধরণী মলিন বসনে সাজি ;
ধূলায় ধূসর কাঁদিছে আর্ত্তরবে !

বাংলার ব্যথা বাজিল কবির বুকে —
মনে পড়ে কত স্বপ্ন লইয়া খেলা—
দুঃখের ছায়া করে পাণ্ডুর মুখে —
মনে পড়ে' গেল রথযাত্রার মেলা !

করিল কবির আরতি তপন তারা,
চন্দ্র পরাল জ্যোৎস্না মুকুট শিরে,
গগন পবন তারে হেরে দিশাহারা,
কমল ফুটিল স্বচ্ছ সরসী-নীরে !

করি' জোড়কর বিধাতার পানে চাহি'
কবি কহে—তার বাষ্প-আকুল স্বর—
'এত সমাদরে কিছু প্রয়োজন নাহি
ভালবাসো যদি দাও মোরে এক বর—

বাংলার বুকে মানুষ হয়েছি আমি,
বুক ভরা মোর তাহার শ্যামল স্নেহে,
তাহারি স্বপ্ন নেহারি দিবস-যামি,
বর দাও প্রভু ফিরে যাই সেই গেহে !'

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মরণে

এই সেদিনে দেখে এলুম দিব্যি তোমায় সুস্থ সবল,
আজকে হঠাৎ শুনি, তুমি নাই !
পরপারের ডাক এসেছে—পাইনি কো তার একটু আভাষ,
মনে মনে সন্দেহ হয় তাই—
আবার যদি যাই কোনো দিন কর্ম্মশ্রান্ত সন্ধ্যে বেলা
'ভারতী'র সেই উপর-তলার ঘরে,
হয় তো তোমায় দেখতে পাব, যেমনটি ঠিক্ ছিলে তেমন
হাসচো হাসি, কইচ মৃদুস্বরে !

বক্‌চে 'বুড়ো' এটা-সেটা, হেমেন্দ্র সে পুরুফ নিয়ে,
মণিলালের উড়চে ধোঁয়া মুখে,
সৌরীন্দ্র খাচ্ছে হাওয়া, তক্তপোষের উপর আমি
শুনচি কথা উপুড় হয়ে ঝুঁকে,
ভাবচি মনে কেমন করে এরা এমন লেখে ভালো
বিশেষতঃ ঐ মানুষটি - যার
ম্যাজিক-কলম টেক্কা দিলে একেবারে সবার উপর,
ফুটিয়ে ফুলের ফসল চমৎকার।

সত্যি ওগো সত্যি তুমি ভেল্কি-বাজি লাগিয়ে দিলে,
শব্দ নিয়ে খেল্লে ছিনিমিনি,
কী বিচিত্র সুরে ছন্দে নাচিয়ে দিলে বাংলা ভাষায়।
তোমার কাছে রইল চির-ঋণী।
দেশ-বিদেশের কবির লেখা বাংলা সুরে ছন্দে ভরে
করলে হাজির বঙ্গবাণীর দ্বারে,
মুগ্ধ মোরা অবাক তোমার অনুবাদের কায়দা দেখে,
কেউ পারেনা ঘেঁসতে তোমার ধারে!
সত্যি ওগো সত্যি তুমি 'সুরের ফুলের ফুলঝুরিতে'
মাতিয়ে দিলে বাংলা দেশের হাওয়া,
ঝুটো-মেকির চির-শত্রু সবুজ প্রাণের অবুঝ কবি
তোমার মত আর কি যাবে পাওয়া?
স্মৃতির শাসন মনুর বচন মানলে নাক তোমার বাঁশী,
শুনিয়ে দিলে মুক্ত হাওয়ার গান,
শুনিয়ে দিলে সেই সে বাণী মানুষ যাতে বাঁধন ছিঁড়ে
পায় ফিরে তার হারিয়ে-যাওয়া প্রাণ।

ওগো কবি তোমার লেখা লাগ্‌তো আমার বড়ই মিঠে,
মাসিক কাগজ প্রকাশ হলেই তাই,
সদ্য-ফোটা ফুলের মত তোমার টাট্‌কা লেখা কোনো
কী আগ্রহে খুঁজতুম, যদি পাই!
বৃথা এখন সে কল্পনা—খানিক বেজেই ভাঙলো বাঁশী।
এমন হবে হঠাৎ কে তা জানে!
এখন তুমি কোন্ ঠিকানায় বুঝতে নারি, তাকিয়ে আছি
আকুল চোখে চেয়ে আকাশ-পানে।

—— শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

দেশের কি মণি গেল
সাপ্তাহিকে, দৈনিকে, পাক্ষিকে
লিখি তাহা, সত্য তার
সমর্থিতে ডাকুক্ সাক্ষীকে।
দশের কি নিধি গেল
বলুক্ তা' দশেরি বাণীতে
আমি তাহা জানিনাক'
আমি তাহা চাহিনা জানিতে।

কোন্ লুপ্ত গৌরবের
সুপ্ত কথা জাগাইয়া বুকে
সে ফুটালো যশোশশী
মসীলিপ্ত বাঙালীর মুখে,—
যার খুসী, স্পর্দ্ধাভরে
সে তাহার দিক্ পরিচয়,
আমি জানি, এ যে তার
কোন গর্ব্ব, কোন খ্যাতি নয়।

কোন্ ছন্দে কি কাহিনী
আছে লেখা কি কি গ্রন্থে তার
তাহারি তালিকা গড়ি'
যে চাহে সে করুক্ প্রচার,—
সে দলিল ছদ্ম-নামে
কোন্ মূর্খে তীব্র কশাঘাতে
যে বোঝে বুঝুক্ তাহা
আসে যায় কিবা মোর তা'তে?

জানিনা যে কোন্ দিনে
সে করিল কোন্ রসিকতা,
জানিনা সে কোন্ ক্ষণে
সে কহিল হাসিয়া কি কথা,—

ঘোষিল যে কার কাছে
"ইহা মানি, উহা মানিনাক"
আজো আমি লেশ তার
জানিনাক', ওগো, জানিনাক'।

আমি জানি সে ভরিল
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভাব-বাঁশরীর
উন্মাদিনী প্রেম-গীতি
চির তন্বী-কাব্য-কিশোরীর।
আমি জানি সে ধরিল
হিল্লোলিত সুর কপর্দ্দের
চঞ্চল স্তবকে তার
মুক্ত ধারা নিত্য আনন্দের।

আমি জানি পরশিয়া
অনুরাগে তারি সে চরণ
বহি গেল বুকে বুকে
রস গঙ্গা বেদনা-হরণ।
আমি জানি তাহারি সে
সঞ্জীবনী ভাষা চন্দ্রমার
ছন্দোময় আকর্ষণে
উথলিল কবিতা-পাথার।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

নারীর সৌন্দর্য্য ও আদর্শ

নারী কেবল তাঁহাদের মনে কবিত্ব ও সদ্ভাব জাগাইবেন, অনেক মনস্বী পুরুষ ইহাই চান। বঙ্কিমচন্দ্র যেন কোথায় বলিয়াছেন যে, "মেয়েদের আপনারা কবিতা লেখা অপেক্ষা পুরুষদিগকে তাহাতে অনুপ্রাণিত করাই তাঁহাদের কাজ।" মেয়েদের সম্বন্ধে এইরূপ একদেশদর্শী অর্দ্ধ-সত্য মানুষের সমস্ত সত্য ও ভাবরাজ্য এমনি অধিকার করিয়া আছে যে সে-বিষয়ে আলোচনা করা সহজ নয়। বিশেষতঃ কোনটী ছাড়িয়া যে কোনটীর কথা বলা যাইবে, তাহা বাছিতে গেলেও হতাশ হইতে হয়।

ভালবাসাই কবিতার প্রধান প্রেরণা বলিয়া নর-নারী উভয়েই উভয়ের অন্তর্নিহিত কবিত্ব-শক্তি জাগাইয়া তুলিতে পারেন। পুরুষেরা শিক্ষার সুযোগ পাওয়ায় তাহাকে ভাষায় বেশী গাঁথিতে পারিয়াছেন, মেয়েদের তাহা না থাকায় তাঁহাদের কবিত্বের ভাব ভালবাসার মধ্য দিয়া জীবনে প্রধানতঃ প্রকাশ পাইয়াছে। এইজন্য নারীর জীবনই অধিকতর সদ্ভাব ও কবিত্বপূর্ণ (artistic) হওয়ায় তাঁহাদেরও কবিত্বের ভাব বেশী জাগাইতে পারিয়াছে। এদিকে পুরুষের ভালবাসার অসম্পূর্ণতা, চাঞ্চল্য এবং জীবনযাত্রা মোটা ও প্রকৃত কবিত্ববর্জ্জিত হওয়ায় নারী সত্যের রাজ্যে তাঁহাদের ভালবাসা ও গুণের দ্বারা আকৃষ্ট থাকিবার সুযোগ অল্প পাইয়াছেন—গুণ থাকিলেও ভালবাসাশূন্য হইলে তাহা মনে যথার্থ সাড়া দিতে পারে না। কাজেই প্রথম ভালবাসার উচ্ছ্বাসের সময় একবার তাহা তাহার প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিলেই সত্যদৃষ্টি বন্ধ করিয়া কল্পনার সাহায্যেই তাহা তিনি জীবনে জাগাইয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাজেও তাঁহার আর কোন গতি না রাখায় এবং ভালবাসা-ব্যতীত আত্ম প্রসারের আর কোন ক্ষেত্র না থাকাতেও তাঁহাকে ইহা করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। ইহাতে নারীর সদ্ভাব ও ভালবাসা লাভের সহিত আপনাদের তাহার যোগ্যতার কোন সম্বন্ধ না থাকায়, তাহা সুলভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর সম্বন্ধে তাঁহাদের দাবী কঠোরতর হইতে থাকে। পুরুষেরা নারীর মধ্যে তাঁহাদের মানস-প্রতিমাকে যতই পাইতে লাগিলেন, ততই কল্পনার রঙে রঙাইয়া এমন আদর্শের সৃষ্টি করিতে থাকিলেন

যে কোন মর্ত্ত্য মানবের পক্ষে তাহা হওয়া সম্ভব নয়, —হইলেও তাহাকে মানুষ-হিসাবে বিশেষ মহৎ ও উচ্চ সৃষ্টি বলা যাইত কিনা সন্দেহ। নারী যতই তাঁহাদের কল্পনা ও মনের মত হওয়ার চেষ্টা পাইয়াছে, ততই তাঁহাদেরও তাহাতে মন ভরে নাই। তাঁহারা কেবলই আদর্শ সৃষ্টি করিতে গিয়াছেন, সত্য-জগতের সহিত মিলাইয়া ভালবাসার সাহায্যে তাহার কতকাংশ আপনার মনের মধ্য হইতে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা মাত্র করেন নাই। তাই তাঁহাদের ভালবাসাও যেমন বিশুদ্ধ ও পূর্ণতর হইতে পারে নাই, তাঁহাদের নারীর আদর্শটীও যতই মনোহর হউক, তেমনি প্রকৃত মানুষের পক্ষে পর্য্যাপ্ত সম্পূর্ণ ও সত্য হয় নাই। তাঁহাদের নারীর বর্ণনাগুলি অধিকাংশই কল্পনার রঙীন জাল মাত্র। তাহাতে নারীকে বাড়ানো হইয়াছে, না খাটো করা হইয়াছে, সন্দেহ। মানুষকে পরীর মত চক্ষে না দেখিয়া ভালবাসাকেই সমস্ত পার্থিব দাবী মিটাইয়াও স্বর্গলোকমুখী করিয়া রাখিতে পারাতেই প্রকৃত ভালবাসার বিশেষত্ব। মেয়েরা এই বিষয়ে পুরুষদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। তাহারা ভালবাসার পাত্রের ছোট বড় যত দোষ থাক্, তাহা দেখিতে ও তাহাতে কষ্ট পাইলেও ভালবাসাকে শুকাইতে, বা কলুষিত হইতে দেয় না। এই ভালবাসার প্রস্রবণ তাহাদের আপনার হৃদয়রাজ্যে,—ভালবাসার পাত্রের উপর তাহা একান্ত নির্ভর করিয়া চলে না। সুতরাং ইহাই প্রকৃত অশরীরী মানস-প্রতিমা। নতুবা বাহিরের একটী রক্ত-মাংসের জীবকে "পরী" কল্পনা করিতে থাকিলে, সহজেই তাহার ডানা না থাকাটাও একটা মস্ত অপরাধে পরিগণিত হইয়া পড়ে। বাস্তবিক সত্যের সহিত যোগ না থাকিলে কিছুই পরিপূর্ণ ও যথার্থ হইতে পারে না। পুরুষের ক্ষেত্রে ভালবাসার স্বাভাবিক বিনয় ও ত্যাগবর্জ্জিত এবং জীবনের সহিত সম্পর্ক-শূন্য, কেবল অপরের ক্ষেত্রে কল্পনার রঙিন আদর্শ সৃষ্টি যেমন সত্য হইতে না পারিয়া তাঁহাদেরও তৃপ্তি দিতে পারে নাই, নারীর আদর্শ-সৃষ্টিও বাহিরের সত্যজগতে প্রতিষ্ঠা না পাইয়া ভালবাসার সাহায্যে চোখ বুজিয়া কেবল অন্তর হইতে গড়িয়া তুলিতে হওয়ায় মিথ্যা ও গৌরব-বিহীন হইয়াছে।

কেবল অন্যকে অনুপ্রাণিত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়,—পর্য্যাপ্তও নয়। একজনকে সদ্ভাবের প্রেরণা দিতে হইলেও আপনার জীবনে তাহা লাভ করা দরকার। নর-নারী উভয়েই নিজ-জীবনে তাহা আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইলে উভয়েরই মধ্যে প্রেম ও সদ্ভাবের সঞ্চার করিতে পারেন। নতুবা চক্ষু, কর্ণ, হস্তপদাদিবিশিষ্ট, সহস্রপ্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ জীব হইয়া একজন কেবল সদ্ভাব ও পবিত্রতার মডেল হইয়া স্থিরভাবে বেদীর উপর দাঁড়াইয়া অন্যের মনকে "অনুপ্রাণিত" করিতে থাকিবেন ও অপরে তাহার sketch করিয়া লইয়া আপনার কাজে মন দিবেন—ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, বোঝা কঠিন। ঐরূপ বেদীপ্রতিষ্ঠ মূর্ত্তি যে দুইদিনেই পুতুলে পরিণত হইয়া "অনুপ্রেরণার" অযোগ্য হইয়া পড়িবে, ইহা ত প্রত্যক্ষ।

তাঁহাদের আর একটি প্রিয় আদর্শ, ফুল,—যাহার সহিত নারীর দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার তুলনা আমাদের মন এতই অধিকার করিয়া আছে—তাহার বিষয়ও দেখিতে গেলে কি বলিতে হয়?—ফুল আমাদের কবিত্বশক্তি উদ্বোধিত করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু পুষ্পজীবনেরও তাহাই মাত্র উদ্দেশ্য বলিতে বোধ করি কাহারও সাহস হইবে না। তাহাকেও ছিঁড়িয়া তুলিয়া আপনার নিজস্ব করিতে গেলে সহজেই শুকাইয়া যায়। বাগানে তাহাকে ফুটাইতে গেলে আমাদের পক্ষ হইতেও অনেক পরিশ্রম যত্ন আবশ্যক হয়; তবুও যে সে নিতান্তই কেবল আমাদের জন্যই ফুটিয়া থাকে, এমন ত বোধ হয় না। তাহা অপেক্ষা মাটি, জল, উত্তাপ, আলো, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য্যের প্রতিই তাহার পক্ষপাতিত্ব যেন বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং নারীকে ফুলের সহিত তুলনা করিতে গেলেও গোল আছে।

ফুলের কথা হইতে নারীর সৌন্দর্য্যের কথা মনে আসিল। নর-নারী উভয়েরই সৌন্দর্য্য আছে। নারীর হয়ত বা সময়ে সময়ে তাহা কিছু বেশী পরিমাণেই থাকিতে দেখা যায়। ইহার বাঞ্ছনীয়তা ও মূল্য কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু এখানেও যাহা একান্তই ভগবানের দান মাত্র, নর-নারী কাহারও আপনার চেষ্টার উপর নির্ভর করে

না;—নারীর ক্ষেত্রে তাহার আদর্শও এমনি কঠিন,—যাহা সত্যজগতে নর-নারী কাহারও সুলভ নহে। ইহা লাভ করা যেমন তাঁহার ক্ষমতার অতীত, তেমনি ইহারই মূল্য সংসারের বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। নারীর কপালে সকল সুখ সৌভাগ্যই কেবল অদৃষ্টমাত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার উপর তাহার আপনার কোনই হাত নাই। এদিকে পুরুষের আপনার সৌন্দর্য্যের যতই অভাব থাকুক,—নারীর পক্ষে পরী নহিলে কাহারই মন তুষ্ট হয় না। সুতরাং ভগবান এ বিষয়ে নারীর প্রতি অনেক পরিমাণে কৃপাদৃষ্টি দিয়াও পুরুষের স্বার্থান্ধতার সহিত পারিয়া উঠেন নাই।

তার পর তাঁহার যৌবনের দাবী।—পুরুষের আপনার যতই অভাব থাক, নারীর পক্ষে তাহার অভাবও যেন অমার্জ্জনীয়। বাস্তবিক নারীকে আপনার সমধর্ম্মী মানুষ বলিয়া না দেখিয়া পুরুষ যে-ভাবেই তাঁহাকে দেখিতে, পাইতে ও গড়িতে গিয়াছে, সেখানেই নারীকেও যেমন অন্যায় যন্ত্রণা দিয়াছে, আপনিও তেমনি বিড়ম্বিত হইয়াছে। নারীকে যথার্থভাবে পাইতে হইলে তাঁহাকে মানুষ হইবার অবাধ সুযোগ ও অধিকার দেওয়া যেমন আবশ্যক,—ভালবাসায় তাঁহার কাছে বিনয়, সৌজন্য, সহিষ্ণুতার সহিত দিতে ও শিখিতে হইবে। কবিতা-নির্ঝরের নূতন স্রোত ইহাতে খুলিয়া যাইবে। তখন কেহই শুধু কাহাকেও "অনুপ্রাণিত" করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় প্রস্তুত না হইয়াও পরস্পরের সম্ভাবে প্রেরণার কারণ হইতে পারিবেন।

অবশ্য কবিতায় নারীর সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর ভালবাসা যে কখনও প্রকাশিত হয় নাই এমন নহে। তাহাতে তাহার ছায়া ত পড়িবেই। নারীর সম্বন্ধে বিশুদ্ধ ও উন্নততর ভাবগুলিও সম্ভবতঃ তাহা হইতেই ক্রমে মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সেই কবিতার মন্দির,—যেখানে নারীর অখণ্ড প্রতিষ্ঠা বলিয়া কথিত হয়,—তাহার মধ্যেও যে কত বিকৃতি ও কত অপদেবতা স্থান পাইয়াছে, তাহাই এখানে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ মন্দির যতই পবিত্র হউক, তাহা স্বাস্থ্যকর নহে। এমন কি বিশ্বপৃথিবীর উদার রাজপথ হইতে তাহা "পবিত্র" কি না, সে বিষয়েও লোকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছে।

অনেকে বলেন, নারী অত সহজ হইয়া পড়িলে সমস্ত কবিতা ও সুক্ষ্মতর ভাবগুলি নষ্ট হইবে। ইহারা কবিতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বেড়া-দেওয়া ঘেরা জায়গায় কবিতার চাষ করিলে তাহাতে সৌখীন ফুল ফুটিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে উদার বিশ্বের তাজা সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। নারী অপার রহস্যজাল বিস্তার করিয়া Amielএর কথায় "তাঁহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তিকে অস্পষ্ট" না করিলেই যে কবিতা বিকাশের বাধা হয়,—তাহা কি শ্রেণীর কবিতা?—কারণ উচ্চতর কবিতায় বুদ্ধির বিশেষ স্পষ্টতা, ঔজ্জ্বল্য ও ধারের আবশ্যক।—Amiel আবার ঐ বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তিকে অস্পষ্ট করার জন্যই নারীকে গালি দিয়াছেন!—নারীর নিস্তার কিছুতেই নাই।

তার পর বলিতে হয়, মানুষের মনের খোরাক যোগাইতে গৃহসজ্জা ও ফুলবাগানেরও আবশ্যকতা আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি নিখিল জগতের মুক্তদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে? দেবমন্দির সম্বন্ধেও তাই,—বিশ্বের রাজপথ সম্মুখে প্রসারিত থাকিলেই তাহার "পবিত্রতা" থাকিতে পারে, নতুবা তাহার বদ্ধ বায়ু বিষাক্ত হইয়া উঠিবে যে।

মেয়েদের সম্বন্ধে আদর্শের বিষয় দেখিতে গেলেও দেখা যায়, পৃথিবীর পাপ-তাপ যাঁহার অজ্ঞাত, এমন নির্দ্দোষ ফুল ও পুতুলের মত নারী,—যাঁহারা স্বামী যতই অপাত্র হউক, তথাপি তাহাকে দেবতা জ্ঞান করেন,—তাঁহার কথা ভিন্ন অন্য চিন্তা জানেন না,—গৃহকর্ম্ম ভিন্ন আর কিছু করেন না,—ইহাই পুরুষের নারী সম্বন্ধে একমাত্র সাধারণ আদর্শ; এবং তিনি কেবল এইরূপ পত্নীই কামনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার কি দারুণ আত্মাভিমান ও স্বার্থপরতার পরিচয়!

যাহা হউক, এ আদর্শটীর বিষয় দেখিতে গেলেও বলিতে হয়, পৃথিবী যদি ফুলের বাগান হইত, তাহা হইলে ঐরূপ

ফুলের মত প্রাণী লইয়া চলিতে পারিত।—কিন্তু তাহা যে নয়, সে কথা বোধ করি বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ঐ সকল "ফুলের মত" প্রাণীদের প্রতি তাঁহারা যে সত্যই "ফুলের মত" ব্যবহার করিয়া থাকেন,—তাহাও কি তাঁহাদের ফুলের মত প্রাণের উপযুক্ত? আর প্রকৃতিকে ফুলের মত করা মানুষের কতকগুলা সাধ্যায়ত্ত হইলেও দৈহিক সৌন্দর্য্যে তাহার সহিত তুলিত হইবার সৌভাগ্য কাহারও আপনার হাতে নাই। কিন্তু তাহার অভাবে ঐ সকল "ফুলের মত" প্রাণীর দশা কি হইবে? তখনও তাঁহারা তাহাকে ঠিক ঐ চক্ষে দেখিয়া থাকেন কি? বাস্তবিক ফুলের সহিত লীলা-কল্পনা আমাদের সাময়িক তৃপ্তি যতটাই দিক না,—ফুলের দিক হইতেও (বিশেষতঃ তাহা যদি সকল প্রকার অনুভূতিপূর্ণ মানুষ হয়) যে কল্পনার আর একদিক থাকিয়া যায়, ইহাই যে মুস্কিল। তার পর পৃথিবী যদি উৎকৃষ্টতর স্থানও হইত, তাহা হইলেও ঐসকল পুষ্পকল্প প্রাণীরা কেবল অলঙ্কার মাত্রই হইতে পারিতেন। কিন্তু অলঙ্কার যতই বাঞ্ছনীয় হউক, মানুষের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না; এবং প্রকৃত মানুষের মত সকল ইন্দ্রিয়ের সজাগ, তীক্ষ্ণ অনুভূতির সহিত সত্যদৃষ্টি, সত্যজ্ঞান দ্বারা জগতের সকল পদার্থে বিধাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া চলা তাহার পক্ষে কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

এ বিষয়ে আরো ভাল করিয়া দেখিতে গেলেও ধরা পড়ে যে ঐ "পবিত্র ফুল"গুলিকে লইয়া তাঁহারা ঘরকন্নাও ভালরূপে করিতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের যতই সদিচ্ছা থাক, কোন কাজই সুনির্ব্বাহ করা তাঁহাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। Dickens-এর ডোরার চিত্র এখানে মনে আসিতেছে! সুতরাং তাঁহাদের প্রথম আদর্শের সহিত শেষেরটীর মিল হয় না।

সেইজন্য ঐ আদর্শ তাঁহাদের বুদ্ধি-গৌরবশূন্য, স্বার্থপর একদেশদর্শী কল্পনাকে মুগ্ধ করিলেও অবশেষে তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই। তখন ক্রমেই উহা প্রণয়িনার ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিয়া স্ত্রীর জন্য দৈনিক জীবন-সংগ্রাম চালাইবার উপযোগী কঠিনতর উপাদানে গড়া নারীর প্রয়োজন হইয়াছে। পরে আবার ঐ কুল ও গৃহদাসীতেও মনের জগতে সাহচর্য্যের কোন সাহায্যই না হওয়ায় আর-একশ্রেণীর গীতবাদ্যাদি ললিতকলা-নিপুণ বিলাসবস্তুর সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এইরূপে নারীকে আপন করতলগত রাখিবার প্রবল বাসনায় তাঁহাকে তাঁহার স্বভাবতঃ যে প্রয়োজন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া নারীর প্রকৃত স্বরূপে তাঁহাকে সমগ্র হইয়া উঠিতে না দিয়া, নারীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া যাহাই করিতে গিয়াছেন,—তাহাতে নারীর নারীত্ব ও মনুষ্যত্ব যেমন অপমানিত ও লাঞ্ছনাহত হইয়াছে, পুরুষেরও তেমনি অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহলই জুটিয়াছে। নারী ত তাঁহার করতলগত গোলাম মাত্র হইবার বস্তু নহে;—তাঁহাকে যতই বাঁধিতে যাইবেন, ততই (তাহার যত যন্ত্রণাই হউক) আপনাকেও বঞ্চিত হইতে হইবে। দুজনেই যে দুজনের জন্য,—এবং তাহা ভিন্ন প্রত্যেকেই আবার আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ, ইহা এখন বুঝিবার সময় আসিয়াছে। নারীর সম্বন্ধে আদর্শ এবং দাবীও এই বুঝিয়া পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তবেই পুরুষ প্রকৃত নারীর দর্শন লাভ করিতে পারিবেন, এবং আপনিও উন্নতির অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার উপযোগী হইতে পারিবেন। নতুবা নদীকে বেড়া দিয়া পুষ্করিণীর সৃষ্টি করিতে গেলে তাহা দূষিত হইয়া পড়িবেই।

পরিশেষে বলিতে হয়, উল্লিখিত ডোরা বা ঐ আদর্শের অন্য নানা প্রকৃতির যে-সব নারীর কথায় সমাজ, সাহিত্য শিল্প-কলা ভরিয়া আছে, তাঁহারা আমাদের ভালবাসা ও সহানুভূতির যোগ্য, সন্দেহ নাই। মানুষের বিচিত্র প্রকৃতির মধ্যে তাঁহারা যে এককালে লোপ পাইবেন, এমনও মনে হয় না। কিন্তু উহাকেই নারীর একমাত্র বা শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হাস্যকর এবং নিষ্ঠুরতা।

বঙ্গনারী।

পরলোকের বন্ধু

অজিতকুমার, সতীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ

প্রত্যাবর্ত্তন

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাহু-মুক্তি

সূর্য্য এই খানিক আগে অস্ত গিয়াছে। এখনও তার রাঙা আলো খানিকটা নীল আকাশের গায়ে দূরস্থিত অগ্নিদাহের ম্লান আলোক-শিখার মত ছড়াইয়া ছিল। নীম ও নারিকেল গাছের শাখার ফাঁকে ফাঁকে পাতার আড়াল এড়াইয়া তাহার রঙের খেলা দেখা যাইতেছিল। ছাদে দাঁড়াইয়া হিমু উদাস দৃষ্টিতে কখনও বা সেই পাতার অনুজ্জ্বল মনমোহন আলোর দিকে কখনও তাহার বিপরীত দিকের ধূসর আকাশে চাহিয়া দুইখানা উড্ডীয়মান ঘুড়ির লড়াই দেখিতেছিল। তাহার দেশের কথা, মার কথা, খেলার সাথীদের কথা, বড় বড় তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঢাকা সরল গতি অপরিসর পল্লীপথ, রাখাল বালকদের মাঠে মাঠে গোচারণ, সন্ধ্যায় তাহাদের ঘরে ফেরা হইতে থলি-কাঁধে ডাক্-হরকরার ঝম্‌ঝম্ শব্দে ছুটিয়া চলার শব্দটি অবধি তার মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। সেখানকার অসংস্কৃত অপরিসর পথ, অধিকাংশ মাটির বাড়ী, জঙ্গলাকীর্ণ স্থান সবই আজ তাহার চোখে নূতন রঙে ফুটিতে-ছিল। সকালে সন্ধ্যায় এখানেও গাছে গাছে পাখী ডাকে। বরং আলোকনাথের পাখীশালায় কত রঙের, কত রকমই না পাখীর ডাক শুনা যায়,—তবু সেখানকার তেঁতুল গাছের ডালে বসিয়া ভোরের পাখী যেমন মধুর সুরে ডাকিয়া প্রতিদিন তাহার ঘুম ভাঙ্গাইত, সালিক, টুনটুনি, চড়ুই যেমন গান করিয়া তাহার মন ভুলাইত, এখানকার এই এত পাখীর কণ্ঠে তেমন সুর কোথায়? হিমুর মনে হইতেছিল, সে যদি দৈববলে পাখী হইয়া এখনি উড়িয়া গিয়া তাহাদের উঠানের সেই আমড়া গাছটির উপর বসিতে পারিত! সেখানে বসিয়া সে তাহার মাকে দেখিতে পাইত! মা আজ সেখানে একা! কেহ মার সঙ্গী নাই। নিজের জন্য নিয়মিত রান্না-খাওয়াও করেন কি না, কে জানে! আচ্ছা, মা এখন কি করিতেছেন? চুপ করিয়া রোয়াকে বসিয়া তাহারই মত ঐ আকাশটার দিকেই চাহিয়া আছেন কি? মা এখন নিশ্চয় তাহারই কথা ভাবিতেছেন। মা ত জানেন না, কোথায় কোন শত্রুপুরীতে তিনি তাঁহার আদরের হিমুকে পাঠাইয়া দিয়াছেন! এখান হইতে সে কি আর কখনো বাহির হইতে পারিবে? বলাইয়ের মার মুখে যে কথা সে এই কতক্ষণ পূর্ব্বে শুনিয়াছে, তার পর যে সে আর কোন ভরসাই পাইতেছে না। তাহার দশা যেন এখন রাম-রাবণের মধ্যবর্ত্তী মারীচের মতই হইয়া পড়িয়াছে! কাল যিনি ভাই বলিয়া বন্ধু বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আজ তিনিও আবার শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন!

ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে বলাইয়ের মা দিদিমার অনুজ্ঞা জানাইয়া যখন তাহাকে নীচের ঘরে চুল বাঁধিবার জন্য ডাকিতে আসিল, তখন সে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষেই বসিয়াছিল। দাসী আহ্লাদ করিয়া বলিয়াছিল, "চল দিদিমণি, চুল বাঁধবে চল। কর্ত্তা-মা তোমার পরবার জন্যে কেমন খাসা ফুল-চিরুণী গড়িয়ে আনিয়েচেন, দেখবে চল। এক একটি নক্ষত্তরের ভেতর এক একটি রাঙা চুনি। রক্তর মতন টুকটুকে রাঙ্গা! খাসা পালিশ করেচে বাবু। তাও বলি, বললে বলবে হয়ত বাড়ানো কথা—তা বাবু, বলাইয়ের মা কিন্তু কক্ষনো বাজে কথা জানে না, এ কলঙ্ক তাকে কেউ কখন দিতে পারবে না—বৌ-ঠাকরুণের আমাদের কত রকমের কত ফুল, কাঁটা, প্রজাপতি, তবেগে, বাগান-টাগান মাথার সাজই বা কত রকম! তাহ'লে কি হবে, বল? এমন মুণ্ডু-মালিনীর কেশ ত আর নেই! এ চুলে কেবল একটি এলো খোঁপা জড়িয়ে রাঙা টুকটুকে একটি গোলাপ ফুল গুঁজে দিলেই কত বাহার দেখায়! সোনা দিয়ে একে সাজাতেও হয় না।" বলিয়া দাসী মুগ্ধ চোখে হিমুর রেশম-চিক্কণ ঘন-কুঞ্চিত কেশ-পাশের

দিকে চাহিয়া রসিকতার হাসি হাসিল। বুদ্ধিমতী বলাইয়ের মা একসঙ্গে দুই দিক রাখিতেছিল। দুই-দিন পরে ইনিই যখন মনিব হইবেন, তখন এখন হইতে ইঁহাকে খুসী রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে সেটা কাজে লাগিতে পারে। মেয়েটী একবগ্‌গা হইলেও সরল খুব। সংসারের বুদ্ধি এতটুকু নাই। তাছাড়া সেও ত আর এমন কিছু মিছা কথা বলিতেছে না!

হিমুর চুলগুলি এতক্ষণ খোলাই ছিল। দাসীর কথায় সে ব্যস্তভাবে সেগুলি খুব উঁচু করিয়া মাথার মাঝখানে ক্ষিপ্রহস্তে তাল পাকাইয়া জড়াইয়া লইল, লইয়া উদাসীনভাবে কহিল, "দিদিমাকে বলগে, আমার চুল ভিজে, বাঁধব না।"

দাসী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "ওমা, সে কি গো? ভিজে, তবে জড়ালে কেন আবার? এস মা, আমি কুরিয়ে দি। হাওয়া পেলে এখনি শুকিয়ে যাবে'খন। চুল বড় সুখী প্রাণী, দিদিমণি,—এদের যত্ন না করলে আবার থাকেও না।" বলিয়া কাছে আসিয়া হিমুর মাথায় হাত দিতে গেলে হিমু সবেগে মাথা সরাইয়া লইয়া অপ্রসন্ন কণ্ঠে কহিল, "আমার মাথায় হাত দিয়ো না।"

বলাইয়ের মা কহিল, "তবে পশ্চিমের বারান্দায় চল। সেখানে এখনও পড়ন্ত রোদ একটু আছে। একবার মেলে দিলেই শুকিয়ে যাবে। চল, দিকি।"

হিমু কহিল, "পড়ন্ত রোদে আমার মাথা ধর্‌বে। তুমি বলগে যাও, চুল ভিজে, বাঁধবে না। তোমার এত সাত-সতেরোয় দরকার কি?"

তাহার অপ্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দাসী একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিল, "বুঝেছি দিদিমণি, বর তোমার মনে ধরে নি। তাই সবেতেই তোমার গোঁসা! তা কি কর্‌বে ভাই, বল,—সবই কি আর পছন্দ-মতন হয়?"

হিমু মুখ ফিরাইয়া একটা রুদ্ধ জানালার বদ্ধ খড়খড়ির দিকে চাহিয়া ছিল—তেমনই রহিল, একটিও কথা কহিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া বলাইয়ের মা সাহস পাইয়া সহানুভূতির সুরে কহিল, "আমরাও সব তাই বলাবলি করি, যে বিয়েটি কর্ত্তা বাবুর সঙ্গে না হয়ে দাদাবাবুর সঙ্গে হলেই খাসা মানাত! আর বৌ-ঠাকরুণও শয্যা ছেড়ে বরণ-ডালা মাথায় করে বৌ-বেটা ঘরে তুল্‌ত। তা ত আর হবার নয়। হ্যাঁ গা দিদিমণি, দাদাবাবুকে তোমরে মনে ধরেচে, বুঝি? কাল যে দেখলুম, দাদাবাবু একখানা বই হাতে করে তোমার ঘরে ঢুকল। দাদাবাবু ত তোমায় দেখে পাগল! কিন্তু ও পিত্যেশ ছেড়ে দাও, কর্ত্তাবাবুর খাস খানসামা রেধো সকাল বেলায় রান্নাঘরে টিকে ধরাতে দিয়ে বামুন ঠাকরুণের কাছে চুপিচুপি বলছিল কি, জান? এই কথা নিয়ে দাদাবাবুর সঙ্গে কর্ত্তাবাবুর নাকি বিকেল বেলায় একটা কুলুক্ষেত্তর হয়ে গেছে! দাদাবাবু তোমায় বে কর্ত্তে চেয়েছিল বলে' কর্ত্তাবাবু তাঁকে বাড়ী থেকে দূর হয়ে যেতে বলেচে। দাদাবাবু চিরকাল অভিমানী। সে কি এমন মর্ম্মান্তিক কথা কখনো সইতে পারে, না, সয়েচে? সেই রাতেই বাড়ী ছেড়ে তিনি চলে গেছে। দাদাবাবুর চাকর বিনোদ সকাল বেলা ঘরে গিয়ে দেখে, না, সেখানে যার যা জিনিষ-পত্তর সব অমনি পড়ে আছে। বাক্স, বিছানা, মণিব্যাগ ঘড়িটি পর্য্যন্ত পড়ে, কেবল দাদাবাবুই নেই। শূন্যি শয্যে পর্শ পর্য্যন্ত করে নি। ভয়ে সব চুপ চুপ করে রয়েচে। কর্ত্তাবাবু নাকি সব শুনেছে—কর্ত্তাবাবুকে চিঠি লিখে রেখে গেছে কি না—তাই গুম হয়ে আছে। যেন কেউ খোঁজ না করে। করলেও দেখা পাবে না, এই কথা বলে গেছে। কর্ত্তাবাবু চিঠি পড়ে কারো সাথে কথাটি কয় নি। আগেকার দিন থাকলে এই নিয়ে বাড়ীতে কি কাণ্ডই না বাধত! বৌ-ঠাকরুণ মাথা খুঁড়ত, মুচ্ছো যেত। মা-ঠাকরুণ চীৎকার করত আজ সব চুপ-চাপ। হায়রে, আঁতের টান যে আলাদা জিনিষ! আমরা যে দাসী-চাকর, শুনে আমরাই লুকিয়ে কেঁদে মরি। ছেলে বলে' ছেলে কি! ছেলের মতন ছেলে! তাই বলি দিদিমণি, যা পাচ্চ, তাই খুসী হয়ে নাও, ভাই! রাগ-দুঃখ করে কেবল কষ্ট পাওয়া আর দেওয়া বইত নয়!"

হিমু মুখ ফিরাইয়া সহসা তর্জ্জনের সুরে কহিল, "তুমি যাবে কি না বল্‌তে পার? না যাও, বল, আমিই যাচ্ছি!" বলিয়া সে সবেগে ঘরের বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় শুনিল, দাসী বলিতেছে, "তোমাদের ভালর তরেই বলি, দিদিমণি। নৈলে বলাইয়ের মা কারো পিত্যেশ রেখে কথা কয় না। ছেলে মানুষ বোঝনা ত কিছুই। এই বিয়েটা চুকে গেলে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফেরে, তা আমাদের তাতেই সুখ!"

ঘরের বাহিরে আসিয়া ছাদের সিঁড়ি চোখে পড়ায় হিমু নির্জ্জনতার আশায় বরাবর সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ছাদে উঠিল। সেখানে দুই চোখে জল ভরিয়া সে আকাশের পানে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গভীর অভিমানে তাহার বুকখানা মাঝে মাঝে কেবলই ফুলিয়া উঠিতেছিল। মা তাহাকে কোথায় পাঠাইয়াছেন? যেখানে মানুষের মন লইয়া মানুষ কেবল শীকার খেলা খেলে। ওগো, তোমরা হিমুকে ছাড়িয়া দাও। সে বনের পাখী, বনের কোলে উড়িয়া যাক্। অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে মার বুকে মুখ রাখিয়া সে পরম সুখে দিন কাটাইবে। চাহে না সে তোমার এই রাজ-প্রাসাদের আলো, এ আনন্দও চাহে না ত—মণি রত্ন মুক্তার মালা, তাও সে চায় না।

হিমুর জল-ভরা চোখের উপর অরুণের মুখ ভাসিয়া উঠিল। এ বিপদে সেই তাহার একমাত্র আশা ও ভরসা। কিন্তু সে ত এত তত্ত্ব কিছুই জানেনা। কেহ জানে না, হিমু আজ শত্রু-পুরীতে বন্দিনী হইয়া আছে। প্রফুল্লদা আশা দিয়া ছিলেন, আশ্বাস দিয়াছেন। সে যে একান্ত মনে তাঁহারই পথ চাহিয়াছিল! ভাগ্য-দোষে তিনিও বিরূপ হইলেন! ছি, এমন মতিভ্রম তাঁহার কেন ঘটিল! হিমু যে তাঁহাকে বড় ভাইয়ের মতই মনে করিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। সে মুখে, সে চোখের দৃষ্টিতে হিমু যে অরুণের দৃষ্টিই দেখিয়াছিল। তবে তিনিই বা এমন পাগলের কাণ্ড করিলেন কেন? বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন? হিমু গল্পে পড়িয়াছে, এমনই করিয়া কত বড় লোকের ছেলে, কত রাজ-পুত্র গৃহত্যাগ করিয়া গিয়া কত বিপদে পড়িয়াছিল। কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া দস্যু-হস্তে বন্দী হইয়া পাতাল-পুরীতে বন্ধ থাকিয়াছে। কে জানে, প্রফুল্লদার অদৃষ্টে আবার তেমন দুর্ঘটনা লেখা আছে কি না। হিমুর চিন্তার ধারা একভাবে বহিতেছিল না। বালিকার চিন্তা কখনো এক বিষয়ে বদ্ধ থাকিতেও পারে না! সে মার কথা, অরুণের কথা সত্যদয়ালের ছয়মাসের খোকাটির কথাই ভাবিতেছিল, এবং ভাবনার সহিত কখন তাহার চোখের দৃষ্টি আকাশের রঙের ও ঘুড়ির রেশে বদ্ধ হইয়া গিয়া সব চিন্তাই অস্পষ্ট হইয়া মনের দুঃখও হাল্‌কা হইয়া আসিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারে নাই।

সহসা সিঁড়ির মাথায় শিকল নড়া ও পায়ের শব্দে হিমু সচকিতে চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে ভীত হইল। যে আসিল, সে আলোকনাথ। প্রায় আট দশদিন হিমু এই দৃষ্টি এড়াইয়া নিজেকে লুকাইয়া কাটাইয়াছে। আজ এমন অসময়ে এখানে যে? নিশ্চয় ইনি আবার জ্বালাতন করিতে আসিয়াছেন! হিমু দমিল না। আলোকনাথকে সে এখন অশ্রদ্ধাই করিত, তাই তাহার সঙ্গ এড়াইয়া চলিত। পুরুষের নিকট যে এমন নির্জ্জন অবসর তরুণী রূপসীর পক্ষে ভয়ের কারণও হইতে পাবে, সে অভিজ্ঞতা তাহার জন্মায় নাই। দেখিয়াও যেন দেখিতে পায় নাই, এমনই অনাগ্রহ উদাস দৃষ্টিতে হিমু আকাশের পটেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিল। আলোকনাথের মুখ আজ বিষণ্ণ। হিমুকে দেখিয়া তাহার ম্লান ওষ্ঠে একটু স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটিল। কাছে আসিয়া সে কহিল, "অনেক দিনের পর তোমার দেখা পেলুম। আর তো বাগানে যাও না! তুমি কি আমায় এখন লজ্জা কর, হিমু? এমন ভাবে লুকিয়ে থাক কেন?"

হিমু তেমনি ভাবে রহিল, জবাব দিল না। আলোকনাথ কহিল, "ভাল লাগেনা তোমার—আমার সঙ্গ? কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবেসে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছি, হিমু, আমার যে আর উপায় নেই।"

হিমু অবাক হইয়া আলোকনাথের পানে চাহিয়া কহিল, "সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছেন? মকর্দ্দমায় হেরে গেছেন, বুঝি? ওঃ না, না, আমারই ভুল হয়েচে। আপনার ভাইপো চলে গেছেন, তাই বলচেন, বুঝি?" আলোকনাথের

কণ্ঠে আন্তরিকতার এমন একটা ব্যথিত সুর বাজিয়াছিল, যাহাতে স্বভাব-কোমলা হিমু মনে অত্যন্ত ব্যথা পাইল। অনেকগুলি নাটক-নভেলের কাহিনী তাহার জানা থাকিলেও, স্বাভাবিক অজ্ঞ স্বভাবের বশে সে বুঝিল না যে, ইহা প্রণয়ীর প্রণয়-নিবেদন! তাহার মনে হইল, তাহাকে উপলক্ষ করিয়া খুড়া-ভাইপোয় এই যে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে, এজন্য ধর্ম্মতঃ সেও ত কতক দায়ী! অনাবিল ভ্রাতৃস্নেহে মৃত্যুরূপিনা হইয়া প্রজাপতির যে মানস-কন্যা সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়াছিল, হিমু কি তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারে? না, কখনই না। সে দুর্ভাগিনী ভাগ্য-নিয়োজিতা। তবু হিমু একদিন তাহার কঠিন বিচারই করিয়াছিল।

হিমুর অত্যধিক সারল্যে ও অনভিজ্ঞতায় লজ্জিত হইয়া আলোকনাথ কহিল, "হ্যা, তাই। সে চিরকালই আমায় এমনি করে দুঃখ দিয়ে আসচে। সে যা হোক, সে এখন বড় হয়েচে, লেখা-পড়া শিখেচে, তার আশা আমি ছেড়েই দিয়েচি। তুমি বুদ্ধিমতা, সবই ত বুঝ্‌তে পারচ—সেই জন্যেই, এই তার অবাধ্যতার শিক্ষা দিতেই আমার আরো দরকার তাকে জব্দ করে দেওয়া। দেখ্‌চ ত, আমার স্ত্রী ত মরারই সামিল। সংসারে সব থেকেও ভগবান্ আমায় সব দিয়েও যেমন দুঃখী করেচেন, রাস্তার একটা মুটে-মজুরও তার চেয়ে সুখী! বুঝচ ত সবই! তুমি শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, তোমায় ত বেশী বল্‌তে হয় না।"

হিমু আজ নিজেকে বুদ্ধিমতী বলিয়া বারবার উল্লিখিতা হইতে শুনিয়া একটুখানি খুসি হইতে গিয়াও পারিল না। বুদ্ধির প্রশংসা তাহার একমাত্র অরুণ ছাড়া আর কেহ কোন দিন করিয়াছে বলিয়া মনেও পড়ে না। অরুণও যেটুকু প্রশংসা করে, সেও যেন তাহার নিকট কাজ আদায় করিয়া লইবার ফন্দীর মত। কেবল শীঘ্র মুখস্থ করার শক্তি-মত্তা বা পাঠে অত্যন্ত মনোযোগিনী এমনি সব কথায়। তাহার কতটুকু সত্য আর কতটুকু দুষ্টামি, সে বিষয়ে হিমুর মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবু অরুণের মুখে প্রশংসার বাণী এমনি মধুর যে বিদ্রোহ করিতেও ইচ্ছা হয় না। অবিশ্বাসী পূজকের পুজোপহারের মত সে তাহা অবলীলাক্রমেই গ্রহণ করিয়া থাকে।

আলোকনাথ যে কিসে তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাইল, সে চিন্তা তাহার মনে না আসিলেও নিজের বিবেচনার সংবাদ অন্যের মুখে শুনিতে বেশ লাগিয়াছিল, তবু সেই সঙ্গে জড়িত বাকী কথাগুলির স্পষ্ট অর্থ কিছু না বুঝিলেও সে কেমন মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল। আকাশের রঙান বর্ণ ক্রমে মলিন হইয়া একখানা পাংশু বর্ণের চাদরের মত দেখাইতেছিল। বাগানের বড় বড় গাছের মাথায় কাটারির মত সরু চাঁদ ম্লান বর্ণে উদিত হইতেছিল, অন্ধকার অল্পে অল্পে ছায়া বিস্তার করিতেই দূরে ঠাকুর বাড়ীতে সন্ধ্যারতির আগমন-সূচক কাঁশর-ঘণ্টার শব্দ উত্থিত হইল। হিমু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আপনি বড় লোক। দয়া করে আমায় মার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি আর একদিনও এখানে থাকৃতে পারচি না।"

তাহার চোখের জল ও কণ্ঠের কাতরতা মুহূর্ত্তে আলোক নাথকে দ্রবীভূত করিয়া তুলিল। হিমুকে সে যথার্থই ভাল বাসিয়াছিল। তাহার অনেকখানি রূপের মোহ হইলেও, কয়দিন হিমুর সঙ্গ লাভে, তাহার বাল-সুলভ সরল আনন্দ-ময় স্বভাবের পরিচয়ে একটা স্নেহের ভাবও জন্মিয়াছিল। সে কোমল কণ্ঠে কহিল, "কেন পাচ্চনা হিমু? সুধু মার জন্যে? তা যদি হয়, বল, মাকে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আস্‌ব। পায়ে ধরে হোক, যেমন করে হোক, তাঁকে আমি এখানে নিয়ে আসব। আর কেনই বা তিনি সেখানে একা থাকৃবেন? তোমার বাড়ী, তাঁর মেয়ের বাড়ী, এ কি তাঁরই বাড়ী নয়?"

"আমার বাড়ী? না,—না গো।" হিমু ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল স্বরে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল। "আমায় এখনি মার কাছে পাঠিয়ে দিন, নৈলে এই ছাদ থেকে আমি লাফিয়ে পড়্‌ব। মা এলেও আমি বাঁচব না, কিছুতেই না।" সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাঁফাইতে লাগিল। কাঁদিবার চেষ্টা করিলেও দারুণ ভয়ে কান্না বাহির হইল না।

আলোকনাথ অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে

চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া অত্যন্ত করুণ হতাশপূর্ণ স্বরে কহিল, "আমি বুঝতে পাচ্চি। তুমি আমায় কখনও কোন কালেও ভাল বাসতে পারবে না। তাই আমার দেওয়া উপহার ময়লার গাদায় ফেলে দাও আমার দেওয়া কাপড়-গহনা ব্যবহার কর না; শুনছিলুম, অসুখের ছুতো করে খাচ্চ না সর্বদিন! তোমার জীবন ব্যর্থ করে দিয়ে শুধু নিজের সুখ,—থাক্, তার ত সবই ফুরিয়ে গেছে, এ লোভও না হয় আমি ত্যাগ করলুম! জোর করে' বিয়ে করলে ত সত্যিকার তোমায় আমি পাবনা। ভয় নেই, স্বচ্ছন্দে তুমি তোমার মার কাছে ফিরে যেয়ো। আমার বাড়ী এসে যে দুঃখ পেয়ে গেলে, পাবো ত, কখনো তা ভুলে যেয়ো।"

হিমু মুখের হাত সরাইয়া অশ্রুরুদ্ধ গাঢ়স্বরে কহিল, "আপনার দয়া আমি ভুলে যাব না। সম্বন্ধেও আপনি আমার দাদা হন্। আপনাকে বরাবরই আমি ভাল বাসব।"

আলোকনাথ এইমাত্র না বলিয়াছিল, সে বুঝিয়াছে হিমু তাহাকে কখনো ভালবাসিতে পারিবে না? মানুষ যতক্ষণ চায়, ততক্ষণই প্রাপ্যের দুর্ল্লভতা! যেই সে ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারণ করিল, অমনি দুর্ল্লভ সুলভ হইয়া দেখা দিল। তাই প্রকৃত শান্তি বুঝি বৈরাগ্যেই মিলে!

অযাচিতভাবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হিমুর ভালবাসার প্রতিশ্রুতি-লাভেও আলোকনাথকে কিন্তু একটুও খুসী হইতে দেখা গেল না। সে আর একটি কথাও না বলিয়া যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে সন্ধ্যার ছায়ান্ধকার-ঢাকা সিঁড়ির পথে নীচে নামিয়া গেল। পরাজয়! আজ বিশ্ব জুড়িয়া শুধু তাহার পরাজয়ের বার্ত্তাই বহিতেছিল। এক্ষেত্রে জয়ী হইয়াও, তাই সে জগতের কাছে পরাজিতই রহিয়া গেল। জগতে সে আজ একা! তাহার কেহ নাই! সেও কাহারও নয়।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঝড়ের পর

একগাছা মুড়া ঝাঁটা দিয়া বাড়ীর বাগানের অনেক দিনের সঞ্চিত ধুলি জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া হিমু একত্র জমা করিতেছিল; মধ্যে মধ্যে অদূরবর্ত্তিনী মায়ের সহিত কথাও কহিতেছিল। মালতী ছোট একটি চেঁচাড়ার চুপ্‌ড়ি হাতে নোটে শাকের ক্ষেতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শাক তুলিতেছিলেন, এবং "অনন্ত বাখিল নাম অন্ত না পাইয়া, কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া," ইত্যাদি নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময় স্নানান্তে মুক্তা ঠাকুরাণীকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া হিমু কথা বন্ধ রাখিয়া দ্বিগুণ মনোযোগে দুই হাতে ঝাঁটা গাছটা সাপ্‌টিয়া ধরিয়া কাজ সুরু করিয়া দিল। দেখিয়া মা আবৃত্তি বন্ধ করিয়া বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ধুলো উড়িয়ে চারদিক অন্ধকার করে দিলি যে,—দেখ্‌ত চুলগুলোর কি দশা হলো।"

মুক্তা ঠাকুরাণী কাছে আসিয়া নিজ দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ করতল উল্টারূপে আধমোড়া ভাবে রাখিয়া, কিছুক্ষণ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইয়া হিমুর দিকে চাহিয়া, তাহার ধূলি-ধূসরিত মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে শ্লেষের স্বরে কহিলেন, "যাকে যা মানায়! হাঁরে-মুক্তোয় রাজরাণী সেজে সোনার পাটে বস্‌বার যুগ্যি মেয়ে ত তোমার নয়, রাণু! ওর তা রুচ্‌বে কেন?"

হিমু ঝাঁটা সমেত ডান হাতখানা মাথার উপর ঘুরাইয়া ধরিয়া হাসিয়া কহিল, "বল ত দিদিমা। সত্যি, এ মানাচ্চে না? খোসামুদে কথা বল্‌লে শুনব না কিন্তু।"

দিদিমা মুখ ভার করিয়া বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "খোসামুদে কথা মুক্ত বামনীর চোদ্দপুরুষে কখনো শেখেনি। মানিয়েচে? হ্যাঁরে রাণু, কর্ত্তা যে আমাদের পাঠিয়ে দিলে নিজে হতে, তার মানেটা কি বল্ ত? তারপর একটা খোঁজ না, খবর না, সেই হতে ত দেখি, সবই চুপচাপ্। ঝিয়েরা সব চুপি চুপি বলাবলি কচ্ছিল,—ভাইপো নাকি হিমিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তাতে কর্ত্তা রাগ করে তাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলে, এ সব কথা ত বলেইচি আগে। তা আমিও বলি, ভাইপোটিই বা কেমন, বাছা? খুড়ো বিয়ে করতে চাইচে,—বুড়ো না, হাব্‌ড়া না, ধনের অধিবধি নেই—বেটা হয়নি,—আহা! বেটার সাধ কারই বা না হয়, বল? তা চাচ্ছে বে করতে,

করুক না। দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে! তোরই কি ঐ মেয়ে নৈলে আর বে জুট্‌ত না? কথায় বলে, বাপ্ খুড়ো! এ ত সত্যি বাপের কাজ কচ্চে! খুড়ো মানুষ করলে,--ওমা, তিনটে পাশ দিয়ে চারটে পাশের পড়া ছেলে, তোর এই কাণ্ড! তাহলে ছোট লোকের ঘরে কি না করবে, বল্ দেখি? বৌ ছুঁড়ির অত রাগ-গোঁসা নেই,—বল্লে, বাবুর সাধ হয়েছে, ছেলে হবে, করুন না বিয়ে, মাসিমা! আমি ভাবি কেবল ফুলুর জন্যে—মানুষ করেচি!”

মালতী মুখ তুলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “কি জানি মামী! রোজই ত মনে করি কোন খবর পাব, অন্ততঃ প্রফুল্লও একদিন আসবেন। তা ত এলেন না, অরুণের এত বন্ধু, শুনি। ওঁর দয়ার কথা অনেকদিন অনেক শুনেচি। নিজে না খেয়েও গরীবকে খেতে দেন। কষ্ট করে থেকে, সেই পয়সায় কত গরীবের ছেলের পড়ার খরচ দেন, অরুণ ত এই সব বল্‌তে অজ্ঞান হত! অরুণের বই-টই সবই ত উনি দেন, নাহলে ওর অত পড়া চুকে যেত!

প্রফুল্লর প্রতি মুক্তাঠাকুরাণী মনে মনে অপ্রসন্নই ছিলেন। মাঝে পড়িয়া সেই ত তাঁহার পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়া দিল। গরীবের মেয়ে বড় ঘরে পড়িত,—সোনা-দানায় অঙ্গ মুড়িয়া থাকিত। দুই হাতে দান-ধ্যান ব্রত তীর্থ কত কি সব করিত। পাঁচজনকে অন্ন দিয়া, পাঁচের পূজ্যি হইয়া থাকতেই ত সংসারের সুখ! নহিলে সুখ কিসের! ঠাকুরাণী বক্রমুখে ঠোঁট টিপিয়া কহিলেন, “যা বল আর যা কও, আমি বাছা হক্ কথা কব। ঐ কাঁচা বয়েস ছাড়া আর কোন পিত্যেশ তোমার ওর কাছে নেই। বড় ঘরের ছেলে, দুঃখু-কষ্ট করে যে খেটে খাবে, তাও কিছু পারবে না। কর্ত্তাও যখন জেদ ধরেচে, তখন তা বজায় রাখ্‌তে বিয়ে করবেই। ছেলের সঙ্গে কি আর কাড়াকাড়ি করবে? তাই একে দিলে সরিয়ে। মাঝে থেকে পড়্‌ল তাঁরই গুড়ে বালি।”

মালতী বিষণ্ণভাবে কহিলেন, “আমার ত সেখানেও কোন আশা ছিল না, মামী। আমি ভাবি, আমাদের জন্যে ওঁদের একটা ঘরোয়া বিবাদ হোল,—সেই জন্যেই আমার দুঃখ হয়!”

“সে দুঃখ তোমার অন্যায়, বাছা! কি যে তুমি ভেবে রেখেচ মনে, তা তুমিই জান। আমার পরামর্শ নাও ত বলি, এখনই কর্ত্তাকে চিঠি লিখে গলার কাঁটা উলোও। তুমি কি মনে কচ্চ, ওর চেয়ে ভাল ঘর তুমি আর পাবে কোথাও?” বলিয়া তিনি ভাগিনেয়ীর বিষণ্ণ নত মুখের পানে বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

মালতী নত মুখে শাকের ডগাগুলি খুঁটিয়া তুলিতেছিলেন, নিরুত্তরেই রহিলেন। তাঁহার পল্লবে-ঢাকা দুটি ব্যথিত চোখের নত দৃষ্টি জলে ভরিয়া ঝাপসা হইয়া গেলেও তাহা মাতুলানীর দৃষ্টিতে পড়িল না; এবং তাঁহার যুক্তিপূর্ণ সদুপদেশের ফল ফলিতেছে কি না, তাহাও ঠিক্ বোঝা গেল না।

হিমুর ঝাঁট দেওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। ঝাঁটা গাছটি যথাস্থানে রাখিয়া ফিরিবার সময় মুক্তাঠাকুরাণীর শেষ কথাগুলি তাহার কানে গেল। সে হাসিয়া কহিল, “দিদিমা, বুড়ো হলে মানুষ ভারী পেটুক হয়, না? পরের বাড়ীর ক্ষীর সন্দেশ ভারী মিষ্টি লাগে?”

মুখরা হিমুর যথেচ্ছ আচরণ একেই ত দিদিমার প্রীতি-প্রদ ছিল না। তাহার উপর এখন তিনি তাহার প্রতি মনে মনে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়াই আছেন। সে-ই ত তাহার মাকে বাধ্য করিয়া বিবাহে সম্মতি দিতে দেয় নাই। বুড়া বর বলিয়া মেয়ের আবার মনে ধরে নাই! মেয়ে কি খুকি? বুড়া ছাড়া কে আবার ও বুড়া হাতী দজ্জাল মেয়েকে বিবাহ করিবে! হিমুর ব্যঙ্গোক্তি তাই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি মিশাইল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঠাকুরাণী কহিলেন, “হ্যাঁ, ক্ষীর সন্দেশের লোভেই মরচি আমি। দেখিনি ত কখনো চোখে! আর সেই পাত্রীই তুই বটিস্! খুব্‌ড়ো কলাগাছ, বিকুবি কি দিয়ে, তাই বল্‌ত আগে আমায়, শুনি?”

হিমু হাসিমুখে কহিল, “শুন্‌বে দিদিমা? আমার পরামর্শ যদি নাও ত আমি বল্‌চি,—যোমাং জয়তি সংগ্রামে যো মেদর্পং ব্যপোহতি, যোমে প্রতিবলো লোকে, স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। তাহলে কেউ আর সাহস করে এগুবেও না।”

দিদিমা এবার অসহ্য ক্রোধে হিমুকে ছাড়িয়া মালতীর নত মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, "যত নষ্টের গোড়া ঐ অরুণে! এত বড় দস্যি দজ্জাল মেয়েকে কেউ কখনো লেখা-পড়া শেখায়? মেয়ে আমার ইংরিজিতে অরুণের সঙ্গে কথা কয়! অত বড় বেটা ছেলে, সেই যেন চোরটির মত মুখ রাঙা করে সরে পালায়। দে না গো রাণু, পণ্ডিতনি মেয়েকে একটা টোল খুলে দে না, সমস্কৃত পড়াবে, ন্যায় শাস্তর শেখাবে। ঢের পড়ুয়ো জুটবে অখন।"

মালতী এবার মুখ তুলিয়া তিরস্কারপূর্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "হিমু—"

"না মা, দিদিমা সত্যি রাগ করেনি! করেচ দিদিমা? ভারী ত মানুষ আমি, আমার উপর আবার রাগ করা! আমায় যদি দূর করে দাও, তুমিই বা ছাই ফেল্‌বে কিসে, বল ত?" বলিয়া মা ও দিদিমার দ্বিতীয় মন্তব্য শুনিবার আশা না রাখিয়াই সে, "ঐ যা দিদিমা পুরুত মশায়ের ছাগল তোমার তুলসী গাছটি মুড়োল"—বলিয়া উদ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে দৌড়াইল।

"বলি, আজ কি শুধু শাকসেদ্ধ খেয়েই থাকতে হবে নাকি? ক্ষেতটা যে উজোড় কল্লি, বাছা! সবই কি তোদের বাড়াবাড়ি! এমন ধারা কখনো দেখিনি, বাবা!" বলিয়া মুক্তাঠাকুরাণী অনুপস্থিত দুষ্টা হিমুর অপরাধের দণ্ড-বিধানে অক্ষমতার ক্রোধের ঝাল একটুখানি তাহার মায়ের উপর ঝাড়িয়া লইয়া গৃহাভিমুখিনী হইলে মালতীও নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

মেয়ের জন্য মামীর কাছে মাঝে মাঝে এমন দুই-চারিটা শ্রুতিকটু মন্তব্য তাঁহাকে প্রায়ই শুনিতে হয়। ইহাতে তাঁহার দুঃখ হইত না। তিনি জানিতেন, মামা তাঁহাকে ভালবাসেন। অবিনীতা নাতনীকে পারিয়া উঠেন না বলিয়াই উড়ো খই গোবিন্দায় নমোর মত এগুলা পরোক্ষে তাঁহারই উদ্দেশে ছুড়িয়া মারা। তা হউক তাঁহার কিছুতেই আসিয়া যায় না। কিন্তু হিমু বড় অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে। অত অবাধ্যপনা তাহার পরে সহিবে কেন? অথচ বারণ করিয়া ফল হয় না। সে কেবল হাসিয়া জড়াইয়া ধরে, শতবার মাপ চায়, দিদিমার পায়ের ধূলা লয়। আবার পর মুহূর্ত্তে তদপেক্ষা কঠিন অপরাধই করিয়া বসে। ইহাকে শাসন করিতেও যে হাত ওঠে না। অবুঝ দুরন্তকে শাসন করিবার লোকের অভাব ত কখনো হয় না; সে ত চিরদিনের জন্যই পড়িয়া আছে। ক্ষমা করিবার লোকেরই না সংসারে অভাব! অভাগিনী মা, এমন মেয়েকে ত কিছুই মনের মত বর দিতে পারিলেন না। শুধু শাসন দিয়াই কি তাহাকে বিদায় দিবেন? তবে বাকী দিনগুলা তাঁহার কিসের স্মৃতি বহিয়া কাটিতে পারিবে?

দুপুর বেলার রান্না-খাওয়া চুকাইয়া দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া মালতী চুপ করিয়া শুইয়াছিলেন। কাছে বসিয়া হিমু তাহার চরকা লইয়া সুতা কাটিতেছিল। মুক্তাঠাকুরাণী অদূরে কম্বলের আসনে বসিয়া, চোখের উপর টিনের ফ্রেমে বাঁধা চশমাখানি আঁটিয়া কাশীখণ্ড পাঠ করিতেছিলেন, ও মধ্যে মধ্যে মালতীকে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে হিমু কহিল, "দিদিমা, একবার কাশী চলনা গা! কাশী হেন স্থান, তাও জন্মে কখনো দেখলুম না। পূজর সময় কন্‌শেসন টিকিট"—হিমুর সহিত দিদিমার কলহ ও সন্ধির কোন বিশেষ পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট ছিল না, কারণ তাহা দিনের মধ্যে দশ বারই হইত। সকাল বেলার ঝগড়া কখন মিটিয়া গিয়া এখন সন্ধির কাল চলিতেছিল। মুক্তাঠাকুরাণী বইয়ের উপর হইতে চোখ তুলিয়া হিমুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি টিকিট, বল্লি? আধা ভাড়া, বুঝি? তা যাবি রাণু? তুইও ত দেখিস্‌নি কখনো। চ'না, বাবা বিশ্বনাথের মাথায় একটু জল দিয়ে তীর্থের রজে একবার গড়াগড়ি দিয়ে আসি।"

প্রশ্নটা যত সহজ, উত্তর তত সহজ ছিল না। একেই ত তাঁহারা মা ও মেয়ে বসিয়া বসিয়া বিধবার পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাইতেছেন। তাহার উপর এই যে প্রকাণ্ড পর্ব্বত-ভার, আসন্ন কন্যা দায়—এ দায় উদ্ধারের সামর্থ্যও ত তাঁহার নিজের নাই। সেও যে উঁহারই করুণার উপর নির্ভর। ইহার উপর আবার তীর্থের সখ? আধা ভাড়া হউক, তবু সেও ত বড় কম নয়,—তাঁহারা তিনজন,—সেথেও একজন চাই। তীর্থের পথে বাহির হইলেই কত রকম খরচ আছে। এই সব ভাবিয়াই অনাগ্রহভাবে

মালতী কহিলেন, "তীর্থ স্থানে বেরুলেই বিস্তর খরচ। খামকা কাজ কি মামী ?"

মামীর মন এতক্ষণ যতটা অগ্রসর না হইয়াছিল, ভাগিনেয়ীর আপত্তির কথায় বিরক্তিতে কাশীনাথের প্রতি ভক্তিতে মনটি আরো দ্বিগুণ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তিনি কহিলেন, "খরচ ত শো'র পেটে খেলেও আছে, রোগে ধরলেও আছে, সবেতেই আছে। তা বলে মানুষ কি পরকালের কাজও করবে না ? হিমি কুঁড়লে হোক, ঝগ্‌ড়াটে হোক, ন্যায্য কথাও বলে। হ্যাঁলা হিমি, অরুণ কবে আস্‌বে লা ? ছুটির কি এখনও দেরী আছে নাকি ? সেখো একজন চাই ত। আবার সে ছাড়া আর কাকেই বা ভরসা করি বিদেশ বিভুয়ে ? যতই হোক, ঘরের ছেলের মতন আছে, মায়াও বসেচে—"

হিমু ইতি-পূর্ব্বে পাঁজি দেখিয়া ইংরাজী তারিখ মিলাইয়া অরুণের আসিবার দিনটি স্থির করিয়াই রাখিয়াছিল। মধ্যে কতগুলি দিন এবং রাত্রি এখনও বর্ত্তমান, তাহার হিসাবও তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। তবু দিদিমাকে রাগাইবার অভ্যাস-বশে কহিল, "দিদিমার যে আর তর সইচে না ! থাম, এখন ছুটির কোথায় কি ? তাছাড়া সে যদি তোমার কাশী বৃন্দাবন করতে যেতে না চায় ? জোর ত নেই বাবু, পরের উপর !"

দিদিমা মালতীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া মৃদু কণ্ঠে খোঁচা দিয়া কহিলেন, "না ভাই, জোর আর আমার কিসের ? আমার সঙ্গে কাশী বৃন্দাবন যেতে সে না চাইতেই পারে—কিন্তু যার সঙ্গে চাইবে, যার জোর চল্‌বে, সেও ত সঙ্গে থাক্‌বে।"

বুদ্ধিমতী মুক্তা ঠাকুরাণী কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটু হিসাবে ভুল করিলেন ! আলোকনাথকে হিমুর বিবাহে অসম্মতির কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন, হিমুর অরুণের প্রতি অনুরাগ-বশতঃ। সেটা তাঁহার ভ্রম ! হিমু অরুণকে ভালবাসিত, সত্য ! কিন্তু সে ভালবাসা তাহার কামনা-জড়িত নয়। সে তাহার মাকে ভালবাসিত, অরুণকে ভালবাসিত। সে ভালবাসা আত্মীয়ের নিকট দাবীর ন্যায় অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল। ভাল না বাসিয়া সে অবশ্য থাকিতে পারিত না। সে জানিত, সে যাহাকে ভালবাসে, সেও তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু তাহার অন্য কোন অর্থ সে কখনো কল্পনাও করে নাই। তাই দিদিমার শ্লেষপূর্ণ বাক্য ব্যর্থ হইয়াই ফিরিয়া গেল, তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অরুণের ভবিষ্যৎ

সেবার বি, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, অরুণ ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার পাশ হইলেও বৃত্তি পায় নাই। পরীক্ষার কৃত-কার্য্যতার যে আনন্দ তাহা সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইল। তারপর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অরুণ যেন কূল খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এম্‌-এর গৌরব বহন করিবার জন্য যে বিপুল ব্যয়-সাপেক্ষ পুস্তকাবলীর প্রয়োজন, তাহা অরুণের ন্যায় গরীব ছাত্রের পক্ষে সংগ্রহ করা একেবারেই সম্ভব নয়। পাশ হইলে ষাট টাকা মাহিনার চাকরিও একটা হয় ত হাতে জুটিবে না।

ঝালদায় থাকিতেও এ-সব চিন্তা অরুণের মনে উঠিত। মুখে সে এ বিষয়ে কোন আলোচনাই করিত না। কারণ সে জানিত, এই দয়ালু পরিবারের সামর্থ্য অল্প। তাহার উপর একটা প্রকাণ্ড ব্যয়ের তালিকা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত। মালতী একদিন নিজে হইতে মুখ ফুটিয়া এ বিষয়ে অরুণকে তাহা বলিয়াছিলেন। তাহারই সাহায্য চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, যদি কোন স্ব-শ্রেণীর ছাত্র গরীবের মেয়েটিকে দয়া করিয়া গ্রহণ করিয়া অনাথার জাতি-মান রক্ষা করে,—সে বিষয়ে একটু চেষ্টা দেখিতেও বলিয়া-ছিলেন। অরুণ জানিত, প্রফুল্লর সঙ্গে তাহার বিবাহ বাধে না। প্রথমেই তাই যোগ্যতা বিচার করিতে গিয়া প্রফুল্লর নামই তাহার মনে পড়িল। কিন্তু সে চিন্তাকে সে উদয়েই চাপিয়া ফেলিল। হিমু-হীন ঝালদা, এ যেন কল্পনা করা যায় না। হিমু চলিয়া গেলে এ সংসারের সব দেনা-পাওনাই যে তাহার চুকিয়া যাইবে। তখন শুধু কলেজের রসহীন বইগুলা কি এই একঘেয়ে জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে ? অরুণ ভাবিল, মা মনে করেন,

হিমু বড় হইয়া গিয়াছে। কোথায় সে বড় হইয়াছে ? এখনও অনেক দিন তাহার বিবাহ না দিলে চলিতে পারে। তা পারে যখন, তখন এত তাড়াতাড়িই বা কি ? হইবে, অখন ! তাছাড়া প্রফুল্লকে নিজে হইতে সে ত কোন কথাই বলিতে পারিবে না। তাহার বাড়ীর ঠিকানাও সে জানে না— সুবিধা-মত যখন তাহার কোন আত্মীয়ের সহিত দেখা হইবে, তখন এ কথা তুলিবে। অরুণ মালতী দেবীকে আশ্বাস দিয়া বলিল, হিমুর জন্য ভাবনা কি ? সে যথাকালে যোগ্যপাত্র নিশ্চয়ই আনিয়া দিবে। মালতী আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেও অরুণ যখন যোগ্য জনের দর্শন দেওয়াইতে পারিল না, তখন অগত্যা তিনি নিজের হাতেই সে সমস্যার ভার গ্রহণ করিলেন। সে কথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আপাততঃ আমরা অতীতের অনুসরণেই প্রবৃত্ত রহিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমেই অরুণ প্রফুল্লর সংবাদ লইল। শুনিল, সে দেশে নাই, খুলনায় গিয়াছে। ক্লাশ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া অরুণ হতাশ হইয়া পড়িল।

প্রফুল্ল খুলনা, বরিশাল ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল। অরুণকে নিরুদ্যম ভাবে ঘরে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "ব্যাপার কি ? ভর্ত্তি হও নি যে ?"

অরুণ ইতস্তত করিয়া কহিল, "মনে কচ্চি, আর পড়ব না। যদি একটা কাজ-কর্ম্ম জুটিয়ে নিতে পারি, তাবি চেষ্টা কচ্চি। পড়া ত যা-হোক এক রকম হল !"

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল, "বিদ্যা-সমুদ্রের তল দেখতে পেয়েচ, তাহলে ? আর না হলেও চলবে ? না হে না, ও-সব বাজে কথা রেখে কালই ভর্ত্তি হয়ে পড়। ডাক্তার-খানায় শুনে এলুম, কাল নাকি সর্ব্ব-সিদ্ধিযোগ ! তারপর আবার অশ্লেষা মঘা, এড়াবি ক' ঘা ? কালই ভর্ত্তি হও, আর একদিনও দেরী নয়।"

অরুণ ম্লান হাসিয়া কহিল, "তাতে আমার দাম আর কত বাড়্‌বে, প্রফুল্ল দা ? এটা গরীবের পক্ষেও ঠিক সঙ্গত কি ?"

অরুণ যে এবার স্কলারশীপ পায় নাই, আর তার অবস্থাও কত অসচ্ছল, প্রফুল্ল তাহা জানিত। সে তাই লজ্জিত মুখে "ওঃ" বলিয়া ঘরটা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া অরুণের খুব কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "অরুণ, তুমি আমায় দাদা বল, আচ্ছা, এটা শুধু ভদ্রতার পাতানো সম্বন্ধ, না, এর মধ্যে সত্যিও কিছু আছে ?"

প্রফুল্লর বক্তব্য বুঝিয়া আনন্দে ও অভিমানে অরুণের দুই চোখে জল ছলছল করিয়া উঠিল। সে কুণ্ঠা-মলিন মুখে কহিল, "তুমি ত সবই জান প্রফুল্ল দা !"

"জানি ভাই। জানি বলেই বলচি। এই পয়সার ভাবনাটা, পরীক্ষা পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি আমার উপরই ছেড়ে রেখে দাও না।"

অরুণ অপরাধীর ভাবে জড়িত কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু তুমি ত আমায় কখনো তোমার সংসারের কোন কথা জানাও নি। তোমার কাকা তোমায় অনেক দেন, বল, কিন্তু সে কি—" বলিয়া অরুণ চুপ করিল।

প্রফুল্ল কহিল, "দু-জনের পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত নয়, এই ত বলচ ! না, অরুণ। কাকা ইচ্ছে কল্লে, অনেক ছাত্রকেই পড়াতে পারেন। তাছাড়া আমার কাজে তিনি কখনো কৈফিয়ৎ চান না। কিন্তু আমার মনে হচ্চে, তুমি মন স্থির কর্ত্তে পার নি। বেশ, ভাইয়ের আদর না নাও, ধারই নিয়ো।"

অরুণ হাসিয়া কহিল, "শুধব কিসে ? নবডঙ্কা যে। তুমি কি মনে কর, পাশ করলেই তার দাম আমি তুলতে পারব ?

"করি বই কি ! আর কোন ওজোর করো না ! তোমার ঋণে আমার মাথা পা পর্য্যন্ত যে বাঁধা, ভাই—কিছু আমায় কর্ত্তে দাও, তোমার জন্যে।"

প্রফুল্লর কথার ভাবার্থ যদিও হেঁয়ালিপূর্ণ, তবু অরুণ তাহা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টামাত্র করিল না।

অরুণের মনে পড়িল, সেবার নিউমোনিয়া রোগে কাতর হইয়া প্রফুল্ল যখন ছুটিতে বাড়ী গেল না বা খবর পাঠাইতেও দিল না, তখন তাহার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া মেশের সকল ছাত্রই বাড়ী চলিয়া গেল। গেল না কেবল অরুণ।

সারাদিন ও রাত অক্লান্ত যত্ন ও সেবায় সে তাহার প্রফুল্লদাকে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছিল। ভাল হইয়া প্রফুল্ল কিন্তু একবারও সে কথার উল্লেখ করিয়া অরুণকে ধন্যবাদ দেয় নাই। আত্মীয়ের জন্য আত্মীয়ের যা কর্ত্তব্য, এ যেন তেমনই কর্ত্তব্য-পালনের ব্যাপার। অরুণ ইহাতে খুসীই হইয়াছিল। প্রফুল্ল যদি পরের মত তাহার কাছে ভদ্রতার ত্রুটি স্বীকার বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত, তবে তাহার লজ্জার আর স্থান থাকিত না। বরং কেহ পরে এ কথার আর উল্লেখ করিলে লজ্জায় তাহার মুখ কান রাঙা হইয়াই উঠিয়াছে! তবু অনিচ্ছাতেও সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া অরুণের মনে হইল, এ বোধ করি সেই ঋণেরই কথা। প্রফুল্লর কণ্ঠে যে ব্যথার সুরটুকু ধ্বনিত হইয়া অরুণের মনে বাজিল, তাহাতে বাদ-প্রতিবাদ করা চলে না। অরুণ প্রফুল্লর প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

অপরাহ্নে প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ী পড়াইতে গেলে এ-কথা সে-কথার পর তিনি নিজ হইতেই কহিলেন, "স্কলারশিপটা না পেয়ে এবার ত একটু অসুবিধা হলো তাহলে। পরীক্ষার সময় যা মাথার যন্ত্রণা গেল, তাতে ত ফার্ষ্ট ক্লাসই আমি আশা করতে পারিনি। বড় খুসী হয়েচি! কিন্তু দেখ হে, আমি একটু গোলে পড়ে গেছি। দিদিমণিটা ত শীঘ্রই পরের বাড়ী চলে যাচ্চে। তখন খোকার দিন কাটবে কি করে? আমাদেরও বড় ফাঁকা ঠেক্‌বে। তুমি বাবু বাসাটি ছেড়ে দিয়ে এবার এখানে এসে থাক। ঘরও মেলা খালি রয়েচে। কোন অসুবিধা হবে না তোমার। কোন ওজোর আমি শুন্‌ব না বাপু। এ উপকারটি তোমায় কর্‌তেই হবে।" প্রিয়নাথ বাবুর কণ্ঠস্বর স্নেহ ও সহৃদয়তা-পূর্ণ। অরুণ বুঝিল, প্রয়োজন কার; তাই তাহার স্নেহপ্রয়াসী চিত্ত, সহজেই গলিয়া গেল। অযাচিত করুণা, সে বিধাতারই দান! নহিলে প্রয়োজন-কালে এমন স্নেহময় হৃদয়ের স্পর্শ, অযোগ্য সে কোন্ গুণেই বা বার বার লাভ করে!

প্রিয়নাথ বাবুও তাহাকে এম্ এ পড়িবার পরামর্শ দিলেন। একটা প্রোফেসরি অন্ততঃ পাওয়া সম্ভব হইবে। আইন পড়িয়া উকীলদের যা অবস্থা! ঘরে স্বচ্ছলতা থাকিলেও ঝক্‌মারির ব্যবসায় না করাই ভাল। ছিপ ফেলিয়া অটুট্ ধৈর্য্যে বসিয়া থাকিতে পারিলে হয়ত সন্ধ্যা বেলায় রুই কাতলা পড়িতে পারে! কিন্তু সে অটুট্ ধৈর্য্য—যাহাকে তখনই সংসার চিন্তা করিতে হইবে, তাহার জন্য নয়।

মাষ্টার মহাশয় বাড়ীতেই থাকিবেন শুনিয়া প্রদ্যুম্ন ও বরুণা খুসী হইয়া তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষের সজ্জা-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল।

অরুণ জানিত না, ছুটির সময় বরুণার বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। ২২শে শ্রাবণ তাহার শুভ-বিবাহের দিন। পাত্র বন্দনার জমিদারের ছেলে সত্যব্রত। সত্যব্রতর সম্বন্ধে অরুণ বেশী কিছু জানিত না। যেটুকু জানিত, তাহাতে তাহাকে আত্মম্ভরী, রূপ ও ধনগর্ব্বিত যুবা বলিয়াই তাহার ধারণা ছিল। ইন্‌টার-মিডিয়েট ফেল করিয়া সে কলেজ ছাড়িয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল। তার পর এ কয় বৎসরের মধ্যে তাহার কোন সংবাদই আর সে পায় নাই। লয়ও নাই। এমন শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়েটির স্বামী-নির্ব্বাচন উপযুক্ত রূপ হয় নাই বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় অরুণ এ সংবাদে মন খুলিয়া তেমন আন্তরিক আনন্দ জানাইতে পারিল না।

বরুণার সহিত দেখা হইলে সে তাহাকে প্রণাম করিয়া নত মুখে একটুখানি লজ্জা-বিজড়িত মিষ্ট হাসি হাসিল। এই কয় দিনের ব্যবধানে সে যেন অনেকখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে। আনন্দের ফাগুন-রাগ তাহার দেহে মনে ইহার মধ্যেই যেন রাঙা আলো ছড়াইয়া দিয়াছে। হাসিতে, ভঙ্গিমায়, কথায় তাহারই ঝল-মলে কিরণ ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। হাতে গড়া স্নেহ-পাত্রীটির জন্য মনে মনে সে একটু উদ্বিগ্নও হইল। সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মনে মনে কহিল,—তোমার কল্পনার স্বর্গ যেন মিথ্যা না হয়! ভগবান্ তোমার ভবিষ্যৎ সুখময় আনন্দময় করুন! বরুণার লজ্জা-জড়িত মৃদু হাসিটুকু তাহার মিষ্ট লাগিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাও দিল। কৈশোরের সুখ-নিকেতন ছাড়িয়া এবার যে অজানা স্থানে সে সত্যের সংগ্রামে চলিয়াছে, সেখানে জয়ী হইতে পারিবে কিনা, কে জানে? অমনি মধুর হাসিটি ভবিষ্যতেও তাহার থাকে যেন, ভগবান!

অরুণের মনে হইল, এবার ফিরিয়া গিয়া হয়ত দেখিবে, চমুও এমনই করিয়া তাহার কাছ হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে!

ভাগ্য-নির্ণয় হইয়া গেলে সে নিশ্চিন্ত মনে পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। প্রফুল্ল প্রথমটা এ ব্যবস্থায় বাধা দিয়াছিল। কিন্তু যখন শুনিল, প্রদ্যুম্নর তত্বাবধান ও প্রিয়নাথ বাবুর লোক-সঙ্গ-স্পৃহা শুধু ছলের কথা, আসলে এ ব্যবস্থা অরুণেরই জন্য! তখন সেও আর আপত্তি করিল না। গৃহস্থ-ঘরে বিশেষ এমন সহৃদয় পরিবারে থাকায় অরুণের শরীরের পক্ষেও উপকার হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়াই সে আরও মত দিল। মানুষের ভালবাসা পাওয়া মানুষের কাছে যে কত মূল্যবান, তা সে বেশ জানে।

এই সময় জলদ ডেপুটির পদ পাইয়া চট্টগ্রামে গেল। বন্ধুর উন্নতিতে অরুণ আন্তরিক আনন্দ জানাইয়া তাহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিল। বিদেশে দুর্দ্দিনে সে জলদের কাছে অযাচিত অনেক সাহায্যই পাইয়াছে। আজ তাহার একজন প্রকৃত বন্ধু দূরে চলিয়া গেল! কে জানে, আবার কবে তাহার সঙ্গে দেখা হইবে! ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

ধর্ম্মকথা

কোন হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার ধর্ম্ম কি, সে বলিবে বেদ উপনিষৎ গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র। কোন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার ধর্ম্ম কি, সে বলিবে কোরাণ হদিজ ইত্যাদি। তেমনই খৃষ্টানকে তাহার ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বাইবেল দেখাইয়া দিবে! কিন্তু প্রাচীন কালের খানকয়েক পুঁথি এবং তদানুসঙ্গিক আচরণ বাস্তবিকই বর্ত্তমান যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। অবশ্য হিন্দুকে যে শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে হয়, আর মুসলমান খৃষ্টানকে যে তাহাদের কোরাণ বাইবেল মানিয়া চলিতে হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। তবুও প্রশ্ন ওঠে—এই মানিয়া চলাটাই বর্ত্তমান মানুষের ধর্ম্ম কি না।

ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহাই বুঝি না কেন, আমাদের মানিতেই হইবে যে, ধর্ম্ম জিনিষটা প্রাচীনতম যুগ হইতে চলিয়া আসিলেও অশোক প্রভৃতি বড় বড় রাজা-মহারাজার সাম্রাজ্যের মত নিবিয়া যায় নাই। ধর্ম্ম তাহার প্রাণ লইয়া বেশ টিঁকিয়া আছে। সহজ কথায় ধর্ম্মটা একটা living অর্থাৎ জীবন্ত বস্তু। কিন্তু আমরা জানি, জীবন মাত্রই পরিবর্ত্তনশীল—জীবিত যে, সে চলিবেই—হয় সে উন্নতির দিকে ছুটিবে, নয় সে অবনতির দিকে গড়াইয়া পড়িবে—এক যায়গায় কখনও সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে না।

ইহা হইতে সহজেই অনুমেয়, বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম কেবলমাত্র অতীতের ধর্ম্মগ্রন্থ, আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। তবে ইহা সত্য যে, ঐ সকল জিনিষ ধর্ম্মের ইতিহাসের (History of Religion) পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান।

আরও একটা কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা ভাল; বর্ত্তমান মানব-ধর্ম্ম যে প্রাচীন শাস্ত্রের ধর্ম্ম নয়, তাহা হইতে ইহা কখনও বুঝা উচিত নয় যে, প্রাচীনকে পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানকে সম্যক বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এমন অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত যে একটীকে বাদ দিয়া অপরটী বুঝিবার উপায় নাই। বর্ত্তমানের গায় অতীতের যথেষ্ট ছাপ লাগানো থাকে। অতীত ও ভবিষ্যৎ আছে বলিয়াই বর্ত্তমান। তেমনই আবার বর্ত্তমান আছে বলিয়াই ভূত ও ভবিষ্যৎ। সুতরাং আমার বলার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে প্রাচীন শাস্ত্রের ধার আমরা একেবারেই ধারি না। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাচীনকে নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান

জাগিয়া উঠিলেও বর্ত্তমান আর প্রাচীন এক নয়। উহাদের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য আছে। এবং এই তারতম্য যেখানে, সেইখানেই বর্ত্তমানের প্রাণ এবং বিশিষ্টতা।

যাঁহারা ধর্ম্মের কথায় প্রাচীন শাস্ত্রকে দেখাইয়া দেন, তাঁহারা ধর্ম্মের এই প্রাণ ও বিশিষ্টতার যথেষ্ট অবমাননা করেন। এবং মানুষের ক্রম-বিবর্ত্তন ও মানব-মনের নব নব সৃষ্টি-কৌশল শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গতানুগতিকতার বা অনুকরণ-প্রিয়তার প্রশ্রয় দিয়া বসেন।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, শাস্ত্রকে মানিয়া চলিলেই ধর্ম্মকে মানা হয় কিনা, অথবা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করিলেই ঈশ্বরকে মান্য করা এবং শাস্ত্রকারকে মান্য করা হয় কিনা? পূজা-অর্চ্চনা কর কেন? ইহার উত্তরে কেহ যদি বলেন, শাস্ত্রের আদেশ, তবে তাঁহার ধর্ম্মপালন করা হয় কিনা তাহা বাস্তবিকই বিবেচনার বিষয়।

মহাত্মা গান্ধি-প্রচারিত অসহযোগ নীতি দেশের অনেক লোক মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু কয়জন তাঁহার মত জীবন যাপন করিতেছেন? শঙ্কর কাণ্টের দর্শনও অনেকে মানিয়া চলেন, কিন্তু তাঁহাদের মত জীবন কয়জন ব্যক্তি যাপন করেন? দর্শনাচার্য্য ষ্টিফেন সাহেবের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভক্তি করেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন তাঁহার মত অবিবাহিত থাকিয়া একনিষ্ঠ ভাবে বাগ্দেবীর উপাসনা করিয়া জীবন কাটাইতেছেন? সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে, শাস্ত্র মানিয়া চলিলেই শাস্ত্রকারকে সম্পূর্ণভাবে মানা হয় না, শাস্ত্রকেই মানা হয়।

ঠিক তেমনই শাস্ত্র মানিলে শাস্ত্রবর্ণিত ভগবানকেও মানা হয় না। শাস্ত্রকেই মানা হয়।

যাঁহারা শাস্ত্রের জন্যই পূজা-অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা শাস্ত্রকে ভগবানের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূজা-অর্চ্চনার মূল্য অবশ্য অতি অল্প। ভগবানকে মুখ্যভাবে উপাসনা করাই প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম, সুতরাং যে সকল আচার-অনুষ্ঠানে ভগবানকে গৌণভাবে দেখা হয়, সে সকল প্রকৃত ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শাস্ত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিতে না পারিলে ধর্ম্মের দ্বারে আসিয়া পৌঁছানো যায় না।

কথাটা আরও একটু বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। শঙ্কর বলিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎটা একবারেই মিথ্যা বা মায়া। এই তত্ত্বটা যদি শুধু শুনিয়া অর্থাৎ না বুঝিয়া এবং কায়মনোপ্রাণে বিশ্বাস না করিয়া কেবলমাত্র শঙ্করের মত পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করি, তবে আমার শঙ্করের কথাটাই মানা হয়। সুতরাং শাস্ত্রনিহিত তত্ত্ব যদি শাস্ত্রের দোহাইএর জন্য স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে শাস্ত্রকেই মানা হয়, কিন্তু শাস্ত্র-নিহিত তত্ত্বকে মানা হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে শাস্ত্র মানিয়া ধার্ম্মিক হওয়ার এবং শাস্ত্রের আদেশের জন্য ঈশ্বর আরাধনা করার মূল্য নিতান্ত অল্প।

কিন্তু তাই বলিয়া যে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত পথে চলিতে হইবে, তাহা নহে। আমি যে-সত্য মানিয়া লইব, যে-ভাবে ঈশ্বর আরাধনা করিব এবং যে অর্চ্চনা অনুষ্ঠান করিব তাহা শাস্ত্রের বিধানের সহিত মিলিয়া যাইতে পারে। শাস্ত্র হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আমার পথ ঠিক করিয়া লইতে পারি। আপত্তি হইবে কেবল সেইখানে, যেখানে সত্যের দোহাই পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আরাধনা অর্চ্চনায় লাগিয়া যাইব অথবা যখন সত্যের যায়গায় শাস্ত্রকে বসাইব। শাস্ত্র যদি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে তবে সে সত্যকে মাথায় তুলিয়া লইলে আত্মা কিম্বা ধর্ম্মের কোন গ্লানি হইবে না বরং উন্নতি ও বিকাশই হইবে। কিন্তু সে সত্য যদি শাস্ত্রের জন্যই মানিয়া লওয়া হয়, তবে জাগিয়া উঠিবে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে দাস-মনোভাব বা Slave-mentality.

এখন একবার মানব-ধর্ম্মের প্রকৃতি বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। ধর্ম্ম বলিতে যাহা ধারণ করে তাহাই বুঝা যায়। এ অর্থে মানব-ধর্ম্ম মানব-প্রকৃতি হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ এ অর্থে ধর্ম্ম ব্যবহৃত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম বা religion বলিতে ঈশ্বর-অনুপ্রাণতা এবং

তদানুসঙ্গিক পূজা-অর্চনা ও আচার-অনুষ্ঠান বুঝা হয়। এই ঈশ্বর-অনুপ্রাণতা জ্ঞানসাপেক্ষ না হইলে পরিস্ফুট ও কার্য্যকরী হয় না এবং টি কিয়া থাকিতেও পারে না। সুতরাং, ধর্ম্ম বলিলে এখন আমরা (ক) ঈশ্বর-জ্ঞান (খ) ঈশ্বর-অনুপ্রাণতা ও (গ) পূজা-অর্চনা ইত্যাদি বুঝি।

সকলেই জানেন, মানব-মনের তিনটী প্রধান শক্তি বা দিক আছে। যথা:—চিন্তার বা জ্ঞানের দিক (Thinking) ভাবের বা ভক্তির দিক (Feeling), কর্ম্মের দিক (Willing)। মানব-মনের এই তিনটী দিকই ধর্ম্মের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সেই ধর্ম্মই ভাল ও উন্নত যে ধর্ম্ম এই তিনটী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার সাহায্যে এই তিনটী দিকই বিশেষভাবে বিকশিত ও কার্য্যকরী হইয়া উঠে। এই সূত্রে বলিয়া রাখা ভাল যে, গীতায় মানব-ধর্ম্মকে এই তিনটী দিক হইতেই দেখা হইয়াছে। গীতায় জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের কথা সকলেই অবগত আছেন। বড় বড় পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, এই তিনটীর অনুশীলন এবং সামঞ্জস্যই ধর্ম্ম। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, তর্ক-শাস্ত্রের মূল নীতি ধর্ম্ম ও জীবন সম্বন্ধে প্রযুজ্য কি না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক জীব ও বস্তুর মধ্যে যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে একের ধ্বংস ও অপরের অভ্যুত্থান অনিবার্য্য। দুর্ব্বলকে সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা জীবন-স্রোতে রক্ষা না করিয়া অধিকাংশ স্থলে তৎপরতার সহিত বিনষ্ট করা হইতেছে। অনেক সময় আবার দুর্ব্বলকে কার্য্যোপযোগী দেখিয়া তাহাকে দিয়া সবল আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করাইয়া লইতেছে। আবার অনুকূল অবস্থায় পড়িয়া দুর্ব্বল সবল হইয়া পড়িতেছে, আর প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া সবলের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। যে ক্ষুদ্রকায় বলহীন মানুষ এককালে অতিকায় জানোয়ারের ভয়ে গুহা-গহ্বরে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া কোন মতে আপনাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, সেই মানুষই আজ জীব-রাজ্যের অধিনায়ক এবং তাহারই ভয়ে ভীষণতম জন্তুবর্গ বনে-জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া কোনও মতে প্রাণরক্ষা করিতেছে। হয়ত আবার এমন দিন আসিবে, যেদিন গরিলাদের বুদ্ধি আর এখনকার মত রহিবে না। সেদিন পৃথিবী জুড়িয়া যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সে যুদ্ধে মানুষ তাহার ভীষণতম অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিতে অবকাশ পাইবে কিনা সন্দেহ। যবন-সৈন্য-সম্মুখে অর্জ্জুনের গাণ্ডীব যেমন ব্যর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, তেমনই হয়ত ক্ষিপ্রগতি গরিলার সম্মুখে মানুষের অস্ত্র-শস্ত্রও ব্যর্থ হইবে। জীব-জগতের এই প্রলয়-লীলা দেখিয়া কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতির সহিত মানুষের সামঞ্জস্য বর্ত্তমান আছে?

মানুষের জীবন-পটেও এই ছবিই প্রতিফলিত দেখিতে পাই। কখনও দেখি, জ্ঞানের আতিশয্যে ভক্তি ও কর্ম্ম পশ্চাতে পড়িয়া রহে, আবার কখনও ভক্তি এত বাড়িয়া উঠে যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম একেবারেই চাপা পড়িয়া যায়। আবার এমনও দেখা যায় যে, কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষ এতই মাতোয়ারা হইয়া পড়ে যে, জ্ঞান ও ভক্তির দিকে তাহার দৃষ্টিই খোলে না। কদাচিৎ একই মনুষ্যে এই তিনটী দিকই সমভাবে বিকশিত হইয়া জীবন-তরণী বহিয়া চলে। তাই বলিতেছিলাম যে, তর্ক-শাস্ত্রের সামঞ্জস্য বা Synthesis জীবন কিম্বা মানব মন সম্বন্ধে তেমন খাটে না। জীবন্ত মানুষ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির একটীকে বাদ দিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনটীই সমভাবে বিদ্যমান থাকে, কিম্বা তিনটীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিরাজ করে, তাহা নয়। সুতরাং তিনের অসমতা বা অসামঞ্জস্য যে অধর্ম্ম, তাহা বলা অন্যায়।

এই সূত্রটী অবলম্বন করিয়া এখন কতকগুলি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্যার বিচার করিয়া দেখা যাক।

যাঁহারা বৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারা সচরাচর বলিয়া থাকেন, আজকালকার দিনে বেদ ও শাস্ত্র-পাঠ ত দূরের কথা, দেব-দ্বিজে ভক্তি পর্য্যন্তও ছোকরা বাবুরা করেন না। ইহার উত্তরে বলা আবশ্যক, বর্ত্তমান যুগে অনেক দ্বিজ আছেন যাঁহারা সত্যকে অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন না। সত্যকে হারাইয়া যদি

তাঁহারা উন্নতি-শীল মানব-মনের ভক্তি হারাইয়া থাকেন, সেজন্য তাঁহারাই দায়ী, ছোকরারা নন। প্রাচীন যে সকল দেব-দেবী সাধারণতঃ অর্চ্চিত হয়, সে অর্চ্চনার অধিকার অনেক ব্যক্তিরই নাই। বিচারালয়ে উকিল ব্যারিষ্টারের দ্বারা বিচারপ্রার্থীর কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ্যে প্রতিনিধির দ্বারা যে কোন উপকার হইতে পারে, সে বিষয়ে বর্ত্তমান যুগ বিশ্বাস হারাইয়াছে। আরও অধিকাংশ দেবদেবীর সহিত এমন কথা অকথা ইতিহাস যুক্ত করা হইয়াছে যে, তাহার ফলে ছোকরা বাবুদের মনে ভয় জাগিয়া উঠিলেও ভক্তির উদ্রেক হয় না। সুতরাং দেবদেবীর প্রতি ভক্তি না করার জন্য ছোকরাদিগকে ধর্ম্মে পতিত ভাবা ঠিক বিজ্ঞতার কারণ নয়।

বেদ ও শাস্ত্রে যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে, তাহা অজ্ঞ-বিজ্ঞ ছোকরা বাবুরা সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানেন যে, সত্য কেবল যে বেদ ও শাস্ত্রেই আছে, তাহা নহে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিধাতার যে কীর্ত্তি উদ্ভাসিত রহিয়াছে, তাহাতেও যথেষ্ট সত্য আছে। মানব-মনের মধ্যেও সত্য নিহিত আছে। সুতরাং সত্যকে আবিষ্কার করিতে যদি কেহ বেদ বা শাস্ত্র না ঘাঁটেন, তবে সেজন্য তাঁহাকে ধর্ম্মে পতিত বা দোষী সাব্যস্ত করা নিতান্ত অসঙ্গত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেদ ও শাস্ত্র না মানিয়া তাহা বা না পাঠ করিয়া, দেব-দ্বিজে ভক্তি না করিয়াও যে মানুষ ধার্ম্মিক হইতে পারে না, তাহা নয়।

খাদ্য-অখাদ্য লইয়াও বৃদ্ধ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ ছোকরা বাবুদের সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া থাকেন। অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে, মনের উপর খাদ্যের প্রভাব যথেষ্ট; পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিলে সকলের মনই বেশ শান্ত থাকে। কিন্তু ইহাও সকলে জানেন, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। শাস্ত্রের লিখিত স্বচ্ছন্দ বনজাত শাক-সব্জীতে যদি ছোকরা বাবুরা পরিতৃপ্ত না হন, তবে তাঁহারা কি না খাইয়া কিম্বা বায়ু সেবন করিয়া দিন কাটাইবেন? খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করিতে আরও একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। এক কালে এবং এক দেশে যাহা খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা অনেক সময় অন্য কালে এবং অন্য স্থানে অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে দেখা যায়। মৎস্য বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সুখাদ্যের মধ্যে একটী। এই মৎস্যই আবার পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণের নিকট অ-খাদ্য। বৈদিক যুগের খাদ্য এখন আর হিন্দুর নিকট খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

আমরা আহার করি কেন,—সে কথাটাও এই সঙ্গে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এক কথায় শরীর-পোষণের নিমিত্ত সকলে আহার করিয়া থাকে। সুতরাং যাহা দ্বারা শরীর সম্যকরূপ পরিপুষ্ট করা সম্ভবপর, তাহাই সুখাদ্য। কিন্তু মনে করুন, এমন একটী আহার্য্য আছে, যাহাতে শরীর-পোষণোপযোগী যথেষ্ট বস্তু বর্ত্তমান, কিন্তু তাহাতে আমার রুচি একেবারেই নাই। এ ক্ষেত্রে আমার পক্ষে এ বস্তুটী বর্জ্জনীয়; কারণ পরিতৃপ্তির সহিত আহার না করিলে সাধারণতঃ উপকারের স্থলে অপকারই হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পরিপোষণোপযোগী পরিতৃপ্তিকর খাদ্যই খাদ্য। কিন্তু অনেক সময় এই দুইটী গুণ থাকা সত্ত্বেও খাদ্য পরিবর্জ্জনীয়। কারণ পাকস্থলী অনেক সময় এইরূপ খাদ্য হজম করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং খাদ্য-অখাদ্য বিচার করিতে গিয়া দেখা উচিত, পাকস্থলী খাদ্যটী সহজে হজম করিতে সমর্থ হয় কি না। হজম না করিতে পারিলে কোন খাদ্যই উপকার করে না, বরং প্রভূত অকল্যাণ সাধন করে। এই সঙ্গে আরও দেখা আবশ্যক, এই সুপাচ্য পরিতৃপ্তিকর পরিপোষণোপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিবার শক্তি আমার আছে কিনা। হাতে পয়সা না থাকিলে যে ঘী-দুধ খাইতে পারা যায় না, তাহা ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। সুতরাং আমার পক্ষে সেই খাদ্যই সুখাদ্য, যাহা আমি সংগ্রহ করিতে পারি এবং যাহা সুপাচ্য, তৃপ্তিজনক ও পরি-পোষণোপযোগী। এইরূপ খাদ্য না খাইয়া অন্য কিছু খাইলে শরীর-ধর্ম্মকে অবহেলা করা হইবে, নিশ্চয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে বলিতে হইবে, অখাদ্য খাইলেই অধার্ম্মিক হয়,—তাহা কখনও সুসঙ্গত নয়। কারণ ধর্ম্ম

হইতেছে মানস-রাজ্যের ব্যাপার, আর খাদ্য হইতেছে বস্তু-রাজ্যের ব্যাপার। অখাদ্য খাইয়াও যদি আমার মনে ঈশ্বর-অনুপ্রাণতা জাগিয়া উঠে এবং আমি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহ কায়মনোবাক্যে সম্পাদন করিয়া যাই, তাহা হইলে আমি যে ধার্ম্মিকগণের একজন হইব, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা অসঙ্গত। সুতরাং অখাদ্য খাইয়াও মানুষ ধার্ম্মিক হইতে পারে। আধুনিক ছোকরা বাবুরা অখাদ্য খান বলিয়াই যে তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের বাহিরে, এ কথা বলা খাটে না।

বিলাস ও বেশভূষা সম্বন্ধেও এইরূপ কথাই প্রযুজ্য।

মোট কথা, আধুনিক যুগ বিশ্বাস করে না যে, ধার্ম্মিক হওয়ার জন্য সংসার-বিরাগী বা মায়া-মমতা-শূন্য হওয়া আবশ্যক। আধুনিক চরিত্র আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, খাইয়া পরিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিয়া মানুষ ধার্ম্মিক হইতে পারে। নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করার নামই এখন ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। উকিল যে, সে যদি তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যটী সাধুভাবে নিষ্পন্ন করে, শিক্ষক যে সে যদি তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যায়, পিতা যদি তাহার সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত না হন; কৃষক যে, সে যদি সাধ্যমত যোগ্যতার সহিত চাষ বাস করে তবেই তাহার ধর্ম্ম বজায় থাকে। এই ধর্ম্মের নামই সনাতন মানব-ধর্ম্ম। অবস্থা-অনুসারে মানুষ এক এক কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। নিজে ইচ্ছা করিয়াও অনেক সময় মানুষ কোন কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া ফেলে। এই সকল কেন্দ্রে তাহার সম্মুখে কর্ত্তব্য নানা মূর্ত্তিতে দেখা দেয়।

এই কর্ত্তব্য সম্পাদনই মানুষের মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্ম। এই কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইলেই মানুষ অধার্ম্মিক হইয়া পড়ে। এই কেন্দ্রস্থিত কর্ত্তব্য পালন করার নাম মানব-ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই সনাতন। এই সঙ্গে যদি ঈশ্বর-অনুপ্রাণতা ঈশ্বর-জ্ঞান থাকে, তবে সোনায় সোহাগা হইয়া দাঁড়ায়।

সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম কর্ম্মমুখী বা কর্ত্তব্যমুখী।

কেহ হয়ত বলিবেন, না লইলাম ভগবানের নাম, না করিলাম তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা, করিলাম শুধু কতকগুলি কাজ আর কাজ, তবুও আমার ধর্ম্ম করা হইল। তবে পশুরাও ত পরম ধার্ম্মিক, কারণ তাহারা ত বেজায় কেজো। এই যুক্তি যে ন্যায়সঙ্গত নয়, তাহা 'কর্ত্তব্য' এই কথাটা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কর্ত্তব্য বোধ না হইলে কর্ত্তব্য করা হয় না। এই কার্য্যটী আমার করা উচিত, এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করার নাম কর্ত্তব্য পালন করা। এই বিবেচনা বা কর্ত্তব্য বোধ না থাকিলে শুধু কার্য্যই সম্পন্ন হয়, কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় না। পশুদের এই কর্ত্তব্য-বোধ নাই। তাই তাহারা কাজ করিয়া যায়, কর্ত্তব্য করে না। ভাল মন্দ বিচার-ক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই কর্ত্তব্য করা সম্ভবপর। যেখানে ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা নাই, সেখানে কর্ত্তব্যও নাই, ধর্ম্মও নাই।

ভগবান আমাদিগকে মানুষ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়াছেন। এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করাই তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা। তাঁহার নাম চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া জপিয়া, সারা দিন-রাত্রি তাঁহার পূজা-অর্চ্চনায় ব্যস্ত থাকিলে যে ভগবান সন্তুষ্ট হইবেন, তাহাতে বিশ্বাস হয় না। পিতা যদি সন্তানকে পড়িতে বলেন, আর সন্তান যদি না পড়িয়া শুধু বাবা-বাবা বলিয়া ডাকিতে থাকে, তবে তাহার যে পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তিরস্কারই লভ্য হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেইরূপ ভগবানের নামে করিলে তিনি যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা ত বোধ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে ভগবানের নাম লওয়া অসঙ্গত, এ কথা আমরা একেবারেই বলি না। আমি তাঁহার নিকট আমার প্রাণের নিবেদন জানাইতে পারি। আমাকে সুন্দর, সুস্থ, সুখী ও সুপথগামী করিবার জন্য তাঁহাকে আমি অন্তরের সহিত অনুরোধ করিতে পারি। সংসার-যুদ্ধে যখন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়ি, অশান্তি ও দুঃখের চাপে যখন পিষ্ঠ হইতে থাকি, তখন যে বুকের ভিতর হইতে ভগবানের নামটা বাহির করা হয়, সে কেবল প্রকারান্তরে বলা যে, সাংসারিক

অশান্তি ও দুঃখের নিকট আমি যে নিতান্ত অসহায়, তাহা নহে। আমার পশ্চাতে ভগবান আছেন। তাঁহার সাহায্যে আমি এই সকল অশান্তি ও দুঃখ অতিক্রম করিতে পারিব। তাঁহার শক্তিতে বলীয়ান হইয়া তাঁহার পতাকা আমি বহন করিতে সমর্থ হইব।

পরিশেষে আর একটী কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব্বে অর্থাৎ মধ্যযুগে ধর্ম্ম দেবমন্দিরে বা গির্জ্জা-ঘরে বা সঙ্ঘে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম সমাজের বা মানুষের চতুর্দ্দিকে ছাইয়া পড়িয়াছে এবং সেইজন্য ধর্ম্মের এখন নানাদিক বা নানা মূর্ত্তি হইয়া পড়িয়াছে। কবি, গায়ক, সাহিত্যিক, কৃষক ইত্যাদিতে ধর্ম্ম অনেকটা এক হইলেও উঁহাদের ধর্ম্মে নানাপ্রকার বিভিন্নতা আসিয়া পড়িয়াছে। সীমার সঙ্গ লাভ করিয়া অসীম আজ নানারূপে বিরাজিত। এ রূপকে অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মের প্রাচীন রূপের ছাপ দেশের ও দশের গায়ে লাগাইয়া দিলেও তাহা টিঁকিবে না। সামান্য বাদ্‌লাতেই তাহা ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে, আর সেই স্থানে জাগিয়া উঠিবে বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্ম।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

পোড়ো বাড়ী

সুরকি ঝরে ইট বার হয়ে পড়েছে, জানলার কাঠের গরাদে পচে ভেঙ্গে গিয়েছে, সদর দরজাটাও পড়ি-পড়ি অবস্থায় হেলে রয়েছে। বাড়ীর খানিকটা অংশ ভেঙ্গে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে।

এই ভাঙ্গা বাড়ীটায় থাকত এক বিধবা মা আর তার দশ বছর বয়সের একটি ছেলে।

বিধবা মা খবরের কাগজের ঠোঙা তৈরি করে, কাটা কাপড়ের জামা সেলাই করে, কার্পেটের উপর ছবি তুলে তাদের মায়ের-পোয়ের খাবার খরচটা আর ছেলের স্কুলের মাইনেটা কোন রকমে যোগাড় করত।

ছেলেটির পড়াশুনায় বেশ মন ছিল। সকালবেলা ঠিক দশটার সময় বই হাতে নিয়ে সে স্কুলে যেত, আবার ঠিক চারটের সময় ফিরে আসত। মা তার সারাদিনটা পয়সা রোজগারের চেষ্টায় গতর খাটিয়ে, সাড়ে তিনটে থেকে ছেলের পথ চেয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকত। ছেলে ফিরলেই তার গা মুছিয়ে, খাবার খাইয়ে মা আবার নিজের কাজে মন দিত, ছেলেও খেলতে যেত।

কলকাতার সন্ধ্যার ধোঁয়াটে অন্ধকারে ছেলেটি প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়তে বসত। রাত হলে পড়া সেরে খেয়ে-দেয়ে, মার সঙ্গে গল্প করতে করতে ছেলে ঘুমিয়ে পড়ত।

এম্‌নি ভাবে তাদের মায়ের-পোয়ের দিন চলছিল।

সেবার কলকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জার এপিডেমিক একটা প্রবল বাত্যার শক্তিতে এসে অনেকের জীবন-হর্ম্ম্য ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল। বিধবা মায়ের ভাঙ্গা জীবন-কুটীরের একমাত্র ঠেকো সেই ছেলেটি রোগের চাপে ভেঙ্গে পড়ল। শোকের এত বড় একটা প্রচণ্ড আঘাতে মা আর স্থির থাকতে পারলে না। স্বামীর মৃত্যুর বজ্রাঘাতে তার জীবনের আধখানা খসে পড়েছিল, তা যে সে পাথরের মত সহ্য করেছিল, সে-এই একটুখানি ছেলের মুখ চেয়েই! আর আজ এই স্নেহের খুঁটী ভেঙ্গে পড়ায় মা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে বাড়ী-ঘর বেচে, সহরের কোলাহলের পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে, একদিন প্রকৃতির অসীম কোলে লক্ষ ছেলেকে পুত্র-শোকাতুরা মা তার প্রাণের অজস্র স্নেহধারা বিলোতে বেরিয়ে পড়ল।

সেই ভাঙা বাড়ী যাঁরা কিনলেন, তাঁরা অনেক মিস্ত্রী লাগিয়ে অনেক টাকা খরচ করে সে বাড়ীর ভোল ফিরিয়ে ফেললেন। ভাঙা একতলা বাড়ী তিনতলা হয়ে উঠল। অস্থি-সার ইট-বার-করা বাড়ীটার গায়ে চুণ সুরকির মাংস লাগল। তার উপর রং পড়ল। বাড়ীতে ইলেকট্রিক আলো-পাখার বন্দোবস্ত হল। বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী-মোটরের আবির্ভাব হল।

বাড়ীর বৈঠকখানায় হাসির সোর বোল গল্পের হট্টগোল আর সঙ্গীতের ফোয়ারা ছুটল।

আগে যে-বাড়ীতে কেউ যেত না,—এখন সে বৈঠক-খানা পাড়ার অনেকের নিত্য-গন্তব্য-স্থল হয়ে উঠল। গৃহকর্ত্তাও সকলের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুললেন।

অর্থের প্রসাদে বাড়ীর বাহ্যশ্রী বেড়ে গেল, দশজনের মনও আকর্ষণ করলে বটে, কিন্তু দীপ্ত-শ্রী এই প্রাসাদ হতশ্রী সেই ভাঙা বাড়ীর করুণ মাধুর্য্যটুকু কিছুতেই আর ফিরে পেলে না!

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

কলিকাতা বিজ্ঞান-ভবন

প্রসিদ্ধ ধনী-ব্যারিষ্টার মহাপ্রাণ ৺তারকনাথ পালিত মহাশয়—টি, পালিত নামে যিনি সাধারণের কাছে পরিচিত,—তাঁহার আজীবন-সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি (প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা) ও সেই সঙ্গে কলিকাতার নিকটে বালিগঞ্জে অবস্থিত তাঁহার প্রকাণ্ড বাস-ভবন মায় জমি-পুষ্করিণী, সমস্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দান করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর পূজার্চ্চনার জন্য।

বিজ্ঞান-ভবন
'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে

এ দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে ও দুঃখ ঘুচাইতে হইলে যে বাঙালীকে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিতে হইবে, তাহা তিনি বুঝিয়া ছিলেন। তাই রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষার যাহাতে সুব্যবস্থা হয়, সেজন্য তিনি নিজের বাস-ভবন ও নগদ বিস্তর টাকা ছাড়া কলিকাতা পার্শি-বাগানের বারো বিঘা জমিও বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯২১ সালে তারকনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রদত্ত টাকার সুদ হইতে অধ্যাপকদের বেতন দেওয়া হইবে ও পার্শি-বাগানে বিজ্ঞান-পরীক্ষাগার নির্ম্মিত হইবে—ইহাই তাঁহার দান পত্রের ব্যবস্থা। পার্শিবাগানে সার্কুলার রোডের উপর প্রকাণ্ড পরীক্ষাগার অনেকেই দেখিয়াছেন। দানপত্রে তিনি আরো ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় শিক্ষকগণের দ্বারা এতদ্দেশীয় তরুণ ছাত্র-দিগকে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে। তারকনাথের পর দানবীর ৺রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ও এই বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতার জন্য প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাতে দিয়া যান। এই দুই দান-বীর তাঁহাদের এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার ভার দিয়া যান্ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অমিত-তেজা ভাইস-চান্সেলর বাঙলার বরপুত্র স্যর আশুতোষের হাতে। এ-কার্য্যে স্যর আশুতোষের নিঃস্বার্থ উৎসাহ ও উদ্যমের আর সীমা ছিল না,— তাই এই অল্পকালের মধ্যেই বিজ্ঞান-ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেখানে শিক্ষার চমৎকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

উদ্ভিদ-দেহ-তত্ত্ব লাবরেটরি
'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে

এই বিজ্ঞান-ভবন হইতে ছাত্রেরা বি, এস, সি অনার; এম, এস, সি ও ডি, এস, সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। তাঁহাদের এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে, এ দেশে তেমন ব্যবস্থা আর কোথাও ছিল না! অবশ্য এখানে ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই— মৌলিক গবেষণার সকল ব্যবস্থাই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি না পাইয়া থাকিলেও কোন ছাত্রের যদি বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিয়া থাকে, তবে তাঁহার শিক্ষার জন্য এখানকার দ্বার উন্মুক্ত।
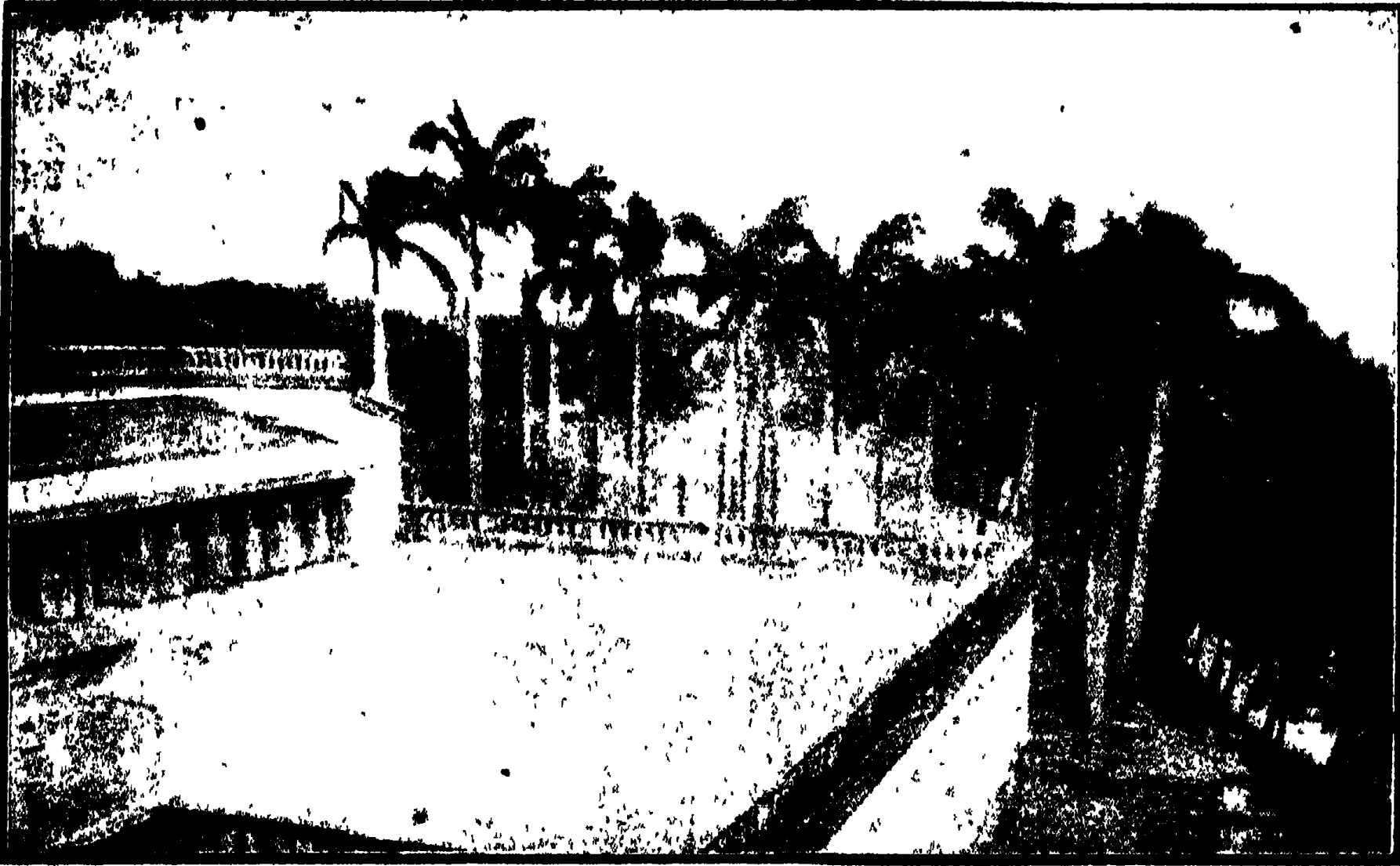
বিজ্ঞান-ভবনের ছাদ
'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে

তাল-খর্জ্জুর-বন-শোভিত পালিত মহাশয়ের বিস্তীর্ণ বাস-ভবনের শোভা অনুপম। এই বাস-ভবনেই এখন কৃতবিদ্য ও সুযোগ্য অধ্যাপকগণের কাছে কত ছাত্র যে বিজ্ঞানের নানা দিক্ লইয়া আলোচনায় নিযুক্ত আছেন, তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। প্রকৃতির মুক্ত উদার বুকে বসিলে বুক যেন দশহাত বাড়িয়া ওঠে, মনের কোণে সঞ্চিত ক্ষুদ্র আঁধারের আবর্জ্জনা নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যায়, কেমন উদারতার হাওয়া বহিতে থাকে। এখানে দৃশ্য ও সজ্জায় এমনি আয়োজনই হইয়াছে।

পূর্ণিমা রাত্রে চাঁদের জ্যোৎস্নায় পরিপ্লুত এই গৃহের প্রকাণ্ড ছাদ বিজ্ঞান-পূজারীর প্রাণে কল্পনার কি রঙীন ছবিই না ফুটাইয়া ধরে, ধ্যানে কি অখণ্ডভাবেই না চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া তোলে! সহরের বুকে ট্রাম-গাড়ী

আর লোকের মত্ত কোলাহলের মাঝখানে, অন্ধকার ঘরে মন যন সুগভীর অভিনিবেশের অবসর পায় না, চিত্তও শ্রান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে—এখানে সে বালাই নাই। চারিধার ফাঁকা, সবুজ গাছপালায় ভরা কুঞ্জ-কানন, গৃহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর—না আছে সেখানে লোকের হট্টরোল, না আছে গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি! প্রকৃতির কোলে নির্জ্জন শান্ত আশ্রম! বাণী-পূজার এই ত যোগ্য মন্দির!

ঘরে-ঘরে যন্ত্রপাতি, পরীক্ষার জন্য নানা কল, নানা আসবাব—এ যেন এক মায়াপুরীর বিচিত্র কক্ষ ঐন্দ্র-জালিক বিচিত্র রহস্যের বিপুল আভাষ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

অধ্যাপনা-গৃহ
'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে

ব্যবচ্ছেদ-গৃহ
উদ্ভিদ-দেহ খুব সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া পরীক্ষা হয়।
'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে

এই ভবনে শারীরতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, পদার্থ-তত্ত্ব রসায়নতত্ত্ব শিক্ষার জন্য আধুনিকতম সকল অনুষ্ঠানেরই আয়োজন আছে। যাহার যে তত্ত্ব শিখিবার ইচ্ছা, সে তাহাই শিখিতে পারিবে। অধ্যাপকগণ একটি কক্ষে অধ্যাপনা করেন—তারপর নানা তত্ত্বের পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন কক্ষে লাবরেটরি প্রভৃতির বিচিত্র ব্যবস্থা আছে।

বাড়ীখানি ত্রিতল। দোতলায় শারীর-তত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ব শিক্ষার লাবরেটরি। প্রাণিতত্ত্ব শিক্ষার অধ্যাপনা হয় এই দোতলায়। এক তলায় মাঝখানে অধ্যাপনা-গৃহ—তার পূবদিকে বায়ো-কেমিক্যাল লাবরেটরি। সেখানে নানা গ্যাসের সৃষ্টি হইতেছে। বিচিত্র গন্ধ উঠিয়া একতলাটিকে ভরপুর রাখিয়াছে। পশ্চিমে মাইকলোজিকাল লাবরেটরি—আচার্য্য ক্রুলের সাধনা-মন্দির। উদ্ভিদ-বিদ্যায় বিচক্ষণ প্রোফেসর বল এ কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন। এখন তিনি বুঝি মিউজিয়মে অন্য কাজ পাইয়াছেন।

এই গৃহের বিচিত্র বিভাগের বিচিত্র সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন, আচার্য্য ক্রুল। এখনো বিস্তীর্ণ জমিতে নানা
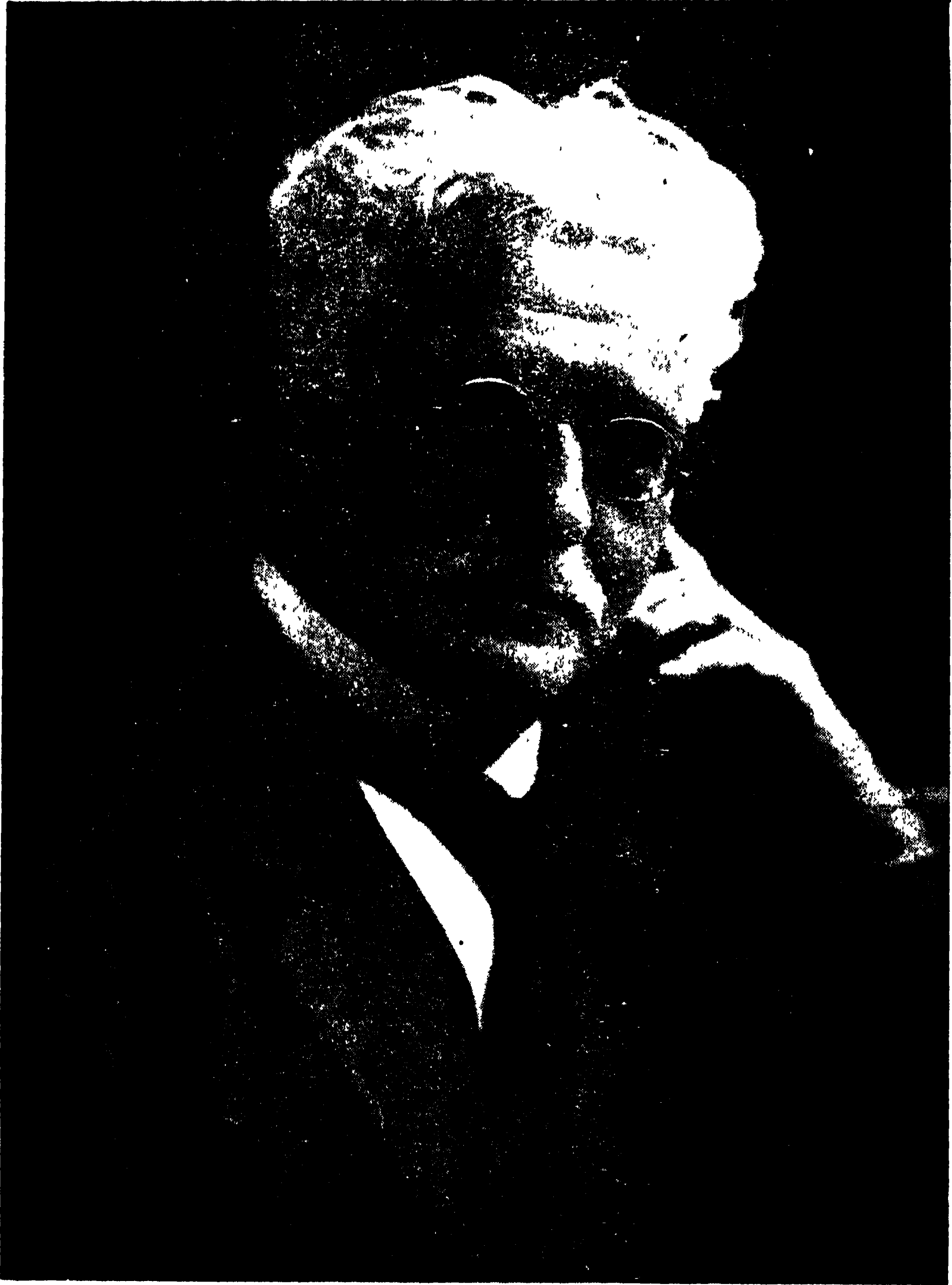
আচার্য্য ক্রুল
'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে

গাছ-গাছড়া বসাইয়া এটিকে বোটানিক্যাল উদ্যানের একটি ছোট-খাট সংস্করণ করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী গড়িয়া তোলা হইতেছে। এই বিচিত্র উদ্যানের রচনা এখনো শেষ হয় নাই। এ যে কত দীর্ঘকালের সাধনার ফলে গড়া হইতে পারে, তাহা, যিনি এখানে আসিবেন, তিনিই বুঝিবেন। অথচ এই অল্প কালের মধ্যে কি আয়োজনই না সারা হইয়া গিয়াছে! আচার্য্য ক্রুলের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় এবং তাঁহার সহকারীবর্গের অদ...

উৎসাহেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। স্যর আশুতোষের উদ্যমও ইহাতে বড় অল্প নয়!

মাইকলজি লাবরেটরির কর্ত্তা আচার্য্য ব্রুল ও তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাস বঙ্গদেশের filter-beds সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। বাঙলার ঝিল পুকুর পথ —উহারই সম্বন্ধে নানা তথ্যের আবিষ্কার চলিতেছে,—কোথাকার জমি কেমন, সে জমির বিশেষত্ব কি। সে তথ্য আবিষ্কারে আচার্য্য ব্রুলের সহকারিতা করিতেছেন শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত। এ তথ্য আবিষ্কার করিয়া জল যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, তাহারই উপায় তাঁহারা নির্দ্দেশ করিবেন। ডাক্তার আগরকার ও প্রোফেসর গাঙ্গুলী এ কার্য্যে তাঁহাদের সহকারী হইয়াছেন।

শ্রেণী-বিভাগ লাবরেটার
'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে

উদ্ভিদ কি করিয়া সূর্য্যরশ্মি গ্রহণ করে, বাহিরের জলবায়ু উদ্ভিদ-দেহে কিরূপ ক্রিয়া করে, এই লাবরেটরিতে তাহার পরীক্ষা চলে।
'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে

এখনো বিজ্ঞান-ভবন সম্পূর্ণভাবে আগাগোড়া গঠিত হয় নাই, গড়ার কাজ চলিতেছে। উদ্যান-রচনায় স্বহস্তে লাগিয়াছেন, আচার্য্য ব্রুল ও তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার বসু। স্বহস্তে ইঁহারা লাঙ্গল ধরিয়া জমি চষিতেছেন। কয়েকজন মাত্র মালী নির্দ্দেশ-মত তাঁহাদের সঙ্গে কাজ করিতেছে।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিষের খোঁচায় জর্জ্জরিত করিতেছেন, তাঁহারা চোখ মেলিয়া একবার যদি সত্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখেন ত দেখিবেন, স্বর্গীয় পালিত মহাশয়ের সুমধুর কল্পনায় রূপ দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কি ঐকান্তিক যত্ন করিতেছে, ও তাহার ফলে আংশিকভাবে এই বিজ্ঞান-ভবন এত অল্প সময়ের মধ্যে কতখানি গড়িয়া উঠিয়াছে —দেখিয়া তাঁহারাও বিস্ময়ে পুলকে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। তাঁহাদের চিত্ত রিষের বিষ ভুলিয়া শ্রদ্ধায়

উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ পরীক্ষা লাবরেটরি
'কলিকাতা রিভিউ'র সৌজন্যে

ভরিয়া উঠিবে। এ কার্য্যে যদি সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতি আসিয়া মিলিত হয়, তাহা হইলে এই বিচিত্র ভবন, শুধু বাঙলার কেন, ভারতের এক অপূর্ব্ব সাধনা-মন্দির হইয়া দাঁড়াইবে! এ ভবন যদি সহানুভূতির অভাবে নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে বাঙালীর সকল আশাও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। এ কথা আমরা ভবিষ্যৎবাণী বলিয়া সূচিত করিতে পারি। ভগবান করুন, সে দুর্দ্দিন না আসুক! এ ভবন যেন সারা দেশের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া বাঙালীর জ্ঞান ও কর্ম্মের মন্দির হইয়া ফুটিয়া ওঠে! শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

অবলার বল

বাতের ব্যথায় পা দুটো ফুলে কলাগাছ হ'লেও, বিরিঞ্চি সেদিন তাঁর আপিসে কামাই দিলেন না। তাঁর হুণ্ডীর কারবার।

আপিসে গিয়েই দেখলেন, একটি মোটাসোটা স্ত্রীলোক তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। তার মাথায় ঘোমটা, গায়ে এই দারুণ গরমেও একখানা পুরানো আলোয়ান জড়ানো। বয়সেও প্রাচীনা। সাধারণত একশ্রেণীর গরিব গৃহস্থ দেখা যায়—যারা ভদ্রলোকের মেয়ে হ'লেও পয়সার অভাবে সকলের সাম্‌নে বেরুতে বাধ্য হয়, এই স্ত্রীলোকটিও যে সেই শ্রেণীর, দেখলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

বিরিঞ্চি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "আমার কাছে তোমার কি দরকার গা?"

বুড়ী তখনি ভালো হয়ে বসে, মাথার ঘোমটা একটুখানি তুলে দিয়ে বল্লে, "আমাকে রক্ষে কর বাবা! আমাদের কর্ত্তা আজ পাঁচমাস অসুখে ভুগচে—আপিস থেকে তাকে বিনি দোষে ছাড়িয়ে দিয়েচে বাবা! আমি তার পাওনা মাইনা চাইতে গেলুম,—কিন্তু মাইনেও পুরো পেলুম না—উল্টে আট-আটটা টাকা কেটে নিলে। আমি বললুম—'কেন?' তারা বল্লে—আপিসে নাকি কার কার কাছে কর্ত্তার ধার ছিল! এও কি হ'তে পারে? তুমিই বল বাবা, এও কি হ'তে পারে? আমি জানলুম না শুনলুম না—কর্ত্তার সাধ্যি কি যে ধার করে! এখন তুমি এর একটা বিহিত কর। আমি গরিব নাচার অবলা, আমার দিকে কেউ চোখ তুলে চায় না, সবাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে—কারুর মুখে দুটো মিষ্টি কথাও শুনতে পাই না—" বলতে বলতে বুড়ীর চোখ ছলছলিয়ে জলে ভ'রে এল।

বিরিঞ্চি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "শোনো, শোনো! তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারুচি না। তোমার স্বামী কি এই আপিসে চাকরি করে?"

বুড়ী বল্লে, "কর্ত্তা রেল-আপিসে কাজ করত!"

বিরিঞ্চি একটা আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, "তা

বল! তাহ'লে আমি কি আর করব বল, তুমি ভুল জায়গায় এসেচ!"

বুড়ী বললে, "সে কি বাবা, এর মধ্যে আমি যে আরো পাঁচ জায়গায় গিয়েছিলুম, কিন্তু মুখপোড়ারা সবাই আমাকে তাড়িয়ে দিলে। এখন তুমিও পায়ে ঠেললে আমি আর কার মুখ চাইব বাবা?"

বিরিঞ্চি বললেন, "আমাকে দিয়ে তোমার তো কোনই উপকার হবে না! তোমার স্বামী যেখানে চাকরি করত, সেখানে যাও।"

বুড়ী করুণস্বরে বললে, "আমি বাবা আর কারুকে জানিনা—তুমিই যে গরিবের মা-বাপ! ছাখো, আমি মিছে কথা বলচি না, কর্ত্তার সত্যিই অসুখ করেচে—এই ছাখো ডাক্তারের চিঠি!"

বিরিঞ্চি বললেন, "তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করচি। কিন্তু রেল-আপিসে আমার কোনই হাত নেই। তোমার স্বামীকেই বরং জিজ্ঞাসা ক'রে ছাখো গে যাও।"

বুড়ী বললে, "অ-আমার ছার-কপাল, সে মিন্সে কিছু জানলে আজ কি আমার এমন হাড়ির হাল হোতো! তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলেই সে ব'লে ওঠে—'যাও, যাও, তুমি মেয়েমানুষ এ-সব ব্যাপার তুমি বুঝবে কি?'—আমি কিছু বুঝি না, বটে! তবে এত-বড় সংসার চালাচ্চে কে, শুনি?"

বিরিঞ্চি অধীরভাবে বোঝাতে লাগলেন, রেল-আপিস আর হুণ্ডীর কারবারের মধ্যে কতটা আকাশ-পাতাল তফাৎ! বুড়ী মনোযোগ দিয়ে সব শুনলে। তারপর বললে, "হুঁ,—আমি সব বুঝেচি। কিন্তু তোমার কথা তারা নিশ্চয়ই শুনবে। তাদের বল কর্ত্তার মাইনের আটটা টাকা ফিরিয়ে দিতে!"

বিরিঞ্চি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রান্ত স্বরে বললেন, "কি আশ্চর্য্য, এখনো তোমার মাথায় ঐ এক কথাই ঘুরচে? রেল-আপিসে আমার কথা খাটবে কেন? তোমার কথায় কথা কইতে গেলে তারা যে আমাকে পাগল ব'লে ভাববে!"

বুড়ী ছাপুস চোখে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "তবে কি আমার আট-আটটা টাকা জোচ্চুরি ক'রে ঠকিয়ে নেবে? আমি গরীব নাচার অবলা, আমার পানে কেউ মুখ তুলে তাকায় না—কি-ক'রে আমার দিন চলবে বাবা?"

একে বাতের ব্যথায় বিরিঞ্চির পা কট্‌কট্‌ করছিল, তার উপরে এইবার তাঁর মাথাটাও দপ্‌দপ্‌ আর বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করতে লাগল। তিনি আর একবার তাকে প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা পেলেন—কিন্তু বৃথা চেষ্টা! শেষটা হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন, "নবীন, ওহে নবীন! তুমি এদিকে এস তো! এই স্ত্রীলোকটিকে তুমি সব কথা বুঝিয়ে দাও—আমি আর সময় নষ্ট করতে পারচি না!" এই ব'লে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।... ...

ঘণ্টাখানেক পরে কতকগুলো কাগজপত্রে সই ক'রে তিনি শুনলেন, পাশের ঘরে বসে নবীন তখনো সেই বুড়ীকে হরেক-রকমে আসল কথাটা বোঝাবার ব্যর্থচেষ্টা করছে। শেষটা নবীনেরও ধৈর্য্যের ঝুলি খালি হয়ে গেল। বিল-সরকারকে নিজের কাজে নিযুক্ত ক'রে নবীনও ব'কে ব'কে গলা শুকিয়ে সেখান থেকে স'রে পড়ল!

বিরিঞ্চি নিজের মনে মনে বললেন, "অসম্ভব-রকমের নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক! আমার মাথা তো ঘুরিয়ে দিয়েচেই, আজ দেখচি, আমার সব লোককেই বুড়ী ক্ষেপিয়ে দেবে! ওঃ আমার বুকের দুপদুপুনি যে আবার বেড়ে উঠল।"

আধঘণ্টা পরে তিনি আবার নবীনকে ডাকলেন। নবীন এলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিহে, ব্যাপার কি?"

নবীন বললে, "স্যার, আমাদের সাধ্যি কি যে, ও বুড়ীকে বোঝাই! আমরা বলি এককথা, আর ও বলে এক কথা!"

পাশের ঘর থেকে আবার বুড়ীর গলা শোনা গেল।

বিরিঞ্চি চেয়ারের উপরে এলিয়ে পড়ে বললেন, "ওঃ, ওর গলার আওয়াজও আর আমার সহ্য হচ্চে না! আমার বাতের ব্যথা আর বুকের অসুখ আবার বেড়ে উঠ্‌চে। তাইতো, কি করি, কিসে এ আপদ বিদেয় হয়!"

নবীন বললে, "দরোয়ান ডেকে ওকে আপিস থেকে বের ক'রে দেব নাকি?"

বিরিঞ্চি সভয়ে ব'লে উঠলেন, "না,—না—খবর্দ্দার! তাহ'লে বুড়ী বেজায় গোলমাল বাধিয়ে দেবে! এ বাড়ীতে আরো তিনটে আপিস আছে, তারা ভাববে আমরা স্ত্রীলোকের ওপরে অত্যাচার করচি! তার চেয়ে বুড়ীকে কোনরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভালোয় ভালোয় এখান থেকে সরিয়ে দাও!"

খানিক পরে শোনা গেল, বিল-সরকার হতাশ ভাবে বলছে, "তোমাকে বোঝানো ভগবানেরও সাধ্যি নয়, উঃ—ব'কে ব'কে আমার গলা কাঠ হয়ে গেল!"

বিরিঞ্চি নিজের মনে বললেন, "অসম্ভব-রকম নাছোড়-বান্দা স্ত্রীলোক! আমার বাতের ব্যথা আর বুকের দুপ্‌দুপুনি ক্রমেই বেড়ে উঠচে যে!"

নবীন তখন আর রাগ সাম্‌লাতে না পেরে বুড়ীকে গিয়ে বললে, "দ্যাখো, তুমি এই বেলা মানে মানে সরে পড়, আমাদের আর পাগল কোরো না বল্‌চি।"

বুড়ী আহত স্বরে বললে, "চুপ, মুখ সাম্‌লে কথা কও!"

নবীন অধীর স্বরে বললে, "বুড়ী, ভালো চাও তো এখান থেকে বিদায় হও!"

বুড়ী ফোঁস ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, "কী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমাকে গরিব নাচার অবলা পেয়ে অপমান করা! জানিস, কর্ত্তা জান্‌তে পারলে তোকে আর আস্ত রাখবে না! বোস তো, আমার বোনপো পুলিসের জমাদার, আমি এখুনি গিয়ে তাকে ডেকে আন্‌চি!" বুড়ীর স্বর ক্রমেই চড়্‌তে লাগল।

পাশের ঘর থেকে ব্যস্ত হয়ে বিরিঞ্চি আবার বেরিয়ে এলেন। দুইহাতে চেপে বুকের দুপ্‌দুপুনি বন্ধ করতে করতে তিনি বল্‌লেন, "কি, কি, কি হয়েচে, এত হট্টগোল কেন?"

বুড়ী উত্তেজিত ভাবে বললে, "দ্যাখো বাবা, দ্যাখো! এই⋯ ⋯এই লোকটা বলে কিনা বুড়ী⋯ ⋯বিদায় হ,⋯ এত অপমান আমি কখনো সইব না, আমার বোনপো পুলিসের জমাদার!"

বিরিঞ্চি মিনতির স্বরে বল্‌লেন, "বাছা, তুমি অত চেঁচিও না! যে তোমাকে অপমান করেচে, আমি তাকে শাস্তি দেব অখন। তুমি আস্তে আস্তে বাড়ী যাও, আজ আমার শরীর বড় খারাপ!"

বুড়ী বললে, "তাহলে আমার কর্ত্তার চাকরির কি হবে? আর আমার আটটা টাকা?"

বুড়ী ফের গোড়া থেকে সুরু করে দেখে বিরিঞ্চি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "তোমাকে তো আমি বলেচিই, রেল-আপিসের ওপরে আমার কোনই হাত নেই!"

বুড়ী বললে, "বাবা, সত্যি বলচি আমার কর্ত্তার বড় অসুখ করেচে, এই দ্যাখো ডাক্তারের চিঠি!"

বিরিঞ্চি খানিকক্ষণ বোবার মত চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বল্‌লেন, "তোমার স্বামীর মাইনে থেকে আটটাকা কেটে নিয়েচে তো?"

বুড়ী বল্‌লে, "হ্যাঁ বাবা, অন্যায়টা দ্যাখো একবার!"

বিরিঞ্চি নিজের পকেটে হাত দিয়ে বল্‌লেন, "এই নাও আটটা টাকা। এখন বাড়ী যাও!"

একগাল হেসে, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে টাকা আটটা নিয়ে বুড়ী বল্‌লে, "বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো! তাহ'লে আমার কর্ত্তার চাকরির জন্যেও তুমি তো রেল-আপিসের সায়েবকে ব'লে দেবে?"

⋯"ওঃ, আমার বুকের অসুখ ভারি বেড়ে উঠল—আমি বাড়ী চল্‌লুম, হা ভগবান—" বল্‌তে বল্‌তে বিরিঞ্চি তখনি আপিস থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন যথাসময়ে আপিসে এসে বিরিঞ্চি দেখলেন, বুড়ী ঠিক সেইখানেই, কালকের মতই ঘোমটা টেনে, একখানা পুরানো আলোয়ান গায়ে চড়িয়ে তাঁর অপেক্ষায় বসে আছে!

বিরিঞ্চির চোখের সাম্‌নে সারা পৃথিবীটা ধোঁয়ার মত ঝাপ্‌সা হয়ে গেল।

বুড়ী কিছু বলবার আগেই একটা ঢোঁক গিলে তিনি বল্‌লেন, "তোমার স্বামীকে আমার আপিসে আসতে বোলো। এইখানেই সে চাকরি করবে।"*

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

---

* বিদেশী গল্পের ছায়া অনুসরণে

মারাঠা ইতিহাসের শিক্ষা

বাঙ্গালা দেশে মারাঠা ইতিহাসের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যায় না, কারণ অনেক বাঙ্গালী ছাত্র ও অধ্যাপকের মতেই মারাঠা ইতিহাস যুদ্ধ-বিগ্রহের নীরস তালিকা মাত্র। শিবাজীর অভ্যুত্থানের সময় হইতে দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের পতনের কাল পর্য্যন্ত মারাঠা জাতি কেবল যুদ্ধই করিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণ ত উত্যক্ত হইয়াছেই, মহারাষ্ট্রের পল্লীবাসীগণও শান্তিতে থাকিবার সুযোগ পায় নাই। কারণ বাহিরের যুদ্ধ না থাকিলে মারাঠা সর্দ্দারেরা পরস্পরের সহিত গৃহবিবাদে ব্যাপৃত হইতেন। কেবল বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনা কাহারও ভাল লাগিবার কথা নহে। কিন্তু যুদ্ধ মাত্রের বর্ণনাই নীরস নহে—যদি সেই অশান্তির ভীষণ কাহিনীর অন্তরালে যে কারণ-পরম্পরা লুক্কায়িত থাকে তাহা চিত্তাকর্ষক হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় অসংখ্য নরহত্যা হইয়াছিল, বিপ্লববাদীরা সাম্য ও স্বাধীনতার নামে বহু অবিচার অত্যাচার করিয়াছিলেন, য়ুরোপের বহু দেশে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। তথাপি ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস কেহ যুদ্ধবিগ্রহ ও নরহত্যার তালিকা বলিয়া উপেক্ষা করেন না, কারণ এই নরহত্যা, অবিচার ও অত্যাচারের পশ্চাতে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্পর্কের মীমাংসা হইতেছিল, প্রজার প্রতি রাজার দায়িত্ব নির্দ্ধারিত হইতেছিল, রাষ্ট্রের অধিকার ও তৎসঙ্গে রাষ্ট্রের অঙ্গ ও অংশ মানবের অধিকার স্বিরীকৃত হইতেছিল। বহুকাল হইতে বহু মনীষির চিত্তে যে সকল সমস্যার উদয় হইয়াছিল ফরাসীবিপ্লবে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য সেই সমস্যার সমাধান হইয়াছিল; সুতরাং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহের তালিকা মাত্র নহে, পরস্পর-বিরোধী ভাব, অধিকার ও দায়িত্বে দ্বন্দ্বের ইতিহাসে,সুতরাং সকলেরই অবশ্যপাঠ্য।

আপাতঃ দৃষ্টিতে মারাঠা ইতিহাসের বিষয়ীভূত অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের মূলে এরূপ দ্বন্দ্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, সুতরাং মধ্যযুগের হিন্দুজাতির শেষ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা আধুনিক হিন্দু বাঙ্গালীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

ভাবিয়া দেখিলে কিন্তু মারাঠা ইতিহাসেও পরস্পর-বিরোধী ভাবের সংঘাত দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ ব্যতীত কার্য্য যখন হয় না, রাজ্যের ও রাজার, জাতির ও জাতীয় শক্তির উত্থান-পতন, আবির্ভাব ও তিরোধান যখন কেবল সামরিক শক্তির অভাব বা পশুবলের অভাবে হইতে পারে না, তখন মারাঠা ইতিহাসের অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের পশ্চাতেও এমন প্রভাবের বা প্রভাব সমষ্টির অস্তিত্ব ছিল, যাহার নিরাকরণ বা সমন্বয় করিতে না পারাতেই আজ শিবাজীর মহারাষ্ট্র লোপ হইয়া গিয়াছে। এই প্রভাব বা সমষ্টির বিরোধের ইতিহাস আধুনিক বাঙ্গালীর নিকট উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না।

মারাঠা জাতি চিরকালই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা অত্যন্ত উৎকট হইলেও অবস্থা-বিশেষে হয়ত স্বাধীনতা-প্রিয়তায় পরিণত হইতে পারিত কিন্তু তাহা হয় নাই, এবং তাহার কারণও আর কিছুই নহে—মারাঠা 'বতন'দারের উৎকট 'বতন'-প্রিয়তা। আরবী 'বতন' শব্দের অর্থ বাড়ী, কিন্তু মারাঠা ভাষায় উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত জমিজমা, চাকরী বা ঐরূপ যে-কোন অধিকারকেই বতন বলা হয়। কোন মারাঠাই কোন কারণে আপনার বতন হারাইতে সম্মত হইত না। তাহাদের নিকট বতনের স্থান দেশের অপেক্ষাও উচ্চে। যখন মুসলমানেরা প্রথমে দক্ষিণাত্যে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করেন, তখনও মারাঠারা বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করে নাই। যাদব-বংশের পতন হইলেও মহারাষ্ট্রের পার্ব্বত্য প্রদেশে বহু মারাঠা বতনদার নিজ নিজ বতনের জন্য মুসলমান নরপতির বিপুল বাহিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জমিদারকে বশে আনিতে সেকালের মুসলমান নরপতি-গণকে কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার গ্রন্থে আছে। অবশেষে মারাঠারা যখন মুসলমানের প্রাধান্য স্বীকার

করিলেন, তখনও মুসলমান নরপতিগণ তাঁহাদের বতনে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা নামে মাত্র সম্রাটের সামন্ত, কিন্তু নিজ নিজ জমিদারীর মধ্যে তাঁহারা স্বাধীন। এই বতন-প্রিয়তা যেমন তাহাদিগকে মুসলমান রাজাদিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস জোগাইয়াছিল, তেমনি আবার সমগ্র মহারাষ্ট্রের ঐক্য-স্থাপনেরও অন্তরায় হইয়াছিল। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক।

অনেক সময়েই দেখা যাইত যে একই বতনের অনেক দাবীদার আছে, আর বতনের দাবা সহজে বা শীঘ্র মিটিত না। মনে করুন, পুনার লোহারকী বতনের প্রকৃত মালিক দুর্ভিক্ষের তাড়নায় দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে বা তাহার পুত্র বা পৌত্র পৈত্রিক বাসভূমিতে ফিরিয়াও আসিলনা বা পৈত্রিক বতনের দাবী করিল না। প্রপৌত্রের মনে পড়িল লোহারকী বতনটার প্রকৃত উত্তরাধিকারী সে; সে পুনায় ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে অন্য লোহার শহরের সমস্ত কাজ একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছে। তিন পুরুষ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে মনে করিতেছে যে সেই খাঁটি বতনদার। অতএব একপ্রস্থ ফৌজদারী ও দেওয়ানী আরম্ভ হইয়া গেল, যাহা দুই দাবীদারের একজন একবারে নির্ব্বংশ না হইলে মিটিবার নহে। লোহারকী বতনের বিবাদ জাতীয় ঐক্যের অন্তরায় না হইতে পারে, কিন্তু দেশমুখী বা তদ্রূপ কোন জমিদারী অধিকার লইয়া বিবাদ হইলেই ত মুস্কিলের কথা। কোন দাবীদারই সহজে নিজের দাবী ছাড়িবে না। পুরুষানুক্রমে হত্যা ও বিচার চলিতে থাকিবে। একপক্ষ হয়ত কোন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে হাত করিয়া জমিদারি দখল করিয়া বসিবে; রাজার ভয়েও কিন্তু অন্য পক্ষ নিজের দাবী ত্যাগ করিবেনা। তাহারা রাজার প্রতিপক্ষের আশ্রয় লইবে এবং তাহার সাহায্যে নিজেদের দাবী সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইবে। এই কারণেই বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় একদল যেমন দেশের তদানীন্তন অধিকারীর পতাকা-মূলে সমবেত হইত, তেমনি আর একদল যাইত আক্রমণকারীর সাহায্য করিতে। মহারাষ্ট্রে শিবাজীর অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে ও পরে এইরূপ গৃহবিবাদ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। ইহার ফল কিরূপ ভীষণ হইত তাহা দেশমুখদিগের বংশ-কাহিনী পাঠ করিলেই বোঝা যায়। নিম্নে জেধে ও খেপেড়েদিগের বংশানুক্রমিক বিবাদের ইতিহাস দেওয়া গেল। একটি বতনের অধিকার লইয়া এই দুই বংশের শত্রুতা আরম্ভ হয়।

জেধেরা দুই ভাই। এক ভাই বতনের ফরমান লইয়া রাজধানী হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীদার খেপেড়ে কর্ত্তৃক নিহত হন। অপর ভ্রাতা বাজী এই আকস্মিক বিপদপাতে সমুদ্র-তীরে পলাইয়া গেলেন; কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। জ্যেষ্ঠের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির কিয়দংশ ব্যয় করিয়া তরবারি-চালনায় সুদক্ষ ১২জন লোক নিযুক্ত করিলেন এবং আরও কিছু লোক সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। এই সুযোগ মিলিল খেপেড়ের বিবাহ-কালে। বিবাহের অব্যবহিত পরেই বাজী জেধে ও তাহার অনুচরেরা খেপেড়ে ও তাহার সঙ্গীগণকে হত্যা করে। বাজীর বংশধর কাহ্নোজী এমন প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠেন যে তিনি আদিলশাহী সুলতানের ক্ষমতাও অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার সাত পুত্র। সর্ব্বকনিষ্ঠ নাইকাজি সুলতানের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা সেই রাগে কনিষ্ঠকে হত্যা করে। নাইকাজীর বিধবা অনসবা স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য দুইজন ভাসুরের হত্যা করে। স্বামীর অপর ভ্রাতারা ইহার প্রতিশোধ লয় ভ্রাতৃজায়ার প্রাণ লইয়া। অনসবার শিশু পুত্রকেও তাহারা মারিয়া ফেলিত কিন্তু তাহার ধাত্রী তাহাকে লইয়া শিবাজীর সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি বাজী পসলকারের আশ্রয় গ্রহণ করে। বড় হইয়া নাইকাজীর পুত্র কাহ্নোজী বানদল দেশমুখের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়। এই কলহের মীমাংসা হয় কাহ্নোজী জেধে শিবাজীর সেনাদলে প্রবেশ করিবার পর। খেপেড়েদিগের শক্তি অনেকটা কমিয়া আসিলেও তাহারা একেবারে নির্ব্বিষ হয় নাই। জেধে শিবাজীর অনুচর, অতএব শিবাজীর ও তৎসঙ্গে জেধের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য খেপেড়ের বংশের তৎকালীন

প্রতিনিধি আফজল খাঁর সহিত যোগদান করিয়াছিল। এইরূপ সেকালের যে কোন জমিদার-বংশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, তাঁহারা সর্ব্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহে মত্ত থাকিতেন, আর এই সকল সুদীর্ঘ কলহ হইত বতনের স্বত্বাধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য, কারণ বতন ছিল তাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। এই বতনপ্রিয়তাই তাহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় করিয়াছিল, ইহাই তাহাদের অনৈক্যের কারণ।

যদি এই বতনানুরাগ জনিত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার কোন প্রতিষেধক শিবাজী আবিষ্কার করিতে না পারিতেন, তবে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মহারাষ্ট্রকে এক 'ধর্ম্মরাজ্য-পাশে' বন্ধন করিবার কল্পনা নিতান্তই অলীক স্বপ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত। শিবাজী এই বতনানুরাগিতা ও স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে আর কাহাকেও কোন চাকরীর পুরস্কার স্বরূপ জায়গীর দেওয়া হইবে না। সরকারী কোন চাকরীতে কাহারও পুরুষানুক্রমিক দাবী থাকিবে না। এমন কি অনেক দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেকে তিনি জমিদারী চালনার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন এবং তৎসঙ্গে মহারাষ্ট্রের আপামর সাধারণের প্রাণে একটা জাতীয় ভাবের উন্মেষ করিবার চেষ্টা পাইলেন। শিবাজী মারাঠা জাতির হৃদয়ে যে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বাংশে পশ্চিম হইতে আমদানী Nationality বা National ideasএর অনুরূপ নহে। তিনি চাহিতেছিলেন দক্ষিণ ভারতে মারাঠার প্রাধান্য। এক বিরাট হিন্দু সাম্রাজ্যের চিন্তা মুঘল সাম্রাজ্যের সেই সর্ব্বোচ্চ সমৃদ্ধির দিনে তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়াছিল কি না বলা কঠিন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ কাশিনাথ রাজবাড়ে তাঁহার মারাঠা ইতিহাসের উপাদান নামক গ্রন্থের পঞ্চদশ খণ্ডে ২৭২ পৃষ্ঠায় দাদাজী নরস প্রভুর নিকট লিখিত শিবাজীর একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়াছেন। ঐ পত্রে হিন্দবী স্বরাজ্যের কথার উল্লেখ আছে। অধ্যাপক সরকার ঐ পত্রের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। শিবাজীর সর্ব্বপ্রথম চরিত-কার কৃষ্ণাজী অনন্ত সভাসদের গ্রন্থে মারাঠা পাদশাহ ও মারাঠা পাদশাহীর কথাই আছে, হিন্দু পাদশাহীর কথা নাই। হিন্দু পদ পাদশাহী পেশবা যুগের কথা, প্রথম বাজীরাওয়ের জীবনের আদর্শ। শিবাজীর গুরু ও বন্ধু রামদাসের রচনায় মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবাজীর বাহুবলে নিরুপদ্রবে স্নান-সন্ধ্যা করিবার সুবিধার কথা আছে, কিন্তু তাঁহারও বোধ হয় লক্ষ্য ছিল—মারাঠা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দিকে। শিবাজীর মৃত্যুর পরে তিনি শম্ভাজীকে লিখিয়াছিলেন—মারাঠা তিতকা মেড় বাজ, মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম বাঢ়বাবা—সকল মারাঠাদিগকে একত্রিত করিও, মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের প্রসার সাধন করিও। এখানেও তিনি মারাঠা এবং মহারাষ্ট্র ধর্ম্মেরই কথা বলিতেছেন, সমগ্র হিন্দু জাতির কথা বলেন নাই! সভাসদে মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় নাই। শিবাজীও মুসলমান ধর্ম্মের দ্বেষ্টা ছিলেন না। সুতরাং Hindu Nationএর কথা তিনি বা তাঁহার গুরু রামদাস কখনও ভাবেন নাই। তাঁহারা ভাবিতেন মারাঠা Nationএর কথা। এখন কিন্তু মারাঠা Nation, Hinduএর Nation মতই পরিহাসের বিষয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে পাশ্চাত্য লেখক মারাঠা Nation, শিখ Nation, Rohilla Nation প্রভৃতি বাক্যের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। এখনকার মত তাঁহাদের যুগে Nationalর ideaটা পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি হয় নাই। শিবাজীও যে ভাবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, তাহা এখনকার জাতীয় ভাবের অপেক্ষা অনেক সঙ্কীর্ণ। কিন্তু অন্ততঃ তাঁহার জীবিতকালে এই নব উদ্বুদ্ধ জাতীয় ভাবে বহু মারাঠা বীর অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, নহিলে তাহারা শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য অমন করিয়া প্রাণপাত করিতে পারিত না।

মারাঠা ইতিহাসে বরাবর এই দুই পরস্পর-বিরোধী প্রভাবের ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়া আসিয়াছে। জাতীয় ঐক্য ও অনৈক্য জনক এই দুইটি প্রভাবের দ্বন্দ্বের কথা মনে রাখিলেই মারাঠা সাম্রাজ্যের স্থিতি, বিস্তৃতি ও বিলোপের তত্ত্ব সম্যক রূপে বোঝা যায়। শিবাজী কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ জাতীয় ভাব মারাঠাদিগের চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা

দূর করিতে পারে নাই, আর রত্নানুরাগও শিবাজীর সময় হইতে তাহাদের জাতীয় ভাব একেবারে বিলুপ্ত করে নাই। ফলে শান্তির সময় মহারাষ্ট্র গৃহ-বিবাদে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে, আর জাতীয় বিপদের দিনে ছোট বড় প্রায় সকলেই জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ভগবা ঝেণ্ডার মূলে সমবেত হইয়াছে। শিবাজীর জীবিতকালে তাঁহার প্রতি বৈরি ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া খেপেড়ে ও মোরেগণ আফজল ও জয়সিংহের সহিত যোগ দিয়াছিল। এমন কি তাহার একদা বিশ্বস্ত পার্শ্বচর অমিতবলশালী শাস্তাজী কাবজীও সামান্য কারণে সায়েস্তা খাঁর সহিত মিলিত হইতে ইতস্ততঃ করে নাই। আবার তানাজী মালকুচর বাজী প্রভু বাজী পসলকর প্রভৃতি যেরূপে প্রভুর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্যও মনে হয় না যে, তাহারা কেবল হীন স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইত। শাম্ভাজীর রাজত্ব কালেও বোধ হয় তাঁহার মন্ত্রিগণ রাজ্যের বিপদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, তাই শাম্ভাজীর সময় অন্নাজী দত্ত ও মোরোপন্ত পিঙ্গবলের প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দুই জনেই শিবাজীর অধীনে সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছে। শাম্ভাজীর মৃত্যুর পরে মারাঠা-সাম্রাজ্য নিতান্ত বিপন্ন। একে একে সমস্ত গিরি-দুর্গই মুঘলের হস্তে পতিত হইল। রাজধানী রায়গড়ও এই দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাইল না। শিশু শাহু তাহার মাতা ও কয়েকজন পিতামহীর সহিত মুঘল হস্তে বন্দী হইল। মারাঠা জাতির সেদিন বড়ই সঙ্কটের দিন। সেই দুর্দ্দিনে কেবল স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইলে কিছুতেই মারাঠা সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিত না। কিন্তু এই সময় মারাঠা জাতি যে দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়-জনক। শাম্ভাজীর পত্নী য়েসু বাই স্বয়ং রাজারামকে মারাঠা সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজারাম জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া দূর কর্ণাটকের ও জিঞ্জিতু দুর্গে আশ্রয় লইলেন। রাজা বন্দী, রাজপ্রতিনিধি পলাতক, রাজ্য শত্রু-অধিকৃত, আর সে শত্রুও নগণ্য নহে, মারাঠা জাতির ধ্বংস-সাধনে বদ্ধপরিকর বহু-সমর-বিজয়ী সম্রাট ঔরংজীব স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু সেদিনও প্রহ্লাদ নিরাজী বাজী যাদব ও শান্তাজী ঘোড়পারে প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধা অকুতোভয়ে মুঘলের প্রতিকূলতা করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে ঔরংজীব হতাশ হইয়া দক্ষিণে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। দক্ষিণের বিরাট অভিযান, এত উদ্যোগ, এত আয়োজন, এত অর্থব্যয় একেবারেই ব্যর্থ হইল! মারাঠা-দিগের নেতা রাজারাম নিজের দেশে ফিরিলেন, মারাঠা জাতি ও শিশুসাম্রাজ্য নিরাপদ হইল, আর অমনি সেই সুপ্ত অনৈক্যের প্রভাব মারাঠাদিগের মধ্যে আবার জাগিয়া উঠিল,—আবার তাহাদের মধ্যে গৃহ-কলহের সূত্রপাত হইল। জাতীয় দুর্দ্দিনে যে দুই বীরের নেতৃত্বে মারাঠা সেনা মুঘলের সহিত যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়াছিল, তাঁহারাই পরস্পরের প্রতিকূলতাচরণ করিতে লাগিলেন! ধনাজী যাদবের সহিত শান্তাজী ঘোড়পারের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। সেই কলহে শান্তাজী প্রাণ দিলেন, আর তাঁহার বংশধরেরা স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মুঘল-অধিকারে চলিয়া গেলেন। শাহুর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরও কিন্তু অনেক মারাঠা অতুল প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দরাও চিটনীসের নাম সমধিক উল্লেখ-যোগ্য। চিটনীসের বহু আত্মীয় শাম্ভাজী কর্ত্তৃক নিরপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দ বল্লাল দেশের নিমিত্ত সে সকল বিস্মৃত হইয়াছিলেন। শাহু সাতারার সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ধনাজী যাদবের পুত্র চন্দ্রসেন যাদব মুঘলের সঙ্গে যোগদান করেন। নিজাম উলমুলক প্রায়ই মারাঠা-দিগের গৃহকলহের সুযোগে নিজের সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে সম্পদের সময়ে কলহ ও বিপদের সময় ঐক্যই মারাঠা ইতিহাসের মূলসূত্রে পরিণত হইয়াছিল। মারাঠা জাতির পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বেও কার্দ্দালার রণক্ষেত্রে সিন্ধিয়া, হোলকার, গাইকবার, ভোঁসলে, পটবর্দ্ধন, ফড়কে বিঞ্চুরকর রাষ্টিয়া প্রভৃতি ছোট বড়, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, নূতন পুরাতন সকল সর্দ্দারই পেশবার প্রাধান্য রক্ষা করিতে নিজামের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে

সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু তার পরেই আবার গৃহ-বিবাদের কুৎসিত কোলাহল। নানা ফড়নবীসের সহিত সিন্ধিয়ার শত্রুতা, সিন্ধিয়ার ও নানার সহিত পটবন্ধনের প্রতিযোগিতা, দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত যশোবন্ত রাও হোলকারের কলহ, সেই কলহের ফলে দ্বিতীয় বাজীরাওএর পুনা হইতে পলায়ন ও ইংরেজের সহিত সন্ধি স্থাপন। এই সন্ধি স্থাপনের ফলেই কিন্তু আবার মারাঠা সর্দ্দারদিগের অন্তর্কলহ আশ্চর্য্যভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মিটিয়া গেল। হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে সকলেই বুঝিলেন যে, অদূরদর্শী পেশবার কার্য্যের ফলে তাঁহারা সকলেই স্বাধীনতা হারাইতে বসিয়াছেন, মারাঠা-সাম্রাজ্যের অন্তিমকাল উপস্থিত হইতে আর বিলম্ব নাই; সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্ব বৈর বিস্মৃত হইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডফ বলেন যে, এই সময় যশোবন্ত হোলকার নিরপেক্ষ থাকিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সিন্ধিয়াকে সর্ব্বনাশের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু হোলকারের পরম মিত্র পিণ্ডারী সর্দ্দার আমীর খাঁ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সেরূপ দুরভিসন্ধি হোলকারের ছিল না। সিন্ধিয়া যখন আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ হস্তে পরাজিত, তখনও হোলকারের সমরায়োজন সমাপ্ত হয় নাই, তাই তিনি সিন্ধিয়ার বিপদের দিনে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন নাই। যদি মারাঠা-সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁহার মমতা না থাকিত, তবে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার পরাজয়ের পরে একাকী ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দুঃসাহস যশোবন্ত করিতেন না, কারণ শত্রু মিত্র সকলেই একবাক্যে তাঁহার বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজের হস্তে মারাঠা সর্দ্দারদিগের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় কেন হইল; তাহার আলোচনা করিবার স্থান এ নহে। এখানে কেবল এইটুকু মনে রাখিলেই চলিবে যে, বহিঃশত্রু নিজামের পরাজয়ের পরেই গৃহকলহে প্রবৃত্ত হইলেও, মারাঠা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আর একটি প্রবল শত্রুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই হোলকর, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা পূর্ব্ববৈর বিস্মৃত হইয়া জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সত্য বটে, দাক্ষিণ মহারাষ্ট্রের কয়েকটি নগণ্য ব্রাহ্মণ সর্দ্দার এই সময়ে ইংরেজের সহায়তা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের নগণ্য ব্যতিক্রম বলিয়া উপেক্ষা করিলে অন্যায় হইবে না। মোটের উপর মারাঠা রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস আলোচনা করিলে পূর্ব্বোক্ত পরস্পর-বিরোধী প্রভাবদ্বয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের দৃষ্টান্ত সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সামরিক দৌর্ব্বল্য মারাঠা-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ নহে, কারণ অতি অল্প দিন পূর্ব্বেও তাহারা নিজামের নিকট হইতে অর্দ্ধেক রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিল। জাতিভেদ, জাতি-বিরোধও তাহার কারণ নহে, কারণ জাতিভেদ ও জাতি-বিরোধ ত মহারাষ্ট্রে শিবাজীর অভ্যুত্থানের সময় হইতেই বিদ্যমান এবং তাহা সত্ত্বেও মারাঠা সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি ও প্রসার ব্যতীত হ্রাস বা সঙ্কোচ হয় নাই। মারাঠাদিগের পতনের আসল কারণ জাতীয় ভাবের সহিত প্রাচীন স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার বিরোধ। এই দ্বন্দ্বে যদি জাতীয় ভাবের জয় হইত, তাহা হইলে মারাঠা সাম্রাজ্যের অত শীঘ্র বিলোপ হইত না। শিবাজী মারাঠার জাতীয় চরিত্র হইতে অনৈক্যের ভাব ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু এক জীবনে এত বড় পরিবর্ত্তন সংঘটন করা যায় না। তাঁহার পুত্র শম্ভাজী বাসনাসক্ত ছিলেন, তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার অবসর পান নাই, প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল, জমিদারী ও জায়গীর। শিবাজী সামরিক জায়গীর প্রথা একেবারে রহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। রাজারাম অবস্থা-বৈগুণ্যে এই সামরিক জায়গীর-প্রথারই প্রসার সাধন করিতে বাধ্য হন। তিনি যখন মহারাষ্ট্র হইতে পলাতক, তখনও অনেক মারাঠা সর্দ্দার তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, বিনিময়ে তাহারা বিজিত প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ চাহিয়া লইয়াছে, কারণ নিয়মিত বেতন দিবার মত অর্থ অথবা ক্ষমতা রাজারামের ছিল না। এইভাবে ঐক্যের প্রতিকূল জায়গীরগুলি লোপ না পাইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পেশবা আমলেও এই নিয়মই চলিতে লাগিল। বড় বড়

মুৎসুদ্দি, বড় বড় সেনাপতি সকলেই জায়গীর পাইতে লাগিলেন, সুতরাং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা দূর না হইয়া বেশ দৃঢ় ভাবে স্থায়ী হইল ও মারাঠা-সাম্রাজ্যে গৃহকলহ উৎপাদন করিতে লাগিল। ইহাতে আরও একটা বড় রকমের বিঘ্ন হইল। যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত পেশোয়ারা রাজশক্তি সুদৃঢ়ভাবে জাতীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না, সুতরাং মারাঠা-সাম্রাজ্যে সামরিক জায়গীর প্রথার feudalism বিষময় প্রভাব বাড়িয়াই চলিল। এই অবস্থায় মারাঠা-সাম্রাজ্য যে দেড় শতাব্দীকাল স্থায়ী হইয়াছিল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। জাতীয় বিপদের দিনে মারাঠাগণ যদি সামরিক ও জাতীয় ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইত, তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই স্বাধীন জাতি হিসাবে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজ আবার 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত' একরাজ্য-পাশে বাধা পড়িয়াছে। আজ আবার জাতীয় ভাবের উন্মেষ হইয়াছে এবং সেইসঙ্গে জাতীয় চরিত্রের বহু দৌর্ব্বল্যও বাহির হইয়া পড়িতেছে। এখন মারাঠা ইতিহাসের শিক্ষা ভুলিলে চলিবে না। কি কারণে ভারতবর্ষে শেষ হিন্দু সাম্রাজ্যের পতন হইল, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ভাবিয়া দেখিতে হইবে, সেই সকল কারণ এখনও বর্ত্তমান কি না? ভাবিয়া দেখিতে হইবে, তাহার প্রতিকার কি? নতুবা আইন-মজলিসে বক্তৃতা করিয়া বাঙ্গালী পৃথিবীর মধ্যে নিজের হারানো স্থান ফিরিয়া পাইবে না। এইজন্যই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের ইতিহাস আলোচনা করা বাঙ্গালী পিতা ও বাঙ্গালী পুত্রের আজ বিশেষ করিয়াই আবশ্যক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

নারীর প্রতি অবিচার

নারীর প্রতি পুরুষের যে অবিচার, যে অবহেলা, যে অসম্ভব ঘৃণা, তার কি কোন প্রতিকার নেই? পুরুষ জানেন, প্রতিকার তাঁদেরই হাতে. তাই যে-নারীজাতি তাঁদের সেবায় অকুণ্ঠিতা, যে নারী জাতি সুখে-দুঃখে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁদের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে পারে, সেই নারীজাতিকে তাঁরা খেলার পুতুল মনে করেন, স্বার্থের যন্ত্র-স্বরূপ বিবেচনা করেন, তাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করেন!

তাঁরা ভুলে যান যে, এই নারীজাতিকেও ভগবান গড়েছেন, তাদের দেহও রক্ত-মাংসে তৈরি. তাদেরও হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, ভাল মন্দ বোঝবার ক্ষমতা আছে, সুখ-দুঃখ অনুভব করবার সামর্থ্য আছে। তাঁদের একবারও মনে হয় না যে স্নেহ প্রেম ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখে, তাঁদের সকল বিপদে বুক পেতে দিয়ে যারা তাঁদের পায়ে যাতে কুশাঙ্কুর না বেঁধে দিন-রাত এই চেষ্টা করচে—তাদের প্রতি কি অবিচার, কি অত্যাচার, কি দুর্ব্যবহারই না তাঁরা করচেন!

তারা তো বেশী কিছু চায় না—তাদের ন্যায্য প্রাপ্যটুকু দাবী করে মাত্র। তাদের কি তাও পাবার অধিকার নেই? নারীজাতি কি পশুরও অধম যে পুরুষ তাঁদের পালিত কুকুর-বিড়ালকেও আদর করেন, অথচ নারীকে কঠোর শাসনে অযথা নিষ্পেষিত করবেন? মিষ্ট কথায় মিষ্ট ব্যবহারে কি পুরুষদেরই একচেটে দখল?

আজকাল অনেক ঘরেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, কথায় কথায় স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করেন। 'দোষ তার থাক্ বা না থাক্, তাঁর ইচ্ছা তাকে নিয়ে তিনি ঘর করবেন না,—ব্যস্—মেরে-ধরে তাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিলেন, তাঁর গৃহদ্বার তার জন্যে চিরুদ্ধ হয়ে গেল। এর উপর কারো কিছু বল্‌বার বা করবার ক্ষমতা নেই, কারণ তিনি স্বামী, প্রভু, তিনি যা করবেন তাই হবে।

এই রকমে কত শত নারী-জীবন যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, তার ঠিক নেই। দেবতা সাক্ষ্য করে, অগ্নি সাক্ষ্য করে, মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বিবাহ, সহধর্ম্মিণী ব'লে গ্রহণ,—এ কি মিথ্যা, এ কি কপটতা, এ কি ছেলেখেলা? না, এ জীর্ণ বস্ত্র-পরিত্যাগ যে, ত্যাগ করলেই হলো? এর কোনই প্রতিকার নেই,—কারণ নারী পরাধীনা, দুর্ব্বল, আর তিনি পুরুষ, স্বামী এবং সবল!

স্বামী অত্যাচারীই হোন্, আর দুশ্চরিত্রই হোন্, তাঁর পদাঘাত ও প্রহার স্ত্রীকে হাসিমুখে সহ্য করতেই হবে। মুখখানি বিরস করবার অধিকার পর্য্যন্ত তার নেই; কারণ স্বামী দেবতা। অত্যাচারী মাতাল স্বামীর হাতে নিপীড়িতা সর্ব্বরূপগুণসম্পন্না একজন সাধ্বী নারীকেও একদিন বিচলিতা হয়ে তার সঙ্গিনীর কাছে বল্‌তে শুনেছি, "ভাই, আমি নিজের জন্যে ভাবিনা, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের মুখ চেয়ে মনে হয় যে, দূর ছাই, স্বামীর অন্ন আর গ্রহণ করবো না, ভিক্ষে করে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করবো।" কত কষ্টে, কত ব্যথায় যে এ কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল, তা তার অন্তর্যামীই শুধু জানেন। এমন ধৈর্য্যশীলা যে নারী, তাকেও যে তার অটল ধৈর্য্য ও সহ্য করবার শক্তি থেকে টলাতে পাবে, তার যোগ্য বিশেষণ কি, তা জানি না।

বয়স ৬০ বছরই হোক্ আর ৮০ বছরই হোক্, স্ত্রী মরতে না মরতেই পুরুষের বিবাহ খুবই সঙ্গত। কিন্তু মেয়েদের স্বামী গেলে দশ বছর বয়স হলেও তার বিবাহ নিষিদ্ধ। কারণ পুরুষ পুরুষ, আর মেয়ে মেয়ে।

পুরুষ অতি-বড় পাপ-কার্য্য করলেও দোষ নেই, আর মেয়েমানুষ একটু জানলার খড়খড়ি তুলেছে, কি অমনি তার নারীধর্ম্মে আঘাত লাগ্‌লো, অমনি তার পাহারা বসলো, অম্‌নি সে নজরে বন্দী হলো!

এই যে এতখানি ঘৃণা, অবহেলা, অপমান সত্ত্বেও কোন প্রতিবাদ না করে মেয়েরা মুখ বুজে পড়ে আছে, সে কেবল তারা এই বাংলা দেশের মেয়ে বলে, সে কেবল তারা শিক্ষিতা হয়নি বলে, সে কেবল তাদের কণ্ঠ রোধ করে রাখা হয়েছে বলে। শিক্ষিতা মেয়েরা আজকাল বিবাহে নারাজ কেন? যারা নিরবচ্ছিন্ন দুর্ব্যবহারে মাথা ঠিক্ রাখতে পারেনা, তারা আত্মহত্যা ক'রে জ্বালা নিবারণ করে কেন? এ কি পুরুষের অত্যাচারের জন্যে নয়? এর জন্যে কি পুরুষ দায়ী নন্?

আজকাল পুরুষরা চান শিক্ষিতা স্ত্রী, কিন্তু সে কতটুকু শিক্ষিতা? যতটুকু শিক্ষিতা হলে তাঁদের স্বার্থে হাত না পড়ে, ব্যস্, এই পর্য্যন্ত—এর বেশী নয়।

তারপর সভা-সমিতিতে উঁচু গলায় বলেন, "না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" ভারত ললনা তো জাগতে চায়, কিন্তু তাদের জাগ্‌তে দিচ্ছেন না যে তাঁরাই—তাদের জাগাবার কোন চেষ্টাই যে তাঁদের নেই!

গাড়ীতে কোথাও যেতে হবে, হুকুম হলো, "দরজা জান্‌লা বন্ধ কর, কেউ দেখ্‌তে পাবে।" পেলেই বা দেখ্‌তে, আমরা কি এমনি যে, কেউ একটিবার দেখ্‌লেই ক্ষয়ে যাবো? গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে হাঁপিয়ে মরে যাও, তাও স্বীকার, তবু জান্‌লা বন্ধ করে রাখতেই হবে।

আজকাল অনেকেই মেয়েদের অবরোধে রাখেন না সত্য, কেউ কেউ জান্‌লা খোলারও পক্ষপাতী, কিন্তু তাহলেই বা কি হবে? আমরা রাস্তায় বেরুলেই রাস্তার কোন কোন পুরুষ এমন ভাবে আমাদের দিকে চেয়ে দেখেন যে, মনে হয়, আমরা যেন কোন নতুন রকমের জীব! এর কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের বাইরে বেরুনোটা তাঁদের কাছে খুবই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। অথচ পুরাকালে এত কঠোর অবরোধ ছিল না। কোন উৎসবের সময় সহস্র সহস্র প্রজাদের সাম্‌নে রাজার সঙ্গে রাণীও আস্‌তেন। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে আলোচনা আর তর্ক-বিতর্কও করতো, তারও প্রমাণ আছে। আমাদের দেশের প্রথা আমাদের দেশের লোকের কাছেই আজ বেমানান্ ঠেকছে!

মেয়েদের কোথাও যাবার কথা হলেই পুরুষরা বলেন, ওরা ঝী-চাকর সঙ্গে করে কি কখনো যেতে পারে? অথচ নিজেরাও তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাননা, কেন না "পথে নারী বিবর্জ্জিতা"। মেয়েদের যাতায়াত

সম্বন্ধে এত গোলই যদি তাঁদের বাধে, তো দিন্না মেয়েদেরই নিজেদের সে ব্যবস্থা করতে, দেখা যাক্, তারা দুর্ব্বল কি সবল। ক্ষমতা আছে কি না পরখ করে না দেখে, নারীদের তুচ্ছ জ্ঞান করা কি যুক্তি-সঙ্গত? মেয়েরা অপদার্থ, এ কথা শুনে শুনে কান পচে গেল; তারা অপদার্থই হোক্ আর যাই হোক্, বিনা-প্রমাণে তারা এ কথা কখনই মাথা পেতে নেবেনা।

আজকাল অনেকেই বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যান। তাঁদের মুখের চুরুট দেওয়া থেকে গায়ের পোষাক পর্য্যন্ত এবং চাল-চলন সবই সাহেবী ধাঁজেরও হয়, কিন্তু সাহেবদের আগমনে মেয়েদের যে কোথায় লুকোবেন, তা তাঁরা নিজেরাই ভেবে পাননা। সাহেবদের মত সখ টি আছে ষোলআনা, কিন্তু তাদের মত হৃদয়ের বল নেই একপাইও। সাহেবদের মত বুলি আছে মুখে, কিন্তু তাদের মত নারীজাতির প্রতি সম্মানের ভাব নেই কারো বুকে।

নিজেরা শিক্ষিত বলে গর্ব্ব করেন, 'নারীর শিক্ষা' সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দেন, কিন্তু সে সবই অসার আস্ফালন। বাঙালী হিন্দুর ঘরে প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, বিবাহ করে বধূকে আন্‌তে না আন্‌তেই অনেকে বলেন, "তোমরা মূর্খ! তোমাদের বাপ মা তোমাদের কিছু শেখাননি, মেয়েগুলোকে একেবারে মাটি করেছেন" ইত্যাদি। সাধারণতঃ হিন্দুঘরের মেয়েরা বিয়ে হবার পর যখন শ্বশুরবাড়ী আসে, তখন তাদের বারো থেকে পনেরো বছর, এই তো থাকে বয়স। এই বয়সের মেয়েদের তো পুরুষেরা মনের মত শিক্ষা দিয়ে তাঁদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন। তা যদি না পারেন তো সে দোষ নারীর, না, তাঁদেরই?

শুধু বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে দুখানা বই পড়িয়ে, দুটো গান শিখিয়ে মেয়েদের নিয়ে এলেন, আর এই পর্য্যন্ত হয়েই শিক্ষার শেষ হলো। অথচ সুশিক্ষিতা না হবার অপরাধটার জন্যে পীড়ন চলবে মেয়েদেরই উপর। কেন? তারা কি শিখ্‌তে চায় না, তারা কি স্বেচ্ছায় জ্ঞানলাভের পথ রুদ্ধ করে? পুরুষরা তাদের বড় করে তুলুন, তাদের উন্নত করে তুলুন, তাদের সভা-সমিতি করতে দিন, সভা-সমিতিতে তাদের যেতে-আস্‌তে দিন, তাদের সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধা জানাবার স্বাধীনতা দিন, তবেই না বুঝ্‌বো যে তাঁরা মেয়েদের যথার্থই শিক্ষিতা করতে চান।

এখন এত ব্যায়াম, ফুটবল, টেনিস, হকি, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলা সত্ত্বেও ছেলে-পুলেদের অসুখ্ লেগেই আছে, আর আগেই বা কপাটি খেলে, সাঁতার দিয়ে নৌকো বেয়ে তাদের শরীর ভাল থাকতো কেন? পুরুষরা বলেন, এর কারণ হচ্ছে এই যে মায়েরা রুগ্ন, মায়েরা শরীরের যত্ন করে না, মায়েরা দুর্ব্বল। কিন্তু সে কার দোষে? পুরুষের অসুখের জন্যেই নারীর শারীরিক অবনতি নয় কি? তারাই কি ঘরে ঘরে রোগকে বরণ করে আনেন না?

যদি স্ত্রী কোন বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে যান তো তা একেবারেই অগ্রাহ্য, কেননা "স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"! যদি ভ্রাতৃ-বিরোধ বা জ্ঞাতি-বিরোধ হয়, তার জন্যেও দায়ী নারী, কারণ তারা স্বার্থপর। কিন্তু দোষ নারীদের নয়, দোষ পুরুষেরই। কি শিক্ষার স্পর্দ্ধা তাদের, তাঁরা যদি নারীকে বুঝিয়ে না দিতে পারেন—কোন্ কাজ ভাল, আর কোন্ কাজ মন্দ? নারীর সাধ্য কি যে স্বামীর ভ্রাতা-ভগ্নী আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কঠোর আচরণ করে, যদি স্বামী তাকে তাতে না প্রশ্রয় দেন!

ছেলেদের মাতৃভক্তি আর বাপেদের পত্নীপ্রেম শুধু বিবাহ-ব্যাপারে খুব প্রবল হয়ে ওঠে, দেখা যায়। ছেলে বলেন, "মা টাকা নিতে চাইচেন, আমি কি কর্‌বো!" বাপ বলেন, "ওঁরা বলছিলেন, এত ভরির কমে হবে না।" হায়রে, এঁরাই আবার স্ত্রীদের সুশিক্ষিতা করতে চান্! নিজেরা এম-এ বি এ পাশ করেও পুরুষেরা এই পণ নেওয়া ত্যাগ করতে পারচেন না, তবে বিদ্যার প্রভাবে মন কি উন্নত হলো? এই যে বিবাহ, এই যে পবিত্র বন্ধন, এ তো কৌতুক নয়। বিবাহের সময় টাকা দেবার ভাব্‌নায় কন্যা জন্মাবামাত্রই পিতা-মাতা আতঙ্কে শিউরে ওঠেন, এমন কি তাদের বেলায় শঙ্খধ্বনিও নিষেধ, এটা কন্যার

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

দারুণ দুর্ভাগ্য নয় কি? ঘরে ঘরে আইবুড়ো মেয়ে ডাগর হয়ে অর্থাভাবে পাত্রস্থ হতে পারচেনা, তার জন্যে তারা কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করচে, নিতান্ত অসহ্য হলে আত্মহত্যাও করচে। তবু এম এ বি-এদের বিদ্যার পাথর-চাপা বুকে একটু বাজচেনা!

আমরা দয়ার প্রার্থনা করচি না—ন্যায়ত ধর্ম্মত মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে আমাদের যা প্রাপ্য, তারই দাবী করচি। নারী যদি তাদের উন্নতির পথে পুরুষের সাহায্য ও সহানুভূতি পায় তো সে কি আনন্দের বিষয় নয়? পুরুষেরা যদি তা দেন তো ভালই, না হলে নারীকে অতঃপর তা জোর করে আদায় করতে হবে।

শ্রীতমাললতা বসু।

অলকা

হিমাচলে অরুণোদয়!

উত্তরে ও পূর্ব্বদিকে তুষারকিরীটী শৃঙ্গশ্রেণী সূর্য্যোদয়ের প্রথম আলোকে দেখা যাইতেছে। প্রভাত-সূর্য্যের কিরণে কোথাও জ্বলিতেছে, কোথাও কোমল রক্তিম আভা,কোথাও হিমানীশিখরে রবিরশ্মি প্রতিহত হইতেছে। অতি শীতল মৃদু পবন, চারিদিকে নানাবর্ণের শিশির-সিক্ত প্রস্ফুটিত কুসুম, বিবিধ বিচিত্র জাতীয় পক্ষীর প্রভাত কূজন। নির্জ্জনতার শান্তি সর্ব্বব্যাপী।

স্থান সম্পূর্ণ নির্জ্জন নহে। সদ্যস্নাতা, আলুলায়িতকুন্তলা তরুণী কুসুম চয়ন করিতেছিল। পরিধানে গৈরিকরঞ্জিত বস্ত্র, লোমশ চর্ম্মে অঙ্গ আচ্ছাদিত। নত মুখে ফুল্ল পুষ্প আহরণ করিতেছিল, কখন বা মস্তক উত্তোলন করিয়া সূর্য্যোদয়ের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে মুখ, সে রূপ, আয়ত লোচনের উজ্জ্বল চঞ্চল দৃষ্টি সে স্থানেরই উপযোগী। নিসর্গের সৌন্দর্য্য চারিদিকে, সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যবর্ত্তিনী সেই রমণী। পর্ব্বত ও আকাশ ও প্রভাতের চিত্রপটে চিত্রিত সেই মোহিনী মূর্ত্তি।

পুষ্পচয়ন সমাপ্ত হইলে রমণী স্বচ্ছন্দ, লঘু পদক্ষেপে পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ কঠিন পথে ফিরিয়া চলিল। কিছুদূর গমন করিয়া পর্ব্বতের অন্তরালে বৃক্ষতলে একটী কুটীর দৃষ্ট হইল। কুটীর-দ্বারে ঋষিতুল্য জটাশ্মশ্রু-মণ্ডিত প্রাচীন পুরুষ দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে এক বৃদ্ধা রমণী। উভয়ে রমণীকে সস্মিতমুখে সম্ভাষণ করিলেন। পুরুষ কহিলেন, "অলকা, এইবার তোমায় দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অলকা কহিল, "কেন?"

বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া তরুণীর স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিয়া কহিলেন, "তোমার এখানে এক বৎসর থাকিবার কথা, সে কাল পূর্ণ হইয়াছে।" তাঁহার মুখে হাসি, চক্ষে অশ্রুবিন্দু।

আহরিত কুসুম অলকা বর্ষীয়সীর অঞ্চলে দিল। বৃদ্ধা কহিলেন, "ভিতরে এস।"

তিনজনেই কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

২

অজনালা রাজ্য পর্ব্বত হইতে দশদিনের পথ। অলকা সেই রাজ্যের রাজা বিক্রমের একমাত্র কন্যা। এক বৎসর পূর্ব্বে অলকার কোন কঠিন রোগের সূত্রপাত হয়, তাহাতে চিকিৎসকেরা তাহাকে দীর্ঘকাল পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতে আদেশ করেন। রাজা লোকজন সঙ্গে দিয়া কন্যাকে তাঁহার এক দুর্গে পাঠাইয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন, মধ্য হইতে অলকা একটা নিজের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। জ্ঞাতিসম্বন্ধে রাজার এক ভ্রাতা সুচেত বৃদ্ধ বয়সে দেশ ছাড়িয়া সস্ত্রীক পাহাড়ে কোন নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেন। সকল সম্পদ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা অতি সামান্য ভাবে থাকিতেন, তবে একেবারে দারিদ্র্যও গ্রহণ করেন নাই।

অলকা তাঁহার নাম করিয়া কহিল, "আমি সুচেত জ্যাঠার কাছে গিয়া থাকিব।"

কন্যার কথা শুনিয়া মহিষী সুপ্রিয়া গালে হাত দিলেন। বলিলেন, "সে কি কথা! তাঁহারা ত সংসার ছাড়িয়া ফকীরের মত থাকেন।"

অলকা বলিল, "সেই ত ভাল। আজ রাজা, কাল ফকীর। কিছুদিন বা রাজ-সম্পদ, কিছুদিন বা ফকীরের ভিক্ষা-পাত্র।"

"বালাই, অমন কথা বলিতে নাই! তোমার কিসের দুঃখ!"

রাজা এতক্ষণ হাস্যমুখে কন্যার বাক্‌চাতুর্য্য শুনিতে-ছিলেন। এখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথাটা কি শুনি?"

অলকা বাপের দিকে হাত ঘুরাইয়া বলিল, "কথাটা খুব সোজা। তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁরা যেমন আছেন সেই রকম থাকিব, আর অসুখ-বিসুখ সব সারিয়া যাইবে।"

রাজা বলিলেন, "ভাল, তাঁহাদের কুটীরের কাছে তোমার জন্য একখানি ছোট বাড়ী তৈয়ার করাইয়া দিব, তুমি দাস-দাসী লইয়া থাকিবে।"

কন্যা ঘাড় নাড়িল, "উঁহু, সে সব কিছুই হইবে না। আমি তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মত থাকিব। দাসদাসী কিছু চাই না।"

রাজকন্যার জিদ বজায় রহিল। সেকালে রাজপরিবারেও বিশেষ বিলাসিতা ছিল না। অলকাকে রাজা স্বয়ং সঙ্গে লইয়া গিয়া পর্ব্বতে সুচেতের কুটীরে রাখিয়া আসিলেন। মধ্যে মধ্যে রাজধানী হইতে লোক আসিয়া সংবাদ লইয়া যাইত, অলকা নিরাময় হইয়াছেন ও দিন দিন তাঁহার শরীর সুস্থ সবল হইতেছে। সংবাদ পাইয়া রাজারাণী নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

৩

সুচেত ও তাঁহার পত্নী কমলা কুটীরের বাহিরে দূরে বড় একটা যাইতেন না। দুইজনেই প্রাচীন; সুচেত ধর্ম্ম-চিন্তায় নিরত থাকিতেন, কমলা ক্ষুদ্র সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, অবশিষ্ট সময় আহ্নিক-জপে কাটাইতেন।

পর্ব্বতকুটীরে আসিয়া অলকা প্রথমেই রাজকন্যার বেশ ত্যাগ করিল। কেহ তাহাকে নিষেধ করিবার ছিল না, কেহ তাহাকে শাসন করিত না। সে অবাধে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিত, অল্পদিনেই পর্ব্বত আরোহণে ও অবতরণে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। পর্ব্বতের নির্ম্মল শীতল বায়ু-সেবনে, নিরামিষ আহার ও ফলমূল ভোজনে, ঝরণার সুমিষ্ট জল পানে সে সত্বর নীরোগ ও সুস্থ হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অতুলনীয় রূপ আরও ফুটিয়া উঠিল। ছিল রাজকন্যা, সঙ্কোচে রাজপরিবার-শাসনে অবনতমুখী, ধীরগামিনী, পর্ব্বতের মুক্ত আকাশে, মুক্ত বাতাসে, তুষারের শুভ্র উজ্জ্বল আলোকে, পর্ব্বতের বন্ধুর স্থানে গমনাগমনে তেজোজ্জ্বল উন্নতমুখী অভ্রান্ত ক্ষিপ্রচারিণী হইয়া উঠিল। রাজকন্যা গিরিকন্যা হইল।

কুটীরের নিকটে লোকালয় ছিল না। অনেক দূরে পর্ব্বতের আরও উচ্চস্থানে গুহার মধ্যে কয়েকজন সন্ন্যাসিনী বাস করিতেন। ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন অলকা সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত। সেই অবধি অলকা প্রায় সেখানে যাতায়াত করিত। সন্ন্যাসিনীরা তাহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন।

কি শান্তির আবাস-স্থান সেই! গুহাগুলি পর্ব্বতের ক্রোড়ে তরুশাখায় নীড়ের মত রহিয়াছে বাহিরে পর্ব্বতজাত বৃহৎ মহীরুহরাজি, তাহার তলে শ্রান্তিহরা ছায়া, ফুলে ফুলে চারিদিক নয়ন-লোভন বর্ণে বর্ণে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। আকাশের প্রান্তে প্রান্তে নীহারধবলিত তুঙ্গ তুঙ্গ পর্ব্বতচূড়া, যেন জটাধারী সন্ন্যাসীর ন্যায় ধ্যান-নিমগ্ন। পশুপক্ষী একেবারে ভীতিশূন্য, গুহাদ্বারে আসিয়া সন্ন্যাসিনীদিগের হস্ত হইতে আহার লইয়া যায়, কুরঙ্গিণী নিকটে আসিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, মেঘ গর্জ্জন করিলে ময়ূর সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করে। অলকা মুগ্ধ হইয়া সব দেখিত।

রাজগৃহে, নগরীতে অলকা এমন বিশুদ্ধ-স্বভাব ব্রহ্মচারিণী দেখে নাই। যে চপলতা, প্রগল্‌ভতা ঘরে ঘরে দেখা যায়, এই রমণীদিগের মধ্যে তাহার লেশমাত্র নাই। সহজ সুন্দর সরল স্বভাব, সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তা। যে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন ইঁহারা সেই সংসারের একটি কথাও কহিতেন

না। অনেক সময় তাঁহাদের নিকটে বসিয়া অলকা তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিত। পূর্ব্ব-জীবনের অথবা সংসারের কোন কথা তাঁহারা কহিতেন না, অলকার গৃহ—রাজগৃহ-সম্বন্ধেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। ইঁহারা কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন, কেন ইঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া এই দুর্গম গিরিগুহায় বাস করিতেছেন? সকলে ত প্রাচীনা নহেন, কয়েকজনের বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প, ইঁহারা কিসে বিরক্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিলেন? এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন অলকার মনে হইত, কিন্তু মুখে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না। সন্ন্যাসিনীদিগের মুখের দিকে চাহিলেই কৌতূহল স্বয়ং নিবৃত্ত হইত। যে মুখে এমন শক্তি, যে চক্ষের দৃষ্টি এমন স্নিগ্ধ-সরল, সে রমণীকে তাহার সংসারের পূর্ব্ব সম্বন্ধ বিষয়ে কি কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়? গৃহাশ্রমত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও নাই।

৪

এইরূপে কয়েক মাস গেল। অলকা ইচ্ছামত কুটীরে থাকে, ইচ্ছামত ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কেহ তাহাকে কিছু বলে না। অনেক সময় সে একা, কিন্তু কোন অভাব মনে হইত না। এখানে মানুষ নাই, কিশোরী বা যুবতীর চপল তরল হাস্যরঙ্গ নাই, লোকালয়ের কল-কোলাহল নাই। আছে প্রকৃতির অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিশাল অপ্রমেয় রহস্য। শব্দশূন্য ভাষায় প্রকৃতি অলকাকে কি বলিত, কেমন সঙ্কেত করিত, তাহা অলকা ভাল বুঝিতে পারিত না, কিন্তু সেই মোহের আকর্ষণী-শক্তি সর্ব্বদা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। এমন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত ত আর কোথাও হয় না, চারিদিকে এমন নির্ম্মল পবিত্রতার সমাবেশ ত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে নিসর্গের একছত্র রাজ্য, মানুষের কিছুমাত্র আধিপত্য নাই। এই যে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী নিস্তব্ধতা, ইহা ত মূক নহে। পত্র-পল্লবের মর্ম্মরে, বিহঙ্গের কাকলীতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছে। চারিদিক হইতে নির্জ্জনতা যেন অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছে। সেই সঙ্কেত নির্দ্দেশে অলকা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিত।

একদিন অপরাহ্লে অলকা পর্ব্বতের কোন অপরিচিত পথে গমন করিতেছিল। যত অগ্রসর হইতে লাগিল, পথ ততই বন্ধুর ও কঠিন হইতে লাগিল। ঘন তরুশ্রেণী অরণ্যের মত হইয়া উঠিতেছিল। এক স্থানে পথ বাঁকিয়া আর একদিকে উঠিয়াছে, সেই স্থানে কতকটা সমভূমি। চারিদিক বিটপী-বহুল বলিয়া অন্ধকার।

বিশ্রাম করিবার জন্য অলকা একটু দাঁড়াইল। সহসা দেখিল সম্মুখে পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া একটা বৃহৎ গোলাকার পদার্থ বেগে গড়াইয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে যেখানে অলকা দাঁড়াইয়াছিল সে স্থান হইতে বিংশ হস্ত মাত্র দূরে আসিয়া পড়িল। পড়িয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। অলকা সত্রাসে দেখিল একটা বৃহৎ কৃষ্ণকায় ভল্লুক!

পর্ব্বতে যে কোনরূপ আশঙ্কা আছে, অথবা কোন হিংস্র জন্তু আছে, অলকা তাহার কিছু জানিত না, তাহাকে কেহ কিছুই বলেও নাই। অলকা যেখানে আসিয়াছিল সে স্থান কুটীর হইতে অনেক দূরে, সে যে একাকিনী এতদূর গমন করিবে, সুচেতা কিম্বা তাঁহার পত্নী তাহা মনে করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে, তাঁহারাও বড় একটা কোন সংবাদ রাখিতেন না, কারণ যে স্থলে তাঁহারা বাস করিতেন, সেদিকে কোন শ্বাপদ আসিত না।

চারিদিকে শান্তি মূর্ত্তিমতী, চারিদিকে অপূর্ব্ব শোভা, কুত্রাপি হিংসাদ্বেষের লেশ নাই। আচম্বিতে, মুহূর্ত্ত মধ্যে ভল্লুকের ভীম আকারে মৃত্যু আসিয়া অলকার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল! মৃত্যুশূন্য স্থান কোথায়? কালে অকালে, স্থানে অস্থানে, মৃত্যু নানারূপে সর্ব্বত্র বিচরণ করে।

অলকা স্পন্দহীন হইয়া দাঁড়াইল। পতনের বেগে ভল্লুকের নিশ্বাস কিছু দ্রুত বহিতেছিল, ক্ষুদ্র, ক্রূর চক্ষু দিয়া ইতস্ততঃ দেখিতেছিল। অল্পক্ষণেই অলকাকে দেখিতে পাইয়া কিয়ৎকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর নিশ্চিন্ত গতিতে, কিছুমাত্র ত্বরা না করিয়া তাহার অভিমুখে অগ্রসর হইল।

ভীতি-বিহ্বল চক্ষে অলকা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কোথায় পলায়ন করিবে? নিশ্চেষ্ট হইয়া মরিবে? প্রাণ-ভয়ে অলকা বেগে পলায়ন করিল। সম্মুখে অরণ্য, তাহাতে প্রবেশ করিল। ভল্লুকও তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইল। অলকা পর্ব্বতপথে অভ্যস্ত ও ক্ষিপ্রগতি, তাহাতে প্রাণের আশু আশঙ্কা, কিন্তু হিংস্র পশুর নিকট হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইবার আশা কোথায়?

কিছুদূর পলায়ন করিয়া অলকা দেখিল, সম্মুখে পাদপশূন্য স্থান আরও দেখিল, সম্মুখে একজন সশস্ত্র যুবা পুরুষ আসিতেছে। তখন অলকার বাক্যস্ফূর্ত্তির শক্তি নাই। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পশ্চাতে দেখাইয়া দিল।

এমন সময় ভল্লুকও বনের বাহির হইল। যুবকের পার্শ্বে একটা প্রস্তরের স্তূপ ছিল। অলকাকে কহিল, "তুমি উহার অন্তরালে দাঁড়াও।" এই বলিয়া বেগে লম্ফ দিয়া ভল্লুকের সম্মুখীন হইল।

যুবকের হস্তে বর্শা, কটিতে কৃপাণ। তাহাকে সবেগে আগমন করিতে দেখিয়া ভল্লুক থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রস্তর-স্তূপের অন্তরাল হইতে অলকা রুদ্ধনিশ্বাসে দেখিতে লাগিল। ভল্লুকের সম্মুখ হইতে যুবা চকিতের ন্যায় তাহার পার্শ্বে গেল। পার্শ্বে গিয়াই সবলে বর্শা ভল্লুকের বক্ষে বিদ্ধ করিল। বাহুতে এমন অসীম বল যে বর্শাফলক আমূল বিদ্ধ হইয়া গেল। রক্ত বমন করিতে করিতে ঋক্ষ ধরাতলে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিল।

৫

ভল্লুক মরিল দেখিয়া অলকার ভীতি অপনীত হইল। সে সাহস করিয়া মৃত ভল্লুকের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক ও অলকা পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখিল।

যুবকের বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর হইবে। আয়তন দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, বিস্ফারিত উজ্জ্বল চক্ষু, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সরল। আকৃতি বীরের ন্যায়, কান্তি মনোহর। তাহার দিকে চাহিয়া অলকা চক্ষু নত করিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

অলকা কহিল, "আমি ক্ষত্রিয়কন্যা, পর্ব্বতে কুটীরে আত্মীয়দিগের সহিত বাস করি। অল্প দিন হইল এখানে আসিয়াছি। আজ আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।"

যুবক কহিল, "সে কথায় কাজ নাই। এদিকে সময়ে সময়ে ভল্লুকাদি আসিয়া থাকে। চল, তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

অলকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

"আমিও ক্ষত্রিয়। এই পর্ব্বতেই বাস করি।"

দুইজনে কুটীরের অভিমুখে চলিল। পথে যুবক অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, অলকা সংক্ষেপে উত্তর দিতে লাগিল, অধিক কথা কহিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল, আত্ম-পরিচয় দিল না।

অনেক দূর গিয়া কুটীর দেখা গেল। অলকা দাঁড়াইয়া কহিল, "কুটীর পর্য্যন্ত আপনার আসিবার আবশ্যক নাই। কুটীরে বৃদ্ধ আত্মীয়েরা আছেন, আজিকার ঘটনা শুনিলে তাঁহারা ভয় পাইবেন, হয়ত কুটীরের বাহিরে যাইতে আমাকে নিষেধ করিবেন।"

যুবক কহিল, "সেই কথা ভাল, তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহাও উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।"

মস্তক নত করিয়া অলকা সম্মতি জানাইল। তাহার পর চলিয়া গেল। দুই একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, যুবক অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছে। সহসা অলকার ললাট ও কপোল লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। সে আর ফিরিয়া চাহিল না।

কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া অলকা সুচেত ও কমলাকে সে দিনকার বিপত্তির সম্বন্ধে কিছু বলিল না। সে সকল কথা কেন যে গোপন করিল নিজেই বুঝিতে পারিল না। সে কখন কিছু লুকাইত না, আজ যেন তাহার মুখ আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল। কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিল, হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে এই সকল কথা গোপনে সঞ্চয় করিয়া রাখ, কাহারও সাক্ষাতে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিও না।

৬

সেইদিন হইতে অলকার জীবনে নূতন ভাবের সঞ্চার

হইল। সায়ংকালে যখন পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে যাইত তখন কোনও স্থানে না কোনও স্থানে যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইত। উভয়ের একজনও সাক্ষাতের কোন স্থান নির্দ্দেশ করিত না, যেন দুইজনেই নিরুদ্দিষ্ট ভাবে ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময় দেখা হইত। প্রথম প্রথম সপ্তাহে দুই তিনবার, পরে নিত্য সাক্ষাৎ হইত। সুচেত ও তাঁহার পত্নী ইহার কিছুই জানিতেন না।

যুবকের নাম প্রতীপ, তাহার পিতা দিলীপ পর্ব্বত অঞ্চলে সঙ্গতিপন্ন জমিদার। প্রতীপ ব্যায়াম ও অস্ত্রকুশলী, মৃগয়াসক্ত, মৃগয়ায় বহু হিংস্র জন্তু সংহার করিয়াছিল, নহিলে ওরূপ অবলীলাক্রমে ভল্লুককে বধ করিতে পারিত না। অলকাকে দেখিয়া অবধি তাহারও ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

ইতিপূর্ব্বে অলকার চক্ষে ও হৃদয়ে পর্ব্বতের নির্জ্জনতা ও শান্তি সর্ব্বদা জাগরূক রহিত। প্রেম আসিয়া তাহার চক্ষু নূতন রাগে রঞ্জিত করিল, হৃদয়তন্ত্রী অশ্রুতপূর্ব্ব রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তখন আর আত্মগোপনের উপায় রহিল না।

পর্ব্বতশিখরে মেঘ সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, শিখরের অন্তরালে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। সেই আসন্ন সন্ধ্যাকালে দেবদারু-দ্রুমতলে এই প্রণয়ীযুগল পরস্পরের প্রেমে প্রতিশ্রুত হইল। অলকা যে রাজকন্যা ও প্রতীপ সাধারণ ভূম্যধিকারীর পুত্র, সে কথা সে সময় তাহারা বিস্মৃত হইল। উভয়ের হৃদয় উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট, পরস্পরের মুখ দেখিয়া উভয়ে আর সব ভুলিয়া গিয়াছিল, ভবিষ্যতের কথা এক তিলের জন্য তাহাদের স্মরণ হইল না। মুহূর্ত্তের সুখ অনন্ত-সুখ প্রতীয়মান হইল।

এইরূপ নিত্য দেখা হয়, নিত্য উভয়ের আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হয়, এমন সময় অলকা সুচেতের মুখে শুনিল, তাহার গৃহে ফিরিবার সময় আগতপ্রায়। সে স্বয়ং দিনগণনা ভুলিয়া গিয়াছিল।

পর দিবস যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন অলকার মুখ মলিন, চিন্তামগ্ন। দেখিয়াই প্রতীপ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

অলকা বলিল। প্রতীপ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে কবে লইয়া যাইবে?"

"বোধ হয় দুই চারি দিনের মধ্যে।"

কিয়ৎকাল প্রতীপ মৌন হইয়া রহিল। অবশেষে ব্যগ্রভাবে অলকার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, "তুমি কেন যাইবে? তুমি আমার সঙ্গে চল, গৃহে লইয়া গিয়া তোমাকে বিবাহ করিব। জাতিতে আমি তোমার সমতুল্য, আমাদের বিবাহে কোন বিঘ্ন নাই।"

অলকা বলিল, "পিতা-মাতার অজ্ঞাতে, গোপনে তোমাকে কেমন করিয়া বিবাহ করিব?"

"তবে কি করিবে?"

"তাঁহাদিগকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব। যদি তাঁহারা সম্মত না হয়েন তাহা হইলে পরের কথা। আমার হৃদয় আমার নিজের, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহা তোমাকে দিয়াছি। আমি বালিকা নহি, শাস্ত্রমতে তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারি। কিন্তু আর এক কথা। তুমি ত তোমার পিতা-মাতাকে আমাকে বিবাহ করিবার কোন কথা বল নাই। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের অভিমত আমাকে জানাইও।

"তাঁহারা কি আপত্তি করিবেন?"

"কোন আপত্তি না করিতে পারেন। তথাপি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা তোমার কর্ত্তব্য।"

পর দিবস অলকা দেখিল, প্রতীপের মুখ ম্লান, চিন্তাযুক্ত। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

"পিতার মুখে যে কথা শুনিলাম, তাহা কখনও আমার মনে হয় নাই। কি করিব, কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না।"

"তিনি কি বলিয়াছেন?"

"তিনি বলিলেন যে তোমার পিতা বলিবেন আর সকলেই বলিবে যে তুমি রাজকন্যা বলিয়া অর্থলোভে তোমাকে ভুলাইয়া আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছি। আরও বলিলেন যে আমার জন্ম হইবার পূর্ব্বে কোনও কারণে তোমার পিতা আমার পিতার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এজন্য আমাদিগের বিবাহে তিনি কদাপি সম্মত হইবেন না।"

অলকা কহিল, "যিনি যাহাই মনে করুন তোমাকে

আমাতে অর্থের কোন কথাই নাই, আমরা দুজনে কুটীরে থাকিলেও সুখে থাকিব। অপর কথার আমি কিছু জানি না, তোমার পিতাও তোমাকে কিছু বলেন নাই। পিতৃগৃহে গিয়া হয়ত জানিতে পারিব।"

বিদায়-কালে অলকা কহিল, "কাল সন্ধ্যার সময় তুমি এইস্থানে আসিও। কাল আমাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিবার কথা আছে।"

পরদিবস রাজধানী হইতে অলকাকে লইতে লোক আসিল। রাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারী, সঙ্গে লোকজন, রাজকন্যার নিজের অশ্ব ও কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য। একরাত্রি তাঁবুতে বাস করিয়া দ্বিতীয় দিবস প্রত্যূষে রাজকন্যাকে লইয়া যাইবে।

সে দিন সন্ধ্যার সময় প্রতীপ ও অলকায় অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সে সকল কথা প্রকাশ করিবার নহে। বিদায়ের সময় দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। অলকার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল।

প্রভাতে সুচেত ও কমলার চরণ বন্দনা করিয়া অলকা পিতৃগৃহের অভিমুখে যাত্রা করিল।

৭

গৃহে ফিরিলে অলকাকে দেখিয়া ও তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। রাণী সুপ্রিয়া মনে করিয়াছিলেন, দাস-দাসী ও উপযুক্ত আহারাদির অভাবে অলকার অসুবিধা ও ক্লেশ হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, বরং দেখিলেন, এক বৎসর কুটীরবাসিনী হইয়া কন্যার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হইয়াছে। তবে পূর্ব্বের অপেক্ষা অলকা কিছু গম্ভীর হইয়াছে, পূর্ব্বের মত সেরূপ সর্ব্বদা হাস্যমুখী, তেমন বাক্‌পটুতা নাই।

মাতার অপেক্ষা বয়স্যারা অধিক দেখিতে পায়। তাহারা দেখিল, অলকা পূর্ব্বের অপেক্ষা শুধু গম্ভীর হয় নাই, তাহার স্বভাবে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বের সে চঞ্চলতা, কারণে-অকারণে সকল সময় হাসি, সকলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। পরস্পরে তাহারা বলাবলি করিত, অলকা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। অধিক কথাবার্ত্তা কহে না, সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক, যে কখনও একা থাকিতে ভাল বাসিত না, এখন যেন সতত বিরলে থাকিতে চায়।

সখীদের মধ্যে অম্বালিকা অলকার অত্যন্ত প্রিয়। সে একান্তে অলকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এমন কেন হইয়া গিয়াছ? পাহাড়ে গিয়া কি হইয়াছিল?"

অলকা উত্তর করিল, "কি আবার হইবে? সেখানে একা থাকিতাম, একা বেড়াইতাম, সেই কারণে বোধ হয় আগের চেয়ে এখন একা থাকিতে ভাল লাগে।"

অম্বালিকা বলিল, "সব সময় কি একা থাকিতে?"

"কুটীর হইতে জ্যাঠা মহাশয় ও জেঠিমা বড় একটা বাহির হন্ না, সেইজন্য আমি একা যাইতাম।"

"আর কাহারও সহিত দেখা হয় নাই?"

অল্প ঈষৎ সঙ্কোচের ভাবে অলকা অম্বালিকার প্রতি কটাক্ষপাত করিল। কহিল, "পাহাড় ত আর মরুভূমি নয়, কত লোককে দেখিয়া থাকিব।"

অলকার কটাক্ষ, তাহার সঙ্কোচ অম্বালিকা লক্ষ্য করিয়াছিল। "না, তাহাই বলিতেছিলাম," বলিয়া সে ক্ষান্ত হইল; আর কোন কথা হইল না।

৮

কয়েকদিন পরে রাজবাটীতে মহলে-মহলে আন্দোলন উপস্থিত। রাজকন্যার বিবাহ হইবে।

পর্ব্বতে বাস-কালীন অলকার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় যেমন সচরাচর ঘটিয়া থাকে তাহাই হইল। নিজের বিবাহের কথা অলকা সকলের পরে শুনিল। শুনিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। তাহার পর অম্বালিকাকে ডাকিয়া কোথায় বিবাহের কথা হইতেছে জিজ্ঞাসা করিল।

অজনালার কিছু দূরে চম্পা নামক রাজ্য। চম্পার রাজকুমার চিত্রাঙ্গদের সহিত অলকার বিবাহ হইবে।

অলকা মাতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমার বিবাহের কথা এ কি শুনিতেছি?"

রাণী নিরীহ ভাল মানুষ। কহিলেন, "কেন মা, এ ত ভাল কথা। বেশ্ সুপাত্র, আর তোমারও বিবাহের বয়স হইয়াছে।"

"তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার কত বয়স হইল?"

মাতা কিছু বিস্মিত হইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "তোমার বয়স বাইশ তেইশ বৎসর হইবে।"

"তবে ত আমি আর ছেলেমানুষ নই। আমি এ বিবাহ করিব না," বলিয়া অলকা উঠিয়া গেল।

রাণী সুপ্রিয়া অবাক্। কিয়ৎকাল পরে রাজা অন্তঃপুরে আসিলে একটু ইতস্ততঃ করিয়া অলকা যাহা বলিয়াছিল স্বামীকে তাহা শুনাইলেন।

কথাটা প্রথমে রাজা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কহিলেন, "পাহাড়ে গিয়া একা থাকিয়া অলকার চিত্ত-চাঞ্চল্য হইয়া থাকিবে। তাহাকে তুমি একটু বুঝাইয়া বলিলেই হইবে। আর তাহাকে বলিয়াই বা আবশ্যক কি? কন্যার বিবাহের সময় কে আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে?"

অবসর-মতে রাণী কন্যাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। সে কিছুতেই বুঝিল না। অগত্যা রাণী রাজাকে জানাইলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া রাজা অলকাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এত স্পর্দ্ধা! তুমি নাকি বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছ?"

"আপনাদের মনোনীত পাত্রকে বিবাহ করিতে আমি অস্বীকার করিয়াছি।" অলকার কথা ধীর কিন্তু মুখ ও কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দৃঢ়।

রাজা আরও রাগিয়া উঠিলেন, "পাত্রকে আমরা মনোনীত করিব না ত কে করিবে?"

"আমি বালিকা নহি। পতিকে মনোনয়ন করিবার অধিকার আমার আছে।"

রাজার ক্রোধ বিস্ময়ে পরিণত হইল। অলকার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি কাহাকেও মনোনয়ন করিয়াছ?"

"করিয়াছি।"

"কে, জানিতে পারি?"

"আপনি পিতা, গুরু, আপনাকে বলা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।" অলকা প্রতীপের নাম ও পরিচয় জানাইল।

তখন রাজা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইলেন। গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "স্বহস্তে তোমাকে বধ করিব অথবা যাবজ্জীবন তোমাকে কারারুদ্ধ করিব, কিন্তু এ বিবাহ কখনও হইবে না।"

অলকা পূর্ব্ববৎ ধীর কণ্ঠে কহিল, "আপনি আমার প্রাণদণ্ড করুন কিংবা আমি আত্মহত্যা করিব, কিন্তু জীবন থাকিতে আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।" এই বলিয়া অলকা আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া অর্গল রুদ্ধ করিল।

রাণী রোদন করিতে লাগিলেন।

৯

বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। অলকাকে রাজা অথবা রাণী আর কিছু বলিতেন না। অলকা অশ্বালিকার সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিল, গোপনে দুই চারি-খানি পত্র পাঠাইল, গোপনে পত্রের উত্তর আসিল। প্রতীপ সমস্ত সংবাদ অবগত হইল।

রাণী দেখিলেন অলকা বিবাহে আর কোন আপত্তি করে না, মাতার আদেশ-মত কার্য্য করে, সকলের সঙ্গে হাসিয়া বাক্যালাপ করে। রাণী হৃষ্ট হইয়া রাজাকে এ কথা জানাইলেন, বুঝাইয়া বলিলেন যে অলকা পিতৃসমক্ষে যাহা বলিয়াছিল, সে কথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত।

রাজা বলিলেন, "উত্তম কথা। বিবাহ হইলে অলকা সব ভুলিয়া যাইবে।"

বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অলকা মাতার নিকট ভাগীরথীতে স্নান করিবার অনুমতি চাহিল। রাজধানী হইতে ভাগীরথী তিন ক্রোশ দূরে। রাণী আহ্লাদ করিয়া কহিলেন, "বেশ ত, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া স্নানে লইয়া যাইব।"

অলকা মাতাকে মিনতি করিয়া কহিল, কোন-রূপ আড়ম্বর বা অশ্বারোহী সৈনিক কিংবা প্রহরার প্রয়োজন নাই, দাস-দাসীরা সঙ্গে থাকিলেই হইবে। রাণী স্বীকৃতা হইলেন।

দাসদাসী-বেষ্টিত শিবিকা প্রাতঃকালে ভাগীরথী-তীরে উপনীত হইল। অনতিদূরে এক ব্যক্তি একটী সজ্জিত অশ্বের বল্গা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অলকা শিবিকা হইতে অবতরণ

করিয়া বেগে দৌড়িয়া গিয়া পলকের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অশ্বধারীর হাত হইতে কশা গ্রহণ করিয়া অশ্বের পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া বায়ুবেগে অদৃশ্য হইল। অশ্বধারীও পলায়ন করিল।

ভিতরের কথা দাস-দাসীরা কিছুই জানে না, অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কেবল রাণী বুঝিতে পারিলেন যে অলকা পলায়ন করিল। চীৎকার করিয়া দাস-দাসীকে কহিলেন, "রাজকন্যা পলায়ন করিয়াছে। ধর, ধর।"

কে ধরিবে? অশ্বারোহী কেহ নাই, রাজকন্যা অশ্বপৃষ্ঠে অতি-বেগে অশ্ব চালনা করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। ভীতি বিহ্বলা রাণী, সন্ত্রস্ত দাস-দাসী নগরে ফিরিতে সৈনিকেরা অশ্বারোহণ করিয়া অলকার অনুসন্ধানে বাহির হইতে প্রায় একপ্রহর অতীত হইল।

প্রায় এক যোজন পথ গমন করিয়া অলকা দেখিল, অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে অশ্বারোহণে প্রতীপ তাহার অপেক্ষা করিতেছে। সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ করিয়া, অশ্বের মুখ ফিরাইয়া প্রতীপ ধাবমান হইল। অশ্বপৃষ্ঠে অলকা তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইল।

পর্ব্বতে যাইতে পথে প্রতীপের মাতুলালয়। অলকাকে প্রতীপ সেইস্থানে লইয়া গেল। সেই রাত্রে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

১০

অলকার কোন সন্ধান না পাইয়া সৈনিকেরা কয়েক দিবস পরে ফিরিয়া আসিল। তখন অলকার সন্ধানের জন্য রাজা গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। তাহারা চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

অবশেষে একজন ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, অলকা ও প্রতীপ পর্ব্বতের অতি দুর্গম দুরারোহ স্থানে বাস করিতেছেন। পঞ্চাশজন বলিষ্ঠ সশস্ত্র পর্ব্বতবাসী তাঁহাদের রক্ষণে নিযুক্ত আছে।

প্রতীপের পিতা দিলীপের নিকট রাজা বিক্রম দূত পাঠাইলেন। দূত গিয়া দিলীপকে কহিল, আপনার পুত্র অর্থলোভে রাজকন্যাকে গোপনে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। রাজার আদেশ, আপনি রাজকন্যাকে অবিলম্বে রাজধানীতে পাঠাইয়া দেন, নহিলে তিনি সসৈন্যে আসিয়া আপনার জমি ছারখার করিবেন ও আপনার পিত্রাসন ভূমিসাৎ করিবেন।

দিলীপ কহিলেন, "আমার পুত্রের বিবাহের কথা আমি কিছু জানি না, সে কোথায় আছে তাহাও অবগত নহি। তাহার পর রাজার ইচ্ছা। পূর্ব্বের কথা তাঁহাকে স্মরণ করিতে বলিও। তাহা হইলে অকারণ তিনি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেন না।"

পূর্ব্ব কথা এই। প্রথম যৌবনে একবার রাজা বিক্রম ও দিলীপের বিবাদ হইয়াছিল। তাহাতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে বিক্রম পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই কারণে দিলীপের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন।

দূত উত্তর লইয়া আসিলে রাজা বিক্রম সৈন্য-সজ্জার আদেশ করিলেন। স্বয়ং সেনাপতি হইয়া দিলীপকে আক্রমণ করিবেন এবং অলকা ও প্রতীপকে বন্দী করিয়া আনিবেন।

অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রথমে বিক্রম প্রতীপের দুর্গম নিবাস-স্থানে যাত্রা করিলেন। যে চর সে স্থান দেখিয়া আসিয়াছিল, সে পথ দেখাইয়া দিল।

যেখানে পর্ব্বতের পথ অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্কীর্ণ, সেই স্থানে প্রতীপের অনুচর ও সৈন্যগণ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডসমূহ ও তরুশাখা দিয়া পথ রোধ করিয়াছিল। বিক্রমের আদেশে তাঁহার সৈন্যেরা পথ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। প্রাচীরের পশ্চাৎ হইতে প্রতীপের সৈন্যেরা প্রস্তরখণ্ড ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

সেই সময় প্রাচীরে উঠিয়া প্রতীপ উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "সাবধান. রাজাকে কেহ আঘাত করিও না, তাহা হইলে তাহাকে আমি স্বহস্তে বধ করিব।"

প্রতাপকে দেখিতে পাইয়া রাজা বিক্রম হস্তধৃত বর্শা তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। প্রতাপের পার্শ্বে তরু-শাখায় বর্শা বিদ্ধ হইল। প্রতীপ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বর্শা মুক্ত করিয়া রাজার চরণতলে নিক্ষেপ করিল। সহাস্যে কহিল, "মহারাজ, দ্বিতীয় বার লক্ষ্য করুন, আমি দাঁড়াইয়া আছি।"

ক্রোধে ও লজ্জায় রাজার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বার বর্শা নিক্ষেপ করিলেন না।

প্রস্তরখণ্ডসমূহের ঘোর পতন শব্দে, সৈন্যদিগের কোলাহলে রাজা বিক্রমের অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। রাজা সাধ্যমত অশ্বকে সংযত করিতে লাগিলেন, সহসা বৃক্ষশাখায় পদ জড়িত হইয়া অশ্ব পতিত হইল। রাজা অশ্বের নীচে পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল। সৈন্যেরা অশ্বকে সরাইয়া রাজাকে মুক্ত করিল। প্রতীপ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া রাজার নিকট আসিল, ভূতল হইতে রাজাকে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করাতে রাজা যন্ত্রণাব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিলেন, কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন না।

রাজা উত্থানশক্তি-রহিত দেখিয়া প্রতীপ কয়েকটা বৃক্ষের শাখা কাটিতে আদেশ করিল, স্বহস্তে কয়েকটা সরল শাখা কাটিয়া সেগুলিকে নিষ্পত্র করিল। শাখাগুলি সাজাইয়া, বাঁধিয়া শয্যাকৃতি করিল। তাহার উপর অশ্ব পৃষ্ঠের কম্বল, সৈনিকদিগের অঙ্গবস্ত্র ও তাহার উপর নিজের অঙ্গবস্ত্র বিছাইয়া কোমল শয্যা রচনা করিল। দুই একজন লোকের সাহায্যে অত্যন্ত সাবধানে ধীরে ধীরে রাজাকে তাহার উপর শয়ন করাইল।

রাজা বিক্রমের বাক্‌শক্তি রহিত, কিন্তু প্রতীপ যাহা করিতেছিল লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। প্রতীপ যখন বৃক্ষ-শাখা রচিত শয্যা সহিত রাজাকে উঠাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন তিনি চক্ষের পলকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতীপ বুঝিতে পারিয়া কহিল, "অলকাকে সংবাদ পাঠাইয়াছি। তাহার আসিতে বিলম্ব হইবে না।"

রাজার চক্ষের পলক পড়িল। চক্ষে যাতনা অথবা রোষের চিহ্ন ছিল না।

আর কয়েক ব্যক্তির সাহায্যে প্রতীপ স্বয়ং রাজাকে বহন করিতে লাগিল। সাবধানে, ধীরে ধীরে তাঁহাকে পর্ব্বতের নীচে নামাইল। পর্ব্বতের তলে গ্রামের জমিদারের শিবিকা ছিল। রাজাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য শিবিকা আনীত হইল। তাঁহাকে উঠাইয়া শিবিকায় শয়ন করান হইতেছে এমন সময় অলকা অশ্বারোহণে আগমন করিল। অবতরণ করিয়া পিতার চরণ-যুগল ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কন্যাকে দেখিয়া রাজার চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল।

রাজধানীতে উপনীত হইতে রাজা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে পালঙ্কে সকলে শয়ন করাইল। অলকা ও প্রতীপ রাণীর চরণ বন্দনা করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া, রাজাকে দেখিয়া রাণী মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন। রাজগৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

কবিরাজ আসিয়া রাজাকে দেখিলেন। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন। তাঁহার মুখ ম্লান, রাজপরিবারবর্গকে কহিলেন, "মেরুদণ্ডে আঘাত লাগিয়াছে, জীবনের আশা নাই।"

রাণী, অলকা ও প্রতীপ সমস্ত রাত্রি রাজার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। রাজার চক্ষু কখন নিমীলিত কখন উন্মীলিত, কখন আর্দ্র। শরীরে যন্ত্রণার কোনও লক্ষণ নাই, নিশ্বাস ধীরে ধীরে বহিতেছে। দক্ষিণ হস্ত রাণীর দক্ষিণ হস্ত মধ্যে ন্যস্ত।

প্রভাত হইল। রাজার কটাক্ষ ইঙ্গিতে প্রতীপ দ্বার ও বাতায়ন মুক্ত করিল।

সূর্য্যোদয় হইল। প্রভাত সূর্য্যের নবীন কোমল রশ্মিতে গৃহ আলোকিত হইল। চক্ষের পলকে রাজা আবার ইঙ্গিত করিলেন। অলকা ও প্রতীপ তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিয়া আপন মস্তকে রক্ষা করিল। তাহার পর তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিল। রাণীও স্বামীর পাদপদ্মরেণু মস্তকে লইলেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া রাজা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ধীরে ধীরে, বিনা যন্ত্রণায় তাঁহার প্রাণ-বায়ু মুক্ত হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

আলোচনা

শিক্ষা এবং মাতা ও পত্নীর আদর্শ

কিছুদিন হইল একটী বাঙ্গলা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে Annie Besant বলিয়াছেন যে মেয়েদের "girl graduates" হইয়া "learned professionএ" যাওয়া অপেক্ষা মা ও স্ত্রীর আদর্শ শিক্ষা করাই তিনি উচিত মনে করেন। এই রকম সব কথা বলিতে পারিলে বড়ই লোকপ্রিয় হওয়া যায়। সেইজন্য যাঁহারা নিজেরা শিক্ষিতা, তাঁহারাও ইহা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ তাঁহারা এমনই ত লোকের অপ্রিয়, সুতরাং এইরূপ সব কথা বলিয়া লোকের একটু চমক্ লাগাইবারও চেষ্টা পাইয়া থাকেন।

ভাল মা ও স্ত্রী হওয়া যে মেয়েদের উচিত, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেই কি কাহারও "graduate" হওয়া বা "learned professionএ" যাওয়া অন্যায় হইবে? সকল মেয়ের পক্ষে ঠিক এক আদর্শ কখনই খাটিতে পারে না, কারণ সকলের শক্তি, সামর্থ্য, ইচ্ছা, প্রকৃতি ও প্রয়োজন এক রকম নহে। তিনি নিজের কথাই ভাবিয়া দেখিতে পারেন। শিক্ষার কোন সুযোগ না পাইয়া তাঁহাকে যদি কেবলমাত্র ঘর-সংসার লইয়া এতদিন থাকিতে হইত, তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারিতেন?—তাঁহার প্রতিভা সমস্তই নষ্ট হইত না কি? আর ঘর-সংসার-বদ্ধ মেয়েদের জন্যই যে অনেক সময় নারীর পক্ষে "learned professionএ" যাওয়া দরকার। যেমন মেয়েদের শিক্ষার জন্য উচ্চ-শিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর, চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যায় দক্ষ ডাক্তার ও ধাত্রীর এবং মেয়েদের পরামর্শ দিবার জন্য আইনে দক্ষ নারীর প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাঁহাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য ও তাঁহাদের সম্বন্ধে সুবিচারের জন্য রাজনীতিতে দক্ষ নারীদের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও বিচারক ইত্যাদি হওয়াও আবশ্যক। আরও অনেক বিষয়েরই উল্লেখ করা যাইতে পারে। তার পর অনেকের কেবল জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহাই হয়ত থাকিতে পারে,—তাহাও ত পাপ বলা যাইতে পারে না। তেমনি অনেকের নানারূপ কলাবিদ্যাতেও অনুরাগ থাকিতে পারে। তার উপর যেরূপ দিন-কাল পড়িতেছে, তাহাতে মেয়েদের অবস্থার প্রকৃত উন্নতির জন্যও তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা করিতে হইলেই যে তাঁহাদের স্ত্রী বা রাঁধুনীর কাজ ব্যতীত আর কিছু করিতে নাই, এমন কোন কথা নাই। উপার্জ্জন করিতে হইলে শক্তি, প্রবৃত্তিও সুবিধা অনুসারে যে যত উচ্চ কাজের উপযুক্ত হইতে পারে, সে জন্য চেষ্টা করাই উচিত হইবে, সন্দেহ নাই।

আর graduate হইলেই বা তাঁহাদের ভাল মা ও স্ত্রী হইবার পক্ষে বাধা কি? দুইটীকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিবার কোন অর্থ নাই। পুরুষেরা "graduate" হইলে বা "learned professionএ" গেলে যদি তাঁহাদের সুগৃ[illegible] পতি হইবার পক্ষে বাধা না হয়, তাহা হইলে মে[illegible] হার অবশ্যম্ভাবিতা মনে করার কারণ কি? ভাও[illegible] তে হইলেও যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা তিনিও [illegible] তবে সেই শিক্ষা আর একটু পূর্ণতর হইলেই কি যত [illegible]ব!

বাস্তবিক মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই কেহই তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষার উপর একবার আক্রমণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহাতে যেরূপ সহজে লোকপ্রিয় হওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নয়। কিন্তু এই "girl graduate" হওয়া ও learned professionএ যাওয়া কি এতই সহজ, যে মেয়েদের কোন মতে আট্‌কাইয়া না রাখিলেই অমনি সকলে তাই হইয়া বসিবে? পুরুষদের যে এদিকে এত সুবিধা দেওয়া ও তাহার জন্য এত চেষ্টা করা হয় এবং নিন্দা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিবর্ত্তে অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সকলই তাঁহারা ইহার দ্বারা পাইয়া থাকেন, তবুও তাঁহাদের বেশীর ভাগ লোকে কি "graduate" হইয়া "learned professionএ" যাইতে পারিতেছেন? ইহাতে মেয়েদের বুদ্ধি, প্রতিভা, শক্তিকে খুবই বাড়াইয়া তোলা হইতেছে সন্দেহ নাই। আমাদের সে বিষয়ে কিন্তু অতটা প্রত্যয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, এখনকার অবস্থার কথা দূরে থাকুক, সব বিষয়ে সুযোগ, সুবিধা পাইলেও অধিকাংশ মেয়েই "graduate" হইতে বা learned professionএ যাইতে পারিবেন না। সুতরাং তাহার জন্য কাহারও নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ার কোন কারণ দেখি না। তাহার পর "মা ও স্ত্রী হওয়ার" সহিত যে ইহার কোন অহি-নকুল সম্বন্ধ নাই, আর ঐ সকল "মা ও স্ত্রীদের" সাহায্য এবং রক্ষার জন্যও যে অনেকের উহা হওয়া আবশ্যক, তাহা আগেই বলা হইয়াছে।

তার পর আবার আর একটী মজার বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই মেয়েদের উচ্চশিক্ষার নিন্দা ও ঠাট্টা বিদ্রূপে তাহার ভূমিকা বাঁধিয়া ঐ সকল উপদেষ্টারা আবার

মেয়েদের শিক্ষার ঔচিত্যের কথাও বলিতে বসেন! কিন্তু ঐ "শিক্ষা" পদার্থটা যে কি, তাহা এত আলোচনা পড়িয়াও এ পর্য্যন্ত বোধগম্য হইল না। তাহা যদি এতই আশ্চর্য্য কৌশল হয় যে, মেয়েরা কোনরূপ স্কুল, কলেজ বা পুস্তকাদির কোন বালাই না রাখিয়াই "আদর্শ শিক্ষিতা" হইতে পারেন, তাহা হইলে ছেলেদের উপর তাহার প্রয়োগেরও ত বিশেষ প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। কারণ তাঁহারা এত পরিশ্রম, অর্থ-ব্যয় ইত্যাদি করিয়াও ত সকলেই "আদর্শ শিক্ষিত" হইতে পারিতেছেন না। আর তাহা যদি কেবল মেয়েদের "পুরুষ না হইয়া আদর্শ মা ও স্ত্রী" হইবার ফল হয়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাঁহারা মেয়েদের সকলকেই "আদর্শ মা ও স্ত্রী" প্রস্তুত করিতে পারিবেন ত? ও তাহা হইবার সুযোগ, সুবিধা দিতে পারিবেন ত? তার পর তাঁহারা যত সহজে মেয়েদের পুরুষ হওয়ার সম্ভাবনা ঘোষণা করেন, তাহাও আশাপ্রদ বলিতে হইবে। তবে দুঃখের বিষয়, কোন বইয়ের ঠিক কয় পাতা পড়িলে তাঁহারা ঐ উচ্চ পদবী লাভ করিবেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ ঠিক মত নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

বঙ্গনারী।

সমালোচনা

মন্দিরের কথা।—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার, এম, এ, বি সি এস প্রণীত। কলিকাতা, বাটারওয়ার্থ এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আঠারো টাকা। ছয়শতেরও অধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে সম্পদ-স্বরূপ। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে, পুরীর কথা, দ্বিতীয়ে কোনারকের কথা, তৃতীয় খণ্ডে ভুবনেশ্বরের কথা। ইহার বহু সন্দর্ভ চিত্র-সমেত ভারতীতে প্রথমে বাহির হইয়াছিল। এই দীর্ঘ গ্রন্থের 'চাবি' পাওয়া যায় ভাবশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটিতে। গ্রন্থের মুখপাতে ভূমিকাটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—শিল্পের স্পর্শে যে সব পাথর প্রাণবান, তাদের পুরোপুরি বুঝতে গেলে শুধু ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তো চলতে পারে না; শিল্পকার্য্য হিসাবেও সেগুলি কি সংবাদ দিচ্ছে সেটা জানা দরকার হয়ে পড়েছে। আগেকার কারিগর তাদের চিন্তামূর্ত্তি নিয়ে যুগ-যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনকার দর্শক আমাদের চিন্তা তার সামনে দাঁড়াল;—এই দুই চিন্তার আলাপে যে কথাটি বেরিয়ে এলো, সেটি হলো শিল্পের; আর মন্দিরের কারুকার্য্যের দিকের কথা হয় তো বা সেইটেই মন্দিরগুলোর আসল কথা, তাই বা কে জানে! ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এ সবের সঙ্গে আমার মনে হয়, মন্দিরগুলির গৌণ সম্বন্ধ, আর অচ্ছেদ্য মুখ্য সম্বন্ধ কারিগরের গড়া জিনিষ মাত্রেরই হল ভাবের আর রসের সঙ্গে, এই জন্য এই দুই দিক দিয়েই মন্দিরগুলিকে বোঝবার চেষ্টা যতই আমরা করব, ততই আমরা আমাদের দেশকে ঠিক চিনে নেবার সুবিধা পাবো। এই গ্রন্থ-রচনায় লেখকের বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রচুর পরিচয় পাই। এইসব বিচিত্র-গঠন মন্দিরই ভারতের অতীত সভ্যতার মূর্ত্তিমান নিদর্শন। গুরুদাস বাবু পুরী কোনারক ও ভুবনেশ্বরের মন্দির বিগ্রহাদির সম্বন্ধে বহু-যুগ-সঞ্চিত বিবিধ পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত তথ্য এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণের নানা মত সংগ্রহ করিয়া সেগুলির সুনিপুণ আলোচনা করিয়া যে সকল তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন, তাহা অমূল্য—প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়া ত বটেই,—তাছাড়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের বহু উপাদানও তিনি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই মন্দির-বিগ্রহাদির প্রসঙ্গে ভারতীয় অন্যান্য মন্দির ও দেব-দেবীর মূর্ত্তির, তুলনামূলক আলোচনায় লেখকের ঐতিহাসিক গবেষণার প্রচুর পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, শ্রীমূর্ত্তি, নরেন্দ্র সরোবর, গুণ্ডিচা গৃহ, কোনারকে বৌদ্ধ প্রভাব, সেকালের স্থাপত্য—এ-সব ঐতিহাসিক তথ্যের এমন সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন যে মূলে প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বহি হইলেও ইহার ঐতিহাসিক আলোচনার ধারাটুকু চমৎকার কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। গ্রন্থে মন্দির ও দেবদেবী প্রভৃতির ১৩৭ খানি ছবি দেওয়া হইয়াছে, প্রত্যেক ছবিখানি বিষয়গুলিকে সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এক কথায় বহিখানির রচনা এমন সরল ও হৃদয়-গ্রাহী যে পড়িবার সময় মনে হয়, পুরী কোনারকে ও ভুবনেশ্বরের পথে ঘাটে মন্দিরে যেন আমরা নিপুণ গাইডের হাত ধরিয়া বেড়াইয়া চোখে সব প্রত্যক্ষ করিতেছি, কানে তার অতীত গৌরবের বিচিত্র কাহিনী শুনিতেছি। এ গ্রন্থের আদর হইলে বুঝিব, বাঙালী সত্যই দেশকে জানিতে চায়, বুঝিতে চায়। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই ছবি—সমস্তই সুন্দর। তবে দরিদ্র দেশে আঠারো টাকা খরচ করিয়া বহি কিনিয়া পড়িবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। প্রকাশককে আমাদের অনুরোধ,—

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের মূল্য যেন কিছু কমাইয়া দেওয়া হয়। দশটাকা দাম করিলে অনেকে কিনিতে পারেন।

চরিত্র।—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। কলিকাতা, ইউনিয়ন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। কিরূপভাবে শিক্ষা দিলে মনুষ্যত্ব পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া দেশ-বিদেশের বহু চরিত্রবান ব্যক্তির জীবনের কৌতূহলোদ্দীপক বিবিধ আখ্যান লেখক এই গ্রন্থে গল্পচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। লেখক তাঁহার কাহিনীগুলিকে চারভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—আত্মচেষ্টা ও আত্মসংযম; গুরুভক্তি; নরসেবা; ও সচ্চরিত্র। কাহিনীগুলি মনুষ্যত্বের মহিমায় উজ্জ্বল। গ্রন্থের ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ, ভাষায় বেশ তেজ আছে, প্রাণ আছে। এ গ্রন্থ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইলে শিক্ষার সঙ্গে ছেলেরা আনন্দও লাভ করিবে প্রচুর।

জীবনের ভ্রম।—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বরাহনগর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, আরো মোনো প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। লেখক 'নিবেদনে' বলিয়াছেন,—"মনুষ্য অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হয় এবং তন্নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করে।—সেই ভ্রমের কারণ কি, তাহার সংশোধনের কোন উপায় আছে কিনা—" তাই তিনি 'চিন্তা করিয়া' বালকদের জন্য লিখিয়াছেন। অন্ধ কুসংস্কারসমূহ দূর করিয়া জীবনকে সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর খাড়া করাতেই জীবনের বিকাশ —এক কথায় ইহাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। তাহা করিতে হইলে শরীরের স্বাস্থ্যের দিকে কি-ভাবে নজর রাখিতে হইবে, আত্ম-নির্ভরতা কি করিয়া শিখিতে হইবে,—এমনি নানা বিষয়ে অনেক প্রয়োজনীয় কথারই লেখক আলোচনা করিয়াছেন। ক্রোধ প্রভৃতি দমন করা, গুরুজনে ভক্তি করা, সদ্বন্ধু নির্ব্বাচন করা প্রভৃতির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তবেই মনুষ্যত্ব বিকশিত হইবে। বহিখানির লেখা ভালো,—ভাষা বেশ সরল ও সহজ। উচ্ছ্বাসের মায়া কাটাইয়া যুক্তির উপরই লেখকের ঝোঁক,--রচনার উদ্দেশ্য সাধু। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এ গ্রন্থখানি ছেলেদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্য।—শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত। প্রকাশক, ইউ, রায় এণ্ড সন্‌স্‌, গড়পার রোড কলিকাতা। ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্‌ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এই ছোট বইখানি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য লেখা। স্বাস্থ্যরক্ষার মূল নিয়ম,—শরীরের যত্ন, ভোরে ওঠার উপকারিতা, স্নানের উপকারিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা, চুল রাখা, নখ রাখা, খাওয়া-দাওয়া, খেলা-ধূলা—পড়া, বিশ্রাম, ঘরের বাতাস—এমনি নব দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলি সহজ কথোপকথনচ্ছলে এমন সরল সুন্দর করিয়া লেখিকা বুঝাইয়াছেন, যে এ বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। বাঙলা ভাষায় এমন বহি পূর্ব্বে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্কুলে মোটা 'স্বাস্থ্যতত্ব' পড়াইয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় না—কারণ সে স্কুলের পড়ার বই—মুগুরের মতই ভারী ঠেকে। এ বইখানি রূপকথার বইয়ের মত হাল্‌কা, ছেলেরা আদর করিয়া পড়িবে; আর এ বইয়ের উপদেশের ভঙ্গীটুকুও এমনি মধুর যে ছেলেরা অবলীলাক্রমে তাহা গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক বাড়ীর অভিভাবক প্রত্যেক ছেলেমেয়ের হাতে এই বই একখানি করিয়া দিন—নাওয়া-খাওয়া বা পরিষ্কার থাকার জন্য ছেলেমেয়েদের যে তাহা হইলে আর বকিতে হইবে না, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি, ছেলেরা গল্পের বই ফেলিয়া এ বহির আদর করিতেছে, ও খুব ছোট ভাই-বোনদের উপদেশ দিতেছে। বইখানি সচিত্র। ছবিগুলিতে ছেলেরা শিক্ষার সঙ্গে মজাও বেশ পাইবে।

খাদ্য-কথা।—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। স্বাস্থ্য-সমাচার কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ষ্টাণ্ডার্ড ড্রাগ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এ গ্রন্থে খাদ্য-সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন উপাদান এবং খাদ্যের পরিপাক-প্রণালী বুঝাইয়া অভিজ্ঞ গ্রন্থকার খাদ্যসমূহের গুণাগুণ ও মাত্রা-নিরূপণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। বহি-খানি লেখকের ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে লিখিত—সুতরাং শাস্ত্রকারের মতই গ্রন্থকারের মত আমরা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি। অজীর্ণতারোগে মৃতপ্রায় এই ধ্বংসোন্মুখ বাঙালী জাতিকে এ গ্রন্থ বিশেষ করিয়া পড়িতে বলি, পড়িয়া এইভাবে চলিতে বলি,—রোগজীর্ণ বাঙালী তাহা হইলে রোগের হাত এড়াইয়া বাঁচিবে। এ গ্রন্থের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার সীমা নাই। দেশের এই দুর্দ্দিনে এ গ্রন্থ প্রচার করিয়া লেখক স্বজাতি-প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। গৃহ-পঞ্জিকার মত এ গ্রন্থ বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক।

দুনিয়ার দেনা। শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। বীরভূম, শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা। এখানি ছোট গল্পের বই। বোবা বওয়া, ফকিরের ফাঁক, দশের দোসর, পথের মানুষ, কাপালিকের কপাল, সাঁঝের পাড়ি, ও দুনিয়ার দেনা এই কয়টি ছোট গল্প এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ছোট গল্পের আর্টের দিক দিয়া সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইলে এগুলিকে ঠিক ছোট গল্প বলা যায় না। লেখিকাও তাহা বলেন নাই। প্রকাশক মহাশয় নিবেদনে বলিয়াছেন, এগুলি "সরস গল্প।" গল্প এগুলিকে বলা যায় এবং গল্পগুলি সরসও বটে। তবে গল্পগুলিতে

একটু বিশেষত্ব আছে।—গল্পগুলি পাঠকের চিত্তে ছোট ছোট নানা ছবি ফুটাইয়া তোলে, চিন্তারও খোরাক জোগায়। লেখিকার ভাষা মিঠা,—উচ্ছ্বাস কোথাও নাই। বইখানি মনোরম।

ঝড়ের দোলা। ফোর আর্টস ক্লাব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা চেরি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এখানি গল্পের বই। চারটি গল্প আছে। তবে গল্পগুলি চারজন বিভিন্ন লেখক-লেখিকার লেখা ১ পাগল—শ্রীমতী সুনীতি দেবী। ২ মাধুরী—শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগ। ৩ শ্রীপতি—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু এবং ৪ জয়মালা—শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ দাস। আমাদের সব চেয়ে ভালো লাগিয়াছে, শ্রীপতি ও জয়মালা গল্প দুটি। 'জয়মালায়' বাঙালী স্ত্রীর ideo-realistic মূর্ত্তিটুকু সুন্দর ফুটিয়াছে, সে মূর্ত্তি করুণ! সংসারে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে পরস্পরকে ভাল বাসিয়া সুখের সংসার গড়িয়াছে, সে সুখে দ্বিধা নাই, বিরোধ নাই—তবু তাহারি মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া যে অতৃপ্তির সুর প্রাণে বাজে, লেখক তাহা বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এই গল্পটিতে। শ্রীপতির মধ্যে আগাগোড়া যে কৌতুকের সুর বাজিয়াছে, সেটুকু বেশ উপভোগ্য। পাগল ও মাধুরী গল্পদুটিকে তাই বলিয়া মন্দ বলিতেছি না। পাগল গল্পে প্লট নাই—কতকগুলি suggestions এর মধ্য দিয়া চমৎকার pathos লেখিকা জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এ যেন রেখা দিয়া ছবি আঁকা। মাধুরী একটু tedious—একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে; গল্পের খেইও মাঝে মাঝে হারাইয়া যায়। যাই হোক, বইখানি উপভোগ্য হইয়াছে।

পুরাণ তত্ত্ব। (প্রথম খণ্ড) শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্ত্তৃক আবশ্যক। কাশীধাম, ত্রিশূল মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা। এই বইখানিতে অষ্টাদশ পুরাণের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করা হইয়াছে। কথোপকথনচ্ছলে সমালোচনা গ্রথিত। সমালোচনাটুকু হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের যে কঙ্কাল উদ্ধার করা যায়, সেটুকুর মূল্য আছে—তবে অবান্তর কথাও অনেক আছে; সেটুকু দ্বিতীয় সংস্করণে ছাঁটিয়া বাদ দিলে পাঠকের পক্ষে সুবিধা হয়।

রহমনখাঁর দুর্গোৎসব। শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা, এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীজ্ঞানদাচরণ দাস। মূল্য দেড়টাকা। এখানি ছোট গল্পের বই। রহমনখাঁর দুর্গোৎসব, সুদে আসলে, কীর্ত্তনীয়া, অন্নকূট, মুক্তি, এক যাত্রায় পৃথক ফল ও শান্তিজল—এই সাতটি গল্প গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলির প্লটে বৈচিত্র্য আছে। লেখকের ভাষা মন্দ নয়,—তবে মাঝে মাঝে কাঁচা হাতের পরিচয় বেশী লেখক এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "উপেন্দ্র নরেন্দ্র হইতে দুই বৎসরের বড়,"—"তাহার প্রতি পদ অতি সঙ্কোচে অতি ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইতেছিল।" "অরুণ যেন বন্দিত্ব দশা প্রাপ্ত হইল।" এই ভাষার দোষে এক এক জায়গায় গল্পের গতিও যেন নদীর চরে নৌকার মত আটকাইয়া গিয়াছে। ছোট গল্পের লেখককে ভাষার সাধনা ভাল করিয়া করিতে হয়। ভাষার উপর ছোট গল্পের কৃতিত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। লেখক নবীন,—তাই তাঁহাকে এ কথা বলিলাম। ভাষা শুধরাইয়া লইতে পারিলে এই লেখকের ছোট গল্প একদিন জমিতে পারে—বহিখানি পড়িয়া এমন আশা হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ। (নাটক)। শ্রীযুক্ত মতিলাল দে প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীভগবতীকুমার দে, কলিকাতা। বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড়টাকা। এ নাটকখানি কতক পদ্যে ও কতক গিরিশবাবুর ছন্দে রচিত হইয়াছে। বহিখানিতে নাটকত্ব বড় কম,—এক এক জায়গায় এক এক জনের মুখে প্রকাণ্ড বক্তৃতা চাপানো হইয়াছে। ভাষা ভালো। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-কাহিনীটুকু সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এইটুকুই যা এ গ্রন্থের স্বপক্ষে বলা যায়। গানগুলিতে কোন বিশেষত্ব নাই। গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য লীলা' ও 'নিমাই সন্ন্যাসে'র ছায়া বহুস্থলে পড়িয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতা। খ্যাতনামা বৈষ্ণব কবিদের পদসংগ্রহ। শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা। বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীবিনোদবিহারী পাল দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের বাছা বাছা পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। টীকা নাই; তবে দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ ফুটনোটে দেওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের কাছে এই সুদৃশ্য বহিখানির যথেষ্ট আদর হইবে। গ্রন্থের প্রারম্ভে বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে আলোচনাটুকু চমৎকার হইয়াছে। বহিখানির ছাপা কাগজ, অবয়ব সুন্দর।

ব্যথার দান। শ্রীযুক্ত কাজী নজরুল ইস্লাম প্রণীত। প্রকাশক, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি ছোট গল্পের বহি। ব্যথার দান, হেনা, ঘুমের ঘোরে, অতৃপ্ত কামনা, বাদল বরিষণে ও রাজবন্দীর চিঠি—এই সাতটি গল্প এগ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য আছে, সবগুলিই রোমান্স; তাহাতে ব্যথার সুরই আগাগোড়া বাজিয়াছে। কাবুল, বেলুচিস্তান, সাহারার ক্যাম্প, এমনি নানা বিচিত্র জায়গার বিচিত্র দৃশ্য-মাধুরীতে ও সেখানকার আব-হাওয়ায় গল্পগুলি ভারী মিঠা মশগুল হইয়া উঠিয়াছে। তবে গল্পগুলি কবিত্বের অত্যুগ্র উচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে এমনি ফ্যানাইয়া উঠিয়াছে যে তাহা একঘেয়ে হইয়া রসভঙ্গও করিয়াছে। ভাষায় মুদ্রাদোষও মাঝে মাঝে আছে। নহিলে গল্পগুলি মন্দ নয়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

নৃত্যকলার বিকাশ

পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে বহু প্রাচীন কাল হইতেই নাচের প্রচলন আছে—তা সে দস্তুরমত সুসভ্য জাতি হৌক, আর নেহাৎ বন্য অসভ্য জাতিই হৌক। সাঁওতালী নাচ দেখিয়া সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, রমণীদের

বসন্তের গান নাচ

সারা অঙ্গে নিমেষে যেন একটা কোলাহল পড়িয়া গেল! এই কোলাহল নানা রকমের—কখনো মৃদু, কখনো ভীষণ! যে নাচে কোলাহল মৃদু, সে নাচ উচ্চাঙ্গের। কবি বলিয়াছেন 'নৃত্য সে যে, অঙ্গে অঙ্গে ছন্দের বিকাশ!'

এই নৃত্যে প্রাণ-সঞ্চারের চেষ্টা মানুষ চিরকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। মনের কোন একটি বিশেষভাবকে রূপ দেওয়াই নাচের লক্ষ্য হওয়া দরকার। যেমন আনন্দ, বিষাদ! নৃত্যে এই রূপ ফুটিলেই তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠ হয়। নৃত্যে এই যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, ইহা কাল্‌চার-সাপেক্ষ যে-নৃত্যে আমরা প্রাণের সন্ধান পাই, তাহাকেই ললিতকলার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আদর করি। সুর-সভার উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভার নৃত্য-কৌশলের কল্পনা মানব চিত্তে নৃত্য-ক্ষুধারই পরিচায়ক। ভারতে অজন্তা গুহায় নৃত্যভঙ্গীর কত-শত ছবিই আমরা দেখিতে পাই। অঙ্গে অঙ্গে সুরের হিল্লোল, গতির মনোরম ছন্দ এই ছবির মূর্ত্তি

রুস নট ও নটী মাইকেল মর্ডকিন ও আনা পাব্‌লোভা

সমাধি-যাত্রা নাচ

গুলিতে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছে। চিত্রগুলিতে নৃত্য যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে! আমাদের দেশে পরাধীনতার ফলে অন্যান্য ললিত-কলার চর্চ্চা যেমন কমিয়াছে, নাচের কদরও তেমনি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গুজরাটের গরবা নৃত্য, কোল-ভীলের নাচ, ময়ূরভঞ্জের নাচ,—এ-সবও যেন নির্জীব হইয়া পড়িতেছে। নাচের সমঝদার নাই, তা নাচিবে কে? সেকালে বৈঠকে, মজলিসে বাই-নাচের যে প্রচলন ছিল, তাও উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে! নাচ এখন রঙ্গমঞ্চে যথেচ্ছ লম্ফে-ঝম্পে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে! এত-বড় ললিত কলার চর্চ্চা দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে, ইহা কম পরিতাপের বিষয় নয়।

অথচ য়ুরোপে আজকাল নাচ কলা-হিসাবে নিত্য নূতন অপরূপ ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতেছে। ভারতীয় আদর্শে, ভারতীয় ছাঁচে যে নৃত্য-প্রথার প্রবর্ত্তন হইতেছে, তাহা সমস্ত বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে,—অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির দার্শনিককে অবধি পুলকিত করিতেছে! এ নৃত্য-প্রথার প্রবর্ত্তকের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মিস মড আলানের নাম উল্লেখযোগ্য। য়ুরোপের বল্ নাচ, টাঙ্গো

সালোম নাচ (সম্রাট হিরডের সামনে)

সালোম নাচ

নাচ আমাদের দেশের অনেকেব চোখে ভাল ঠেকে না। তাহার যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য আছে, যুরোপ-বাসাই তাহার সমঝদার। কিন্তু মড আলান প্রাচান যে-সকল ভাব নাচে সজীব করিয়া তুলিতেছেন, তাহার রমণীয়তা আর বৈচিত্র্য সকলেরই প্রাণেই সৌন্দর্য্যেব বেখাপাত করিবে। চিত্তের কোন বিশেষ ভাবকে রূপ দেওয়াই মড আলানের নাচের প্রধান লক্ষ্য। নৃত্যকলার ইহাই চরম বিকাশ! মড আলানের সালোম্ নাচ এমন অপূর্ব্ব যে এই নৃত্য-মাধুর্য্য দেখাইবার জন্য তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন— তাঁহার এ নৃত্য-কৌশল দেখাইয়া তিনি বিশ্বব্যাপী কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। ফুলের রূপ, ছবির রূপ, গানের রূপ, আলোর রূপ, সুরের রূপ, হাওয়ার রূপ—এ সমস্তই বিচিত্র কৌশলে নৃত্যের ভঙ্গীতে এমন মনোহর করিয়া তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন যে তাঁহার নাচ দেখিয়া দর্শক সবিস্ময়ে ভাবে, এ কি দেখিলাম! 'বসন্তের গান' মেণ্ডেলসনের একটি বিখ্যাত গান। পরিপূর্ণ যৌবনের মাধুর্য্যে হিল্লোলে পেলবতায় ও আনন্দের সুরে রচনাটি অপূর্ব্ব সুন্দর, সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যই মড আলান তাঁহার বসন্তের গান নাচে তেমনি সুকুমার ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গতির ভঙ্গীতে অঙ্গের দোদুল হিল্লোলে যৌবন যেন তাহার পরিপূর্ণ তারুণ্যে তাঁহার নৃত্য-লীলায় জাগিয়া উঠিয়াছে!

এ নাচে অঙ্গে অঙ্গে আনন্দের যেমন হিল্লোল ছুটিয়াছে, তেমনি আবার বিষাদের করুণ সুর জাগিয়াছে, মড আলানের 'সমাধি যাত্রা' নাচে!

কিন্তু সব-চেয়ে প্রাণস্পর্শী নাচ, তাঁহার সালোম নৃত্য।

ক্লিওপেট্রা নাচ

স্পেনের নর্ত্তকী ভালেন্সিয়া

স্মরণ করিয়া সালোম শিহরিয়া উঠিল, তখন তার মুখে-চোখে সারা অবয়বে কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন আসিল, অঙ্গভঙ্গী যেন মন্থর হইয়া পড়িল! শরীর ও মনের দিক দিয়া এ নাচে ললিত কলার চরম বিকাশ ঘটিয়াছে!.

এ নাচের প্রভাব য়ুরোপ ও আমেরিকাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। মড আলানের অনুকরণ করিয়া শত শত নর্ত্তকী আজ সালোম নাচের বিচিত্র বিকাশ দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। মড্ আলানের পর মাদাম ওল্গিৎ ভালেরির নাচ উল্লেখযোগ্য। মাদাম ভালেরি বলেন, গানের মত নাচের বিকাশও সুরের লীলায়। তাঁহার 'ক্লিও-পেট্রা' নাচ জগতে প্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এ নাচে তাঁহার প্রতিভার অসাধারণ বিকাশ হইয়াছে!

এ নাচে ক্লিওপেট্রার জীবন একেবারে মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! অঙ্গের চপল হিল্লোলে গতির ললিত ভঙ্গীতে মণি-মাণিক্যের ঔজ্জ্বল্যে ক্লিওপেট্রার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, দম্ভ, ঐশ্বর্য্য, ক্ষোভ, ঈর্ষা এমন প্রতিফলিত হইয়াছে যে এ নাচ দেখিতে দেখিতে আমরা সেই মিশর-মণি

রোশেনারার ভারতীয় "স্বর্ণ-শস্য-নৃত্য"

বিশ্বসভায় এ নৃত্য ইন্দ্রজালের মতই সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে! তাহার মৌলিকতায় ও বিকাশের বিচিত্র ললিত ভঙ্গীতে, আকারে ইঙ্গিতে এ নাচের আর তুলনা নাই!

সালোম নাচের বিকাশের ধারাও ভারী বিচিত্র। প্রথমে সম্রাট হিরডের সামনে আপন-ভোলা বিলাস-নৃত্য। তারপরে নাচিতে নাচিতে যখন ... বড় হত্যার কথা

ক্লিওপেট্রা মূর্ত্তিতে মাদাম্ ভালেরি

ক্লিওপেট্রাকে যেন চোখের সামনে জীবন্ত দেখিতে পাই! ফুলের মধ্য হইতে বিষাক্ত সর্প ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—সেই সর্পকে মুঠিতে চাপিয়া ধরিয়া মাদাম ভালেরি যে ক্লিওপেট্রাকে নাচে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে ক্লিওপেট্রার শেষ জীবনের ভীষণ নৈরাশ্য ও অন্তর্দাহ তাহার চরম বেদনা লইয়া দেখা দিয়াছে।

এ সাপটিও আবার খেলার সাপ নয়, আস্ত জীবন্ত সাপ!

প্রাচীন ভারত ও মিশরের দিকেই এখন য়ুরোপীয় নর্ত্তকীদের ঝোঁক বেশী। এই দুই দেশের অন্তরের বিশেষ বিশেষ ভাব নাচে ফুটাইয়া তুলিতেই তাঁহাদের সমধিক আগ্রহ। মিস্ রুথ সেণ্ট ডেনিস ভারতীয় নর্ত্তকীর নৃত্যের নানা ছাঁদ তাঁহার নাচে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার বন-নৃত্যে ভারতীয় যোগীর অর্চ্চনার একটি বিশেষ ভঙ্গীকে তিনি রূপ দিয়াছেন। ভারতীয় নাচের প্রাণ গতির সুরে, গতির ভঙ্গীতে, অবয়বে ছবি ফুটানোয়। মিস্ সেণ্ট ডেনিস্ তাহাতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভারতীয় নর্ত্তকী সাজিয়া ভারতের বহু নৃপতির আসরে তিনি যে নাচ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া কাহারো মনে এতটুকু সন্দেহ জাগে নাই যে তিনি একজন য়ুরোপীয় মহিলা!

আর একজন য়ুরোপীয় মহিলা নাচে অপরূপ ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার নাম মিস্ মঙ্কম্যান। পাখা, ফুল, ইহাদের রূপ দেওয়াই তাঁহার নাচের লক্ষ্য। তাঁহার প্রজাপতি নৃত্য ললিতকলার অপূর্ব্ব বিকাশে উজ্জ্বল।

প্রজাপতির জন্মে ভাবটুকু যেমন মিষ্ট, তাহার

বন নৃত্য

নর্ত্তকী আনা পাব্‌লোভা

ইংরাজী রঙ্গালয়ে নাচ

পার্সী নর্ত্তকী ওহানিয়ান

প্রজাপতির জন্ম

প্রকাশও তেমনি মধুর ! এ যেন জীবন্ত কাব্য ! প্রভাতের প্রথম রৌদ্র-কিরণে প্রজাপতির জন্ম হইল। তাহার তরল লঘু গতি, তাহার ক্ষিপ্র উদাস ভাব, তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্য এ নাচের মুখপাতে কি সুন্দর ফুটিয়াছে। তারপর পাখা মেলিয়া প্রজাপতি উড়িতে চাহিল, নাচেও অমনি রঙ বাহার ফুটিল! প্রজাপতির হাল্‌কা জীবনের হাল্‌কা ভঙ্গীটুকু মিস মক্‌ম্যানের নাচে কি দীপ্ত জীবন্ত ভাষায় মধুর ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে!

তা ছাড়া রোশেনারা, স্পেনের ভালেন্সিয়া, রুশ নর্ত্তকী কারাসাভিনা, আনা পাবলোভা, পার্সী নর্ত্তকী ওহানিয়ান— ইঁহারাও নাচে অনেক নূতন ভাব নূতন ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সে-সব নাচে কালচারের পরিচয়ও প্রচুর পাওয়া যায়।

রুশিয়ায় নাচের রেওয়াজ পুরামাত্রায় বর্ত্তমান। মুটে মজুর, চাষীর দলও সেখানে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া সন্ধ্যার পর নাচিয়া মনকে হাল্‌কা করিয়া লয়। সেকালের গ্রীক নাচের অনেক ভঙ্গী আজকাল রুশ নাচে দেখা যায়। নাচে ইংরাজের খ্যাতি নাই। তাদের নাচ অত্যন্ত কৃত্রিম—ধাপুড়-ধুপুড় গোছের। এক এক সময় পালোয়ানী কসরৎ বলিয়াও মনে হয়। ইংরাজ এখন রুশ নাচের নকল করিতেছে।

য়ুরোপে নাচ শিখাইবার জন্য নৃত্য বিদ্যালয় আছে। আর্ট হিসাবে সেখানে নাচের শিক্ষা দান হয়। তাছাড়া যে-সব নর্ত্তক-নর্ত্তকীর প্রতিভা আছে, তাঁহারা নাচে নানা রস, নানারূপ ফুটাইয়া নাচকে সজীব, মুখর করিয়া তোলেন।

প্রাচীন গ্রীসের নাচের নকলে য়ুরোপে দিনকতক 'রেনবো' ও 'সার্পেন্‌টাইন' নাচের ভারী ধূম পড়িয়াছিল—

প্রজাপতি নৃত্য

রুস নট ও নটী আডল্‌ফ্‌ বোম্‌ ও কারাসাভিনা (একটি রূপকথার নৃত্যাভিনয়)

…স নাচে পোষাকের বহর ছিল খুব …বর রকমের। 'সার্পেনটাইন নাচে, …না যায়, এক নটীর পোষাক ছিল …ক মাইল দীর্ঘ। এখন 'সার্পেন-…টাইন' নাচের রেওয়াজ এক রকম …ঠিয়া গিয়াছে।

…-সব দেখিয়া মনে হয়, নাচটা উড়াইয়া দিবার জিনিষ নয়। গান গাওয়া, ছবি আঁকা, এ-সবের মত নাচও ললিত-কলার অঙ্গ। এ অঙ্গটিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গুর মত উপেক্ষার মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে ললিত কলার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হইতেই পারে না—এ কথা মনে রাখিয়া আমাদের উচিত, এখন নাচের দিকে মন দেওয়া। রঙ্গ-মঞ্চের বিকট লম্ফ-ঝম্পে নৃত্য-কলার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিয়াছে—গলা টিপিয়া নৃত্য-কলাকে আমরা সেখানে হত্যা করিতেছি! এই উচ্চাঙ্গের কলা যাহার-তাহার হাতে খোঁচা খাইয়া মরে যদি, তাহা হইলে সে পাপ আমাদের বড় অল্প হইবে না! নাচের আদর বাড়ুক, মজলিসে বৈঠকে সমঝদার আসিয়া বসুন, বারবনিতার লাস্যময় নির্জীব পদ-তাড়নার পেষণ হইতে তবেই নৃত্যকলার উদ্ধার সম্ভব হইবে। নহিলে এমন সুন্দর ললিত-কলা যদি চর্চ্চার অভাবে, আদরের অভাবে উঠিয়া যায়, তবে আর আপ্‌শোষের সীমা থাকিবে না।

শ্রীকুমুদিনীমোহন নিয়োগী।

নিস্তারিণীর রাজনীতি

হাঁ৷ দাদাবাবু, ভাল আছ ত? বউদিদি, কত দিন প…র আবার দেশে এলে! তোমাদের এই ফুটফুটে ছেলেপিলেগুলি যে দেখে, সেই দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকে। তা …চে থাকুক, বেঁচে থাকুক, ছেরজীবি হয়ে সব বেঁচে থ…ক!

তা দাদাবাবু, তোমরা ত কত দেশ দেখলে, কত জায়গায় বেড়ালে, তুমি কত রোজগার কর্‌লে, লোকের মুখে তোমার নাম শুন্‌লে কত আহ্লাদ হয়! ছেলেবেলা তোমায় কোলে পিঠে কোরে মানুষ কোরেচি, এখন তুমি বড়লোক হয়েচ, তবু তোমাদের পুরাণো ঝি বলে যখন দেশে এস, তখন আমাকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে কত যত্ন আইত্তি কর।

দেখ, দাদাবাবু, তোমরা ত সব খবর রাখ, তুমি কত লেখাপড়া শিখেচ, কোন্‌ দেশে কি হচ্চে, সব জান।

আমরা মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ, কিছু জানি নে, কিছু বুঝ্‌তেও পারিনে। দেশে যে কি হয়েচে, দেখ্‌লে শুন্‌লে আক্কেল গুড়ুম হয়। এই দেখ না পুলিসের ধর্‌-পাকড়। পুলিসে চোর-ছ্যাঁচড়, খুনী-ডাকাত ধরে, এই ত জানি। এ আবার কি নতুন কাণ্ড! এই যে সভা বলে, সে ত চিরকাল হয়, গোলদীঘিতে ত ছেলেরা জড় হয়ে বরাবর বক্তিমে করে। তা এখন তাদের পুলিসে ধরে কেন, আর মেজেষ্টর সাহেব তাদের জেলেই বা দেয় কেন? তারা চোর নয়, গাঁট-কাটা নয়, দিনে-দুপুরে ডাকাতিও করে না। ও মা, তাই কি ধরা বলে ধরা! একটা পাহারওয়ালা, পাঁচশো জন লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কে কাকে ধরে! লাঠি হাতে একজন পাহারাওয়ালা, তার পিঠ চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে হাসতে হাসতে কাতারে কাতারে লোক ছুটেছে। পথের লোক বলে, আমাদেরও ধরে নিয়ে চল! এ কি জেলে যাওয়া না শঙ্করার মেঠাই-মণ্ডা খেতে ছোটা? জেলে যেতে কোথায় ভয়ে সারা হবে, না, গান গাইতে গাইতে মাঝ-রাস্তা দিয়ে চলেচে? যেন বারোয়ারির দল। কিছু বুঝতে পারিনে দাদাবাবু, কিছু বুঝতে পারিনে।

আর সবাই বলে মহাত্মা গাঁধির জয়। পথে ঘাটে যেখানে যাও কেবল ওই এক বোল। হ্যাঁ দাদাবাবু, মহাত্মা গাঁধিকে তুমি দেখেচ? একবার তিনি এই গোলদীঘিতে এসেছিলেন। আমি মাধববাবুর বাজার থেকে ছানা কিনে নিয়ে আস্‌চি, আর সব চেঁচাচ্চে, মহাত্মা গাঁধির জয়! আমি ভাবলুম, যাই, একবার দেখে যাই। বাপরে, যে ভিড়, কার সাধ্যি তার ভেতর ঠেলে যায়। আমার দেখা হ'ল না। পাপী কিনা, মহাত্মা দর্শন হবে কেন? আচ্ছা, দাদাবাবু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। শুনেচি সেকালে নাকি মুনি-ঋষিরা মহাত্মা হতেন। এই কলিকালেও কি মহাত্মা হয়? না হলেই বা দেশশুদ্ধ লোক মহাত্মা গাঁধি বল্‌বে কেন? তিনি নাকি ঠিক দেবতার মতন? তাই যদি হবে তা হলে সরকার তাঁকে জেলে দিলে কেন? যে পাপ করে দুষ্কর্ম্ম করে, সেই জেলে যায়। বরাবর লোকে এই ত জানে। যে মহাত্মা হয়, দেবতা হয়, তাকেও কি জেলে দিতে হয়? তোমরা আইন জান, তোমরা বল্‌তে পার। হ্যাঁ গা, এ কোন দেশী আইন যে মহাত্মা দেবতাকে আর চোর-ডাকাতকে এক জেলে পোরে? সত্যি যুগে নাকি বাঘ-ছাগলে এক ঘাটে জল খেত, তাই বুঝি কলিকালে মহাত্মাকে আর চোরকে এক জেলে দিতে হয়। তা এ কলির বিচার, এতে আর সরকারের দোষ কি? যার রাজ্যে বাস করি তার কি নিন্দে কোরতে আছে? জলে বাস কোরে কি কুমীরের সঙ্গে কোঁদল কর্‌লে একদণ্ড চলে?

দাদাবাবু, আমি এলোমেলো আবল্‌ তাবল্‌ কত কি বল্‌চি তাতে তুমি ব্যাজার হচ্চ না ত? এই দেখ, রামচন্দ্র দেবতা ছিলেন, বাপের কথায় তিনি বনে গেলেন। আচ্ছা, সে সময় যদি অযোধ্যায় অন্য রাজা থাকৃত তাহলে কি রামচন্দ্র জেলে যেতেন? কেষ্টো ত সাক্ষাৎ ভগবান, তা কংস ত তাঁকে মেরে ফেল্‌তে বসেছিল, তাঁর বাপ মাকে হাতে পায়ে শেকল দিয়ে জেলে পুরে রেখেছিল। তবে দেবতায় আর চোর-ডাকাতে তফাৎ কি হ'ল? কিছু বুঝতে পারিনে, দাদাবাবু, কিছু বুঝতে পারিনে।

শুধু কি মহাত্মা গাঁধি? ভবানীপুরের কৌঁসিলী সি আর দাস আর পইরাগের উকীল পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কি কোরলেন! কে কবে এমনতর কাণ্ড শুনেচে! ভবানীপুরে কতবার তত্ত্ব নিয়ে গিয়েচি, সি আর দাসের বাড়ী দেখেচি, তাঁকে বাড়ী থেকে হাওয়া-গাড়ী কোরে যেতে দেখেছি। এমন রোজগার নাকি কখনো কেউ করে নি। মানুষে টাকার জন্যে হাহাকার করে, কত কুকর্ম্ম করে, আর উনি অত টাকার আয় পায়ে ঠেলে ফেলে দিলেন! তবু যদি সাধু-সন্ন্যাসী বৈরাগী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন, তাহলেও না হয় লোকে বুঝত যে, উনি উদাসীন হয়ে, সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। কেন, পাকপাড়ার লালাবাবু ত অমন ঐশ্বিজ্জি ছেড়ে গোবৰ্দ্ধন গুহায় গিয়েছিলেন। কিন্তু সি আর দাস ত বোষ্টম্‌ হন নি, বনেও যান নি। তাঁকেও জেলে দিয়েচে। শুধু কি তাঁকে? এক বই ছেলে নয়, সেও জেলে গিয়েছিল। সীতা-সাবিত্রীর মত তাঁর পরিবার বাসন্তী দেবী, তাঁকেও ত পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তবে তাঁর জেল হয় নি।

না দাদাবাবু, এঁরা কি কোরেছিলেন? ওই কি বলে, স্বদেশী না দেশের কাজ কর্‌ছিলেন? তা কোর্‌লে কি অত-বড় রোজগার ছাড়তে হয়, না, জেলে যেতে হয়? এই দেখ দাদাবাবু, আগে ত সব মস্ত মস্ত লোক দেশের জন্যে কত সভা কত বক্তিমে কোরতেন,. কেউ উকীল, কেউ কৌঁসিলী, কেউ খবরের কাগজ লেখেন, কিন্তু তাঁরা ত কেউ রোজগার ছেড়ে দেন নি, কেউ জেলে যান নি! তাঁদের কেমন বাড়ী-ঘর, কত টাকা-কড়ি, গাড়ী-ঘোড়া, হাওয়া-গাড়ী। তবে এখন এমন কেন হ'ল? দাদাবাবু, এর আগের বারে যখন দেশে এসেছিলে, তখন বউদিদির মুখে গল্প শুনেছিলুম যে, তুমি পণ্ডিত মতিনালের বাড়ী খানা খেয়েছিলে, তাঁর সঙ্গে তোমার ভাব আছে। তাঁর মত বড়মানুষী নাকি রাজা-রাজড়াও কখনো করে নি। তাঁরও এক ছেলে, সে নাকি বিলেতে খুব সাহেব হয়েছিল। তারপর কিনা সব সাহেবিয়ানা গেল, বাপে-বেটায় জেলে গেল! পণ্ডিত মতিনালকে দেখলে লোকে তার পায়ের ধুলো নেয়। পেরাগে যারা কল্পবাস কোর্‌তে যেত তাদের মুখে শুনেচি, পণ্ডিত মতিনালের নাকি একটা পাড়া জুড়ে বাড়ী, কত রকম যে বড়-মানুষী তার সীমে নাই। দেখে শুনে মনে হয় যুগ উল্টেচে, তা নইলে কি কখনো এমন হয়? আমরা ত কিছু বুঝ্‌তে পারিনে, তাই তোমায় জিজ্ঞেস কোর্‌চি।

এই যে স্বদেশীর হই-চই পড়েছে এটা কি দাদাবাবু? দেশ কি আবার নিজের ছাড়া পরের হয় না কি? রাজা যদি অন্য দেশের হয়, তা সেও ত দেশটাকে মাথায় কোরে তুলে নিয়ে যেতে পারে না। নিজের দেশের জিনিষ খাও, নিজের দেশের কাপড় পর, তাও কি আবার ঢাক বাজিয়ে সবাইকে বল্‌তে হয় না কি? সব দেশে কি তাই করে না? ছেলেবেলা দিদিমার কাছে শুন্‌তাম, গরিব বড় মানুষ সকলেই দিশী কাপড় পর্‌ত, তা মোটা হোক আর ভাল হোক। আবার তাই হ'লে দোষ কি? বিলিতী কাপড় সস্তা বলে কি সবাই কেনে? তা হলে বিলেতে আমাদের দিশী কাপড় কেনে না কেন? কেনা-বেচা, খাওয়া-পরা সব তাতে ত আর নীর মুখ দেখা হওয়া চাই। কেমন, দাদা বাবু? যদি বিলেতে এ দেশের কাপড় না পরে, তা হলে এ দেশেই বা বিলেতের কাপড় পরবে কেন?

খাওয়াও সেই রকম। যে দেশে যেমন খাওয়া, সে দেশের লোক সেই রকম খাবে, এই ত জানি। সাহেবেরা যা খায় তা তাদের ভাল, আমরা যা খাই আমাদের তাই বেশ। তবে বাবু-ভেইয়ারা বিলাতে দু চার বছর থেকে দেশে ফিরে এসে সাহেব সাজে কেন, আর সাহেবি খানা খায় কেন? ওই যে বামুনদের ছেলে তিনটে পাস কোরে বিলেতে গিয়েছিল, সে ত বিলেতে মোটে তিন বছর ছিল, তার পর ফিরে এসে একেবারে সাহেব, সাহেবের মত খাওয়া-পরা, সাহেবের মত চলা-ফেরা, সব সাহেবী রকম। আর সাহেব যারা তিরিশ বছর এ দেশে থাকে তারা ত বাঙালা হয়ে যায় না, বাঙালার মত ধুতি-চাদর পরে না, মাছের ঝোল ভাত খায় না। সাহেব সাজ্‌লে কি পউরুষটা বাড়ে? আর সত্যি সত্যি যে সাহেব নয়, সে কি কখনো সাহেব হতে পাবে? আবার এই যে বিলেত না গিয়েই সাহেব সাজে, এ কি-রকম দাদা বাবু? তুমি ত অনেক টাকা রোজগার কর, তুমি ত সাহেব সাজ না? আমি যাদের বাড়ী কাজ করি, তাদের পাশের বাড়ীতে একঘর ভাড়াটে এসে কিছু দিন ছিল, একেবারে মস্ত সাহেব অথচ বিলেত কখনো চক্ষেও দেখে নি। বাড়ীতে চাকর নেই খানসামা আছে, ঝি নেই আয়া আছে। বাপ-পিতেমো ভুঁয়ে আসন পেতে খেত, এখন এরা টেবিল না হলে খেতে পারে না। ঘাগরা-পরা একরত্তি একটা মেয়ে চাকরকে ডাকৃত, খানসামা, মেম-সাহেব বোলাতা হায়। মেম-সাহেব ত মেম-সাহেব, একেবারে শ্যাওড়া গাছের পেত্নী! হ্যাঁ গা বউ দিদি, তোমায় যদি কেউ মেম-সাহেব বলে, তা হলে কি তোমার ভাল লাগে? এমনতর অনাছিষ্টি ত কোথাও দেখি নি! একদিকে মহাত্মা গাঁধি, সি আর দাস আর পণ্ডিত মতিনালকে দেখ, আর এক দিকে এই সাহেব-মেম দেখ। রাম চাটুর্য্যের ছেলে হরি চাটুর্য্যে কি না সাহেব! বাপ ধুতি পরে ছাতি মাথায় দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ কোরে আপিসে যেত, বাড়ীতে গামছা কি ঠ্যাঙে-ওঠা কাপড় পরে থাকৃত, আর ছেলে হ্যাট-কোট প'রে, পা

ফাঁক কোরে দাঁড়িয়ে চুরুট ফুঁকচে! বলে কার গুষ্টিতে কে জন্মায়! একি দত্যি-বংশে পেল্লাদ, না মনিষ্যি-বংশে বাঁদর?

তোমরা হয়ত বল্বে, তোদের বাসন-মাজা ঘর-নিকোনো কাজ, তোদের অত সাত-সতেরোর খোঁজে দরকার কি? তা সত্যি দাদাবাবু, কিন্তু এখন আর সে কাল নেই, সে কাল নেই। ঝি চাকর মুটে-মজুরের মেজাজ দেখচ ত? পান থেকে চুণটি খস্বার জো নেই, তুমি ছাড়া তুই বল্লেই চক্ষু দুটী যেন জবা ফুল! আজকাল যে সময় পড়েচে, দাদাবাবু, সবাইকে সব কথা ভাব্তে হয়। এ যেন দেখ্তে দেখ্তে যুগ উল্টে যাচ্ছে, দেশে এমন কোটালে বান ডেকেচে যে সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন মা কালীর ইচ্ছে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সঙ্কলন

বঙ্গীয় নাট্য-কলা

বঙ্গীয় নাট্যকলার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় শ্রীচৈতন্যদেব পার্ষদবর্গের সহিত কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতেন। আপামর জনসাধারণ সমক্ষে যখন এ সকল অভিনীত হইত তখন সে সমুদায় বঙ্গ ভাষায় হওয়াই সম্ভব। তখন বাঙ্গালা ভাষা নিতান্ত ক্ষীণ ছিল এবং তৎকালীন অভিনীত নাটকাদির নমুনা পাওয়া সুকঠিন। তবে প্রাচীন পদাবলী হইতে অভিনয়োপযোগী রচনার বিশেষ অভাব পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উক্ত প্রকারের রচনা আধুনিক গীতি-নাট্যের অন্তর্ভুক্ত।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বাঙ্গলা ভাষায় নাটকাদি রচিত হইতে আরম্ভ হয়। তবে ইহার মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত নাটকাদির অনুবাদ হইলেও অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে রচিত নহে। তন্মধ্যে লোচন দাসের "জগন্নাথ বল্লভ," যদুনন্দন দাসের "বিদগ্ধ মাধব" বা "রাধাকৃষ্ণলীলা কদম্ব" এবং প্রেম দাসের "চৈতন্য—চন্দ্রোদয় কৌমুদী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যাখ্যাসহ পয়ার ছন্দে লিখিত মূলের অনুবাদ মাত্র। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে নাটকাদির অভিনয় বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইতে থাকে। এ সমুদায় গীতিনাট্যের অন্তর্গত এবং দৃশ্যপটাদির সাহায্য ব্যতিরেকে অভিনীত হইত। নবদ্বীপ নিবাসী কৃষ্ণকমল গোস্বামী বিশেষ আগ্রহ ও যত্নসহকারে প্রথমে নবদ্বীপে "নিমাই সন্ন্যাস" ও পরে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে "স্বপ্নবিলাস" "রাই উন্মাদিনী" "বিচিত্র বিলাস" "ভারত-মিলন," "সুবল সংবাদ," "নন্দ হরণ" প্রভৃতি গীতাভিনয় প্রকাশ করিয়া সাতিশয় খ্যাতি লাভ করেন। কৃষ্ণকমল প্রকাশিত স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী ও বিচিত্র বিলাস এই তিনখানি গ্রন্থের অবলম্বনে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় "The popular dramas of Bengal নামক পুস্তক প্রকাশ করেন ও জর্ম্মন, রুশ প্রভৃতি দেশেও প্রচার করেন। এতৎ-প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর, বীরভূম, নদীয়া, যশোহর ঢাকার জমীদারগণের আন্তরিক চেষ্টা ও সহানুভূতি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তাঁহাদের উৎসাহে তৎকালীন নাট্যসম্প্রদায় (যাত্রা পার্টি) গীতাভিনয় দ্বারা জনসাধারণের মনোরঞ্জনচ্ছলে নৈতিক শিক্ষাদানে সমর্থ হইয়াছিল। পরে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা ভাষায় নাটকাদি রচিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮২১ খৃঃ অব্দে কলিরাজার যাত্রা এবং ১৮৩১ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসুন্দর নামক নাটক বাগবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র বসুর রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনীত হয়। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বে জেনারেল এসেম্বি্ল (স্কটীস চার্চ) বিদ্যালয়ের গণিত অধ্যাপক তারাচাঁদ সিকদার ইংরাজী নাটকের আদর্শমত "ভদ্রার্জ্জুন" নাটক রচনা করেন। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে পণ্ডিত রামগতি তর্করত্নের সংস্কৃত-নাটকের আদর্শ মত "মহানাটক" প্রকাশিত হয়। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে নলদময়ন্তী তৎপরে যোগেন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক "কীর্ত্তিবিলাস" নীলমণি পাল কর্ত্তৃক "রত্নাবলী," তর্করত্নের "বিল্বমঙ্গল," ১৮৫৪ খৃঃ রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব এবং অল্পদিন পরে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ বিক্রমোর্ব্বশী ও বেণী-সংহার নাটক

প্রকাশ করেন। অনতিকাল পরে সিমলা ছাতু বাবুর বাড়ীতে মালবিকাগ্নিমিত্র এবং পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর দ্বিতীয় বার অভিনীত হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকের ছায়া অবলম্বনে বোধেন্দুবিকাশ নামক নাটক প্রকাশ করেন। ইহার পর হইতে ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় বহুতর নাটক প্রকাশিত হইতে থাকে। তন্মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষের ভানুমতীর চিত্তবিলাস উল্লেখযোগ্য। উহা মহাকবি Shakespereএর Merchant of Venice এর অনুবাদ। অতঃপর ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত শর্ম্মিষ্ঠা নাটক প্রকাশ করেন এবং পর পর অন্যান্য নাটকগুলি প্রকাশিত হয়। এই সময় ভবানীপুর নিবাসী উমেশচন্দ্র মিত্র বিধবা বিবাহ ও সীতার বনবাস নাটক রচনা করেন। তৎপরে ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে রামনারায়ণের নব নাটক প্রভৃতি এবং মনোমোহন বসুর রামাভিষেক প্রভৃতি নাটকাবলী প্রকাশিত ও অভিনীত হইতে থাকে।

সেবা ও সাধনা, বৈশাখ, ১৩২৯। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দে।

ঘাস

(গান)

কখন্ বাদল-ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি
সবুজ মেঘে মেঘে।

ঐ ঘাসের ঘন ঘোরে
ধরণীতল হল শীতল
চিকণ আভায় ভরে,

ওরা হঠাৎ-গাওয়া গানের মত
এল প্রাণের মেঘে॥

ওরা যে এই প্রাণের রণে
মরু-জয়ের সেনা।
ওদের সাথে আমার প্রাণের
প্রথম যুগের চেনা।
তাই এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি
ওদের খেলা ঘরে।
ওদের দোল্ দেখে আজ প্রাণে আমার
দোলা ওঠে জেগে॥

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ষা-প্রাতে

(গান)

আজি বর্ষা-রাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
অরুণ-আলো মেশে।
বেণু-বনের মাথায় মাথায়
রং লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়
কোথা যে যায় ভেসে॥

এই ঘাসের ঝিলিমিলি,
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন
এক তালে যায় মিলি।
মাটির প্রেমে আলোর রাগে,
রক্তে আমার পুলক লাগে,
বনের সাথে মন যে মাতে,
ওঠে আকুল হেসে॥

প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর্য্য ও ম্লেচ্ছ

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে বিপুল মানব-সমাজের মোটামুটি দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে একশ্রেণীর নাম আর্য্য, অপর শ্রেণীর নাম ম্লেচ্ছ। এই উভয় শ্রেণীর ভাষাগত পার্থক্যই অতি প্রাচীন যুগে ইহাদের বিভাজক অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্য-ধৃত বেদের ব্রাহ্মণাংশের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দ্বিজগণ অপভাষা প্রয়োগ করিলে সেকালে ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হইতেন, কারণ অপশব্দভাষীর নামই ম্লেচ্ছ।

ঋষিপ্রবর বৌধায়নের মতে অবৈধরূপে গোমাংসভোজী সংস্কৃত-বিরুদ্ধভাষণশীল বেদবিহিত যাবতীয় শৌচাচারবিহীন মানবগণ ম্লেচ্ছনামে অভিহিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ কোষকার অমরসিংহের মতে একশ্রেণী চণ্ডালই ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ। তিনি প্রথমতঃ চণ্ডাল, প্লব, মাতঙ্গ, দিবাকীর্ত্তি, জনঙ্গম, নিষাদ, শ্বপচ, অন্তেবাসী, চণ্ডাল, ও পুক্কস—চণ্ডালের এই দশটি নাম একশ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে কিরাত, শবর ও পুলিন্দ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ম্লেচ্ছজাতিকে চণ্ডালের অবান্তর ভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু মহর্ষি দেবল ম্লেচ্ছকে চণ্ডাল হইতে স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"দাসীকৃতো বলান্ম্লেচ্ছৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ"। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও চণ্ডাল এবং ম্লেচ্ছের পার্থক্য স্বীকার করিয়া তুল্যতা বিবেচনা করিয়াছেন; যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকার মতেও "অন্ত্য" শব্দের অর্থপ্রদর্শনপ্রসঙ্গে চণ্ডাল পর্য্যায় শ্বপচ ও ম্লেচ্ছ তুল্যধর্ম্মাক্রান্ত অথচ ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অন্তে অর্থাৎ আর্য্যপল্লীর বাহিরে যাহারা বাস করে, যেমন ম্লেচ্ছ যবন শ্বপচ প্রভৃতি, যাহাদের অপেক্ষা অধম জাতি আর নাই।

হেমাদ্রি-ধৃত পৈঠীনসী বচনেও চণ্ডাল এবং ম্লেচ্ছের পার্থক্য বিবেচিত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণের মতে মৃত বেণ রাজার দেহ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মথিত হইলে তাহার বাম ভাগ হইতে ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। পরন্তু সেই ম্লেচ্ছগণ অঞ্জনের মত কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল।

কিন্তু সূতসংহিতা পাঠে জানা যায় যে বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভে জাত সন্তান "ক্ষতৃ" নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণীতে গুপ্তভাবে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন সন্তানের নাম হইয়াছে "ম্লেচ্ছ"।

মনুসংহিতায় ক্রিয়ালোপনিবন্ধন এবং ব্রাহ্মণের অদর্শননিবন্ধন পুণ্ড্র, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, অপহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ প্রভৃতি দেশজাত ক্ষত্রিয়দিগের বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব জন্মিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার পরেই আবার বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদের মধ্যে যে সকল মানব ক্রিয়ালোপাদি-দোষে চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাহ্যভাব অর্থাৎ ম্লেচ্ছভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা ম্লেচ্ছভাষাযুক্ত হউক আর আর্য্যভাষাযুক্তই হউক উহাদিগকে দস্যুজাতি বলিয়া মনে করিতে হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণাদি জাতি হইতেও পুরাকালে অনেকে ম্লেচ্ছদলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত হরিবংশের বচনাবলীপাঠে জানা যায় যে, বশিষ্ঠের আদেশানুসারে সগর রাজা কতকগুলি অত্যাচারী ক্ষত্রিয়ের আর্য্য-জনোচিত বেশের অন্যথা করিয়া উহাদিগকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে ইহাদের ম্লেচ্ছত্ব বিঘোষিত হইয়াছে "তে সর্ব্বে পরিত্যাগাৎ ম্লেচ্ছত্বং যযুঃ।" অর্থ—তাহারা সকল ধর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রদর্শিত প্রমাণাবলীর সাহায্যে ম্লেচ্ছদিগের নানাপ্রকার উদ্ভব প্রতিপন্ন হয়। উৎপত্তির বৈচিত্র্যনিবন্ধনই ইহাদের বর্ণগত পার্থক্য ঘটিয়াছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কৃষ্ণকায় কাফ্রি, সাঁওতাল প্রভৃতিকে বেণদেহপ্রসূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইয়ুরোপীয়গণ সম্ভবতঃ সগরবিধ্বস্ত ক্ষত্রিয়ের বংশধর। হেমাদ্রিনিবন্ধধৃত কূর্ম্মপুরাণের বচনপাঠে শুক্লবর্ণ ম্লেচ্ছের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে কেবল শুক্লশব্দই ম্লেচ্ছ অর্থে পঠিত হইয়াছে।

মহাভারত পাঠে জানা যায়, কলিঙ্গদেশবাসী চিত্রাঙ্গদ রাজার রাজপুর নামক নগরে রাজকন্যার স্বয়ম্বরসভায় বিভিন্নদেশবাসী বহু রাজার সমাগম হইয়াছিল। ইহাতে দক্ষিণদিকবাসী এবং প্রাচ্য ও উদীচ্যদেশবাসী ম্লেচ্ছ এবং আর্য্য বহু রাজার বর্ণনা দেখা যায়। ইঁহারা সকলেই শুদ্ধজাম্বুনদপ্রভ অর্থাৎ বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ এবং ভাস্বরদেহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

কিন্তু মহাভারতেই মৃত বেণরাজার দক্ষিণ উরুমন্থনসম্ভূত পুরুষকে বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী এবং অন্যান্য পর্ব্বতবনবাসী শত-সহস্র ম্লেচ্ছের আদি-পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই আদি-পুরুষ খর্ব্বকায়, পোড়া খুঁটির মত কৃষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু এবং কৃষ্ণ কেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে ঋষিগণ "নিষীদ" এই কথা বলিয়াছিলেন; অতএব ইহার বংশধরগণ নিষাদ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত ক্রূর-স্বভাব।

তাম্রার একটি নাম "ম্লেচ্ছমুখ"। এই নামটির যৌগিকার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ইহার বর্ণ ম্লেচ্ছের মুখের মত; সুতরাং ইহা হইতে তামাটে বর্ণের ম্লেচ্ছজাতির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ব্রহ্মদেশবাসী প্রভৃতিই এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। অতএব ইহাও বুঝা যায় যে, কৃষ্ণ শুক্ল তাম্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ম্লেচ্ছের সহিতই আর্য্যজাতির পরিচয় ছিল।

ধরাধামে যখন হইতে আর্য্যজাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন হইতেই ইহাদেরও অস্তিত্বের প্রমাণ দেখা যায়। এমন কি, মান্ধাতার সময়েই ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধেও একটা চিন্তা হইয়াছিল। মান্ধাতা ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, অন্ধ্র, মদ্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, ও কাম্বোজ প্রভৃতি ব্রহ্মক্ষত্রপ্রসূত বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি দেশবাসী মানবগণ কি প্রকার ধর্ম্মের আচরণ করিবে? আমার মত নৃপতিগণই বা এই সকল দস্যুজীবিকে কি ভাবে দেশ মধ্যে স্থাপন করিবে?

প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্র বলিয়াছেন যে, সমস্ত দস্যুগণই মাতা পিতা গুরু আচার্য্য আশ্রমবাসী এবং ভূপতিদিগের সেবা করিবে। বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানও তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে।

মান্ধাতার ও ইন্দ্রের প্রশ্নপ্রতিবচনের অর্থ হইতে তদানীন্তন চীন শক প্রভৃতি দস্যু ব্যবহার-জীবী ম্লেচ্ছদিগের ধর্ম্মবিষয়ে সমুন্নত অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায়। পরন্তু ইহারা বৃত্তির অপকর্ষনিবন্ধন এবং অনেক বিষয়ে সদাচারের ব্যত্যয়-নিবন্ধনে আর্য্যসমাজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মান্ধাতার সময়ের চীন শক প্রভৃতি ম্লেচ্ছ এবং বৌধায়ন-প্রোক্ত সর্ব্বাচারবিহীন অসভ্য বর্ব্বর ম্লেচ্ছ, একশ্রেণীর

...নব নহে। কারণ, প্রাচ্যোদীচ্য ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে সভ্যভব্য রাজা ছিল, এবং সেই রাজগণ আর্য্যমহিলার স্বয়ংবর-সভায় কন্যার্থী হইয়া অন্যান্য রাজার সহিত উপস্থিত হইত; পূর্ব্বোক্ত চিত্রাঙ্গদ রাজকন্যার স্বয়ংবর বৃত্তান্ত হইতেই এই বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্য নরপতিদিগের অন্যান্য আভ্যুদয়িক কার্য্যেও বিভিন্নদেশীয় ম্লেচ্ছরাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন, বাল্মীকির রামায়ণও এই বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক স্থির হইলে প্রাচ্য উদীচ্য প্রতীচ্য এবং দাক্ষিণাত্য, ম্লেচ্ছ ও আর্য্য রাজগণ এবং বনপর্ব্বতবাসী রাজগণ উপবিষ্ট হইয়া দশরথের উপাসনা করিয়াছিলেন।

মান্ধাতার প্রশ্ন বাক্যে যবন চীন শক প্রভৃতি দেশবাসীর ন্যায় গান্ধার এবং মদ্রদেশবাসীও দস্যুজীবী ম্লেচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; অথচ গান্ধার এবং মদ্রবাসীদিগের সহিত কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের যৌনসম্বন্ধেও কোন বাধা ছিল না। মদ্ররাজদুহিতা মাদ্রী পাণ্ডুরাজার ভার্য্যারূপে পরিণীত হইয়াছিলেন। কর্ণসারথি মদ্ররাজ শল্যের সহিত কর্ণের বিবাদ উপস্থিত হইলে কর্ণের মুখ হইতে মদ্রদেশের অনেক প্রকার কুৎসিতাচারের কথা বহির্গত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে মদ্রদেশের নারীগণ অত্যন্ত ব্যাভিচার-রত, অশুভ কর্ম্ম অর্থাৎ পাপকর্ম্ম ও অহঙ্কার প্রসিদ্ধ ইহাদের সহিত শত্রুতা এবং মিত্রতা কিছুই করিবে না। অশিষ্ট মদ্রদেশবাসিগণ সক্তুমৎস্যভোজী অর্থাৎ শুষ্ক মৎস্যের চূর্ণভোজী, ইহারা গোমাংসের সহিত মদ্য পান করিয়া মাতাল হইয়া অসংবদ্ধ প্রলাপ ও গান করে এবং পরস্পর বামপ্রলাপ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম কি প্রকারে থাকিবে?

কর্ণের বাক্যবাণে আহত হইয়াও শল্য স্বকীয় জন্মভূমি মদ্রদেশের বিশুদ্ধিখ্যাপনের প্রয়াসী হইলেন না, কেবল নিজের বংশের বিশুদ্ধি ও সদাচারের উল্লেখপূর্ব্বক স্বকীয় ধর্ম্মপরায়ণতানিবন্ধন স্পর্দ্ধা করিয়াছেন।

প্রদর্শিত বৃত্তান্ত হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, মদ্র প্রভৃতি নিন্দিত দেশে ভ্রষ্টাচার লোকের আধিক্য ছিল, এবং সদাচার যাজ্ঞিক প্রভৃতির অল্পতা ছিল। ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মানবগণও অন্যান্য বিশুদ্ধ দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত এবং ম্লেচ্ছ বলিয়া পরিভাষিত হইতেন। পরমার্থতঃ ইহাঁরা গারো কাফ্রি সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর বা সর্ব্বধর্ম্মরহিত ছিলেন না। অধিকসংখ্যক অধিবাসীর আচারগত অনার্য্যতা নিবন্ধন তত্রত্য বিশুদ্ধাচারগণও মোটামুটী ভ্রষ্টাচার ম্লেচ্ছ বলিয়াই অবজ্ঞাত হইয়াছেন। অন্যান্য নিন্দিত দেশের পক্ষেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ অতি পুরাকালে খৃষ্টধর্ম্ম বা ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রভৃতির আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং আর্য্য-ম্লেচ্ছ সকলকেই উচ্চাবচভাবে হিন্দুর গণ্ডীর ভিতরেই থাকিতে হয়।

মানুষ যতই অনাচার পাপাসক্ত হউক না কেন, আর্য্য শাস্ত্রানুসারে তাহার কোন না কোন স্তরে থাকিবার স্থান এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মের অধিকার থাকিয়াই যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯। শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

গান

মনের মধ্যে নিরবধি
শিকল-গড়ার কারখানা।
একটা বাঁধন কাটে যদি
বেড়ে' ওঠে চারখানা।
কেমন করে' নাম্‌বে বোঝা,
আপদ তোমার নয় ত সোজা
অন্তরেতে আছে যখন
ভয়ের ভীষণ ভারখানা॥
রাতের আঁধার ঘোচে বটে
বাতির আলো যেই জ্বালো।
মূর্চ্ছাতে যে আঁধার ঘটে
রাতের চেয়ে ঘোর কালো।
ঝড় তুফানে ঢেউয়ের মারে
তবু তরী বাঁচতে পারে
সবার বড় মার যে তোমার
ছিদ্রটার ঐ মারখানা॥
পর ত আছে লাখে লাখে,
কে তাড়াবে নিঃশেষে?
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে
পর করে দেয় বিশ্বে সে।
কারাগারের দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে?
আপনি তুমি ভিতর থেকে
চেপে আছ দ্বারখানা॥
শূন্য ঝুলির নিয়ে দাবী
রাগ করে' রোস্ কা'র পরে?
দিতে জানিস্ তবেই পাবি,
পাবিনে ত ধার করে'।

লোভে ক্ষোভে উঠিস্ মাতি'
ফল পেতে চাস্ রাতারাতি
আপন মুঠোয় করলে ফুটো
আপন থাঁড়ার ধারখানা ॥

শান্তি, আষাঢ় ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাছির কথা

মাছি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—(১) বন-মক্ষিকা ও ২) গৃহ-মক্ষিকা। আফ্রিকার "জী-জী" মাছি, (Tse-Tse Fly), কাচ-মাছি মৌমাছি প্রভৃতি এই বন-মক্ষিকার অন্তর্গত; এরা কদাচ গৃহস্থের নিকটে আসে। এদের হুল্ দিয়ে মানব শরীরে বিষ প্রবেশ করাবার, মশার মত রক্ত শোষণ করবার ও কামড়াবার বেশ ক্ষমতা আছে। মৌমাছি ও কাক্-মাছি বা কাচ-মাছিদের দেহের শক্তি অসাধারণ—শোনা যায়। একবার একজন কীট-শক্তি-অনুসন্ধিৎসু সাহেব একটা কাচ-মাছিকে (Blow Fly) দিয়ে একশ সত্তর গ্রেণ ওজনের একখানা খেলাঘরের ছোট মালগাড়ী টানিয়েছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মাছিটির নিজের ওজন ছিল মাত্র এক গ্রেণ!

আফ্রিকা মহাদেশে Sleeping Sickness বা "ঘুমপাড়ানো রোগ" নামক এক প্রকার ব্যাধি দেখা যায়; এর বিশেষত্ব হচ্ছে,—এতে রোগীর কোন কর্ম্ম করার উদ্যম বা জাগ্রত থাকার শক্তি একেবারে লোপ পায়—কেবলই নিদ্রাতুর হ'য়ে পড়ে; তারপর রোগী কিছুকাল নিদ্রাবস্থায় থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন মহানিদ্রার কোলে চ'লে পড়ে। উপরিউক্ত জী-জী মাছির দংশন দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়।
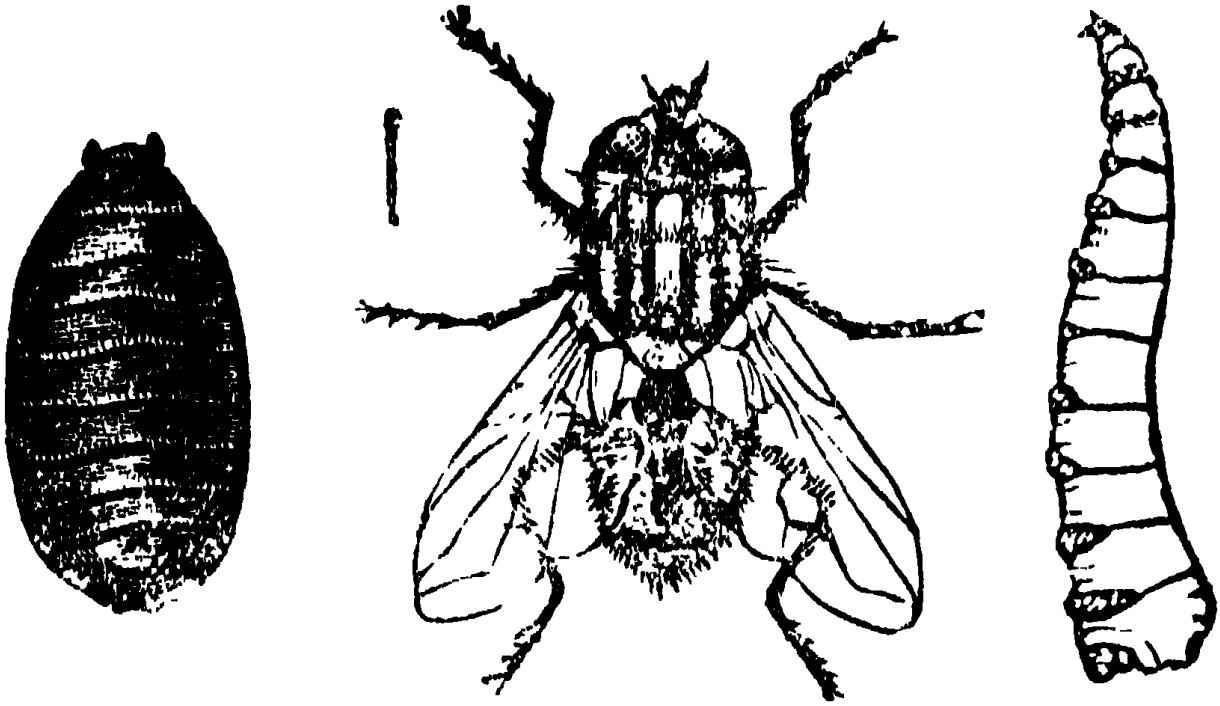
গৃহ মক্ষিকা, তাহার ডিম ও মূককীটাবস্থা

সাধারণতঃ আমরা গৃহের মধ্যে ও চতুঃপার্শ্বে যে সকল মাছি দেখি ও যাদের মধুর "ভন্ভন্" ধ্বনি শুনি তারাই গৃহ-মক্ষিকা-পর্য্যায়ভুক্ত। এরা কামড়াতে বা হুল বিদ্ধ করতে পারে না, কেবল মানুষের গায়ে অপ্রীতিকর ভাবে সুড়্সুড়ী দেয় এবং বড় জোর দু'পাঁচটা মারাত্মক রোগের জীবাণু সংবহন করে।

সাধারণ গৃহ-মাছির গাত্র-বর্ণ হলুদ রঙের—তার উপর কালো কালো ডোরা কাটা, কতকটা জিরাফের গায়ের মত। মাথাটি একটা চ্যাপটা সরুষের মত—মাঝে একটা ত্রিকোণাকার কালো দাগ, মুখের দিকটা ঈষৎ ছুঁচালো—রঙ মেটে লাল্। এদের আকার অন্যান্য মাছির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। এই শ্রেণীর আর এক প্রকার মাছি আছে—যাদের চলিত কথায় "গুব্‌রে মাছি" (Stomoxys Calcitrans) বলা যায়, তারা দেখতে প্রায় সাধারণ মক্ষিকারই মত; কিন্তু এরা মানুষকে দংশন করতে জানে। এই গোষ্ঠীর আর এক দল মাছি (Sepsis Violecca) আছে—তাদের পশ্চাৎভাগ অনেকটা বোলতার
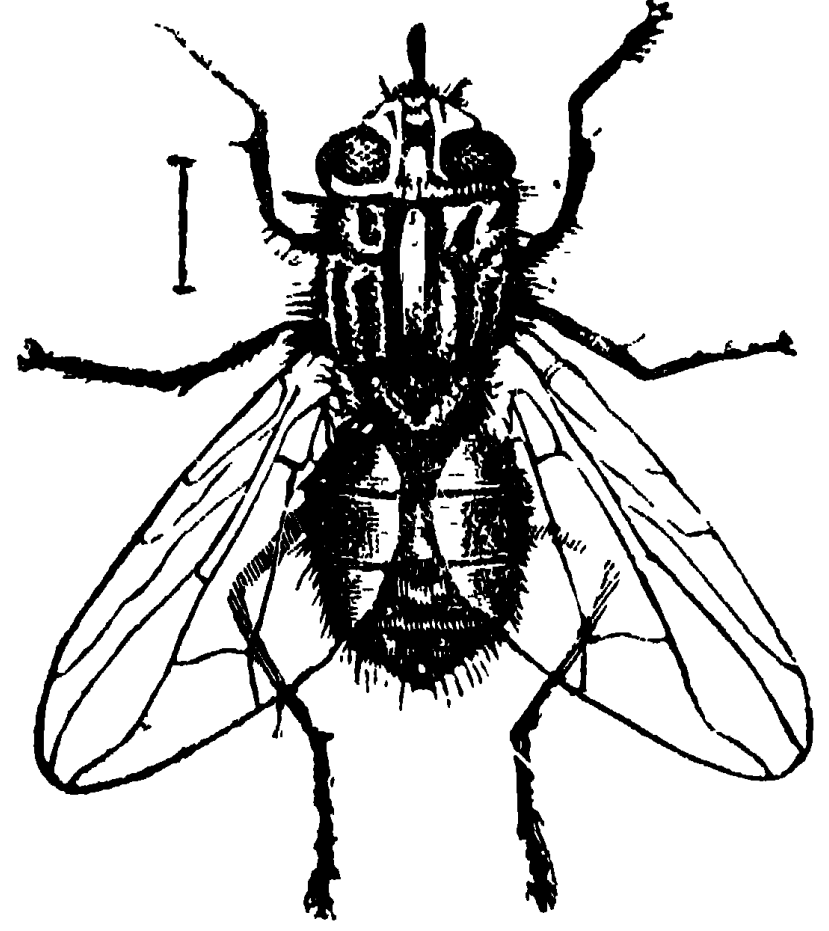
আস্তাবলের মাছি

মত, মাথাটি গোলাকার ও পক্ষপুট অপেক্ষাকৃত ছোট। এই দুইটি জাতি ঘোড়ার আস্তাবল, গোয়ালঘর প্রভৃতি স্থানে আপনাদের বংশ বৃদ্ধি করে। আর এক রকম মাছি, Cluster Fly। এরা হেমন্তকালে মাঝে মাঝে এসে দলে দলে গৃহ পূর্ণ করে। সাধারণ গৃহ-মক্ষিকার চেয়ে এরা আকারে কিছু বড়, পেটের দিকটা ক্রুস-করা চকচকে কালো ডাবি জুতোর মত দেখায়। সারাগাত্রে অতি সূক্ষ্ম হলদে রঙের লোম ছড়ানো। আহার্য্যবস্তুর ভোগ দখল নিয়ে ক্লাষ্টার মাছিদের সঙ্গে গৃহ-মাছিদের প্রায়ই তুমুল লাঠিবাজী চ'লে থাকে; শেষে ক্লাষ্টার-কুলই জয়ী হ'য়ে খাসদখল ক'রে বসে। কিন্তু সুখ তাদের বেশী দিন সহ্য হয় না; হঠাৎ একদিন এক অজ্ঞাত মহামারী (Funguous disease) এদের বস্তির মধ্যে এসে যদু-বংশ-ধ্বংস লীলা অভিনয় কর্ত্তে সুরু করে।

আর এক জাতীয় মাছি আছে, এদের গায়ের রঙ স্বচ্ছ নীল কিম্বা সবুজ। পাশ্চাত্য পতঙ্গ-তত্ত্ব-বিদ্‌গণ এর এক দেড়-গজী নাম রেখেছেন—Calliphora Erythrocephela; বাঙলা ভাষায় এর নাম "অয়স্কান্ত মক্ষিকা" বা-"নীলমণি মাছি" রাখা যেতে পারে। এরা সাধারণতঃ গৃহস্থের পুরীষ বা কীট-পতঙ্গাদির গলিত শব হ'তে

উৎপন্ন হয়। এই জাতীয় মাছির আবার প্রকার-ভেদ আছে। এরা গ্রীষ্মের শেষে ও বর্ষার প্রথমে প্রায়শঃ প্রচুর পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করে এবং পাকা আম-কাঠাল প্রভৃতির প্রতি দুশ্চেদ্যরূপে প্রণয়াকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বোল্‌তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন ক'রে অনেক সময় এরা ময়রার মিষ্টান্নের ভাগও গ্রহণ করে; আবার কখনও বা কসাইয়ের দোকানে গিয়ে মাংসের উপর একাধিপত্য করে।

নীলমণি জাতীয় আর এক ধরণের মাছি (Drosophila ampelophila) আছে। এরা সাধারণতঃ অর্দ্ধ পক্ক আমের মধ্যে পরভৃতের মত ডিম পেড়ে রেখে চলে যায়। আমের আভ্যন্তরিক উত্তাপে ডিম ফুটে লম্বাকার ছানা হয়। তারপর আমের শাঁস খেয়ে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হ'য়ে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে ছানাগুলি মাছির আকার ধারণ করে। তারপর আমের ভিতর দিয়ে সিঁধ কেটে বাহিরের আলোয় বেরিয়ে আসে।
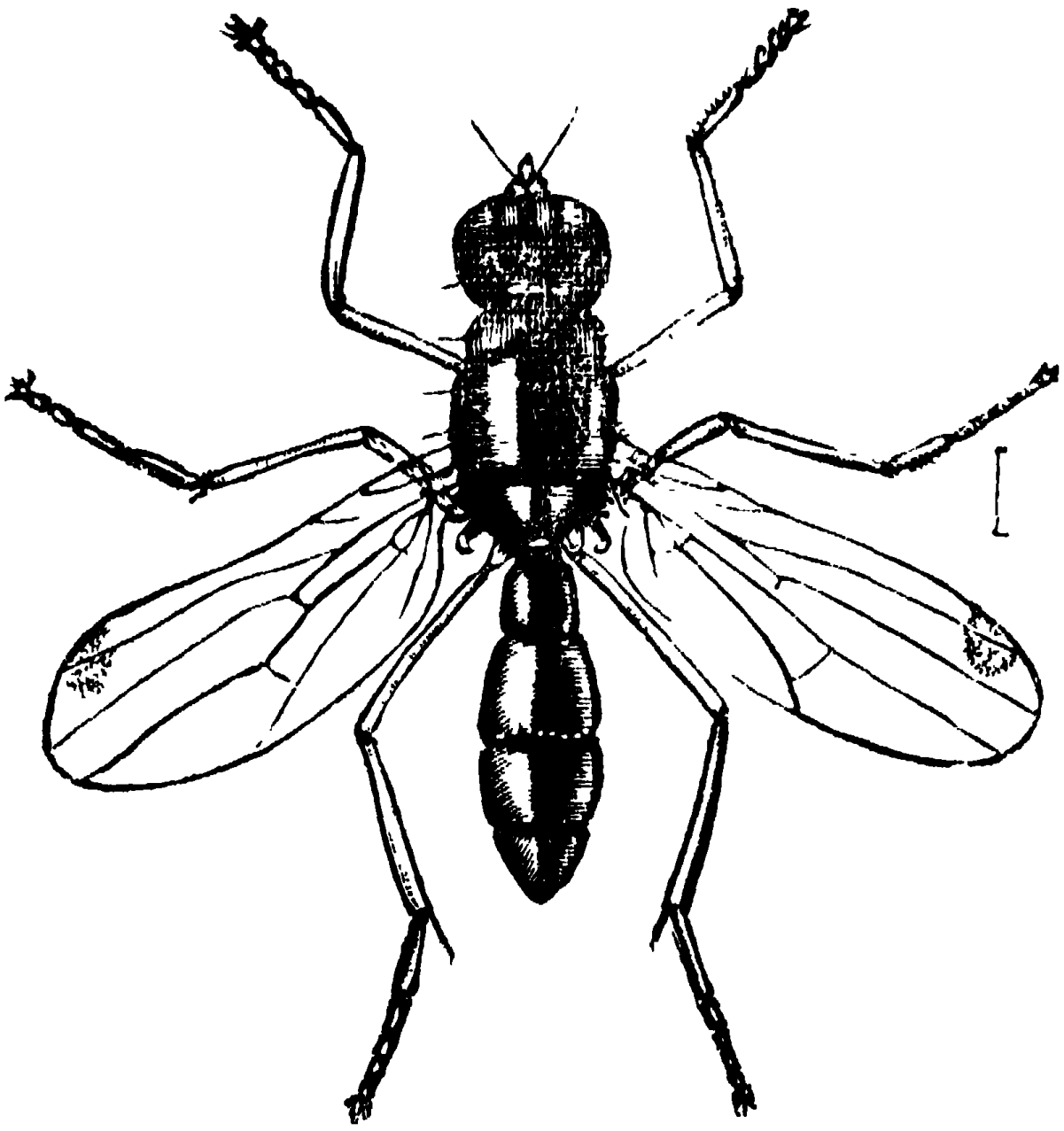
The Dung Fly

সাধারণতঃ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে মাছি বহু পরিমাণে জন্মগ্রহণ করে। শীত-প্রধান দেশে বা গ্রীষ্মসঙ্কুল দেশে ভরা শীতের সময় এরা আদৌ বাঁচতে পারে না। কীট-পতঙ্গ-তত্ত্ববিদরা বলেন—অধিকাংশ মাছি সাপের মত শীতটুকু গৃহের ফাটলে, খড়ের গাদার নীচে, বা অন্য কোন আবর্জ্জনাময় নিভৃত স্থানে অভুক্ত ও ঘুমন্ত অবস্থায় কাটিয়ে দেয়। তখন এরা ডিম পাড়ে না, বা এদের কোন সন্তান সম্ভাবনা হয় না। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে শীতকালে একটা বড় লোহার জাল বেষ্টিত খাঁচার মধ্যে কতকগুলি মৌমাছি ধ'রে রাখা হ'য়েছিল; দেখা গেল—যে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার খাঁচাটি সর্ব্বদা তাপযুক্ত রাখায় অধিকাংশ মক্ষিকাই ৫৩ দিন পর্য্যন্ত জীবিত আছে, তারপর ক্রমশঃ মরতে সুরু করল। দেশান্তরের সংগৃহীত বৃক্ষলতাদি সজীব রাখার জন্য যে একপ্রকার কাচ-মণ্ডিত প্রকোষ্ঠ (Green house) থাকে, তার মধ্যে একবার কতকগুল মৌমাছিকে আবদ্ধ করে রেখে দেখা গেল যে, তারা ঠিক গ্রীষ্মকালের মত পরিপূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে আপনাপন কার্য্য সাধন কচ্ছে, সমস্ত শীতকালটা তাদের মাথার-উপর দিয়ে চ'লে গেল—তা তারা জানতেও পারলে না। আমেরিকার মক্ষিকা-তত্ত্ব-বিশারদ বিশপ, ডাভ্ ও পার্‌ম্যান সাহেবরা (Messrs Bishop, Dove and Parman) স্থির করেছেন যে মাছিরা শীতের চার-পাঁচ মাস কাল ডিম, কিড়া ও গুটি অবস্থাতেই যাপন করে, পূর্ণাবয়ব (Natural full size) অবস্থায় এরা শীতের প্রকোপ কদাচ সহ্য করতে পারে না।

Musca Domestica বা সাধারণ গৃহ-মক্ষিকা সচরাচর ঘোড়া, গরু, শূকর, মুরগী ও মানুষের বিষ্ঠার উপর ডিম পাড়ে; তা'ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মল, রন্ধনাগারের পরিত্যক্ত শাক-পাতা বা তরকারীর খোসা, পলিত প্রাণী-দেহ ও উদ্ভিদাদিতেও এরা ডিম পাড়তে অনভ্যস্ত নয়। এক একটি স্ত্রী-মাছি এক একবারে ১১০টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে ও একদিনে ২ বার থেকে ৪ বার পর্য্যন্ত প্রসব করতে পারে। স্ত্রী-মাছিদের অন্তঃসত্ত্বাবস্থার কাল তিন হ'তে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত, তারপর প্রসব বেদনা উপস্থিত হ'লে এরা কতকগুলি সমবয়সী প্রণয়ী জুটে একস্থানে এসে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ফুটতে ২৪ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগে। উপযুক্ত শৈত্যাতপ পেলে এরা ৮ ঘণ্টার
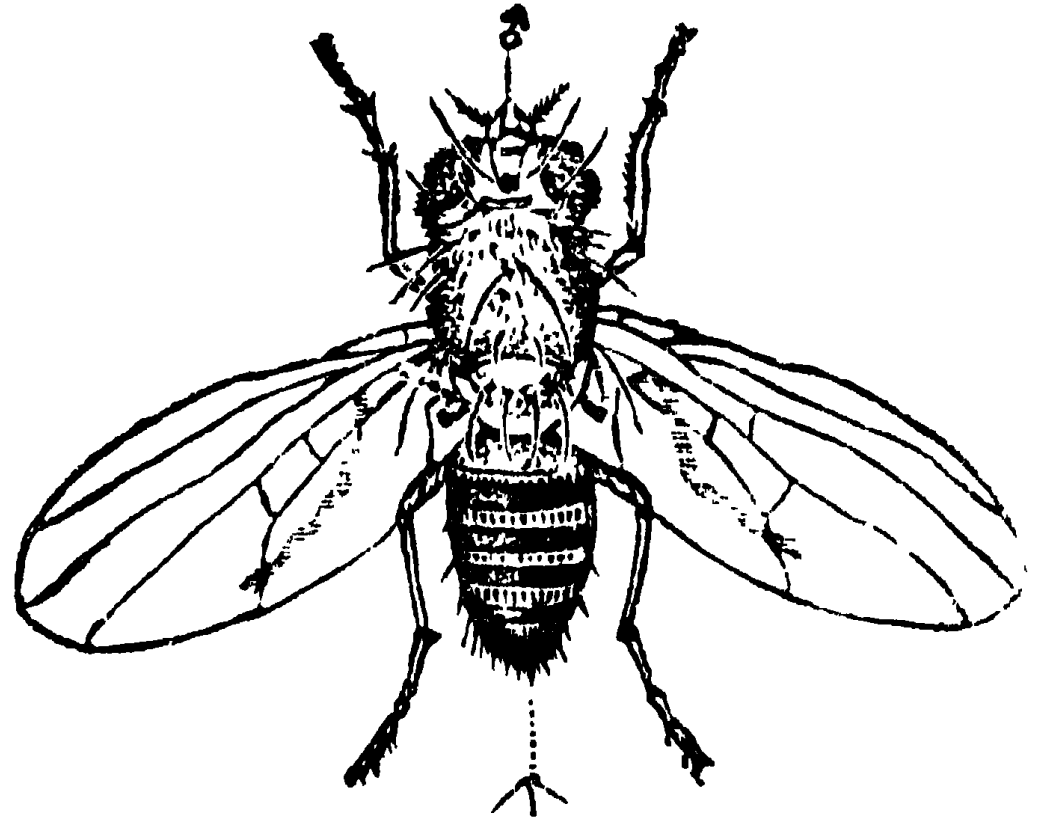
The Fruit Fly

মধ্যেই ফুটে পড়ে। কিড়া বা কীটের রূপ (maggots) নিয়ে এরা ডিম থেকে বহির্গত হয়; তখন দেখতে এদের কতকটা শ্বেতবর্ণের ছোট ছোট চালের পোকার মত দেখায়। ২।৩ দিন কীটের অবস্থায় নানারূপ ময়লা খেয়ে নিজেদের দেহ পুষ্ট করে নিয়ে, শেষে গুটিপোকার অবস্থায় (Pupation period) পরিণত হ'তে আরম্ভ করে। তখন

এদের দেহের উপরিভাগ সঙ্কুচিত ও অপেক্ষাকৃত শক্ত হ'তে থাকে, গায়ের রঙ শ্বেত হ'তে বাদামীতে পরিবর্ত্তিত হয়, তখন এদের চ'লে হেঁটে বেড়াবার ক্ষমতা প্রায় রহিত হ'য়ে যায়; এই সময় মক্ষিকা শাবকদের ঘুমন্ত অবস্থা বলা যেতে পারে। এইরূপ গুটির অবস্থায় এরা তিন থেকে দশ দিন পর্য্যন্ত থেকে, শেষে নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত হয়ে, বিশ্বের আলোয় বেরিয়ে চোখ মেলে চায়। খোলস্ পরিত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই যে এরা উড়তে পারে—তা' নয়; কিছুক্ষণের জন্য পক্ষ-বিস্তার করে এরা পায়ে হেঁটে বেড়া'তে থাকে। তার পর আলো ও বাতাস লেগে পাখা রীতিমত শক্ত হ'লে উড়্‌তে আরম্ভ করে। তার পর পুরুষ-শাবক-মাছি ৩৪ দিন যেতে না যেতেই গর্ভ সঞ্চার কত্তে সমর্থ হয়; সুতরাং মাসে দুইবার করে মাছিদের বংশবৃদ্ধি হয়। হাউয়ার্ড সাহেব স্থির করেছেন -একটি মাছি থেকে ৪০ দিনে এক কোটি দুই লক্ষ বংশধর জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং এই বংশধরগুলিকে একত্র ক'রে যদি দাঁড়ীপাল্লায় চড়ান যায়, তা'হলে তাদের ওজন হয় প্রায় দশ মণ।

অতিরঞ্জন কাঁচের (Magnifying glass) সাহায্যে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মাছির সর্ব্ব গাত্রে--বিশেষতঃ শুঁড় ও পা ছয়টিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম সংযুক্ত আছে। রোগবীজাণু পূর্ণ মল-মূত্রাদিতে উপবেশন করলে স্বভাবতঃই ওদের নিম্ন-গাত্রে ও শুঁড়ে রোগ বীজাণু-গুলি ফুলের পরাগের মত সংলগ্ন হয়ে যায়। তার পর যখন গৃহস্থের আহার্য্য-সামগ্রীর উপর উড়ে বসে, তখন ঐ রোগ বীজাণুগুলি খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে ঝ'রে পড়ে এবং যে ব্যক্তি ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করে, তার শরীরে বীজাণুগুলি সঞ্চালিত হ'য়ে নানা-রূপ ব্যাধির সৃষ্টি করে। অন্নবহা নাড়ীর মধ্যেই (Alimentary canal) রোগবীজাণুগুলি (Bacteria) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ও অধিক দিন জীবিত থাকে; সুতরাং মাছির বমন ও বিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রোগবীজাণুগুলি নিঃসন্দেহে সঞ্চারিত ও সংক্রামিত হ'তে পারে। মাছি যত বেশী আহার করে ততবেশী মলত্যাগ করে; একবার আহারের পর এক ঘণ্টার মধ্যে এদেরও চার বার মলত্যাগ করতে দেখা যায়। তার উপর মাছি মাঝে মাঝে উদর মধ্য হ'তে এক প্রকার লালা (Vomit spots) উদ্গীরণ করে; এরূপ করার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—কোনরূপ শক্ত আহার্য্যকে লালা দ্বারা দ্রব করে, পরে শুঁড় দিয়ে লালামিশ্রিত নরম খাদ্যটিকে শোষণ করে। একটি মাছির কার্য্য কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেই দেখা যাবে যে, কোন কঠিন পদার্থের উপর হুল্‌টি স্থাপন ক'রে, মাছি ঐরূপ জলবৎ পদার্থ বমন কচ্ছে এবং পরে আবার তা আপন উদরে শোষণ ক'রে নিচ্ছে। খাদ্য দ্রব্যগুলি কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট ঢাকা বা জালের ঢাক্‌না দিয়ে ঢেকে রাখলেও মাছির রোগ-বীজাণু

মাছির গুটি অবস্থা (স্বাভাবিক আকার)

প্রচারের হাত হ'তে অব্যাহতি নেই; কারণ ঢাক্‌নার উপর ব'সে যদি মাছি মলত্যাগ করে, তাহ'লে জাল বা ছিদ্রের ফাঁক দিয়ে তা খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে প'ড়ে সেগুলি দূষিত করতে পারে।

যেখানে অস্থায়ী ভাবে কুলি-মজুররা বস্তি গড়ে বা যুদ্ধযাত্রী সৈন্য-সামন্তদের শিবির পড়ে, সে সকল স্থানে মল-মূত্রাদি পরিত্যাগের সুশৃঙ্খলা বা পরিষ্কারের সুব্যবস্থা প্রায়ই ঘটে ওঠে না; সুতরাং মাছিদের পক্ষে এই সকল দীর্ঘ সঞ্চিত মল-মূত্র থেকে ব্যাধি-বীজ মানুষের আহার্য্য-সামগ্রীর উপর চালান্ করার রীতিমত সুবিধা হয়। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সান্নিপাতিক বা টাইফয়েড্ জ্বরের (Typhoid) মহরম উপস্থিত হয়। এই রোগের বীজাণু (Bacillus Typhosis) রোগীর রক্ত, মূত্রস্থালী ও অন্ত্রমধ্যে অবস্থান করে, এবং মল-মূত্রের সহিতই রোগীর দেহ মধ্য হ'তে বাহিরে এসে থাকে; এমন কি রোগী রোগমুক্ত হ'লেও বহুদিন পর্য্যন্ত তার মল-মূত্রের মধ্যে টাইফয়েড্ বীজাণু বিদ্যমান থাকে।

এইরূপ উপায়ে মাছিরা ওলাউঠা, রক্তাতিসার, শিশুদের গ্রীষ্মকালীন্ উদরাময় প্রভৃতি পাকস্থালী-প্রদেশজনিত রোগের বীজ সংক্রামণ করে। তা'ছাড়া, যক্ষ্মা, চক্ষুরোগ, গো-স্ফোটক (Anthrax), বসন্ত, এমন কি কুষ্ঠ-ব্যাধি পর্য্যন্ত গৃহ-মাছির "পদপল্লবমুদারম্" আশ্রয় ক'রে স্থান হ'তে স্থানান্তরে সংবাহিত হয়।

স্বাস্থ্য সমাচার জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯। শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

পঁচিশে বৈশাখ

রাত্রি হ'ল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে লেখা লিপিখানি
হাতে করে' আনি,
দ্বারে আসি দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি ;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।
শাল তাল শিরীষের মিলিত মর্ম্মরে
বনান্তের ধ্যানভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে আসে ধরণীর পরে,—
আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,

মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কাল-বৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।
আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয় তলে লয়ে মোর প্রাণ-দেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি পথে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষোমাঝে।
জন্ম মরণের
দিগ্বলয় চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলালো।

শুভ্র আলো
কালের বাঁশরী হ'তে উচ্ছ্বসি যেন রে
শূন্য দিল ভরে'।
আলোকের অসীম সঙ্গীতে
চিত্ত মোর ঝঙ্কারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।
উদয় দিক্‌প্রান্ত তলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
"অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নব মল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন-হিল্লোল-দোল ছন্দে,
শ্যামলের বুকে
নিনিমেষ নীলিমার নয়ন-সম্মুখে।
সেই যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি'
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।
হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন ;—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হোক্ তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন!
হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক্ কুজ্ঝটিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্য্যের মতন!
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি,
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্ত্তে অরণ্য দেয় ভরি'—

সেই মত, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে কর উন্মোচন!
ব্যক্ত হোক্ জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক্, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়!"

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত মাঝে
চির-নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

সবুজপত্র, চৈত্র বৈশাখ, ১৩২৮,২৯ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচীন জীব-বলি প্রথা

পশুবলি প্রথা শুধু বাঙ্গালায় কিম্বা ভারতবর্ষে নয়, অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে ডিভনসিয়রে যে মাসের প্রথম ভাগে জলদেবতার উদ্দেশ্যে মেষ-বলির একটি উৎসব হইত। বলির পর পশুটির এক টুকরা মাংসের জন্য জনসাধারণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, কারণ তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে উহার এক খণ্ড মাংস খাইতে পারিলে সম্বৎসরে তাহাদের কোন অমঙ্গল হইবে না। বুরিয়ট নামক মঙ্গোলীয় এক জাতি সায়বেরিয়ার বৈকাল হ্রদের নিকট বাস করে। তাহারা এখনও কোন ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকার বা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার সময় তাহার প্রিয় অশ্বটীকে বলি দেয়। এতদ্ব্যতীত তাহাদের বাৎসরিক অশ্ব-মেধ প্রথা আছে। দেবতা অধ্যুষিত পবিত্র পাহাড়ে বলির অশ্বটিকে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহার পাদচতুষ্টয় বন্ধন করতঃ ভূতলে ফেলিলে পুরোহিত পেট চিরিয়া তাহাকে বধ করেন। ইহার মাংস রন্ধন করিয়া তাহার কতকটা যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয় এবং তৎসঙ্গে সোমরসের ন্যায় এক প্রকার মাদক দ্রব্যও ঐ অগ্নিতে ঢালিয়া দেওয়া হয়। বলির কতকাংশ আকাশ-দেবতাদের উদ্দেশ্যে শূন্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং পুরোহিত পশুটির অস্থিসকল যজ্ঞাগ্নিতে প্রদান করেন। তখন সকলে অবশিষ্ট মাংস দেবতাদিগের প্রসাদরূপে ভক্ষণ করে এবং এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে—'আমাদের গ্রাম সমৃদ্ধিশালী হউক, বহু সন্তান-সন্ততি হউক, অসংখ্য গো-অশ্ব প্রভৃতিতে দেশ পরিপূর্ণ হউক, দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হউক'' ইত্যাদি। যজ্ঞাবশেষ যাহাতে কুকুর প্রভৃতি কোন অস্পৃশ্য পশু ভক্ষণ না করে, তজ্জন্য অগ্নিতে পুড়াইয়া ফেলা হয়।

বর্ষাঋতুর অন্তে গ্রীকদের একটি উৎসব হইত। এই সময় কয়েকটী শ্বেত অশ্ব সূর্য্যদেবতার অর্ঘ্য স্বরূপ সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে এইরূপ পূজায় দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া প্রচুর শস্য উৎপাদন করিবেন। Spartanগণও, বুরিয়টের মত, গিরি-শিখরে অশ্বমেধ করিয়া দেবতার তুষ্টি সাধন করিতেন। রোমকগণও শরৎ ঋতুতে Mars দেবতার নিকট একটী শ্বেত অশ্ব বলিদান করিতেন। ইহার মস্তক রাজপুরোহিতের ভবনে আনয়ন করতঃ সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইত। দেবালয়ের কুমারীগণ ইহার রক্তের সহিত গো-শাবকের রক্ত মিশ্রিত করিয়া পশুপালকগণকে প্রদান করিতেন এবং তাহারা পশুর বংশ বৃদ্ধির জন্য ইহা গ্রহণ করিত। ইরাণদের ইতিহাসেও গো, অশ্ব প্রভৃতি পশু-বলির উল্লেখ আছে।

মঙ্গোলীয় বুরিয়টদের মত শকগণও কৃষিদেবতার উদ্দেশ্যে এবং মৃতব্যক্তির আত্মার সুখ ও শান্তি বিধানার্থ অশ্ব বলিদান করিতেন। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় বহু জাতি বৃক্ষ-দেবতার পূজায় পশুকে বৃক্ষে বন্ধন করতঃ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা ইহার বধসাধন করিত।

ব্রাহ্মণযুগে আর্য্যদের মধ্যেও পশুবলি প্রথা প্রচলিত ছিল, শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, দেবতাগণ পূর্ব্বে যথাক্রমে মানুষ, অশ্ব, বৃষ, মেষ, ও ছাগ বলি দিতেন ঐ ব্রাহ্মণগ্রন্থে আরও দেখিতে পাই যে পূর্ব্বে অগ্নিবেদি নির্ম্মাণের সময় বেদি দৃঢ় করিবার জন্য ইহা মনুষ্য মস্তকের উপর নির্ম্মিত হইবার রীতি ছিল। ভিত্তি দৃঢ় করিবার মানসে ইহার নিম্নে মনুষ্য মস্তক রাখিয়া তদুপরি প্রাসাদ, দুর্গ বা সেতু নির্ম্মিত হইবার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে রোমসহরে Capitol এর নিম্নে মনুষ্য মস্তক পাওয়া গিয়াছিল। একসময় নরবলি শ্রেষ্ঠ বলি বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ক্রমে এই নিষ্ঠুর প্রথা ভারত মিশর, ও অন্যান্য প্রাচীন দেশ হইতে তিরোহিত হয়। রোমান সেনেট খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭৫ অব্দে আইন করিয়া নরবলি প্রথা উঠাইয়া দেয়।

প্রভাতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯। শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী।

ঝর্ণা

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে
তনু ভরি' যৌবন তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত লোল উতরোল সিন্ধু!
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও অঙ্গে
চুমা চুমকীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে
ধূলা ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা!

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্তে
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্তে
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত
শ্যামলিয়া ও পরশে কর গো শ্রীমন্ত
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসার ভর্ণা;
ঝর্ণা!

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী!
পাহাড়ের বুক চেরা এস প্রেমদাত্রী!
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুত গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্ত্যে, সুপর্ণা!
ঝর্ণা!

মঞ্জুল ও হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে!
মোতিয়া মোতির কুঁড়ি মুরছে ও অলকে
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে!
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা।
ঝর্ণা!

ঝরণা, আষাঢ় ১৩২৯। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পরের ছেলে

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সর্ব্ব-সন্তাপ হারী সর্ব্ব-ক্ষতি-সংশোধক, সর্ব্ব-ক্ষতের পরম-ভেষজ কাল, তাহাকে শত শত কোটী কোটী প্রণাম! বিনয় একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াই বেহালা বাজাইতেছিল। সম্মুখে যে মাতুলানী অধীরভাবে কি-একটা কথা বলিতে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, তাহা সে টেরও পায় নাই। সুরের ইন্দ্রজাল তখন তাহার চারিদিকে এমনি মায়ালোকের সৃষ্টি করিয়াছিল ছায়ানটের অপূর্ব্ব রাগিণী অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার ঝঙ্কারে বাদকের এবং শ্রোতার মনে সুখের কিম্বা দুঃখের অথবা এই উভয়ের মিশ্রনে যেন এক রহস্য-লোকেরই আভাষ বিস্তার করিতেছিল। রাগিণীটী কাঁদিতে চায় কিম্বা হাসিতে চায়—অথবা সুখের দুঃখের সকল ভার কোন সুখাতীত দুঃখাতীত বস্তুর মধ্যে মিশাইয়া দিয়া সে শুধু ভাষা-হীন সুরের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াই যাইতে চায় তাহা যেন বুঝা যাইতেছিল না। শুধু চারিদিকে একটা ব্যথা-ভরা রাগিণীর কুহেলিকা আর তার মাঝে মাঝে ব্যথা হরণের আবির্ভাবের অস্পষ্ট আভাষ দুইই সমানভাবে খেলিয়া যাইতেছিল। রাজেশ্বরী দেবী কয়েকটা রুষ্ট অভিযোগের ভাষা মুখে করিয়া আনিয়া সহসা বিনয়ের বেহালার সুরের আঘাতেই যেন বাক্যহীন হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিলেন।

অন্তরা হইতে সঞ্চারী, সঞ্চারী হইতে আভোগে নামিয়া সুরের শেষ মূর্চ্ছনা আস্থায়ীতে যাইয়া মিলিতে চাহিতেছে, এমন সময় বিনয়ের দৃষ্টি সম্মুখে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ঝন্ ঝন্ শব্দে বেহালার তিনটা তার ছিঁড়িয়া সঙ্গীতের দেবী সহসা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তার পরেই চারিদিক নিস্তব্ধ। বিনয়ের হস্ত এবং মন ইন্দ্রিয় সব যেন একসঙ্গে অচল হইয়া গেল। কিন্তু প্রবাহিত সুর-জালের আকস্মিক অপঘাতে বায়ুতরঙ্গেও যেন একটা অশব্দ আর্ত্তনাদ উঠিল, "এ কি হল—এ কি হল!" সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বরী দেবীর কণ্ঠও ধ্বনিত হইল—"কি করলি বিনয়? থাম্‌লি কেন? কি হ'লো?"

উত্তর নাই। সুর-রাগমুগ্ধ আরক্ত মুখে পাংশু বর্ণের আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে! অতর্কিত আঘাতে বুকের সমস্ত শিরা-উপশিরার সঙ্গে অন্তঃস্থলও ধ্বক্ ধ্বক্

করিয়া তাহাদের বিষম স্পন্দনকে দর্শকের সম্মুখে এমন করিয়া ধরাইয়া দিতেছে যে বিনয় বিব্রত হইয়া বেহালা ফেলিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাজেশ্বরী দেবীও তখন নিজের আঘাত সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "যেয়ো না, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

আবার কথা আছে? আর কি কথা থাকিতে পারে, এবং না জানি সেই বা কি? শঙ্কিত মুখে বিনয় মাতুলানীর পানে চাহিল।

"বসো, দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চলবে না, খানিকক্ষণ সময় লাগ্‌বে।"

"বল।" দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই শঙ্কা-অবরুদ্ধ কণ্ঠে বিনয় উত্তর দিল।

"বল্‌ছিলাম এই যে,—একে আমি মেয়ে মানুষ, তাতে বুড়ো হতে চল্‌লাম, চিরদিনই কি সংসারের সব আমায় দেখ্‌তে হবে? তাহলে লোকে ছেলেপিলের কামনা করে কেন? এ কি অন্যায় নয়?"

বিনয় একটু আশ্বস্ত হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তা তোমার সংসার, তুমি না দেখ্‌লে কে দেখ্‌বে?"

"আমার সংসার! আমি কি মর্‌বার সময় সঙ্গে করে বেঁধে নিয়ে যাব? কিসের সংসার আমার? কিশোরের সংসার কিশোর ভোগ করুক—আমার কি!"

বিনয় এইবার একটু হাসিয়া বলিল, "তাতো বটেই, তা আমায় কেন বল্‌ছ? আমি কি কর্‌ব?"

মাতুলানী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "তবে কাকে বলব বল তো? কর্ত্তা কি আছেন যে ছেলের সব দিক দেখ্‌বেন! তুমিও যদি কিশোরের ভাল-মন্দয় না থাক্‌বে, তাহ'লে,—তাহ'লে তার দশা কি হবে, বল ত?"

"কি করতে হবে, বল।"

"দেওয়ান গোমস্তা সব আমায় এসে জ্বালাতন কর্‌বে, এটার কি কর্‌ব—ওখানে কি কর্‌তে হবে, এটা না হলেই নয়। একটু জপ কর্‌তে বসেছি, তখনো এই খেঁচ্‌কানি! ফ্যালো হাতের জপ, তাদের মন্তব্য শোনো—তাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি চালাও,—কেনরে বাপু, কিশোরের কি কেউ নেই? তুমি থাক্‌তে আমার এই সব নাকাল—এতে কি মানুষের মেজাজ ভাল থাকে?"

"তুমি যে আজ নতুন কথা বল্‌ছ মামী! আমি কবে কোন্ কালে বিষয়-আশয় চালাবার মত বুদ্ধি ধরি, বা এই সব দেখে থাকি যে আজ দেখ্‌ব?"

"এতদিন না দেখেছ, নাই দেখেছ, সে আলাদা কথা, তাই বলে চিরদিনই কি খোকা থাক্‌বে? কিশোরের সম্পত্তি তুমি আমি যদি না দেখ্‌ব, তাহলে কে দেখ্‌বে, বলতো? পাঁচ ভূতে লুটে খাবে তবে?"

"তুমি বেঁচে থাক্‌তে ভূতের বাবার সাধ্যি কি মামা যে তোমার কিশোরের সম্পত্তিতে আঙুল ছোঁয়ায়? আমার কথা আজ ত নতুন নয়, সে তুমিও জানো আমিও জানি। এ-সব বাজে কথা রেখে এখন আসল কথাটা কি, তাই বল?"

"আসল আর নকল কি বাপু—সবই আমার আসল, জেনো। আমার আর এত ঝক্কি সইছে না।"

"তাহলে আমি যেতে পারি? আর কোন কথা নেই ত?"

"গিয়েই বা তুমি কোন্ লাটগিরিতে বস্‌বে? বেহালা সাধ্‌তে বস্‌বে ত? তার আগে আমার আরও গোটা কতক কথা আছে, শোনো।"

"তাই বল না, বাপের সুপুত্তুর হয়ে কে না শোনে, দ্যাখো।"

"কিশোর যাটের আট বছরের ছেলে হলো, এখনো যে লেখা-পড়ার দিক্ দিয়ে ঘেঁসে না, তাও কি লক্ষ্য কর্‌তে নেই তোমার?"

"কেন, মাষ্টার তো আছে!"

"তবেই আর কি! মাষ্টার যখন আছে, তখন লেখা-পড়া হতেই হবে,—তা ছেলে দিনান্তে একবার তার কাছে ঘেঁষুক আর নাই ঘেঁষুক।"

"কিশোর কি পড়্‌তে যায় না?"

"কোথায়! সমস্ত দিন যত অনাছিষ্টির খেলা, সঙ্গে একপাল ছোঁড়া-ছুঁড়ি জুটেছে। কখনো পুকুরে ইষ্টিমার ভাসানো হচ্ছে, কখনো স্পিরিট জ্বেলে রেল চালানো

হচ্ছে, আর ছাতে উঠে বেলুন উঠোনোর তো কামাই নেই! কোন্‌দিন কাপড়ে-চোপড়ে আগুনই লাগবে—না, ছাত থেকে পড়্‌বে, কি জলেই ডুব্‌বে, তা জানি না। মাষ্টারের কাছে দিনান্তে একবারও যায় কি না সন্দেহ।"

"কেন, তুমি বক্‌তে পার না?"

"আমার কথা কেয়ার করে বুঝি! বক্‌তে গেলে সেখান থেকে এমন ছুট্ দেবে যে খাবার সময়ে সাত্‌ বাড়ী খুঁজিয়ে সকলকে হায়রাণ ক'রে তুল্‌বে। কি দুষ্টু যে হয়েছে, তা যদি দ্যাখো! তাই তো বল্‌ছি যে তুমিও যদি এমন ক'রে গা ভাসিয়ে থাক্‌বে, তাহলে ছেলেটার কি ক্ষতি হবে আমাদের, তা কি বুঝ্‌চ না? এই বেলা তাকে শাসিত কর্‌তে ধর।"

"মাষ্টারকে বলে দিলেও তো পারো যে পড়তে না গেলে শাসন করে কিম্বা নিয়মিত ঘণ্টা ধ'রে আটকে রাখে, কি—"

"সে সব আমি পারবনা বাপু। পরের ওপর আমি অমন করে ছেলে শাসন কর্‌বার ভার দিতে পারব না। সে কি ভালর জন্যে যতটুকু দরকার, তার ওজন রাখ্‌তে পার্‌বে? হয়ত খুব বেশী মার্‌বে—কি খিদের সময় কি তেষ্টার সময়েও ছেড়ে দেবে না, খুব বেশীক্ষণ ধরে রেখে ছেলেকে হাপ্‌সে দেবে! পরকে দিয়ে কি ও-সব হয়?"

বিনয় নিঃশব্দে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে অনেকগুলা কথা তাহার গুমরাইয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু মুখে তাহাদের আনিয়া মাতুলানীর সহিত আবার এক দফা কলহে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। মনও তো তাহার বক্তব্যগুলা পরিপাক করিতে পারিতেছিল না। জলের উপর তৈলের ন্যায় তাহা মনের উপরে ভাসিয়াই বেড়াইতে লাগিল। পর? কে পর, কে আপন? কোন্ অধিকারে সে ছেলেকে শাসন করিতে যাইবে? সে তো এখন আর তাহার মাণিক নয়, সে যে কিশোর। পরের ছেলের উপর তাহার এই শাসন দুইদিন পরে যদি এই মাতুলানীরই অপছন্দ হয়। আজ তিনি শাসন করিতে বলিতেছেন বলিয়া নিজের ধারণা-মত শাসন করিতে গেলে কাল যদি ইনি চোখ রাঙাইয়া বলেন, "আমার ছেলে শাসন করিবার তুমি কে?" তখন বিনয়ের বলিবার কি থাকিবে? আর কিশোর যদি বিনয়ের শাসন না মানে! এতো খুবই সম্ভব, যখন রাজেশ্বরী দেবীকে মানেনা, তখন বিনয়কেই বা মানিবে কেন? বরং না মানারই অধিক সম্ভাবনা। বিনয় কিশোরের কে?— কেন সে তাহাকে ভয় বা শ্রদ্ধা করিবে? বরং ভয় না করিবার, শ্রদ্ধা না করিবারই তো কথা!

সহসা দাঁড়াইয়া থাকিতে অশক্ত হইয়া বিনয় মাতুলানীর সম্মুখের আসনের উপর বসিয়া পড়িল। এমন কাজ সে কখনো করে না। তাই মাতুলানীও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি হল বিনয়? মাথা ঘুরছে নাকি?"

ভাগিনেয়ের বসিয়া পড়িবার ধরণে তাঁহার এ সন্দেহও হইয়াছিল। মামীর নিজের কথাতেই বিনয় তাহার অপ্রতিভ ভাবটা ঢাকিয়া লইবার সুযোগ খুঁজিয়া পাইয়া মাথা নাড়িয়া অস্পষ্টভাবে সায় দিল, "হুঁ।"

"মাথার আর অপরাধ কি! দুধ ঘী কি ভালো খাবার তো ছোঁও না, দেখি! বেড়াতে বেরুনো, কি কিছু একটা করা, কিছু না, মাঝে মাঝে যা বেহালাটা নাড়ো চাড়ো, শুনতে পাই! এতে কি শরীর ভালো থাকে? যাক্, যা আমি বল্‌ছিলাম—ছেলের দিকে মন দাও বাপু এই বেলা,— নৈলে পরে দুঃখ পেতে হবে।"

"ও কি আমারই কথা শুনবে মামীমা?"

"কি আশ্চর্য্যি! তুমি পুরুষ মানুষ, বাপ, তোমায় ভয় করবে না? কথা শুনবে না? আমি মেয়েমানুষ বলে আমায় মানে না। এই বয়সে ছেলেগুলো নাকি এই রকমই দুষ্ট হয়, মিত্তির-গিন্নি বল্‌ছিল। তার যাটের চার-পাঁচটি সোনার চাঁদ—ছেলে মানুষের সব জানেন। পুরুষ মানুষ ছাড়া ও-বয়সের ছেলেগুলো মেয়েদের একেবারে মানে না।"

"তাহলে মাষ্টারকেও তো ভয় করতো।"

"কি যে বল তুমি বাপু, তোমার সঙ্গে আমি আর বকতে পারি না! মাষ্টার আর তুমি! একদিন তোমারই সম্পূর্ণ বশ ছিল, তোমাকে ছাড়া কাউকে জানতো না! আজও কি এটুকু তার জানা নেই যে তুমিও একজন তার বাপই!"

না, না! এটুকু সে ভুলিয়া যাক্, ভুলিয়াই থাকুক! এ কথা তাহার মনে আর না থাকিলেই যে বিনয় বর্ত্তাইয়া যায়!

একদিন সে বাপ ছিল বটে, কিন্তু আজ? কোন্ লজ্জায় সে মাণিকের কাছে সে অধিকার লইতে যাইবে? যে মাণিক তাহাকে ভিন্ন একদিন অন্য কাহাকেও জানিত না, সে তো কিশোর নয়। সে যে মাণিক, মাণিক। সে মাণিকের একটু অস্তিত্বও কি এই জমীদারের দুলাল অগাধ সম্পত্তির ভাবী অধিকারী ব্রজকিশোরের মধ্যে থাকিবার কথা! না, না।

"দেখি, কিশোর কোথায় কোন্ নতুন ফন্দীর খেলা জুড়েছে। ডেকে দিচ্ছি তোমার কাছে, কান ধরে নিয়ে একটু পড়্‌তে বসাও দিকি।"

গৃহিণী চলিয়া গেলেন—আর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বিনয় সেই আসনটার মধ্যেই মাথা গুঁজিল।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীমান্ ব্রজকিশোর তখন বাড়ীই ছিলেন না। সঙ্গীদল লইয়া নিকটস্থ একটা ফলের বাগানের মধ্যে নূতন একটা ক্রীড়ার উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন। একদিন পূর্ব্বে খুব ঝড়-বৃষ্টি হইয়া একটা অনতিগভীর অনতিপ্রশস্ত নামালো জায়গায় খানিকটা জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এবং একটা লিচু গাছের বড় ডাল ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে পড়িয়া শিশুদিগের পরম প্রলোভনের বিষয় হইয়াছিল। এইটুকু জল ভাঙ্গিয়া গেলেই ডালটার মোটা গোড়ার উপর উঠিতে পারা যায়, তারপর সেখান হইতে ধীরে ধীরে সমস্ত জলটার উপরেই বিচরণ করিতে পারা যাইবে। নীচে ছোট্ট পুকুরের মত অনেকটা জল এবং তাহার মধ্যে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত অর্দ্ধ-উন্নমিত ছোট-খাটো গাছের মত ডালটা, তাহার মাথায় মাথায় বেড়াইয়া বেড়ানো, এ কি কম সাহসের কথা! এই অভিনব বীরত্ব-প্রকাশের প্রলোভন সেই আট হইতে নয় দশ বৎসর বয়স্ক বালকদের কাহারই ত্যাগ করিতে পারিবার কথা নয়।

উরুর কাছে কাপড় তুলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া অতি-সন্তর্পণে সকলে জলে নামিল। দলের মধ্যে তাহার বয়োজ্যেষ্ঠ কেহ কেহ থাকিলেও সাহসে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বলিয়া শ্রীমান ব্রজকিশোরই সকলের অগ্রগামী হইল। সেই ছোট ছোট পায়ের একহাঁটু জল হইতে বেশীক্ষণ লাগিল না। তখনো ডালের মোটা গুঁড়ির নাগাল মিলে নাই। সভয়ে কেহ কেহ ফিরিবার প্রস্তাব করিলে কিশোরচন্দ্র তাহাদের অকুতোভয়ে সাহস দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রায় এক উরু জলের মধ্যে গিয়া শেষে সকলে ডালের উপর চড়িতে পারিল। তখন আর ভয়ের নামও নাই, বীরবৃন্দের আস্ফালন দেখে কে? শাখা-মৃগের মত সেই পতিত অর্দ্ধমগ্ন জলের উপর সকলে চারি হাতে-পায়ে বিচরণ করিতে লাগিল, কেহ-বা সুবিধামত স্থানে উপবেশন করিয়া জলে পা ডুবাইয়া মহা স্ফূর্ত্তিতে চেঁচাইতে লাগিল—"স্থাখ্, স্থাখ্, আমি কেমন মজার জায়গা পেয়েছি। কেমন রাজার মত বসে আছি, অথচ পায়ে জল ঠেক্‌ছে। তোরা কেউ এমন জায়গা পাস্‌নি, দুয়ো—দুয়ো!"

"রাজার মত বৈ কি, বকের মত! আর এই স্থাখ, কে রাজার মত সকলের ওপর-ডালে বসে তোদের মজা দেখাচ্চে।"

সকলে চাহিয়া দেখিল, কিশোর সত্যই সকলের উপরে রাজার মত সুখাসীনভাবে বসিয়াছে। পর-মুহূর্ত্তে তাহার সজোরে ঝাঁকানি দেওয়ার বেগে সমস্ত জল কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বালকের দল চীৎকার করিল,—

"ও ভাই, না ভাই কিশোর—না ভাই! পড়ে যাব—পড়ে যাব।"

"তা গেলেই বা, কতটুকুই বা জল? বড় জোর আমাদের এক বুক, কি এক গলা—তাতে আর ডুবে মরবিনে কেউ। বরং একটু সাঁতার শিখে নেওয়া যাবে, ডাল ধরে। নাম্‌বি ভাই?"

"না ভাই—না! গা-মাথা ভিজে যাবে—কাপড় ভিজ্‌বে। বাবা মার্‌বেন—মা বক্‌বে—না, ভাই।"

"উঃ—ভারী মা বাবা, তা বলে আমরা সাঁতার শিখ্‌ব না? পুকুরে নাব্‌তে ভয় লাগে, বেশী জল,- এতে বেশ মজা। ঐ তো ও-পাশে আমাদের বেনেপোকা ধর্‌বার ঢিপিটা। আকন্দ গাছগুলোয় আজ আর একটাও পোকা নেই, বিষ্টির দায়ে সব পালিয়েছে। এখানে আর কতই জল হবে,—চল্, নামি।"

"না ভাই, বাবা মারবেন—মা মারবে।"

"তবে থাক্ তোরা—আমিই একা নাবছি।"

"তোর মা কিছু বলবেন না? টের পান্ যদি?

পরম তাচ্ছিল্যের সহিত কিশোর উত্তর দিল, "নাঃ।"

"তোকে আর কে কি বলবে—তুই হলি জমীদার। কিন্তু তোর মা যেন আপন-মা নয়, বাপ্ তো আপন বাপ, তিনিও কিছু বলতে পারেন না তোকে?"

আর এক সঙ্গী উত্তর দিল, "আপন বাপ আর কি করে হবেন, এখন তো কিশোর জমিদার মশায়ের ছেলে! বিনয় বাবুর ছেলে আর তো নয়। কি ক'রে তিনি আর বকবেন—মারবেন?"

কিশোর স্তব্ধ হইয়া একটু বসিয়া থাকিতে থাকিতেই জনৈক বালকের চীৎকারে চমকিয়া উঠিল। "ঐ গ্যাখ্, তোর চাকর এসেছে তোকে খুঁজতে। চ ভাই, এই বেলা পালাই, চ'।"

সক্ষোভ গর্জ্জনের সহিত ক্ষুদ্র জমীদার তাহাদের তাড়া দিয়া উঠিল, "চাকরকেও ভয় করতে হবে নাকি?"

"তোর যেন ভয় নেই, ও গিয়ে আমাদের বাবা-মাকে বলে দেয় যদি?"

"হুঁঃ—ওর ভারী সাধ্যি!"

এমন সময়ে একটা চীৎকারে সকলে চমকিত হইয়া দেখিল, সকলের নীচু ডালে ঠিক জলের উপরে পা ছোঁয়াইয়া যে-ছেলেটি খেলা করিতেছিল, সে সভয়ে সেখান হইতে 'সাপ' 'সাপ' বলিয়া চেঁচাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। সকলেই বিষম আতঙ্কে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম বালকটি ডাল হইতে পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গেল।

ভয়ে আড়ষ্ট বালকের দল নিজেরা যে-পথে ডালে উঠিয়া ছিল, সেইপথে যে আবার নামিবার চেষ্টা করিবে, তাহাও তাহাদের সাধ্যে আসিল না, কেবল দৃঢ়ভাবে ডাল ধরিয়া সকলে চেঁচাইতেই লাগিল। কিশোর শুধু দৃঢ় পদে ডাল হইতে জলে নামিবার চেষ্টা করিতে করিতে উভয়কে সাহস দিতে লাগিল, "ভয় নেই নরেন, একটুখানি জল,—ডুববেনে—ভয় নেই,—আরে একটা হেলে সাপ, ভয় নেই।"

কিশোরের সন্ধানে অদূরে যে চাকর আসিতেছিল, ইতিমধ্যে সে ছুটিয়া আসিয়া জলে নামিয়া পড়িয়াছে এবং "বাবু আপনি এই বৃষ্টির জলে নামবেন না—নামবেন না" বলিতে বলিতে জলে-পতিত বালকের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু তাহার নিষেধ গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া কিশোর ডাল ধরিয়া জলে নামিয়া তাহার এক-গলা জলের মধ্যে দাঁড়াইল। পতিত বালকটিও তখন হাবুডুবু খাইয়া ডাল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহারও জল সেখানে প্রায় ঐ রকমই। ইতিমধ্যে চাকরটা তাহাদের কাছে আসিয়া পৌছিতেই কিশোর তাহাকে আদেশ করিল, "ওকে কোলে করে ডাঙ্গায় নিয়ে চল্।" ভৃত্য ক্ষুদ্র মনিবটির হুকুম তামিল করিতে করিতে বলিল, "আপনি ডালের ওপর উঠে দাঁড়ান বাবু, জলে থাকবেন না। অসুখ করবে। সাপটা ডাল ছেড়ে, ঐ দেখুন, ডাঙ্গার দিকে চলে গেল, আমি এসে আপনাকে কোলে ক'রে নামিয়ে নিয়ে যাচ্চি।"

কিশোর সে কথা কানে না তুলিয়া তাহার পশ্চাতে ডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "তুই ওকে নামিয়ে দিয়ে এই সব ছেলেদের একে একে হাত ধরে ধরে নামিয়ে নিয়ে আয়।"

ভৃত্য সভয়ে বলিল, "ততক্ষণ আপনি ভিজে গায়ে ভিজে জামা-কাপড়ে থাকবেন? গিন্নিমা যে—"

প্রভু বিষম ধমক দিয়া উঠিল, "তোকে অত সর্দ্দারি করতে হবে না,—যা বলছি, আগে তাই কর্।"

কিশোর হইতে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ বালকেরা কিশোরের দেখা-দেখি সাহস সঞ্চয় করিয়া একে একে ডাল হইতে নামিয়া জল পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং কিশোরের ভৃত্যের সাহায্যে অবিলম্বে সবগুলি ডাঙ্গায় উঠিল। এইবার বাড়ী যাইবার পালা। সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে দেখিয়া কিশোর সদম্ভে বলিল, "এত ভয়টা কিসের, শুনি? তোদের তো মেরে ফেলবেই না, নাহয় একটু বকুনিই খাবি! আর কে বা তোদের বাড়ীতে বলতে যাচ্চে? আয়রে নরেন, তুই আমার সঙ্গে আয়, তোর কাপড় শুকিয়ে দিইগে, তার পরে বাড়ী যাস্।"

ান কিশোরও বাড়ী গিয়া কিন্তু অনেকখানি অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পড়িল। নিজের সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে বন্ধুর জন্যই সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু রাজেশ্বরী যখন অন্ধকার মুখে তাহাকে একদিকে টানিয়া লইয়া নিজহস্তে তোয়ালে দিয়া তাহার গায়ের জল মুছাইতে লাগিলেন এবং দাসদাসীরা চারিদিকে তাহারই জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিল, তাহার বিপন্ন অতিথির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কিশোর তখন বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই বাড়ী চলে যা, নরেন—শীগ্‌গির যা।"

পরম স্নেহে আমন্ত্রিত বালক সহসা এই তাড়া খাইয়া অপ্রতিভভাবে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে বিনয়ের সম্মুখে পড়ায় সেভাবে আর তাহাকে বাড়ী যাইতে হইল না। বিনয় তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া দিল এবং খানিকটা গরম দুধ ও কিছু খাবার আনাইয়া খাইবার জন্য অনুরোধ করিল। বলিল, "তোমার কাপড় ততক্ষণ শুকিয়ে যাক্—তুমি এইগুলো খেয়ে নিয়ে এই ঘরে ব'সে ছবি ত্যাখো। ভিজে কাপড়ে গেলে তোমার বাপ-মা দুঃখ পাবেন। সহজে আর তোমাদের মাণিকের সঙ্গে খেল্‌তে দেবেন না।"

বালক খাইতে খাইতে বলিল, "কিন্তু দেখুন বিনয়বাবু, এতে কিশোরেরই সব চেয়ে বেশী দোষ, সে-ই-ই আমাদের—"

"যাক্, যাক্—আমি একটু দেখে আসি, মাণিক কেমন আছে। তুমি খাও।"

খানিক পরে বিনয় ফিরিয়া আসিলে বালক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "কিশোর কি খুব বকুনি খাচ্চে, বিনয় বাবু?"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "না, কিন্তু সে আর একা বাড়ী থেকে বেরুতে পাবে না। তোমরা এক কাজ কর না কেন,—এই বাড়ীতে এসেই তার সঙ্গে খেলা করবে?"

বালক কিছুক্ষণ ভাবিয়া শুষ্কমুখে বলিল, "বাড়ীতে আর কি খেলা হতে পারে?"

"সে ব্যবস্থা আমরা ক'রে দেব, সকালে মাণিক আর খেল্‌বে না, পড়বে। বিকেলে সকলে ত একসঙ্গে মাঠেই খেলা কর্‌বে—দুপুরে যদি তোমরা—"

"বাঃ আমরা যে তখন ইস্কুলে যাই! কিশোর যদি আমাদের কাছে না যায়, আমরাই বা তাহলে আসব কেন?"

"না—না, যাবে বৈকি,—যাবে বৈকি, তবে কি না—"

"আমার কাপড় শুকিয়েছে বিনয় বাবু, এইবার আমি বাড়ী যাই। বাবা হয়ত আমায় খুঁজচেন। দিন্ আমার কাপড়। ওটুকু ভিজে থাক্‌গে—ওতে কিছু হবে না। আমি যাই এইবার।"

বালকের পাছু-পাছু গৃহ হইতে বাহির হইয়া বিনয় দেখিল, অদূরে কিশোর গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া আছে। নরেন তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইতে সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। গতিক সুবিধা নয় বুঝিয়া নরেন তখন নিঃশব্দে এক-পা এক-পা করিয়া চলিয়া গেলে বিনয় ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিশোরের দিকে অগ্রসর হইতেই কিশোর একছুটে অন্যদিকে পলাইয়া গেল। ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সত্যেন্দ্র স্মরণে

ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র, আমাদের প্রিয়বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ আজ আর ইহলোকে নাই! ছন্দের রাজা, ভাবের ভাবুক, শব্দের স্রষ্টা, জ্ঞানের নিধি সত্যেন্দ্র অকালে আজ কোন্ অজানা লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন! ভারতীর কুঞ্জ আজ নীরব। বাঙলার বেণু-বীণা মূর্চ্ছাহত, কুহু-সুরের ফুলঝুরি, কেকার কুহক আজ অতীতের কথা—স্মৃতিতে মাত্র পর্য্যবসিত! এ কি সম্ভব! কবি-সভা আঁধার করিয়া, বন্ধু-সভায় প্রলয়ের বাজ ফেলিয়া সত্যেন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন! আকাশে বাতাসে বেদনার আকুল স্বর ছুটিয়াছে—সত্যেন্দ্র নাই!

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার কাব্য হইতে কতখানি বৈচিত্র্য, ললিত-কোমল ছন্দ ও সুর, জাতীয় সঙ্গীতের আবেগ-উচ্ছ্বাস, ভেরীর জলদ-মন্দ্র রব, আশার বাণী, কতখানি মনুষ্যত্ব ও মহত্ব যে আজ অন্তর্হিত হইল, তাহা যাঁহারা সত্যেন্দ্রকে জানিতেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। সত্যেন্দ্রকে হারাইয়া বাঙলার কি ক্ষতি হইল, তাহা শুধু বাঙলার অন্তর্যামীই জানেন!

সত্যেন্দ্র কি শুধু বাংলার কবি ছিলেন? তিনি একজন খাঁটী মানুষ ছিলেন, সদালাপী বন্ধু ছিলেন, এ দুর্ব্বলের দেশে শক্তির আধার ছিলেন! কি অসীম দরদে ভরা ছিল তাঁর প্রাণ, কি মমত্ব, সত্যানুরাগ ও স্বদেশ-প্রেমেই না তাঁর চিত্ত অনুপ্রাণিত ছিল! অভাগা বঙ্গদেশ, এ রত্ন আজ সে হারাইয়া বসিল!

রবীন্দ্রনাথকে বরণ করিতে গিয়া সত্যেন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"অসুন্দরের শোধন তুমি, অসত্য আর অমঙ্গলের অরি!"

তাঁর কবি-প্রতিভাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তোমার হিয়ার চিন্তামণি-ঘরে
বিশ্বমানব জলসা করে, ওঠে বিপুল-পুলক-ভরা গীতি!

এ কথা সত্যেন্দ্র-সম্বন্ধেও পুরাপুরি খাটে। সত্যেন্দ্রও ছিলেন কবি-গুরুর মতই চিরদিন অসুন্দরের শোধন, অসত্য আর আর অমঙ্গলের অরি। তাঁরও হিয়ার চিন্তামণি-ঘরে, বিশ্ব-মানব জলসা করিত, সেখানে "বিপুল পুলক-ভরা গীতি" উঠিত!

তরুণ যৌবনে কবি-সভায় সত্যেন্দ্রর প্রথম প্রবেশ, যেমন আকস্মিক, তেমনি মনোরম! সে প্রবেশের ভঙ্গীতে কি কুণ্ঠা, কি সঙ্কোচ, অথচ সে ভঙ্গীতে প্রতি চরণ-ক্ষেপে কতখানি শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল!

মাসিক-পত্রের হাটে সুলভ খ্যাতির মোহে সত্যেন্দ্র পূর্ব্বে কখনো ঘোরেন নাই, কবি-সভায় তাঁহার উদয় প্রভাতের তরুণ সূর্য্যের মতই দীপ্ত, মহিমাময়! স্নিগ্ধ কিরণে সহসা একদিন বাঙলার গগন আলো করিয়া তিনি দাঁড়াইলেন! সে যেন বসন্তের হাওয়ায় ভোরের পাখীর মতই সত্যেন্দ্রের বেণু-বীণা অনায়াস ঝঙ্কার তুলিল,—

বাতাসে যে বাণী যেতেছিল ভেসে ভেসে,
যে বেদনা ছিল বনের বুকেরি মাঝে,
লুকানো যা ছিল, অগাধ অতল দেশে
তারে ভাষা দিতে বেণু সে ফুকারি বাজে।
মূকের স্বপনে মুখর করিতে চায়,
ভিখারী আতুরে দিতে চায় ভালবাসা—
পুলক-প্লাবনে পরাণ ভাসাবে হায়,
এমনি কামনা,—এতখানি তার আশা!

এ কথা শক্তিমানের কথা! কবি নিজের শক্তি জানিতেন, তাই এই প্রথম ছত্রেই তাঁর পথের সন্ধানও তিনি দিয়াছিলেন। তাঁর কবিতায় 'মূকের স্বপন মুখর' হইয়াছে চিরদিন, 'ভিখারী আতুর' চিরদিনই ভালবাসা পাইয়াছে! বাতাসের ব্যথা, বনের বেদনা—যা অগাধ অতল দেশে লুকানো ছিল, তাহাকে তিনি ভাষায় রূপ দিয়া ফুটাইয়া অমর করিয়া তুলিয়াছেন! তরুণ কবি এই প্রথম কাব্য গ্রন্থেই দেখাইলেন, তাঁহার চিত্ত-নন্দন কি শোভা, কি আনন্দ, আর কি সৌন্দর্য্যে ভরা! চির-পরিচিত বহু পুরাতন বস্তুকে নূতন আলো দিয়া নূতন রূপে তাহাদের তিনি ফুটাইয়া তুলিলেন।

নিজের স্বাধীন মত অকুতোভয়ে ব্যক্ত করিবার শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। সত্যের প্রতি মর্য্যাদা, সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা সত্যেন্দ্রর চরিত্রে ও কাব্যে আগাগোড়া দেদীপ্যমান। কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, সত্যেন্দ্র সার্থক-নামা। এই সুগভীর সত্যানুরাগ সত্যেন্দ্র-চরিত্রের বিশেষত্ব। রচনায়, আচারে-ব্যবহারে মনে-জ্ঞানে সত্যেন্দ্র সত্যের উপাসক। যাহা মিথ্যা, যাহা অনৃত, সত্যেন্দ্র ছিলেন তাহার শত্রু। ন্যাকামি, ভণ্ডামি, অত্যাচার, মিথ্যা আচার, কুসংস্কার- -এ-সব ছিল তাঁর দুই চক্ষের বিষ। এ-সবের বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্র চিরদিনই বীরের মত অসি ধরিয়াছিলেন, সম্মুখ সমরে বা মেঘের আড়াল হইতে গোপন শরক্ষেপে সত্যেন্দ্রকে কেহ কোন দিন এক তিল এই সত্যের পথ হইতে হঠাইতে পারে নাই, এতটুকু কাবু করিতে পারে নাই।

কবিতা লিখিব বলিয়া সত্যেন্দ্র কোনদিন কবিতা লেখেন নাই—তাঁহার কলমের মুখে ভাব যেন ঝরিয়া পড়িত! জাতির বেদনা, বিশ্বের আনন্দ হাজার গানের সুরে তাঁহার কলমের মুখে ফাটিয়া পড়িত তাই তাঁহার সমস্ত কবিতায় এতখানি তেজ, এতখানি প্রাণের পরিচয় পাই! কি আন্তরিকতার সুর আগাগোড়া বাজিয়া গিয়াছে!

'হোমশিখা' সত্যেন্দ্রর দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ অভিনব ভাবে উচ্চ চিন্তার ধারা সুমধুর কল্পনার পাশে মোহন ছন্দে ধরা দিয়াছে! প্রেম ও নির্ভীকতায় কবিতাগুলি অনুপ্রাণিত। সাম্য-সামের দীপ্ত রাগিণী এমন করিয়া আর কোন কবি বাঙালীর কানে শুনাইয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। এমন উদার সহানুভূতি, দরদের এমন সার্ব্বভৌমিকতা আর কোন কাব্যে পাই না। বাঙালী 'হোমশিখা' পড়িয়া কবিকে এক নিমেষে হৃদয়ের আসনে বরণ করিয়া লইলেন।

তারপর কবির 'তীর্থ-সলিল', তীর্থ-রেণু' ও 'মণি-মঞ্জুষা' —এই তিনখানি কাব্যে বিশ্বের ভাব সংগ্রহ করিয়া দুই হাতে তিনি বাঙালীর ঘরে ঘরে তাহা বিলাইয়াছেন। শুধু বাঙলা কেন, বিশ্বের সাহিত্যে এমন বিচিত্র ডালি আর নাই! যতদিন বাঙলা ভাষা বাঁচিবে, এ তিনখানি গ্রন্থ ততদিন কোহিনুর মণির মত তাহার কণ্ঠ ভূষিত রাখিবে। এগুলি work of a poet inspired by the work of a poet; not a copy but a reproduction; not a translation but the rendering of a poetic inspiration. রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—তোমার লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার বিশ্বাস, কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই,—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য।

এগুলিতে মূলের ভাব বজায় রাখিয়াই শুধু সত্যেন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই। ছন্দে তিনি যে বিচিত্র লীলা দেখাইয়াছেন, শব্দে যে আবেগময় ঝঙ্কার তুলিয়াছেন—তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। হাল্‌কা এবং গম্ভীর সুরে ও ছন্দে বাঙালী একেবারে বিস্মিত অভিভূত হইয়া গেল! কবি 'মণি-মঞ্জুষা'র প্রস্তাবনায় গাহিয়াছেন,—"গানের মাণিকে দুই মুঠা গেছে ভরে"—সত্যই তাই! এ মাণিক দুই হাতে তিনি অজস্রধারে বিলাইয়াছেন! কবিতার আদর দেশে নাই, ভাবুক সমঝদারেরও অভাব, কবি তাহা জানেন,—জানেন বলিয়া গাহিয়াছেন,

জানি, আমি জানি বাহিরে যে অবহেলা,
তবু গাহি গান, গানের মালিকা গাঁথি;
একা একা রচি বাতাসে গানের মেলা,
উষার আশায় কাটাই আঁধার রাতি;—

সন্ধ্যা আঁধারে আলোকের গান গাহি,
নব-প্রভাতের আশা-পথ শুধু চাহি।

১৩১৮-১৯ সাল—এই সময়টায় কবির লেখনার আর বিরাম ছিল না। নিত্য নবু ছন্দে নূতন গান বাঙালীকে তেনি শুনাইয়াছেন। এই সময়ই বাহির হয়—তাঁর 'ফুলের ফসল'। বাঙলার কাব্য-সাহিত্যে ফুলের ফসল উৎকৃষ্ট লিরিক। শোভায় সৌন্দর্য্যে বৈচিত্র্যে মাধুর্য্যে ফুলেব ফসল যেন তাজা ফুলের বাগান! এমন শোভা কোন বাদশাহা বাগানে নাই,—এমন প্রাচুর্য্যও আর কোথাও নাই! ছন্দে যেমন বৈচিত্র্য আর লীলা-প্রবাহ, সুরে তেমনি বিহ্বলতা আবার ভাবেও তেমনি অভিনবত্ব! মনে পড়ে, ভারতীব ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা মনস্বিনী শ্রীমতী সরলা দেবী একবাব বলিয়াছিলেন, কাব্যের বিভাগে ববীন্দ্রনাথ যাহা দিয়াছেন, একেবারে নিঃশেষ করিয়াই দিয়াছেন। বাংলার ভবিষ্যৎ কবি কি পুঁজি লইয়া যে আসরে নামিবেন, জানি না। সত্য, রবীন্দ্রনাথেব দানের বৈচিত্র্য ও অজস্রতা দেখিয়া সকলেরই মনে হইয়াছিল, কাব্যেব রাজ্যে দানেব আব বাকী রহিল কি! সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু চমক্ লাগাইয়া দিলেন। তাঁহার অভিনব দানও অজস্র ভারে বাঙালীকে তেমনি বিমুগ্ধ অভিভূত করিয়া দিল। ফাল্গুনী হাওয়ায় কবির চিত্ত-নন্দনে হাজার হাজার ফুলে ফসল ফলিল,—সে একেবারে 'সৌরভে বসে সুপ্ত হরষে ভরি' চেতনায়; 'হারিতে স্বর্ণে তরুণ বর্ণে সুখ-ভরা স্বপনায়!' 'তার রূপেব মাধুরী হেরিয়া কুহরি উঠিল পাখী', কবি 'ঘন-পল্লবে সিন্ধু-লহরে মুকুতার ছবি' আঁকিয়া গেলেন। অশোক, মহুয়া, করবী, 'বিপদের রক্ত নিশান, বিষবুদ্বুদ' আফিমের ফুল, বেলা, চম্পা, বকুল, আকন্দ, শিরীষ, জুঁই, কেলিকদম্ব, হাস্নুহানা, কৃষ্ণকলি, লালাকমল, কোন ফুল আর ফুটিতে বাকী নাই! বিচিত্র সুরে বিচিত্র ফুলের এ বিচিত্র গান—বাঙলার কাব্য-কুঞ্জে এক অপরূপ শোভা, অনুপম সুরভি ও ঐশ্বর্য্য বহিয়া আনিল! যেমন ছন্দের বাহার, তেমনি শব্দের ঝঙ্কার, ভাবেরও তেমনি প্রাচুর্য্য!

ছন্দে সত্যেন্দ্র যে অধিকার দেখাইয়াছেন, তাহা বাঙলায় কেন, বিশ্বের কোন কবি কোন দিন দেখাইয়াছেন কিনা সন্দেহ! বাঙলা ছন্দে তিনি যে বৈচিত্র্য যে ভঙ্গী আনিয়াছেন তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। তাহার পূর্ব্বে কেহ, কল্পনাও করে নাই যে, বাঙলা ভাষার ছন্দে এমন কারিগরি চলিতে পারে! নানা বিদেশী ছন্দ—ইংরাজী, গ্রীক, ইতালিয়ন্, স্কচ, ফরাসী, জাপানী, জার্ম্মান ছন্দের সুর, সংস্কৃত জটিল ছন্দেব সুব বাঙলায় তিনিই আমদানী করেন। পিয়ানোর সুর, চরকার সুর, পাল্কী বেহারার পাল্কী বহার সুর বাঙলা ভাষায় ছন্দেব দীপ্ত-মধুর রাগে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথ বলেন, ছন্দেব খেলায় সত্যেন্দ্রর পাশে দাঁড়াইতে পারে, এমন ক্ষমতা কোন কবির কোনদিনই দেখি নাই।

'তুলির লিখন' একোক্তি গাথা। প্রাচীন ভারতের মনোরম ছবি। ভারতের অন্তরেব ভাব যেন মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়াছে! ভাবে ও কল্পনায় গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম! কবির তুলির লেখায় সত্যই বিদ্যুৎ ছুটিয়াছে!

'অভ্র-আবীর' মহান উচ্চ সুরে ভরপুর! শুধু বাণীর চরণে নয়, দেশমাতৃকার পায়েও 'অভ্র আবীর' যেন রক্তকমল! এ গ্রন্থে কখনো লিরিকের মিঠা সুর বাজিয়াছে কখনো বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে ভৈরীর ভৈরব গর্জ্জন, কখনো বা মহত্ত্বের কাছে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তের মুগ্ধ স্তুতি। 'টিকেমের মন্ত্র', 'নিৰ্জ্জলা একাদশী' 'জাতির পাঁতি' ইজ্জতের জন্য 'কাবভাঙ্গাল অধঃপতিত জাতি' ও সমাজের কানে যেন চেতনার বিজয়-মন্ত্র!

'নির্জ্জলা একাদশী'তে কবি বিদ্যুতের সুরে গাহিয়াছেন,—

> কচি মেয়েব একাদশী—জল চেয়েছে মাব কাছে,
> বাপ এসে তা' করে আটক,—ধর্ম্ম খসে যায় পাছে;
> এও মানুষে ধর্ম্ম ভাবে! হায় রে দেশের অধর্ম্ম!
> হায় মূঢ়তা,—এর তুলনায় হত্যাও নয় কুকর্ম্ম!
> হত্যা—সে লোক ঝোঁকের করে এক নিমেষে সকল শেষ;
> এ যে কেবল দগ্ধে মারা যাপ্য করা মৃত্যু-ক্লেশ;
> বিনা পাপে শাস্তি এ যে, ধর্ম্ম এ নয়, হয়রানী,
> এর স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইক, থাকতে পারে শয়তানী!

* * * *

'স্নেহলতার আত্মহত্যা'য় কবি সমাজের অত্যাচারে জলিয়া আগুনের সুরে গাহিলেন,—

একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হতে নৈরাশে,
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ-সাপের নিশ্বাসে!
আগুনে সে প্রাণ সঁপেছে অগ্নিতেজা নিষ্কলুষ,
মরেছে সে; বেঁচে আছে পুরুষ জাতির অপৌরুষ।

... ...

মুলুক জুড়ে প্রেতের নৃত্য, অর্থপিশাচ হৃদয়হীন
করছে পেষণ, করছে পীড়ন, করছে শোষণ রাত্রিদিন।
পুত্রবন্ত বেহাই ঠাকুর, বেহাই-জায়া বেহায়া,
বামন অবতারের মত বার করেছে তে-পায়া।

নারীর অমর্য্যাদা নারীর প্রতি ঘৃণা সত্যেন্দ্রর বুকে বাজের জ্বালা ধরাইয়া দিত। সত্যেন্দ্র গাহিয়াছেন,—

কন্যা ঘরের আবর্জ্জনা! পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়।
"পালনীয়া, শিক্ষণীয়া—" রক্ষণীয়া মোটেই নয়!
ভদ্র ধাঙড় আছেন দেশে করেন যাঁরা সদ্গতি,
কামড় তাদের অর্দ্ধরাজা—, পরের ধনে লাখ-পতি।
হায় অভাগ্য! বাঙলা দেশের সমাজ-বিধির তুল্য নাই,
কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই!

* * * *

যাদের লাগি ধনুর্ভঙ্গ, যাদের লাগি লক্ষ্যভেদ, -
যাদের লাগি সকল চেষ্টা, সকল যুদ্ধ সকল জেদ,
পৌরুষেরই ধাত্রী যারা, উৎস এবং প্রবাহ,—
যাদের গৃহ, যারাই গৃহ, কর্ম্মে যারা উৎসাহ,—
যাদের পূজায় দেবতা খুসী, যাদের ভাগ্যে ধনার্জ্জন,
পুরুষজাতির প্রথম পুঁজি, দুঃখভোলা যাদের মন,
উচ্চে তাদের করবে বহন,—উদ্বাহ নাম সফল যায়,
নৈলে কিসের পুরুষ মানুষ? ক্লৈব্য পরের প্রত্যাশায়।
সত্যিকারের পুরুষ যারা ফিরত নাক ভিখ্ মাগি,
শিবের ধনুক ভাঙত তারা কিশোরীদের প্রেম লাগি।

কিন্তু তিনি ইহার প্রতিকারের জন্য অন্ধ অথর্ব্ব অত্যাচার-কলুষিত প্রাচীন বৃদ্ধ সমাজের মুখ চাহেন নাই। তিনি মুখ চাহিয়াছেন, তরুণ সম্প্রদায়ের, তাই বলিয়াছেন,—

বাংলা দেশের আশার জিনিষ! ওগো তরুণ সম্প্রদায়!
জগৎ আজি তোমা-সবার উজল মুখের পানে চায়!

... .

তোমরা তরুণ! হৃদয় করুণ, তোমরা বারেক মিলাও হাত,
জাতির জীবন গঠন কর, কর নূতন অঙ্কপাত।
নূতন আকার, নূতন বয়স, সবল দেহ, সতেজ মন,
তোমরা কর শুভ কাজে অশুভ পণ বিসর্জ্জন!
পাটোয়ারীগোছ বুদ্ধি যাদের, দাও উঠিয়ে তাদের পাট,
পাটে বস তোমরা রাজা, দাও ভেঙে দাও বাঁদীর হাট।

এই তরুণ সম্প্রদায় সত্যেন্দ্রর আশার স্থল। তিনি তাহাদের মরমী বন্ধু ছিলেন। এই ছেলের দল তরুণ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি আর-এক জায়গায় বলিয়াছেন,—

মানুষ হয়ে ওরা সবাই অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিয়ে চলে, হাস্যমুখে গর্ব্বভরে,

... ...

পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল!
আলাদিনের মায়াপ্রদীপ, ওই আমাদের ছেলের দল।

সত্যেন্দ্র শুধুই ফুলের ডাকে, বাতাসের ডাকে, বসন্তের সভায় বীণার সুর তুলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ছিলেন, জাতীয়তার কবি, মনুষ্যত্বের পুরোহিত, শক্তির পূজারি। মানবত্ব যখনই যেখানে দলিত হইয়াছে, কবি তখনই সেখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মানুষের দুঃখে গলিয়া মানুষের কাছে দরদ চাহিয়াছেন—মনুষ্যত্বের দীপ্ত রাগিণী শুনাইয়াছেন। এই দরদ তাঁর জাতি-বিজাতির ভেদ রাখে নাই। তাঁহার কাছে মেথর, নীচ অন্ত্যজ অশুচি কেহই ঘৃণ্য নয়—সকলেই মানুষ, সকলেই সমান স্নেহের পাত্র।

গঙ্গার ধারা যে পদে উপজে,
তাহে উপজিল শূদ্রজাতি,
পাবনী গঙ্গা,—শূদ্র পাবন,
পরশ তাহার পুণ্য-সাথী!

হোমরুলের জন্য দেশের মর্ম্মস্থলে যখন দাবী উঠিল, কবিও তখন দাবীর চিঠি পেশ করিলেন,—

মানুষ হতে দাও আমাদের, ঘুচাও মনের এ আপশোষ!
ঘর-শাসনের দাও অধিকার, হোমরুলের কি এতই দোষ!

ভারতে নেশনের অভ্যুদয়ে কবির সেই গান, 'বাজা রে শঙ্খ ; সাজা দীপমালা—" কি আশায় উৎফুল্ল হইয়াই কবি গাহিলেন,—

মিলন ঘটেছে কত জাতে জাতে
কত শ্রেণী সাথে মিশেছে শ্রেণী—
তাই ত সাগর-সঙ্গম আর
তীর্থ মোদের যুক্তবেণী।
বাহান্ন পীঠ এক হবে যাহে,
উচ্চারো সেই মন্ত্র তবে,
আনো শক্তির কঙ্কালগুলি
মহাশক্তির উদয় হবে।
ছোট ছোট সব দেউল টুটিয়া
মিলুক দেবার শক্তিরাশি —
ভারতে আবার জাগুক উদার
উদাসী শিবের প্রসাদ-হাসি।

* * *

মহাজীবনের বার্ত্তা এসেছে
মহা-মিলনের লয়ে নিশান —
ডাকে ভবিষ্য ডাকিছে বিশ্ব,
করিছে ইসারা বর্ত্তমান!"

দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নর-নারীর দুঃখে সকলের প্রাণ গলাইয়া কবি গাহিয়াছেন :—

আজি নিরন্ন দেশ বিপন্ন
ক্লেশ-বিষণ্ণ লক্ষ হিয়া ;
নিষ্ঠুর মৃত্যুর নীরব ছায়া
ছাইল অম্বর পক্ষ দিয়া।
মরু ধূসর প্রান্তর অই,—
বিমর্ষ অন্তর বর্ষণ কই ?
আজি ভিখারী বালক নারী—
প্রাণ ধরে শিশু অশ্রু পিয়া !
অতি দুঃসহ দুর্গতি রে
হতাশ শত কঙ্কাল ফিরে !
"কে দিবি অন্ন ? কে হবি ধন্য ?"—
পুণ্য পথে ফিরিছে পুছিয়া।

কি মর্ম্মভেদী করুণ দৃশ্য—আর কি আকুল আবেগময় গান !

আর্ত্ত নর-নারীর দুঃখে যেমনি তাঁহার প্রাণ গলিত, — মনুষ্যত্বের মহত্বের শ্রদ্ধা করিতেও সত্যেন্দ্র তেমনি তৎপর ছিলেন। তাঁহার 'গান্ধিজী' কবিতা বাঙ্‌লা সাহিত্যের অলঙ্কার।

কুটীরে কুটীরে মহাজীবনের জ্বেলেছে যে হোমশিখা
দিন-মজুরের জনে জনে সঁপি মর্য্যাদা শুচি টীকা।
পৌঁছে দেছে যে পৌরুষ নব চাষাদের ঘরে ঘরে,
যার বরে ফিরে শিল্পীর গেহ কাজের পুলকে ভরে।
যার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে যে ত্রিবিশ কোটীর মন,
দেশের খতেনে যশের অঙ্ক লেখে সাধারণ জন,
আত্মবিলোপী কর্ম্মী-সঙ্ঘ যার বাণী শিরে ধরি'
নীরবে করিছে ব্রতের পালন দুঃসহ দুখ বরি—

* * *

যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্‌মহলের খিল,
পূরা হয়ে গেছে যার আগমনে ত্রিবিশ কোটির দিল,
তার আগমনী গাওরে খেয়ালী, গৌড়বঙ্গময়,
গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধীর গাহো জয়।

তাঁহার 'সাগর-তর্পণ' 'বঙ্কিমচন্দ্র' 'দীনবন্ধু মিত্র', তাঁহার 'রবি-প্রশস্তি' মহত্ত্বের পূজায় জাতিকে চিরদিন উদ্বুদ্ধ রাখিবে ; দেশের লোক মহত্ত্বের সম্ভ্রম ও পূজা শিখিবে !

সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেম, সে ছিল যেন তাঁর তপস্যা। দেশকে তিনি জড় মাটীর স্তূপ মনে করিতেন না। দেশ তাঁর কাছে 'মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ !' বাঙলা দেশ তাঁর চোখে অন্নদা, গৌরী, লক্ষ্মী, শিবানী—একই কালে করালা—কমলাসনা ; ভৈরবী ও সুন্দরী। তিনি ধ্যানে গাহিয়াছেন, "অভয়া তুই ভয়ঙ্করা, কালো গো তুই আলোর নীড়।"

গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমির কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্যেরও সীমা নাই !—
"গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়া, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।
কিরীট তোমার বিরাট হীরা হিমালয়ের জিম্মাতে,...
তোর কোহিনুর কাড়বে কে বল্ ? নাগাল না পায়
কেউ হাতে।"

আর কীর্ত্তি ?

যে জানে, সে হিয়ায় জানে, জানে আপন চিত্তে গো,
জানে প্রাণের গভীর ধ্যানে নয় যে তুমি মিথ্যে গো।
আছ তুমি, থাকবে তুমি, জগৎ জুড়ে জাগবে যশ,
উথলে ফিরে উঠবে গো তোর তাম্র-মধুর প্রাণের রস।

দেশকে জীবন্ত দেখিতেন বলিয়াই সত্যেন্দ্র 'নব বঙ্গের' নবীনা নাগরী' কলিকাতার গৌরবে তন্ময় চিত্তে গাহিয়াছেন,

বিদেশী ইহারে করেছে লালন, স্বদেশের যত তরুণ হিয়া
ইহাকে ঘিরিয়া গুঞ্জরে তবু প্রতি নয়নের কিরণ পিয়া।
সত্যেন্দ্রর চোখে কলিকাতা "ভাব-ভারতের সারনাথ"
আচারে হয়তো ত্রুটি আছে এর, বিচারে হয়তো রয়েছে গ্লানি,
তবু নবযুগে এ নব তীর্থ, সব সাধনার পীঠ এ জানি।

* * *

সাধনার পীঠ সাধের আসন শিল্পের নব জীবন-ধারা
এ মহানগরী ভারত আকাশে সাতাশ তারার নয়ন-তারা।

... ...

মাইকেল মধু হেথা সমাহিত, বঙ্কিম-হেম-ভস্মকণা
ধূলিতে ইহার রয়েছে মিশায়ে কত না ভাবুক রসিকজনা।

... .

কবির 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' তুরগী, রবির প্রভাত গীতির শ্রোতা
এই কলিকাতা কোলাহলময়ী, এর ভাগ্যের তুলনা কোথা।
কবি-গুঞ্জনে এ ধূলিপুঞ্জ ধরেছে কুঞ্জবনের ছবি,
জগৎ উজল যার প্রতিভায় এ সেই রবির উদয়-গিরি।
হেথা আশুতোষ আশু নিরামল নব নালন্দা শিক্ষা-গেহ,
দেশের কিশোর হৃদয়গুলিতে বিথারি পক্ষীমাতার স্নেহ।

... .

হেথা পরিষৎ অশথের চারা দিকে দিগন্তে পসারে শাখা,
টেকচাঁদ আর গুপ্ত কবির প্রকাশে এ ঠাঁই পুলকে মাথা।
গিরিশ হেথায় রঙ্গে মাতল, বাদ দ্বিজেন্দ্র হাসিল হাসি।
ভারতের শেষ বয়সের মেয়ে—উজ্জয়িনীর বাজিছে বাঁশী।

সত্যেন্দ্র কমল-বিলাসী কবি বা ফ্যাসনের কবি ছিলেন না। রমণীর মন আর যৌবন লইয়া তরল খেলা তিনি কোন দিন খেলেন নাই। নারী সত্যেন্দ্রর চোখে মহিমাময়ী দেবী, মায়ের জাতি! তিনি ছিলেন সৌন্দর্য্যের কবি,আনন্দের কবি, মঙ্গলের কবি, জাতীয়তার কবি। তাঁর ভাষা যেমন বলিষ্ঠ, ভাব তেমনি শক্তিতে ভরপূর, আর ছন্দেও তেমনি লীলাপ্রবাহ। এ যেন ভাবের বন্যা, পৌরুষের আগুন, মনুষ্যত্বের দীপ্তি! মৌলিকতা, বাগ্মিতা, বুদ্ধি, কল্পনা এবং রস ইহাই হইল কবিতার প্রাণ; এ-সবগুলার আশ্চর্য্য সমন্বয় ছিল সত্যেন্দ্রর কাব্যে। এ যেন ছিল তাঁর তপস্যা। এই গুণেই সত্যেন্দ্র আজ শুধু বাঙলায় নয় বিশ্ব-সাহিত্যে অমর। ব্রাউনিংয়ের ন্যায় সত্যেন্দ্রও বলিতেন,—

The world's no blot for us,
Nor blank; it means intensely
and means good.

তিনি cynic ছিলেন না, pessimist ছিলেন না—তাঁহার সমস্ত গানে, সকল কবিতায় কেবলি আশার সুর বাজিয়াছে! মন ছিল তাঁর উদার, আশার হাওয়ায় মুক্ত, দীপ্ত, নির্ম্মল!

এ ছাড়া বিদ্রূপের কশাও মাঝে মাঝে তিনি উদ্যত করিতেন। ভণ্ডামি ন্যাকামি ও অত্যাচারের গায়ে এমন জোরে আর কেহ বোধ হয় এমন নির্ম্মম কশাঘাত করেন নাই। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাঁর অসাধারণ শক্তিও ছিল। 'হসন্তিকা' তাহার প্রমাণ। তাছাড়া সাহিত্যে বা অপর ক্ষেত্রে কাহাকেও অনধিকার চর্চ্চা করিতে দেখিলে তার উপর সর্ব্বদাই ব্যঙ্গের কশা চালাইয়াছেন, নবকুমার কবিরত্নের ভূমিকায় ছদ্মবেশ ধরিয়া। সংস্কারক নবকুমার কবিরত্ন আর কেহই নন্; তিনি সত্যেন্দ্রনাথ।

আবার শুধুই তিনি কি ছন্দের রাজা ছিলেন গদ্যেও তাঁহার ছিল অসাধারণ দখল। তাঁর 'জন্মদুঃখী' নরওয়ের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক Jonas Lie এর Livsslavenএর জীবন্ত জলন্ত অনুবাদ। এখানেও দুঃখীর দুঃখে তাঁর চিরন্তন সহানুভূতি দীপ্ত ভাষায় করুণ সুর তুলিয়াছে। তাঁহার রঙ্গমল্লী' চারখানি বিদেশী নাট্যের মর্ম্মানুবাদ, adaptations। চীনা নাটক তিনিই প্রথম বাঙলার সাহিত্যে দান করেন। এগুলি এমন নিখুঁতভাবে দেশী ছাঁচে গড়িয়াছেন, যে তার কোথাও এতটুকু বিদেশীতার বিকটতা নাই—নূতন সৃষ্টির মতই মনোরম। তারপর

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
(আনন্দ বাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

বাঙলা বারোয়ারি উপন্যাসে সত্যেন্দ্র কয়েকটি অধ্যায়ের লেখক। মানব চরিত্রে তাঁহার সুগভীর অভিনিবেশ, বঙ্গের সমাজতত্ত্বে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান এই কয়টি পরিচ্ছেদে ছত্রে ছত্রে ফুটিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের বহু রচনা এখনো মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশের ভার আজ বাঙালীর। তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা 'জ্যৈষ্ঠীমধু' গত আষাঢ়ের ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।

১৩২৬ সালে বন্ধুরা মিলিয়া এক সভা গড়েন,—সত্যেন্দ্র তার নাম রাখিলেন, রবিমণ্ডলী। সত্যেন্দ্র তার প্রধান উদ্যোগী। এ সভা খাতার পিঠে চড়িয়া কোনদিন জাঁকাইয়া বসিবার চেষ্টা করে নাই। প্রতি-রবিবারে অপরাহ্নে একজনের গৃহে বন্ধুদের চায়ের মজলিস বসিত; আর অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য আমন্ত্রণ-কারী নূতন রচনা পড়িয়া শুনাইতেন। সত্যেন্দ্র এ-সভার প্রথম উদ্বোধন করেন। তাঁর গৃহে রবিমণ্ডলীর প্রথম বৈঠক বসে। সত্যেন্দ্র এ-বৈঠকে ধূপের ধোঁয়া নাটিকা রচনা করিয়া পাঠ করেন। নামের মত—এ নাটিকাখানি অতীতের ধূপের ধোঁয়ায় মশ্‌গুল্। নাটিকাটিতে পুরুষ-চরিত্র মোটে নাই। অযোধ্যার রাজবধূ সীতা, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি—ইঁহারা নায়িকা। ধূপের ধোঁয়া ১৩২৬ সালে ফাল্গুন মাসের ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। স্বতন্ত্র গ্রন্থ এখনো ছাপা হয় নাই। 'ধূপের ধোঁয়া' বাঙ্‌লা ভাষার কণ্ঠে হীরার হার!

এ'ত গেল সত্যেন্দ্রর কবিত্বশক্তির কথা। সত্যেন্দ্র যে কত বড় মানুষ ছিলেন, তা তাঁর বন্ধুরা আর পরিচিতেরাই শুধু জানেন। কোন প্রতিজ্ঞা করিলে ভীষ্মের মত অটল ভাবেই তাহা তিনি রক্ষা করিতেন। সত্যেন্দ্র মিথ্যার সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে অসুন্দরের সঙ্গে রফা করিবার লোক ছিলেন না। প্রাচীন গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা, তরুণের প্রতি অনুরাগ—তাঁর অন্তর ছিল বিকশিত ফুলের মতই তাজা, উদারতার হাওয়ায় নির্ম্মল, আলোয় আলো—সে চিত্তে কুসংস্কারের একতিল আঁধারের ঠাঁই ছিল না। নাম-জাহিরে তাঁর কোনদিন প্রবৃত্তি ছিল না। চালচলন অত্যন্ত সাদাসিধা! অর্থের অভাব ছিল না, তবু কোনদিন বিলাসিতার ধারেও তিনি পা বাড়ান নাই। পায়ে হাঁটিয়া কোথায় সে ধর্ম্মতলা—কোথায় ময়দান—সত্যেন্দ্রনাথ চলিয়াছেন। কোন দ্বিধা নাই!

সত্য বলিতে কখনো তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। সত্য অপ্রিয় হইলেও চক্ষু-লজ্জার খাতিরেও মিথ্যার আবরণে নিজের মতকে তিনি ঢাকিতে জানিতেন না। এজন্য কেহ কেহ বিরক্ত হইলেও তিনি সত্যের মর্য্যাদা কোনদিন লঙ্ঘন করেন নাই।

তাঁর সত্যপ্রিয়তার একটা গল্প বলি। সে আজ কয়েক বৎসরের কথা। একজন লেখক আমায় তাঁর রচিত একটি গল্প পড়িয়া শোনান্। গল্প শুনিতে শুনিতে আমার আতঙ্ক হয়, যদি গল্প শেষ হইলে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন, কেমন হলো? তাহা হইলে মুখের উপর কি করিয়া বলিব—ভাল নয়! গল্পটি সত্যই কিছুই হয় নাই।

গল্প পড়া শেষ হইলে যা' ভাবিয়াছিলাম, তাই ঘটিল। লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হয়েছে?

আমি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া করিলাম—মন্দ কি! বেশ হয়েছে।

ঠিক তার পরদিন সত্যেন্দ্র আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—অমুকের গল্প তুমি ভাল বলেছ! তোমায় ভাল লেগেছে?

আমি বলিলাম,—রামঃ! লক্ষ্মীছাড়া গল্প।

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—কেন তবে ভাল বলেছ?

আমি কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম,—চক্ষুলজ্জার খাতিরে। মুখের উপর কি করে বলি, মন্দ!

সত্যেন্দ্র বলিলেন,—অন্যায় করেছ। আমাকে সে গল্প পড়িয়ে শুনিয়েছে। আমি বলেচি, ছাই! তাতে সে বললে, তুমি তার প্রশংসা করে এসেছ। শুনে আমি অবাক হলুম, সে গল্পর কি করে প্রশংসা করলে! যাই হোক্ আর অমন বলো না—ওতে মিছে প্রশ্রয় পেয়ে ওরা বড় বাড়িয়ে তোলে!

আমি বলিলাম,—বেশ, এবার থেকে নির্ভীকভাবে সত্য কথাই বলবো,—তা সে যত অপ্রিয়ই হোক্!

ইহার মাস দুই পরে আবার সেইরূপ ঘটনা! সেই লেখকই তাঁর লেখা আর একটি গল্প পড়িয়া শুনাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন লাগল? আমি সত্যেন্দ্রর কথা স্মরণ করিয়া সত্য কথা বলিলাম। বলিলাম,—কিছু হয় নি! লেখক স্তব্ধ রহিলেন।

তারপর সন্ধ্যায় কান্তিক প্রেসে সত্যেন্দ্রর সঙ্গে দেখা। সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—তার কোন গল্প আবার আজ তোমায় শুনিয়েছিল বুঝি?

আমি বলিলাম,—হাঁ, শুনে সত্য অভিমতই জানিয়েচি। সত্যেন্দ্র বলিলেন,—বুঝেচি তা। আমার সঙ্গে দেখা হতেই সে বলছিল, সৌরীনবাবুর ভারী অহঙ্কার হয়েছে! তাতেই বুঝলুম, তার লেখার তুমি নিশ্চয় নিন্দে করেছ।

আমি বলিলাম,—দেখলে সত্যেন, এই জন্যেই অনেক সময় সত্য অভিমত বলা যায় না।

সত্যেন্দ্র বলিলেন,—তা হোক, তবু সত্য অভিমতই দিতে হবে।

বাঙলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ৺অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন সত্যেন্দ্রর পিতামহ। সত্যেন্দ্রর জন্ম হয় ১২৮৮ সালের মকর সংক্রান্তির দিন। এই ত বয়স—ইহার মধ্যে সকলি ফুরাইল!

সত্যেন্দ্র ডিগ্রীধারী নন্, ডিগ্রীর উমেদারীও করেন নাই। কিন্তু তাঁর মত পণ্ডিত অল্পই দেখিয়াছি। তাঁর পড়াশোনা ছিল প্রচুর। তিনি বহু ভাষা জানিতেন। তাঁর কবিতা কবিত্বের দিক দিয়াই শুধু উপভোগের বস্তু নয়, তাহার মধ্যে পুরাণ, ইতিহাস, সমাজ-তত্ত্বের নানা কথা আমরা পাই। তাঁর লাইব্রেরী বাঙলা দেশে একটি দেখিবার সামগ্রী। বই কিনিয়া আলমারী-জাত করা তাঁর স্বভাব ছিল না—নিজে পড়িতেন। ইদানীং চোখ খারাপ হওয়ায় নিজে বই পড়িতে পারিতেন না—অপরকে ধরিয়া পড়াইয়া শুনিতেন। তাঁর জ্ঞান ছিল নানাদিকে। এমন জিনিষ নাই, যা তাঁর জানা ছিল না। কোথাকার অপ্রকাশিত একটা গ্রাম্য শব্দ কি ছড়া, আর কোথায়, বা বিদেশের কি আচার-রীতি। তিনি ফরাসী ও পারস্য ভাষা খুব ভালই জানিতেন। বন্ধুদের বহু গ্রন্থের নাম-করণের বেলায় সত্যেন্দ্রর ডাক পড়িত। এমন বন্ধু-বাৎসল্যও দেখা যায় না। তাঁর বন্ধু-বাৎসল্য ছিল অকৃত্রিম। যিনি তাঁর বন্ধুত্ব-গর্ব্বে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তিনিই জানেন, তাঁর সখ্য, সে কি সম্পদই না ছিল! উপদেশ দিতে পরামর্শ দিতে

তাঁর যেমন আগ্রহ ছিল, বন্ধুর মঙ্গল-সাধনেও তেমনি তাঁর চিত্তও ছিল দরাজ।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িতেছে—না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই লেখককে একবার একখানি বহির কঠিন সমালোচনা করার জন্য এক দল সাহিত্যিক তাঁহাকে একরকম 'একঘরে' করিয়া ছিলেন। তাঁদের এক বৈঠকী মজলিসে সত্যেন্দ্র ও অপর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ হয়—লেখকের হয় নাই। সত্যেন্দ্র সে কথা শুনিয়া বলিয়া বসেন—যাব না! লেখক নিজে অনুরোধ করিয়াছে, ব্যক্তিগত মতামতে তোমার এ অনিচ্ছা বা রাগ কেন? সত্যেন্দ্র বলিলেন—এ ত সামাজিকতা নয়, এ দস্তুরমত ছোটলোকমি!

ভাষার প্রতি অনুরাগ যত্ন তাঁর কি অপারসীম ছিল, তার একটি উদাহরণ দিই। দশ-বারো বৎসর পূর্ব্বে বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদে যখন মণিলাল ও আমি প্রবৃত্ত হই, তখন সত্যেন্দ্র আমায় Alphonse Daudetর লেখা Jack উপন্যাসখানি পড়িতে দেন। তাঁর লাইব্রেরীর আমি একজন পাঠক ছিলাম। উপন্যাসখানি পড়িয়া ফেরত দিতে গেলে, সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন পড়লে? আমি বলিলাম, চমৎকার! তবে এই দুঃখ, যে এসব theme নিয়ে এদেশে কেউ উপন্যাস লেখেন না!

সত্যেন্দ্র বলিলেন,—কোত্থেকে লিখবে? কাকে উপন্যাস বলে, তাই জানেনা। তুমি এ-খানার অনুবাদ কর। আমি শিহরিয়া কহিলাম, সর্ব্বনাশ! এই ৭৫০ পাতার বই অনুবাদ করব! সত্যেন্দ্র বলিলেন, তোমরা দু'জনে অনুবাদ সুরু করেছ যখন, তখন তোমরা না করলে কে করবে? কর তুমি অনুবাদ! সত্যেন্দ্রর জিদে আমি জাকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। দু-বৎসর পরে উপন্যাস (মাতৃঋণ) সম্পূর্ণ হলে আমি দুপুরবেলা সত্যেন্দ্রর বাড়ী গিয়া হাজির হইলাম। বই ফেরত দিলাম, বলিলাম,—তুমি যা খাটিয়েছ, ওঃ! এই নাও তোমার বই।

হাসিয়া সত্যেন্দ্র বলিলেন, ও-বইয়ে আমার সত্ব নেই আর। বলিয়া বইখানি টানিয়া যেখানে ইংরাজীতে নিজের নাম লেখা ছিল Satyendranath Dutta, ঠিক তার উপরে লিখিয়া ফেলিলেন, To Saurin in appreciation. আমি সে বই লইব না, সত্যেন্দ্রও ছাড়িবেন না। হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা দাও, তুমি মারা গেলে আমি পরিষদে পাঠিয়ে দেব।

সে কথা, স্নেহের সেই আবেগময় কণ্ঠস্বর আজো আমার প্রাণে বাজিতেছে।

সত্যেন্দ্রর সাহিত্যের আদর্শ ছিল খুব উঁচু। যে-কোন লেখাই বন্ধুরা লিখিতেন, সত্যেন্দ্রকে পড়িয়া না শুনাইলে যেন তার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাইত না। সত্যেন্দ্র যদি বলিতেন, লেখা ভালো, বন্ধুরা তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁর এ সাহিত্যের মাপকাঠি বন্ধুত্বের খাতিরে টলিতে জানিত না। এ কি সামান্য কথা! সত্যের প্রতি কতখানি নিষ্ঠা থাকিলে মানুষ এমন পারে!

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি সত্যেন্দ্রর ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং মার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল পুরাণ-কাহিনার মতই অপূর্ব্ব, অপরূপ। মার মনে পাছে কষ্ট হয়, এ জন্য তিনি সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকিতেন। মার অনুমতি সকল কাজে গ্রহণ করিতেন। মা একাদশী করিতেন বলিয়া তিনিও একাদশী করিতেন।

সামাজিকতার গুণে বন্ধুসমাজে সত্যেন্দ্র সকলেরই অতি-প্রিয় ছিলেন। বন্ধু-সভায় তিনি ছিলেন সবার সেরা। আলাপে-গানে সকলকে তিনি বিমুগ্ধ রাখিতেন। তাঁর গৃহে কথায় কথায় বন্ধুদের মজলিস বসিত—আর সত্যেন্দ্রর নিজের হাতে কি সে আদর আর পরিচর্য্যা!

আজ সত্যেন্দ্র নাই! আর তাঁকে চক্ষে দেখিতে পাইব না, আর তাঁর কণ্ঠ শুনিব না—বন্ধুর এ তীব্র বেদনা ভাষায় বলিবার নয়। তাঁর বিয়োগে তাঁর রচনা বা ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করিতে আজ আসি নাই—তার এ স্থান নয়, কালও নয়; সময়ে যোগ্যতর ব্যক্তি সত্যেন্দ্রর কাব্যের বিশ্লেষণ করিবেন, তাঁর আসন কোথায়, নির্দ্ধারণ করিবেন। আমার এ আলোচনা শুধু বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দরিদ্র বন্ধুর তর্পণ। এ শুধু তাঁর কথার আলোচনায় মর্ম্মের মধ্যে তাঁর সান্নিধ্য-অনুভব।

আজ সত্যেন্দ্র নাই। চিতার আগুনে আজ প্রচুর জ্ঞান

কবিত্ব, মনুষ্যত্ব, মহত্ব, স্বদেশানুরাগ সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্র যে রচনা রাখিয়া গিয়াছেন, জানি, সেগুলি nurslings of immortality. জানি, সত্যেন্দ্র অমর, তবু আচার্য্য হরিনাথ দেব মৃত্যুতে সত্যেন্দ্রনাথ যে কথা বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, আজ সত্যেন্দ্রর তিরোধানে তাঁর সেই কয় ছত্রই কেবলি মনে পড়িতেছে। এ ত সত্যেন্দ্রর দেহ শুধু আজ শ্মশানে পুড়িয়া ছাই হয় নাই, এ যে—

আজ শ্মশানে বঙ্গভূমির নিভ্‌ল উজল একটি তারা,
রইল শুধু নামের স্মৃতি রইল কেবল অশ্রুধারা ;
নিবে গেল অমূল্য-প্রাণ, নিবে গেল বহ্নিশিখা !
বঙ্গভূমির ললাট 'পরে রইল আঁকা ভস্মটীকা।

অকালে সত্যেন্দ্র চলিয়া গেলেন। তাঁর চিত্তে কীট্‌স্ শেলি বায়রণ ব্রাউনিং আসিয়া একাত্ম হইয়া যেন বাস করিতেছিলেন! রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্রময়চিত্ত সত্যেন্দ্র নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিমেষের জন্য হারান্ নাই, এ বড় সামান্য কথা নয়। তাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হইয়া একদিন যে বিদেশের নোবেল প্রাইজকে বাঙলা দেশে দ্বিতীয়বার আহরণ করিয়া আনিত, এ কথা সত্যেন্দ্রর কাছে অনেকবার আমি বলিয়াছি। এ কথা বন্ধুর পরিহাস বা অত্যুক্তি বলিয়া কোনদিনই আমি মনে করি নাই, ইহা ছিল আমার অন্তরের বিশ্বাস।

যাও কবি, যাও বন্ধু, সুরলোকে গিয়া তোমার সুরের ধারায় নন্দনকে নন্দিত কর! তোমার জন্য এখানে আমরা শোক করিব না। জানি, এ মর্ত্ত্যে দুই দিনের জন্যই সকলে আসিয়াছি। তুমি সহসা আগে চলিয়া গেলে, আমরাও একদিন যাইব। এখানে যে কয়দিন থাকিব, আমরা তোমায় চোখে দেখিব না, এই যা দুঃখ—নহিলে জানি, তুমি সে কল্পলোকে আমাদেরই পথ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে! এ বিরহের বেদনা একদিন এ ঘুচিবেই। তোমার অম্লান হাসি, তোমার সেই সহজ ভালবাসা, হে সত্যের পূজারী, সে তো ক্ষণিক নয়, সে তো মিথ্যা হইবার নয়। তবে আজ, কিসের শোক, কিসেরই বা বেদনা!

আমরা ত তোমাকে হারাই নাই, বন্ধু! তুমি আমাদের মনে আছ, প্রাণে আছ, আমাদের সকল চিন্তায় আলোর শিখার মতই দীপ্যমান আছ! পাছে শোকের মোহে সে কথা ভুলি, তাই বুঝি আমাদের সান্ত্বনার জন্যই তুমি গাহিয়া গিয়াছ,—

যেদিন আবার ফুটবে মুকুল
সেদিন আমায় দেখতে পাবে ;
ফাগুন হাওয়া বইলে ব্যাকুল
থাকব দূরে কোন্ হিসাবে!
আসব আমি স্বপন ভরে
গভীর রাতে ভুবন 'পরে ;
হাসব আমি জ্যোৎস্না সাথে,
গাইব যখন কোকিল গাবে!
তোমরা যখন কইবে কথা,
শুনব আমি শুনব গো তা,
আমার কথা হরষ ব্যথা
হায় গো হাওয়ায় ভেসে যাবে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞানের নেপোলিয়ন

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের পেটেণ্টে আপিসের সব-চেয়ে বড় খদ্দের হচ্ছেন টমাস আলভা এডিসন। আজ পর্য্যন্ত তিনি যত বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার 'পেটেণ্ট' নিয়েছেন, আর কোন মানুষ তা পারে নি। গেল চুয়ান্ন বৎসরের মধ্যে নূতন নূতন উদ্ভাবনার জন্যে তিনি মোট নয়শোটি বিভিন্ন 'পেটেণ্ট' গ্রহণ করেছেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে হিসাব ক'রে দেখা হয়েছিল যে, ত্রিশবৎসরের মধ্যে তাঁর নেওয়া পেটেণ্টের সংখ্যা ৭৯১ টি,—অর্থাৎ প্রতি পক্ষে গড়ে দুইটিরও বেশী!

এডিসনের বয়স যখন মোটে পাঁচবৎসর, তখন থেকেই আবিষ্কার ও গবেষণার দিকে তাঁর ঝোঁক! শিশু এডিসন শুনলেন, মুরগীরা ডিমের উপরে ব'সে তা দিলে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। শুনেই তিনি একরাশ ডিমের উপরে গিয়ে বসে দেখলেন, মানুষ তা দিলে বাচ্চা বেরোয় কিনা? বলা বাহুল্য, তাঁর এ পরীক্ষা বিফল হয়। বালক-বয়সে তিনি যখন রেলপথে কাজ করেন, তখন আবার কি-একটা পরীক্ষা করতে গিয়ে রেলগাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেন। ফলে কণ্ডাক্টর তাঁর কাণের উপরে এমন প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দেয় যে, চিরকালের জন্যে তিনি কালা হয়ে যান।

একুশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম উদ্ভাবনার 'পেটেণ্ট' গ্রহণ করেন, কিন্তু তাতে একপয়সাও লাভ করতে পারলেন না। তেইশ বৎসর বয়সে তিনি আর একটি নূতন জিনিষ উদ্ভাবন করলেন। সেটির দাম যে সতেরো আঠারো হাজার টাকার বেশী হবে, এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল না। কিন্তু তার বদলে তিনি একলক্ষ ও কয়েক হাজার টাকা পেয়ে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। সেই বিপুল মূলধনে তিনি একখানা দোকান খুলে বসলেন। তারপর তারবার্ত্তা সম্পর্কীয় আর একটি উদ্ভাবনার ফলে তাঁর মূলধন আরো বেড়ে উঠল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এডিসন একদল উৎসাহী যুবককে সঙ্গীরূপে নিয়ে একটি বড় পরীক্ষাগার স্থাপন করলেন। সেই পরীক্ষাগার আজ সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। সেখানে এমন সব অগুন্তি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হয়েছে, যার জন্যে বর্ত্তমান মানব-সভ্যতা নানাদিকে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই-সব আবিষ্কার-উদ্ভাবনার জন্যে এডিসনকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। কোন একটি নূতন ভাব মনে এলে তিনি দীর্ঘ তিন দিন ও রাত বিনিদ্রভাবে একাসনে বসে কাটিয়ে দিয়েছেন—তাইত আজ আমরা বিজলী-বাতি, উষ্ণীভূত (incandescent) আলোক, ফোনোগ্রাফ, বায়স্কোপ ও বৈদ্যুতিক রেলপথ প্রভৃতি অভাবিত ব্যাপারকে চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট সত্য বলে দেখতে পাচ্ছি। আজ এডিসনের বয়স পঁচাত্তর বৎসর। কিন্তু এখনো

এডিসন (এখনকার চেহারা)
পঁচাত্তর বৎসর বয়সে এখনো ২৪ ঘণ্টা ধরে একটানা পরিশ্রম করেন

চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে একটানা পরিশ্রম করতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। তাঁর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার উপর যে-সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে এখন সাড়ে সাতলক্ষেরও বেশী লোক নিযুক্ত আছে।

টিপুনিতে ব্যথা সারে

দৈবগতিকে হাতের বুড়ো আঙুল থেঁতো হয়ে গেলে, আপনি কি কখনো তা চেপে ধ'রে ব্যথার টন্‌টনানি কমাবার চেষ্টা করেছেন? এটি করবার সময়ে আপনি কি কখনো এই কার্য্যের কারণ ভেবে দেখেছেন?

সংপ্রতি "zone therapy" নামে যে অপূর্ব্ব চিকিৎসা-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, দেহের এক জায়গার ব্যথা-বেদনা অন্য কোন জায়গা টিপে ধরে অনায়াসেই কমানো বা আরাম করা যায়।

ডাক্তার ফিজ্‌জেরাল্ড দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখিয়েছেন, আপনার যে পাশের দাঁতে ব্যথা হবে, সেই পাশের একটি হাতের বা পায়ের আঙুল টিপে ধরলে, ব্যথা থেকে আপনি নিস্তার পাবেন।

শিরঃপীড়ায় মুখ-গহ্বরের উপরদিকটা আঙুল দিয়ে ঠেলে ধরলে তা সেরে যাবে।

বাঁ হাঁটু মচ্‌কে গেলে বাঁ হাতের কনুই চেপে ধরতে হয়

দাঁতের ব্যথা এই উপায়ে আরাম হয়। যেদিকের দাঁতে ব্যথা হবে, সেইদিকের হাতের আঙুলের বিশেষ বিশেষ

দাঁতের ব্যথা আরাম করা

গাঁট টিপে ধরবেন। চোয়ালের মাঝখান থেকে ধরা হোক্। ব্যথা যদি প্রথম তিনটি দাঁতে হয়, তবে বুড়ো আঙুল, পরের দুইটি দাঁতে তর্জ্জনী, তার পরের কসের দুই দাঁতে অনামিকা ও কড়ে আঙুল চেপে ধরা দরকার।

বাঁ হাঁটু মচ্‌কে গেলে বাঁ হাতের কনুই চেপে ধরবেন।

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল যদি হাতুড়ী বা অন্য কোন জিনিষের আঘাতে থেঁৎলে যায়, তবে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা কোন স্থিতিস্থাপক (elastic) বন্ধনী দিয়ে খুব কষে বেঁধে ফেলবেন।

এম্‌নি zone therapy অনুসারে চিকিৎসা করে শরীরের প্রায় প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যথা আরাম করা যায়। ডাক্তার ফিজ্‌জেরাল্ডের মতে, রবারের বা কাপড়ের খুব শক্ত বন্ধনী ব্যবহার করাই সব চেয়ে প্রশস্ত। দরকারের সময়ে এই বন্ধনীটি পাঁচ থেকে পনেরো মিনিট পর্য্যন্ত রাখা উচিত। কিন্তু এতে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়

...য়, তাই ঐ নির্দ্দিষ্টকালের পরে এটি খুলে ফেল্‌তে হবে। ...ব্যথা যতক্ষণ না কমবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অমনি মাঝে মাঝে ...লে বন্ধনীটি আবার ব্যবহার করবেন। তাতেও যে ...থা না কমে, তার কারণ গুরুতর। সে ক্ষেত্রে ডাক্তার ডাকাই কর্ত্তব্য।

বাঁ দিককার চোয়ালের দন্ত্যশিরা টিপে ধরে সারা বাঁ অঙ্গের বেদনা সারানো

ডাক্তার ফিজ-জেরাল্ডের চিকিৎসা পদ্ধতি আরো একটু ...বর ক'রে দিচ্ছি। শিরঃপীড়ার সময়ে মুখ-গহ্বরের উপর-অংশ অর্থাৎ টাক্‌রার উপরটা বুড়ো-আঙুল বা ছুরির ধা...-নির্ম্মিত চওড়া হাতল দিয়ে (মাথার যেখানে ব্যথা, সম্ভব হ'লে ঠিক তার নীচে) জোরে চেপে থাকবেন—তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত। ব্যথা গুরুতর হ'লে এই সঙ্গে হাতের আঙুল বা কব্জীর উপরেও বন্ধনী দিবেন—বিশেষ ক'রে হাতের উপর কিংবা পিছনদিকে চাপ দেওয়া দরকার। পেটের গোলমালে বা চোখের ব্যয়রামের জন্যে শিরঃপীড়া না হলে এই উপায়েই ব্যথা আরাম হয়ে যাবে।

দাঁতের ব্যথায় পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আঙুলে বন্ধনী দেবেন এবং সেই সঙ্গে ঠিক ব্যথার উপরে গণ্ডদেশ চেপে ধরবেন কিংবা বুড়ো আঙুল ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ব্যথিত দাঁতের মাড়ি টিপে ধরবেন। আঙুলের বন্ধনী প্রথম বা দ্বিতীয় গাঁটের উপরেই হওয়া উচিত।

ঠিক কোথায় বন্ধনী বা চাপ দিতে হবে, সেটা বোঝাও খুব সহজ। শক্ত দাঁতওয়ালা একখানা আলুমিনামের চিরুণী সংগ্রহ করুন। তারপর যেখানে বন্ধনী দেবার কথা, সেইখানে চিরুণীর দাঁত রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাড়তে থাকুন। চিরুণীর দাঁতের স্পর্শ যেখানে লাগলে ব্যথা কম বলে মনে হবে, ঠিক সেইখানেই বন্ধনী বা চাপ দেবেন।

কেউ কেউ উক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতির সফলতার কারণ নির্দ্দেশ করেছেন এইরূপ। আহত স্থানের কোন স্নায়ু বা অন্য যে স্নায়ুর সঙ্গে মস্তিষ্কে আহত স্থানের স্নায়ুর যোগ থাকে, তা চেপে ধরলে মস্তিষ্কের মধ্যে ব্যথা-বোধ সঞ্চারিত

চিরুণী ঘুরিয়ে বন্ধনীর জায়গা নির্দ্দেশ

হ'তে পারে না। অর্থাৎ টেলিগ্রাফের তার কেটে দিলে যেমন খবর-চলাচল বন্ধ হয়, এও তেমনি।

আরো কয়েকটি ব্যাপারে zone therapy'র সফলতা দেখা গেছে। নাসা-বেথার অনুসরণে মুখ-গহ্বরের নানাস্থানে চাপ দিলে প্রায়ই সর্দ্দি জর আরাম হয়। উপর-ঠোঁটের মাঝখানটা তর্জ্জনীর সাহায্যে দাঁতের উপরে চেপে ধরলে হাঁচিও প্রায় বন্ধ হ'য়ে যায়। বমনে ও সমুদ্র-পীড়ায় দুই হাতের তেলো চেপে ধর্‌লে বা ধাতু-নির্ম্মিত চিরুণী নিয়ে তেলোতে আঘাত করলে যথেষ্ট উপকার হয়। কটিবাতে বা lumbagoতে আঙুলের ডগাগুলি চেপে ধরলে ফল হবে। এক্ষেত্রে আর এক কাজও করতে পারেন। একখানা চিরুণী এমন ভাবে চেপে ধরবেন, যাতে ক'রে চিরুণীর দাঁত সব আঙুলের মাঝের গাঁটগুলির উপরে লেগে থাকে—এবং বুড়ো-আঙুল থাকে চিরুণীর শেষ-ভাগের উপরে।

আলাদিনের খাল

ডিনামাইট যে মানুষের পরিশ্রম কতদিকে কমাতে পারে, আমেরিকায় তার এক নূতন প্রমাণ পাওয়া গেছে। এক জায়গায় চারজন মাত্র লোক মিলে, অর্দ্ধ দিবসের

ডিনামাইট ফাটার পরমুহূর্ত্তেই খালের চেহারা

মধ্যেই একটি সাতশো ফুট লম্বা, বারো ফুট চওড়া ও সাড়ে চার ফুট গভীর খাল খুঁড়ে ফেল্‌তে পেরেছে। ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে এই উপায়ে। যেখান দিয়ে খাল যাবে, সেখানে

ডিনামাইটে আগুন দেওয়ায় তা যেমন ফাটে, জল অমনি তোড়ে এসে খাদ ভরিয়ে ফেলে।

প্রথমে সারি সারি ডিনামাইট-ভরা দণ্ড পুঁতে দেওয়া হয়। তারপর সেই ডিনামাইটে আগুন দেওয়ায় তা ফেটে গিয়ে চোখের নিমেষে নির্দ্দিষ্ট পথে খাল সৃষ্টি করে দেয়! এই ভাবে খাল কাটলে খোঁড়া মাটি দু'পাশে উঁচু ক'রে ফেলে রাখতেও হয় না। কারণ বিস্ফোরকের মুখে খোঁড়া মাটি পর্য্যন্ত সাফ হয়ে যায়।

ফোনোগ্রাফের ডাক্তারি

আমেরিকায় সংপ্রতি একরকম নূতন ফোনোগ্রাফ উদ্ভাবিত হয়েছে, যার দ্বারা রোগীর হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ধ্বনির রেকর্ড তুলে নেওয়া যায়। রেকর্ডে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শব্দ উচ্চতর হয়ে বাজবে—এমন-কি, একটি প্রকাণ্ড হল-ঘরে বসেও তা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাবে। এই

ফোনোগ্রাফের রেকর্ডে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের শব্দ এমন উচ্চে বাজবে যে বক্তৃতার প্রকাণ্ড হল ঘরে বসেও তা শোনা যাবে।

নূতন উদ্ভাবনার ফলে, এর পর রোগীর হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের রেকর্ড দরকার হ'লে বহুদূর দেশেও চিকিৎসকের কাছে পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া চলবে। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে, দূরদেশ থেকে অতিরিক্ত 'ভিজিট' দিয়ে অরা ডাক্তার ডেকে আন্‌তে হবে না। কারণ, ডাক্তাররা তখন রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলেও, রেকর্ডের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের আর্ত্ত ধ্বনি শুনেই রোগের লক্ষণ বুঝতে পারবেন!

নিক কার্টারের স্রষ্টা

পৃথিবীতে সব-চেয়ে বেশী বই লিখেছেন কে? আমেরিকার সদ্য-মৃত ফ্রেডারিক ভ্যান রেনস্লেয়ার ডে! আপনারা অনেকেই বোধ হয় বিখ্যাত ডিটেকটিভ নিক কার্টারের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত আছেন? পাশ্চাত্য দেশে এই গোয়েন্দার গল্পগুলির আসল বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে কোথাও অশ্লীলতা বা কুৎসিত ভাবের আঁচটুকু পর্য্যন্ত নেই। তাই কম-বয়সী বালক-বালিকার হাতেও অসংকোচে নিক কার্টারের গল্প দেওয়া যায়। মিঃ ডে প্রধানতঃ এই নিক কার্টারের গল্প লিখেই বিখ্যাত হয়েছেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রথম নিক কার্টারের গল্প প্রকাশিত হয়। ফি হপ্তায় তখন একখানি ক'রে বই বেরুত। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, মিঃ ডে সবশুদ্ধ এগারোশোখানা 'নিক' কার্টারের গল্প লিখেছেন। প্রত্যেক বইখানিই উপন্যাস। তাদের মধ্যে মোট শব্দের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ! রবিবার ছাড়া বৎসরের অন্যান্য প্রত্যেক দিনেই মিঃ ডে নিয়মিত ভাবে পাঁচহাজার শব্দ রচনা না ক'রে কলম ছাড়তেন না।

কিন্তু কেবল এই এগারোশোখানা গোয়েন্দা কাহিনী নয়,—মিঃ ডে বেনামীতে আরো অসংখ্য পুস্তক লিখে রেখে গেছেন। চল্লিশটি বিভিন্ন নামে তাঁর লেখা ছোট গল্প আছে রাশি রাশি। তাঁর কোন লেখাই পূর্ব্ব রচনার পুনরাবৃত্তি নয়। মিঃ ডের লেখা খুব উঁচু-দরের না হ'লেও সাহিত্য-শ্রমে যে তিনি পৃথিবীর আর সব লেখককে টেক্কা দিয়েছেন, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

সাধারণতঃ মিঃ ডে টাইপ রাইটারের সাহায্যে উপন্যাস রচনা করতেন। ক্রমাগত টাইপ রাইটার চালিয়ে চালিয়ে তাঁর কাঁধের মাংসপেশী অতিরিক্ত রূপে স্ফীত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। মুখে মুখেও তিনি গল্প রচনা ক'রে যেতে পারতেন। তিনি "প্লট" বেঁধে লিখতে বসতেন না,—চরিত্রগুলিকে ঘটনার ধারাবাহিক স্রোতে যথেচ্ছভাবে ছেড়ে দিতেন, সে গুলি আপনা অপনি স্বভাবিক ভাবে বিকসিত হয়ে উঠত। তাঁর বালক পাঠকের সংখ্যা ছিল চার কোটিরও বেশী! কিন্তু জনসমাজে এমন প্রিয় ও পরিচিত হয়েও, কপর্দ্দক-শূন্য দীন ভিখারীর মত অসহায় অবস্থায় তাঁকে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে!

প্রসাদ রায়।

অভিনয়ে ডিগ্রী লাভ

লণ্ডন য়ুনিবার্সিটিতে অভিনয়ে কৃতিত্বের জন্য ছাত্রদের ডিগ্রী দিবার প্রস্তাব হইতেছে। সম্প্রতি University Extension Boardএর উপর খসড়া নিয়মাবলী তৈয়ার

করিবার ভারও দেওয়া হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, দুই বৎসরকাল নাট্যকলার বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা লাভ করিলে তবে এই ডিগ্রী পরীক্ষা দিবার অধিকার মিলিবে। এ ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য ছাত্রেরা শুধু নাটক পড়িয়া তৈয়ার হইলেই চলিবে না—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের স্বর-সাধনা করিতে হইবে; স্বর নিক্ষেপ, স্বর রহস্যের থিওরিতে পুরাপুরি জ্ঞান লাভ করিতে হইবে,—তাছাড়া মনোবিজ্ঞান, দেহ-বিজ্ঞান, পোষাক-পরিচ্ছদের ইতিহাস, নাট্য-সাহিত্য, কাব্য, নাটক পড়া, বক্তৃতা ও অভিনয়,—এ সমস্ত বিষয় দস্তরমত শিখিয়া তাহার পরীক্ষা দিতে হইবে। সমস্ত বিষয়গুলিতে যিনি 'পাশ' হইবেন, তিনিই অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য ডিগ্রী পাইবেন।

রাধিকানন্দ।

গা ডলা

সেকালে আমাদের দেশে স্নানের পূর্ব্বে গায়ে বেশ করিয়া তেল মাখিবার প্রথা ছিল। বড় লোকেরা চাকর দিয়া আধঘণ্টা, একঘণ্টা বেশ করিয়া গা ডলাইয়া তেল মাখিতেন। মেয়েরাও বেশ করিয়া গায়ে তেল মাখিত। কথাই ছিল, 'তেলে-জলে শরীর!' এখন বিলাতী আব-হাওয়ায় সাবান মাখিবার বেওয়াজ সুদূর পল্লীগ্রামেও এমনি প্রবেশ করিয়াছে যে সেখানেও ডোবার কর্দ্দমাক্ত মলিন জলে নর-নারীকে সাবান মাখিয়া গা ধুইতে ও স্নান করিতে দেখা যায়। অথচ সেকালের জোয়ান্ লোকেরা বলেন, তেল মাখিয়াই তাঁরা তাঁদের শরীরকে তোয়াজে রাখিয়াছেন। তেল মাখার দরুণ খোস-পাঁচড়া হইত না, তাছাড়া একটু ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দিকাশী বা গরমে অসহ্য-বোধ, এ ভোগও তাঁদের বড় ভুগিতে হয় নাই।

তেল মাখা সম্বন্ধে এখন নানা কথা উঠিতে পারে। অমন আয়েশ করিয়া আধঘণ্টা একঘণ্টা ধরিয়া তেল মাখার সময়ও অনেকের নাই! যাই হোক্, সম্প্রতি আমেরিকার প্রসিদ্ধ জুয়ান মাক্‌ফাডেন বহু পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন,—তেল নাই মাখিলে! গা ডলো, লোক দিয়া নয়, বেশ করিয়া নিজে ডলো। দেখিবে, গায়ের চামড়ায় মখ্‌মলের মত একটা মসৃণত্ব আসিবে শরীর দস্তরমাফিক ভালো হইবে—কোল-কুঁজো থাক যদি কিম্বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যদি কাহারো খুঁৎ থাকে, ত সে সব খুঁতও এই ডলায় একেবারে ভরিয়া সরিয়া উঠিবে। এ কাজে প্রয়োজন শুধু নিজের দুইখানি হাত ও একটু ফুরসৎ! সকালেই এ ব্যায়াম প্রশস্ত। এ ব্যায়ামে নিশ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণে কোন বাধা থাকিবে না। শরীরে এতটুকু শ্রান্তি বা জড়তা থাকিবে না, শরীরে শক্তি, তেজ পাওয়া যাইবে।

অনেকেই সকালে উঠিয়া হাই তুলিতে থাকেন; দুপুরে কাজকর্ম্মের সময়ও ঘুমে চোখ ঢুলিয়া আসে। শ্রান্তি বা অবসাদের আর বিরাম নাই! এ ঘুমের ঘোর যেন আর ছাড়িতে চায় না। কোন কাজে উৎসাহ নাই—গা যেন মাটী-মাটী হইয়া আছে সর্ব্বক্ষণ—কাজ করিতে ভালই লাগে না। কোন কাজে গাও নাই!

এই শ্লথ আলস্যের নানা কারণ থাকিতে পারে—কিন্তু কারণ যাহাই থাকুক, এই চিত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রথামত গা ডলার অভ্যাস করিলে সমস্ত শরীরে রক্তের চলাচল হইবে এবং সর্ব্বপ্রকার জড়তা হইতে মুক্ত হইয়া শরীর ও মন সর্ব্বদা উৎসাহ-সবল থাকিবে। এইটুকুই চরম লাভ নয়—ইহাতে কি পুরুষ, কি নারী, সকলের শরীরের গড়নও এমন হইবে, বিশেষ করিয়া নারীর দেহ-সৌন্দর্য্য সুষমায় ভরিয়া উঠিবে। এই ব্যায়াম প্রত্যহ করিলে অন্য ব্যায়ামের প্রয়োজনও থাকিবে না। ইহাতে বুকের ছাতি দরাজ হইবে, হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। অথচ ইহাতে মেহনৎ-আয়োজনের কোন ঘটা নাই,—নিভৃত ঘরের কোণে এ ব্যায়াম-চর্চ্চা নারী অনায়াসে অভ্যাস করিতে পারেন। এ ব্যায়ামের মজা এই যে ইহাতে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত-সঞ্চালন হয়। মাকফাডেন বলিয়াছেন,—দো-মনা হইয়া এ ব্যায়াম করিয়ো না; বেশ স্ফূর্ত্তি সহকারে কর, আমি আশ্বাস দিতেছি—শরীর তোমার স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিবে—গায়ের টোল সারিয়া যাইবে; সঙ্গে সঙ্গে মনও সর্ব্বক্ষণ উৎসাহ-প্রবণ ও প্রফুল্ল থাকিবে।

মেয়েদের পক্ষে বিশেষতঃ বাঙালী মেয়েদের পক্ষে এ

ব্যায়াম খুবই সহজ বলিয়া মনে হয়। আর ইহাতে তাঁহারা ফলও পাইবেন প্রচুর।

১। বাঁ হাতকে (ছবির মত) ঘাড়ের ডান দিকে যতখানি সম্ভব আনো। তারপর ঘাড়ের উপর সেই হাত রাখিয়া নীচের দিকে টানিয়া ডলো; ঠিক এমনি ভাবেই আবার ডান হাত দিয়া বাঁ ঘাড় ডলো।

২। হাতের নীচের অংশ ডলো (ছবির ভাবে)। আট-দশ বার ডলো। উপর-হাত তারপর অমনিভাবেই ডলো।
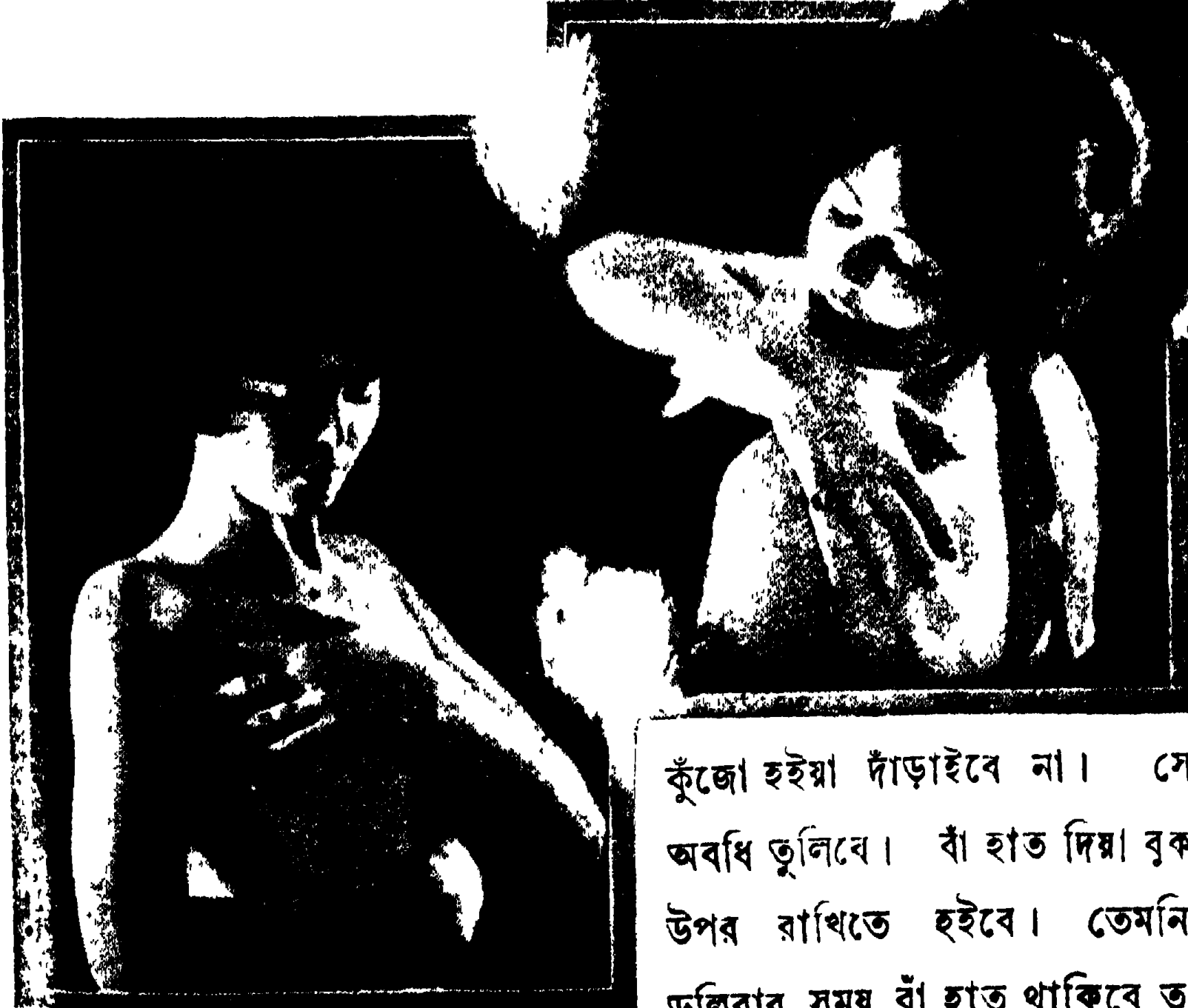
৩। বগলের নীচে হাতের তলপিঠ ছবির মত ডলো। নীচের হাতও ডলিতে হইবে। অর্থাৎ ডান হাত ডলিতে হইবে বাঁ হাতে, আর বাঁ হাত ডলিবে ডান হাতে।

৪। ডান হাত দিয়া বাঁ দিক-কার ঘাড়ের নীচে যতখানি হাত যায়, পিঠ ডলো। হাত ছবির মত রাখিয়া ডলিতে হইবে। উপর হইতে নীচে এবং নীচে হইতে উপরে ডলিতে হইবে। আবার এমনি করিয়া বাঁ হাত দিয়া ডান দিককার পিঠের উপর-ভাগ ডলো।

৫। বাঁ হাত বুকের উপর ডলো উপর হইতে নীচে, নীচে হইতে উপরে। কুঁজো হইয়া দাঁড়াইবে না। সোজা দাঁড়াইয়া হাত যতদুর যায়, ততদুর অবধি তুলিবে। বাঁ হাত দিয়া বুক ডলিবার সময়, ডান হাতখানি তলপেটের উপর রাখিতে হইবে। তেমনি আবার ডানহাত দিয়া বাঁ দিক্‌কার বুক ডলিবার সময় বাঁ হাত থাকিবে তলপেটের উপর।

৬। ছবির মত দুই হাত তলপেটের উপর রাখিয়া ডাহিনে বাঁয়ে করিয়া ডলিবে। কখনো ডান হাত উপরে, বাঁ হাত নীচে, আবার কখনো বাঁ হাত উপরে, ডান হাত নীচে এমনি হাত উল্টা পাল্টা করিয়া লইবে।

৭। ছবির মত, তোয়ালে ধরিয়া পিঠের উপর রাখো। তোয়ালের দুই ধার দুই হাতে ধরিয়া স্নানের পর পিঠের জল যেমন করিয়া গামছায় মোছা হয়, তেমনি ভাবে পিঠে তোয়ালে ঘষো। ডান কাঁধের উপর যখন তোয়ালে ঘষিবে, তখন ডান হাতে উপর প্রান্ত ধরিবে; তারপর বাঁ কাঁধে তোয়ালে ধরিবার সময় উপর প্রান্ত বাঁ হাতে ধরিবে। ছবিতে ডান কাঁধে তোয়ালের প্রান্ত ডান হাতে ধরা আছে। অমনি বাঁ কাঁধে হাত বদল করিয়া তোয়ালে ঘষিতে হইবে। পিঠ ডলিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ রীতি।

৮। কোমর ও নীচের পীঠ দুই হাতে ছবির মত ডলিতে হইবে। কোমর ও পাছার বেঁক অবধি দুই হাতে ডলিতে হইবে—উপর হইতে নীচে, নীচে হইতে উপরে।

তারপর পায়ের হাঁটুর উপর উরু হইতে ডলিতে হইবে। দুই হাত দুই উরুতে রাখিয়া উপর হইতে নীচের দিকে ডলিতে হইবে। নীচে হইতে উপর দিকে ডলা নয়।

পায়ের পিছন দিক অর্থাৎ ডিম ডলিতে হইবে। হাঁটু যতখানি সম্ভব সোজা রাখা দরকার। পায়ের তলা (ডিম অংশ) ডলিবার সময় যদি জোরে ডলা হয়, তবে ভালই হয়। অপর অঙ্গ খুব জোরে ডলিবার প্রয়োজন নাই—তবে একেবারে—ফুলের অঙ্গ-পরশ গোছও যেন না হয়!

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মৃত্যুমুখী ইন্দুমতী
শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত চিত্র হইতে

৪৬শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩২৯ { পঞ্চম সংখ্যা

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বাঙ্গালা সাহিত্যে একজন মহারথী ছিলেন। অন্যান্য লেখকদের মত তিনি অনেক রকমের, অনেক রংএর, অনেক ঢংএর অনেকগুলি বই লিখিয়া যান নাই সত্য; কিন্তু তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কেহ বড় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার দীর্ঘ জীবনটাকে তিনি একখানা বাঙ্গালা বিশ্বকোষ করিয়া বাঙ্গালীদের দিয়া গিয়াছেন। লেখক লেখকই থাকেন, বই লেখেন, গল্প-পদ্য, নাটক, নবেল, ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, রচনা বিবেচনা দর্শন বিজ্ঞান আরও কত কি তার সীমা নাই অন্ত নাই। কিন্তু বই আর লেখক দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। লেখক হইতে বই অনেক তফাৎ। সময়ে সময়ে ঠিক বিপরীতও দেখা যায়। মাতাল হয়ত মদ ছাড়াইবার জন্য বই লিখিতেছেন। ঘোর বাবু সংযম শিক্ষা দিতেছেন, "আমরা যাহা বলি তাহাই কর, যাহা করি তাহা করিও না।" অক্ষয় বাবু সে রকম লোক ছিলেন না। তাঁহার জীবন সাহিত্যময় ছিল। শয়নে স্বপনে, ঘরে বাহিরে, সমাজে মজলিসে, ঘাটে পথে, আহারে বিহারে, পূজায় পার্ব্বণে, খবরের কাগজে মাসিক পত্রে, কাগজে কলমে, সংসারে সভায় তিনি বাঙ্গালাময় ছিলেন; তাঁহার সবটাই বাঙ্গালা সাহিত্য। তাই বাঙ্গালী তাঁহাকে উপাধি দিয়াছে "আচার্য্য।" তিনি টোল করিয়া পড়ান নাই, তবুও তিনি আচার্য্য। তিনি জ্যোতিষ-গণনায় দক্ষ ছিলেন না, তবুও তিনি আচার্য্য। তিনি বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী ছিলেন না, তথাপি তিনি আচার্য্য। তিনি কখনও কলেজে অধ্যাপনা করেন নাই তবুও তিনি আচার্য্য। কিন্তু তাঁহার মত আচার্য্য কে আছেন? তিনি যে তাঁহার জীবনটাই লোক-শিক্ষায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাই তিনি আচার্য্য। তাই কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী তাঁহাকে উপাধি দিয়াছেন, "আচার্য্য"। অক্ষয়বাবু, আপনার কাছে আমরা যত পাইয়াছি, এত আর কাহারও কাছে পাই নাই, তাই আপনি আমাদের আচার্য্য। তাই আপনি আমাদের পূজ্য, তাই আপনি আমাদের হৃদয়ে এত অধিক স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

বলিবেন, অক্ষয় বাবু বাঙ্গালীকে কি দিয়াছেন যে আমরা তাঁহার এত বড়াই করি? আমি বলি, যাহা আর কেহ দেয় নাই। সেটা কি? বাঙ্গালীয়ানা, বাঙ্গালীত্ব, আমি বাঙ্গালী এই বোধ। আমার বাঙ্গালী বলিয়া যে একটা সত্ত্বা আছে—এই জ্ঞান। বেশী সংস্কৃত পড়িলে লোকে ব্রাহ্মণ হইতে চায়, ঋষি হইতে চায়। সেটা খাঁটী বাঙ্গালার জিনিস নয়; তাহার সঞ্চার পশ্চিম হইতে। বেশী ইংরাজী পড়িলে কি হয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবেনা। সাহেব হয়, হাট্ কোট্ পরে, নেকটাই গলাবন্ধ পরে, পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ায়, হক্-না-হক্ ইংরাজী বুলি ঝাড়ে, মনটা ইংরাজ-ইংরাজ হইয়া যায়। এই যে ভাব ইহারও সঞ্চার পশ্চিম হইতে, সাগর-পার হইতে। ইংরাজীই পড়, আর সংস্কৃতই পড়,

ফার্সিই পড়, আর উর্দ্দুই পড়, বাঙ্গালার উপর তোমার নজরই পড়িবেনা। বাঙ্গালার ভাল-মন্দ তুমি দেখিতেই পাইবেনা, মোট কথা বাঙ্গালার উপর তোমার প্রীতিই থাকিবেনা। সেই প্রীতিটুকুই অক্ষয় বাবু আমাদের দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হাড়ে হাড়ে সে প্রীতি ছিল, তাই তিনি সে প্রীতিটুকুই বাঙ্গালীকে শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং শিখাইতে পারিয়াছেন এবং তাই তিনি জীবনে মরণে আমাদের উপর আচার্য্যগিরি করিতেছেন।

সে বাঙ্গালীয়ানাটা কি? সে কথা এত বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবীকে আমি কি বুঝাইব? তাঁহারা সকলে তাহা বুঝেন। অন্ততঃ অক্ষয় বাবুর কল্যাণে বা আশীর্ব্বাদে তাহা বুঝিয়াছেন। আমি তাহার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিলে ধাষ্টামি হইবে। তবে মোটামুটী দু-চার কথা বলিয়া দেখাইব, আমিও আপনাদের মত অক্ষয় আচার্য্যের শিষ্য হইতে পারিয়াছি কিনা! বাঙ্গালীয়ানার অর্থ এই যে, বাঙ্গালার যা ভাল তাহা ভাল বলিয়া জানা, আর যাহা মন্দ তাহা মন্দ বলিয়া জানা। ভাল লওয়া ও মন্দ না লওয়া তোমার নিজের কাজ। কিন্তু জানাটা প্রত্যেক বাঙ্গালীর দরকারী কাজ। জানিতে হইলে বুদ্ধিপূর্ব্বক বাঙ্গালা দেশটা কি দেখিতে হইবে, বাঙ্গালায় কে থাকে দেখিতে হইবে, বাঙ্গালার আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সমাজ-সংসার, উৎসব-আনন্দ, দুঃখ-শোক, কুস্তি লাঠী খেলা টোল পাঠশালা দেখিতে হইবে। ইহার গান গীতি পয়ার পাঁচালি, নাচ খেমটা, কীর্ত্তন ঢপ যাত্রা কবি সব দেখিতে হইবে। মন প্রাণ দিয়া দেখিতে হইবে। আবার এখনকার কালে যাহা যাহা বদলাইতেছে, তাহাও দেখিতে হইবে। খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, কনসার্ট, থিয়েটার, ইস্কুল, কলেজ, আপিস, আদালত সবই দেখিতে হইবে। বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালা জাতির সমস্ত জীবনটা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই তুমি বাঙ্গালী হইবে। অক্ষয়বাবু তাহা করিয়া ছিলেন, তিনি বাঙ্গালা চিনিয়াছিলেন, তাই চিনাইতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে তিনিও ধন্য হইয়াছেন, আমরাও ধন্য হইয়াছি।

এখনকার লোকের জীবন-চরিত নাই বলিলেই হয়। অথবা অত লম্বা কথাটা আপনারা ভাল বলিবেন না। এখনকার লোকের জীবন চরিতে বিশেষ কিছু নাই, বৈচিত্র্য নাই। সব একরকম একঘেয়ে। শিক্ষা-বিভাগের ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর কল্যাণে সব একাকার হইয়া গিয়াছে। যেমন ভাত হাঁড়ির ভাত, একটা টিপিলেই সবগুলা টেপার কাজ হয়, এখনকার লোকের জীবন-চরিতও সেই রকম। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, এক পাকের তৈয়ারী কিনা, তাই সবই স্বাদ একই রকম। তেমনি সব বাঙ্গালীরই জীবন-চরিত একই রকম; সেই পাঠশালা, সেই ইস্কুল, সেই কলেজ, সেই ইউনিভার্সিটী, সেই মাষ্টারী কেরাণীগিরি উকিলী বা ডাক্তারী, সেই বিবাহ, সেই ছেলে-পিলে, সেই সাহেব, সেই আপিস। সবই এক রকম। এক পাকের তৈয়ারি কিনা, তাই স্বাদ একই রূপ!

এখানে বলিয়া রাখি, বিদ্যাসাগর মহাশয় এখন বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় ঢাকা পাটনা কাশী লক্ষ্ণৌ আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয় দেখিয়া খুসী হইতেন; বলিতেন, সব আর এক পাকের তৈয়ারী হইবে না, অনেকগুলা পাক চড়িয়াছে, হয়ত এখন লোকের জীবন-চরিত একটু একটু বিচিত্র হইবে। অক্ষয়বাবুর জীবনে বিশেষত্ব এই যে তিনি বাবার নিকট অনেক শিখিয়াছিলেন। বাবা তাঁহাকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন; কখনও মজলিস হইতে "অক্ষয়, তুই উঠিয়া যা" বলিয়া ছেলেকে সরাইয়া দিতেন না। অক্ষয়বাবুর বাবা একাধারে বাবা, মাষ্টার, বন্ধু ও গুরু ছিলেন, তাই অক্ষয়বাবুর বাবার উপর এত টান। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "জগৎ একদিকে আর বাবা আর একদিকে থাকিলে আমার মনোতুল-দাঁড়াতে বাবার দিকেই ঝোঁক ছিল।" তাঁহার মৃত্যুর সময় যে ঘটনা হয়, তাহা আরও করুণ হৃদয়গ্রাহী। অক্ষয়বাবুর পীড়া হয় শিবপুরে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার আর রক্ষা নাই। তাই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কদমতলার বাড়ীতে ফিরিয়া যান। তাঁহার পিতার যে ঘরে মৃত্যু হয়, সেই ঘরে তাঁহার বিছানা হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি ইসারা করেন, বাবার যেখানে মৃত্যু হইয়াছিল এবং চিরন্তন হিন্দু নিয়ম অনুসারে যেখানে পেরেক পোতা

ছিল, সেইখানে তাঁহাকে শোয়ান হয়। সেখানে শুইয়া সম্মুখে বাবার ছবি টাঙ্গান ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে তাঁহার শিবচক্ষু হয়।

তাঁহার বাবার উপর এই যে অসাধারণ টান এটাও একটা বাঙ্গালীয়ানা—বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। এ জিনিষটা এখন বড় দেখা যায় না। সেকালে খুব দেখা যাইত। এখনকার বাপেরা ইলিস মাছের মতন উজান ঠেলিয়া চলিয়া যান, আর ইলিস মাছের ডিমের মতন ছেলেরা ভাটাইয়া গিয়া যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার ঠিকানা থাকে না। ইলিস মাছের সহিত ইলিস মাছের ছানার কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। এখনকার বাঙ্গালী ছেলেদেরও তেমনি বাপের সঙ্গে বড় দেখা হয় না। সেকালের বাঙ্গালা বাপের কাছেই শিক্ষা-দীক্ষা পাইত। সে বাবার সঙ্গেই দিনরাত ঘুরিত; বাবার প্রতি ছেলের ভক্তি হইত, ছেলের প্রতি বাবার স্নেহ হইত। এখনকার বাবারা ছেলের শিক্ষার ভার দিয়াছেন মাষ্টারের উপর, ছেলেরও ভক্তিটুকু ভাগ হইয়া গিয়াছে, অথবা ভাগ হইয়া লোপ পাইয়া গিয়াছে। বাপে-ছেলেয় আর সে ভাবটা নাই। সেকালে পিতৃভক্তি বলিলে বাবার শ্রাদ্ধের উদ্যোগ বুঝাইত। পিতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া ও জাঁকাইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি হইত না। এখন সে প্রবৃত্তি নাই। তাই তেমন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবার প্রবৃত্তিও নাই। সেকালে কামার কুমোর ময়রা তেলি তাঁতি সকল জাতিই আপনার ঘরে বসিয়া বাবার কাছে জাত-ব্যবসা শিক্ষা করিত, ভট্টাচার্য্যেরা বাড়ীতে বাপের কাছে সব বিদ্যা শিক্ষা করিত। গুরু-শিষ্য বলিয়া পরস্পরের প্রতি একটা টান হইত, সর্ব্বদা নিকটে থাকিবার জন্য একটা টান হইত এবং সে টানে বড় একটা বখরাদার থাকিত না, তাই টানটা বেশ জমাট হইত। পিতৃভক্তিও জমাট হইত। অক্ষয়বাবু বাঙ্গালীর এই পিতৃভক্তির বিশেষত্বটুকু বেশ দেখাইয়া এবং শিখাইয়া গিয়াছেন। অনেকে বাপকে 'পদায়' অর্থাৎ আত্মজীবনী লিখিতে গিয়া বাপের যাহা পদপসার তার চেয়ে অনেক বাড়াইয়া দেন; অক্ষয়বাবু সে রকম ছিলেন না। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী, সোজা কথায় সোজা ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

অক্ষয়বাবু আসল বাঙ্গালীর মতন সৌখীন ছিলেন না। মোটা ভাত মোটা কাপড়েই তাঁহার চলিত। অতিথি-অভ্যাগত আসিলে ভাল খাইবার অয়োজন হইত, পাল-পার্ব্বণে খাওয়া-দাওয়ার ভাল উদ্যোগ হইত, নহিলে সবই সাদাসিদে। এটুকুও বাঙ্গালীর সাধারণ গুণ, সকলেরই এ গুণ আছে, তবে শিক্ষার দোষে এখন কতক কতক বিগড়াইয়াছে। বাঙ্গালী নিরীহ শান্তিপ্রিয় জাতি। নিরীহ শান্তিপ্রিয় হইলেই প্রায় একঘেয়ে হইয়া যায়। সেই একঘেয়ের হাত হইতে বাঁচিবার জন্যই বার মাসে তের-পার্ব্বণের সৃষ্টি। এই বার মাসে তের-পার্ব্বণের উদ্যোগে খানিকটা মুখ বদলাইয়া যায়, খানিকটা নূতন জীবনের সঞ্চার হয়। খানিকটা আমোদ-আহ্লাদ হয়, একঘেয়ের হাত হইতে দুচার দিন পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অক্ষয়বাবু বারমাসে তের-পার্ব্বণ ঠিক্ ঠিক্ করিতেন। ক্রমে বছর বছর বারমাসে তের-পার্ব্বণ করিতে করিতে তের-পার্ব্বণ একঘেয়ে হইয়া যায়, তখন তার হাত থেকে উদ্ধারের উপায় কি? মাঝে মাঝে তীর্থ করিতে যাওয়া। ঘরে বসিয়া বসিয়া একই রকম কাজ করিতে করিতে যখন বিরক্তি ধরিয়া গেল, তখন একটা না একটা তীর্থে যাওয়া, ইহাতে বাঙ্গালার বড়ই উৎসাহ। যখন রেল ছিল না, ষ্টীমার ছিল না, তখন বাঙ্গালী অনেক দিন ধরিয়া তীর্থ-যাত্রার উদ্যোগে কাটাইয়া দিত, এবং তীর্থ করিয়া আসিয়া সেই গল্পে অনেক দিনের একঘেয়ে ভাবটা কাটিয়া যাইত। অক্ষয়বাবু তাঁহার দীর্ঘজীবনে এক এক করিয়া সকল তীর্থেই বেড়াইয়াছেন। সারা ভারতটা ঘুরিয়া লইয়াছেন। এটাও একটা বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব; এটাও অক্ষয়বাবুতে ছিল।

অক্ষয়বাবুর একটা বড় সৌভাগ্য ছিল, তাঁহাকে উদরান্নের জন্য কখনও খাটিতে হয় নাই। তাঁহার অনেক বয়স পর্য্যন্ত বাবা বাঁচিয়াছিলেন, আর মরিয়াও যাহা রাখিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষয় বাবুর ও তাঁহার পরিবারবর্গের মোটা ভাত-কাপড়ের বেশ সংস্থান ছিল। তিনি সাহিত্য

চর্চ্চাতেই দিন কাটাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, সেরূপ দিন কাটাইবার পক্ষে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষার আবশ্যক, তাঁহার বাবা তাঁহাকে সে সবই দিয়াছিলেন। একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সদ্বংশজাত কায়স্থ-সন্তানের যাহা যাহা জানা আবশ্যক, অক্ষয়বাবু পাঠশালা, ইস্কুল কলেজ প্রভৃতি হইতে এবং নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া, নানা লোকের নিকট, যে যে-বিষয়ে ওস্তাদ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সব শিক্ষা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে সেইগুলি ছড়াইবেন এই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই তিনি প্রথম বয়সেই বঙ্কিমবাবুর সহিত জুটিয়া বঙ্গদর্শনে লিখিতে আরম্ভ করেন, তারপর "সাধারণী" প্রকাশ করেন, তারপর "নবজীবন।" নবজীবন মানে হিন্দুর নবজীবন অর্থাৎ Hindu Revival. শিক্ষিত বাঙ্গালীরা (তখন বাঙ্গালী ছাড়া অন্য দেশের শিক্ষিত যাঁরা, তাঁদের সংখ্যা এত কম ছিল যে গণনাতেই আসিত না) একটু একটু বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজী পড়িয়া সাহেবীআনা করিলে সাহেব ত হওয়া যাইবেই না; বরং দেশের লোকের সঙ্গে তফাৎ হইয়া দেশের উন্নতির বিঘ্নের কারণ হইবে। বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় Civil Service হইতে বরখাস্ত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গোরার হাতে লাঞ্ছিত হইয়াও ক্ষমা প্রার্থনা বই অন্য প্রতিকার পাইলেন না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটিল যে, সাদা সাদাই থাকিবে, কালো কালোই থাকিবে, সাদায় কালোয় মেশামেশি ঘেঁসাঘেসি হইবে না। তাই যখন শশধর তর্কচূড়ামণি মুঙ্গের হইতে আসিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন এবং "বঙ্গবাসী" তাঁহাকে কোল দিলেন, তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী বলিয়া উঠিল, এইবার হিন্দুধর্ম্মের একজন Apostle আসিয়াছেন। সে দলের মধ্যে অক্ষয়বাবু ত ছিলেনই, কারণ বঙ্গবাসী তাঁহার শিষ্য, সেবক, কর্ম্মচারী, আজ্ঞাবহ মাত্র। বঙ্কিমবাবু, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বড় বড় লোক আগ্রহ-সহকারে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গেলেন, তর্ক-চূড়ামণি সেই সপ্তাহেই বঙ্গবাসীতে লিখিলেন—"ইঁহারা আমার শিষ্য হইয়াছেন।" বঙ্কিমবাবু চটিয়াই লাল; কিন্তু তখন "বঙ্গদর্শন" উঠিয়া গিয়াছে; সেইজন্য "নবজীবনে" চূড়ামণির জবাব দিলেন। চূড়ামণি আবার বঙ্গবাসীতে তাহার জবাব দিলেন। দিন-কতক বেশ জমাট হইতে লাগিল। চূড়ামণি বলিলেন, যদি হিন্দু হইতে চাও, খাদ্যা-খাদ্য বিচার কর, ত্রিসন্ধ্যা কর, নিত্যস্নানী নিরামিষাশী হও, তবে ত হিন্দু হবে; বঙ্কিম বাবু বলিলেন, তাহা নহে, আমরা অখাদ্যও খাইব, হিন্দুও হইব। তখন Hindu Revival দুই দল হইল। একদল Conservative, আর একদল Liberal; কিন্তু হিন্দুর নবজীবন করিতে হইবে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। সুতরাং অক্ষয়বাবুর "নবজীবন" বেশ জোরে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তফাতে দাঁড়াইয়া বেশ মজা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতেন, আমাদের ধর্ম্ম ত আর মরে নাই যে তাহার নবজীবন বা পুনর্জীবন হইবে; যাহাদের ধর্ম্ম মরিয়াছিল, তাহাদের নবজীবন হউক। আমাদেরই সুবিধা, আমাদেরই দল পুষ্ট হইবে।

'নবজীবন'ও 'সাধারণী'র দিনকতকত বেশ পসার হইল। 'সাধারণীর চানাচুর' তখন আচমনীয় হইলেও আমরা বেশ পেট ভরিয়া খাইয়াছি। সে সময়ে চানাচুর পড়িয়া লোকে যেমন আমোদ ও আনন্দ পাইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। ঘরে ঘরেই চানাচুরের কথা। অক্ষয়বাবুর দেখাদেখি অক্ষয়বাবুর বাবাও চানাচুর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সাধারণীতে কত রহস্য, কত ব্যঙ্গ, কত ঠাট্টা, কত তামাসা চলিত, তাহার আর পার নাই। গুপ্তকবি ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে এইরূপেই বাঙ্গালা মাতাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে রুচি বদলাইয়া গিয়াছে, অক্ষয়বাবুর রঙ্গ-তামাসায় রুচির দোষ একেবারেই ছিল না। তাঁহার "শুধুই রহস্য," "নূতন মতে নূতন পঞ্জিকা" "চণকচূর্ণ বা চানাচুর", "শুকসারী-সংবাদ", "নববোধোদয়", "নবজীবনের আটকৌড়ে", "ভাই হাত তালি" প্রভৃতি লেখাগুলির রুচি অতি বিশুদ্ধ, ব্যঙ্গ অতি তীব্র এবং উপদেশ অতি গভীর। উহাতে আমাদিগকে কমলাকান্তের দপ্তরের মত ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক মহালোক, জ্ঞানলোক ও সত্যলোকেরও উপরে টানিয়া লইয়া যাইতে পারেনা সত্য, কিন্তু উহাতে বেশ বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করা যায়। এইরূপ ব্যঙ্গ লেখাই অক্ষয়বাবুর বিশেষ গুণ।

অক্ষয়বাবু পিতার কাছে অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিরূপে খবরের কাগজ চালাইয়া লাভ করিতে হয়, সে শিক্ষা তিনি পান নাই। তাঁহার গ্রাহকরা কাগজের দাম দিত না, তিনি আদায় করিতে পারিতেন না। কি কৌশলে চাঁদা আদায় করিতে হয়, জানিতেন না। মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ করিয়া, রহস্য করিয়া গ্রাহকদিগকে লজ্জা দিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন, আর বিজ্ঞাপন দিতেন। গ্রাহকরা পাইয়া বসিত। তাহারা মনে করিত যে, টাকা না দিলে যদি এরূপ রঙ্গ-রহস্য বাহির হয়—সে ত ভালই।

তারপর ভাঙ্গা দল হইতে লাগিল। "সাধারণী" ভাঙ্গিয়া "বঙ্গবাসী" হইল, "নবজীবন" ভাঙ্গিয়া "ভ্রমর" হইল, "প্রচার" হইল, আরও কত কি হইল। অক্ষয়চন্দ্র ক্রমে সম্পাদকতা ছাড়িয়া আচার্য্যগিরি আরম্ভ করিলেন ও করিতে লাগিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি।

এদিকে তাঁহার বাড়ীর অবস্থাও ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন, স্ত্রীও পরলোকে গেলেন, কতকগুলি অপোগণ্ড শিশু লইয়া অক্ষয়বাবু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। শিশু ত শিশু, একেবারেই শিশু, একটীও দশবৎসরের বেশী নহে, নম্বরেও অনেকগুলি, মাতৃহীন ছোট ছোট ছেলে লালন-পালন যে কি কষ্ট, তা যে করিয়াছে সেই জানে; যে ভুক্তভোগী নহে, তাহাকে সে কথা বুঝান যায় না। অক্ষয়বাবু একেবারে কদমতলাবাসী হইলেন, বাড়ী ছাড়িয়া একপাও নড়িবার যো রহিল না। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার স্ফূর্ত্তি কমিল না। তিনি বলিতেন, মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশু পালন করা আর বালগোপালের সেবা করা একই কাজ। তিনি ত বালগোপালের সেবা লইয়া আখ্ড়াধারী বাবাজীর মত কদম-তলার আখড়ায় বিরাজ করুন, তাঁহার "সাধারণী," তাঁহার "নবজীবন" তাঁহার সাহিত্য-সেবা সব গুটাইয়া আসিল। কিরূপে গুটাইল, কেমন করিয়া গুটাইল, তাহার বিশেষ বিবরণ তাঁহার জীবনচরিত-লেখকেরা দিবেন। আমার এক্ষেত্রে সে কথা কহিতে গেলে একটু বাড়াবাড়ি হইবে।

ছেলেদের লেখাপড়া শিখানো, তাহাদের শরীর যাতে ভাল থাকে তাহা দেখা, তাহাদের স্বভাবচরিত্র যাতে ভাল হয়, তাদের মনে যাতে কোন ক্ষোভ না হয়, মেয়েরা যাহাতে লেখাপড়া শিখে, সংসারধর্ম্ম করিতে শিখে তাহার চেষ্টা করা, তাহাদের বিবাহ দেওয়া—এই সকল গুরুতর কার্য্যে অক্ষয়বাবুর অনেক সময় এমন কি অধিকাংশ সময় কাটিলেও অক্ষয়বাবু বাঙ্গালা সাহিত্য ছাড়েন নাই; কিন্তু এখন হইতে তিনি নিজে আর বড় লিখিতেন না, করিতেন গুরুগিরি বা আচার্য্যগিরি। বঙ্গবাসীর আচার্য্যগিরি তাঁহাকে খুবই করিতে হইত, কারণ যোগীন্দ্র বোস্ তাঁহার হাতে গড়া শিষ্য। তিনি অনেকদিন "সাধারণীর" সহিত কাজকর্ম্ম করিয়াছিলেন। সকল কাজেই তাঁহাকে অক্ষয় বাবুর পরামর্শ লইতে হইত, অক্ষয়বাবুও অকাতরে তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন ও লেখাপড়ার বিষয় সাহায্য করিতেন। অনেক সময় তাঁহার কাগজে লিখিতেনও। শক্ত সমস্যা হইলে যোগীনবাবু গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। চুঁচুড়ায় সমিতি ছিল; অক্ষয়বাবু তার সভাপতি ছিলেন। ছেলেরা প্রবন্ধ লিখিলে দেখিয়া দিতেন ও তাহাদের ভাষা দুরস্ত করিয়া দিতেন এবং নানা উপায়ে তাহাদের উৎসাহ দিতেন। চুঁচুড়ার শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল, উহারা তাঁহার ঋণ ভোলে নাই, ভুলিবেনা, ভুলিতে পারিবেনা। বৃদ্ধ দীননাথ ধর সর্ব্বদাই অক্ষয়বাবুর কাছে যাইতেন এবং নানারূপ রহস্য করিয়া অক্ষয়বাবুকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। বাঙ্গালা লেখা, বাঙ্গালা গান বাঁধা দীননাথ ধরের একটা বুড়া বয়সের রোগ। তিনি বলেন, "আমি যাহা কিছু লিখিতাম, অক্ষয় একবার না দেখিয়া দিলে আমার তৃপ্তি হইত না।" অক্ষয়বাবুর আর এক চেলা আমাদের স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। নবজীবনেই তাঁহার হাতে-খড়ি হয়। তিনি কেমন করিয়া অক্ষয়বাবুর সহিত পরিচিত হন, কেমন করিয়া তাঁহার লেখা সর্ব্বপ্রথম নবজীবনে প্রকাশ হয়, কেমন করিয়া অক্ষয়বাবু রামেন্দ্রবাবুকে আস্তে আস্তে আপনার করিয়া লন—সে কথা রামেন্দ্রবাবু নিজেই অনেক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। রামেন্দ্রবাবু বলিতেন, দেশটা আপনার; দেশকে মা বলিয়া পূজা করিতে হইবে—বঙ্কিমবাবু এ কথার উদ্বোধন করিয়া যান, কিন্তু এ কথার

প্রচার ও বিস্তার অক্ষয়বাবুর নবজীবনে হয়। আর বর্ত্তমান সময়ের যে দেশ-প্রীতি, সেও নবজীবনের লেখার ফল। রামেন্দ্রবাবুর মতন চেলা পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। অক্ষয়বাবু তাহা পাইয়াছিলেন, সেজন্য তিনি ধন্য হইয়াছেন।

কিন্তু অক্ষয়বাবুর আচার্য্যগিরি দশটা বিশটা বা পঁচিশটা চেলা তৈরী করায় নয় সেটা হইতেছে তাঁহার বাড়ীর মজলিসে। তাঁহার বাবা মজলিস ভাল বাসিতেন। সেকালে গ্রামে গ্রামে বৈঠকখানায় বৈঠকখানায় মজলিস বসিত। পাড়ার লোকে, গ্রামের লোকে একত্র হইয়া গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, ঠাট্টা-তামাসা, সেই সঙ্গে সঙ্গে দলাদলির ঘোঁট পরনিন্দা পরকুৎসা সবই চলিত। মজলিসের মুরুব্বি ভাল লোক হইলে ভাল কথাই চলিত, মন্দ লোক হইলে মন্দ কথাই চলিত। ভাল হউক, মন্দ হউক, কতকগুলি লোকে ত মেশামেশি করিত, তার একটা ভাল ফল হইতই হইত। শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর বলেন, "এখনকার লোকে ল্যাঙ্কের কেল্লা পাকাইয়া তার উপর বসিয়া গোঁজমোহন হইয়া বাড়ীতে থাকেন।" অর্থাৎ একেবারেই মেশামেশি নাই। অক্ষয়বাবুর বাবা ভাল লোক ছিলেন। তাঁর মজলিসে মকর্দ্দমা মেটামিটির কথা হইত, গল্প-গুজব হইত। সাধারণের অনেক কাজের কথা হইত, গান-বাজনা হইত, স্কুল-কলেজের কথা হইত। অক্ষয়বাবুর নিজের কদমতলার মজলিসে কেবল সাহিত্য হইত। দেশের লোক ত যাইতই, কলিকাতা হইতেও অনেকে তাঁহার ওখানে যাইত। অনেকে সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ লইতে যাইত, অনেকে তাঁহার কাছে শিখিতে যাইত, অনেকে তাঁহার কি মত, তাহা জানিবার জন্য যাইত। গান-বাজনাও তাঁহার বাড়ীতে অনেক সময় হইত, সে সব গান-বাজনা সাহিত্য। তাহাতে কুৎসিত কুৎসার বড় নাম-গন্ধ থাকিত না। দূর হইতে যাঁহারা আসিতেন, অক্ষয় বাবু তাঁহাদের খুব যত্ন করিতেন। আমের সময় আম, কাঁঠালের সময় কাঁঠাল, আনারসের সময় আনারস, যখনকার যা খাওয়াইতেন। কেহ দু'একদিন থাকিতে চাহিলে বিশেষ আনন্দিত হইতেন। এইরূপেই তাঁহার আচার্য্যগিরিটা বেশী হইয়াছিল। রবিবারে প্রায়ই কলিকাতা হইতে দু'চারজন লোক যাইতেন। পালপার্ব্বণে ছুটীর সময় আরও বেশী, বড় বড় ছুটীতে আরও বেশী। সুরেশ সমাজপতি প্রায়ই যাইতেন, পাঁচকড়ি বাবু প্রায়ই যাইতেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী অনেক সময় যাইতেন। রামেন্দ্রবাবুও যাইতেন। সাহিত্য-পরিষদের দলের অনেকেই তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার আচার্য্যগিরি গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে আবার তাঁহার বই পড়িয়া, "সাধারণী" "নবজীবন" পড়িয়া তাঁহার চেলা হইয়াছেন, আর অনেকে দেখা পান নাই। কারণ, স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি কলিকাতার সমাজে বড় একটা মিশিতে পারিতেন না। শেষ বয়সে যখন কলিকাতায় আসিলেন, তখন তিনি স্থবির। তিনি বড় কোথাও যাইতে পারিতেন না, তাঁহার কাছেই লোককে আসিতে হইত।

তিনি কি দিয়া গুরুগিরি করিতেন কোন্ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালা, তাহার প্রথম শিক্ষা ও প্রধান শিক্ষা সোজা সরল বাঙ্গালা। সংস্কৃত বেশী থাকিবেনা, ফার্সীও বেশী থাকিবেনা, অথচ চলিত কোন কথা ছাড়া হইবে না, এইটীই তাঁহার মূলমন্ত্র, এইটীই তিনি সকলকে শিখাইয়াছেন। এমন কি বঙ্কিমবাবু পর্য্যন্ত বোধ হয় তাঁহার পাল্লায় পড়িয়া কড়া সংস্কৃত পরিহার করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ভাষা, লেখা ও ভঙ্গীর খুব সুখ্যাতি করিতেন। চার বৎসর বঙ্গ-দর্শন চালাইয়া যখন তিনি বিদায় গ্রহণ করেন, তখন সাধারণী খুব চলিতেছিল। বঙ্কিমবাবু "তীক্ষ্ণদৃষ্টি-শালিনী তেজস্বিনী" বলিয়া সাধারণীর খুব সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবুর শেষ বয়সের লেখায় বাঙ্গালাটা অনেক সোজা হইয়াছিল, এমন কি তিনি শেষ বয়সে আগেকার লেখা বই গুলা নূতন ভাষায় লিখিয়া যান। এ সবই অক্ষয় বাবুর জন্য।

অক্ষয়বাবু আর শিক্ষা দিতেন বাঙ্গালী হইতে। সেই সেকালের সরল সোজা বিশ্বাসী বাঙ্গালী হইতে, পুরাণ বাঙ্গালা পড়িতে, কীর্ত্তনের গান শুনিতে এবং পুরাণ বাঙ্গালা বুঝিতে,—মোটামুটি বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে উপদেশ

দিতেন। দেশের উপর যাহাতে দেশের লোকের টান হয় সেজন্য চেষ্টা করিতেন। ইহার উপর বেশী বলিতে গেলেই রাজনীতি আসিয়া পড়ে, কারণ দেশের লোকের যদি দেশের প্রতি টান হয়, তাহা হইলে ইংরাজের দিকে টান কমিয়া যায় সুতরাং রাজনীতিতে আসিয়া পড়ে। অক্ষয়বাবু "পিতাপুত্র" নামে তাঁহার পিতার ও নিজের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তাহাতে সর্ব্বত্রই রাজনীতি পরিহার করিয়াছেন, অনেক জায়গায় বলিয়াছেন, "এই পর্য্যন্ত লিখিলাম আর একটু বলিলেই রাজনীতি হইবে সুতরাং তাহা আর লিখিলাম না।"

চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি হইয়া তিনি বাঙ্গালার ম্যালেরিয়ার জন্য বড় কাঁদিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়াছেন। সাহিত্য সম্মিলনে ম্যালেরিয়ার কথা কেন? অক্ষয়বাবুর কাছে বাঙ্গালী লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য, আর বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া বাঙ্গালী; দুইয়ে একটা অচ্ছেদ্য অভেদ্য সম্বন্ধ। বাঙ্গালার সাহিত্য বলিতে গেলেই বাঙ্গালী আসে, আর বাঙ্গালীর কথা বলিতে গেলেই ম্যালেরিয়ার কথা আসে। বাস্তবিকই ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার গণ্ডগ্রামগুলিকে উৎসন্ন দিয়া শুধু বাঙ্গালীর নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যেরও অর্দ্ধেকটা প্রাণবধ করিয়াছে। অক্ষয়বাবুর বাবা উলোর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে গ্রাম যেন হাসিতেছে। লোকের কত স্ফূর্ত্তি, কত আনন্দ, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে সে উলো কোথায় চলিয়া গেল। সে স্ফূর্ত্তি নেই, আমোদ নাই, গ্রাম যেন বন হইয়া গিয়াছে। অক্ষয়বাবু হালিসহরের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে চক্ষে জল আসে।

অক্ষয়বাবুর সমালোচনা খুব তীব্র ছিল, সে সমালোচনার ঘায়ে অনেককেই ছটফট করিতে হইত। আমি একবার তাঁহার হাতে পড়িয়াছিলাম। আমি বঙ্গদর্শনে "কাঞ্চন-মালা" নামে একটী গল্প লিখি। ভাষা যতদূর সোজা করিবার, তাহা করি; কিন্তু এক জায়গায় একটা গভীর রাত্রির বর্ণনা করিতে গিয়া কথকদের একটা চূর্ণী চুরী করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। সেটা এই, "ঘোরা দ্বিপ্রহরা যামিনী কুমুদ-বনাহ্লাদিনী শান্তনলিনী ঝিল্লীরব মুখরিতা পেচককুল কলরব উদ্ঘোষিণী, তখন শাট্যঞ্চলে বদনাবগুণ্ঠন করত অভিসারিকাকুল আপনাপন প্রেমপাত্রের নিকট গমন করিতেছেন।" অক্ষয়বাবু প্রবন্ধটীর সমালোচনা করিলেন—ভাষাটী বেশ সুন্দর, পরিষ্কার কিন্তু মাঝখানে এ কি কড়্কড়্-কড়্কড়্. কড়াৎ! আমি পড়িয়া হাসিলাম, মনে হইল, অক্ষয়বাবু বোধ হয় কথকতা ভাল করিয়া শুনেন নাই। নইলে কথকের চূর্ণী তিনি ধরিতে পারিলেন না কেন? কথকের চূর্ণীগুলিকে আমি বাঙ্গালা ভাষার অতুলনীয় সম্পত্তি বলিয়া মনে করি। তাল ও লয়ের সহিত উচ্চারণ করিলে হাজার হাজার লোক মুগ্ধ হইয়া যায়, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহার পর অক্ষয়বাবুর "পিতাপুত্র" পড়িয়া দেখিলাম, তিনি বাঙ্গালার সব রকম সাহিত্যের কথা বলিয়াছেন, কীর্ত্তন গান, খেম্‌টা, ঢপ, যাত্রা, কবি, পাঁচালি, সকলের কথা, কিন্তু কথকতার কথা নাই।

অক্ষয়বাবু নিজে একবার বিষম সমালোচনার দায়ে ঠেকিয়াছিলেন। কয়েক জন বন্ধু বিশেষ শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয়ের অনুরোধে অক্ষয়বাবু একখানি বাঙ্গালা School Book লিখিয়াছিলেন। বইখানি টেক্‌স্ট্‌ বুক কমিটি তিনবার না পছন্দ করিল। তখন অক্ষয়বাবু কমিটীর চাঁইয়ের কাছে দূত পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, কেন তাঁহার বই না-পছন্দ হইল। চাঁই বলিলেন, "দেখুন দেখি মহাশয়, অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন কিনা 'গুরু-মহাশয় আমাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন।' এই সব ভাষা শেখাবার জন্যই কি আমরা স্কুলে ছেলে পাঠাই?" অক্ষয়বাবুর দূত অক্ষয়বাবুকে এই সকল কথা বলিলেন। অক্ষয়বাবু তাঁহাকে আবার চাঁইয়ের কাছে পাঠাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি লিখিতে হইবে?" চাঁই বলিলেন, "কাষ্ঠাসনের উপর দণ্ডায়মান করাইয়া দিয়াছিলেন।" অক্ষয়বাবু বলিলেন—"তবে আর আমি স্কুল-বই লিখিব না।"

অক্ষয়বাবু আমার আর একখানি বইয়ের বেশ সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেখানিই আমার প্রথম বই, ১৮৭৪ সালে লেখা। ছাপা অনেক পরে হইয়াছিল,

সমালোচনা আরও অনেক পরে। অক্ষয়বাবু বলিয়াছিলেন "এই গ্রন্থকার ও পাঠকের মধ্যে ভাষা বলিয়া একটা ব্যবধান নাই।" আমি সোজা বাঙ্গালা লিখি বলিয়া তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারই প্রস্তাবে একবার এই সাহিত্য-পরিষদে সভাপতি হইয়াছিলাম। আমার মেজদা ৺রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য ও অক্ষয়বাবু একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়েই হুগলী কলেজে পড়িতেন এবং একই ক্লাশে পড়িতেন। মেজদার মুখে সর্ব্বদাই শুনিতাম, অক্ষয় বড় ভাল ছেলে—অক্ষয় য়ুনিভার্সিটীর ফার্ষ্ট হইয়াছিল। আমি বরাবরই তাঁহাকে বড় ভাইয়ের মতন ভক্তি করিতাম। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতাম। তাঁহাকে দেখিলে আমার খুব স্ফূর্ত্তি হইত। আজ তাঁহার এই তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠায় পৌরোহিত্য করিয়া আমি ধন্য হইলাম এবং আমায় এই কার্য্যে বরণ করিয়া আপনারা আমার যে উপকার ও সম্মান করিলেন, তাহা আমি কখনও ভুলিব না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

স্বরলিপি

তার বিদায়-বেলার মালাখানি
আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে
পলে পলে রে।
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে
জাগে ফাগুন সমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে।

দিনের শেষে যেতে যেতে
পথের পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল
বনান্তরে,
সেই ছায়া এই আমার মনে,
সেই ছায়া ঐ কাঁপে বনে
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্ঞা -া II {জ্ঞা জ্ঞপা -া। পদা দপা -া I মা মজ্ঞা -া। রা সা -া I সরা রা -সা।
তা র্ বি দা য়্ বে লা র্ মা লা ০ খা নি ০ আ মা র

সণ্া সা (-ণ্সা I সা -পা -া। -গমা জ্ঞা -া)} I -রা I {সরা -জ্ঞা -জ্ঞরা। সা -া -রা I
গ লে ০ ০ রে • • • তা র্ ০ দো ০ ০ লে • ০

সরা -জ্ঞা -জ্ঞরা। সা -া -া I সপা পা -া। পণা ণা -া I ণধা পা -ধা। ধপা মা -া} I
দো ০ • লে ০ ০ বু কে র্ কা ছে ০ প লে • প লে •

মগা -পা পজ্ঞা। -া জ্ঞা -া II
রে • ০ • "তা র্"

II মা -পা পা । পমা জ্ঞা -মা I পা না -া । না র্সা -া I র্সঋা -া -র্না । র্সা -া -া I
গ ন্ ধ তা হা র .ক্ষ ণে • ক্ষ ণে • জা • • গে • •

র্না র্সা র্জ্ঞা । র্জ্ঞরা র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞরা র্মজ্ঞা -া । ঋা র্সা -া I না -ঋা র্ঋসা । পা ণা -া I
ফা গু ন্ স মী • • র• ণে • জা গে • গু ন্ জ রি ত •

ণধা র্সা র্সণা । ধা পা -ধা I পক্ষা -পা -া । -জ্ঞা জ্ঞা -া II
কু ন্ জ ত লে • রে • • • "তা র্"

II {ণ্ সা -রা । সরা -জ্ঞা -জ্ঞরা I সা -া -া । -া -া -া I র্সর্রা র্রসা -া । ণা ণা -া I
দি নে র শে • • যে • • • • • যে তে • যে তে •

দা দা -া । দপা পা -া I সপা পা -া । পা পা -দা I দমা -া -া । পা -া -দা I দমা -পা
প থে র্ প রে • ছা য়া • খা নি • মি • • লি • • য়ে •

-জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা -রা I জ্ঞা জ্ঞপা পমা । জ্ঞরা সা -া} I সপা -া পা । পমা -জ্ঞা -মা I প
• দি ল • ব না • • সু রে • সে ই ছা য়া এ ই আ

না -া । না র্সা -া I র্সঋা র্ঋসা না । র্সা র্সা র্জ্ঞা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -ঋা । ঋা র্ঋসা -া I
না র্ ম নে • সে ই ছা য়া ও ই কাঁ পে • ব নে •

র্সঋা র্ঋসা -া । ণা ণা -া I ণর্সা র্সণা -া । দা পা -দা I দক্ষা -পা -া -জ্ঞা
কাঁ পে • সু নী ল দি গ ন্ চ লে • রে • •

জ্ঞা -া II II
"তা র্"

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিলন ও বিরহ

মিলন, - শিয়রে বসি মৃদু সুরে কয়,
'আছি নিতি পাশে পাশে নাহি কোন ভয়
সারাদিন, সারামাস, সারাটী বরষ,—
দিয়ে যাব আঁখিপাতে ঘুমের পরশ'।

বিরহ,—পায়ের তলে নোয়াইয়া মাথা,
নীরব, নিঝুম বসি,—নাহি কোন কথা!
চোখে তার মূক ভাষা, ডেকে যেন বলে,
'তোমারে জাগাতে আছি, যাও পাছে ভুলে'।

৺জীবনকৃষ্ণ বরাট।

সাহিত্যে রাজা-রাণী

রাজা নাই, রাণী নাই, তাস খেলি কেমন করিয়া ?
রাজা নাই, রাণী নাই, গল্প লিখি কাহাকে লইয়া ?

এই যে চার বৎসর-ব্যাপী যুদ্ধ হইয়া গেল, জগতের প্রায় সকল জাতির সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, ইহার চরম ফল এই হইবে যে পৃথিবীতে কোন দেশে আর রাজা রাণী দেখিতে পাওয়া যাইবে না! ইয়োরোপে রাজার মত রাজা কয়জন অবশিষ্ট আছে? পোষাকি কিম্বা কাচের আলমারিতে তোলা রাজা থাকিতে পারে, কিন্তু তেমন রাজায় কাহারও মন উঠে না। ইয়োরোপ হইতে যদি রুস, জর্ম্মান ও অষ্ট্রীয়ান সম্রাট অন্তর্হিত হইলেন, তাহা হইলে আর বাকি রহিল কে? বেলজিয়াম কিম্বা ইটালী গণনার মধ্যেই আসে না। ইংলণ্ডের রাজ্য প্রকাণ্ড, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজা নিজের ইচ্ছামত কিছু করিতে পারেন না। লোকে রাজা বলিতে যাহা বুঝে, ইংলণ্ডের রাজা তেমন রাজা নহেন, জাপানের সম্রাটও তেমন রাজা নহেন।

যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই রাজারা লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। চীন যে অত বড় ও অত প্রাচীন সাম্রাজ্য, সেখানকার সম্রাট ও সম্রাট-বংশ যুদ্ধের আগেই গিয়াছেন। স্পেনেও যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্ব হইতেই রাজা নাই। আমেরিকা খণ্ডে—কি উত্তর, কি দক্ষিণ আমেরিকায়—রাজা-রাণীর পাটই নাই। জগতে যে নূতন যুগ দেখা দিয়াছে তাহাতে রাজা রাণীর স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, রাজবংশ এবং বংশাবলীক্রমে রাজ্য-শাসন-প্রথা উঠিয়া যাইবে, সকল দেশ ও সকল জাতি কালে স্বাধীনতন্ত্র হইবে।

এই চিরন্তন রাজ্যপ্রথার বিপর্য্যয়ে ভবিষ্যতে লোক-সমাজে কি দাঁড়াইবে বলা যায় না, কিন্তু রাজা রাণীর তিরোভাব হইলে সাহিত্য-জগতে একটা বিশেষ অভাব হইবে। উপন্যাস, নাটক, মহাকাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি অঙ্গহীন হইবে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, রাজবংশীয় ঘটনাদি মহাকাব্যের ভিত্তিস্বরূপ। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডিসীর নায়ক নায়িকা রাজা-রাণী। মিল্টনের মহাকাব্যে স্বয়ং ঈশ্বর ও সয়তান শ্রেষ্ঠ নায়কদ্বয়। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করাও কঠিন নহে। রাজা ও রাণী রাজ্যের, সমাজের কেন্দ্রস্থানীয়, প্রজাপুঞ্জের দৃষ্টি তাঁহাদের দিকে, দেশের লোক সর্ব্বদা তাঁহাদেরই আলোচনা করে। সূর্য্য যেমন সৌরজগতের কেন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ তাহাকে বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ করে, রাজাও সেইরূপ জনসমাজের কেন্দ্র, তাঁহারই চারিদিকে সমাজের তর্ক-বিতর্ক, আন্দোলন-আলোচনা ঘুরিয়া বেড়ায়। রাজা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, সমাজের শাস্তা ও নিয়ন্তা, এইজন্য সমাজ সকল বিষয়ে তাঁহার মুখ-প্রেক্ষা করে।

রাজা রাণী বর্জ্জন করিলে মহাকাব্যে কি থাকে? রামচন্দ্র ও সীতা দেবীকে লইয়াই রামায়ণ; কুরু-পাণ্ডবই মহাভারতের প্রধান উপাদান। নাটকেও তদ্রূপ। কালিদাস, ভর্তৃহরি, শেক্স্পীয়রের অপূর্ব্ব নাটকাবলীতে রাজা রাণী সর্ব্বত্র। গল্পের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের তুল্য গল্প জগতে নাই, তাহাতেও রাজা রাণী চরিত্র প্রধান। ইতিহাসও কেবল রাজারাণী লইয়া। তাঁহাদের জন্মমৃত্যু, যুদ্ধসন্ধি রাজ্য-শাসন, কার্য্যপরম্পরা, ইহাই ইতিহাসের মূল উপকরণ। পৃথিবী হইতে রাজারাণী লুপ্ত হইলে উপন্যাস-ইতিহাসে অভাবনীয় বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

নিতান্ত শৈশবকাল হইতে রাজা-রাণীর কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। "এক ছিল রাজা, তার দুয়া সুয়া দুই রাণী।" চারি বন্ধুর গল্প যদি হইল, তাহা হইলে রাজপুত্র প্রথম, তাহার পর যথাক্রমে মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সদাগরপুত্র। চিরকাল এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি ও ইয়োরোপীয় অপর ভাষার নভেলে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উপন্যাস-লেখকেরা রাজারাণী একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন না। এক নাপোলিয়োঁকে অবলম্বন করিয়া নানা ভাষায় উপন্যাস রচিত হইয়াছে। নাপোলিয়োঁ ঠিক উপকথ

অথবা মহাকাব্যের রাজা ছিলেন না, কেন না তাঁহার রাজবংশে জন্ম নহে এবং তিনি রাজবংশ স্থাপন করিতেও পারেন নাই, কিন্তু ফরাসী জাতির সম্রাট না হইলে ইতিহাসে উপন্যাসে তাঁহার নামের এত ছড়াছড়ি হইত না। জর্ম্মানির সম্রাট, রুশিয়ার সম্রাট উপন্যাসের আধার, কেন না রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও নানাবিধ রহস্য তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। কাইসরের গোঁফের আড়ম্বর দেখিয়া কত উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে! ইয়োরোপের রাজন্যবর্গ, রাজপরিবার ও অমাত্যবৃন্দ লইয়া শত শত উপন্যাস রচিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের গুপ্ত-মন্ত্রণা, গুপ্ত সন্ধিপত্র, গোপনীয় রাজপত্র, গুপ্ত দূত, অসংখ্য ডিটেক্টিভ গল্পের বীজস্বরূপ। রাজকার্য্য বিষয়-সংক্রান্ত চক্রান্ত ও জটিল ব্যাপার এক শ্রেণীর উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ। যাহাকে চ্যান্সেলরিস অব ইয়োরোপ বলে, সেই সকল মন্ত্রণাগারে অহর্নিশ যুদ্ধ-সন্ধি, পরস্ব-হরণ, প্রতিবাসীকে আক্রমণ, এই সকল কূট ও ক্রূর জল্পনা হইত, তাহারই যৎসামান্য ইঙ্গিত আভাস লইয়া ভূরি ভূরি গল্প উপন্যাসের রচনা। যুদ্ধের অবসানে কল্পনার সেই উৎস তিরোহিত হইল। কয়েক পুরুষ পরে রোমানফ, হোহেনজোলর্ণ ও হ্যাপ্সবর্গ বংশে পরিচয় দিবার কেহ থাকিবে না।

ইয়োরোপের লুপ্ত সম্রাটাদি ও রাজবংশ সমূহ অবলম্বন করিয়া যে ভবিষ্যতে ইতিহাস উপন্যাস বিরচিত হইবে না এমন কথা বলি না। মরা হাতি লাখ টাকা। কাইসর রাজ্যভ্রষ্ট, রুশিয়ার সম্রাট সবংশে নিহত, তথাপি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অনেক বাস্তব অবাস্তব কথা প্রকাশিত হইবে, ইতিহাসে নানাবিধ আলোচনা সমালোচনা হইবে। কিন্তু নির্ঝরের উৎপত্তি-স্থান সলিল-শূন্য হইলে ঝরণা শুষ্ক হইবেই, রাজা রাণা না থাকিলে তাঁহাদের সম্বন্ধে কত দিন কত কথা লেখা যাইতে পারে?

আমেরিকার কোন স্থানে রাজা নাই। আমেরিকার গল্প উপন্যাসও তেমন সরস নয়। উল্লেখযোগ্য দুই চারিজন লেখক মাত্র। ইয়োরোপে রাজা নাই বলিলেই হয়। আফ্রিকায় ত মোটেই নাই। আর এসিয়াখণ্ডে পারস্য, আফগানিস্থান ও জাপান ছাড়া আর কোথাও রাজা নাই। ইহাকের নূতন রাজাকে খেলা-ঘরের রাজা বলিলেই চলে।

পৃথিবীর সকল দেশ প্রজাতন্ত্র হইলে প্রজার মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে সে কথা বিচারের এ স্থান নহে। তবে কোনও দেশে রাজা রাণী না থাকিলে যে কল্পনার একটি চিত্তবিনোদন রাজ্য লুপ্ত হইবে ও সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ একটি কক্ষ শূন্য হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সমাচার-চন্দ্রিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা সাময়িক পত্রিকার জন্মকাল। সেই সময় যে সমস্ত বাংলা সংবাদ-পত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সমাচার-চন্দ্রিকা এক সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে এই পত্রিকার ১২৩৭ সালের (১৮৩০-৩১ খৃঃ অঃ) সম্পূর্ণ ফাইল পাইয়াছিলাম; তাহা হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল।

সমাচার-চন্দ্রিকার প্রথম প্রচারের সময় লইয়া যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে; এবং বোধ হয় ইহার প্রথম সংখ্যা না পাওয়া গেলে তাহার মীমাংসার কোনও উপায় নাই। এ সম্বন্ধে এ কয়টি মত উল্লেখযোগ্য :—

(১) ১৮২০-১ খৃঃ অঃ (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৮, পৃঃ ১১২ পাদটীকা।)

(২) ১৮২১ খৃঃ অঃ (কলিকাতা রিভিউ, ১৮৫০, পৃঃ ১৫৭; Miss Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*. 1900, p. 63. foot-note)

(৩) ১৮২২ খৃঃ অঃ (Long, *Catalogue*; also

Return, 1855; কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, বাঙ্গালা সাহিত্য; জন্মভূমি ১৩০৩-৪; রামগতি ন্যায়রত্ন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩১৭, পৃঃ ৩৭৩; Dinesh Chandra Sen, *Hist. of Beng. Lang. and Literature*, p. 909; নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত, পৃঃ ৭১৯ পাদটীকা।)

(৪) ১৮২৪ খৃঃ অঃ (*Bengal Acadmey of Literature 1864*, vol i, no 6, p. 2)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার প্রথম প্রচারক ও সম্পাদক ছিলেন। কথিত আছে, ভবানীচরণ সংবাদ-কৌমুদী পরিচালনায় রাজা রামমোহন রায়ের সহকারী ছিলেন; পরে সতীদাহ সম্বন্ধে রামমোহনের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি উক্ত পত্রিকা পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিরুদ্ধে এই সমাচার-চন্দ্রিকা প্রচার করেন। ইহা যদি সত্য হয় তবে সমাচার-চন্দ্রিকা সংবাদ-কৌমুদীর পরবর্ত্তী। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি উপরোদ্ধৃত জন্মভূমি পত্রিকার প্রবন্ধে বলেন যে কৌমুদীর চতুর্থ বৎসর প্রচারের সময় ভবানীচরণ কৌমুদীর সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌমুদীর প্রচারাব্দ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। লং সাহেব তাঁহার *Catalogue* ও *Return* 1855, এ ইহার তারিখ দিয়াছেন ১৮১৯; এবং *Calcutta Christian Observer* পত্রে (1840, Feb) ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। এই তারিখ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় (পৃঃ ৩৭৩) এবং দীনেশ বাবু (পৃঃ ৯০০) তাঁহাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা রিভিউএ লং সাহেব তাঁহার বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে আবার এই তারিখ অনেক পিছাইয়া ১৮২৬ খৃঃ অঃ ধরিয়াছেন। পুনশ্চ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত রামমোহন গ্রন্থাবলীতে কৌমুদীর প্রথম প্রচারাব্দ ১৮২২ খৃঃ অঃ লিখিত হইয়াছে (vol i. intro. p. xix); এবং জন্মভূমি, ১৩১০ ফাল্গুন, (সহমরণ প্রবন্ধ) এ ইহার তারিখ ১৮২১ খৃঃ অঃ এইরূপ পাওয়া যায়। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির মতে এ সমস্ত ধারণা ভুল এবং কৌমুদীর প্রকৃত তারিখ ১৮১৮; সুতরাং এই হিসাবে চন্দ্রিকার তারিখ তাঁহার মতে ১৮২২ খৃঃ অঃ। এদিকে মিস্ কলেট্ তাঁহার রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতে (পৃঃ ৬৩) কৌমুদীর যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে তিনি উক্ত পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দেখিয়াছিলেন বা তৎসম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বৃত্তান্ত পাইয়াছিলেন। তিনি ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২১ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং চন্দ্রিকাও প্রায় সেই সময় প্রকাশিত হইয়াছিল এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। কৌমুদী প্রকাশের অব্যবহিত কাল পরেই, কিম্বা ১৮২২ খৃঃ অব্দের প্রথমেই চন্দ্রিকার প্রচারকাল সম্ভব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক পত্র ছিল, পরে ১৮২৯ খৃঃ অঃ (১৭৫১ শক) হইতে ইহা সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হইত। এই সম্বন্ধে সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের আলোচ্য ফাইলের প্রথম সংখ্যায় (সংখ্যা ৪৭৬; শনিবার, ১ বৈশাখ, ১২৩৭ সাল; ইং ১৩ই এপ্রিল, ১৮৩০ সাল; পৃঃ ১১, পংক্তি ১) এইরূপ নির্দ্দেশ আছে;

"এই চন্দ্রিকা পত্র ১৭৪৩ শকে সাপ্তাহিক অর্থাৎ প্রতি সোমবারে প্রকাশ হইত। ১৭৫১ শকের বৈশাখাবধি সপ্তাহে দুইবার অর্থাৎ সোমবার ও বৃহস্পতিবারে প্রকাশমান হইতেছে। এ পর্য্যন্ত চন্দ্রিকাপত্রের কোন হানি অর্থাৎ কোন দিন অপ্রকাশ হয় নাই সর্ব্বদাই উজ্জ্বল আছে ইহাতেই বিজ্ঞ গ্রাহক সকলে নির্ম্মল চন্দ্রিকার রসাস্বাদনে আপ্যায়িত হওয়াতে চন্দ্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে।"

এই বিবরণ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ১৭৪৩ শকে চন্দ্রিকার প্রথম প্রচার এবং আলোচ্য ১৮৩০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল।

সমাচার-চন্দ্রিকার যে ফাইল আমাদের আলোচ্য তাহা বাংলা ১২৩৭ সালের সম্পূর্ণ ফাইল এবং ইহাতে ৪৭৬ হইতে ৫৮০ সংখ্যা আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১ হইতে ৮৪৮ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক। ইহার প্রথম সংখ্যার একটু বিস্তৃত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহার আকার কোয়ার্টো, প্রতিবারের পত্র সংখ্যা ১২, এবং প্রতি পৃষ্ঠায় দুইটী কলম বা পংক্তি থাকিত। প্রতি সংখ্যার শিরোদেশে এই শ্লোকটী থাকিত:—

সদা সমাচারক্ষুধাং ফলার্পিকা
পদার্থ-চেষ্টা-পরমার্থদায়িকা।
বিজ্ঞস্ততে সর্ব্বমনোহমুরঞ্জিকা
শ্রিয়া ভবানীচরণস্য চন্দ্রিকা॥

পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠার অন্তে থাকিত:. কলিকাতার কলুটোলা ২৬নং বাটীতে চন্দ্রিকা-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া সোমবার প্রাতে ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে প্রকাশ হয় মূল্য প্রতি মাস ১ টাকা"। প্রথম সংখ্যার প্রথম ১০ পৃষ্ঠা সমস্ত বিজ্ঞাপন ও ইস্তাহার যথা—

(১) রেভেনিউ বোর্ডের নোটিশ বা বিজ্ঞাপন পত্র (পৃঃ ১-২)

(২) শেষ শেরিফ সেল (পৃঃ ২-৮)

(৩) মোকাম কলিকাতার নাতওয়ান খাতকের পরিত্রাণের আদালত (পৃঃ ৮, পং ১-২)

(৪) ধর্ম্মসভায় ধনদান (পৃঃ ৮, পং ২ এবং পৃঃ ৯, পং ১)। [এইস্থলে বলা আবশ্যক যে চন্দ্রিকা এই ধর্ম্মসভার মুখপত্রস্বরূপ ছিল ; এবং ধর্ম্মসভার কার্য্যাববরণা, বিজ্ঞাপন, অর্থপ্রাপ্তি স্বীকার এবং অর্থানুকূল্যের জন্য প্রার্থনা (বর্ত্তমান বিজ্ঞাপন এই বিষয়ে) প্রভৃতি সমস্ত প্রকাশিত হইত। প্রায় প্রতি সংখ্যায় অর্থদাতৃগণের নামের তালিকা বাহির হইত। বর্ত্তমান বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে ১২৩৬ সালের ৫ই মাঘ ধর্ম্মসভা স্থাপিত হয় এবং ভবানীচরণ ইহার সম্পাদক ছিলেন। সাধারণের অর্থ সাহায্যে এবং রাজা রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র, রামকমল সেন, উমানন্দ ঠাকুর প্রভৃতির পরিপোষকতায় এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণ এবং বিশেষতঃ সতীদাহ নিবারক আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করা। সহমরণ বিষয়ক সমস্ত খবর এই পত্রিকায় থাকিত, এবং তখনও স্থানে স্থানে যে দু-একটী সহমরণের খবর পাওয়া যাইত তাহা এই পত্রিকায় প্রশংসিত হইত। এই সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ পত্রের (বিশেষতঃ সমাচার-দর্পণ ও সংবাদ-কৌমুদীর) সহিত চন্দ্রিকার যে বাদানুবাদ চলিত তাহার উল্লেখ বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। দর্পণ প্রায়ই সতী প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত এবং চন্দ্রিকা হিন্দুপক্ষ হইতে তাহার জবাব দিত। এই সভা হইতে ইহার ও বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ জনৈক ইংরাজ ব্যারিষ্টারকে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার মারফত বিলাতে সতীপ্রথার বিপক্ষে আইন তুলিয়া লইবার জন্য দরখাস্ত পাঠান হইয়াছিল। এই সাহেব যে জাহাজে যাইতেছিলেন তাহা বঙ্গ সাগরের মুখে নষ্ট হওয়াতে তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হয়। ইহার খবরাখবর বর্ত্তমান ফাইলে পাওয়া যায়।]

(৫) ধর্ম্মসভার ধনরক্ষক। [বৈষ্ণবদাস মল্লিকের পদত্যাগ ও তৎস্থলে প্রমথনাথ দেবের নিয়োগ] পৃঃ ৯, পং ১।

(৬) সমাচার চন্দ্রিকা। [চন্দ্রিকায় বাণিজ্য বিষয়ক বিজ্ঞাপন প্রেরণের জন্য অনুযোগ]। পৃঃ ৯, পং ২।

(৭) কেতাব শাহনামা। [উক্ত নামধেয় কোন পুস্তকের বিজ্ঞাপন] পৃঃ ৯, পং ২

(৮ পুস্তকবিক্রয়। [চন্দ্রিকা প্রেসে প্রকাশিত বিক্রয়ার্থ পুস্তকের তালিক'। ইহার মধ্যে ভবানীচরণ প্রণীত "কলিকাতা কমলালয়, প্রশ্ন উত্তর দ্বারা কলিকাতার রীতি বর্ণন, মূল্য দুই টাকা" উল্লেখযোগ্য]। পৃঃ ১০ পং ১-২

ইহার পরে রাজকর্ম্মের নিয়োগ (পৃঃ ১১, পং ১) এবং বোম্বের সহমরণ বিষয়ক (পৃঃ ১১, পং ১-২)। শেষোক্ত প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায় যে বোম্বাইএর গভর্ণর এই রূপ আদেশ করিয়াছেন যে পঞ্চায়েত সমর্থনে সতীদাহ হইতে হইতে পারিবেক। বলা বাহুল্য ইহাতে চন্দ্রিকাসম্পাদক অত্যন্ত সন্তুষ্ট। পরিশেষে ধর্ম্মসভায় অর্থদান ও দাতৃগণের নামের তালিকা, পৃঃ ১১-১২।

পরবর্ত্তী সংখ্যাসমূহের ছাঁচ প্রায় এইরূপ। সুতরাং প্রত্যেক সংখ্যার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া তাহা হইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা তথ্য এইখানে আমরা লিপিবদ্ধ করিব।

সং ৪৭৭, ১লা বৈশাখ ১২৩৭, ইং এপ্রিল ১৫, ১৮৩০। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে ধর্ম্মসভার অধিবেশন। এই সভায় সতীদাহ সম্বন্ধে বিলাতে অভিযোগ

পাঠাইবার কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

সং ৪৮১, ইং এপ্রিল ২৯ ১৮৩০ তারিখের চন্দ্রিকায় বাংলা বঙ্গদূত পত্রের উল্লেখ। পুনশ্চ ৩রা জুন ১৮৩০ (২২শে জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭) এই পত্রের নবম সংখ্যার উল্লেখ ; ১৭ই জুন (৪ঠা আষাঢ়) এ একাদশ সংখ্যার, ২৪শে জুন (১১ই আষাঢ়) এ দ্বাদশ সংখ্যার, ৫ই জুলাই ২২শে আষাঢ়) এ চতুর্দ্দশ সংখ্যার, ২৩শে আগষ্ট (৮ই ভাদ্র) এ বিংশ সংখ্যার উল্লেখ আছে। ২১শে জুন (৮ই আষাঢ়) সংখ্যায় ৩২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রকাশিত বঙ্গদূতের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বোধ হয় বঙ্গদূত সাপ্তাহিক ছিল, এবং ইহার প্রকাশের তারিখ এইরূপ মোটামুটি হিসাব করা যায়।

বঙ্গদূত ৯ সংখ্যা ৩০ মে (১৮ই জ্যৈষ্ঠ)
" ১০ ৬ই জুন (২৫শে জ্যৈষ্ঠ)
" ১১ " ১৩ই জুন (৩২শে জ্যৈষ্ঠ)
" ১২ " ২০শে জুন (৭ই আষাঢ়)
" ১৩ " ২৭শে জুন (১৪ই আষাঢ়)
" ১৪ " ৪ঠা জুলাই (২১শে আষাঢ়)

এই হিসাবে বঙ্গদূতের প্রচারকাল আনুমানিক ৪ঠা এপ্রিল ১৮৩০। লংসাহেব তাঁহার *Catalogue* এ ইহার তারিখ দিয়াছেন ১৮২৫ ; কিন্তু কলিকাতা রিভিউএর প্রবন্ধে (এই পত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে Banga Dutt) ইহার তারিখ তিনি ধরিয়াছেন ১০ই মে ১৮২৯। চুঁচুড়া লবণবিভাগের (Salt Board) দাওয়ান নীলরতন হালদার এই সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। লংসাহেব *Return* এ বলেন ইহা ষোল বৎসর কাল প্রচলিত ছিল ; ইহা যদি সত্য হয়, তবে যখন তিনি ১৮৫০ খৃঃ অঃ কলিকাতা রিভিউএ তাঁহার প্রবন্ধ লেখেন বঙ্গদূত তখনও কিরূপে জীবিত ছিল তাহা বুঝা যায় না। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার "বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে" (পৃঃ ৯৬) লিখিয়াছেন বঙ্গদূত বাংলা ও পারসী এই দুই ভাষায় লিখিত হইত। কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

৩রা মে ১৮৩৩, সং ৪৮২ চন্দ্রিকায় সমাচার-দর্পণের উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে তখন দর্পণ বাঙ্গালা ও ইংরাজী দুই ভাষাতেই লেখা হইত। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি (*Bengali Lit.* pp. 242-3) যে খৃঃ অঃ ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত দর্পণ এই দুইভাষায় লিখিত হইত, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দেও দর্পণ দ্বিভাষী ছিল। চন্দ্রিকা হইতে জানা যায় যে ইউরোপীয়েরা ধর্ম্মসভার কার্য্যাবলী দর্পণের ইংরাজী অনুবাদ হইতে জানিতে পারেন ; "ইহা ইউরোপীয় লোকেরা কেবল দর্পণের অনুবাদের দ্বারা অবগত হইতেছেন" (পৃঃ ৫৮, পং ১)।

৩রা জুন ১৮৩৩ (২২শে জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭) তারিখের ৪৯১ সংখ্যক চন্দ্রিকায় (পৃঃ ১১৯), ১৬ই জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত ৩৪৭ সংখ্যক সংবাদ-তিমির-নাশক পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৪শে জুন (১১ই আষাঢ়) ৪৯৭ সংখ্যক চন্দ্রিকায় (পৃঃ ১৭৬) লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ন্যায়ালঙ্কার সম্পাদিত শাস্ত্রপ্রকাশ নামক পত্রের সূচনার উল্লেখ আছে। "মূল্য প্রতিমাসে একটাকা। প্রতি বুধবারে যন্ত্রিত হইয়া এক এক পত্র দিবেন।"

১লা জুলাই, ২৮শে আষাঢ় তারিখের ৪৯৯ সংখ্যক চন্দ্রিকায় (পৃঃ ১৯১) কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অধিবেশনের বিবরণ হইতে বোঝা যায় যে তখন উক্ত সমিতির আর্থিক অবস্থা অতি মন্দ ; কারণ হাইকোর্টের জজ রায়ন (Ryan) সাহেব উক্ত অধিবেশনে আক্ষেপ করেন যে এ দেশবাসীরা উক্ত সমিতির কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। ১৮১৭ খৃঃ অঃ ইহার দেশী সভ্য সংখ্যা ছিল ৮০, কিন্তু ১৮২৯ খৃঃ অঃ কেবল ১০ জন মাত্র অবশিষ্ট। ইহাতে চন্দ্রিকা সম্পাদক বিশেষ অসন্তুষ্ট নহেন, কারণ তিনি ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রায়ই লেখনী চালনা করিতেন (সং ৫২৬, ৪ঠা অক্টোবর, ২৯শে আশ্বিন, পৃঃ ৪২২)।

২২শে জুলাই (৮ই শ্রাবণ) তারিখের চন্দ্রিকায় (পৃঃ ২৩৯) গৌরমোহন আঢ্যের বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে তৎপরিচালিত ওরিএন্টাল সেমিনারী নামক বিদ্যালয় ১৮২৮ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং ৬ই সেপ্টেম্বর (২২শে ভাদ্র) তারিখের চন্দ্রিকা হইতে জানা যায় যে পুরাতন হিন্দু কালেজ তখন চিৎপুর রোডেই স্থাপিত ছিল।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ৭৫ বৎসর বয়ক্রমকালে ১৫ই আশ্বিন ১২৩৭ সালে দেহত্যাগ করেন (চন্দ্রিকা সং ৫২৬, ১৯ শে আশ্বিন, ৪ঠা অক্টোবর, পৃঃ ৪১৩)।

হিন্দুকালেজের ছাত্রদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে জনৈক ছাত্রের পিতার আক্ষেপ (চন্দ্রিকা সং ৫৩৪, ১৭ই কাত্তিক, ১লা নভেম্বর, পৃঃ ১৭৯)।

৫৩৯ সংখ্যক চন্দ্রিকায় (১৮ই নভেম্বর, ৪ঠা অগ্রহায়ণ) ৩৯৩ সংখ্যক কৌমুদীর এবং ২৭শে কার্ত্তিকের চন্দ্রিকায় ২৪ শে কার্ত্তিকের কৌমুদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ৫৪০ সংখ্যায় (৮ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর) রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত-গমনের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। "গত শুক্রবার শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারিজন পরিচারক সমভিব্যাহৃত হইয়া আলবিয়ন্‌ নামক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক বিলাতে গমন করিয়াছেন।" (পৃঃ ৫২৪)

সং ৫৫১, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৬ই পৌষ। প্রেমচাঁদ রায় প্রভৃতি কর্ত্তৃক বাংলা সংবাদ-সুধাকর নামক একখানি নূতন পত্র প্রকাশের গুজব।

সং ৫৫৯, ২৭শে জানুয়ারী, ১৮৩১, ২০শে পৌষ। "বাঙ্গালা ভাষায় পাঁচটা কাগজ হইয়াছে তাবৎ চলিতেছে" (পৃঃ ৬১২)। পরে আমরা দেখিব এ মন্তব্য ঠিক নহে।

সং ৫৫৯, ২৭শে জানুয়ারী, ১৫ই মাঘ। "কএক জন বাঁকা বাবু পিতৃবিয়োগান্তর নানা কুকর্ম্ম করিয়াছেন এবং নববাবু বিলাস গ্রন্থে তাহা ব্যক্ত আছে" (পৃঃ ৬৭৬)।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৩১, ২২শে মাঘ, ১২৩৭, ৫৬১ সংখ্যক চন্দ্রিকায় (পৃঃ ৬৯১-২) সম্বাদ-প্রভাকরের প্রথম প্রচারের উল্লেখ আছে। ইহার তারিখ সাধারণতঃ ১৮৩০ বলিয়া ধরা হয় (যথা কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, রামগতি ন্যায়রত্ন, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি) কিন্তু তাহা ভুল। ইহার প্রথম সংখ্যা ১৬ই মাঘ ১২৩৭ সালে বা ইং ২৮শে জানুয়ারী ১৮৩১ খৃঃ অব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় ; এবং মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার জন্মভূমির প্রবন্ধে প্রথম ইহার ঠিক প্রচারাব্দ দিয়াছেন। আমরা চন্দ্রিকা হইতে উপরোক্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক সম্বাদ-প্রভাকর নামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার জল্পনা হইয়াছিল সম্প্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে।"

এবং পরবর্ত্তী সংখ্যায় (পৃঃ ৭০৪) চন্দ্রিকাসম্পাদক এই নবীন উদ্যমকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ধারায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। পুনশ্চ ১ ই মার্চ্চ ১৮৩১, ৫ই চৈত্র ১২৩৭, সংখ্যা ৫৭৩, পৃঃ ৭৯৮, চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিতেছেন : "প্রভাকর অত্যল্প দিবস প্রকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতেই এতন্নগরের যাবতীয় ভদ্রলোক তৎপত্রের আদর করিয়াছেন এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে ঐ পত্রের গ্রাহক হইয়া অনেক লোক পত্র লিখিতেছেন।"

সম্বাদ-সুধাকরের প্রচার। চন্দ্রিকা ১৮ই ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৩১, সংখ্যা ৫৬৮, পৃঃ ৭৪৭—"আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতেছি গত ১৩ ফাল্গুন বুধবার প্রাতে সম্বাদ সুধাকর নামক সমাচার পত্র এতন্নগরের যোড়াবাগান ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত দেবীচরণ প্রামাণিকের আলয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে।" এবং ৫৭৩ সংখ্যক চন্দ্রিকা (১৭ মার্চ্চ ১৮৩১, ৫ই চৈত্র, ১২৩৭) হইতে জানা যায় "সুধাকর পত্রের প্রকাশক কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বৈদ্য-কুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ রায়।" ইহার তারিখ লং সাহেব মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি ১৮৩০ ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। লং সাহেব (*Return 1855*) বলিয়াছেন ইহার আয়ুষ্কাল ৩ বৎসর কিন্তু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির মতে ইহা ১১ বৎসর চলিয়াছিল। Calcutta Christian Observer (Feb. 1840) পত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

চন্দ্রিকা সংখ্যা ৫৭১, ২৮শে ফাল্গুন ১২৩৭, ১০ মার্চ্চ ১৮৩১ খৃঃ পৃঃ ৭৭২ ; "সমাচার-সভা-রাজেন্দ্র নামক বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় এক সমাচারপত্র সৃজন হইবার কল্প ছিল তাহা গত ২৫ ফাল্গুন সোমবার প্রকাশ হইয়াছে প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করিয়াছি তাহাতে তৎপ্রকাশকের প্রতিজ্ঞা বা অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত হয় নাই কেবল কএকটী সংবাদ এবং তাহারি অবিকল অনুবাদ পারস্য ভাষায় হইয়া কাগজে

মুদ্রিত হইয়াছে বোধ হয় আগামিতে তৎপ্রকাশক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন।" সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে জানা যায় ইহা প্রথম বাংলা-ও-পারস্য ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্র। ইহা হইতে অনুমান হয় যে সমাচার দর্পণে পারস্য ভাষা ' মধ্যে স্থান পাইয়াছিল মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের এইরূপ ধারণা অমূলক। "সভাবাজেন্দ্র নামক কাগজের প্রকাশক মোসলমান" (চন্দ্রিকা, সং ৫৭৩, ১৭ মার্চ্চে ১৮৩১, ৫ই চৈত্র ১২৩৭, পৃঃ ৭৭৮)। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ইহার সম্পাদকের নাম দিয়াছেন মৌলবী আলি মোল্লা। ১৮৪৮ খৃঃ অঃ পূর্ব্বেই ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। দীনেশবাবু (p. 910) যে ইহার তারিখ দিয়াছেন ১৮২১, তাহা একেবারেই ভুল।

এই সমাচার-চন্দ্রিকা নবদ্বেষী "গোঁড়া" হিন্দুসম্প্রদায়ের মুখপত্র স্বরূপ ছিল, এবং যাহা কিছু নূতন বা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন সমস্তই মন্দ এইরূপ মত প্রচারে ব্রতী ছিল। এইজন্য অনেক সময় অনেক বিষয় ইহার মতামত অত্যন্ত অসম, একদেশীয় এবং চরম ভাবাপন্ন ছিল। কেবল যে সতীদাহ সমর্থনে বদ্ধপরিকর ছিল এমত নহে, পরন্তু কতকগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদের ইংরাজীশিক্ষা অবিধেয়, হীনবর্ণদিগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হওয়া উচিত নহে (কারণ তাহা হইলে তাহারা ব্রাহ্মণাদির সহিত সাম্য স্পর্দ্ধা করিবে) ইত্যাদি মত এই পত্রিকার কোন দিকে ঝোঁক্ ছিল তাহা বেশ বুঝাইয়া দেয়। রাজনৈতিক অপেক্ষা সামাজিক বিষয়ের আলোচনাই থাকিত; তবে মধ্যে মধ্যে টেক্সবৃদ্ধি, আদালতে মোকদ্দমার ব্যয় বাহুল্য, মফঃস্বলে দারোগা ও আমিনদিগের অত্যাচার প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ বা পত্র প্রেরকদিগের পত্র প্রকাশিত হইত।

সমাচার-চন্দ্রিকার পরবর্ত্তী ইতিহাস আমাদের সমালোচনার বহির্ভূত; কিন্তু ভবানীচরণ বরাবর ইহার সম্পাদক ছিলেন না। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলেন যে ভবানীচরণ ১৮৪০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদন করিয়া ছিলেন।

ভবানীচরণের পর বোধ হয়, ১৮৫০ খৃঃ অঃ পানীহাটীর ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও তৎপুত্র বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ইহার পরিচালনা করিতেন। পরে ইহা দৈনিক হইয়াছিল। লংসাহেব (*Return* ১৮৫৫) বলেন যে ইহা ১৮৫১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। এবং ১৮৫১ খৃঃ অব্দের অরুণোদয় হইতে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎকালীন বাংলা সাময়িক পত্রিকার যে তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৫, পৃঃ ৭৫) তাহার মধ্যে চন্দ্রিকার নামও পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারের ২৩শে বৈশাখ ১২৭২ সালের (ইংরাজী ১৮৬৫) প্রাত্যহিক প্রভাকর হইতে জানিতে পারি যে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত চন্দ্রিকা জীবিত ছিল। পরে ইহা দৈনিকের সহিত মিলিত হইয়া বাহির হইত।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমরা ইং ১৮৩০-১, বাং ১৩২৭ সাল পর্য্যন্ত এই কয়খানি বাংলা সাময়িক পত্রের খোঁজ পাই:

১।	সমাচারদর্পণ	প্রচার-কাল ২৩শে মে ১৮১৮
২।	ব্রাহ্মণসেবধি	" আগষ্ট ১৮২১ ?
৩।	সংবাদকৌমুদী	" ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২১ ?
৪।	সমাচারচন্দ্রিকা	" ১৮২১-২
৫।	সংবাদতিমিরনাশক	" অজ্ঞাত ১৮২৩ ?
৬।	বঙ্গদূত	" ৪ঠা এপ্রিল, ১৮৩০
৭।	শাস্ত্রপ্রকাশ	" জুন ১৮৩০
৮।	সংবাদপ্রভাকর	" ২৮শে জানুয়ারী ১৮৩১
৯।	সংবাদসুধাকর	" ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩১
১০।	সমাচারসভারাজেন্দ্র	" মার্চ্চ ১৮৩১

শ্রীসুশীলকুমার দে।

বৌঠান

(গল্প)

বন্ধু-বান্ধবেরা বলতো—শিবদাসদের বাড়ীর পর্দ্দা উঠে গেল। শিবদাসের সাতপুরুষ আগে একজন পূর্ব্বপুরুষ কোন এক ইংরেজ সওদাগরের দাওয়ানী করে কলকাতায় সাতমহল বাড়ী তৈরি করেছিলেন। সূর্য্যও তাঁদের বাড়ীর মেয়েদের মুখ দেখতে পেতো না। তারপর কালের সঙ্গে সঙ্গে একটি করে মহল ভূমিসাৎ হোতে-হোতে শিবদাস বাড়ীর কর্ত্তা হয়ে দেখলে যে, সাতটি মহলই তখন মাটীতে পড়ে মুখ ঘস্‌ড়াচ্ছে। রাস্তায় দাঁড়ালে বাড়ীর ভেতর পর্য্যন্ত দেখা যেতো বলে বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতো—শিবেদের বাড়ীর পর্দ্দা উঠে গেল। পর্দ্দা উঠে যাবার আগেই পর্দ্দানশীনরা সরে পড়েছিলেন, তাই রক্ষে, নাহলে এই ভাঙা বাড়ীতে আবার পর্দ্দার বন্দোবস্ত করতে হলে তাকে ভিটেশুদ্ধ উঠিয়ে দিতে হতো। এই বিশাল ইট-কাঠের স্তূপের মধ্যে একখানি আধ-ভাঙা ঘর তখনো কালের পায়ে একেবারে লুটিয়ে পড়েনি! এই ঘরখানায় শিবদাস থাকতো।

সপ্তাহখানেক আগে একখানা উপন্যাস বিক্রি করে সে দেড়শো টাকা পেয়েছিল। সেদিন রাত্রি থেকে লক্ষ্মীছাড়ার দলের সব-কটিই তার ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে—নড়বার নামটি নেই। কদিন থেকে তাদের খাওয়া-দাওয়া আর গানের হুল্লোড়ে প্রতিবেশীরা শশব্যস্ত হয়ে উঠেছিল. এমন কি তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুলিশে খবর পাঠাবার সংকল্পও করছিল।

রাত তখন প্রায় তিনটে। শিবুর ঘরে লক্ষ্মীছাড়াদের জলসা তখনো পুরোদমে চলেছে! তারা জন-পনেরো মিলে গলা ছেড়ে গান ধরেছে—"অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ—।" গানে বোধ হয় হৃদয়ের ভাবটা সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে না পেরে তারা বাজনাও সুরু করেছিল। চৌকি, কেরোসিনের বাক্স, বই, বালিস, মেঝে—যার যাতে হাত আছে, সে তাই বাজাচ্ছে। রমেন সম্প্রতি এক অসহযোগীদের সভায় গিয়ে হাত ভেঙে এসে দুদিন থেকে নির্জ্জীব হয়ে পড়েছিল, তার গলার সঙ্গে একখানা হাত তখনো কাঠ দিয়ে বাঁধা। গান শুনে সে আর শুয়ে থাকতে না পেরে উঠে তার মুলো হাতখানা কোমরে ঠেকিয়ে নাচ সুরু করায় আমোদ যখন খুবই জমে উঠেছে, ঠিক সেই সময় পাড়ার জনকয়েক মুরুব্বী একেবারে শিবুর ঘরের মধ্যে এসে হাজির!

হ্যাঁ হে, তোমাদের ব্যাপারখানা কি, বলতো? ধরাখানাকে কি সরা জ্ঞান করেছো?

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এই রকম রসভঙ্গ হওয়ায় তারা অবাক্ হয়ে আগন্তুকদের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। শিবদাস ছাড়া এদের আর কেউ চিনতো না। কিন্তু তারা ঘরে ঢুকতেই শিবদাস মোটা-সুরেশের পেছনে শুয়ে পড়েছিল। পাড়ার বিরিঞ্চি খুড়ো একবার এদিক ওদিক দেখে বল্লে—লক্ষ্মীছাড়াটা গেল কোথায়?

বিরিঞ্চির কথা শুনে হঠাৎ তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—"আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, ভবে—"

নসীরাম হাইকোর্টে চাকরী করতো। সে বলতো, জজেরা তাকে ভারি খাতির করে, এজন্যে পাড়ার লোকেরা তাকে সম্ভ্রম করে চলতো। লক্ষ্মীছাড়ারা আবার গান সুরু করায় নসীরাম চীৎকার করে বল্লে—কালই পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এর একটা বিহিত করতে হবে। এ রকম করে—

নসীরামের কথা শেষ হবার আগেই একজন বাতিটা নিবিয়ে দিলে। বাতি নিবতেই যে যেখানে বসেছিল সে সেইখানেই শুয়ে পড়লো। মুরুব্বীরা খানিকক্ষণ বক্ বক্ করে শেষে অন্ধকারে ইটের স্তূপে হোঁচট্ খেতে খেতে বেরিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে যারা ছিল, তাদের আর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। বাতি নিবুনোর সঙ্গে সঙ্গে তারাও যেন নিবে গেল।

পরদিন শিবদাস ঘুম থেকে উঠে দেখলে, সবাই চলে গেছে। ভাঙা ছাতের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে একরাশ রোদ এসে পড়েছে। শিবদাস মুখ ধুয়ে ঘর পরিষ্কার করে

চৌকির ওপর গিয়ে বসলো। ক-দিন চেঁচামেচি ও ছুটোপাটির পর তার দেহে ও মনে একটা অবসাদ এসেছিল, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর সে স্থির করলে যে সেদিন আর রান্নার হাঙ্গাম করবে না। দেওয়ালে একটা পেরেকে তার জামাটা টাঙানো ছিল, তার পকেটে হাত দিয়ে সে দেখলে যে, দেড়শো টাকার মধ্যে টাকা দেড়েক তখনো খরচ হয়নি। জামাটা গায়ে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

সমস্ত দিন এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে বিকেল বেলা এক চায়ের দোকানে ঢুকে দু-পেয়ালা চা ও খানকয়েক কেক্ খেয়ে শিবদাস একখানা বাংলা দৈনিক টেনে নিয়ে পড়তে লাগলো। খবরগুলো এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে সে বিজ্ঞাপন পড়তে লাগলো। বিজ্ঞাপন পড়া শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় সে দেখলে, কাগজের এক কোণে একটা আশ্চর্য্য রকমের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপনটা এই :—

—জামাই বাবু,

তুমি রাগ করে চলে যাওয়ায় আমরা বড় দুর্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছি। আচ্ছা, এখানে গরমে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে তুমি দার্জ্জিলিংয়ে গিয়েই থেকো; কেউ তোমায় জ্বালাতন করবে না। তুমি শান্তিপুরের মিহি ধুতিই পরো আর আমি তোমায় ঠাট্টা করবো না। টাকার দরকার হলে চেয়ে পাঠিও, কোন সঙ্কোচ করো না। ইতি বৌঠান। ২৮নং জগদীশ মালধরিয়ার গলি।

কাগজখানা হাতে নিয়ে শিবদাস ভাবতে লাগলো, নিশ্চয় কোনো বাড়ীর জামাই রাগ করে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যেই এই বিজ্ঞাপন লেখা হয়েছে। অ-পরিচিত, অ-দৃষ্ট এই জামাই বাবুটির সৌভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে তার মর্ম্মস্থল থেকে একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস উথলে উঠলো। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে সে আর একবার চিঠিখানার ওপর চোখ বুলিয়ে গেল। শেষে কি ভেবে একবার এদিক ওদিক চেয়ে কাগজ থেকে বিজ্ঞাপনের সেই অংশটুকু ছিঁড়ে নিয়ে একেবারে বাড়ীমুখো ছুটলো।

বাড়ীতে গিয়ে শিবদাস তাড়াতাড়ি খাতার একখানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লিখতে বসলো,

—বৌঠান,

তোমার দেওয়া বিজ্ঞাপন কাগজে পড়লুম। ভেবেছিলুম, এ জীবনে আর কখনো ধরা দেব না। কিন্তু তোমাদের স্নেহের বাঁধন এমনই দৃঢ় যে কিছুতেই তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলুম না। আমার শরীরটা বড় খারাপ, তাই নিজের হাতে চিঠি লিখলুম না। তুমি পত্র-পাঠ মাত্র শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেয়ারে এই ঠিকানায় আমাকে দু-শো টাকা পাঠিয়ে দেবে। এখন আর ছ-মাসের জন্যে দেখা হবে না। আমাকে এখানে ধরবার চেষ্টা করোনা। তাহলে ধরতে তো পারবেই না, জীবনে কখনো ধরা দেবো কিনা, তাও ঠিক বলতে পাচ্ছিনা। আশা করি, তোমরা সবাই ভাল আছ। ইতি জামাই বাবু।

বেয়ারিং চিঠি ডাকে ফেলে শিবদাস তার ঘরে ফিরে এসে ভাবতে বসলো—কাজটা ঠিক হলো কি না? রাত্রি বারোটা অবধি বসে বসে শেষকালে বৌঠানের কথা ভাবতে ভাবতে শিবদাস তার পায়া-ভাঙা খাটের ওপর বই মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

দু-দিন আর দু-রাত্রি সে বৌঠানের টাকার আশায় ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলে। পাছে পিয়ন টাকা নিয়ে এসে ফিরে যায়, এই ভয়ে দু-দিন সে ঘর থেকে বেরুলোই না। দু-দিন পরে একদিন দুপুরবেলা স্বর্গের দূতের মত ডাক-পিয়ন এসে তার দরজায় দাঁড়ালো। পিয়নের ডাক শুনে শিবদাস বেরিয়ে এল। পিয়ন বল্লে, রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে দু-শো টাকার মনিঅর্ডার আছে, আপনাকে জামিন দিতে হবে।

শিবদাস পিয়নের হাত থেকে মনিঅর্ডারের ফরম্‌খানা নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো, তারপর ডান হাতে ও বাঁ-হাতে দুজনের নাম সই করে তার কাছে থেকে কুড়িখানা দশ টাকার নোট গুণে নিয়েই ঘরে এসে তার ডালা-ভাঙা বাক্সটা গুছোতে আরম্ভ করে দিলে। বিছানা ও বাক্স যথা-সম্ভব গুছিয়ে খাতা থেকে এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে শিবদাস লিখলে, ভাই সব, মাস-ছয়েকের জন্য বিদায়!

চিরকুটখানা একটা ঢিল চাপা দিয়ে খাটের ওপর রেখে শিবদাস শেয়ালদা ষ্টেশনের দিকে ছুটলো।

আজ দিন পনেরো হলো, শিবদাস দার্জ্জিলিংয়ে এসে একখানা বাড়ী ভাড়া করে আছে। একমাত্র পাহাড়ী চাকর, সেই তার ঝী, চাকর, বাঁধুনী—সব কাজই করে। কাজকর্ম সারা হয়ে গেলে সন্ধ্যে থেকে রাত্রি বারোটা অবধি তার সঙ্গে বসেই সে আড্ডা দেয়। অন্য কোন বন্ধু-বান্ধব না জুটলেও দিন-গুলো তার কাটছিল বেশ।

সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় শিবদাস বাইরের দিকে একখানা চেয়ার টেনে এনে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিল—হঠাৎ এত জায়গা থাকতে সে দার্জ্জিলিংয়ে চলে এল কেন? এই বৌঠানটি কে? আর এই জামাই বাবুটিই বা কে? খেয়ালের ঝোঁকে তখন কিছুই ভাবেনি, এখন নানারকম ভাবনায় তার মনটা বিগড়ে যেতে লাগলো। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা সোনার স্বপনে মুগ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে তার ওপর দিয়ে মেঘেরা তাদের শীতল পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—স্বপ্ন যেন ছুটে না যায়! সহরের কলের চিম্নি তার বিষ-মাখানো ধোঁয়া ছেড়ে এখানে প্রকৃতির বিলাসের কোন বাধাই জন্মাতে পারে না। মাঝে মাঝে একদল নরতা উঁচু-নাচু আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে কলরব করতে করতে চলে যাচ্ছে। আশা ও নিরাশার ছায়াবাজির মত শিবদাসের চোখের ওপর দিয়ে একটার পর একটা এই সব দৃশ্য ভেসে যাচ্ছিল। মন তার কিছুতেই নিবিষ্ট হতে চাইছিল না। সে ভাবছিল, এ কোন্ বিলাসীর ভূত তার ঘাড়ে কেমন করে চেপে বস্‌লো! মন স্থির করবার জন্যে শেষে সে খাতা-পেন্‌সিল নিয়ে কবিতা লিখতে বসে গেল। কয়েক লাইন লেখার পর মনটা যখন বেশ একাগ্র হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় তার পাহাড়ী চাকর তাকে একখানা চিঠি দিয়ে বল্লে—চিঠিখানা কাল এসেছে, দিতে ভুল হয়ে গেছে।

চিঠির ওপরে স্ত্রী-হস্তের লেখা—রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ীর ঠিকানাও ঠিক লেখা ছিল। শিবদাস কবিতার খাতার মধ্যে পেন্‌সিলটা গুঁজে রেখে চিঠি পড়তে লাগলো।

—জামাই বাবু,

তুমি এত নিষ্ঠুর কি করে হলে? আমরা অবাক হয়ে গেছি। কলকাতা থেকে দার্জ্জিলিংয়ে গিয়েছ, সে খবরটা জানালে বোধ হয় নির্জ্জন-বাসের কোন অসুবিধা হতো না। অমিয়ার বাবা দার্জ্জিলিংয়ে চাকরি করেন, জানো, বোধ হয়। তোমার চাকরের বোন তাদের বাড়ীতে চাকরি করে। তোমার চাকর তার বোনকে তোমার নাম করেছিল, সে আবার অমিয়াদের কাছে তোমার গল্প করেছে। অমিয়া সেই খবর আমাকে পাঠিয়েছে। ছ-মাস ধরা দেবে না বলেছো, আমরা দিন গুনছি, কবে ছ-মাস পূরবে! তার আগে তোমাকে জ্বালাতন করবো না, ভয় নেই। তুমি দার্জ্জিলিং ছেড়ে আর কোথাও যেয়োনা। চিঠির উত্তর দিও। শান্তিপুরের ধুতি খানকয়েক পাঠিয়ে দেবো? আশা করি, ভাল আছ। ইতি বৌঠান।

শিবদাস সেদিন নিজেকে কবিতার মধ্যে ডুবিয়ে দেবে স্থির করেই বসেছিল কিন্তু তা আর হলো না। বৌঠানের চিঠি তার থিতিয়ে-পড়া মনটাকে বিষম জোরে ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল। সমস্তদিন সে বিছানার ওপর বসে ভাবতে লাগলো যে, তারা তার দার্জ্জিলিংয়ে আসা পর্য্যন্ত জানতে পেরেছে! আচ্ছা, এই অমিয়াটি কে? কিন্তু তখনি আবার মনে হলো—যাক্‌গে বাবা, আর অমিয়ার খোঁজ করে দরকার নেই। এখন ভালয় ভালয় কলকাতায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়। হয়তো এরা তাকে স্তোক দিয়ে এইখানে রেখে তারপর সদলে এসে তাকে গ্রেপ্তার করবার মৎলব করছে। আচ্ছা, জামাই বাবুর বদলে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্ত্তি দেখ্‌লে এই বৌঠান কি মনে করবে! ভাববে, যে আমি একজন পাকা জোচ্চোর! তখনি ঘাড়টি ধরে পুলিশের জিম্মায় সঁপে দিয়ে হাসতে হাসতে তারা বাড়ী ফিরে যাবে। শিবদাসের মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—কিন্তু আমি কি সত্যই জোচ্চোর? না, না, কখনো না, আর যাই হই, আমি জোচ্চোর নই, বৌঠান, আমি জোচ্চোর নই! তোমার আহ্বানে এমন কোন মাদকতা ছিল, যার প্রভাবে আমার বিচার বুদ্ধি অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। কে তুমি নারী?

আমার মতন বাঁধন-হারাকেও তুমি এমন বাঁধনে বেঁধে ফেলেচো! শিবদাস আর কিছু ভাবতে পাচ্ছিল না। সে বৌঠানের চিঠিখানা দু-হাতে ধরে বুকে চেপে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

অনেকক্ষণ সেইভাবে পড়ে থেকে শিবদাস একবার ভাবলে যে, এই বন্ধন ছিঁড়ে কালই সে দার্জ্জিলিং ছেড়ে চলে যাবে তার সেই ভাঙা ঘরে। কিন্তু তখুনি আবার মনে পড়লো, বৌঠান বলে দিয়েছে দার্জ্জিলিং ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। যার আহ্বানে তার অন্তর এমন করে সাড়া দিয়েছে. তার অনুরোধ কেমন করে সে ঠেল্‌বে? এই অনুরোধ যে তার সমস্ত শক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছে। নিজের অসহায়তার কথা ভাবতে ভাবতে আবার সে শুয়ে পড়লো।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগলো—আমি কি এতই অসহায়? কিসের অসহায়! এই মুহূর্ত্তেই আমি চলে যাব। কে এই বৌঠান? আমার কে সে? তার অনুরোধে আমার কি এসে যায়? তাকে কখনো চোখে দেখিনি, কখনো তার সঙ্গে পরিচয় নেই। হাঁ, হাঁ, আমি জোচ্চোর, পাকা জোচ্চোর—এই অনুরোধ-পত্র যার উদ্দেশে লেখা হয়েছে সে কোথায়? সে যেখানেই থাকুক, আমাকে তো আর এই পত্র লেখা হয়নি! তবে,—তবে? এই তবের উত্তর সে অন্তর থেকে কিছুতেই পাচ্ছিল না। নিদ্রায় তন্দ্রায় তার সে রাত্রিটা কেটে গেল। সকাল বেলা উঠে চা খেয়ে সে চিঠি লিখতে বসলো।

—বৌঠান,

তোমার চিঠি পেয়েছি। মনে করেছিলুম, অজ্ঞাতবাস করবো। কিন্তু তোমরা আমায় খুঁজে বের করেছো! যা হোক্, অজ্ঞাতবাস করবার ইচ্ছাটা মন থেকে এখনো যায়নি। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, এই ছ-মাস নিজের হাতে কাউকে চিঠি লিখবো না। হাতের লেখা দেখে বোধ হয় তা বুঝতে পারছো। টাকার দরকার হলেই জানাবো। আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। তোমার যদি একখানা ফটো আমায় পাঠিয়ে দাও, তবু আমার নির্জ্জন বাসটা একটু মধুময় হয়ে ওঠে। আশা করি, কিছু মনে করবে না। শান্তিপুরে ধুতি আর আমি পরি না। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ই মাথায় তুলে নিয়েছি। ইতি

জামাই বাবু।

চিঠিখানা ডাকে ফেলে দেওয়ার পর শিবদাসের মনে হলো, ফটো চেয়ে বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। কিন্তু তখন আর আপশোষ করা বৃথা ভেবে সে নিজের মনে সাহস সঞ্চয় করতে লাগলো। যার কাছ থেকে স্নেহ-ভালবাসা পেতে পারে, এমন লোক তার কেউ ছিল না! বিধাতা ছোটবেলাতেই তার কপালে লক্ষ্মীছাড়ার তিলক পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারি মত লক্ষ্মীছাড়াদের আবহাওয়ার মধ্যেই সে বেড়ে উঠেছে। তার আবার ভয় কিসের? সে স্থির করলে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, যে ফাঁসের মধ্যে সে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার শেষ অবধি না দেখে সে ছাড়বে না। সমস্ত উদ্বেগ ও আশঙ্কাকে মন থেকে জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লো।

ঠাণ্ডি-সড়কে তখন বাঙালী, পার্শী, মাড়োয়ারী, ইংরেজ মাহলারা নানারকম বেশভূষা করে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সেখানে বেড়াতে বেড়াতে শিবদাসের মনে হতে লাগলো, এদের সঙ্গে তার এক-রাস্তায় বেড়ানো যেন খাপ খাচ্ছে না। একটি খদ্দর-পরা বাঙালী-যুবতী ইংরেজের পোষাক-পরা একটী বাঙালী পুরুষের হাতের মধ্যে হাত দিয়ে রাস্তায় ধীরে ধীরে পায়চারি কচ্ছিলেন। পুরুষটি শিবদাসের অঙ্গের মোটা খদ্দরের দিকে একটা ব্যঙ্গের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যুবতীকে কি বললে। যুবতী শিবদাসের দিকে একবার চেয়ে হেসে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা তার মোটেই ভাল লাগছিল না, পাছে সে কোনো কথা বলে ফেলে, এই ভয়ে নিজেই সাবধান হয়ে রাস্তার ধারে একটা জায়গায় বসে পড়লো। একদল পাহাড়ী যুবক রাস্তা মাতিয়ে সোরগোল করতে করতে চলে যাচ্ছিল, তারা শিবদাসকে দেখে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করে শিবদাসের কাছে এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন

অতি সঙ্কোচের সঙ্গে শিবদাসকে জিজ্ঞাসা করলে—বাবু আপনি কলকাতা থেকে আসচেন ?

—হ্যাঁ।

—বাবু, দু-দিন পরে আমাদের এখানে এক সভা হবে সেখানে আপনাকে ভাষণ দিতে হবে।

বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস তার কোনকালেই ছিল না, তার ওপর সেখানকার ভাষা তার আদৌ জানা নেই। সে তাদের বল্লে যে, সে ভাষণ দিতে জানে না। কিন্তু তারাও নাছোড়বান্দা। কলকাতার লোক, বিশেষ খদ্দর-পরা লোক যে ভাষণ দিতে জানে না, এ কথা তারা বিশ্বাস করতে রাজী নয়। অগত্যা শিবদাসকে বলতে হলো যে, সে তাদের ভাষা মোটেই জানে না, হিন্দিতে ভাষণ দিতে পারে। তারা শিবদাসের কথা শুনে উল্লাসিত হয়ে তার ঠিকানা জেনে নিয়ে চলে গেল।

পরদিন শিবদাস সকাল বেলা বসে বসে ভাবছিল বৌঠানের কথা, ফটোগ্রাফের কথা। হয়তো ফটো চাওয়ায় তাদের মনে সন্দেহ হবে! আচ্ছা, আসল জামাই বাবুটি কি উবে গেল ?

হঠাৎ কিসের একটা গোলমালে তার চিন্তার খেই হারিয়ে গেল। সে শুনতে পেলে, একদল লোক তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সমস্বরে গান গাইছে। শিবদাস জানালা দিয়ে দেখলে, কাল মলে যাদের সঙ্গে দেখা, এ তাদেরই দল। আজ তাদের সঙ্গে কয়েকটি বাঙালা ও মাড়োয়ারী ছেলেও জুটেছে। তারা গলা ছেড়ে গান ধরেছে—"সংসার ছেত্রেমে গান্ধীজি একেলা লড়্ রহা হায়।"

তাকে দেখে তারা সবাই "বন্দে মাতরম্" বলে চীৎকার করে উঠলো। শিবদাস তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিতেই তারা সবাই হুড়মুড়্ করে বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকলো। তারা শিবদাসকে বল্লে যে আজ সেখানে একটা সভা হবার কথা আছে। এক বাঙালা বাবু তাদের কথা দিয়েছিলেন যে তিনি সভাপতি হবেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার নারাজ হবেন বলে তিনি আর সভাপতি হতে চাইছেন না।

শিবদাস নিজেকে নিয়ে বেশ একলা কাটিয়ে দিচ্ছিল; সে ভাবলে—আচ্ছা এক গোলমাল কোথা থেকে এসে জুটলো। সেদিন বেড়াতে গিয়েই এই ফ্যাসাদ—

সে তাদের বলে দিলে—আমি সভাপতি-টতি হতে পারবো না।

দলের মধ্যে কয়েকটি বাঙালা ছেলে ছিল। শিবদাসের কথা শুনে তাদের মধ্যে থেকে একটি প্রিয়দর্শন ছেলে এগিয়ে এসে তাকে বল্লে—আপনি যদি আজকে সভাপতি না হন, তাহলে আমাদের আর মুখ দেখাবার যো থাকবে না। একেই তো ভারু বলে বাঙালাকে সবাই নিন্দা করে—

ছেলেটির চোখ ছল-ছল করতে লাগলো, সে আর কোন কথা বলতে পারলে না! শিবদাস দেখলে, আর-সব বাঙালা ছেলেরা তার মুখের দিকে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে রয়েছে। তাদের মুখ দেখলে মনে হয় যে, বাঙালী জাতির সমস্ত লজ্জা ও গ্লানির পসরা তাদেরই যেন মাথায় নিয়ে সভায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে! তাদের সেই মিনতি-ভরা করুণ দৃষ্টি তার সমস্ত আপত্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শিবদাস সেই ছেলেটির পিঠে হাত দিয়ে বল্লে—আচ্ছা ভাই, তোমরা যখন বলছো, তখন আমি সভাপতি হবো।

শিবদাসকে আর কিছু বলতে হলো না, তারা উচ্ছ্বসিত আনন্দে চীৎকার করে উঠলো—"বন্দে মাতরম্।"

সভাপতি হতে স্বীকৃত হয়েছে শুনে পাহাড়ীরাও আনন্দধ্বনি করে উঠলো। তারপর সবাই মিলে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে গান গাইতে গাইতে ফিরে গেল। সবাই চলে যাবার পর শিবদাস একলা বসে ভাবতে লাগলো—বাবুদের সভাপতি করবার জন্য এদের এত ঝোঁক কেন ?

সেদিন সভা ভেঙে যাওয়ার পর শিবদাস বাড়ীতে এসে দেখলে, রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে একখানা চিঠি ও একটা প্যাকেট এসে পড়ে রয়েছে। সে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে চিঠিখানা পড়তে লাগলো।

—ভাই জামাই বাবু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি আমার ফটো চেয়েছ

কিন্তু আমার কি ফটো আছে? বিয়ের পর তো আর ছবি তোলা হয়নি! বিয়ের পর দিন-সাতেকের মধ্যেই তো তিনি অসুখে পড়েছিলেন, তারপর একমাস যেতে না যেতেই কপাল পুড়লো—সে কথা তো আর তোমার অজানা নেই। বিয়ের আগে বাবা, মা আর দুটি ভাইকে নিয়ে একবার আমরা ফটো তুলিয়েছিলুম, সে ছবিখানা পাঠাচ্ছি, যত্ন করে রেখো। তুমি যেমন ভোলা লোক, হারিয়ে যাওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। এ ছবি আমার আর নেই, আর জানো বোধ হয় যাদের সঙ্গে বসে এই ছবি তুলিয়েছিলুম, তাদের মধ্যে এই হতভাগী ছাড়া আর সকলেই এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আশা করি, ভাল আছ। ইতি বৌঠান।

শিবদাস চিঠি পড়া শেষ করে তাড়াতাড়ি প্যাকেট খানা খুলে ফেল্লে।

সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি পরিবার। কর্ত্তা ও গিন্নি চেয়ারে বসে আছেন, আর সামনে মাটীতে বসে একটি মেয়ে, দু-দিকে দুটি ছোট ছোট ছেলে। ছবি দেখে তার বোধ হলো—মেয়েটি সুন্দরী। সঙ্গে সঙ্গে অমনি মনে পড়লো—বৌঠান বিধবা।

বৌঠানের ছবি দেখতে দেখতে তার বুকের মধ্যে একটা গভীর সহানুভূতি গুমরে গুমরে ফুলে উঠতে লাগলো। ছবিখানা দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, একটি সুখী পরিবার, সবারই মুখে যেন হাসি উছ্‌লে পড়ছে! কিন্তু এ আনন্দের নির্ঝর পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য শুকিয়ে গিয়েছে। বৌঠান লিখেছে যে, সে-ছাড়া আর সকলেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। একমাত্র সে-ই বেঁচে আছে, কিন্তু সেও অর্দ্ধমৃত। শিবদাস বৌঠানের চিঠিখানা আর একবার পড়লে। চিঠির প্রত্যেক কথার ভেতর দিয়ে এমন একটা প্রচ্ছন্ন করুণ রস বয়ে চলেছিল যে পড়তে পড়তে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়লো।

তার ক্ষুব্ধ অন্তর থেকে-থেকে বলে উঠ্‌ছিল বৌঠান, তোমার দুঃখের একটি কণাও যদি আমি নিজে নিতে পারতুম, তাহলে সেইটেই আমার বুকে সব-চেয়ে বড় আনন্দের নিশান হয়ে থাকতো।

সে সজল চোখে একহাতে কুমারী-বৌঠান ও অন্য হাতে বিধবা-বৌঠানের ছবি নিয়ে সারারাত্রি বসে বসেই কাটিয়ে দিলে। অনেকক্ষণ ছবির দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে তার মনে হতে লাগল—এ মুখ তো তার বহুদিনের পরিচিত! এই তো তার মানসী! এই দুঃখ-কষ্টময় সংসারের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে একেই তো সে শতভাবে শতরূপে পূজা করে এসেছে। কল্পনার ভাণ্ডার লুট করে এর জন্যেই সে বিরলে বসে মালা গেঁথেছে। এই তো সেই!

শিবদাসের মুগ্ধ অন্তর সারারাত্রি ছবির সঙ্গে মৌন সম্ভাষণে কাটিয়ে দিলে। ভোরের আলো ছাত-জানলার ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিতেই সে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিলে।

শিবদাসের যখন ঘুম ভাঙলো, তখন চড়্‌চড়ে রোদ উঠে গিয়েছে। সারারাত্রি জেগে তার মাথা ও মন দুই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। মাথাটা ধুয়ে সে বাইরে গিয়ে বসলো। সকাল বেলা আকাশ সেদিন খুব পরিষ্কার। দূরে, বহুদূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণ চূড়া সূর্য্যের কিরণে টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে। শিবদাস পাহাড়ের এ-মূর্ত্তি কখনো দেখেনি, সে অবাক হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলো যে, তার অন্তরের বাসনাগুলো তাদের নিভৃত গুহা ছেড়ে কি পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় রক্ত নিশান উড়িয়ে দিলে? না, মানসীর স্পর্শে কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার স্বপ্ন ছুটে গেল! কখনো বা তার মনে হতে লাগলো যে, ঐ রক্তরাঙা চূড়ার উপরে এখনি তার মানসী এসে দাঁড়াবে, তার প্রভাত-কমলের মত স্নিগ্ধ হাসিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা আবার ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর সে নিয়ে যাবে তাকে সেই নিভৃত পাহাড়ের কোলে! তারপর—

বেলা দুটো তিনটে অবধি শিবদাস মোহাবিষ্টের মত পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়েই কাটিয়ে দিলে।

তার নেপালী চাকর বাবুর রকম-সকম দেখে ভাবছিল—নিশ্চয় বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বিকেল বেলা রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে আর একখানা চিঠি ও একটা প্যাকেট এল। হাতের লেখা

দেখেই শিবদাস বুঝতে পারলে, এ চিঠি কে লিখেছে। সে প্যাকেটখানা রেখে তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলো।

—জামাই বাবু,

ফটো পেয়েছ বোধ হয়। সেখানা পাঠিয়ে আমার এমন লজ্জা করছে, তুমি না জানি আমায় কি ভাব্‌ছো? আজ কাগজে পড়লুম যে, তুমি সেখানে এক সভায় সভাপতি হয়েছিলে। তুমি যে এত সুন্দর বক্তৃতা করতে পার, তা জানতুম না। সত্যি বলছি, খবরটা পড়ে যে আনন্দ পেয়েছি, বহুদিন সে রকম আনন্দ পাই নি। তোমায় একখানা ধুতি ও চাদর পাঠাচ্ছি। আমি হাতে সুতো কেটে এই ধুতি ও চাদর তৈরী করিয়েছি—পোরো। আইন-ভঙ্গ নিয়ে কলকাতায় এখন বড় হাঙ্গামা চলেছে। প্রত্যহ হাজার হাজার লোক জেলে যাচ্ছে। জেলে আর লোক ধরছে না। তোমার চিঠি পাচ্ছি না কেন? বড় ব্যস্ত, বুঝি? চিঠি পাওয়া মাত্র উত্তর দিও। ইতি বৌঠান।

শিবদাস প্যাকেট খুলে দেখলে যে, বৌঠান একখানা খদ্দরের ধুতি ও একখানা লাল চওড়া পাড়ওয়ালা খদ্দরের চাদর পাঠিয়েছে। ধুতি ও চাদর সে তুলে রেখে দিলে।

বিকেল বেলায় লোকে রাস্তা ভরে গিয়েছে। শিবদাস তার বাড়ীর দরজার কাছে চেয়ার নিয়ে গিয়ে রাস্তার লোক-চলাচল দেখতে লাগলো। সেইখানে বসে বসে যখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময় ডেপুটি কমিশনারের চাপরাশি এসে এক মস্ত সেলাম ঠুকে তার হাতে একখানা চিঠি দিলে। ডেপুটি কমিশনার তাকে লিখেছেন,—

প্রিয় রামধন বাবু—

আপনি পরশ্ব তারিখে এখানে সভা করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। আমি শুনলাম যে আগামী কল্য আপনি এক সভায় বক্তৃতা করিবেন। আজ হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত এখানে কোন সভার অনুষ্ঠান করিতে আমি নিষেধ করিতেছি। কোন সভায় বক্তৃতা দিলে কিংবা সভা করিলে তাহার ফলাফলের জন্য আপনি দায়ী থাকিবেন। ইতি ডেপুটী কমিশনার।

চাপরাশি উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, উত্তর নেই শুনে সেলাম করে সে চলে গেল।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে শুতে যাবার আগে শিবদাস বৌঠানকে চিঠি লিখলে,—

—বৌঠান,

তোমার ফটো, তোমার হাতে কাটা সুতোর ধুতি ও চাদর পেয়েছি। এগুলো পেয়ে যে আমার কি আনন্দ হয়েছে, তা তুমি বুঝতে পারবে না। আর একটা বড় উপকার হয়েছে এই—আমার কাছে এতদিন যেটা রহস্যময় বলে বোধ হচ্ছিল, তা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পৃথিবীতে নাই; এই আনন্দের মধ্যে দুঃখ এই যে, তোমার কাছে যেটা নিতান্ত সরল ছিল, সেটা একটা রহস্য হয়ে উঠলো—সে রহস্যের সমাধান হবার উপায় নেই। এই কথাটা যতবার মনে হচ্ছে, আনন্দের শিখা ততবারই নিবে যাচ্ছে। কাল এখানে এক বিরাট সভা হবে। আগেই আমি তাদের সভাপতির কাজ করবো বলে কথা দিয়েছি। আজ সন্ধ্যেবেলা ডেপুটি কমিশনার জানিয়ে দিয়েছেন যে, সভা হতে পারবে না। আমি কি করবো, বোধ হয়, বুঝতে পারছো। যখন তুমি এই চিঠি পাবে, তখন হয়তো আমি জেলের মধ্যে। তোমার ফটোখানা বাঁধাতে দিয়েছি। এই বোধহয় শেষ চিঠি। ইতি—

শিবদাস ইচ্ছা করেই সেদিন চিঠির নীচে 'জামাইবাবু' না লিখে চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিলে।

পরদিন বিকেলে শিবদাস বৌঠানের দেওয়া ধুতি ও চাদর পরে সভায় গেল। সভায় সেদিন বেশী লোক হয়নি। কিন্তু আইন অমান্য করে সভা করলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়, তা দেখবার জন্যে সভাক্ষেত্র থেকে দূরে বিস্তর লোক দাঁড়িয়েছিল। শিবদাস কোনদিকে দৃকপাত না করে আবেগময়ী ভাষায় ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দিয়ে বসে পড়লো। আরও দু-একজনের বক্তৃতা হবার পর সভাভঙ্গ হলো। বাড়ী ফেরবার মুখে ছবিওয়ালার দোকান থেকে বৌঠানের ছবিখানা নিয়ে ফিরছে, এমন সময় পথে তাকে পুলিশের লোক এসে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে আদালতের বিচারে আইন অমান্য করার জন্য তার ছ-মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল। তাকে সেখানে রাখলে পাছে কোন রকম হাঙ্গামা হয়, সেইজন্য সেদিন বিকালেই তাকে কলকাতার জেলে চালান করে দেওয়া হলো।

* * * * *

ছ-মাস পরে একদিন বিকেলে জেলের একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী শিবদাসকে এসে জানালে—বাবু আজ তোমার মুক্তির দিন। সকালেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হতো, কিন্তু বাইরের লোকেরা তোমাকে নিয়ে শোভাযাত্রা করবার বন্দোবস্ত করেছিল বলে তখন তোমাকে ছাড়া হয়নি।

মুক্তি! মুক্তি! ছ-মাসের পর আজ মুক্তি!

মুক্তির সংবাদ পেয়ে তার বুকের মধ্যে রক্ত নেচে উঠলো। জেলের পোষাক ছেড়ে ফেলে নিজের কাপড় পরে বেরোবার সময় জেলের একজন কর্ম্মচারী বৌঠানের ফটোখানা তার হাতে দিয়ে বল্লে—এখানা আপনার, নিয়ে যান্।

জেল থেকে রাস্তায় এসে শিবদাস দেখলে, তখনো বেলা একেবারে পড়ে যায় নি। জেলখানার সামনেই রাস্তার ধারে একখানা বড় মোটরের পাশে একটি তরুণী বিধবা কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, শিবদাস রাস্তায় পা দিতেই তরুণীর উৎকণ্ঠিত চোখ দুটো তার চোখে গিয়ে পড়লো। তরুণীকে দেখেই তার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। তখনি সে বুঝতে পারলে—কে সে—কার অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে। শিবদাস রাস্তা পার হয়ে তরুণীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি রামধন বাবুর জন্যে অপেক্ষা করছেন বোধ হয়? তাঁকে কাল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আপনাকে দেবার জন্যে এই ছবিখানা তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছেন।

ঘাড় তুলে ছবিখানা দিতে গিয়ে সে দেখলে, তরুণী তার দুই চোখে বিশ্বজোড়া বিস্ময় নিয়ে তার চাদরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

শিবদাস দু-হাতে ছবিখানা তুলে ধরে বল্লে—নিন্।

তরুণী দু-খানা ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার হাত থেকে ছবিখানা নিয়ে কি জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে থেমে গেল।

শিবদাস আর কোন দিকে না চেয়ে আস্তে আস্তে তার ভাঙ্গা বাড়ার দিকে পা চালিয়ে দিলে * * * * *

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

সাধ

সিন্ধুর সম ভরি' দিয়ো বুকে বিরামবিহীন গান,
ইন্দুর সম হরি যত কালো আলো যেন করি দান,
কলি সম মোর বহুক্ কলিজা গোপন সুধার গেহ,
অলি সম মোর হউক্ সতত রেণু-মুখা সব স্নেহ।

ভক্তির স্রোতে যাক্ ভাসি মোর শক্তির শত ভীতি,
রূপের গরবী পুড়িয়া হউক্ ধূপের সুরভি নিতি,
শষ্পের মত করিও মৃদুল পুষ্পের মত পূত
আশার মতন করো মনোহর, মনোরথ সম দ্রুত।

গোধূলির প্রায় করিয়ো মানস কোমল আলোকে ঘেরা,
কবির মতন করিও হৃদয় প্রেমে নিখিলের সেরা।
আষাঢ়ের নব বারিধারা প্রায় স্নিগ্ধ করিয়া, প্রিয়,
নয়নের কোণে সোহাগ-বিজলী তরল করিয়া দিয়ো।

আনন্দ মোর হোক্ সহচর, প্রীতি মোর হোক্ সাথী,
তোমারি বীণার ঝঙ্কারে মোর চিত্ত উঠুক্ মাতি',
তোমারি পরশে ফুটুক্ জীবনে অক্ষয় মধুরিমা,
এস তুমি প্রাণে জাগিবে হরষে অমৃত পূরণিমা।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

মিশরের মমি

প্রাচীন মিশরীদের বিশ্বাস ছিল যে মানুষের জীবন অনন্ত। মানুষ মরিয়া গেলে তাহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু সে আত্মা আবার কিছুকাল পরে সেই দেহেই

মৃতদেহ রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীন মিশরে আইন-কানুনেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। মৃত দেহ রাখিবার বাক্স যা তৈয়ার হইত, তাহার ষ্টাইল্ (রচনা-রীতি) ছিল তিন
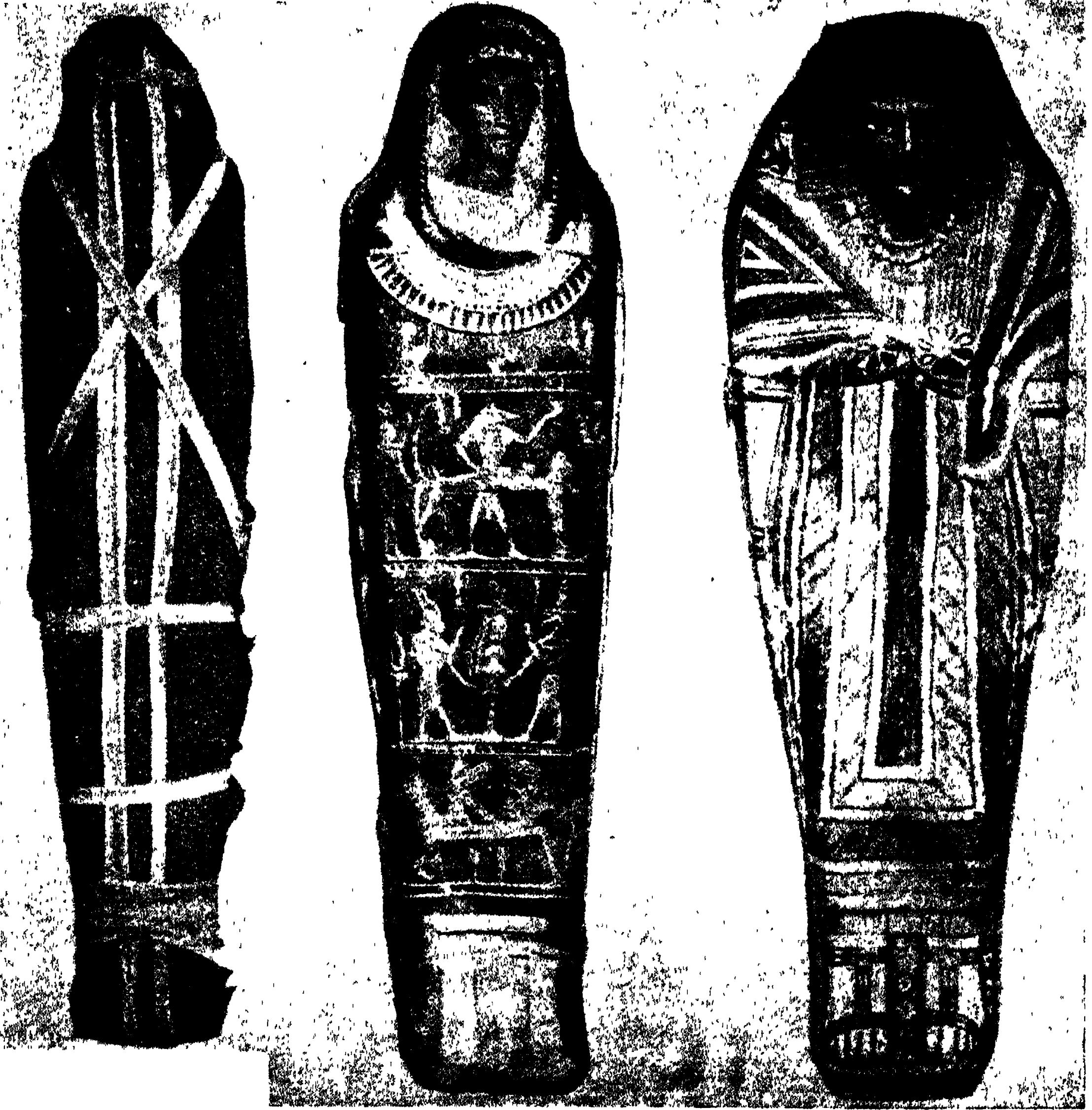
মমি — মমি-পুট — কফিন্

ফিরিয়া আসে। তাই তাহারা মৃত দেহের সৎকার করিত না, যত্নে রাখিয়া দিত। এ বিশ্বাস আজ প্রায় ছ' হাজার বছর ধরিয়া মিশরীদের চিত্ত অধিকার করিয়া আছে।

রকম। সোনা বা রূপার বাক্সেও মৃতদেহ রক্ষিত হইত। এমনি একটি রূপার বাক্সের দাম সেদিন বিলাতে কষিয়া দেখা হইয়াছিল—তাহার দাম, তিন হাজার ছ' শো টাকা।

বাক্সের উপর নক্সার কাজেও চমৎকার কারিগরির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বাক্স তৈয়ার করাইয়া প্রথমে তাহার ভিতরটা শোধন করা হয়। মৃত দেহ যাহাতে বাক্সের মধ্যে পচিয়া না যায়, সেজন্য নানা ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে মৃতের নাকের ছিদ্র দিয়া মস্তিষ্কটাকে বাহির করিয়া ফেলা হয়, পরে শরীর হইতে অন্ত্র প্রভৃতি বাহির করিয়া তালের মদে ভিতরের ফাঁকগুলা ভাল করিয়া ধুইয়া পরে সুগন্ধি আতর ও ধূপধুনার গন্ধ সেই ফাঁকে ভরিয়া দেওয়া হয়। তারপর প্রায় দুইমাস ধরিয়া নেট্রামে মৃতদেহ ডুবাইয়া রাখা হয়; ডুবাইয়া রাখার পর আবার ধোওয়া ও সুগন্ধির প্রলেপ চলে; পরে মৃতদেহের যে-যে স্থান কাটিয়া ধোওয়া ও গন্ধ লেপ করা হয়, সেই সেই জায়গায় সুগন্ধি প্রলেপের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে কোন কোন মৃতদেহে চারশো গজ ব্যাণ্ডেজ পাওয়া গিয়াছে। অন্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যগুলা মৃতদেহ হইতে বাহির করিয়া সুদৃশ্য বড় পাত্রে রাখা হয়।

তাল-মদ ও নেট্রাম ছাড়া মৃতদেহকে দালচিনির তেলেও কখনো কখনো ডুবাইয়া রাখা হয়। তাহার ফলে মৃতদেহের চামড়া ও হাড় কয়খানাই টিঁকিয়া থাকে,—বাকী অংশ গলিয়া যায়। এ-ধরণের কাজে প্রায় ১২০০৲ বারোশো টাকা খরচ পড়ে। যাহারা অত্যন্ত গরিব, তাহারা এত ব্যয় করিতে পারিত না, তাহারা মৃতদেহ মধুতে ডুবাইয়া রাখিত। সম্প্রতি শীল-করা মধুর পাত্রে একটি শিশুর মমিও পাওয়া গিয়াছে।

এখনো যে-সব মমি বহু দীর্ঘ কালের ব্যবধানেও টিঁকিয়া আছে, সেগুলি পাথরের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে, আর তাহাদের বর্ণ হইয়াছে কালো কয়লার মত। অপরগুলি নানা সুগন্ধি ও তৈলে সিক্ত থাকার দরুণ এমন হইয়া গিয়াছে যে ব্যাণ্ডেজ খুলিবামাত্র চূর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়ে। এগুলার মধ্যে অধিকাংশের বর্ণই পীত হইয়া গিয়াছে।

উক্ত উপায়ে মমিকে ধ্বংসের গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া বাক্সে পূরিয়া মিশরীরা তাহাকে কবরে রক্ষা করিত। কবরের জন্য এমন নিরাপদ স্থান খুঁজিত, যেখানে ছিদ্র

মিশরের মৃত্যু-উৎসব
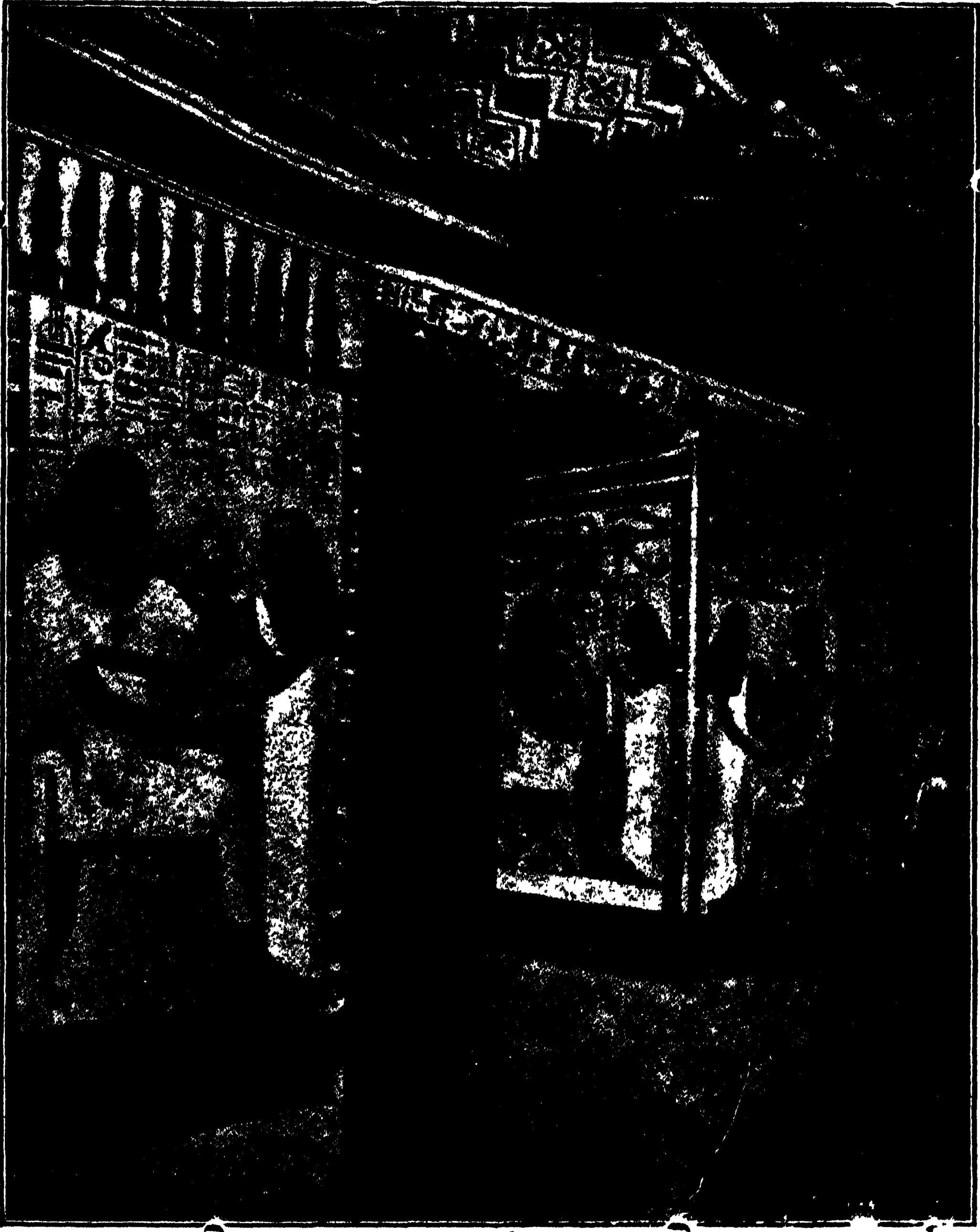
সমাধি মন্দিরের বিচিত্র দেওয়াল

পশু-পক্ষী আসিয়া না তাহা নষ্ট করিতে পারে! এই কবর-ভূমির সজ্জা মৃতের অবস্থার উপর নির্ভর করিত। গরিবের নুনে-জরাণো দেহ হয় বালির নীচে, নয় পাহাড়ের নীচে, নয় এমনি কোন সাধারণ স্থানে কবরিত করা হইত। এখনো পাহাড়ের ধারে সমুদ্রের তীরে কঙ্কালের রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। যাহাদের অবস্থা একটু ভালো, তাহাদের কবরিত করা হইত, ইটে-গাঁথা প্রাচীরে বেষ্টিত ছাদ-ওয়ালা গৃহের মধ্যে; আর যাহারা খুব সম্ভ্রান্ত বা ধনী, তাহাদের কবর দেওয়া হইত রাজকীয় পিরামিডে, নয় ত মস্তবে।

ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কবরের সময় নানা ধুম-ধাম হইত। শোভাযাত্রা, পুরোহিতদের উপাসনা,—এ সবের আর অন্ত থাকিত না। উপাসনার অর্থ এই যে মৃত ব্যক্তির নশ্বর দেহ বা খুট্ অবিনশ্বর সাহুতে রূপান্তরিত হইয়া স্বর্গে দেবতাদের কাছে চলিয়া যাক্! এ উপাসনা সত্ত্বেও

তারপর ক্রমে নানা বিচিত্র নক্সা-করা বাক্সে মিশরীরা মৃতদেহ ভরিয়া তাহা কবরিত না করিয়া নিজেদের গৃহের প্রকাণ্ড কক্ষে তাহা সাজাইয়া রাখিতে লাগিল। এই বাক্সের গায়ে তাহারা মৃতের পরিচয় ও কীর্ত্তি-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে সুরু করিল। শোকে ইহাতে তাহারা আশ্চর্য্য সান্ত্বনা পাইতে লাগিল, অর্থাৎ প্রিয়জন যেন দূরে নাই! ডাকিলে সাড়া দিবে না, কথা কহিবে না বটে, তবু এই একই গৃহে সঙ্গে সঙ্গে রহিল ত! মৃতের ছবি বাক্সের গায়ে আঁকা থাকিত। গর্ডন রিলিফ্ এক্স্‌পিডিশনে মিশরে গিয়া হার্বার্ট ইংগ্রাম নামে একজন ইংরাজ এমনি একটি মমি সাত শো পঞ্চাশ টাকায় খরিদ করিয়া আনেন। এটি এক পুরোহিতের মমি। ইহার গাত্র হইতে লিপিমালার যে পাঠোদ্ধার হয়, তাহা দেখিয়া ভয়ে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে! মমির গায়ে লেখা ছিল,—যে-কেহ এই পুরোহিতের মৃতদেহকে ঠাঁই-নাড়া করিবে বা তাহাকে বিরক্ত করিবে, পুরোহিতের শাপে তাহার ভাগ্যে কবরের জন্য ভূমি মিলিবে না, তাহার অপঘাত-মৃত্যু ঘটিবে, এবং তাহার দেহের অস্থি-পঞ্জর অবধি জলের স্রোতে সমুদ্রে ভাসিবে। এ কথা ইংগ্রাম সাহেব হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে কিন্তু আশ্চর্য্যভাবে এ অভিশাপ ফলিয়াছিল। কিছুকাল পরে ইংগ্রাম সাহেব তাঁহার বন্ধু স্যর হেনরি মিউয়ের সঙ্গে সোমালিল্যাণ্ডে হাতি শিকার করিতে যান। হাতির খবর পাইয়া দুই বন্ধু তখনি বনের দিকে ছুটিলেন। স্যর হেন্‌রি তাড়াতাড়িতে বন্দুক ফেলিয়া আসিয়াছিলেন; ইংগ্রাম বলিলেন, আমার বন্দুক নাও। ইংগ্রাম হাতি-মারা বন্দুক দিয়া নিজে রাখিলেন ছোট একটা বন্দুক। তারপর শিকার লক্ষ্য করিয়া স্যর
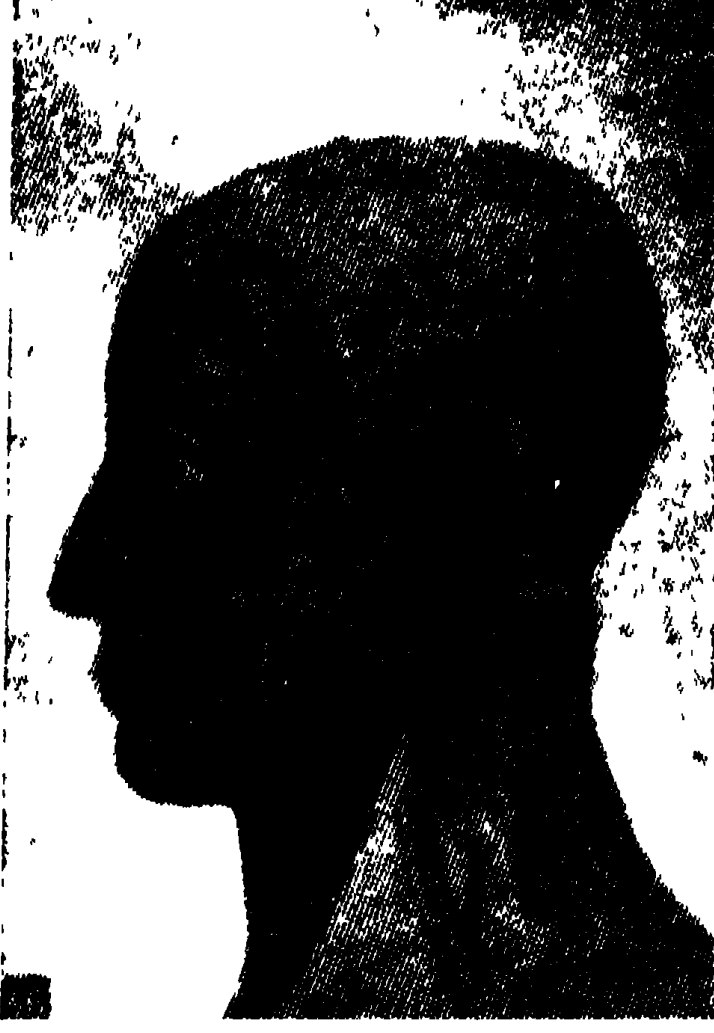
প্লাষ্টারের মুখ
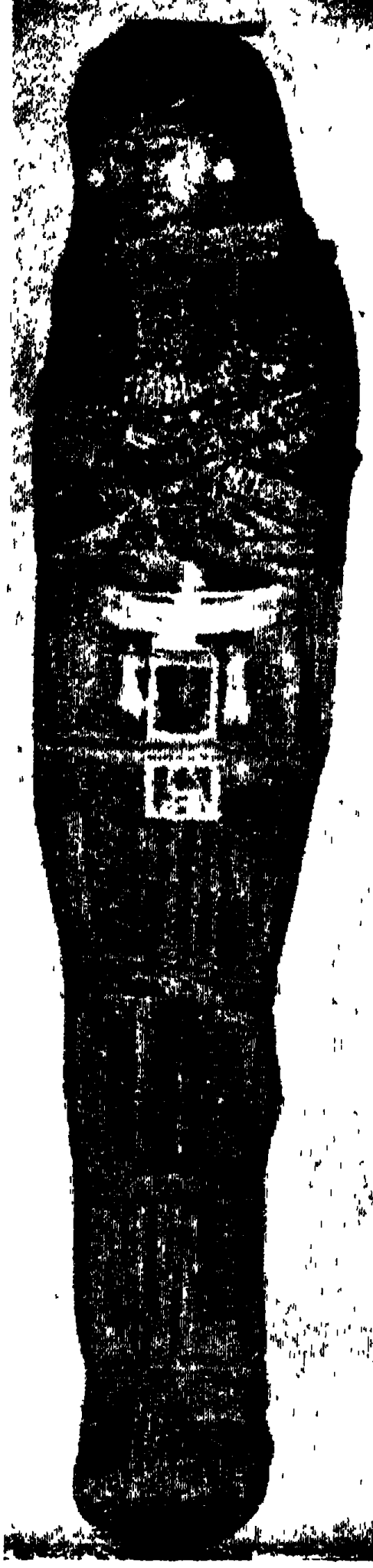
এক পুরোহিতের মমি
(৮০০ খৃ পূর্ব্বাব্দ)
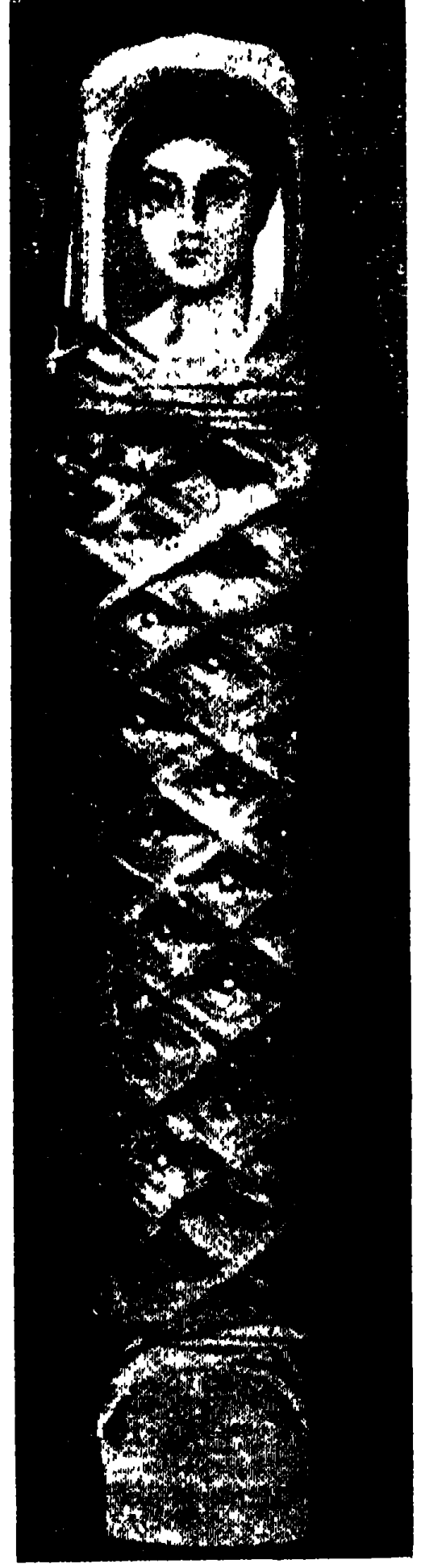
ধনী মহিলার মমি
(৩০৪ খৃষ্টাব্দ)
গায়ে রেশমী বুনানির মধ্যে তব্‌লকী বসানো আছে।

হেনরি বন্দুক ছুড়িলেন, ইংগ্রামও ছুড়িলেন; হাতির গায়ে গুলি লাগিল, হাতি ক্ষেপিয়া উঠিল। ইংগ্রাম যেমনি দ্বিতীয় গুলি ছুড়িবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি ঘোড়াটা হঠাৎ ক্ষেপিয়া ছুট দিল। গাছের ডালে আটকাইয়া ইংগ্রাম পড়িয়া গেলেন, ঘোড়া পলাইল। সাহেবের যেমন মাটীতে পড়া, ক্ষ্যাপা হাতিও অমনি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পা দিয়া দলিয়া পিষিয়া থেঁতো করিয়া সাহেবকে সে মারিয়া ফেলিল;—মারিয়াও ছাড়িল না, শুঁড়ে জড়াইয়া আছাড় দিল। সে সময় একটা পাহাড়ের তলায় কোনোমতে তাঁহার কবর

আমিনরার পুরোহিতনীর মমি-পুট (১৬০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ)

দিয়া শিকারীর দল শিকারে চলিয়া গেল। ফিরিবার সময় তাহারা আসিয়া দেখে, বন্যার জল বাড়িয়া সে মৃতদেহ কোথায় যে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নও নাই! অনেক অনুসন্ধানে ইংগ্রামের পায়ের একপাটী মোজা ও একটুক্‌রা ভাঙ্গা হাড় পাওয়া গেল। এই মোজা ও হাড়ের টুক্‌রা পরে এডেনে আনিয়া কবরিত করা হয়। মমির সে অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়া দলশুদ্ধ সকলে তখন ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিল! এ মমিটি এখনো লেডি মিউয়ের কাছে আছে।

প্রাচীন মিশরীরা মমিকে শেষে সম্পত্তি বলিয়া মনে করিত। বাপ-মার মমি বন্ধক রাখিয়া মিশরীরা টাকা অবধি কর্জ্জ লইত।

তিন-চার শো বৎসর পূর্ব্বে মিশরের মমি য়ুরোপের ডাক্তার-খানায় ঔষধের মত বিক্রয় হইত। মমির টুক্‌রা ঘষিয়া দিলে কাটা ছেঁড়া ঘা নাকি জোড়া লাগিত, আরাম হইত। এখনো চিত্রকরেরা মমি হইতে রঙ্‌ তৈয়ার করেন। এই রঙেরই নাম "মমি ব্রাউন!" মমি গুঁড়াইয়া তাহা জলে মিশাইয়া এই রঙ তৈয়ার হয়।

এখন মমির টুক্‌রা কাগজ-চাপার মত ব্যবহৃত হয়। সম্রাট এডওয়ার্ডের একটি কাগজচাপা ছিল, মমির হাত।

ছবির আমিনরা-মমির খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাহার বাক্সে খোদিত আছে। এই মমিটি ব্রিটিশ মিউজিয়মে এখন সংরক্ষিত আছে।

আমিনরার এই পুরোহিতনীর কাহিনীও ভীষণ। এই পুরোহিতনী মহা-সমৃদ্ধ প্রাচীন থিব্‌সের মন্দিরে বাস করিতেন। মিশরীদের কাছে পুরোহিতনীর সম্ভ্রমের আর সীমা নাই। ১৬০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এই পুরোহিতনীর মৃত্যুর পর ইঁহার মৃতদেহ নানা গন্ধ তৈলে অর্চ্চিত করিয়া কাঠের পুটে পুরিয়া দেওয়া হয় এবং সেই পুট বা বাক্সের উপর নক্সার কাজ করিয়া সেটি মিশরী আচার্য্যদের সমাধি-মন্দিরে কবরিত করা হয়। এই সমাধিগর্ভে এই মমি কত সহস্র বৎসর যে লুকানো ছিল, তার আর সংখ্যা নাই। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে একদল আরব দস্যু এই সমাধি-গৃহের সন্ধান পাইয়া সেখান হইতে ধনরত্ন লুঠ করিয়া আনে, সঙ্গে সঙ্গে এই মমিটিও আধার হইতে অপহৃত হয়। আধারটা ঐখানেই পড়িয়া থাকে। তারপর প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে একদল ইংরাজ নীল নদের দিকে বেড়াইতে গিয়া লক্সারে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে ভূগর্ভে প্রাচীন গৌরব ও সমৃদ্ধিতে মণ্ডিত থিব্‌স্‌ তাঁহারা আবিষ্কার করেন। তারপর এক ইংরাজ মহিলা এই দলকে অভ্যর্থনা করিয়া এক পার্টি দেন। সেখানকার কন্‌সল্‌ মুস্তাফা আগা এক আরবকে এই দলের কাছে পাঠান। আরব আসিয়া সংবাদ দেয়, নদীর ধারে একটা মমি পুট পাওয়া গিয়াছে। সকলে সদলবলে তথায় গিয়া দেখেন,—আধারের গায়ে এক রমণীর মূর্ত্তি খোদিত। রমণী সুন্দরী—কিন্তু মুখে-চোখে কঠিন ভাব। দলের একজন মিঃ ডব্লিউ—এই মমি-পুটটি লইয়া আসেন। তারপর তাঁর নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে।

বলিয়া হাসিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিলেন। তারপর এক ফটোগ্রাফার আধার-পুটের ফটো তুলিতে আসে। ফটো তুলিয়া নেগেটিভ করিবার সময় সে চমকিয়া ওঠে! সে বলে, ছবির মধ্য হইতে এক বিকট-মূর্ত্তি নারী তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ওঠে! তার পর নানালোকের কথায় মহিলাটি এই মমি-পুট ব্রিটিশ মিউজিয়মে পাঠাইয়া দেন।

মিশরের এই মমির ইতিহাস কি যে গভীর রহস্যে ভরা, সহস্র সহস্র শতাব্দীর পর সে রহস্য আমূল আবিষ্কার করা সহজ ব্যাপার নয়। তবু যদি কোনদিন মিশরের পিরামিডের সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হয়, মূক মমি কোনদিন যদি ভাষায় কথা কহিতে পারে, তবে প্রাচীন মিশরের রোমাঞ্চকর কত বিচিত্র কাহিনীই না প্রকাশ হইয়া সমগ্র বিশ্বকে সেদিন স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিবে!

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

প্লাষ্টারের মুখ

প্লাষ্টারের মুখ ও মড়ার মাথা

ফিরিবার পথে মিঃ ডব্লিউর চাকর একদিন বন্দুক সাফ করিতেছিল, হঠাৎ তাহা হইতে গুলি ছিট্‌কাইয়া ডব্লিউয়ের হাতে লাগে। হাত তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিতে হয়। চাকরটাও পরে হঠাৎ একদিন মারা যায়। দলের দু-তিনজন পথ হারাইয়া কোথায় যে গিয়া পড়েন, তাঁহাদের আর কোন খপর মেলে না; দেশেও তাঁরা ফেরেন নাই। আর একজন বন্দুক ফাটিয়া মারা যান্। মিঃ ডব্লিউ মমি-পুটটি লইয়া কায়রো অবধি আসেন—আসিয়া দেখেন, তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর।

পুরোহিতনী শান্তির ব্যাঘাতে দারুণ অপ্রসন্ন হইয়া ছিল! দেশে ফিরিয়া মমি-পুটটি মিঃ ডব্লিউ তাঁর ভগ্নীকে উপহার দেন। অমনি সে ভগ্নীর দারুণ অর্থক্ষতি হয়—দুই-একটা মৃত্যুও বাড়ীতে ঘটিয়া যায়।

মাদাম্ ব্লাভাট্স্কি এই সময় একদিন তাঁহাদের বাড়ীতে আসেন। আসিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলেন, বাড়ীতে কোন 'অশুভ আত্মা'র আবির্ভাব হইয়াছে! পরে মমির কথা শুনিয়া বলেন,—এখনই এটা দূর করিয়া দাও। গৃহকর্ত্রী শুনিলেন না—এটা কুসংস্কার

থিব্‌সের মন্দির

প্রেমের তীর্থযাত্রা

(ফরাসী হইতে)

যখন তাহারা পরস্পরকে ভাল বাসিয়াছিল, তখন তাহাদের সম্মিলিত বয়স চল্লিশ বৎসর মাত্র ছিল। যুবকটি সেই সময় তরুণ-শিল্পের জন্য সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়; আর তরুণীটি সেই সময় কোন এক ধনী পরিবারের মধ্যে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত ছিল। "অলিভি"য়ের প্রেমে আসক্তা "মারিয়েৎ" অলিভিয়েকে ইতালীতে অনুসরণ করিবে স্থির করিল। সেখানে উহারা সঙ্গীর মত, প্রেমিকের মত, বেশ সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল। তিন বৎসর যেন কয়েক ঘণ্টার মত কাটিয়া গেল। তারপর উহাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইল। যৌবনের উদ্দাম ভালবাসার পরিণাম সাধারণত এইরূপই হইয়া থাকে—যে সব মধুর প্রণয়-ব্যাপার জীবন-প্রভাতকে এত মধুময় করে, উহা সেই নশ্বরতারূপ একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন যাহার বশে অতি সুন্দর যে ফুল তাহাও আশু ঝরিয়া পড়ে—অতি রসালো যে ফল তাহাও সদ্য শুকাইয়া যায়। কোন বিবাদ-বিসংবাদ না করিয়া, কোন কটু কথা না বলিয়া, তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইল;—ঠিক সেই সময় যখন তাহারা অনুভব করিল তাহাদের প্রেমের মাত্রা নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছে; উহারা মনে করিল, যে পাত্রটি মধুর সুরভি-নির্য্যাসে পূর্ণ হইয়াছে, সেই পাত্রটি একেবারে খালি না করিয়া তাহার শেষ ফোঁটাটি সযত্নে রক্ষা করা ভাল—তাহা হইলে উহার কিঞ্চিৎ সৌরভও কিছুকাল পরে আঘ্রাণ করা যাইতে পারিবে।

অলিভিয়ে খ্যাতনামা হইল, ধনশালী হইল; পুরুষেরা তাহাকে ঈর্ষা করিতে লাগিল, স্ত্রীলোকেরা তাহার প্রেমে পড়িতে লাগিল। নর-নারী উভয়েই আপন আপন বিশেষ ধরণে তাহার উদয়োন্মুখ খ্যাতির সমীপে স্বকীয় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিল। মারিয়েতেরও উদ্দাম হৃদয় তাহাকে নানাপ্রকার অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন ঘটনার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাকেও অনেকে ভাল বাসিয়াছিল; তাহার মধ্যে একজন তাহাকে বিবাহ করে। অল্পদিনের মধ্যে সে বিধবা হয়। উত্তরাধিকার-সূত্রে সে তাহার মৃত পতির ধন-ঐশ্বর্য্য ও "রাণী" (মার্কীজ্) উপাধি প্রাপ্ত হয়।

এগার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। সেই ছাড়াছাড়ির পর হইতে আর উহাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। অবশেষে ভাগ্যদেবী কোন এক নাচের মজ্‌লিসে উহাদের মিলন ঘটাইয়া দিল। অলিভিয়ে মনে মনে ভাবিতেছে,—"এই সুন্দরী রমণীটি না জানি কে?" যে, পূর্ব্বে তাহার কেশ-কলাপে শুধু একটি সাদা মল্লিকা এবং তাহার বক্ষদেশে একটি ক্ষুদ্র গোলাপগুচ্ছ ধারণ করিত,—সেই তাহার পূর্ব্ব-প্রণয়িনীর সর্ব্বাঙ্গ এখন কিনা রত্নালঙ্কারে ভরা!

আবার মারিয়েৎ মনে মনে ভাবিতেছে;—"এই সুন্দর যুবকটি না জানি কে?" কোথায় যেন উহাকে দেখিয়াছে এইমাত্র অস্পষ্টভাবে তাহার স্মরণ হইতেছে; রং যেন একটু ময়লা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কতকটা তাহারই মত ছুঁচালো দাড়ি, তাহারই মত উপর-তোলা গোঁফ। উহাদের পরস্পর মধ্যে এইবার চোখাচোখি হইল। উভয়েই উভয়কে চিনিল। বৈঠকখানার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উদাসীন জন-তরঙ্গের ব্যবধান ভেদ করিয়া উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিল।—সেই সেকালের মধুর হাসি, যে সময়ে তাহাদের বলিবার একই কথা ছিল, একই কথা অন্তরে জাগিত;—যে সময়ে কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া হাতে হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উহারা চুপ করিয়া মুখামুখী হইয়া বসিয়া থাকিত। হঠাৎ উহাদের চোখের পাতা একটু ভিজিয়া উঠিল; সেকালের সুখের স্মৃতি বিদ্যুৎ-বেগে উহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। হৃদয়ের এক অদৃশ্য দূত যেন উভয়ের স্বাগত বহন করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত করিল। তাহার পর, এক সময়ে যাহাদের শরীর ও মন চুম্বনে চুম্বনে একাকার হইয়া গিয়াছিল, সেই দুই পুরাতন

প্রেমিক-যুগল যেন এক রহস্যময় চুম্বকের আকর্ষণে আবার পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল।

আর্টিষ্ট মার্কিজের দিকে অগ্রসর হইল। মার্কিজও আর্টিষ্টের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মারিয়েৎ হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল; "একি! আবার দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবি নি।"

একটা জনশূন্য কক্ষের পশ্চাৎ-প্রান্তে উহারা আসিয়া বসিল। প্রেমিকের চিরন্তন অভ্যাস ও স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে বিজনতা ও নিস্তব্ধতার অন্বেষণে, উহারা এই ঘরটি বাছিয়া লইয়াছিল। একটা স্থূল প্রদীপ, স্বচ্ছ গোলাপী কাগজে আবৃত, এই প্রসাধন-কক্ষটির মধ্যে সংযত আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল! পার্শ্ববর্ত্তী নৃত্য-শালার বাদ্যোত্থিত তুমুল কলরব, কক্ষের মখ্‌মল পর্দ্দায় বাধা পাইয়া, এবং প্রাচ্যদেশীয় গালিচার সংস্পর্শে একটু মৃদু ভাবাপন্ন হইয়া, সুদূর সঙ্গীতের মত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল; এবং উহাদের ঘনিষ্ঠ প্রেমালাপকে যেন সাদরে একটু দোলা দিয়া উহাদের চিত্ত-সরোজকে বিকসিত করিয়া তুলিতেছিল। হঠাৎ আবার দেখা হওয়ায় উহাদের কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, কিরূপ আবেগে উভয়ের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়াছিল, এই পনের বৎসর কাল উহারা কিরূপভাবে জীবন যাপন করিয়াছে—এই সব কথা আপনাদের মধ্যে বলাবলি হইতে লাগিল। মিথ্যা কথা বলা হেয় মনে করিয়া উহারা কিছুই পরস্পরের নিকট লুকাইল না; পূর্ব্বপ্রণয়ের স্মৃতির মর্য্যাদা যে উহারা ধর্ম্মতঃ রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহা উভয়েই অকপট ভাবে স্বীকার করিল। একটু লঘু পরিহাসের আবরণে এই সব খোলাখুলি কথা ব্যক্ত হইলেও ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে উহাদের মনে শেল-সম বিদ্ধ হইতেছিল। কি আপশোষ,—কি ভ্রান্তি,—হস্তগত সুখ ছাড়িয়া উহারা কিনা দূরে সুখ অন্বেষণ করিতে গেল! নৃত্যশালার ঐকতানবাদ্য হইতে প্রাচ্য দেশীয় ফুলের তীব্র সৌরভের ন্যায় একটা মন-মাতানিয়া সুর যখন বাজিয়া উঠিল, তখন মারিয়েৎ দেখিল, তাহার পূর্ব্ব-প্রণয়ীর গভীর দৃষ্টি তাহার উপর স্থিরভাবে নিপতিত;—সেই দৃষ্টিতে সেই পূর্ব্বকালের প্রেমানল যেন হঠাৎ আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই স্নেহ-মাখা আদরের দৃষ্টি, সেই অনুনয়ের কোমল দৃষ্টি দেখিয়া মারিয়েতের হৃদয় স্পন্দিত হইল—তাহার গণ্ডস্থল লজ্জায় রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। অলিভিয়ে মারিয়েতের দিকে একটু ঝুঁকিয়া একটু কম্পিতকণ্ঠে গদগদস্বরে কি কতকগুলি কথা বলিল। মারিয়েৎ বলিল;—"তুমি তবে আমাদের উপন্যাসে, আর এক পরিচ্ছেদ যোগ করে দিতে চাও? আচ্ছা তাই হবে!...কিন্তু একটা সর্ত্তে।—সে সর্ত্তটা এই:—উপন্যাসের যেখানে আমরা ছেড়েছিলাম—সেইখান থেকে আবার নূতন করে আরম্ভ করতে হবে...দেখ অলিভিয়ে, আমরা দুজনে একসঙ্গে এই প্রেমের তীর্থযাত্রায় বাহির হব—তারপর ফিরে এসে আমি তোমার হব—তার আগে নয়!"

রাত্রিটা উজ্জ্বল ও শীতল। আরও সুন্দর দেখিতে হইবে মনে করিয়া রজনী-বালা তাহার দিব্য নাভসিক অলঙ্কারের কোষ হইতে সব রত্নগুলিই বাহির করিয়াছেন। উর্দ্ধগগনে তারাময়া নদীর মত" স্বর্গ-গঙ্গা" বা "ক্ষীর-সিন্ধু" প্রসারিত। কতকগুলি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র স্বকায় বিচিত্র-বর্ণের অনল-শিখা ইতস্তত নিক্ষেপ করিতেছে; মনে হইতেছে যেন চুনি পান্না হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য রত্নরাজি একটা বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাবরণের উপর খচিত। জমাট শিশির রেলগাড়ীর জানলা-শাসির উপর কত প্রকার সূক্ষ্ম চিকনের কাজের নক্সা আঁকিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যাত্রাপথে, এক একটা বড় বৃক্ষ-কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—তুষার-বস্ত্রে আবৃত হইয়া নুইয়া পড়িয়াছে। রেল-গাড়ী ইতালীর এক একটা নগর পার হইয়া চলিয়াছে। এদিকে অলিভিয়ে গাড়ীতে বসিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ইতালী দেশে অবস্থিত তাহার সেই পূর্ব্বপ্রণয়িনীকেই সর্ব্বক্ষণ ভাবিতেছে। আহা! যেখানকার আকাশ চির-নীল, যেখানকার মৃদু শীতঋতু আমাদের মধুর বসন্তের মত, সেই ইতালী দেশে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে! যেখানকার জীবন জ্বালাময়, যেখানে অবিরত প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বন্দ্ব চলিতেছে, যেখানে লোকের ঈর্ষানল সতত উদ্দীপ্ত হয়, যেখানে গতানুগতিক

সাদামাটা প্রেমেই তৃপ্ত থাকিতে হয়, সেই পারীর অধিবাসী অলিভিয়ে, ইতালীতে উপনীত হইয়া আর্টকে, প্রকৃত প্রেমকে আবার নূতন করিয়া জ্বালাইয়া লইবে এই কথা ভাবিয়া তাহার মন উৎফুল্ল হইল। মধুর বিরাম ও একটা দিব্য শান্তির ভাব তাহার মনে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ভাবী সুখের যেন একটা পূর্ব্বাস্বাদ প্রদান করিল।

তুরীন, ফ্লরেন্‌স···মাঠ ময়দান এখনো সবুজ ও ফুলে-ভরা, বাতাস ঝুরঝুর করিয়া সুগন্ধ বহন করিয়া আনিতেছে; আকাশ বেশ স্বচ্ছ; দ্রাক্ষালতা বড় বড় গাছের ডাল জড়াইয়া ধরিয়া, এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বেগ্‌নী-রং-ধরা আঙ্গুরের মালা ঝুলাইয়াছে,—যাহা এক সময় কবি-ভর্জ্জিলের নয়ন মুগ্ধ করিয়াছিল। অলিভিয়ে কেবলি মারিয়েৎকেই ভাবিতেছে। মারিয়েতের সহিত আবার সাক্ষাৎ হওয়ায় পূর্ব্বানুভূতির সমস্ত স্মৃতি তাহার মনে অবার জাগিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকালের সেই সোহাগ-আদরের তীব্র স্মৃতি, সে সুখ না দুঃখ ঠিক্ বলা যায় না—সেই স্মৃতি তীরের মত তাহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিল; সেই পূর্ব্বতন বিস্মৃত চুম্বনের অমৃতরস আস্বাদনের জন্য তার মন আবার হঠাৎ ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সে এখন মারিয়েতের মধ্যে তার পূর্ব্বপ্রণয়িনীকে দেখিবে শুধু নয়—আর এক নূতন রমণীকে যেন আবিষ্কার করিবে, এই ভাবিয়া সে যারপর নাই উৎসুক হইয়া উঠিল।

যখন প্রাতঃকালে রোমে আসিয়া পৌঁছিল তখন গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিল, ষ্টেশনের প্লাটফর্মে তাহার সেই বান্ধবী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অলিভিয়ে বলিল:—"আ! এই যে মারিয়েৎ, তোমাকে আবার আমি পেলাম··মনে হচ্চে যেন সবে কাল আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি—না?"

মারিয়েৎ একটি অপূর্ব্ব মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল:— "এসো আমি তোমাকে নিয়ে যাই···"

উহারা একটা ভাড়াটে গাড়ীতে উঠিয়া একটা বাড়ীর দরজায় আসিয়া পৌঁছিল। আর্টিষ্ট তখনি বাড়ীটা চিনিতে পারিল। উভয়ে তিন-তলার উপরে উঠিল। মারিয়েৎ একটা দ্বার খুলিয়া বলিয়া উঠিল:—

"এই দেখ আমাদের সেই ঘর!" উহা তাহাদের আগেকার কামরা; সমস্ত আসবাব আগেকার মত একই জায়গায় রহিয়াছে; সেই টেবিল, টেবিলের উপর সেই গালিচার টুক্‌রা, দোয়াত উল্টাইয়া যাওয়ায় তাহাতে কালীর দাগ পড়িয়াছে; সেই আরাম-চৌকি; গুল্‌দার কাপড়ের পর্দ্দাযুক্ত একটা বড় পালং···অলিভিয়ে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে সেই আস্‌বাবগুলি দেখিয়া হইল; অন্যের পক্ষে যাহা সাদাসিদা জিনিষ মাত্র, অলিভিয়ের চক্ষে তাহার সহিত যেন একটা প্রেমের কবিত্ব জড়ানো রহিয়াছে। অলিভিয়ে দেখিল, মারিয়েতের হাতে-তোলা গোলাপ, যুঁই, চামেলী—কত ফুল ঘরময় ছড়ানো রহিয়াছে। সেই পূর্ব্বকালে উহারা দু-জনে সামনের এক বাগান-বাড়ীতে গিয়া সেখানকার বাগান হইতে নানাবিধ পুষ্প চয়ন করিত; সুগন্ধী ভায়োলেট্ ফুল মারিয়েৎ তার বক্ষের বসন-ভাজে গুঁজিয়া রাখিত, কেন না, সে জানিত অলিভিয়ে ভায়োলেটের গন্ধ খুব ভালবাসে।

অলিভিয়ে বলিল—

"মারিয়েৎ! এইবার আবার আমরা সুখী হব"... এই বলিয়া মারিয়েৎকে বাহুপাশে বন্ধন করিবার জন্য উদ্যত হইল। মারিয়েৎ তখনি একটু সরিয়া অতি শোভন বিদ্রোহিতার ভাবে উত্তর করিল;—

"না না, না না, অলিভিয়ে;···আমাদের প্রেমতীর্থ যাত্রার এই প্রথম আড্ডা—আজকের রাত্রিটা আমি তোমাকে দিলাম, তার বদলে এই দিনটা আমাকে দেও।"

অলিভিয়ে যখন আবার সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিল, তখন মারিয়েৎ বলিল;—

"আঃ, তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরা সবাই সমান। তোমাদের মনে কোন বাসনার উদয় হলে তোমরা একেবারে অধীর হয়ে পড়, তোমাদের একটুও বিলম্ব সয় না! তোমরা স্থূলেরই উপাসক, তোমরা সুমার্জ্জিত সুকুমার সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করতে পার না। সুখের আস্বাদ যদি ভাল করে পেতে চাও, তাহলে সুখকে অত তাড়াতাড়ি ধরতে যেও না,—একটা কথা না বলে থাকতে পাচ্চনে—আমাকে ক্ষমা করবে। পুরুষ মানুষ তোমরা পেটুক,—ঔদরিক, মার্জ্জিত সূক্ষ্ম রসের রসিক নও।"

অলিভিয়ে বলিল :—

"মারিয়েৎ, তুমি দেখ্‌চি, বসতন্তে একেবারে তত্ত্ববাগীশ হয়ে পড়েছ !"

অতঃপর উহারা প্রফুল্লচিত্তে ঘর হইতে বাহির হইল। মারিয়েৎ তাইবর নদীর ধারে গিয়া সেই আগেকার মত সেখানকার এক খোলা জায়গায় ভোজনের আড্ডায় গিয়া তাহাদের আগেকার সেই প্রিয় খাদ্য-সামগ্রী আহার করিবে বলিয়া প্রস্তাব করিল। এ মৎলবটা অলিভিয়ের খুব ভাল লাগিল। তখনি উহারা একটা খাবার আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইল। আড্ডাটা রাস্তার ধারে পদ-পথের খোলা অলিন্দের উপর। একটা প্রকাণ্ড কমলালেবু গাছের ছায়াতলে একটা টেবিল পাতা; সেই টেবিলের ধারে উহারা বসিল। সেই টেবিলের কাঠের গায় উহাদের নাম ছুরি দিয়া বেণী-পাকানো ভাবে খোদা রহিয়াছে, সন্ তারিখও রহিয়াছে, দেখিল। অলিভিয়ে বলিল :—"এই দেখ !...... এরই মধ্যে ১৭ বৎসর......তোমার মনে আছে মারিয়েৎ সেদিন, আমরা পরস্পরকে কেমন ভালবেসেছিলেম !"

মারিয়েৎ বলিল :—

—"হাঁ তোমার আঁকা ডায়ানার ছবিটা ঠিক সেইদিন শেষ হয়। তোমার সে ছবিটা খুব উৎরে গিয়েছিল। তারপর আমরা পল্লীগ্রামে বেড়াতে গেলেম—মইজ নদী দেখতে গেলেম,—তারপর বেড়িয়ে এসে আবার আমাদের ঘরটিতে ঢুক্‌লেম, সে আর মনে নেই? খুব মনে আছে, আ! সে কি মধুর দিন! আর সে দিনটা কেমন বেশ পরিষ্কার ছিল—না ?"

উহারা দুজনে কয়েক মুহূর্ত্ত একেবারে নিস্তব্ধ—কি যেন একটা চিন্তায় নিমগ্ন। উহাদের মানস-পটের উপর দিয়া কখন বা পুরাতন ফোটোগ্রাফ-ছবির মত সৌর-করতেজে অর্দ্ধ-বিনষ্ট, কখন বা পূর্ণ দিবালোকে আলোকিত সুস্পষ্ট মানস প্রতিবিম্ব সকল চলিয়া যাইতে লাগিল। মাথার উপরে, ঊর্দ্ধে ইতালির সুনীল গগন-গম্বুজ উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নারাঙ্গি নেবুর তমসাচ্ছন্ন পত্র-পল্লবের মধ্যে কীট-পতঙ্গ গুঞ্জন করিতেছে; নেবু ফুলের মধুর মদালস গন্ধে বাতাস ভরপুর। উহাদের পাদদেশে তাইবর নদী তরতর বেগে বহিয়া যাইতেছে। নদীর অপর পারে, "তেভ্তার" সুন্দর মন্দির ও পুরাতন অট্টালিকা সকল যেন নদীর জলে পা ডুবাইয়া আছে। অনেক কীর্ত্তি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষও দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। এই সমস্ত, এই আকাশের কোণটিকে এক অপূর্ব্ব বিষাদময় মাহাত্ম্যে মণ্ডিত করিয়াছে। সেকালে এই স্থানটি উহাদের নিকট বড়ই মনোরম বলিয়া মনে হইত।

মারিয়েৎ উহার বন্ধুর ললাট অঙ্গুলির দ্বারা মৃদু স্পর্শ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল :—

"এই মাথার মধ্যে কি-সব চল্‌চে ? তুমি যে তোমার দাসার পানে অমন করে তাকিয়ে আছ ? দুর্ভাগ্যক্রমে সে কি তার কোন কাজে তোমাকে অসন্তুষ্ট করেছে ?"

অলিভিয়ে প্রথমে একটু ইতস্তত করিল, তাহার পর খপ্ করিয়া বলিয়া উঠিল :

"মেরিয়েৎ, আমি জান্‌তে ইচ্ছা করি, তুমি আমা অপেক্ষা আর কাউকে বেশী ভাল বেসেছ কি না ?"

—"অলিভিয়ে, এমন-কথা আমাকে কি তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার ?—বিশেষত এমন স্থানে !"

—"লক্ষ্মীটি, আমাকে বল্‌তেই হবে !...আমি জান্‌তে চাই..."

"ভারি দুষ্টু, তোমা অপেক্ষা আর কাউকে ভাল বেসেছি তা কি আমি মনে করতেও পারি ?"

—"কিন্তু তুমি যে আমাকে বলেছ !"

—"যদি এখন আমি তা ভুল্‌তে চাই, তা হলে তোমার তা মনে করিয়ে দেবার কি অধিকার আছে বলত গো !"

না জানি কি একটা অসুস্থ কৌতূহল-বশে প্রণোদিত হইয়া—(যাহা কখন কখন আমাদের মানব-অন্তঃকরণের অন্তঃস্তলে জাগিয়া উঠে) অলিভিয়ে জেদ করিয়া ধরিয়া বসিল, একথার উত্তর তাকে দিতেই হবে। মারিয়েতের আর কোন প্রেমিক ছিল কি না, তাহার পূর্ব্ব-প্রণয়িনীর কপোল দেশ তাহার চুম্বন ছাড়া আর কাহারও চুম্বনে রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইয়াছিল কিনা—ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষাও আর কোন প্রবলতর শক্তি আসিয়া যেন মারিয়েতের নিকট

এই কথাটা পাড়িতে অলিভিয়েকে বাধ্য করিল। একথা শুনিতে সে ভয়ও করিতেছিল—আবার না জিজ্ঞাসা করিয়াও থাকিতে পারিতেছিল না।

মারিয়েৎ বলিল—"এযে বিশ্রী কথা; অলিভিয়ে, অলিভিয়ে, তুমি পাগল না হ'লে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে না।"

অলিভিয়ে সাহসে ভর করিয়া বলিল :—

"ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে আমি একথা জিজ্ঞাসা করছিনে মারিয়েৎ।"

মারিয়েৎ বলিল :—

—"ও! তাই নাকি! বেশ সখা, তোমার যখন শুনতে আমোদ হচ্চে, তখন আমার সেদিনের খেয়াল কল্পনার গল্প করা যাক্—আর তোমার সেই সৌভাগ্যের কথা ··কিন্তু এ-সব কথা বল্‌তে এখন কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়।"

এই সময় হঠাৎ অলিভিয়ের মনে একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। অলিভিয়ে স্বীয় মনের আবেগকে দমন করিতে পারে নাই এবং যে রমণী এমন বিশ্বস্তভাবে তার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কাপুরুষের ন্যায় তাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার মনে ব্যথা দিয়াছে মনে করিয়া, সে লজ্জিত হইল।

অলিভিয়ে বলিল :—"মারিয়েৎ, আমাকে ক্ষমা কর—এখন আমি বেশ বুঝ্‌তে পারচি, এরূপ স্থানে - যেখানে আমাদের মধ্যে প্রথম ভালবাসা হয়েছিল—এইরূপ স্থানে আমাদের ভালবাসা ছাড়া অন্য ভালবাসার কথা উত্থাপন করাটাই একটা মহাপাপ!···"

মারিয়েৎ অলিভিয়ের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল; অলিভিয়ে সেই হস্ত চুম্বন করিয়া সাধারণ ভদ্রতার ভাবে প্যারীর থিয়েটার, সঙ্গীত, উপন্যাস প্রভৃতির কথা পাড়িল। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে উহারা স্বকীয় পূর্ব্বার্জ্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে, উত্তরে উভয়কে বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। উহাদের পরস্পরকে যে আবার নূতন করিয়া লাভ করিতে পারিবে না, পরন্তু ছাড়াছাড়ির পর হইতে এই দীর্ঘকালের মধ্যে উহাদের জীবনের নানাবিধ ঘটনা সংঘটিত হইয়া উহাদের অন্তরে যে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, —এই কথা একটু একটু করিয়া উহারা এখন বুঝিতে আরম্ভ করিল। মারিয়েতের মনে হইল, অলিভিয়ে একটু সন্দেহবাদী, একটু ঠাট্টাবাজ হইয়া পড়িয়াছে এবং অতিভোগ-জনিত ভোগসুখে উহার একটু অরুচি জন্মিয়াছে, উহার বিচার-বুদ্ধি ও পরিহাস-বুদ্ধি, উহার অন্তঃকরণের উদার আবেগসমূহের প্রস্রবণকে শুকাইয়া ফেলিয়াছে। পক্ষান্তরে অলিভিয়ের মনে হইল, সেই তখনকার দরিদ্র শিক্ষয়িত্রী, ঘটনাচক্রে প্রভূত ধন-ঐশ্বর্য্যশালিনী মার্কীজ পদে রূপান্তরিত হইবার পর হইতে, উহার নিজস্ব স্বভাব হারাইয়াছে, এখন উহার সেই লজ্জার ভাব নাই, সেই অবুঝ সরলতার ভাব নাই;—যাহাতে করিয়া পূর্ব্বে তাহার মধ্যে যেন একটা চিরকুমারী-সুলভ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত। উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে পরস্পরের মানস-আদর্শ পরস্পরের মানস-পটে যেরূপ মুদ্রিত ছিল, এই দীর্ঘকালের ঘটনাবলী উহাদের উভয়কেই তাহা হইতে অনেকটা তফাৎ করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রাতর্ভোজনের পর মারিয়েৎ ও অলিভিয়ে সহরে বেড়াইতে গেল। সেখানে গিয়া পোপের প্রাসাদে প্রবেশ করিল। কিন্তু রাফায়েল ও মাইকেল এঞ্জেলের হস্ত-চিহ্নিত পুণ্য-মন্দিরে পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়া উহারা যেরূপ ধর্ম্মভাব অনুভব করিত, এক্ষণে সে ধর্ম্মভাব মনে আর জাগরুক না হওয়ায় উহারা আশ্চর্য্য হইল। তাহার পর সেখানকার অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলিও একে একে দেখিল। সেখান হইতে বাহির হইয়া মারিয়েৎ বলিল :—

"ভাল! তুমি যে কিছুই বলচ না?"

—"আমার মুখ থেকে তুমি কি-শুন্‌তে চাও?···তুমি একেবারে শিউরে উঠবে যদি আমি তোমার কাছে কবুল করি যে এ সব আমার কাছে এখন আর তেমন সুন্দর বলে মনে হয় না···"

মারিয়েৎ বলিল :—

—"দেখ, ভারি আশ্চর্য্য—আমারও ঐ-রকম ধারণা হয়েছে—দেখ সখা, আমরা তখন দুজনেই খুব সরল-হৃদয় ছিলাম—এখন আর আমরা তা নই।"

—"তা হতে পারে……"

মারিয়েৎ একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল; তাহার পর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া আবাব বলিতে আরম্ভ করিল :—

"বড়ই দুঃখের বিষয়! সুন্দর দেখে মুগ্ধ না হওয়াটা ভাল নয়…"

প্রথমত উহারা তো পরস্পরের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করিয়াছিল, তাহার পর আবাব আর্ট সম্বন্ধেও এই বিভ্রম উপস্থিত হওয়ায়, উহাদের মনে যে একটা অস্পষ্ট রকমের অসোয়াস্তি আসিয়াছিল, সেই অসোয়াস্তি হইতে উহাদের কষ্ট আরও যেন বাড়িয়া উঠিল।

উহারা একটা ভাড়াটে গাড়ীতে উঠিয়া, Via-appiaর দিকে যাত্রা করিল। সেই সময় দিবাকর পশ্চিম দিগন্তে ঢলিয়া পড়িয়া সেখানকার মর্ম্মর-প্রস্তরময় প্রাচীন সমাধি-মন্দিরগুলিকে উষ্ণ সৌর-করে রঞ্জিত করিয়াছিল, এবং মার্ব্বেল-মণ্ডিত জল-প্রণালীগুলির ছায়াকে অতিরিক্ত পরিমাণে দীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছিল। উহাদের পূর্ব্বেকার প্রেমের দিনে, অলিভিয়ে কখন-কখন সমস্ত দিনের খাটুনির পর, 'পিন্‌সিও' নামক একটা মনোরম স্থানে আসিয়া মারিয়েতের সহিত মিলিত হইত। সেইখানে মারিয়েৎ একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া অলিভিয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিত। তাহার পর দুজনে, নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মাঠ-ময়দানের ভিতর দিয়া চলিয়া, তত্রত্য সুবিস্তৃত কুসুমিত তৃণভূমির একটি সুন্দর বিরল কোণ খুঁজিয়া বাহির করিত। এবং সেইখানে পাশাপাশি বসিয়া, নীরব আনন্দে এই দৃশ্যটির ধ্যানে নিমগ্ন হইত। তাহাদের মনে হইত, এরূপ মহান দৃশ্য বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

পরে, যখন সূর্য্য সাগর-গর্ভে অন্তর্হিত হইত, তখন উহারা পাশাপাশি হইয়া ঐ স্থানের শোভা-সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় পান করিয়া, ধীর গম্ভীরভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। যাত্রাকালে অলিভিয়ে খুব মৃদুস্বরে কতকগুলি পদ্য আবৃত্তি করিত; অথবা 'আপলো', 'ডায়ানা' প্রভৃতি রোমের দেবতাদের কথা বলিত। দেব-দেবীর দীপ্তিময় মূর্ত্তি ও বিচিত্র বর্ণচ্ছটার মোহমদে প্রমত্ত হইয়া, এই সব প্রাচীন প্রতিমা সমূহের মধ্যে উহারা যেন আপনাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া অনুভব করিত। তারপর, ধীরে ধীরে হাত-ধরা-ধরি করিয়া, উর্দ্ধে তারকা-খচিত আকাশের দিকে নেত্রপাত করিয়া, ধাবে ধারে সমাধি-মন্দির—এইরূপ পথ দিয়া উহারা চলিত। উহাদের পদসংস্পর্শে বড় বড় পাষাণ প্রস্তরের উপর প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিত,—সেই সব স্থান যাহা রোমক উপানৎ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মাড়াইয়া চলিত।

কিন্তু ঐদিন যখন উহারা "সিসিলিয়া মাতেল্লার" কবরের নিকট আসিয়া পৌছিল, তখন হঠাৎ মারিয়েৎ বলিয়া উঠিল :—

"দেখ অলিভিয়ে, আমার আর কোন আশা নাই!… এইখানে বেড়িয়ে আমি যে কত সুখী হব মনে করে ছিলাম… এই রোমক পল্লীভূমি এখন আর আমার ভাল লাগে না,—সে দিন ফুরিয়ে গেছে!…"

অলিভিয়ে উত্তর করিল :—

—"আসল কথা হচ্চে, পারীর আশপাশগুলো অন্য রকমে সুন্দর কিনা।"

কিয়দ্দূরে উহারা দেখিল, এক যুবক, ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে কহিতে আসিতেছে। উহাদের সঙ্গেই ৩৷৪টি সুতন্বী রূপসী রমণী। যুবকেরা আর্টিষ্টের দল, উহাদের 'মডেল'দিগের সহিত উহারা বেড়াইতে আসিয়াছে। উহারা হাসিতেছে, 'মডেল' রমণীদিগের সহিত রসিকতা করিতেছে, চিত্র-শালায় প্রচলিত মজার মজার গান গাহিতেছে। একটু পরে, বিংশতি বৎসর বয়স-সুলভ উদ্দাম উল্লাস হঠাৎ উহাদের নির্ব্বাপিত হইল;—শিল্প-কলার আলোচনা, বাজে গল্প-গুজবের স্থান অধিকার করিল। হঠাৎ উহারা গম্ভীর হইয়া উঠিল, এবং দুরন্ত কতকগুলি গিরি-দৃশ্য দেখাইয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিল—"কি সুন্দর!" "কি সুন্দর!" তাহার পর, খুব হাস্য-কোলাহল উঠাইয়া সঙ্গীদিগকে জ্বালাতন করিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে ঠাট্টা মসকরার বিনিময় করিতে লাগিল। যতক্ষণ না উহারা রাস্তার বাঁক ফিরিয়া অন্তর্হিত হইল, ততক্ষণ অলিভিয়ে ও মারিয়েৎ একদৃষ্টিতে উহাদিগকে দেখিতে লাগিল। পরে কোন কথা না বলিয়া, উহারা দুজনে পরস্পরের

মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। ঐ দৃষ্টির অর্থ :—"এক সময় আমরাও ঐ রকম ছিলাম!…আমাদের মধ্যে না জানি কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে!"

রাত্রি সমাগত হইলে, উহারা নিকটস্থ একটা ভোজনাগারে গমন করিল। পূর্ব্বে উহারা কতবার আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্য সঙ্গীদের সহিত এই ভোজনাগারে আসিয়াছে। যে ঘরে বসিয়া পূর্ব্বে উহারা আহার করিত সেই ঘরে আসিয়া আজ আবার আহার করিতে বসিল। নীল জমির উপর, সাদা গোলাপী রঙের ফুল-কাটা সেই ঘরের গালিচার রং জ্বলিয়া গিয়াছে—উহা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

যখন খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, অলিভিয়ে মারিয়েৎকে জিজ্ঞাসা করিল, যে গানটা অলিভিয়ে আগে খুব ভালবাসিত, সেই সেকালের গানটা মারিয়েতের মনে আছে কিনা। মারিয়েৎ ঐ গানটা গাহিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঐ গানের কথাগুলা ও সুর উহাদের কাণে কেমন যেন কৃত্রিম ও বে-সুরো বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। মারিয়েতের গণ্ডদেশ বাহিয়া মোটামোটা অশ্রুর ফোঁটা গড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, অলিভিয়ে বলিল ;—

"তুমি কাঁদচ ?"

মারিয়েৎ বলিল—"ও কিছু না, আমি বেচারা সেই গান-রচয়িতার কথা ভাবছিলুম…" "ঐ গান-রচয়িতা উহাদের একজন প্রিয়তম সঙ্গী, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ফুস্-ফুসের রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।" অলিভিয়ের চোখের পাতা একটু আর্দ্র দেখিয়া, মারিয়েৎ আবার বলিয়া উঠিল—"তুমিও যে কাঁদচ! তোমার আবার হ'ল কি ?"

—"ওদিকে মনোযোগ দিও না, আমিও তার কথা ভাবছি…" কিন্তু উভয়েই মিথ্যা কথা বলিল ; কেন না, বস্তুতঃ উহারা বন্ধু-বিচ্ছেদের জন্য কাঁদিতেছিল না। উহারা আপনাদের দুঃখেই কাঁদিতেছিল। এই সময় উহারা উঠিয়া প্রস্থান করিল। অলিভিয়ে বলিল :—

"আমাদের সেই ঘরটিতে আবার ফিরে যাওয়া যাক্, কি বল ?" একটি কথাও পরস্পরের সঙ্গে বিনিময় না করিয়া, উহারা তাহাদের সেই পুরাতন ঘরটির দিকে চলিতে লাগিল ; ফুলে ভরা সেই ঘরটি, সেই ঘরটি—যেখানে উহাদের মধ্যে ভালবাসার প্রথম সূত্রপাত হয় ; এবং যে ঘরটিতে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে, আবার পূর্ব্বের মত পরস্পরকে ভালবাসিয়া সুখী হইবে বলিয়া মতলব আঁটিয়াছিল। কিন্তু এই সময় একটা সূক্ষ্ম বিষাদের ভাব আসিয়া উহাদের চিত্তে সংগোপনে প্রবেশ করিল। যৌবনকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য, পুরাতন প্রেমকে আবার নবীন করিয়া তুলিবার জন্য উহারা যে প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহা একটা ঘোর নৈরাশ্যে পরিণত হইল ; উহাদের মোহ ছুটিয়া গেল। প্রেম, শিল্প-কলা, বিশ্ব-প্রকৃতি, উহারা স্বয়ং,—সমস্তই এই দারুণ অশুভ ভ্রমণ-পথে—ব্যর্থতা, পরিতাপ ও বিষাদের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই ঘরটির দ্বারদেশে যখন উহারা উপনীত হইল, তখন উহারা পরস্পরের পানে একবার চাহিয়া দেখিল ; প্রত্যেকেই আশা করিয়াছিল, অপরের নেত্রে এমন একটা দীপ্তিচ্ছটা দেখিতে পাইবে, যাহা দেখিয়া উহারা নববলে বলীয়ান হইবে। কিন্তু উহাদের অন্তরের অন্তস্তল যেরূপ নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেইরূপ উহাদের চোখের দৃষ্টিও এক্ষণে বিষাদময়। উহারা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; প্রতি মুহূর্ত্তেই উহারা অনুভব করিতে লাগিল—যেন উহাদের মধ্যে কি-একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়া উহাদিগকে চিরদিনের মত পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। অবশেষে মারিয়েৎ অলিভিয়ের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল :—

"কাল, সখা…আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি!…"

অলিভিয়ে উত্তর করিল :—

"তোমার যা ইচ্ছে ; আমিও, আমিও ক্লান্ত…আসি তবে মারিয়েৎ!…"

—"বিদায় অলিভিয়ে!…" এইটুকু মাত্র কথা হইল। তার পরদিন, অলিভিয়ের বিলম্বে ঘুম ভাঙিল। হোটেলের খানসামা তাহার হাতে একটা পত্র দিল।

এই পত্রখানি মারিয়েৎ লিখিয়াছে :—

"তুমি যখন আমার এই লেখা পাবে, তখন আমি বহুদূরে চলে গিয়েছি…আমাদের পূর্ব্ব-প্রণয়ের কাছে, প্রণয়ের স্মৃতি ছাড়া অন্য জিনিস—স্মৃতির চেয়েও কিছু ভাল

জিনিস আমরা যে চেয়েছিলুম,—এইটিই আমাদের বিষম ভুল হয়েছিল। এস আমরা এখন সেই শুক্‌নো গোলপটিকে পূজার ফুলের মত সযত্নে রক্ষা করি;—আবার যেন উহাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা না করি। যে মারিয়েৎকে তুমি এক সময়ে ভাল বেসেছিলে, আমি এখন সে মারিয়েৎ নেই, আর আমি যে অলিভিয়েকে পূর্ব্বে ভাল বেসেছিলাম তুমিও আর এখন সে অলিভিয়ে নেই। তোমাকেই সাক্ষী মান্‌ছি, ঠিক্‌ কি না বল—আমরা পরস্পরকে খুঁজেছি, কিন্তু পরস্পরকে আর খুঁজে পাই নি! আমরা দুজনেই কি একটা জিনিস হারিয়েছি,—যার অভাব আর কিছুই পূরণ করতে পারচে না:—সেটা হচ্ছে হৃদয়ের সরলতা ও যৌবন। তাই, যে সময়ে আমরা সরল-হৃদয় ছিলাম, আমাদের বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র ছিল, সেই সময়কার মত আবার সুখী হবার জন্য আমরা বৃথা চেষ্টা করেছি।

প্রেম কখনই আবার নূতন ক'রে আরম্ভ করা যায় না।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্যথার দান

আমার গলে পরিয়ে দিলে বরণ-মালা
তার যে জ্বালা
এতখানি
তা কি জানি?

তোমার বুকের রক্ত দিয়ে ফুলগুলি সব রাঙিয়েছিলে
গেঁথেছিলে
আপন হাতে
নিজন রাতে;
এই অভাগায় তাই দিয়ে যে করলে বরণ
ওগো আমার মন-হরণ!
সে যে মরণ
সেই কথাটা জান্‌লে পরে
আমার প্রাণের বরণ-ডালা সেই বেদনায় উঠ্‌ত ভরে'।

বাসি পলাশফুলের মত
ঠোঁট দু'খানি, নয়ন দুটি বারেক তুলে করলে নত,
দেখতে পেলাম মধুর হাসি
সে যে তোমার সর্ব্বনাশী
জীবন-ভরা ব্যথায় ঝরা মন-মাণিকের টুক্‌রোখানি
তা কি জানি?

বিষের সাগর সেঁচে দিলে মাণিক হাতে,
জ্বল্‌ল আমার আঁধার রাতে;
এখন দেখি সেই যে আলো
তা'তেই আমার সব হারালো!

আমার ঘরে
তোমায় যেমন নিইছি সকল শূন্য করে'
কণ্ঠে আমার তোমার হাতের বরণ-মালা
মণির আলা
উজল হয়ে আছে জানি আঁধার মাঝে;
তবু কেন বক্ষে বাজে
মিলন-রাতের এতটুকু হাসির কণা?
দেয় যে জনা,
আনন্দ কি তারি একা?
এমনি লেখা
নেয় যে তাহার ছার কপালে?
বুকে তাহার আগুন জ্বালে
একটি কথা
যা পেয়েছি সে কি শুধু হৃদয়-ভরা নিদয় ব্যথা?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কুমার সিদ্ধার্থের দান

শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত

রঙ্গালয়ের রঙিন আলো

কোনো আর্টের কোনো-কিছুর জ্ঞান যখন হয়নি সেই শিশুকালের একটা সন্ধ্যেবেলা—আমার মনে পড়ে ভূতপূর্ব্ব বেঙ্গল থিয়েটারে অশ্রুমতী নাটকের দর্শকরূপে আমাকে আমার রামলাল চাকর ঠিক ষ্টেজের গোড়ায় বালক-বালিকাদের জন্যে রিজার্ভ-করা একখানা চৌকিতে বসিয়ে দিয়েছিল। সেদিনের কন্‌সার্টের কথাটা আমার কিছুই মনে নেই; বোধ হয় এখনকার চেয়ে কিছু মিঠে ছিল;—নানা বাদ্যযন্ত্রের সুর-বেসুর মিলে একটা ভীষণ ব্যাপার নিশ্চয়ই সেদিন ঘটেনি, তাহলে মনে থাকতো। সেদিনের ড্রপসিন্‌টা দেশী ছিলনা। সাহেবের আঁকা গ্রীক পুরাণের একখানা খুব রংচং দেওয়া—অতএব ছেলে-ভোলানো ছবির দিকে হাঁ-কোরে চেয়ে আছি এমন সময় ড্রপ উঠলো। সেই মুহূর্ত্ত থেকে পঞ্চম অঙ্কে ড্রপ পড়া পর্য্যন্ত সেলিম, প্রতাপ, পৃথ্বীরাজ, অশ্রুমতী, মলিনা, ভীল-সর্দ্দার সবাই মিলে শিশুজগৎ থেকে মনটাকে আমার রোমান্সের একটা স্বপ্নময় জগতে এমন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল যে সে সময় যদি আমার লেখার বিদ্যে থাকতো তো তখনকার বঙ্গদর্শনে এইরকম একটা সমালোচনা ছাপা হয়ে থাকতো—এখনকার নাট্যরসিকদের জন্যে, যথা সেলিমটা অতিরিক্ত মাত্রায় বোকা এবং সেন্টিমেণ্টাল, অশ্রুমতীটা তার প্রেমে পড়ে ভুল করেছে। প্রতাপ সিংহ চলনসই, উদ্দীপনা-পূর্ণ কথাগুলো ওর মুখ থেকে কেড়ে নিলে বাকি কিছুই থাকে না। শক্তসিংহ—একটা দরোয়ান বল্লেই হয়, গাল-পাট্টাই সার; আমি প্রতাপ সিংহ হলে তলোয়ার দিয়ে ওর গালপাট্টা কামিয়ে একগালে চূণ আর একগালে কালি দিয়ে দূর কোরে দিতুম এবং নিজে শক্তসিংহ সেজে একেবারে দিল্লীর বাদশার মাথা কাটতে দৌড়তুম। ভামসা মন্ত্রী—বেশ লোক, কিন্তু ওর মাথার মোগলাই পাগড়িটা না থাকলেই রাজপুত বলে মানাতো; তাছাড়া পাগড়িটাও ছোট এবং সাদা পাটের চুলগুলো বেশ সাদা, বেশ ধরা যায় ছোক্‌রা বুড়ো সেজেছে, ঘাড়ের দিকের কাঁচা চুল একটু-একটু দেখা যাচ্ছিল। ভীলসর্দ্দার একেবারে নির্দ্দোষ,—চমৎকার অভিনয়, চমৎকার ভাব-ভঙ্গী, এমন কি আমাদের অক্ষয় মজুমদারমশায় বলে তাঁকে চেনা গেলেও তিনি যে সত্যিই ভীল এবং উচ্ছেমতীকে নিয়ে খেলতে এসেছেন—তাব সন্দেহ রইলনা। পৃথ্বীরাজ বেশ, বিশেষতঃ কারাগারে পৃথ্বীরাজ, আর মলিনা—সেও চমৎকার! চমৎকার ভাব-ভঙ্গী, বেশ গায়, কেবল আর একটু যদি সুন্দর হতো তো অশ্রুমতীকে ছেড়ে ওকেই সুন্দর বলতেম। অশ্রুমতীর বিশেষত্ব—যখন 'প্রেমের কথা আর বোলোনা' গাইতে-গাইতে সন্ন্যাসিনী সেজে শেষ-দৃশ্যে সে দেখা দিলে, তখন মনে হ'ল এর সবই ভালো তবে একটু বেশি ন্যাকা আর পিন্‌পিনে, আর কেন দু-একবার সে রাজপুতের মেয়ে হয়েও চিনেবাড়ির বার্ণিস-করা রূপোর বক্‌লস্-দেওয়া পম্পসু পোরে বেরিয়ে রসভঙ্গ করে গেল বুঝলেম না! জুতোটা গ্রীন্‌রুমে রেখে এলেই ভালো হতো! জুতোটা মনে পড়িয়ে দেয় ষ্টেজের ছায়া আর মায়ার চেয়ে হাল ফ্যাসানটার টান ও শক্তি কতখানি প্রবল, আরো মনে পড়িয়ে দেয় জুতো-মোজা-দাতাকে অসময়ে।

সেদিনের অশ্রুমতীর জুতোজোড়া যেভাবে আমার শিশুমনের মৌচাকে খোঁচা দিয়েছিল, তেমনি এখন থিয়েটারে গেলেই নানা দিক থেকে নানা বেশ-ভূষার খুঁটিনাটির খোঁচা এসে আমার লাগে,—পার্শি সাড়ি, বিলিতি ব্রেসলেট, মাথার উপর মার্কেটের ফুলের ঝুড়ি, গলায় গোরস্থানে দেবার রিদ্‌ মালা! রাজা-রাজড়ার সাজ—তখনো যে যাত্রার দলের নকল, এখনো প্রায় তাই; তার বদ রং একটুও মেলায় নি এখনো, বরং ইলেকট্রিক আলোয় আরো সুস্পষ্ট রকমে চক্ষের পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। সখের থিয়েটারগুলোর কথা বলবনা। একবার একদল কোনো-এক দৃশ্যে একটা আস্ত সদ্যোজাত মানবক হাজির করেছিল! দুপুর রাতে ছেলের কান্নাটা সব দর্শকই সেদিন এত উপভোগ করেছিল এবং এত হাততালি লাগিয়েছিল যে সারারাত তারি চটাপট আর ছেলে-কাঁদুনীর

দুঃস্বপ্নটা থেকে-থেকে ঘুমের চটক ভাঙিয়ে আমায় বিষম রাগিয়ে তুলেছিল। সখের দলের অনুকূল কি প্রতিকূল কোনো কিছুই লেখার উৎসাহ সেই থেকে আমার কমে গেছে।

সংখ্যায় থিয়েটারগুলো এখন তখনকার চেয়ে অনেক বেড়েছে, এবং আয়ের দিক দিয়েও কত যে বেড়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, কিন্তু নাট্য-শিল্পের দিক দিয়ে এখনকার ষ্টেজ তখনকার চেয়ে যে বেশী এগিয়েছে তা বলা যায় না। তবে জাঁক বেড়েছে, জমক বেড়েছে, নাচ বেড়েছে, চেঁচানো বেড়েছে, আরো কতকগুলো নতুন এবং অদ্ভুত সামিগ্রি বেড়েছে যার ফর্দ্দ দিলে হয়তো আমাদের দর্শকদের মন খুসি হতে পারে। প্রথম হচ্ছে—আগে যে বইগুলো বিশেষভাবে ষ্টেজ করবার জন্যে লেখা হতো সেইগুলোই কেবল প্লে করা সম্ভব ছিল; এখন একটা এমনি অদ্ভুত শক্তি পেয়েছে আমাদের ষ্টেজ যে যাতে কোরে যেমনই বই হোকনা কেন, এমন কি নাটক না হলেও সেটা প্লে করা চলবে আর দর্শকরা সেটা দেখে মনে করবে খুব চমৎকার নাটক দেখলে। আর একটা বেড়েছে—সময়-অসময় যে-সে দৃশ্যে নাচ; এতে কোরে দর্শক যে কত বেড়ে গেছে তার ঠিক নেই! অপিচ পূর্ব্বে থিয়েটারের গান—সুরে তালে দেশের মধ্যে এবং ওস্তাদির মধ্যে বদ্ধ থাকতো, এখন থিয়েটারের গান সুর তাল ইত্যাদির গণ্ডী থেকে এতটা মুক্তিলাভ করেছে যে থিয়েটারের টিকটিকিরও সেটার রস উপভোগ করতে একটুমাত্র কষ্ট হয় না। রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যশিল্পের দিক দিয়ে আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বল্লেম তা সামান্য দর্শকের দিক দিয়েই বল্লেম, কেননা আমি থিয়েটারের অধ্যক্ষ বা অভিনেতা নই, সুতরাং বিশেষজ্ঞের উক্তি বলে উপরের কথাগুলোকে গম্ভীর ভাবে নেবার কারু আবশ্যক নেই, কিন্তু দৃশ্যপট-রচয়িতা পরলোকগত যে অমর বাবুর দুঃস্থ পরিবার-বর্গের সাহায্যের জন্য আজকের এই আয়োজন, তাঁর জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু না জানলেও শিল্পের দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ জানা-শোনা ছিল, সুতরাং এবারের কথাগুলো একটু শ্রবণযোগ্য।

শিল্পের দিক দিয়ে মানুষের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা যা আমরা অনুভব করি সেটা বড় চমৎকার শক্তি ধরে। অমর বাবু কে ছিলেন, তাঁর বংশ-পরিচয় আমি এখনো জানিনে, কিন্তু তিনি মানুষটি কেমন ছিলেন তা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। তিনি দৃশ্যপট রচনা বিষয়ে একজন পাকা আর্টিষ্ট ছিলেন এবং আর্টিষ্ট ছিলেন বলেই তিনি কিছু সঞ্চয় করে যেতে পারেননি। লোকটির সমস্ত চেষ্টা দৃশ্যপট তার নানা কলকৌশল, তার আলো-ছায়া, বর্ণসমন্বয় এবং নানা খুঁটিনাটি নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিল যে সংসারের দিকটা ভাববারই বেচারার সময় হয় নি; এমন কি কিছু পয়সা এবং নাম রেখে না গেলে মাসিক পত্রে তাঁর অকাল-মৃত্যুর খবর বার হবে না, পরিষদে তাঁর স্মৃতি-সভা বসবে না, এমন কি মেয়ের বিয়ে হওয়াও দায়, এ কথাও তাঁর ভাববার অবসরই হয় নি! তাঁর নামটাই অমর ছিল, কিন্তু অমরত্ব পাবার জন্যে উৎকট প্রবৃত্তি তাঁর রক্ত চঞ্চল করতো না। শিল্পের জন্যে তাঁর দেহপাত প্রাণপাত চেষ্টা দেখেছি—আর কিছুর জন্যে নয়। এক-একজন আপনাকে এমন কোরে ঢেকে রাখে যে হঠাৎ তার মধ্যে যে কোনো গুণ আছে তা বোঝাই যায় না। অমরবাবুর সম্বন্ধে এ ভুল আমি করেছিলেম; কিন্তু তাঁর শিল্প—লোকটি যে কতখানি গুণবান তা বুঝিয়ে দিয়ে গেল। সব আর্টিষ্টের মধ্যে দেখা যায় শেখবার এবং নতুন কিছু লাভ করবার এবং যথাসাধ্য তার শিল্পকে বিলিয়ে দিয়ে যাবার একটা বাসনা অত্যন্ত প্রবল, এত প্রবল যে মনে হয় অনেক সময়ে যেন আর্টিষ্ট ছেলে-মানুষি করছে, নয় তো পাগলামি করছে—চলতিকে উল্টে দেবার এবং নতুন থেকে নতুনে ছোটবার পাগলামির তাড়া। এই ত্বরার মধ্যে দিয়ে অমরবাবুর জীবনটা চলেছিল ত্বরিত গতিতে। কমই কাজ তিনি শেষ করেছেন—কিন্তু তাঁর অসমাপ্ত সব কাজের থেকেই দৃশ্য-শিল্পের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছায়া ও স্বপ্ন আমার চোখে পড়েছিল। কিন্তু এখন আর সেটুকু আশা করতে পারিনে, কেন না আর্টিষ্ট পালিয়েছে! ষ্টেজ-ম্যানেজাররা কিন্তু নিশ্চয়ই নিরাশ হননি, কেন না তাঁরা জানেন—রাংতা আর রং দিয়ে দর্শকের চোখ ঠিকরে দিতে পারে এবং মোগল রাজপ্রাসাদে

লুহ ফিলিপের আমলের আস্‌বাব্‌ ঠিকঠিক এঁকে দিতে একটুও আপত্তি করে না কিম্বা মৃত আর্টিষ্টের জীবনের রঙে রাঙানো দৃশ্যপট-গুলোকে ধুয়ে-মুছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে এঁকে দিতেও পটু এমন পটো বাজারে যথেষ্ট। কিন্তু আমি বলছি ষ্টেজ-ম্যানেজার একটি বিষয়ে নিরাশ হবেন— অমরবাবুর কাছ থেকে যেমন, অমন সস্তায় আর তাঁরা কারু কাছে কাজ নিতে পারবেন না। এখন হয় তো যারা আসবে তারাও তেল-রং নয় জল-রং দিয়েই এঁকে চল্‌বে, কিন্তু তাদের পায়ে ও মাথায় তেল এবং খাবারের থালায় জল দুইই বেশি-বেশি চাই। তাই বলি যে মরে গেছে সে মন্ত্র জান্‌তো, আলোর আর্টিষ্ট কিনা, তাই রাম-ধনুকের রং দিয়ে ছেঁড়া নেকড়াকে সে রাজ-সজ্জার রূপ দিতে পার্‌তো; অতি সস্তায় সব আর্টিষ্ট সেটা পারে না।

রঙ্গ-মঞ্চের সামনে দর্শকের মধ্যে আমি ছেলেবেলা থেকে অনেকবার বসেছি এবং বার-দুচ্চার মঞ্চের উপরে উঠেও দেখেছি, তাতে কোরে আমার ধারণা যে নাট্যশালার মধ্যে দুটো আলো আছে—একটা ফুট লাইটের তীক্ষ্ণ আলো, আর-একটা হচ্ছে ম্যাজিক লণ্ঠনের রঙিন আলো। ফুট লাইটের আলোটা নীচের দিকের আলো বা পদতলের আলো এবং রঙিন আলোটা উপর দিক থেকে রামধনুককে ছুঁয়ে এসে পড়ে। যে পদতলের আলোর সেবা করে সে অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিম্নগতি লাভ করতে-করতে শেষ রঙ্গ-পীঠ থেকে পিটের দর্শক-শ্রেণীর চৌকির পায়ের তলায় গিয়ে বিরাম পায়। নাট্য-কলার রহস্য-রঙে বিচিত্র ম্যাজিক লণ্ঠন বা উপরের রঙিন আলোয় যে সাঁতার দিতে পারে সে উর্দ্ধগতি পায়—উত্তমের দিকে উন্নতির দিকে। অমর বাবু সেই রঙিন আলোর স্রোতে আপনাকে নিক্ষেপ করেছিলেন, সুতরাং রঙ্গালয়ের উপরের বক্স ছাড়িয়েও অনেকখানি উপরে তাঁর জায়গা ঠিকই হয়েছিল, আগে জানিনি আজ জানলেম। *　　শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* বাংলা রঙ্গালয়ের সুযোগ্য নাট্যশিল্পী অমরনাথ রায়ের স্মৃতি-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

কান্তকবি রজনীকান্ত*

১৩১৭ সালে শ্রাবণ মাসের ভারতীতে লিখিয়াছিলাম,—স্বদেশীর পুণ্য মন্ত্র যেদিন বাঙলার ঘাট-মাঠ-কুটীর-প্রাসাদ মুখরিত করিয়া তুলিল, বাঙলার কবি সেদিন গাহিয়াছিলেন,—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই,"

"তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত,—
মায়ের ঘরের ঘী-সৈন্ধব মার বাগানের কলার পাত।"

বাঙালীর প্রাণ তখন কাঁপিয়া উঠিল। ঠিক কথা! এমন খাঁটী প্রাণের কথা শাস্ত্রে নাই, কোথাও নাই! প্রাণের সুপ্ত তারে যেন ঘা লাগিল, সংস্বরে তার বাজিয়া উঠিল।...এই প্রাণের গান প্রথম গাহিয়াছিলেন, কবি শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন।

বাঙালী সেই সময় কবি-রজনীকান্তের প্রথম পরিচয় পায়। তারপর কবি যখন অসহ্য রোগ-যাতনায় কাতর, কলিকাতার কটেজ হাসপাতালে, রোগশয্যায়, তখন বাঙালীর কানে কবির বিচিত্র সুরের বিচিত্র গান কি অমৃতই না বর্ষণ করিল। মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া বাঙালীকে সাধনতত্ত্ব, দেশাত্মবোধ ও হাস্য-কৌতুকের যে ধারায় তিনি স্নান করাইলেন, বাঙালী তাহাতে ধন্য হইয়া গেল।

আজ কবির তিরোধানের বারো বৎসর পরে তাঁহার একান্ত-ভক্ত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁহার এই জীবনী-গ্রন্থ লইয়া বাঙালীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রজনীকান্তের গান বাঙালী এখনো ভোলে নাই। বৈঠকে আসরে সঙ্ঘে সভায় মৃত্যু-বাসরে রজনীকান্তের গান এখনো লোকের মুখে-মুখে ফিরিতেছে। রজনীকান্ত বাঙালীর খাঁটী কবি, বাঙলার খাঁটী কবি—বাঙালী এ গ্রন্থে তাহার প্রিয় কবির পরিচয় পাইবে। কবির বাল্যজীবন, কবিত্ব-উন্মেষের উৎস কোথায়, তাহার সন্ধান পাইবেন, কবির মনুষ্যত্বের পরিচয় পাইবেন, সামাজিকতার পরিচয় পাইবেন অর্থাৎ এক কথায় কবির পরিপূর্ণ পরিচয় পাইবেন।

* কান্তকবি রজনীকান্ত। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত। কলিকাতা ৩নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট বেঙ্গল বুক কোম্পানি হইতে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি টাকা।

কবি রজনীকান্ত

১২৭২ সালে ১২ই শ্রাবণ, (২৬এ জুলাই, ১৮৬৫) পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে কবির জন্ম হয়। কবির পিতা ৺গুরুপ্রসাদ সেন সবজজ ছিলেন। বাল্যকালেই রজনীকান্তের কবিত্বশক্তি স্ফুরিত হয়। তাঁহার পিতা একজন সুগায়ক ছিলেন, এবং কবিতা রচনাও করিতেন। রজনীকান্ত বাল্যকালে বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখিতেন এবং কিশোর বয়স হইতেই গান বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি প্রথম গান রচনা করেন।

অবশ্য পনেরো বৎসর বয়সে কবিতা আজ-কাল অনেকেই লেখে,—তাহা প্রায়ই প্রসিদ্ধ কবিতা-সমূহের ভাব-ছন্দ ও ভাষার হুবহু নকল। রজনীকান্ত পনেরো বৎসর বয়সে যে কবিতা রচনা করেন, তাহাতে কাহারো ভাব ভাষার নকল তিনি করেন নাই। তাছাড়া সে-কবিতায় যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা সরল সহজ ; মিলও গরমিল নয়, সরস সতেজ। এইটুকুই বিশেষত্ব।

ইংরাজী ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বি, এল পাশ করিয়া রজনীকান্ত রাজসাহীতে ওকালতি আরম্ভ করেন। তবে ওকালতিতে তাঁহার চিত্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে তিনি দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎ কুমারকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার ফ্যাক্‌সিমিলি হস্তাক্ষর এই গ্রন্থে ব্লক করিয়া ছাপানো হইয়াছে। কবি লিখিয়াছেন,—"কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভাল বাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম ; আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।"

এই পত্রে বঙ্গবাণীর করুণ কাতর দীর্ঘশ্বাস যেন মূর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! আবার কবিতা লিখিতেন বলিয়া রজনীকান্ত নেহাৎ নিরীহ ছিলেন না। ফুল-পেলব স্বাস্থ্য লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। সমবয়স্ক বন্ধুদের মধ্যে তিনি ছিলেন 'চাঁই'—তা কি ফুটবল খেলায়, কি জিম্‌নাষ্টিকে, কি দেশের উন্নতি-সাধনে। ছুটীর সময় ভাঙ্গাবাড়ী গিয়া রজনীকান্ত আহার ও পাঠের সময় ব্যতীত বাকী সময়টুকু পল্লীর উন্নতিকল্পে এবং প্রতিবাসীগণকে আমোদ-আহ্লাদ দিবার জন্য অতিবাহিত করিতেন। কলেজে পড়িবার সময়ই তিনি পাবনা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-সম্মিলনীর সভ্য হইয়া গ্রামের গৃহে গৃহে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য যত্ন করেন। এই স্ত্রী-শিক্ষা-প্রথায় তাঁহার শ্রম সফলও হইয়াছিল।

অভিনয়-কলায় রজনীকান্তের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। রাজসাহী থিয়েটারে তিনি অভিনয় করিতেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকে রাজা, এবং গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গলে' পাগলিনীর ভূমিকা তিনি বিশেষ দক্ষতা-সহকারে অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি থিয়েটারে নিজে গান শিখাইতেন, অভিনয় শিক্ষা দিতেন, রঙ্গমঞ্চ গঠন করিতেন। এ ব্যাপারে তাঁহার উৎসাহ ছিল অদম্য রকমের।

কবিতা লিখিয়া তাহা ছাপাইতে রজনীকান্তের সঙ্কোচ ছিল অত্যন্ত বেশী। গান তিনি মুখে মুখে রচনা করিয়া দিতেন, কিন্তু তাহা সহজে ছাপাইতে চাহিতেন না। ছাপিলেও নাম প্রকাশ করিতেন না। বস্তুতঃ বঙ্গভঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙালী প্রথম রজনীকান্তের প্রতিভার পরিচয় পায়।

১৩১৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নব-গৃহ-প্রবেশ-উৎসবে রজনীকান্ত দুইটি সঙ্গীত রচনা করিয়া সভায় গাহিয়াছিলেন। সে গান শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া আলাপ করেন ও বলেন, 'বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হইয়াছে,—অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আর একটা করুন।" সে গান দুইটী এখানে উদ্ধৃত হইল,—

সৃষ্টির বিশালতা
লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ
　　নীল গগন-গর্ভে ;
তীব্রবেগ, ভীম মূর্ত্তি,
　　ভ্রমিছে মত্ত গর্ব্বে।
কোটী কোটী তীক্ষ্ণ উগ্র
　　অনলপিণ্ড-তারা ;
দৃপ্তনাদে ঝলকে ঝলকে,
　　উগরে অনল-ধারা।
এ বিশাল দৃশ্য, যাঁর
　　প্রকটে শক্তি-বিন্দু ;
নমি সে সর্ব্ব-শক্তিমান্
　　চির-কারণ-সিন্ধু।

সৃষ্টির সূক্ষ্মতা
স্তূপীকৃত গণন-রহিত
　　ধূলি, সিন্ধুকূলে ;
কোটী কীট করিছে বাস,
　　এক সূক্ষ্ম ধূলে।
কীট-দেহ-জনম-মৃত্যু
　　নিমিষে কোটী লক্ষ ;
ভুঞ্জে দুঃখ, হরষ, রোষ,
　　প্রীতি, ভীতি, সখ্য।
এই সূক্ষ্ম-কৌশল, রটে
　　যাঁর জ্ঞান-বিন্দু ;
নমি সে চিরপ্রমাদ-শূন্য
　　চিৎ-স্বরূপ-সিন্ধু!

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রজনীকান্তের কণ্ঠ-নালীতে ক্যান্সার রোগ দেখা দেয়। নানা ঔষধ প্রলেপে যখন কোন ফল হইল না, তখন তিনি ভাদ্র মাসে কলিকাতায় আসিলেন। প্রায় দুই-তিনমাস কলিকাতায় থাকিয়া রজনীকান্ত অবধৌতিক চিকিৎসার জন্য কাশী যাত্রা করেন। এ সময় তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র গ্রন্থস্বত্ব মাত্র অবিক্রীত দুইশত কাপি কেবলমাত্র চারি শত টাকা মূল্যে তিনি বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। তাঁহার রোজ-নামচায় এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"আমার এমন অবস্থা হলো যে আর চিকিৎসা চলে না, তাইতে বড় আদরের জিনিষ বিক্রয় করেছি। হরিশ্চন্দ্র যেমন শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে বিক্রয় করেছিলেন। হাতে টাকা নিয়ে আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল।"

কাশীতে রোগের উপশম হইল না, অত্যন্ত শ্বাসক্লেশ দেখা দিল। তখন মাঘমাসে আবার তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন। ডাক্তার মেজর বার্ড বলিলেন, অস্ত্র-সাহায্যে গলায় ছিদ্র করিয়া রবারের নল বসাইয়া দিতে হইবে ; সেই নলের ভিতর দিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা যাইবে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

রজনীকান্ত তখন হাসপাতালে আসিলেন। গলায় অস্ত্র করা হইল। কবির কণ্ঠ চিরদিনের জন্য মূক হইল, রুদ্ধ হইল। তখন লোকের সঙ্গে যা-কিছু আলাপ-পরিচয় হইত, তাহা লেখনীর সাহায্যে। কণ্ঠরুদ্ধ হইবার পর আটমাস রজনীকান্ত বাঁচিয়াছিলেন। সেই আটমাস খাতায় পেনসিল দিয়া তাঁহার সমস্ত মনোভাব, যাবতীয় বক্তব্য তিনি জানাইয়া গিয়াছেন। তবে সব খাতা পাওয়া যায় নাই। যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিরও সব জায়গায় পাঠোদ্ধার হয় না। খাতায় লিখিত সেই বিবরণ এই জীবনী-গ্রন্থে বিষয়ানুযায়ী নানাভাগে জীবনী-কার বিভাগ করিয়া 'হাসপাতালের রোজনামচা' নামে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই রোজনামচা বঙ্গসাহিত্যে এক অমূল্য সামগ্রী। ইহা ঠিক ডায়েরি নয়, সাল-তারিখ কোথাও লেখা নাই এবং ডায়েরির ধরণেও লেখা নয়। ইহার মধ্যে রজনীকান্তের হাসপাতালে রচিত অনেক গান এবং কবিতাও স্থান পাইয়াছে।

জীবনী-কার এই রোজনামচার বিষয়-ভেদে ভাগ করিয়াছেন,— ১। রসালাপ। ২। নিজের ক্ষুদ্রত্ব-জ্ঞান। ৩। পরিবারবর্গের প্রতি। ৪। কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। ৫। আত্ম-জীবনীর ভূমিকা। ৬। আনন্দ-ময়ীর ভূমিকা। ৭। উইলের খসড়া। ৮। আনন্দবাজার। ৯। ধর্ম্ম বিশ্বাস। ১০। ১১। ঈশ্বরে একান্ত-নির্ভরতা। ১২। শেষ কথা। এই রোজনামচাটুকু পাঠ করিলে কবির হৃদয়ের পুরাপুরি খপর পাওয়া যায়। তাঁহার 'অমৃত' এই রোগশয্যাতেই রচিত হয়।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ হাসপাতালে রজনীকান্তকে দেখিতে গিয়া ভীষণ রোগেও কাব্যসাধনারত রজনীকান্তের শান্ত সৌম্য ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লেখেন,—

"সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংসে স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম।......কণ্ঠ

বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়তেছে, অগ্নি আরো তত-বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে। মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায় তাহা অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সচ্ছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগ-ক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য।......"

কবিবরের পত্রের এই কয় ছত্রে রজনীকান্তের মনুষ্যত্ব ও কবিত্বের যে পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে, শত-শত পৃষ্ঠা ভরিয়া বাক্যের অলঙ্কার সাজাইলেও তাহা ততটা সুস্পষ্ট প্রকাশ করা যাইবে না।

এই রোগশয্যায় তিনি সমস্ত বাঙালী জাতির যে সেবা, যে শ্রদ্ধা, যে সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা কবির জীবনে শ্লাঘ্য, একান্ত কাম্য। দুর্দ্দিনের ব্যথা তাহারই প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়। দেশের যত বড় বড় লোক তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং রজনীকান্তের সহাশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ মনে সকলে ফিরিয়াছিলেন। ২৮ এ ভাদ্র (১৩১৭) মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আটটায় রজনীকান্ত রোগ-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া মুক্তিলাভ করেন।

এই জীবনী-গ্রন্থখানি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে কবির জীবনী-পরিচয়। দ্বিতীয়ভাগে, কবির কাব্যালোচনা। প্রথমভাগ-টুকু লেখকের লেখার গুণে এমন হৃদয়গ্রাহী, এমন মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে যে তন্ময় হইয়া তাহা পড়িতেই হইবে। কবির জীবনী এমনি কৌতূহলে ভরা, এমনি মধুর, আখ্যায়িকার মতই তাহা এমনি সরস। গ্রন্থের ভাষা বেশ সহজ ও সরল, রচনাও প্রাণ-গলানো ভাবে অনুপ্রাণিত। কোথাও একটা উচ্ছ্বাস বা আড়ম্বর নাই। এজন্য জীবনী-কারকে ধন্যবাদ দিই।

একটু গোল বাধিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ লইয়া। কবির কাব্য আলোচনা করিতে হইলে যে শক্তি, যে নিরপেক্ষ অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয়ভাগে তাহার তেমন পরিচয় পাইলাম না। এ বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে কবির হাস্যরসে দখলের আলোচনায়। লেখক এ বিভাগের সুরু হইতেই একেবারে কোমর বাঁধিয়া বাঙালীর সহিত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাঙালীকে তাহার স্মৃতিশক্তি লইয়া কতকগুলা অবান্তর গালি দিয়া তিনি একেবারে ডি-এল রায়ের লাঞ্ছনায় নামিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারডি ও হাসির গান লিখিয়া মহা-অধর্ম্ম করিয়াছেন, এমনি একটা স্বতঃ-সিদ্ধ ভ্রান্ত থিওরি খাড়া করিয়া নলিনীবাবু কয়েকটা বেফাঁস কথাও বলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সঙ্গীত হাসি-তামাসার বিষয় নয়, ব্যঙ্গরঙ্গের বস্তু নয়, ছেলেখেলার জিনিস নয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ হাসির গান লেখেন নাই, একটিও নয়।" কে বলিল, রবীন্দ্রনাথ "ঐ জন্যই" হাসির গান লেখেন নাই। আর রবীন্দ্রনাথ হাসির গান মোটে লেখেন নাই, এ কথাই বা কে বলিল? "যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক, তোমরা সবাই ভালো"—এটা কি হাসির গান নয়? তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের—

"যাও ঠাকুর, চৈতন-চুট্‌কি নিয়া,
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিয়া।"

এটিকেও হাসির গান বলিয়াই আমরা জানি। তারপর প্যারডির সৃষ্টিকর্ত্তাকে লেখক 'বঙ্গ সাহিত্যরসের কালাপাহাড়" বলিয়াছেন। লেখক বলেন, 'প্যারডিকারগণ' হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে গিয়া "ন্যক্কারজনক বিকৃত বীভৎস রসের আমদানী করিয়া গিয়াছেন—সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া সৌন্দর্য্যের স্থানে কদর্য্য কুৎসিতকে স্থানদান করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।" এ সব কথা আমরা মানি না। প্যারডি সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব সাহিত্যে প্রচলিত আছে এবং তাহার স্থান কাব্য-রসিকেরা বেশ উঁচুতেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন প্যারডিতে হাস্যকৌতুক যদি ম্লান হয়, তাহা হইলে সে লেখকের দোষ, প্যারডির নয়। প্যারডিতেও উচ্চাঙ্গের হাস্যরস পাওয়া যায়। বিলাতী বহু প্যারডির উল্লেখ করিতে পারি, যাহা য়ুরোপীয় সাহিত্যে অমর খ্যাতি লাভ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার জন্মভূমি"র যে প্যারডি রচিত হইয়াছে—"আমার কর্ম্মভূমি", তাহা এই ভারতী পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তাহা পড়িয়া এই প্রবন্ধের লেখকের কাছে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলিয়াছিলেন, 'আমার গান ও কবিতার অনুকরণে যে সব প্যারডি রচিত হইয়াছে এটি তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমার ও গানের যে এমন সুন্দর প্যারডি হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমার পূর্ব্বে ছিলনা।" এ কথা, আজ দ্বিজেন্দ্রলাল জীবিত নাই—তবু লেখক হলফ করিয়া বলিতে পারেন। সুতরাং নিজের গানের প্যারডি পড়িয়া যে দ্বিজেন্দ্রলালের "মিষ্ট রস অম্ল হইয়া বমন হইয়া গিয়াছিল"—এ কথা কখনই মানিব না। লেখক রবীন্দ্রনাথের উপর আরো একটা জিনিষ চাপাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্যারডিতে রসের সংহার হয়, তাই রবীন্দ্রনাথ এই রচনায় কখনো হস্তক্ষেপ করেন নাই।" এ সত্য লেখক কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন। একজনের জীবনী লিখিতে গিয়া তাঁহাকে বড় করিয়া তুলিতে হইলে আর-একজনকে গালি না দিলেও বেশ চলে। রবীন্দ্রনাথও প্যারডি লিখিয়াছেন,—

"কতকাল রবে, বল ভারত রে,
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।
দেশে অন্নজলের হলো ঘোর অনটন,
খাও হুইস্কি সোডা আর মুর্গি মটন।"

হাসপাতালে রচনানিরত রজনীকান্ত

এও ত একটা বিখ্যাত গানেরই প্যারডি। রজনীকান্ত রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিজেন্দ্রলাল, উভয়ের প্রতিভাই স্ব-স্ব বিশেষত্বে উজ্জ্বল—তবে একজনের জন্য অপরকে অহেতুক গালি দিতে যাওয়া কেন। অথচ জীবনী-লেখক নিজেই বলিয়াছেন—"রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালকে দেখিয়াই হাসির গান লিখিতে প্রবৃত্ত হন্!" দুইজনে হাসির গানে দুইটি ধারা বহাইয়া গিয়াছেন। একজনের হাসির গানে খাঁটি দেশী সুর, আর একজনের হাসির গানে দেশী-বিলাতীর মিশ্র সুর। দুজনের গানেই বাঙালী মুগ্ধ, দুজনের গানেই বাঙালী হাসিয়াছে। দুজনেরই গানের সুরের তলে যে মর্ম্মভেদী অশ্রুর ফল্গুধারা আছে, তাহাতে বাঙালী কাঁদিয়াছে। দুইজনেই বড়। তবে একজনকে তাঁহার আসন হইতে টানিয়া অনর্থক এ-ভাবে খোঁচা দেওয়া কেন। এইটুকুই এ বইখানির যা-কিছু ত্রুটি। আরো কতকগুলি ঝাঁঝালো খোঁচা আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের উপর। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নন্দলালে'র খ্যাতি গ্রামোফোনের কলের মুখে ছাড়িয়া লেখক তাহাকে খাটো করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ দুশ্চেষ্টা কিন্তু নেহাৎ হাস্যকর। নন্দলালের আদর তাহাতে কমিবে না। গ্রামোফোনের জাঁতা কলে ধরা দিবার পূর্ব্বেই নন্দলালকে দেশের লোক চিনিয়াছিল, জানিয়াছিল—এবং এই যে জানা, এ নন্দলালের নিজের গুণেই। নন্দলালকে চিনাইতে গ্রামোফোনের দরকার হইয়াছিল বলিলে কথাটা সত্য হইবে না। আর গ্রামোফোন ভাঙ্গিয়া ধূলা হইয়া গেলেও বাঙলা সাহিত্যে নন্দলাল চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে—নন্দলাল অমর। কাহারো তীব্র বিষদৃষ্টিতে সে মরিবার ছেলে নয়। তারপর রজনীকান্তের ঔদরিকের পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সন্দেশ' রাখিয়া জীবনী-কারের 'সন্দেশ'কে অহেতুক নিরেস করিবার চেষ্টাও দুশ্চেষ্টা। দ্বিজেন্দ্রলালের সন্দেশের শেষ দুই ছত্রে—

"ওহো না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর,
সন্দেশ থাকে পাড়িয়া,
মনের বাসনা মনে রয়ে যায়,
চোখে বহে যায় ধারিয়া।"

ইহার মধ্যে হাসি-অশ্রুর যে নিটোল গাঁথুনি, তাহাতে যেন মুক্তার ঝালর দুলিতেছে, কারিগরিতে এ একেবারে অপূর্ব্ব। তাহাকে গায়ের জোরে ভাঙ্গা যায় না! এক কথায় সন্দেশে এক রকম হাস্যরস উছলিয়াছে, ঔদরিকের উক্তিতে হাস্যরস অন্য ধরণের।

এই পরিচ্ছেদটুকু পড়িয়া দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, houmur এবং wit কাহাকে বলে, এবং এ দুইয়ে কি প্রভেদ, লেখক তাহার সুস্পষ্ট ধারণা না করিয়াই এ পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন! দ্বিতীয় সংস্করণে এই পরিচ্ছেদটুকু আবার নূতন করিয়া আমরা লিখিতে বলি।

রজনীকান্তের দেশাত্মবোধ ও সাধনতত্ত্বের কবিতা ও গানের রসবোধ লেখক ঠিকই করিয়াছেন, এবং তাহার সরস আলোচনা কালেই হইয়াছে।

'জনপ্রিয় রজনীকান্ত' পরিচ্ছেদটি খাঁটীপ্রাণের সরল অভিব্যক্তি। রজনীকান্তের পূর্ণ পরিচয়টুকু এ পরিচ্ছেদে বেশ দক্ষতার সহিত লেখক দিতে পারিয়াছেন।

এক কথায় হাস্য-রসের আলোচনাটুকু বাদে এ জীবনী-গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে—বাহ্যসম্পদে ও অন্তর সম্পদে সমুজ্জ্বল। Boswellism কোথাও কোথাও আছে ; তা থাকুক, রজনীকান্তের জীবনীর পরিচয়টুকু এমন সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে মনে হয়, শৈশব হইতেই যেন আমরা কবির সহিত মিশিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। লেখার গুণে রজনীকান্তকে পুঁথি রচিত সে-এক-কোন্-কালের কবিমাত্র বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, কবি আমাদের সুখে-দুঃখে নিত্য-সহচর, ফুটবল-জিমন্যাষ্টিকের মাঠে হাস্যমুখ ক্রীড়া সঙ্গী, যৌবনে নানাসংস্কারে রত বান্ধব, আর গানের মজলিসে বৈঠকে কাব্যের আলোচনা-সভায় তিনি গায়ক, কবি, সখা। এই ভাবটুকু জাগাইতে পারা জীবনী-কারের পক্ষে বড় সাধারণ কৃতিত্বের কথা নয়। আর এই ভাব জাগাইতে পারিয়াছেন বলিয়া কবিকে বোঝাও এমন সহজ হইয়াছে যে তিনি আমাদের মনে-প্রাণে স্বজনের মত মিশিয়া পরমাত্মীয় হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এইখানেই নলিনীরঞ্জনের কৃতিত্ব, তাঁহার এ গ্রন্থ রচনার বিশেষত্ব।

গ্রন্থে পনেরোখানি ছবি আছে। বইখানি খুব ভালো কাগজে ঝরঝরে ছাপা। বাঁধাইটুকু চমৎকার। আশা করি, রজনীকান্তের ভক্ত পাঠক, শুধু ভক্ত পাঠক কেন, বাঙালা সাহিত্যের রসিক পাঠক-মাত্রেই এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে অবহেলা করিবেন না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সিমুম *

(Strindberg হইতে অনুবাদিত)

চরিত্র

বিস্ক্রা। আরবী-কুমারী

য়ুসুফ...তাহার প্রণয়ী

গিমার্ড...জুয়েভস্ লেফটেনান্ট

(ঘটনাটী বর্ত্তমান সময়ে আল্‌জীরীয়ায় সংঘটিত হয়।)

সিমুম। কোন 'মারাবুত' বা ধর্ম্ম-মন্দিরের অভ্যন্তর। জীবিতাবস্থায় যে মুসলমান পীর এই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, গৃহতলের মধ্যদেশে তাঁহার প্রস্তর-শবাধার রহিয়াছে। মেঝেতে উপাসনার আসনাদি বিস্তৃত। দক্ষিণ দিকে পশ্চাতে একটী অস্থি-আগার।

পশ্চাতে প্রাচীরের মাঝখানে একটী দ্বারপথ রহিয়াছে। ইহার কপাট বন্ধ ও ইহা যবনিকায় আবৃত ; দ্বারপথের উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বা রাহা রহিয়াছে। গৃহতলের এখানে-সেখানে ছোট ছোট বালু-স্তূপ দৃষ্ট হয়। একস্থানে একত্র একটী অগুরু তরু, তালপত্র ও কতকগুলি 'আলফা' ঘাস নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

প্রথম দৃশ্য

বিস্ক্রার প্রবেশ। তাহার পরিচ্ছদের শিরস্ত্রাণে মস্তকাবৃত থাকায় মুখ-মণ্ডল প্রায় ঢাকা পড়িয়াছে। পিঠে একটী সেতার। কোন একটী আসনে আপনাকে নত-জানু করিয়া, বক্ষোপরি আড়াআড়ি ভাবে হাত রাখিয়া সে প্রার্থনা আরম্ভ করিল। বাহিরে প্রবল বাতাস বহিতেছে।

বিস্ক্রা। লা ইল্লাহা ইল্লা ল্লা !

[য়ুসুফ ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল]

য়ুসুফ। সিমুম আসছে ! ফরাসীটে কোথায় ?

বিস্ক্রা। এখনি সে এখানে আস্‌বে।

য়ুসুফ। সুযোগ পেয়েও তুমি তাকে হত্যা কর নি কেন ?

* ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে যে প্রকার লু প্রবাহিত হয়, উত্তর আফ্রিকা আরব এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে সেইরূপ একপ্রকার উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহাকে সিমুম বলে।

বিক্রা। কারণ তাকে নিজেকেই সে কাজ করতে হবে। আমায় তা করতে হলে আমাদের সমস্ত জাতিটাই ধ্বংস হয়ে যেত। কারণ ফরাসীরা আমাকে রমণী বিক্রারূপে না জানলেও, আমি তাদের কাছে গাইড আলি বলে পরিচিত।

যুসুফ। তাকে নিজেকে সে কাজ কর্ত্তে হবে, তুমি বলছ? কি করে তা হবে?

বিক্রা। তুমি জান না যে সিমুম এই সব সাদা লোকদের মস্তিষ্ক খেজুরের মত শুষ্ক করে দেয়, তার ফলে তারা ভীষণ-ভীষণ স্বপ্ন দেখে, জীবনের উপর বীতস্পৃহ হয়ে ওঠে, আর অসীম অজানার পথে ছুটে পালায়।

যুসুফ। ওরকম হয় শুনেছি বটে, আর গেল যুদ্ধে ছ' জন ফরাসীও যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই নিজেদের জীবন নষ্ট করেছিল। কিন্তু আজ সিমুমে আস্থা করো না, কারণ পাহাড়ে আজ বরফ পড়েছে, আর আধঘণ্টার মধ্যেই হয়ত সর্ব্বত্র ঝড় বয়ে যাবে। বিক্রা, তুমি কি করে ঘৃণা করতে হয়, জানো?

বিক্রা। কি করে ঘৃণা করতে হয় জানি কি না? — আমার ঘৃণা মরুভূমির মত সীমাহীন, সূর্য্যের মত তপ্ত, আর আমার প্রেমের চেয়েও বলবান। আলির হত্যার পর হতে আমার কাছ থেকে অপহৃত প্রত্যেক সুখময় ঘণ্টাটী বিষ-ধারার বিষের ন্যায় আমার ভিতরে সঞ্চিত হয়ে আছে। আর সিমুম যা করতে পারে না, আমি তাও করতে পারি।

যুসুফ। চমৎকার বলেছ, বিক্রা, আর তোমাকেই সে কাজ সমাধা কর্ত্তে হবে। যে দিন প্রথম আমার চোখ তোমায় নিরীক্ষণ করেছিল, সেই দিন থেকে আমার বিদ্বেষ শরৎকালের 'আলফা' ঘাসের মত নিস্তেজ হয়ে আসছে। আমার কাছ থেকে তুমি শক্তি গ্রহণ কর—তুমি আমার ধনুকের তীর হও।

বিক্রা। আমায় আলিঙ্গন কর, যুসুফ, আমায় আলিঙ্গন কর!

যুসুফ। এখানে, এই পবিত্র জনের সম্মুখে নয়;—এখন নয়, পরে, অন্য সময়ে,—যখন তুমি তোমার কাজের পুরস্কার পাবে!

বিক্রা। গর্ব্বিত সেখ! দাম্ভিক পুরুষ!

যুসুফ। হাঁ—যে নারী তার বুকের নীচে আমার সন্ততিবর্গের ভার বহন কর্ব্বে, তাকে সে সম্মানের যোগ্যতা প্রমাণ কর্ত্তে হবে।

বিক্রা। আমি, আমি ভিন্ন আর কেউ যুসুফের সন্ততি-ভার বহন কর্ব্বে না! আমি—বিক্রা—ঘৃণিতা, কুৎসিতা, কিন্তু শক্তিময়ী বিক্রা!

যুসুফ। উত্তম! আমি এখন ঝরণাটার পাশে ঘুমুতে যাচ্ছি।—শ্রেষ্ঠ মারাবুত সিদ্ধিসেখের কাছ থেকে তুমি যে সব গুপ্ত বিদ্যা শিখেছিলে, যেগুলি তুমি তোমার শিশুকাল থেকে হাটে হাটে লোককে দিয়ে এসেছ, আমায় কি তোমায় সে সব বিদ্যা আবার শেখাতে হবে?

বিক্রা। সে সবের আর প্রয়োজন নেই। ভয় দেখিয়ে একটা ফরাসীর—যে কাপুরুষ চোরের মত শত্রুদলে প্রবেশ করে আর নিজের আগে আগে সাদার গুলি পাঠায়—তার জীবন নিতে যে সব কৌশলের প্রয়োজন, আমি তা সব জানি! এমন কি আমার পেটের ভিতর থেকে আওয়াজ বের করবার বিদ্যেও। আর যা আমার কৌশলের বাহিরে, সে কাজ মিহির সম্পন্ন কর্ব্বে, কারণ মিহির যুসুফ আর বিক্রার দিকে!

যুসুফ। মিহির মুসলমানের বন্ধু বটে, কিন্তু তাকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। তুমি হয়ত পুড়ে যেতে পার, বাবা,—আগে এক চুমুক জল খেয়ে নাও, কারণ তোমার হাত দেখছি কুঁকড়ে উঠেছে, আর —

[সে একটী আসন উত্তোলন করিয়া একপ্রকার ভূগর্ভে অবতরণ করিল ও তথা হইতে জলপূর্ণ এক পর্ণ-পাত্র লইয়া উঠিয়া আসিল ও বিক্রার হাতে প্রদান করিল]

বিক্রা। [অধরের নিকট পানাধার তুলিয়া] এরি মধ্যে আমার চোখ দুটো লাল দেখাতে আরম্ভ করেছে—আমার ফুস্‌ফুস্ পুড়ে যাচ্ছে,—আমি শুনছি—আমি শুনছি—দেখ্‌ছ, ধূলোগুলো কি করে ছাতের ভিতর দিয়ে ঝরে পড়ছে—আমার সেতারের তারগুলো টুং টাং কচ্ছে। সিমুম এসেছে! কিন্তু ফরাসীটা আসে নি!

য়ুসুফ। এখানে নেমে এস, বিন্দ্রা; ফরাসীটাকে আপন হাতে মরতে দাও।

বিন্দ্রা। প্রথমে নরক, তারপর মৃত্যু! তুমি ভেবেছ আমি ভয় পেয়ে যাব? [একটী বালু-স্তূপের উপর জল ছিটাইতে লাগিল] আমি বালির উপর জল ছিটিয়ে দেব, যেন এর ভিতর থেকে প্রতিহিংসা গজিয়ে উঠতে পারে! আমি আমার হৃদয় শুকিয়ে ফেলব। প্রতিহিংসা, তুমি জেগে ওঠ! সূর্য্য, তুমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও! বাতাস, তুমি সব টুঁটি টিপে মেরে ফেল!

য়ুসুফ। বেন য়ুসুফের মাতা, তোমায় অভিবাদন কচ্ছি—তুমিই জিঘাংসু য়ুসুফের সন্ততি-ভার বহন কর্ব্বে তুমিই!

[বাতাস প্রবলতর হইতেছে। দ্বারের সম্মুখস্থ পর্দ্দা বাতাসে পত্পত শব্দে দুলিতে লাগিল। একটী লাল আলোক-ছটা কক্ষটীকে প্রভাসিত করিয়া তুলিল কিন্তু পরবর্ত্তী দৃশ্যের সময় ইহা পীত আলোকে পরিবর্ত্তিত হইবে]

বিন্দ্রা। ফরাসীটা আসছে আর সিমুমও এসেছে! যাও!

য়ুসুফ। আধঘণ্টার মধ্যে আবার তুমি আমার দেখা পাবে। [একটী বালু-স্তূপের দিকে দেখাইয়া] ঐ তোমার বালির ঘাড়, নাস্তিকদের নরক বাসের সময় ভগবান স্বয়ং নিরূপণ কর্চ্ছেন।

[ভূগর্ভে অবতরণ করিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্দ্রা। পাণ্ডু-দর্শন গিমার্ডের প্রবেশ; সে হোঁচট খাইয়া পড়িল; তার মন বিপর্য্যস্ত, তার কথার স্বর নিম্ন।

গিমার্ড। সিমুম এখানে! আমার লোকগুলির কি হয়েছে বলে তোমার মনে হয়?

বিন্দ্রা। আমি তাদের পশ্চিম থেকে পূবে নিয়ে গেছলুম।

গিমার্ড। পশ্চিম থেকে পূবে! দেখি! তার মানে সোজা পূবদিকে—আর পশ্চিম! ও, আমায় একটা চেয়ারে বসিয়ে জল এনে দাও!

বিন্দ্রা। [তাহাকে কোন বালু-স্তূপের নিকট লইয়া গিয়া বালির উপর তাহার পা রাখিয়া মেঝেতে শোয়াইল] এখন আরাম পাচ্ছ?

গিমার্ড। [আহাম্মকের ন্যায় তাহার প্রতি তাকাইয়া] আমার গাট যেন মুচড়ে যাচ্ছে। আমার মাথার নীচে কিছু দাও

বিন্দ্রা। [তাহার পদ-নিম্নে আরো বালি স্তূপীকৃত করিয়া] এই যে তোমার একটা মাথার বালিশ হয়েছে।

গিমার্ড। মাথা? কেন, ঐ ত আমার পা—ওদুটো আমার পা নয়?

বিন্দ্রা। নিশ্চয়!

গিমার্ড। আমি তাই ভেবেছিলুম। আমার মাথার নীচে এখন একটা টুল দাও!

বিন্দ্রা। [অগুরু গাছটা টানিয়া গিমার্ডের পায়ের নীচে ঠেলিয়া দিল] এই নাও তোমার টুল।

গিমার্ড। এখন জল!—জল!

বিন্দ্রা। [শূন্য পানাধারটা বালিতে পূর্ণ করিয়া তাহার হাতে দিল] ঠাণ্ডা থাকতে খেয়ে ফেল।

গিমার্ড। [পানাধারে অধর স্পর্শ করিয়া] এ ঠাণ্ডা—তবু আমার তৃষ্ণা নিবৃত্ত হচ্ছে না! এ আমি খেতে পাচ্ছিনে—জল আমার ভাল লাগে না নিয়ে যাও!

বিন্দ্রা। ঐ যে সেই কুকুরটা তোমায় কামড়েছিল—

গিমার্ড। কোন্ কুকুর? আমায় কখনো কোন কুকুরে কামড়ায় নি।

বিন্দ্রা। সিমুম তোমার স্মৃতিটাকে তুবড়ে দিয়েছে—সিমুমের ছল-চাতুরীকে সাবধান! রেবেল-ওয়াদে শেষ শিকারের সময় যে ক্ষ্যাপা গ্রে-হাউণ্ডটা তোমায় কাম্ড়েছিল, তার কথা তোমার মনে নেই?

গিমার্ড। রেবেল-ওয়াদে শিকার? ও ঠিক!—সেটা কি বীবরের রক্তের?

বিন্দ্রা। কুকুরী ছিল।—হাঁ—এই ত মনে পড়েছে। সে তোমায় পায়ের ডিমে কামড়েছিল। তুমি ক্ষতে বেদনা বোধ করছো?

গিমার্ড। [পায়ের ডিম স্পর্শ করিবার জন্য হাত

জড়াইল ও অশুরু বুকে নিজেকে সংবদ্ধ করিল] হাঁ,—তেষ্টা পাচ্ছি !—জল !—জল !

বিক্রা। [বালিপূর্ণ পানাধার প্রদান করিয়া] খাও, খাও !

গিমার্ড। না, আমি পাচ্ছিনে !—ভগবান্‌, ভগবান,—আমায় জলাতঙ্কে পেয়েছে।

বিক্রা। ভয় পেয়ো না। আমি তোমায় আরাম করবো ; সর্ব্বশক্তিশালী সঙ্গীতের সাহায্যে অপদেবতাটাকে তাড়িয়ে দেব। শোনো !

গিমার্ড। [তার স্বরে] আলি ! আলি ! না, সঙ্গীত নয় ; আমি তা সহ্য কর্ত্তে পারিনে ! ওতে আমার কি উপকার হবে ?

বিক্রা। গানে যদি বিশ্বাস-ঘাতক সাপের অপদেবতাটাকে বশে আনতে পারে, তোমার কি মনে হয় না, একটা ক্ষ্যাপা কুকুরের অপদেবতাকেও সে জয় কর্ত্তে পারে ? শোনো। [সে তার-সহযোগে গাহিল] বিক্রা-বিক্রা, বিক্রা-বিক্রা, বিক্রা-বিক্রা ! সিমুম ! সিমুম।

য়ুসুফ। [নিম্ন হইতে অনুরূপ স্বরে।] সিমুম ! সিমুম !

গিমার্ড। কি গান গাচ্ছ তুমি, আলি ?

বিক্রা। আমি কি গান গাচ্ছিলুম ?—দেখ, আমি এখন আমার মুখে একটা তালপাতা পুরব। [দাঁতের মধ্যে এক টুকরা পাতা রাখিল ; গান যেন উপর হইতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়] বিক্রা-বিক্রা, বিক্রা-বিক্রা, বিক্রা-বিক্রা।

য়ুসুফ। [নিম্ন হতে] সিমুম ! সিমুম !

গিমার্ড। এ কি পৈশাচিক ভোজবাজী !

বিক্রা। এখন আমি গান কর্ব্ব !

বিক্রা ও য়ুসুফ [একসঙ্গে] বিক্রা—বিক্রা, বিক্রা—বিক্রা ! সিমুম !

গিমার্ড। [উঠিয়া] ছুটো সুরে গান গাচ্ছ কে তুমি ? শয়তান ! তুমি পুরুষ, না, নারী ? না দুইই ?

বিক্রা। আমি গাইড্ আলি। তোমার ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়ে গেছে, তাই তুমি আমায় চিন্তে পাচ্ছ না ! কিন্তু তুমি যদি এই চোখ আর চিন্তা-কৃত ভেল্কির হাত থেকে বাঁচতে চাও, তা'হলে আমায় বিশ্বাস কর,—আমি যা বলি, বিশ্বাস কর, আমি যা করতে বলি, কর।

গিমার্ড। আমাকে তোমার তা বলতে হবে না, কারণ তুমি যেমন বলেছ, সব জিনিষই তেমনি দেখতে পাচ্ছি।

বিক্রা। দেখছ ত, পৌত্তলিক !

গিমার্ড। আমি ? পৌত্তলিক ?

বিক্রা। হাঁ, তোমার বুকের ভিতরকার প্রতিমাটা বের করে নাও।

[গিমার্ড একটী পদক বাহির করিল]

বিক্রা। এখন একে পা দিয়ে মাড়াও ; তারপরে পরম কারুণিক, পরম কৃপালু একমাত্র ভগবানকে ডাক।

গিমার্ড। [সন্দিগ্ধভাবে] সেণ্ট এডুয়ার্ডকে—আমার পেট্রন সেণ্ট ?

বিক্রা। সে কি তোমায় রক্ষা কর্ত্তে পারে ? পারে কি ?

গিমার্ড। না, সে পারে না ! [জাগিয়া] হাঁ, পারে !

বিক্রা। দেখি !

[দ্বার খুলিল ; পর্দ্দা কাঁপিতে ও গৃহতলস্থ ঘাস নড়িতে লাগিল]

গিমার্ড। [মুখ আবৃত করিয়া] দুয়ার বন্ধ করে দাও।

বিক্রা। প্রতিমাটা ফেলে দাও।

গিমার্ড। না, তা আমি পারি না।

বিক্রা। দেখছ ? সিমুম আমার একগাছি চুলও নাড়াতে পাচ্ছে না, আর নাস্তিক তুমি তাতে মরে যাচ্ছ ! ফেলে দাও প্রতিমাটা !

গিমার্ড। [গৃহতলে পদক নিক্ষেপ করিয়া] জল ! আমি মরে যাচ্ছি !

বিক্রা। সেই পরম কারুণিক, পরম কৃপালু, অদ্বিতীয় জনের পায়ে প্রার্থনা জানাও !

গিমার্ড। কি করে প্রার্থনা কর্ব্ব ?

বিন্ক্রা। আমার সঙ্গে সঙ্গে বল—

গিমার্ড। বল !

বিন্ক্রা। ভগবান অদ্বিতীয়, সেই পরম কারুণিক, পরম কৃপালু তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় ভগবান নেই।

গিমার্ড। ভগবান অদ্বিতীয়। সেই পরম কারুণিক, পরম কৃপালু, তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় ভগবান নেই !

বিন্ক্রা। মেঝেতে শোও।

[গিমার্ড অনিচ্ছা-সত্বেও শয়ন করিল]

বিন্ক্রা। কি শুনছ

গিমার্ড। একটা ঝরণার কুলুরব শুনছি।

বিন্ক্রা। তবেই দেখ ! ভগবান অদ্বিতীয়; সেই পরম কারুণিক, পরম কৃপালু তিনি ভিন্ন অন্য ভগবান নেই !— কি দেখছ ?

গিমার্ড। আমি একটা কুলুরব শুনছি—আমি একটা প্রদীপের আলো দেখতে পাচ্ছি—একটা সবুজ খড়খড়িওলা জানলায়—একটা সাদা রাস্তায়

বিন্ক্রা। জানালায় কে বসে ?

গিমার্ড। আমার স্ত্রী—এলিস !

বিন্ক্রা। বাহুতে তার কণ্ঠ জড়িয়ে পর্দ্দার পিছনে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ?

গিমার্ড। আমার ছেলে জর্জ্জ !

বিন্ক্রা। কত বড় ছেলে তোমার ?

গিমার্ড। সেণ্ট নিকোলাসের দিনে চার বৎসর হবে।

বিন্ক্রা। এর মধ্যে সে বাহুতে একজন পরস্ত্রীর কণ্ঠ জড়িয়ে পর্দ্দার পিছনে দাঁড়াতে পারে ?

গিমার্ড। না, তা সে পারে না—কিন্তু এ সেই-ই !

বিন্ক্রা। চার বছর বয়স বলছ, আর তার সুশ্রী গোঁফ আছে ?

গিমার্ড। সুশ্রী গোঁফ— তুমি বলছ ?— ও, সে—আমার বন্ধু জুলে।

বিন্ক্রা। বাহুতে তোমার স্ত্রীর কণ্ঠ জড়িয়ে পর্দ্দার পিছনে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ?

গিমার্ড। ও ! শয়তান !

বিন্ক্রা। তোমার ছেলেকে দেখছ ?

গিমার্ড। না, আর আমি তাকে দেখছিনে।

বিন্ক্রা। [সেতারে ঘণ্টাধ্বনির অনুকরণ করিল] এখন কি দেখছ ?

গিমার্ড। ঘণ্টা বাজছে, দেখছি—আমি মৃতদেহ খাচ্ছি তাদের গন্ধ আমার মুখে কটু মাখনের মত ঠেকছে ছি !

বিন্ক্রা। একজন পুরোহিত একটা মৃতশিশুর জন্য ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাইছে, শুনতে পাচ্ছনা ?

গিমার্ড। দাঁড়াও !—আমি শুন্‌তে পাচ্ছিনে !— [ব্যাকুলভাবে] তুমি কি চাও যে আমি—এই যে শুন্‌তে পাচ্ছি।

বিন্ক্রা। তারা যে শবাধার নিয়ে যাচ্ছে, তার উপর মালাটা দেখতে পাচ্ছ ?

গিমার্ড। হাঁ—

বিন্ক্রা। ওতে বেগুনি রংয়ের ফিতে রয়েছে—আর রূপোলি জলে লেখা রয়েছে—স্নেহের জর্জ্জ—তোমার পিতার নিকট থেকে চির-বিদায়।

গিমার্ড। হাঁ, তাই বটে ! [কাঁদিতে লাগিল] জর্জ্জ ! ওঃ, জর্জ্জ ! প্রিয় বৎস আমার। এলিস—পত্নী তুমি আমায় সান্ত্বনা দিতে পার না ? ওগো, আমায় রক্ষা কর ! [চারিদিকে হাতড়াইতে লাগিল] এলিস, কোথায় তুমি ? তুমি কি আমায় ছেড়ে চলে গেছ ? উত্তর দাও, তোমার প্রিয়তমের নাম ধরে ডাক !

একটা স্বর। [ছাদ হইতে] জুলে ! জুলে !

গিমার্ড। জুলে ! কিন্তু আমার নাম কি আমার নাম ? চার্লস ! আর সে জুলেকে ডাকছে ? এলিস— প্রিয়তমা পত্নী আমার—উত্তর দাও—কারণ এখানে তোমার আত্মা রয়েছে—আমি তা অনুভব কর্চ্ছি—তুমি ত শপথ করেছিলে, কখনো আর কাউকে ভালবাসবে না !

[স্বরটা হাসিতেছে, শোনা গেল]

গিমার্ড। কে হাস্‌ছে ?

বিন্ক্রা। এলিস তোমার পত্নী।

গিমার্ড। ওঃ! আমায় মেরে ফেল ! আর আমার

বাঁচবার সাধ নেই! সেণ্টডুতে সোন্নার ক্রাউটের ন্যায় জীবন আমাকে বিড়ম্বিত করে তুলেছে!—ঐ, ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে—সেণ্ট ডু কি জান? ঈশ্বর! [থুতু ফেলিবার চেষ্টা করিল] মুখে এক ফোটা লালা নেই!—জল—জল—নাহলে আমি তোমায় কামড়াব।

[বাহিরে বাতাস প্রচণ্ড ঝড়ে পরিণত হইল]

বিক্রা। [মুখে আঙুল দিয়া কাশিল] এখন তুমি মর্ত্তে বসেছ, ফরাসী! সময় থাকৃতে তোমার শেষ ইচ্ছা কি, লিখে রাখ—তোমার নোট-বই কোথায়?

গিমার্ড। [নোট-বহি ও পেন্সিল বাহির করিয়া] কি লিখতে হবে?

বিক্রা। মৃত্যুর সময় লোকে তার স্ত্রী আর পুত্রের কথা ভাবে!

গিমার্ড [লিখিল] এলিস—আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি! সিমুম—আমি মারা যাচ্ছি!

বিক্রা। তারপর স্বাক্ষর কর, তা নাহলে ইচ্ছাপত্র বলে এর কোন মূল্য হবে না।

গিমার্ড। কি স্বাক্ষর কর্ব্ব?

বিক্রা। লেখ:—লা ইল্লাহা ইল্লা ল্লা।

গিমার্ড। [লিখিয়া] লিখেছি এখন আমি মর্ত্তে পাবি কি?

বিক্রা। এখন তুমি মর্ত্তে পাব—স্বীয় পক্ষ-দ্রোহী ভীরু সৈনিকের মত মর্ত্তে পাব। আর আমি নিশ্চয় জানি, শেয়ালদের কাছ থেকে তুমি চমৎকার সমাধি পাবে—তারা তোমার মৃতদেহের উপর অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীত গাইবে। [সেতার আক্রমণের সঙ্কেত-স্বরূপ ঢোল বাদ্য বাজাইল] তুমি ঢাকের আওয়াজ শুনছ?—আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে আস্তিকের দিকে, যাদের পক্ষে সূর্য্য আর সিমুম রয়েছে—তাদের গুপ্তস্থান থেকে—তারা অগ্রসর হচ্ছে (সেতারে ঘর্ ঘর্ শব্দ করিল] ফরাসীরা সমস্ত লাইন জুড়ে বন্দুক দাগছে—তাদের বন্দুক বোঝাই কর্ব্বার সুযোগ নেই—আরবেরা অবসর-ক্রমে গুলি চালাচ্ছে—ফরাসীরা পালাচ্ছে!

গিমার্ড। [উঠিয়া] ফরাসী কখনো পালাতে জানে না!

বিক্রা। ফরাসীরা পলায়নের আদেশ পেলে পালাবে।

[তাহার পরিচ্ছদের তল হইতে ফ্লুট বাহির করিয়া তাহাতে পলায়নের সঙ্কেত বাজাইল]

গিমার্ড। তারা পালাচ্ছে—এই যে সঙ্কেত—আর আমি এখানে—[স্কন্ধাভরণ ছিঁড়িয়া ফেলিল] আমি মরে গেছি! [ভূপতিত হইল]

বিক্রা। হাঁ, তুমি মরে গেছ!—তুমি জাননা যে তুমি অনেকক্ষণ মরে গেছ!

[অস্থি-আগারের দিকে গমন করিয়া তথা হইতে একটী মনুষ্য-করোটী গ্রহণ করিল]

গিমার্ড। আমি কি মরে গেছি?

বিক্রা। অনেকক্ষণ! অনেকক্ষণ!—আর্শীতে নিজেকে দেখ!

[তাহার সম্মুখে করোটী ধরিল]

গিমার্ড। হায়! এই আমি!

বিক্রা। তোমার নিজ গালের উঁচু উঁচু হাড়গুলো দেখতে পাচ্ছনা? শকুন-শকুনিরা যে চোখ উপড়ে নিয়েছে, তা দেখতে পাচ্ছনা? তোমার ডানদিকের চোয়ালের খালি জায়গাটা,—যেখান থেকে তোমার একটা দাঁত উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল,—দেখতে পাচ্ছনা? তোমার চিবুকের গর্ত্তটা দেখতে পাচ্ছনা—যেখানে, এলিস যে দাড়িতে হাত বুলোতে ভালবাস্‌ত, প্রাতরাশের সময় তোমার জর্জ্জ যে কাণে চুমো খেত, তা দেখতে পাচ্ছনা? পলাতকের শিরশ্ছেদের সময়—জল্লাদ ঘাড়ের এইখানে যে তলোয়ার খাড়া করেছিল, তা দেখতে পাচ্ছনা?

[গিমার্ড সুস্পষ্ট ভয়ের সহিত তার অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল ও তার কথা শুনিতেছিল—মরিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল]

বিক্রা। [নতজানু হইয়া তার নাড়ী পরীক্ষা করিল; পরে উঠিয়া গাহিল] সিমুম! সিমুম! [উত্তর দ্বার খুলিয়া গেল; বাতাসে যবনিকা পতাকার মত কাঁপিতে লাগিল; বিক্রা মুখ পর্য্যন্ত হাত দিয়া চীৎকার করিয়া পশ্চাতে পড়িয়া গেল] যুযুক!

তৃতীয় দৃশ্য

বিল্কা। মৃত গিমার্ড। ভূগর্ভ হইতে যুসুফ বাহির হইয়া আসিল।

যুসুফ। [গিমার্ডের দেহ পরীক্ষা করিয়া বিল্কার দিকে চাহিল] বিল্কা! [তাহাকে দেখিতে পাইয়া বাহুতে তুলিয়া লইল] তুমি বেঁচে আছ ?

বিল্কা। ফরাসীটা মরে গেছে ?

যুসুফ। যদি না গিয়ে থাকে, যাবে। সিমুম! সিমুম!

বিল্কা। তবে আমি বেঁচে আছি ? কিন্তু আমায় একটু জল দাও।

যুসুফ। [তাহাকে ভূগর্ভের দিকে লইয়া গেল ; এই নাও, এখানে জল আছে ! এখন যুসুফ তোমার।

বিল্কা। আর যুসুফ, মহান যুসুফ, বিল্কাও তোমার সন্তানের জননী হবে।

যুসুফ। আমার শক্তিময়ী বিল্কা ! সিমুমের চেয়েও শক্তিময়ী ···· যবনিকা

শ্রীপ্রমথনাথ রায়।

ভাষা-বিজ্ঞান-চর্চ্চার ইতিহাস

ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা অতি প্রাচীন, এত প্রাচীন যে ঋগ্বেদীয় অবেস্তা সাহিত্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির সত্তা পরিদৃষ্ট হয়। ররিন্সন ক্রুশো যখন মনুষ্য-সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া নির্জ্জন দ্বীপে বাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে কৃষক, সূত্রধর, কর্ম্মকার, আগ্নেয়াস্ত্র-ব্যবসায়ী ও ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি নানা বর্ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট কার্য্য একাই করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নব-সমাজের উন্নতির জন্য কর্ম্ম-বিভাগ আবশ্যক। চীনদেশে কর্ম্ম-বিভাগের একটা বৈচিত্র্য আছে। যে যাহা জানে সে তাহাই করিবে; অন্য কোন কাজ তাহাকে করিতে হইবে না। ভাত সকলেই খায়—ঘড়ির কাঁটা-ধরা সময়ে তাহারা প্রতি দিন তিনবার ভাত খায়, প্রাতে ৬টা, দ্বিপ্রহরে ১টা ও অপরাহ্ণ ৬টার সময়ে। কিন্তু যে খাইবে সে রন্ধনের চিন্তায় আকুল হইবে না। রন্ধনের ভার সে দেশে অন্ন-ব্যবসায়ী এক শ্রেণীর লোকের উপর। তাহারা ভারে করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া সর্ব্বত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। যাহার যতটুকু অন্ন ও ব্যঞ্জনাদির প্রয়োজন সে সেই অনুপাতে মূল্য দিয়া তাহা খরিদ করে। আপন আপন কর্ম্মস্থলেই সকলে সর্ব্বপ্রকার ভোজ্য-দ্রব্য খরিদ করিতে পায়। সুতরাং পাচক-ব্রাহ্মণের অত্যাচার তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় না। রমণীগণকেও রন্ধন-গৃহের ধূমে সুকুমার দেহের লাবণ্য হারাইতে হয় না। এ বিষয়ে তাহারা আমাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান্।

সামাজিক কর্ম্ম-বিভাগের ন্যায় সাহিত্য ও জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রেও একটা কর্ম্ম-বিভাগ আবশ্যক। আমাদের শাকটায়ন, যাস্ক, মীমাংসাকার, পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রভৃতি জগদ্‌বরেণ্য পণ্ডিতগণ যে অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শী ছিলেন না, তাহা নহে। কিন্তু বাগ্‌বিজ্ঞান বা ভাষা-শাস্ত্র লইয়াই তাঁহারা আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সেই এক বিষয়ের কৃতিত্বেই তাঁহারা ভুবন-বিশ্রুত অমর হইয়াছেন। কিন্তু আধুনিক যুগে আমাদের বঙ্গদেশে এ বিষয়ে একটা ভয়ঙ্কর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ বা সাহিত্য-সম্মেলনে ভাষা-বিজ্ঞানের একটা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। এখানে জ্ঞানানুশীলনের চারিটী শাখা—সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন। ভাষা-বিজ্ঞান সাহিত্য-শাখার অন্তর্গত। কিন্তু সাহিত্য ও ভাষা এক নহে : ভাষা-বিজ্ঞান সাহিত্য-শাখার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

আমাদের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়েও এই ভাষা-

বিজ্ঞানের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট বিভাগ ছিল না। স্যর্ আশুতোষ সরস্বতীর নেতৃত্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কারের সময় এই নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষা-বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম সৃষ্টির পর যিনি এই বিষয়ের অধ্যাপনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি বহু-ভাষা-বিৎ ও ইংরাজী ভাষায় সু-কবি হইলেও ভাষা-বিজ্ঞানের সকল খবর রাখিতেন না। তাহার ফলে ভাষা-বিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকায় কেমন একটা জটিলতা ছিল। সুতরাং ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার তারাপোরওআলার নেতৃত্বে ভাষা-বিজ্ঞানের পাঠ্যতালিকার আমূল সংস্কার হইয়া গিয়াছে। এখনকার পাঠ্যতালিকা অতি পরিষ্কার, কোনরূপ জটিলতা ইহাতে নাই। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বিচক্ষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের সূক্ষ্ম বিচার ও গবেষণার ফলে বাঙ্গালা ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর মহাশয় যখন বঙ্গ-ভাষার আলোচনায় হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন, তখন ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চ্চা আমাদের দেশে অজ্ঞাত-পূর্ব্ব। সুতরাং তাঁহাকে অজ্ঞানের নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া উষার আলোক প্রকাশ করিবার জন্য বিলুপ্ত-প্রায় অগণিত বাঙ্গালা পুঁথির পাতায় পাতায় হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইয়াছে ! কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনায় পূর্ণ দিবালোক প্রদীপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ও কলিকাতার অনুকরণ ও অনুসরণ করিতেছেন। আর একটা নূতন জিনিস আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে—প্রাচ্য-বিদ্যা মহা-সম্মেলন বা Oriental Conference. এই সম্মেলন বা Conferenceএ ভাষা-বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ গঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এসিয়াটিক সোসাইটীর ভারতীয় শাখা সমূহেও ভাষা-বিজ্ঞানের জন্য পৃথক বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য দেশে ত সেরূপ বিভাগ আছেই।

ভাষা-বিজ্ঞানরূপ এই যে একটা বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডার মহামানবের সাধারণ সম্পত্তিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইউরোপে তাহার আধুনিক পরিপুষ্টি হইলেও অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেই এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। শাকটায়নের ধাতুবাদ, যাস্কের নিরুক্তবাদ ও পাণিনির সুবন্ত-তিঙন্ত-অব্যয়রূপ শব্দের শ্রেণী বিভাগ আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছে ও বিপুল গবেষণার ফল বলিয়া সমাদর করিয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগে আমাদের বঙ্গদেশে ভাষা-বিজ্ঞানের এত অনাদর কেন ? অনুশীলিতব্য বিষয়-সমূহের মধ্যে ভাষা-বিজ্ঞানের পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ নাই কেন ? যে দিন আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, সে দিন এ বিষয়ে লিখিত অতি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকার কলেবর বিভূষিত করিয়াছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বিমোহন লেখনীও বঙ্গীয় ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনায় সঞ্চালিত হইয়া অনভিজ্ঞের অন্তঃকরণেও বাগ্‌বিজ্ঞানানুশীলনের স্পৃহা জাগাইয়াছিল। তখন কিন্তু পরিষদে ইতিহাস বিজ্ঞানাদি শাখার কল্পনা হয় নাই। এক 'সাহিত্য' শব্দেই তখন অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার অন্তর্নিহিত ছিল। না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে যাঁহারা চাহেন তাঁহারা ভাবেন ভাষা-বিজ্ঞানের বিষয়ে আবার পড়িবার কি আছে ? ভাষা-বিজ্ঞান শাস্ত্রের পূর্ব্বাচার্য্যগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা না জানার ফলে ভাষা-বিজ্ঞান বিষয়ক বহু হাস্যোদ্দীপক প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। সাহিত্যিক বা পণ্ডিত মাত্রেই ভাষা-বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় অধিকারী হইতে পারেন না। কর্ম্ম-বিভাগ এখানে একান্ত আবশ্যক যদি এই প্রকার কর্ম্ম-বিভাগ হয়, তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই এই শাস্ত্রের আলোচনা প্রসার লাভ করিতে পারে।

অনেকেই ভাবেন যে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ধ্বনি পরিবর্ত্তনের নির্দ্ধারণ করাই ভাষা-বিজ্ঞানের বিষয় বা কার্য্য। তাই 'Saxon' শব্দে 'শকসূনু', 'গর্গ' শব্দে 'Georgia' প্রভৃতির ধ্বনি-সাম্য আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িতেছে। 'মনান্তর' শব্দের শুদ্ধতার বিষয়ে মতান্তর ঘটিতেছে, 'সক্ষম' শব্দ মাথা তুলিতে অক্ষম হইতেছে, চণ্ডীদাস-সমাদৃতা 'রজকিনী'র অসমাদর হইতেছে, 'সৃজন' শব্দের সৃষ্টি লোপের

চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ইহা ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়ীভূত হইলেও ইহাই তাহার সব নহে। ভাষা যখন মানবজাতির বিশিষ্ট সম্পত্তি, তখন মানবজাতির ইতিহাসের সহিত ভাষার বিকাশের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং মানবতত্ত্ব ও মানবের ইতিহাস না জানিলে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা চলে না। মানুষের মনোবৃত্তির বৈশিষ্ট্য অনুসারেই যখন ভাষার বিকাশ ও পরিবর্ত্তন, তখন মনস্তত্ত্ব বা psychology ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় অপরিহার্য্য। বাগ্‌যন্ত্রের গঠন ও তৎসন্নিহিত নানা পেশী ও বায়ু-পথের অবস্থান ও সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণ-প্রণালী জানিবার জন্য দেহতত্ত্ব বা physiologyর জ্ঞান আবশ্যক। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবজাতির বহুধা বিস্তারের ইতিহাস ভূতত্ত্বের মতবাদের সহিত ভাষার সাক্ষ্য মিলাইয়া না লইলে বহু ভ্রম-প্রমাদ থাকিয়া যায়। নানাজাতির ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রবাদ-পুরাণের ভিতর ভাষার বিকাশ বিষয়ক নানা গুপ্ত তথ্য নিহিত আছে সুতরাং এ সকল শাস্ত্রের আলোচনা ও মানব-সমাজের নানা ক্রিয়াকলাপ না জানিলে ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। পৃথিবীর নানা ভাষার প্রকৃতি না জানিলে তুলনা-মূলক আলোচনা চলে না। সুতরাং ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনার সহিত এই সকল নানা শাস্ত্রের আলোচনা অপরিহার্য্য। তাই ভাষাতত্ত্ববিৎ Jackson বলিয়াছেন :—

A true philologist is in turn the historian, philosopher, logician, the physiologist, psychologist, sociologist,—even the student of comparative religion, and with it all, he must ever remain the skilled observer and impartial judge.

ইহা ছাড়া ভাষা-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক পূর্ব্বাচার্য্যগণ যাহা করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের প্রণীত নানা গ্রন্থের অধ্যয়ন আবশ্যক। নতুবা এতকালের আলোচনার ফল পাওয়া যাওয়া না। এতকালের সমৃদ্ধ এই শাস্ত্রের মূলভিত্তি স্বাধীনভাবে গাড়িয়া লইবার বৃথা পরিশ্রম করিতে হয়। এ পর্য্যন্ত ভাষা-বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় কি কি ফল ফলিয়াছে, আমরা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিব।

এই শাস্ত্রের মূল-পত্তন ভারতবর্ষেই হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইউরোপেই ইহার পরিপুষ্টি হইয়াছে এবং তাহাও অতি আধুনিক যুগে। জর্ম্মানি দেশই এ বিষয়ে সমধিক অগ্রসর। এক্ষণে ইউরোপ, আমেরিকা, এসিয়া সর্ব্বত্রই এই শাস্ত্রের আলোচনা চলিতেছে, এবং পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র নানা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য সম্মেলন হইতেছে। অসংখ্য মাসিক ও সাময়িক পত্রিকা এ কার্য্য পরিচালন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

ভারতের প্রাচীন যুগ

ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রথমে ভাষাশাস্ত্র লইয়া মাথা ঘামাইয়াছে। বৈদিক যুগের বৈয়াকরণ শাকটায়ন প্রতিপন্ন করেন যে, শব্দ মাত্রই ধাতু হইতে উদ্ভূত। গার্গ্যাচার্য্য ইহার আপত্তি করিয়াছিলেন এবং নিরুক্তাচার্য্য যাস্ক শাকটায়নের সমর্থন করিয়াছিলেন। যাস্কাচার্য্য শব্দ সমূহের চতুর্ব্বিধ শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। পাণিনি এ শ্রেণী-বিভাগ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে শব্দ-সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সুবন্ত, তিঙন্ত ও অব্যয়। শব্দের ধাতুমূলত্ব তিনিও স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়; কারণ শাকটায়নের উণাদি সূত্র তাঁহার অমর গ্রন্থের সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং তিনি কৃৎ-তদ্ধিতাদি প্রকরণে ধাতু হইতে শব্দ সিদ্ধ করিয়াছেন। প্রাতিশাখ্য সমূহে ধ্বনি-বিচার ও সন্ধি প্রভৃতির বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা হইয়াছে; অক্ষর সমূহের বিশ্লেষণ, মাত্রাদির বিচার এবং উদাত্তাদি স্বরের আলোচনায় প্রাতিশাখ্যগুলি এরূপ নিপুণতার পরিচয় সংরক্ষিত করিয়াছে যে ইউরোপের বিজ্ঞান-সম্মত phonetics বা ধ্বনি-বিচার ইহার নিকট হার মানিয়াছে। মীমাংসা, ন্যায় ও অলঙ্কার শাস্ত্রে শব্দ-শক্তি-বিচার নিপুণতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। বহু ছন্দোগ্রন্থ এবং পালি ও প্রাকৃত ভাষার তুলনা-মূলক ব্যাকরণও ভারতে প্রণীত হইয়াছে। পতঞ্জলির

মহাভাষ্যকে ব্যাকরণ না বলিয়া ভাষা-শাস্ত্র বলাই উচিত, কিন্তু সর্ব্বত্রই আলোচনার একমাত্র দোষ, পরিলক্ষিত হয়। 'ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত' এই প্রশ্নের বিচারে এবং বেদের প্রতি ঐন্দ্রজালিক ভক্তিবশতঃই ভারতের ব্যাকরণ বা ভাষা-শাস্ত্র আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য ঋষিগণ ধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অপ্রচলিত বেদের ভাষার উচ্চারণ ও শব্দ-সম্ভার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভাষাশাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাই যাহা-কিছু অপ্রচলিত ছান্দস ভাষার রীতি ও উচ্চারণের বিরুদ্ধ তাহাই ধর্ম্ম-নাশ-ভয়ে বর্জ্জনীয় হইয়াছে। ফলে তাঁহাদের কৃত্রিম ব্যাকরণের আইন অমান্য করিয়া অসংখ্য প্রাকৃত ভাষা মাথা তুলিয়াছিল এবং সংস্কৃত ভাষা পণ্ডিত সমাজের গণ্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

ইউরোপের প্রাচীন যুগ—গ্রীস ও রোম

গ্রীস দেশেও অতি প্রাচীনকাল হইতে ভাষার উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি এবং বর্ণ ও শব্দের বিভাগ লইয়া চিন্তা চলিয়াছিল। ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে ভাবিয়াছিলেন 'প্লেটো'র পূর্ব্বে আণ্টিস্থিনিস, হেরাক্লিটস্, ডেমোক্রিটস ও পীথগোরস্, এবং তৎপরে প্লেটো। প্লেটোর মতে চিন্তাই ভাষা। চিন্তাকালে আত্মা নিজের সহিত নিঃশব্দে কথোপকথন করে, আর শব্দ করিয়া যে চিন্তা-প্রবাহ ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যস্থল দিয়া বহির্নিষ্ক্রান্ত হয় তাহাই ভাষা বা logos. তাঁহার Theaetetus গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন যে, কোনও বিষয়ে মত দেওয়াই কথা বলা, আর মতটাই হইল কথা। তবে এই কথা নিজের মনে ও নিঃশব্দে নির্গত হয়; উচ্চস্বরেও হয় না, অন্যের নিকটও পৌঁছে না। তাঁহার Cratylus গ্রন্থে নিম্নরূপ বর্ণ-বিভাগ আছে,—

বর্ণ

স্বরবান্ বা নাদবর্ণ (Phonecnta বা voiced)

স্বরহীন বা শ্বাসবর্ণ (aphona বা voiceless)

ধ্বনিত বা অর্দ্ধব্যঞ্জন (hemiphona)

স্পৃষ্ট বা স্পর্শবর্ণ (aphthogga)

পরবর্ত্তী যুগে গ্রীসে ধ্বনির শ্রেণী-বিভাগ হইয়াছিল— (ক) psila বা অঘোষ, (খ) mesa বা ঘোষবৎ এবং (গ) dasea বা মহাপ্রাণ। শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় বিষয়ে প্লেটো ও এরিষ্টটলের যুগে নানারূপ বিদ্রূপাত্মক গম্ভীর রচনা চলিত। এ যেন বাঙ্গালা 'প্রভাকর' পত্রিকার রস-রচনা বা খেউড় গান। তখন গ্রীস দেশে ব্যুৎপত্তি-শাস্ত্রের প্রথম যুগ। ধ্বনির সাম্যমাত্র দেখিয়াই ব্যুৎপত্তির সাম্য নির্ণীত হইত। তাই এত রস-রচনার অবসর ঘটিয়াছিল। প্লেটোর Cratylus গ্রন্থে এই প্রকার রস রচনা বা parodyর অসংখ্য উদাহরণ আছে। তাহার অধিকাংশ স্থলেই অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই। প্লেটোই প্রথমে শব্দের শ্রেণী-বিভাগ বা parts of speechএর বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন এবং subject (onoma) ও predicate (rhema) এবং কর্ত্তৃ ও কর্ম্ম বাচ্যের প্রভেদ কল্পনা করিয়াছিলেন। এরিষ্টটল এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ করিয়া অষ্ট শ্রেণীতে শব্দ সমূহের বিভাগ করিয়াছিলেন। এরিষ্টটল case বা কারকের উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং case শব্দ tense বা ল-কারের অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আলেকজন্দ্রিয়া, গ্রীস ও রোমের বৈয়াকরণদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নাম কয়টী উল্লেখযোগ্য।

(১) ডাইওনিসিয়োস থ্রাক্স্ (Dionysios Thrax) প্রথম বৈয়াকরণ; খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে এরিষ্টটলের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন।

(২) অপ্‌পোলোনিয়স্ ডিস্‌কোলোস্ (Appolonius Dyskolos) শব্দ-বিন্যাস-প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন।

(৩) বক্তৃতা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উন্নতির জন্য গ্রীক আদর্শে রোমের বহু লাটিন ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল।

(৪) (Laurentius Valla) লরেন্টিয়স্ বল্ল (১৪শ শতাব্দী) প্রণীত লাটিন ব্যাকরণ প্রামাণ্য গ্রন্থ।

(৫) (Varro) বারো ও (Priscian) প্রিস্কিয়ন প্রাচীন লাটিনের ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন।

একালের ভাষা-শাস্ত্রের আলোচনায় আর একটী উদ্দীপক কারণ ছিল ধর্ম্মানুশীলন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র

বাইবেল গ্রন্থ হিব্রু ভাষায় লিখিত ছিল বলিয়া হিব্রু ভাষা গ্রীস ও রোমে এত সমাদর পাইয়াছিল যে, ইহাকেই জগতের সকল ভাষার মূল বলিয়া মানিয়া লইয়া গ্রীক ও লাটিন শব্দের মূলান্বেষণ হিব্রু ভাষার শব্দ সম্পদের মধ্যে হইত। এই চেষ্টার ব্যর্থতার ফলস্বরূপ স্বীকৃত হয় যে, হিব্রু, সীরিয়ক ও আরবী ভাষা যে শ্রেণীর, গ্রীক ও লাটিন ভাষা সে শ্রেণীর নহে।

মধ্যযুগ—ইউরোপে সংস্কৃতের প্রচার (১৭৮৬-১৮৩৩)

ভাষা-বিজ্ঞান শাস্ত্র অতি আধুনিক শাস্ত্র। ইহার বয়স এক শতাব্দীও হয় নাই। কিন্তু এত অল্পকাল মধ্যে ইহার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি ঘটিয়াছে যে একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত বলিয়াছেন* যে, জুপিটারের মাথায় মিনের্ভার ন্যায় অকস্মাৎ এই শাস্ত্র গজাইয়া উঠিয়াছে। গ্রীস ও রোমের সাহিত্য হইতে ইহার পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার উৎপত্তি ইউরোপে হয় নাই। ইউরোপের নিকট ইহা ভারতবর্ষের দান। পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতবর্গের নিকট যে দিন সংস্কৃতের প্রচার হইল সেই দিনই তুলনা-মূলক ভাষা-শাস্ত্রের জন্ম হইল বলিতে হইবে। ভারতবর্ষের পবিত্র ভাষা ও ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারের যাঁহারা দ্বার উন্মোচন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে আবেগ-স্পন্দন প্রবল ভাবে চলিয়াছিল, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মনে এই স্পন্দন জাগরূক থাকিবে। মনুসংহিতার 'মাংস' শব্দের ব্যুৎপত্তি তাঁহাদের নিকট হাস্যোদ্দীপক হইতে পারে, (মাং স ভক্ষয়িতাঽমুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্ ইতি মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ 'He will "me-eat" in yonder world whose "me-eat" I eat in this world here, for that is the whole meat of the matter.') প্রাচীন গ্রীকদিগের ব্যুৎপত্তি-শাস্ত্রও এই প্রকার হাস্যোদ্দীপক ছিল। (Dean Swift) ডীন সুইফট 'ostler' শব্দের যে 'oat-stealer' বলিয়া অর্থ করিয়াছেন তাহাও সেই প্রকার। কিন্তু তর্কের খাতিরে সংস্কৃতের এই সকল সামান্য সামান্য অংশ বাদ-ছাঁট দিলে এ সাহিত্যে ভাষা-বিজ্ঞানের যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। স্যর উইলিয়ম জোন্স্ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্য তথা ভাষা-বিজ্ঞানের মহান্ উপকার করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নাম চির-স্মরণীয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপন করেন। প্রথম অধিবেশনে তিনি যে সভাপতির অভিভাষণ করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী পঙ্‌ক্তি বহু স্থলে উদ্ধৃত হইয়া থাকে কথা কয়টী অতি উপাদেয় ও মূল্যবান্।*

(২) এ যুগের দ্বিতীয় পণ্ডিত হেনরী টমাস কোলব্রুক (Henry Thomas Colebrooke 1765-1857)। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিভাগে বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

(৩) ফ্রীড্‌রীশ্ শ্লেগেল (Friederich Schlegel 1772-1829), ফ্রান্সে বন্দী অবস্থায় আলেগজাণ্ডর হামিল্টনের নিকট সংস্কৃত শিখিয়া মুক্তির পর জর্ম্মনি দেশে সংস্কৃতের প্রচার করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি ইঁহার হিন্দুর ন্যায় ভক্তি ছিল।

(৪) উইলহেম ভোন হম্বোল্ট (Wilhelm von Humboldt 1767-1835)। ইনি বহু বিষয়ে কৃতবিদ্য

* A. V. W. Jackson.

* The Sanskrit Language, whatever be its antiquity, is of wonderful structure: more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either: yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could have been produced by accident; so strong that no philologer could examine all three without believing them to have sprung from some common source which perhaps no longer exists. There is a similar reason, though not quite so forcible, for supposing that both the Gothic and Celtic, though blended with a different idiom, had the same origin with Sanskrit.

রাজনৈতিক ছিলেন। ভাষা-শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বহু অভিনব তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনিই ভাষা-বিজ্ঞান আলোচনায় ঐতিহাসিক প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহার মতে মনুষ্য-বিষয়ক জ্ঞানের একাংশই হইল ভাষাবিজ্ঞান। মনুষ্য-মধ্যে নিহিত শক্তি-বিশেষকেই ইনি 'ভাষা' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই মনুষ্যমধ্যস্থিত ঐশী শক্তির বাহ্য বিকাশ। ইনি বলেন,—"অতীত ও ভবিষ্যৎ আমাদের জ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে; সুতরাং বর্ত্তমান লইয়াই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। আলোচনা ঐতিহাসিক হওয়া আবশ্যক এবং ইতিহাসের সীমার বাহিরে কোনও-কিছুর গবেষণা অনর্থক।" ইনি শব্দের ধাতুমূলত্ববাদ সমর্থন করেন। প্রত্যয় সমূহ এককালে স্বাধীন শব্দ ছিল বলিয়া ইনি বিশ্বাস করিতেন।

(৫) আডল্‌ফ্‌ শ্লেগেল (Adolf Schlegel 1767-1845) হিন্দুর ন্যায় ভক্তি ও ইউরোপীয়ের ন্যায় সমালোচনাশক্তি লইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনিই ইউরোপে সংস্কৃত ভাষাবিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক।

(৬) ফ্রাঞ্জ বপ্‌ (Franz Bopp 1791-1867) তুলনামূলক ব্যাকরণ লিখিয়া অমর হইয়াছেন। সংস্কৃত ধাতুরূপ-সমূহের গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মণিক ও পারস্য ভাষার সহিত তুলনা (১৮১৬); সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, জেন্দ, লিথুআনীয়, গথিক ও জর্ম্মনভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ (১৮৩৩); গ্রীক ও সংস্কৃত স্বর (accent), ব্যাকরণের পরিশিষ্ট (১৮৫৪); এই তিনখানি গ্রন্থ ইঁহার অমর কীর্ত্তি। ইঁহার মতে প্রত্যয়সমূহ এককালে সম্পূর্ণ শব্দ ছিল; এবং ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম কেবল নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে খাটে, সর্ব্বত্র বিনা ব্যতিরেকে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে না।

(৭) জেকব গ্রীম (Jacob Grimm, 1785-1863) জর্ম্মনিক ভাষাসমূহের ধ্বনিপরিবর্ত্তনের এক ঐন্দ্রজালিক বিধি প্রণয়ন করেন। জর্ম্মনিক ভাষাসমূহে বর্গীয় প্রথম বর্ণ স্থানে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে তৃতীয় এবং তৃতীয় বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ হয়—এই বিধিই গ্রীমের
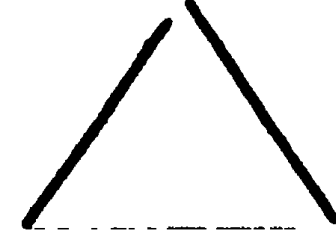
অমর আবিষ্কার। ইহা ভাষা-বিজ্ঞানশাস্ত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ইনি ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহার মতে প্রত্যেক শব্দের মূল অন্বেষণ করিতে হইবে এবং পরিপুষ্টির সজীব প্রণালী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তবে শব্দটীকে চেনা যাইবে। আমাদের জীবনধারার অন্তর্গত গভীর প্রবাহবিশেষকে ভাষা বলা যায়—প্রাকৃতিক নিয়মে সেই ভাষার পরিপুষ্টি হয়।

উপকরণ সংগ্রহের যুগ—(১৮৩৩-৫৫)

(১) আগষ্ট এফ্‌ পট (August F. Pott, 1802-1887) বিরাট ব্যুৎপত্তি-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন ও বপের ব্যাকরণের সংস্কার করেন।

(২) ফ্রীডরীশ্‌ ম্যাক্সমূলর (Friederich Max Muller, 1823-1900) লোকের মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানের প্রচার করেন। সায়ণ ভাষ্যসহ ঋগ্বেদ ও Sacred Boaks of the East Seriesএর ৪৯খানি অনুবাদ-গ্রন্থ সম্পাদন করেন। পুরাণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি-সমূহের তুলনামূলক আলোচনা করেন। ইনি লোক-প্রিয় ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন এবং অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারত-সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে এবং ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে ইঁহার মতবাদ সমূহ একালের পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হয় না।

(৩) রিউডল্‌ফ রোথ (Rudolf Roth, 1821-95) এবং (৪) ওটো বোটলিঙ্ক (Otto Bohtlingk, 1815-1904) সংস্কৃত ভাষার এক বিরাট-বিশাল অভিধান (St. Petersburg Dictionary) প্রণয়ন করিয়াছেন। এই বিশাল অভিধান-গ্রন্থে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হইয়াছে।

(৫) অগষ্টস্‌ শ্লয়্‌শার (Augustus Schleicher,

1823-68) Compendium (1861) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি এই যুগের ভাষাতত্ত্ববিষয়ক কার্য্য-সমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার অনেক শিষ্য ছিলেন। সেইজন্য ভাষা-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ইনি যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। শিষ্যগণ কিন্তু গুরুর মত গ্রহণ করেন নাই। ইনি ইউরোপ ও এসিয়ার ভাষাসমূহের জননী স্থানীয়া মূল আর্য্যভাষার অস্পষ্ট ছবির অনুভব করিয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্য ব্রুগমান সেই ছবিতে রঙ ফলাইয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

এ যুগের মতবাদ সমূহে অনেক ভ্রম-প্রমাদ আছে।

নব্যযুগ—১৮৫৫ হইতে

এই যুগের প্রবর্ত্তকগণ Jung grammatiker বা নব্য বৈয়াকরণের দল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নব্য-তন্ত্রীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত নাম কয়টিই প্রধান :—

(১) ষ্টাইন্থল (H. Steinthal, 1825 99)

(২) হরমন অষ্টোফ (Herman Ostoff)
(৩) কার্ল ব্রুগমান্ (Karl Brugmann) } ত্রিমূর্ত্তি
(৪) হরমন পাউল (Herman Paul)

(৫) হুইটনী (W. D. Whitney 1827-94)

(৬) ডেলব্রুক (B. Delbruck).

(৭) লেস্কিয়েন (Leskien)

(৮) ষ্ট্রেইটবের্গ (Streitberg).

ইঁহারা পূর্ব্বযুগের পণ্ডিতদিগের মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। লীপজিগ হইতে শ্লয়শারের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক এই যুদ্ধ ঘোষিত হয়। লেস্কিয়েন বলেন, ধ্বনিবিজ্ঞানের নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নাই। ধ্বনি-বিজ্ঞান লইয়াই এ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এ যুগের কার্য্যারম্ভ হয় নিম্নলিখিত মতবাদ-সমূহ লইয়া এবং সেই অনুসারে নানা বিষয়ে তাঁহাদের কার্য্য চলিতেছে।

(১) সজীব ভাষার আলোচনা আবশ্যক। কেবলমাত্র প্রাচীন ভাষার আলোচনায় ভাষাশাস্ত্র চলে না।

(২) 'ভাষায় উৎপত্তি' প্রভৃতি কতিপয় সমস্যা আনর্থক বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

(৩) শারীর-বিজ্ঞানবিষয়ক ও মনোবিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ কল্পনা হয়।

(৪) Analogy বা বাগনুপাত ও তাহার উপযোগিতা অনুভূত হয়।

(৫) ভাষায় বিভিন্ন রীতির সমাবেশ—বিভিন্ন জাতীয় মানবের একত্র মিলন।

ধ্বনিবিজ্ঞান—(১) ধ্বনি পরিবর্ত্তন (ক) ব্যঞ্জনবর্ণ—

গ্রীমের ধ্বনিব্যত্যয় বিষয়ক বিধি (Lauiver-Schiebung) সর্ব্বত্র খাটিত না। সেই বিধির বহু ব্যতিরেক, ব্যতিক্রম বা exception ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই ব্যতিক্রম সমূহের কারণ নির্ণয় হওয়ায় স্থির হইয়া গেল যে, ধ্বনিব্যত্যয় বিধির কোনও ব্যতিরেক নাই। গ্রাস্মান (Grassmann) আবিষ্কার করিলেন যে, যদি কোনও ধাতুর আরম্ভ ও অন্তে মহাপ্রাণ বর্ণ মূলভাষায় থাকে, তবে সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় তাহার একাংশের অল্পপ্রাণতা হয়। দুইটীই মহাপ্রাণ থাকে না। সুতরাং গ্রীমের বিধির এই শ্রেণীর ব্যতিরেক অমূলক। বর্ণর (Karl Verner 1877) দেখিলেন, ধ্বনিব্যত্যয় ব্যাপারে উদাত্তাদি স্বরের যথেষ্ট প্রভাব আছে। মূল ভাষায় যদি কোনও স্পর্শবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণে স্বর (accent) না থাকে তবে গ্রীমের বিধি খাটে না। ইহার ফলে অঘোষ অল্প প্রাণ বর্ণ স্থানে ঘোষবদ্ বর্ণ হয়। ইহাতে কতিপয় ব্যতিক্রমের সমাধান হইল। আস্কোলি (Ascoli 1870) বলিলেন, মূলভাষায় দুইটী বর্ণ (ক ও চ) আধুনিক 'ক' উচ্চারণে মিলাইয়া মিশাইয়া আছে। ইহাতেও বহু ব্যতিক্রমের সমাধান হইল। ব্রুগমান (Brugmann) আনুনাসিক বিধি* (Sonant nasal Theory) আবিষ্কার করায় এবং

* সংস্কৃত ভাষায় বহু স্থলে মূল আর্য্যভাষার একটী অনুনাসিক বর্ণ লুপ্ত থাকে। গ্রীকভাষা ও আবেস্তার ভাষাতেও এই লক্ষণ দেখা যায়। সংস্কৃত 'শতম্', আবেস্তা 'শতেম্', গ্রীক 'হেকাটোন্'; কিন্তু লাটিন 'কেন্তুম্' (Kentum)। কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষা হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃত 'গম্' ধাতু হইতে 'গন্তুম্', 'গমৎ' প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হয়, কিন্তু 'গতি', গত্বা' (পালি 'গন্ত্বা') প্রভৃতিও হয়। প্রথমায় 'ভবান্', 'ভবন্তৌ' 'ভবন্তঃ'; কিন্তু তৃতীয়ায় 'ভবতা', 'ভবদ্ভ্যাম্', 'ভবদ্ভিঃ'। স্বরপ্রভাবই এই সকল অনুনাসিক লোপের কারণ। মূল ভাষায় n ও m দুইটী অনুনাসিক স্বরবর্ণ ছিল।

অবেও কতকগুলি ব্যতিরেকের সমাধান হওয়ায় স্থির হইল এবং যে

ব্যঞ্জন বর্ণ বিষয়ক ধ্বনিব্যত্যয়-বিধির কোনও ব্যতিক্রম নাই।

(খ) স্বরবর্ণ— Curtius গ্রীক ভাষার আলোচনা করিয়া স্থির করেন যে, সংস্কৃত ভাষাতেই যখন মূলভাষার স্বর সমূহ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে (কারণ তখন সংস্কৃতের খুব সমাদর), তখন ইউরোপীয় ভাষা সমূহে একমাত্র স্বর 'অ' স্থানে অ, এ, ও,—এই তিনটী স্বর উৎপন্ন হইয়াছে। বপ, গ্রীম প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত বহুকাল এই মতে বিশ্বাস করিতেন। অবশেষে Amelung, Brugmann, Collitz প্রভৃতি নব্য-তন্ত্রীর দলের পরিশ্রমে স্থির হইল যে, গ্রীক ভাষাতেই যথাসম্ভব মূল ভাষার স্বরসমূহ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সংস্কৃতে নহে। তারপর Bartholomae, Bechteb, Fortunatov, Meillet, Brugmann, Streitberg, Hirt প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দ্বারা গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ, উদাত্তাদি স্বরবিধি প্রভৃতির নানা নিয়ম আবিষ্কৃত হওয়ায় স্থির হইল যে, স্বরবিষয়ক ধ্বনিব্যত্যয়েরও ব্যতিরেক নাই। সুতরাং স্থির হইয়া গেল,

ধ্বনিব্যত্যয় বিধির ব্যত্যয় নাই। Sound laws have no exceptions.

(২) ধ্বনিবিজ্ঞান – ধ্বনির উৎপত্তি, বাগ্‌যন্ত্রের প্রকৃতি।

ধ্বনিবিজ্ঞান শাস্ত্র মোটেই আধুনিক শাস্ত্র নহে। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাতিশাখ্যকার ধ্বনির বিশ্লেষণ, ধ্বনির উৎপত্তি, ও প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে এ শাস্ত্রকে আধুনিক শাস্ত্র বলা মোটেই চলেনা। কিন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্রের একটা বিভাগ স্বরূপে ইহার আলোচনা গত শতাব্দীর মধ্য ভাগেই পাশ্চাত্য দেশে আরম্ভ হইয়াছে। পট্ ও বেন্‌ফির সময় পর্য্যন্ত বহু ভাষাতাত্ত্বিক এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন ও ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য অনেক মাল-মশলা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য বিবিধ চেষ্টার ফলে অবশেষে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার স্থানে সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাগ্‌যন্ত্রে ধ্বনির উৎপাদন ও কর্ণের দ্বারা তাহার গ্রহণ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা এই যুগেই হয়, পূর্ব্বে হয় নাই। এই কার্য্যে আধুনিক ভাষার আলোচনা বিশেষভাবেই আবশ্যক হইয়াছে। পৃথিবীর কোন্ কোন্ ভাষায় কি কি উচ্চারণ আছে তাহার সংগ্রহ হইয়াছে। ভাষাতাত্ত্বিকের সহিত শরীর-তত্ত্বজ্ঞগণের একত্র মিলন ও মিলিয়া-মিশিয়া কার্য্য চলিয়াছে। শরীর-বিজ্ঞানের দ্বারা বাগ্‌যন্ত্রের বিশ্লেষণ ও বিবিধ পরীক্ষা হইয়াছে। কৃত্রিম বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে বিবিধ পরীক্ষাকার্য্য চলিয়াছে।

এই ত গেল ধ্বনির উৎপাদন ও বিশ্লেষণাদির কথা। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দিক দিয়াও বহুবিধ যন্ত্রের ব্যবহার ও তাহার সাহায্যে পরীক্ষা ও তথ্যনির্ণয় চলিয়াছে। ধ্বনির দ্বারা উৎপন্ন বায়ু-তরঙ্গ, তাহার বক্রতার প্রকৃতি, দৈর্ঘ্যের পরিমাণ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ু সমূহের উপর তাহার ক্রিয়া, ইত্যাদি বহু আলোচনা ও পরীক্ষা এই যুগে হইয়াছে ও এখনও চলিতেছে।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রকৃতি নির্ণয় চেষ্টা এবং শারীরক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান-সংক্রান্ত ধ্বনিবিজ্ঞান বিধির প্রভেদ সূক্ষ্মভাবে নির্ণীত হইয়াছে। "Volker psychologie" (1900) বা লৌকিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ে অনেক কথা-কাটাকাটি চলিয়াছে। নানাস্থানে বড় বড় বৈঠক বসিয়াছে। নানাস্থানে স্থায়ী সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে ধ্বনিবিজ্ঞান আলোচনার ফলে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহে মনোযোগ পড়িয়াছে।

(১) পৃথক পৃথক ভাষায় ব্যাকরণের সম্পর্ক প্রকাশ।

(২) ভিন্ন ভিন্ন জাতির চিন্তা-প্রণালী প্রকাশক শব্দ-সম্পদের আলোচনা।

(৩) শব্দ-শক্তি বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা।

(৪) Analogy বা বাগনুপাত পদ্ধতির বিবিধ বিচার।

(৫) মূক-বধিরাদি নানাশ্রেণীর রোগ লইয়া বিবিধ পরীক্ষা।

(ক) aphasia—উচ্চারণে অসমর্থতা।

(খ) para phasia—শব্দবোধে গোলযোগ।

(গ) apraxia—অর্থবোধে অসামর্থ্য।

(ঘ) sensory aphasia—শব্দ-বধিরতা ও শাব্দ-অন্ধতা।

এই বিষয়ের জন্য পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের আলোচনা চলিতেছে। মস্তিষ্কের বাগ্‌বিষয়ক ক্রিয়ার বিষয়ে নানা গবেষণা ও পরীক্ষা কার্য্য চলিতেছে। শব্দোৎপত্তির মানসিক কেন্দ্র কোথায় তাহারও কতকটা নির্ণয় হইয়াছে।

পৃথিবীর ভাষা-সমূহের শ্রেণীবিভাগ—

(১) হিব্রু ও অন্যান্য সেমেটিক ভাষাসমূহের আলোচনা অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিতেছে। কলেজে ও ধর্ম্মমন্দিরে ইহার পঠন-পাঠন হইতে হইতেছে। আসীরীয়, বাবিলোনীয়, সীরীয়, আরবী ও অন্যান্য সেমেতিক ভাষার আলোচনা অতি দ্রুত গতিতে চলিতেছে। যাঁহারা এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের, মধ্যে ডি সেসী (de Sacy), গেসেনিয়স (Gesenius), এওআল্ড্ (Ewald) ডিলিশ্ (Delitzsch), রাইট (Wright), লাগার্ডা (Lagarda) ও নোল্‌ডেকের (Noldecke) নাম উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা নাম এ বিষয়ে অগ্রসর তাঁহাদের মধ্যে হাউপ্ট্ (Haupt), জিমর্ণ্ (Zimmern), বার্থ (Barth) প্রভৃতির নাম প্রধান। Brocketman's Comparative Grammar of the Semetic Languages (Leipzig) একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। ইংরাজ, ফরাসী ও জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ আধুনিক যুগে ইহুদীগণের বহু প্রাচীন লিপির আবিষ্কার করিয়াছেন। মিসরের নানা স্থান খনন করিয়া নানা প্রাচীন কীর্ত্তির উদ্ধার ও আলোচনা চলিতেছে। এজরা (Ezra) ও নেহিমিয়ার (Nehemiah) সময়ের বাইবেলের ইতিহাস, জেহোবা গির্জ্জার পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক দরিয়াসের অধীন জেরুসালেমের শাসনকর্ত্তা বাগোআসের নিকট লিখিত আবেদন-পত্র, উইঙ্ক্‌লার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হিটাইট (Hittite) ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য আবিষ্কার। সেমেতিক ও আর্য্যভাষার মধ্যে সম্পর্কস্থাপনের চেষ্টাও হইয়াছে। তার মধ্যে Indo germanische Forschungenএ লিখিত Pedersen এর প্রবন্ধই আধুনিক।

(২) মিশরের হেমেটিক ভাষার আলোচনা রসেটা প্রস্তরের (Rosetta stone) আবিষ্কারের পর হইতেই হইতেছে বলিতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও কর্ম্মীর সংখ্যা অনেক। চ্যাম্পোলিয়ন্ (Champollion), লেপ্‌সিয়স্ (Lepsius), ডিরোজে (de Rouge), ব্রুগ্‌শ্ (Brugsch), এবর্স্ (Ebers), মাস্পেরো (Maspero), পীল্ (Piehl), ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি (Flinders Petric), এরমন (Erman), বার্লিনের বিখ্যাত মিসরতত্ত্বজ্ঞ (Egyptologist) গণ, ব্রেষ্টেড্ (Breasted of Chicago), ম্যাক্‌সমূলর (Max Muller of Philadelphia), ষ্টার্ণ (Stern) ও ষ্টেইনডর্ফের (Steindorff) নাম উল্লেখযোগ্য।

(৩) আফ্রিকার ভাষা সমূহ লইয়া খাটিতেছেন রৈনিশ্ (Reinisch), ব্লীক (Bleek), ষ্টেন্থল (Steinthal), ক্রফ (Krapf), কোএল্‌ব্ (Koelb) ও টরেণ্ড (Torrend) "Zeitschrift fur africanische Sprachen" ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত আফ্রিকা-বিষয়ক পত্রিকা।

(৪) চীনা ভাষা লইয়া খাটিয়াছেন স্তনিশ্লস জুলিয়েন (Stanislas Julien, উইলিয়মস (Williams), লেগে (Legge), শ্লেগেল ও গাইল্‌স্ (Schlegel and Giles), গবেলেঞ্জ (Georg von der Gabelentz), চবনেস (Chavannes) ও হীর্থ (Hirth)। ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে চীনে ভাষার অধ্যাপকের উচ্চপদ।

(৫) জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, তুর্কীস্থান, মধ্য ও উত্তর-এসিয়ার ভাষা-সমূহ।

(৬) হিটাইট ও সুমেরো-অক্কদীয় ভাষা-সমূহের সমস্যা সমাধান।

(৭) মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন ভাষা-সমূহ।

(৮) পলিনিসিয়ার ভাষা-সমূহ।

(৯) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ভাষা-সমূহ।

(১০) আধুনিক আমেরিকার ভাষা-সমূহ।

এই সকল বিভাগের প্রত্যেকটীতেই অসংখ্য কৃতবিদ্য কর্ম্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তা ছাড়া আর্য্য ভাষা, দ্রাবিড়ী ভাষা প্রভৃতি লইয়া ত আলোচনা চলিতেছেই।

আর্য্যভাষা সমূহের প্রকৃতি-গত শ্রেণীবিভাগ—

বহু সহস্রভাষার আবিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু সন্তোষজনক শ্রেণী-বিভাগ হয় নাই। নৃতত্ব, ভাষাতত্ব ও জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, জাতি বা শোণিত সম্পর্কের সহিত ভাষার কোনও সম্পর্ক নাই। সুতরাং আর্য্য-ভাষা-সমূহের যে প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র কাজ চালাইবার উপযোগী। বিজ্ঞান-সম্মত সম্পূর্ণতা ইহার নাই।

পূর্ব্বে আকৃতিগত বা গঠন-গত সাদৃশ্য ধরিয়া ভাষার শ্রেণীবিভাগ হইত। শব্দের সহিত শব্দ জুড়িয়া যে-সকল ভাষায় পদ গঠন হয় সেই-সকল ভাষাকে agglutinative বা সংযোগধর্ম্মী ভাষা বলা হয়। এই সকল ভাষার প্রত্যয়-সমূহকে গোটা গোটা শব্দ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। তুর্কী, হঙ্গারীয়, ফিনলণ্ডীয় প্রভৃতি ভাষা এই শ্রেণীর। এই সকল ভাষার তুলনামূলক আলোচনা হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে প্রত্যেক ভাষাতেই প্রত্যয় সমূহ গোটা গোটা শব্দ হইতে সমুদ্ভূত। এখন সেকথা সকলে মানিতে চাহেন না। তবে একথা সকলেই স্বীকার করেন (এবং না করিলে উপায় নাই) যে অধিকাংশ প্রত্যয়ই গোটা গোটা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কতকগুলি ভাষায় প্রধানতঃ প্রত্যয়াদির সাহায্যেই পদ গঠন হয়। ইহাদিগকে Inflectional বা প্রত্যয়-ধর্ম্মী ভাষা বলা হয়। আমাদের আর্য্যভাষা সমূহ ও আরবী প্রভৃতি সেমেতিক ভাষাকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা হয়। এই দুই শ্রেণীর ভাষাই পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধ ভাষা। চীনা ভাষায় প্রত্যয়, শব্দ, বিশেষ্য বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি কিছুই নাই; কতকগুলি একাক্ষর ধাতু আছে। ভাষায় প্রয়োগ করিবার জন্য ইহাদের কোনওরূপ পরিবর্ত্তন হয় না; একাধিক ধাতুকে জুড়িয়া পদ গঠন করাও হয় না। ধাতু-সমূহ বাক্যমধ্যে পাশাপাশি বসিয়াই বাক্যগঠন করে। এই ভাষাকে (isolatiny) বিচ্ছেদধর্ম্মী, (mono syllabic) একাক্ষর ধর্ম্মী বা (root language) ধাতুধর্ম্মী ভাষা বলা হয়। আমেরিকার আদিমানবাসীদিগের ভাষায়ও প্রত্যয়াদির ব্যবহার নাই। শব্দের পর শব্দ জুড়িয়া সংযোগ ধর্ম্মী ভাষার ন্যায় এ ভাষাতেও বাক্য-গঠন হয়। তবে সংযোগধর্ম্মী হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে পদ বলিয়া কোনও কিছু নাই বলিলেই হয়। এক একটী বাক্য এক একটী পদের ন্যায়। তাই এই শ্রেণীর ভাষাকে poly-synthetic বা বহুসংযোগী ভাষা বলা হয়।

ভাষা-বিজ্ঞান চর্চ্চার মধ্যযুগে এইভাবেই ভাষার শ্রেণী বিভাগ চলিত। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল যে প্রত্যেক ভাষাতেই এই চারি শ্রেণীর ভাষার লক্ষণ অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। কোনও ভাষাকেই খাঁটি সংযোগ ধর্ম্মী, খাঁটি প্রত্যয় ধর্ম্মী, খাঁটি বিচ্ছেদধর্ম্মী বা খাঁটি বহু-সংযোগী বলা যায় না। আরও দেখা গেল যে ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে পিরেনীজের নিকটে প্রচলিত বাস্ক (Basque) ভাষা সর্ব্বনাম সংযোগী, আফ্রিকার বান্তু (Bantu) ভাষা উপসর্গ সংযোগী এবং এইরূপ নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য নূতন নূতন ভাষায় পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। সেইজন্য আকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ ছাড়িয়া প্রকৃতি বা উৎপত্তি ধরিয়া শ্রেণীবিভাগই অনুমোদিত হইল। কিন্তু প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগেও আকৃতিগত উপাদান লইয়াই বিচার চলিয়াছে।

আর্য্যভাষাসমূহের নয়টী শ্রেণী। (১) ভারত-ইরাণীয় ভাষা বা Ayan ভাষায় (ক) মূল অ, এ, ও—এই তিনটী স্বর এক অকারে মিলাইয়া মিশাইয়া আছে। (খ) মূল ə বা Schwa vowel বা অনিরূপিত হ্রস্ব স্বর স্থানে ই হইয়াছে। যেমন * Pitˊr. স্থানে 'পিতর্'। (গ) অকার ভিন্ন স্বরের পরস্থিত স স্থানে ষ হয়। (ঘ) ষষ্ঠীর বহুবচনে স্বরান্ত শব্দের উত্তর "নাম্" প্রত্যয় হয়। (২) আর্ম্মিণীয় ভাষায় (ক) পদান্ত না হইলে 'ই' ও 'উ' বর্ণের লোপ হয়। (খ) মূল * n. ও * m. এই দুই স্বর স্থানে 'অন্' ও 'অম্' হয়। (গ) মূল ভাষার ঘোষ বর্ণস্থানে অঘোষ বর্ণ হয়। (৩) গ্রীক ভাষায় (ক)

• r. ও • l. বর্ণস্থানে 'অর্', 'র', 'অল্', ল' হয়। (খ) স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী 'স্' বর্ণের লোপ হয়। (গ) 'জ্' স্থানে 'দজ্' হয়। (ঘ) পরোক্ষায় 'ক' (k), যেমন esteka (তস্থৌ)। (ঙ) লুঙ্-এ 'থেন্' প্রত্যয়, যেমন edothen. (৮) ইতালীয় ভাষায় (ক) n. ও m. স্থানে en ও em হয়। (খ) r. ও l. স্থানে or ও ol হয়। (গ) ভ, ধ, ঘ স্থানে ক থ, খ হয়। (ঘ) স্বরদ্বয়ের মধ্যাস্থিত s স্থানে z বা r হয়। (৫) জর্ম্মণীয় ভাষায় (ক) n. m. r. l. স্থানে un, um, ur ul হয়। (খ) গ্রীমের আবিষ্কৃত বিধির প্রয়োগ এই ভাষায়। বিশপ্ উলফিলাস (Bishop Ulfilas) খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে যে ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেই গথিক (Gothic ভাষাই এই শ্রেণীর মধ্যে প্রাচীনতম। (৬) বাল্টোস্লাবিক ভাষায় (ক) n. ও r. স্থানে in ও ir হয়। (খ) স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যুক্তব্যঞ্জনের সরলতা হয়। (গ) প্রত্যয়ের ব্যবহার বিষয়ে কয়েকটী বৈশিষ্ট্য। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে কৃত বাইবেলের অনুবাদই এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। (৭) কেল্টিক ভাষায় 'এ স্থানে 'ই', এবং r. ও l. স্থানে ri ও li হয়। আয়রলণ্ড, স্কটলণ্ড, মানদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে এখন এ ভাষা আছে। পূর্ব্বে ফ্রান্স ও ইউরোপের পশ্চিমাংশে এই ভাষা প্রচলিত ছিল। (৮) আলবানীয় ভাষার প্রকৃতি কয়েকখানি প্রাচীন লিপি হইতে খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকে নির্ণীত হয়। তুর্কী, রোমান্স্ ও স্লাবনীয় ভাষার অপূর্ব্ব মিশ্রন এই ভাষায় দেখা যায়। (৯) তোখারীয় ভাষা ১৯০২-৩ ও ১৯০৪-৫ সালের অন্বেষণে তুর্ফান নামক স্থান হইতে জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

আর্য্যভাষাসমূহের এই শ্রেণীবিভাগ সর্ব্বসম্মত হইলেও ইতি পূর্ব্বে আরও অনেক প্রকারে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল। নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগটিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইউরোপীয় কতিপয় ভাষায় যেস্থানে তালব্য ক (c, k, বা q.) উচ্চারণ হয় সেস্থানে আবেস্তা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় শ উচ্চারণ হয়। এইজন্য আর্য্যভাষাসমূহ 'শতেম্' ও 'কেন্তম্' নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ১০০ সংখ্যাবাচক শব্দের উচ্চারণ ধরিয়াই এই শ্রেণীবিভাগ। সংস্কৃত 'শতম্', আবেস্তা 'শতেম্' (Satim), লিথুআনীয় Szimtas; লাটিন kentum (কেন্তম্), গ্রীক 'হেকাটোন্', কেল্টিক 'cet' (from 'kent' গথিক hund, তোখারীয় kandh, ইত্যাদি। সুতরাং প্রথম (শতেম্) শ্রেণীর ভাষা (১) ভারতীয়-ইরানীয়, (২) আর্মিনীয়, (৩) আল্‌বানীয়, (৪) লিথু-স্লাবনীয়; আর দ্বিতীয় (কেন্তম্) শ্রেণীতে (১) লাটিন, (২) গ্রীক, (৩) জর্ম্মণীয়, (৪) কেল্টিক ও নবাবিষ্কৃত (৫) তোখারীয়।

ইহা ছাড়াও কিন্তু বহু সাদৃশ্য এই ভাষা সমূহের পরস্পর প্রভাবের পরিচয় দিতেছে। (ক) স্পর্শ ঘোষ বর্ণ স্থানে অঘোষ; বর্ণের উচ্চারণ হয় (১) জর্ম্মনীয় ও (২) আর্ম্মাণীয় ভাষায়; আর তাহা হয়না (১) সংস্কৃত, (২) গ্রীক, (৩) লাটিন, (৪) স্লাবনীয় ভাষায়। এইরূপ লক্ষণ দেখিয়া হার্ট (Hirt) প্রাচ্য-আর্য্য ভাষা ও পাশ্চাত্য আর্য্যভাষা (West Indo-german and East Indo-german) নামে দুই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। (খ) গ্রীক ও লাটিন ভাষায় ১) মহাপ্রাণ ঘোষ বর্ণ স্থানে মহাপ্রাণ শ্বাসবর্ণ হয় ষষ্ঠীর বহুবচনে আকারান্ত শব্দের উত্তর সর্ব্বনামের ন্যায় asom প্রত্যয় হয়। (৩) ও কারান্ত শব্দ মাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ। (গ) গ্রীক ও ভারত-ইরানীয় ভাষায় অনুনাসিক স্বর (Sonant nasal) লুপ্ত থাকে। (ঘ) গ্রীক ও আবেস্তা ভাষায় (১) পদাদি 'স' স্থানে 'হ' হয়। (২) স্বরবর্ণের নানাভাবে বিকাশ দেখা যায়।

এই সকল নানা লক্ষণ দেখিলে ভাষার শ্রেণীবিভাগ অসম্ভব বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। তাই এখন শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতের আস্থা কমিতেছে।

পদবিন্যাস-প্রণালীর তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া নাম করিয়াছেন ডেলব্রুক (Delbruck)।

প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষের ব্যাকরণ শাস্ত্রে পদবিন্যাস বিষয়ক চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তুলনামূলক আলোচনা অতি আধুনিক যুগেই হইয়াছে। বপের সময়েও পদবিন্যাস প্রণালী অনাদৃত ছিল। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে ল্যাঙ (Lange) এ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখেন

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ

শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত

তাহা ছাড়া আর এ বিষয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত কেহ কিছু লেখেন নাই। অবশেষে নব্যতন্ত্রীদিগের যুগে উইন্‌ডিস্ (Win isch) ও ডেল্‌ব্রুক্ তাঁহাদের Syntaktische Forschungen (1871-88) প্রকাশিত করেন। এক্ষণে ব্রুগমান Vergleichende Grammatik বা আর্য্যভাষার ব্যাকরণ নামক বিরাটগ্রন্থের পঞ্চম ভলুমে Vergleichende Syntax (1893) নামে এই বিষয় অন্তর্নিবেশিত করিয়াছেন এই ভলুমের ইংরেজী অনুবাদ এখনও হয় নাই এই অংশের সম্পাদক ব্রুগমান ও ডেলব্রুক্।

ছন্দঃশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনায় Westphal ও Sieversএর নাম উল্লেখযোগ্য। টিউটানক, বৈদিক, সংস্কৃত ও হিব্রু ছন্দের আলোচনা হইয়াছে। গদ্যের rhythm বা শ্রুতি-সুখকর মাত্রা লইয়া সাধারণভাবে আলোচনা হইয়াছে।

ছন্দঃশাস্ত্রের অনুরোধে যে ভাষায় উচ্চারণের পরিবর্ত্তন হয়, তাহার উদাহরণ বৈদিক "বিদা মঘবন্ বিদা"। এখানে 'বিদ' স্থানে 'বিদা' হইয়াছে বহুকাল পূর্ব্বে যাস্ক এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিধি রচনা করিয়াছিলেন। (১) অথাপ্যন্তে-নিবৃত্তিস্থানেষু আদি লোপো ভবতি স্তঃ সন্তীতি। (২) অথাপ্যন্তলোপো ভবতি গত্বা গতম্ ইতি। (৩) অথাপ্যুপধা লোপো ভবতি জগ্মুর্জগ্মতুরিতি। (৪) অথাপ্যাদিবিপর্য্যয়ো ভবতি জ্যোতিঃ ঘনঃ। (৫) অথাপ্যাদ্যন্তবিপর্যয়ো ভবতি স্তোকা রজ্জুঃসিকতা ইতি। (৬) অথাপি বর্ণোপজনঃ আস্থৎ ভদ্রজা ইতি॥

ছন্দের অনুরোধে উচ্চারণের পরিবর্ত্তনের উদাহরণ আমাদের প্রাকৃত কাব্য সমূহ। তুলসীদাসের রামায়ণে ইহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। পিঙ্গলকৃত প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক নিয়ম ও উদাহরণ আছে। পালি ভাষাতেও এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং ভাষাবিজ্ঞানে ছন্দঃ শাস্ত্রের মূল্য আছে।

শব্দশক্তি ও অভিধানের আলোচনায় ফরাসী পণ্ডিত ব্রেআলের (Breal) নাম সর্ব্বাগ্রে। পাউল, হুইটনি, টকার ও আর্টেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে মাথা ঘামাইয়াছেন। বিষয়টী অনালোচিত হইলেও ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহার খুব গুরুত্ব আছে। আমাদের মীমাংসা, ন্যায় ও অলঙ্কার শাস্ত্রে এ বিষয়ের আলোচনা আছে। আমাদের দেশের প্রচীন পণ্ডিতদিগের কৃতিত্বের বিষয় এযাবৎ আলোচিত হয় নাই।

ভাষা-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের দ্বারা আবিষ্কৃত ফল ও তাহার ব্যবহার।

(১) Schrader's "Reallexikon der indo-germanischen, Altertumskunde" (190) আর্য্যদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি ও সভ্যতার ভাষাবিজ্ঞান-মূলক ইতিহাস।

(২) Hirt কৃত "Die Indogermanen" (2 vols, 1905-7)

(৩) Meringer লিখিত "worter and Sachen" ও Indogermanische Forschungen" পত্রিকায় প্রবন্ধ-সমূহ।

(৪) Victor, Hehn প্রণীত "Kulturpflangen und Hanstiere" এসিয়া ও ইউরোপের গৃহপালিত পশু ও কৃষিজাত বৃক্ষাদির বিবরণ। ৫০ বৎসরের প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই শ্রেণীর বহু গ্রন্থ নানা ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

আর্য্যদিগের প্রত্নানবাস—(১) এসিয়া, (২) সুইডেন হইতে ককেসস্ পর্য্যন্ত বহু দেশ, (৩) উত্তর ইউরোপ, (৪) এবং মেরু সন্নিহিত কোনও দেশ আর্য্যদিগের নিবাস-ভূমিত্বের দাবি করিয়া ক্রমে ক্রমে নানা উকীলের মুখে আপন আপন জবানবন্দি করিয়াছে এবং সকল মামলা ডিসমিস হওয়ার পর শেষ মামলাটী এখন চলিতেছে।

এ সকল বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোনও আবিষ্কার হয় নাই।

বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষাসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা হইয়াছে। Sweet's "History of Language" (1900) এ বিষয়ে ভাবিবার বই। ব্রুগমান যেমন মূল আর্য্যভাষার আনুমানিক পুনর্গঠন করিয়াছেন, মোলের (Moller) সেইরূপ প্রাচীন সেমেতিক ভাষার পুনর্গঠন করিয়াছেন (১৯০৭)। মূল আর্য্যভাষার সহিত মূল সেমেতিক ভাষার তুলনামূলক আলোচনাও হইয়াছে। কিন্তু এ প্রকার কাল্পনিক ভাষা দ্বয়ের আলোচনায় সুফল ফলিবে মনে হয় না। ১৮২৮ খৃঃ

অব্দে ক্লপ্রথ (Klaproth) এ আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। সেমেতিক ও হেমেতিক বংশে যে সাদৃশ্য আছে তাহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। চীনাভাষা ও আর্য্য-ভাষার মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে।

কয়েকটী অদ্ভুত আবিষ্কার

(১) জর্ম্মণ সম্রাটের অভিভাবকতায় Grun wedel, Le coq (ও Stein পূর্ব্ববর্ত্তী) প্রভৃতি কর্ম্মিগণ পূর্ব্ব-তুর্কীস্থানে মাটি খুঁড়িয়া বহু প্রাচীন বস্তুর আবিষ্কার করিয়াছেন।

২। স্পিসেল, মেলর, সাগ্‌লিঙ্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বার্লিন একাডেমীতে বহু প্রাচীন আদর্শ বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিয়াছেন।

(৩) St. Petersburg Academyতে Salamenn এ বিষয়ে অনেক কথা পাড়িয়াছেন।

এই সকল আবিষ্কারের মধ্যে কেণ্টুম্ (Centum) শ্রেণীর ভাষার উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। এটী ভাষা-তাত্ত্বিকগণের নিকট বিচিত্র সমস্যা। এ সমস্যার পূরণ হয় নাই।

ভাষাবিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন মতভেদ

(১) আর্য্যভাষার প্রত্যয়-সমূহের সর্ব্বনামমূলতা বিষয়ক মতবাদের স্থানে কোনও সন্তোষজনক মতবাদের প্রতিষ্ঠা না হইলেও ইহার উপর পণ্ডিতদিগের শ্রদ্ধা কমিতেছে।

(২) Hirt বিশেষ্য হইতে (নামধাতু-রূপে) ক্রিয়ার উৎপত্তি বিষয়ে যে সমাদৃত মতবাদের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে বহু সমস্যার সমাধান হয় না বলিয়া মতের প্রতি শ্রদ্ধাহানি হইতেছে। অথচ তাঁহার মতে কিছু সত্য আছেই।

(৩) প্রাচীনের স্থানে নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দ গঠিত হইতেছে।

(৪) মূল আর্য্যভাষার পুনর্গঠন ও আর্য্যদিগের প্রাচীন বিবরণের বিষয়ে সাধারণতঃ অভক্তি জন্মিতেছে। দুহিতা গোদোহন করিত কি না সে কথার অকাট্য প্রমাণ কিছু নাই। 'অস্তি' শব্দের মূল *'esti' কি না তাহাই বা কে বলিতে পারে ?

এক্ষণে নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সাক্ষ্যের সহিত ভাষার সাক্ষ্য মিলাইয়া লওয়া হয়। মতবাদ সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত না হইলে অকাট্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

ভাষা-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আরও কত বিস্তৃত বিভাগ ও বিভিন্ন বিষয়িণী আলোচনা চলিয়াছে ও চলিতেছে, তাহার বিবরণ এক নিশ্বাসে দেওয়া যায় না। ভবিষ্যতে আলোচনার ইচ্ছা রাখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।*

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

* শান্তিপুর পঞ্চম বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে পঠিত।

প্রত্যাবর্ত্তন

চতুর্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মা

অসময়ে বিবাহের সাধে কাকার বিরুদ্ধে প্রফুল্লর মন একেই আগে হইতে তাতিয়াছিল, মনে মনে সে তাঁহাকে দুর্ব্বল-চিত্ত বলিয়া অভিযোগও করিতেছিল; তবু তিনি যে প্রফুল্লকে এমন নীচ বা স্বার্থপর বলিয়া ভাবিতে পারেন, এ কথা সে কোনদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই! প্রফুল্লকে,—ফুলুকে তিনি শেষে কিনা তাঁর প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ভাবিতে পারিলেন! কি ঘৃণা! আর কি সে দুরদৃষ্ট! ইহার পর সংসারের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে

পর করিল, কামিনী-কাঞ্চনের সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া সে তাহার সবটুকু সামর্থ্যই এবার দেশ-সেবার কোন মহানতম কার্য্যেই প্রয়োগ করিবে।

জীবনে অনেক কিছু করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সে এতদিন মনে মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছিল। আজ যখন পাখীর পালকের হাওয়া না লাগিতেই তাহার অতিভঙ্গুর তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গেল, তখন সেদিক হইতে মুখ ফিরাইতে গিয়া শুধু বিস্মিত নয়—সে মর্ম্মাহত হইল। এতদিন সে তবে ধনীগৃহের আসবাবের মধ্যেই গণ্য হইয়া ছিল! আজ তাহার স্থানচ্যুতিতে কোনখানে এতটুকু বাধিল না গো! আজীবন সে তবে কেবল ভুলের উপাসনা করিয়া শুধু প্রতারিত হইয়াই আসিয়াছে। মা ছাড়িয়া জ্ঞাতির খেয়ালের স্নেহে মুগ্ধ হইয়া এই যে তার আত্মহত্যা করা, এ দৃশ্যে কি দশজনে তাহাকে ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ কাঙাল বলিয়াই মনে করিবে না! হায় রে, পরগাছা সে, বৃথাই পর-অঙ্গে জড়িত হইতে চাহিয়াছিল। ইহাতে নিজের মূল্য ত বাড়িলই না, বরং সে লতা ছাঁটিয়া ফেলায় তরু-অঙ্গ আজ স্বস্তির আনন্দই যেন অনুভব করিতেছে! তবে কেন সে এমন সর্ব্বনেশে লোভের কাজল চোখে পরিয়াছিল? ইহার পূর্ব্বাপর ভালমন্দ কিছুই সে ভাবিয়া দেখে নাই!

কিন্তু ইহার সবটুকু অপরাধই কি তার? কে এই শিশু-চিত্তকে নিরন্তর প্রলোভনে ভুলাইয়া যাহা সব-চেয়ে অসম্ভব, সেই মাতৃ-স্নেহেও সন্দেহ জাগাইয়া তার তরুণ মনে হিংসার বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল! মা তাহাকে ভাল বাসেন না! ভাই-ই তাঁর সর্ব্বস্ব, এই মিথ্যা উপদেশে অহরহ তাহার সরল মনে গরলের সৃষ্টি করিয়া নির্ব্বোধ অবিবেকী অভিমানী বালকের অস্থির মনকে বশীভূত করিয়া লইয়া আজ অনায়াসে উৎসব-গৃহের ব্যবহৃত বাসিফুলের মতই ত্যাগ করিতে পারিল! করুন্ তা, প্রফুল্ল তথাপি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছে। ভগবান্‌ও যেন করেন! কিন্তু নিজেকে সে আর ক্ষমা করিতে পারে না।

তাহার জন্ম-দুঃখিনী মা—যিনি শৈশবে পিতা,—যৌবনে স্বামী হারাইয়াছেন—সন্তান সে, সেও ত অনায়াসে তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছে! ছেলেবেলার কথা ভাল করিয়া মনে পড়ে না। তবু প্রফুল্লর কুণ্ঠিত মন বলে, হয়ত তাহার শিশু-চিত্ত ঐশ্বর্য্যের রূপেই মুগ্ধ হইয়াছিল। তাই মাতুলালয়ের সহস্র অনাটন এড়াইয়া কাকার রত্ন-মণ্ডিত অলঙ্কারই সে চাহিয়াছিল। নহিলে মা ছাড়িয়া সে আসিয়াছিল কেন? মা যখন তাঁহার মত পিতৃহীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত আতুর ভাইটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন, সে তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় না পাইয়া তাহাতে পুত্র-স্নেহের অভাবই অনুভব করিয়াছিল কেন? মার উপর সে অভিমানই করিয়াছিল। কর্ত্তব্য ত কিছুই করে নাই। কখনও জানিতে চাহে নাই, মা তাহার খাইতে পান কিনা? সংসার তাঁহার কিসে চলে? প্রফুল্লর হাসি আসিল। সে আবার দেশভক্ত বলিয়া বড়াই করে! হারে দুর্ভাগা দেশ! যার মার পেটে অন্ন যায় না,—পরণে বস্ত্র লাগে না, তাহারাই কি না মাথার পরে, দেশ-ভক্তির বিজয়-মুকুট! এমন কুসন্তানও সে জন্মিয়াছিল!

আলোকনাথের কাছে প্রফুল্ল যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তার পর এ গৃহের অন্ন গ্রহণ করা সে অনুচিত জ্ঞান করিল। কাকার আজীবনের যা-কিছু তাহার সখের ব্যবহারের জিনিষ-পত্র, সমস্ত ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় খুড়িমার সহিত দেখা করার অদম্য প্রলোভনও দমন করিল। সে জানিত, সন্ধ্যার ব্যাপার ততক্ষণে সবই তাঁর কানে উঠিয়াছে। কাঁদিয়া নিশ্চয়ই তিনি অনর্থ বাধাইবেন। তাঁহার কাতরতা এড়াইয়া সংকল্প রক্ষা করা প্রফুল্লর পক্ষেও হয়ত অসম্ভব হইবে। কাজ নাই! প্রফুল্ল চিরদিন পরের ভাবনাই ভাবিয়া আসিয়াছে, নিজের ভাবনা ভাবিবার অবসর সে কখনও পায় নাই। কারণ সে চিন্তায় সুখ ত তাহার ছিলই না, বরং দুঃখই ছিল পর্য্যাপ্ত! তাই ক্ষতগ্রস্ত অঙ্গের মত এদিকটাকে সযত্নে সে পরিহার করিয়াই চলিত।

কাকার সহিত কলহে এ গৃহের সহিত দেনা-পাওনা যখন সে সম্পূর্ণ মিটাইয়া বসিল, তখন সেই ক্ষত অঙ্গটার বেদনাই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, যে, ইচ্ছা থাক আর না থাক, ইহাকে পরিহার করিয়া চলিবারও তাহার সাধ্য নাই! কারণ এ তাহার নিজের দেহ, ইহার

ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সব কিছুই তাহার নিজস্ব। ত্যাগ করিলাম বলিলেই ত্যাগ করা যায় না। মন তাহার মার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছিল সত্য, তবু লজ্জাও হইতেছিল। নিজের জায়গায় সে যে চিরদিনই অপরিচিত অতিথির মত রহিয়া গিয়াছে! মামা হয়ত তাহার জন্য অনুকম্পায় মনে মনে হাসিবে। তবু মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঠেলিয়া ফেলিয়া সে মাতুলালয়ে যাওয়াই স্থির করিল। গ্রামের বাহিরে আসিয়া এক বন্ধুর কাছে কিছু কর্জ্জ লইয়া যাত্রা করিল। বন্ধু বিস্মিত হইলেও কোন প্রশ্ন করিল না। এমন অসময়ে কেনই বা বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়াছে, সে কথাও তাহার মনে হইল না! কারণ এই ছেলেটির খেয়ালের কথা সকলেরই জানা ছিল। মনে করিল, স্বদেশীর কোন একটা নূতন কাজে হয়ত মাতিয়াছে। এমন ত প্রায়ই সে যায়। হয়ত কাকাকে লুকাইয়া যাইতেছে, তাই অর্থের অনাটন।

প্রফুল্ল যখন মামার বাড়ীর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি হইয়াছে। শুব্ধ পল্লীর বিজনতায় গ্রামখানি যেন ইহারই মধ্যে সুপ্তিমগ্ন অনুমিত হইতেছিল। শ্রাবণের আকাশ। ক্ষণপূর্ব্বের বর্ষণ-স্নাত পূর্ণ চন্দ্র মেঘান্তরাল হইতে বাহির হইয়াছে। জ্যোৎস্না-ধারায় দিগন্ত প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, দরিদ্র পল্লী সারাদিনের পরিশ্রমের পর শ্রান্তি অপনোদনে সুখ-সুপ্ত। সে শ্রাবণ-নিশীথের রজত-জ্যোৎস্নার মাধুর্য্য অনুভব করিবার মত কেহই বড় জাগিয়া নাই! পথের ধারে গাছতলা। প্রফুল্ল দেখিল, শিবমন্দিরের পূজারী তখনও মন্দিরের পাশে বসিয়া করতাল বাজাইয়া আপন মনে ভজন গাহিতেছে। সে স্থির হইয়া একবার মন্দির দ্বারে দাঁড়াইল, তারপর আবার চলিতে সুরু করিল। তাহার ক্লান্ত দেহ বিশ্রাম চাহিতে লাগিল। মনের অবস্থাও স্বাভাবিক ছিল না। তাই সে কম্পাউণ্ডার বনবেহারীকে ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ করিতে দেখিয়াও কোন কথা কহিল না। বরং তাহার লক্ষ্য এড়াইবার জন্যই একটু দ্রুতপদে স্থানটা পার হইয়া আসিল।

দত্ত বাবুদের বৈঠকখানায় সখের কনসার্ট পার্টির রিহার্শাল চলিতেছিল, এ ছাড়া আর কোনখানে কোন শব্দ নাই।

বাড়ীর দরজায় দুই একবার ধাক্কা দিতেই ভিতর হইতে উত্তর দিয়া বুড়ীঝি আসিয়া দ্বারা খুলিয়া দিল। প্রফুল্ল ভিতরে আসিলে সে দরজায় খিল লাগাইয়া দিয়া কহিল, "সেই থেকে পথ চেয়ে রয়েচি। বলি, সত্যিই আজও আর আসবেনি!" জুতার শব্দ সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রফুল্ল দালানে উঠিতেই পাশের ঘর হইতে আওয়াজ আসিল, "দিদি বসেই আছেন। তোমার জন্যে ভারী ব্যস্ত ছিলেন। যাও ওঁর কাছে।" প্রফুল্ল সামনের দরজা দিয়া মার ঘরে ঢুকিল। বিছানার ভিতর হইতে সৌদামিনী ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমিও ঠিক ভেবেচি, তুমি আজ আসবেই!"

প্রফুল্ল অগ্রসর হইয়া মৃদু অথচ কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "আমি এবার এখানেই থাকব মা। সেখানে আমার আর দরকার হবে না। আমি এবার বরাবরের জন্যেই এইখানে এসেচি।"

প্রফুল্লর মনে হইল, সকলে যেন আজ তাহার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মা বলিলেন, "ফুলু, সত্যিই তুই ফিরে এলি?"

"হ্যাঁ মা! সেখানে আমার ছুটি হয়ে গেছে যে, তাই তোমার কুঁড়ে আর তোমার কোলই আজ আমার সবার আগে মনে পড়ল।"

"ছোট বৌ ভাল আছে?" সৌদামিনীর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও আশঙ্কা ধ্বনিত হইল।

প্রফুল্ল কহিল, "কাকীমা বেঁচে আছেন মা, ভাল থাকার ত কোন সম্ভাবনা তাঁর ছিল না। তোমার এত অসুখ—আমায় খবর দাওনি কেন মা?"

সৌদামিনী শান্তভাবে কহিলেন, "বুঝতে পারিনি এতটা বলে। প্রথমে মনে করে ছিলুম, অনেকবারই ত অমন ঝেড়ে উঠি, এবারো হয়ত উঠব। যখন বুঝলুম, তখনই তোমায় চিঠি দিয়েচি। চিঠি পেয়েছিলি ত?"

"তোমার চিঠি? না মা আমি ত পাইনি! কোথায় লিখেছিলে?"

"পাস্‌নি? তবে এলি যে! কত চিঠি মেশে দিয়েছিলুম যে। কখন কোথায় থাক—কিছুই ত জানাও না।" মার কণ্ঠস্বর অভিমান-পূর্ণ! বুঝি, শারীরিক দুর্ব্বলতায় তাহা

দুর্ব্বলও হইয়া পড়িতেছিল। সৌদামিনী খাটের বিছানায় শুইয়া ছিলেন। প্রফুল্ল তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়াছিল। সে নত হইয়া মার পায়ের উপর মুখখানা গুঁজিয়া দিয়া অশ্রুরুদ্ধ মৃদুস্বরে কহিল, "এবার প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও মা, আমায়।"

"পাগল ছেলে!. মুখ তোল্। কাছে আয়। আরো, আরো কাছে আয়। বল্ আমায় সব কথা! কি হয়েচে? ঠাকুরপো ভাল আছে?"

"আছেন। কাকা আমায় তাঁর সোনার শেকল থেকে এবার মুক্তি দিয়েছেন। তাই সেখান থেকে চিরদিনের বিদায় নিয়েই আমি চলে এসেচি। যে অনর্থকরী অর্থ আমার মা ভুলিয়ে রেখেছিল, সেও আমায় মুক্তি দিয়েচে। আমাকে তাঁদের আর দরকার হলো না, মা!"

সৌদামিনী মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমিও যে তোমার পথ চেয়েই যাত্রা পিছিয়ে রেখেছি, ফুলু! দয়াময় তোমাকে দয়া করেই আমার হাতে ফিরে দিয়েচেন!"

মাথার দিক্‌কার খোলা জানলা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো শয্যা-শায়িনীর অতি শীর্ণ পাণ্ডু মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার শয্যা-সংলগ্ন দেহের পানে এতক্ষণের পর ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া প্রফুল্ল বুঝিল, মা তাহার সত্যই এবার মহা-যাত্রার পথ ধরিয়াছেন। বুঝিয়া সে মহাভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

সে যে আজ বড় আশ্বাসে মার কোলেই আশ্রয় লইতে আসিয়াছে! এ আশ্রয়ও কি তবে তাহার ফুরাইল না কি! তাহার বিষণ্ণ মুখে ক্ষোভের মৃদু হাসি ফুটিল, এ ঠিক বিচারই হইয়াছে! মা কি এত হেলার জিনিষ যে, চিরদিনের অবজ্ঞা কর্ত্তব্য-হীনতার ত্রুটি যখন-খুসী সুবিধা-মত সারিয়া লইলেই চলিবে!

খোলা দরজা দিয়া বাহিরের উঠান দেখা যাইতেছিল। উঠান-ভরা চাঁদের আলো, রান্নাঘরের খড়ের চালে, উঠানের ধারে বাতাবি লেবু ও শিউলী গাছের উপরে আলোর ধারা লুটাইয়া পড়িয়াছিল, চালের মাথায় উচ্ছে-লতার সবুজ পাতা ও হলদে ফুলগুলি জ্যোৎস্না-স্নাত। বুড়ী-ঝি দোরের কাছে আঁচল বিছাইয়া খালি মেঝেয় শুইয়া ঘুমাইতেছিল। পাশাপাশি দু-খানি ঘরে দু-জন রোগী। বুড়া মানুষ সে, তবু কতবারই উঠিয়া রাত্রে খবর লয়। এই দুইটি ভাই-বোনকে সে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছিল। সুখের দিনে ইহাদের দেখিয়াছে, দুঃখের দিনেও মায়া-বশে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই। সৌদামিনী তাহাকে ঘুমাইতে বলিলে সে খেদের স্বরে বলে, "আর ঘুম! ঘুম কি পোড়া ববাতে আছে দিদিমণি! তুমি যে সারা রাতটা এপাশ-ওপাশ কচ্চ! তোমার রাত কি কাটবে না? আমি বুড়ো-হুড়ো মানুষ, আমার কি আর চোপর রাত ঘুম ধরে!" বলিয়া কখনো পাখা লইয়া সৌদামিনীকে বাতাস করে, কখনো গায়ে হাত বুলাইয়া দেয়, কখনো প্রফুল্লর কথা বলে। মানসিক দুর্ব্বলতায় সৌদামিনীও এখন অনেক সময় তাঁহার মনের চাপা কপাট খুলিয়া সুখ-দুঃখের কথা ঝায়ের কাছে খুলিয়া বলেন। চিরদিনের মাটি-চাপা দেওয়া বাঁধের মুখ যে এবার বন্যার টানে ধুইয়া আলগা হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যায় প্রফুল্লকে আসিতে দেখিয়া অনেক দিনের পর বুড়ী যেন একটু আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। কত বড় দায়িত্ব মাথায় লইয়া যে তাহার দিন ও রাতগুলা এতদিন কাটিতেছিল, সে কেবল সেই-ই জানে। অতীনও আজ প্রফুল্লকে দেখিয়া শান্ত হইয়া শুইয়াছে।

প্রফুল্ল ম্লান দৃষ্টি দিয়া বাহিরের জ্যোৎস্না রাত্রির মধুর সৌন্দর্য্যটুকু অর্থহীনভাবে চাহিয়া দেখিতেছিল। সৌদামিনী চোখ বুজিয়া চুপ করিয়াছিলেন। প্রফুল্ল ভাবিতেছিল, মা হয়ত এইবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সৌদামিনী সহসা চোখ চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "ফুলু, তুমি কি দেশকে—তোমার দেশকে ভালবাস, বাবা?"

"বাসি মা!" প্রফুল্ল প্রবলভাবে চমকিয়া মার দিকে মুখ ফিরাইল। মা কি বলিতে চান? এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি? মা কি এ সম্বন্ধে কিছু অনুজ্ঞা করিবেন?

"ফুলু আমার কাছে সরে এস। এইখানে এই বুকে মাথা রাখ। আঃ! বুক আমার জুড়িয়ে গেল! এত দিনের পর তোমায় আমি ফিরে পেলুম,—সেই ছোট্টবেলার ফুলুকে,—আমার সাত রাজার ধন মাণিক, আমার খোকাকে আমি সত্যি সত্যি ফিরে পেলুম! বড় শান্তি! আমি চললুম! ভগবান্ তোমায় সুখী করবেন।"

"মা, যদি এত ভালই বাসতে আমায়—তবে বিলিয়ে দিয়েছিলে কেন মা? ঘরে অমৃত-ভাণ্ড থাকতেও চিরদিনের কণ্ঠশোষ ত আমার মিটল না!"

প্রফুল্লর কণ্ঠস্বর ব্যথাহত। দুই চোখ বহিয়া তাহার জল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

দুঃখ ও করুণা-মাখা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সৌদামিনী মৃদুস্বরে কহিলেন, "ভুল করেছিলুম। ঐশ্বর্য্যের মোহে লুব্ধ হয়ে মনে করেছিলুম তোমার সুখের জন্যে তোমায় ত্যাগ করেচি। বুক দিয়ে তোমায় আমি পরের হাতে তুলে দিয়েছিলেম। সে ক্ষত এখনও আমার শুকোয়নি ত। তেম্নি টাটকা হয়ে—বুক জুড়ে দিনরাত সে বেদনায় টন্‌টন্ করেচে। তবুও অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আমার অহং ভেবেছিল, তোমার সুখের জন্যে তোমায় আমি ছেড়ে দিলুম। আমার ত্যাগ তোমায় সুখী করবে। তাই মুখেও কখনও এতটুকু স্নেহের আভাষ তোমার কাছে ফুটতে দিই নি, কোন স্নেহ তোমায় দেখাই নি। সাধারণের মত,—না, তারও চেয়ে তুচ্ছ করে তোমায় আমি ব্যথা দিয়েচি, পাছে আমায় ছেড়ে যেতে তোমার মন উতলা হয় বলে। অন্তর্য্যামী জানেন, এই ছলনায় আমার বুকের ভেতর যে মা, সে তার সর্ব্বস্ব হারিয়ে রাতদিনই মরণ-কান্না কেঁদেচে কি না!"

"ভুল তুমি একাই ত করনি মা। নীচ হিংসায় পুড়ে আমিও মনে করেছিলুম, সব ভালবাসা তোমার মামার উপর। আমায় তুমি ভালবাসনি কখনো! আমার উচিত পাওনা তাই আমায় তুমি দিতে পার্ব্বে না। মনের দোষে নিজেও সুখী হইনি; কাকেও তা হতেও দিই নি। সংসারটাকে শুধু দোকানদারী বলে মনে করেছিলুম মা। আমায় মাপ কর মা!"

"মাপ তোমায় করব, আমি! পাষাণী মা! আমি যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান আমার পরম সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলেচি, বাবা! তার শাস্তিও কি আমি পাইনি? আজীবনই ত পেলুম! দয়াময় দয়া করে এও কি আমায় বুঝিয়ে দিলেন না যে, লোভের মূল কত আলগা মাটিতে পোঁতা ছিল? যার জন্য তোমায় ছেড়ে দিলুম,—তোমায় ত তা দিতেও পারলুম না!"

প্রফুল্ল সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "সে ভালই হলো মা তাই তোমায় আমি ফিরে পেলুম। এইবার ঘুমিয়ে পড়। আমি বাতাস করি।" বলিয়া সে পাখা হাতে লইলে সৌদামিনী ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "থাক্, আমার বুক বড় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর ত কোন কষ্টই নেই, দুঃখ ঐ হতভাগাটার জন্যে কেবল—বড় অসহায়—"

প্রফুল্ল নত হইয়া মার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া করুণা-ভরা কণ্ঠে কহিল, "মামাকে আমি তোমার মতন করেই ভালবাস্‌তে শিখব মা। ওঁর সব ভার তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমায় ছেড়ে দাও। আমার অপরাধ, আমার মহাপাপের যদি তাতে একটুও প্রায়শ্চিত্ত হয়!"

সৌদামিনী অতি শীতল ক্ষীণ হাতখানি ছেলের মাথায় রাখিয়া গভীর স্নেহে মৃদুস্বরে কহিলেন, "তা আমি জানি, বাবা! তার ভার তুমিই কেবল বইতে পারবে। বড় দুঃখ ত বড় ছাড়া কেউ বইতেও পারে না! ওকে তুমি ভালবেসো ফুলু! হয়ত আমার মত সেও পথ ভুল করেছিল, আসলে লক্ষ্য তার হীন ছিল না। অতীনকে বলো ফুলু তার দিদি বলে গেছে, বীজ পুঁতলে তার ফল একদিন ফলেই। তপস্যা কখনো বিফল হয় না! সে দেখ্‌লে না, কি ক্ষতি! মানুষ ত নিজের সুখই শুধু চায় না!...তোমার মুখ আর দেখ্‌তে পাচ্চি না যে! চোখ যে আমার জড়িয়ে জড়িয়ে আস্‌চে! এ কি ঘুম! এইবার ঘুমুব কি তবে? আঃ, দয়াময়, কত দয়া তোমার! যদি না আর জাগি! জেনো তুমি, মা তোমার সুখী হয়েচে! তোমায় পাওয়া আমার সার্থক হয়েছিল!"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অরুণের ছুটি

হিমানীর কাছ হইতে অরুণ একদিন সকাল বেলার ডাকে একখানা পোষ্ট কার্ড পাইল। সে লিখিয়াছে, পূজার ছুটিতে টিকিটের অর্দ্ধ মূল্যের সুযোগে তাহারা এবার কাশী যাইবে। অরুণ ছাড়া তাহাদের যখন আপন-জন কেহ

নই, তখন তাহাকেই কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাদের লইয়া যাইতে হইবে।

পোষ্ট কার্ডখানি বার বার পড়িয়াও অরুণের মনে হইতেছিল, পড়া যেন ঠিক হইল না! অক্ষর কয়টি প্রায় মুখস্থ হইয়া গেল। কলেজ হইতে ফিরিয়া কোটের পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া সে আর একবার পড়িয়া লইল। হিমু তাহাকে ছুটিতে বাড়ী ফিরিবার তাগিদ্ দিয়াছে! সে বলিয়াছে, সে-ছাড়া তাহাদের আপনার লোক আর কেহ নাই, তাই তাহাকেই একান্ত প্রয়োজন। হিমুর কথা বলার পদ্ধতিটি কি মিষ্ট! অরুণের মনে হইল, এই স্নেহশীল পরিবারের আশ্রয় না পাইলে তাহার উদ্দেশ্য-হীন জীবন না জানি কেমন করিয়া কাটিত! প্রবাসী নিজ গৃহের জন্য যেমন ব্যাকুলভাবে ছুটির দিন প্রতীক্ষা করিতে থাকে, ঝাল্দার জন্য অরুণের মনও তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ব্যাকুল হইত না। মুক্তাঠাকুরাণী দু-খানি কম্বল ও একটি বালতির ফরমাস করিয়াছিলেন। সেগুলি সে আগে হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিল। হিমুর জন্য দুখান বই কিনিল। প্রফুল্লর সঙ্গে এবার তাহার অনেক দিন দেখা হয় নাই। সেই যে সে পরীক্ষা দিয়া দেশে গিয়াছিল—তার পর আর কোন খবরই তাহার নাই। এম্-এ পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ায় সে গেজেটে প্রফুল্লর নাম পড়িয়াছে। সে চল্লিশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। এ আনন্দের অংশ সে প্রফুল্লকে নিজ মুখে জানাইয়া তাহার সহিত তুল্যাংশে গ্রহণ করিতে পারিল না! সে তাহার মেশের দেনা মনি-অর্ডারে শোধ করিয়া সেখানকার সংস্রব মিটাইয়া ফেলিয়াছে। বাসায় যা-কিছু জিনিষপত্র ছিল—তাহা তার দেশের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবার জন্য অন্য একটি বন্ধুকে অনুরোধ-পত্র দিয়াছিল। সে পত্রে যে ঠিকানা ছিল তাহা দেখিয়া অরুণ বিস্মিত হইলেও প্রফুল্লকে সে ঠিকানায় দু-তিনখানি পত্রও দিয়াছিল; কোন উত্তর পায় নাই। জলদকে চিঠি দিয়া জানিল, সেও তাহার কোন খবর জানে না। অরুণকে প্রয়োজন-মত সে যে অর্থ-সাহায্য করিত, দুই মাস তাহাও বন্ধ ছিল, পরে এক সঙ্গে এক শত টাকার একখানি নোট সে মনি-অর্ডারে পাইল। প্রেরক প্রফুল্ল নিজে। সে ঝাউডাঙ্গা হইতে মনি-অর্ডার করিয়াছে। ঝাউডাঙ্গায় প্রফুল্লকে কখনো সে যাইতে দেখে নাই। তবে স্বদেশী-প্রচার কার্য্যে প্রফুল্ল অনেক সময় এমন অনেক জায়গায় যাইত, যাহা সে নিজেও কখনো দেখে নাই। অরুণ মনে করিল, এও হয়ত তেমনি। কিন্তু এবার সে তাহার বন্ধু-বান্ধবদের এমন কি অরুণকে পর্য্যন্ত যেভাবে সংবাদ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, এমনটা আর কখনও ঘটে নাই।

প্রফুল্লর দেশের বাড়ীর যে ঠিকানা, অরুণ দেখিল, সে ত তাহার অপরিচিত নয়। সে বাড়ী যে অরুণের অস্থি-মজ্জার সহিত চিরপরিচিত! প্রফুল্লদা তবে সেই বাড়ীরই ছেলে? তাই তিনি এমন করিয়া অরুণের কাছে আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়াছেন! অরুণ জানিত, দ্বারবাসিনীতে প্রফুল্লদার বাড়ী। তাই সে সে-সম্বন্ধে তাহাকে কখনো কখনো প্রশ্নও করিয়াছে,—সেখানকার বাহিরের লোক সকলকে না হো'ক কাহাকে-কাহাকেও সে চিনিত ত। প্রফুল্লদা তাহার এ প্রশ্নের উত্তর ঘুরাইয়া দিত। সে বলিত, তাহারা বিদেশী। অল্প কিছুদিন ওদেশে আসিয়াছে মাত্র। অরুণও নিজের লজ্জা বাঁচাইয়া এ প্রসঙ্গে আর অধিক অগ্রসর হইত না। তাহাদের অকপট বন্ধুত্বের মাঝখানে এই যে একটা প্রকাণ্ড গোপনতার দেওয়াল ছিল,—সেটাকে পুরাতন বাড়ীর পতনোন্মুখ প্রাচীরের ন্যায়ই তাহারা এড়াইয়া চলিত। প্রফুল্লর মনে হইত, সে অরুণের কাছে অপরাধী,—আর অরুণের মনের কথা সে ত অনেকবারই বলা হইয়াছে।

এবার কলিকাতায় আসিয়া সে হিমুর কাছ হইতেও বড় বেশী চিঠি পায় নাই। প্রথম চিঠিখানিতে হিমু দ্বারবাসিনীতে দিদিমার বোনঝীর বাড়ী যাইবার সংবাদ দিয়াছিল। অরুণও জানিত, আলোকনাথ মুক্তাঠাকুরাণীর আত্মীয়। সে ইহাতে বিস্মিত হয় নাই! দ্বিতীয় পত্রে সে তাহাদের ফিরিয়া আসার খবর দিয়া জানাইয়াছে, প্রফুল্লদাকে সেখানে সে দেখিয়াছে, আর তাঁহার সম্বন্ধে দেখা হইলে সে অনেক কথাই বলিবে!—এ কথার অর্থ অরুণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তবে এটুকু বুঝিল,

হিমু যখন সেখানে ছিল,—তিনিও হয়ত তখন বাড়ী ছিলেন। তবে তাহার চিঠিগুলাই বা না পাইবেন কেন? বিস্ময়ে তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া রহিলেও এ সম্বন্ধে সে হিমুকে কোন কথা লিখিল না।

ছুটিতে অরুণ আসিলে তাহাকে দেখিয়া অনেকেই খুসী হইলেন; তাহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সব-চেয়ে খুসী হইল হিমু। হিমুকে দেখিয়া অরুণ বিস্মিত হইল। এই তিন চারি মাসের ব্যবধানে তাহার যেন অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মাথাতেও সে বাড়িয়াছে যেমন, সৌন্দর্য্যেও তার চেয়ে কিছু কম বাড়ে নাই। তাহার শ্বেতপদ্মের ন্যায় শুভ্র বর্ণে গোধূলির গোলাপী আভা কে যেন মাখাইয়া দিয়াছে! চঞ্চল মৃগশিশুর গতি বুঝি আর তেমন উদ্দাম নাই! তাহা মন্থর হইয়া আসিয়াছে। চোখের সে দুষ্টামিভরা হাস্য-চঞ্চল দৃষ্টিতেও যেন বিদ্যুদ্দাম তুল্য চকিত শঙ্কিত ভাব! তাহার স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহখানিও কৃশ হইয়া গিয়াছে,—তবু তাহাতে রমণীয়তার অভাব নাই। পল্লাবনী পুষ্পভার নম্রা লতার মত সে দেহে মাধুর্য্য যেন আর ধরিয়া রাখা যাইতেছে না। দেখিয়া অরুণ বিস্ময়ের চেয়ে ব্যথাই অনুভব করিল বেশী। মনে হইল, হিমু এবার তাহার অধিকারের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ইহার সহিত অসঙ্কোচে কথা বলার দিনও বুঝি এবার ফুরাইয়া আসিল! এ চিন্তায় অনিচ্ছাতেও তাহার অন্তর ভেদ করিয়া একটা ব্যথার দীর্ঘশ্বাস উদ্গত হইল।

আকৃতির সহিত হিমুর প্রকৃতির বাহ্য পরিবর্ত্তন অরুণের চোখে তেমন করিয়া ধরা পড়িল না। সে পূর্ব্বের মতই অসঙ্কোচে অরুণের সহিত গল্প সুরু করিয়া দিল। তাহাদের দ্বারবাসিনী যাওয়ার গল্পই এবারকার প্রধান বর্ণনীয় ঘটনা!

অরুণ শুনিল, প্রফুল্ল আলোকনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র এমনি একটা সংশয়ের মেঘ তাহার মনেও সময় সময় উদয় হইত। সে তাহাকে আকার দিতে পারিত না! এ পরিচয় লাভে সে আনন্দই অনুভব করিল! মনে হইল, ইন্দ্রনাথের স্থানে একদিন তাঁহার যোগ্য উত্তরাধিকারী তবে স্থান পাইবে! হিমু অন্য সব পরিচয় দিলেও প্রফুল্ল যে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, সে কথাটি বাদ দিয়া গেল। সে ঘটনা মুক্তাঠাকুরাণীই সালঙ্কারে বিবৃত করিলেন—অরুণ জানুক, কেমন ভাল তাহার বন্ধুটি! যদিও প্রফুল্লকে বিবাহের কথা বলিতে তিনি নিজে শুনেন নাই, তবু রাধাচরণ-প্রমুখ দাসদাসীবৃন্দের কথা ত আর মিথ্যা হইতে পারে না! রাধু নিজের কানে প্রফুল্লকে "হিমু, হিমু" বলিতে শুনিয়াছে। কাকাকে সে কিছুতেই বিবাহ করিতে দিবে না, বলিয়াছে। আর শুনিবার বাকী কি! একরোখা ছেলেটির অবাধ্যতার উচিত শাস্তিও যে হইয়া গিয়াছে, মুক্তা ঠাকুরাণী খুসী হইয়া সে কথাও জানাইলেন। শুনিয়া অরুণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। সমবেদনায় বন্ধুর জন্য যে ব্যাকুলতা সে অনুভব করিতেছিল, তাহার কোন উল্লেখও সে অস্থানে প্রকাশ করিল না। মন যদিও তাহার প্রফুল্লর সন্ধানের জন্য ব্যগ্র হইতেছিল—তবু এতগুলি দেবদর্শন-আশায় ব্যাকুল চিত্তের অনুরোধ সে প্রত্যাখ্যান করিতেও পারিল না। ইঁহারা যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন! এখন আর সে না বলে কেমন করিয়া? ফিরিয়া আগে বন্ধুর সংবাদ লইয়া তবে সে নিজের কাজে মন দিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

বৈদ্যুতিক বাড়ী *

কলিকাতার পথে প্রথম মোটর গাড়ী চলিতে দেখিয়া আমাদের পাড়ার শিবরাম গোঁসাই বলিয়াছিলেন,—এ যা কাণ্ড দেখলুম, হ্যাঁ, এ একেবারে অদ্ভুত! এর পর কোন্ দিন দেখ্‌ব, বাড়ীতে চাকর-বাকর রইল না, তাতে কি! কল্ টিপলে চাকরের কাজ তোমাদের ঐ ইলেক্‌ট্রিসিটিই করে দিয়ে যাবে! তোমার বাড়ী এলুম, তামাক খেতে চাই—চাকরকে ডাকবার দরকার হবেনা,—কল টিপব আর অমনি সাজা কল্‌কে শুদ্ধ হুঁকো এসে হাতে হাজির হবে! তখন এ কথায় হাসিয়া ছিলাম।

ফটক খোলা

কিন্তু এখন দেখিতেছি, গোঁসাইয়ের সে কথা আর হাসিয়া উড়াইবার মত নয়। একজন ফরাসী ভদ্রলোক এমনি বাড়ীই তৈয়ার করাইয়াছেন—তাঁর নাম জর্জ্জিয়ান্যাপ। ট্রয়ে তিনি থাকেন; তাঁর বাড়ীর নাম Villa Feria Electra. পথের ধারে ছোট-খাট বাড়ীখানি। বাড়ীর ফটক বন্ধ থাকে।
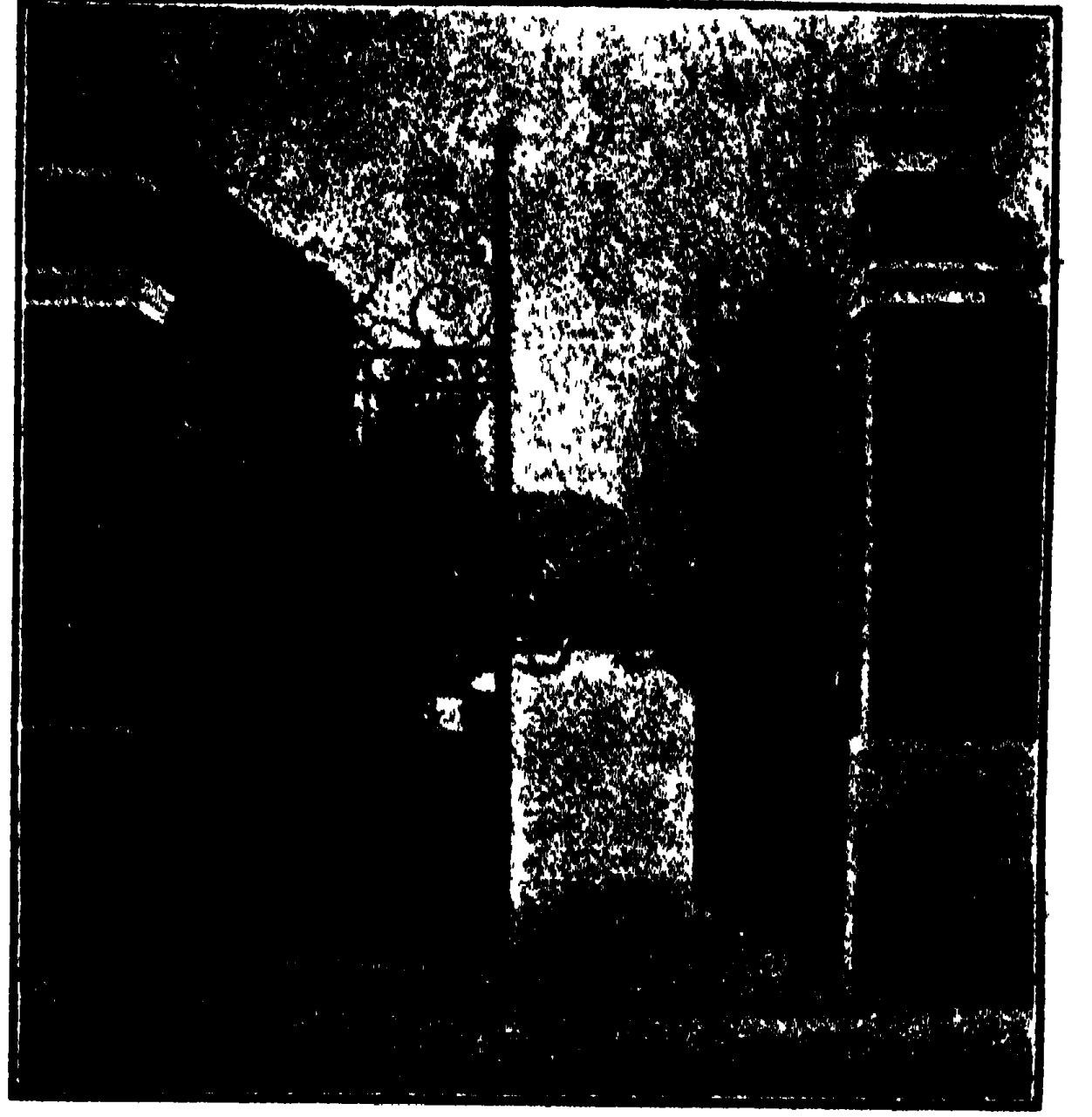
ইলেকট্রিক বাড়ী

ফটকের একধারে একটি ইলেকট্রিক্ সুইচ বোতাম আছে। তুমি ভিতরে যাইতে চাহিলে বাহিরের ফটকের সেই বোতামটি টেপো, অমনি একটা আলোর সূক্ষ্ম রেখা তোমার মুখে আসিয়া পড়িবে ও সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ শুনিবে,—ভিতর হইতে কে বলিতেছে,—"কে?" তুমি লোকটা কে, গৃহস্বামী তাহা দেখিয়া লইলেন! তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কিড়িং করিয়া একটা শব্দ শুনিবে ও ফটক খুলিয়া যাইবে। তুমি ভিতরে ঢুকিলে ফটক আবার বন্ধ হইয়া যাইবে। রাত্রি-বেলায় ফটক বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে, যাইবার পথ আলোয় আলো হইয়া গিয়াছে। তারপর ভিতরে ঢুকিয়া যে দ্বার দেখিবে, সে দ্বারও বন্ধ। দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেই দ্বার আপনি খুলিয়া যাইবে! ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই একটা পাপোষ, সেই পাপোষে দাঁড়াইবামাত্র কোথা হইতে অদৃশ্য ব্রশ আসিয়া তোমার জুতার ধুলা-কাদা ঝাড়িয়া দিবে।

তারপর কথাবার্ত্তা সারা হইলে ডিনার-টেবিলে খাইতে বসিয়া দেখিবে, কোন লোক আসিয়া পরিবেষণ করিতেছে না; এবং টেবিলটাও সাধারণ টেবিলের মত নয়। টেবিলটি বেশ বড়। মাঝখানে কাচের প্রকাণ্ড ডিশ—তাহাতে ফুলদানী, ফলদানী। ফুলদানীতে নানাবর্ণের ফুল, ফলদানীতে বিবিধ ফল। কাচের ডিশখানির আকার ঠিক হাঁসের ডিমের মত। টেবিলের একপ্রান্তে একখানি গোল রেকাবি আছে। বাড়ীওয়ালা জর্জ্জিয়াস্থাপ্ সেইখানে বসেন। তাঁর ডানদিকে একরাশ ইলেকৃট্রিক বোতাম; কতকগুলির রং সাদা আর কতকগুলির রং কালো। তারপর ঘরে আলো বাড়াইতে চাও তো, তাহারও ব্যবস্থা আছে। ঘর ঠাণ্ডা বোধ হইলে তাহাও দরকার-মত গরম করার ব্যবস্থা আছে।
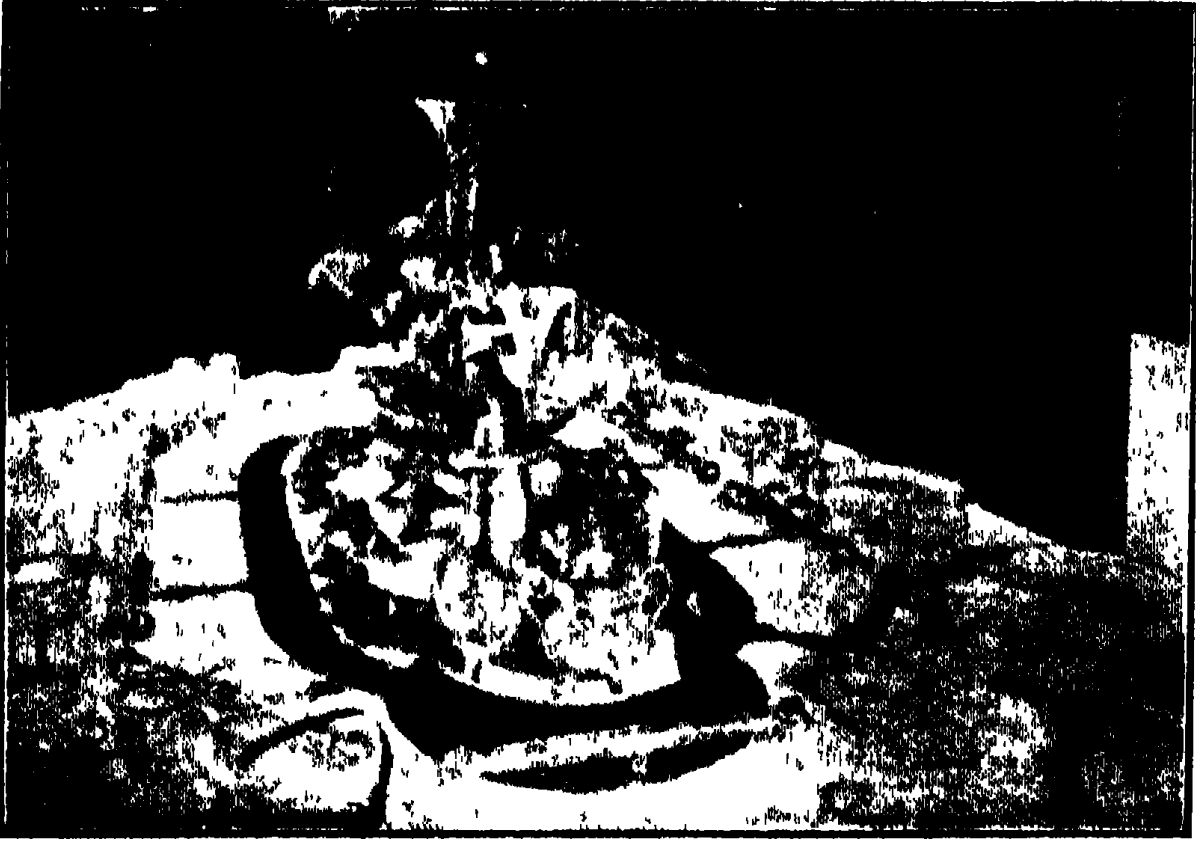
ডিনার-টেবিল

সকলে খাইতে বসিলে জর্জ্জিয়াস্থাপ সেই ছোট গোল রেকাবিটা যেমন হাতে তুলিয়া লন, অমনি পাশের কামরার খোলা দ্বার দিয়া সুপের পাত্র আসিয়া হাজির হয়। এবং একটা বোতাম টিপিবামাত্র সে পাত্র স্থাপের সম্মুখে আসিয়া টেবিলে নামে। পাত্রের সঙ্গে বড় একখানি চামচ আছে। এই পাত্র চামচ-সমেত সকলের সামনেই ক্রমে ক্রমে আসিতে থাকে। স্থাপ শুধু কতকগুলা বোতাম টিপিয়া ধরেন। তারপর গোল রেকাবিখানি টেবিলে পূর্ব্বের মত রাখিবামাত্র সুপের পাত্র আবার তাহার নিজের জায়গায় চলিয়া যায়।
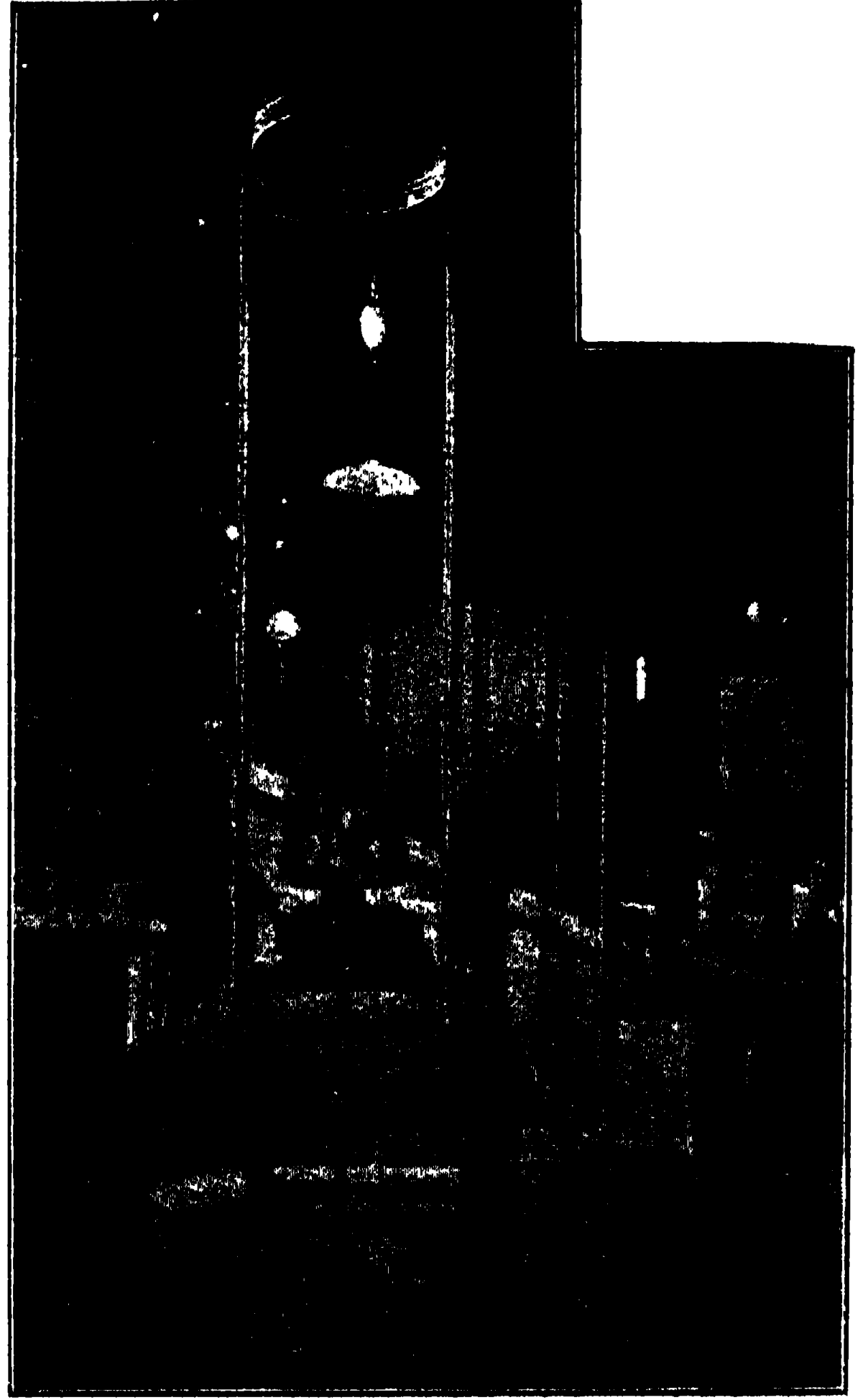
রান্নাঘর

তারপর অন্যান্য ডিশও বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ আসিয়া হাজির হয় এবং সকলে নির্ব্বিঘ্নে আহার শেষ করে।

রান্নাঘরটি খাইবার ঘরের ঠিক পাশেই—সেখানে নানা কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জাম।

এই সাজ-সরঞ্জাম-সমেত বাড়ীখানি তৈয়ার করিতে স্থাপের পনেরো বৎসর সময় লাগিয়াছিল। রান্না-বান্নাও ঐ বোতাম টেপার সাহায্যেই চলিয়া থাকে!

শ্রীকনক মুখোপাধ্যায়।

পেটের ব্যায়াম •

ব্যায়ামের নাম শুনলেই বাঙালী ভয় পায়, কিন্তু ব্যায়ামের মতন সহজ ব্যাপার দুনিয়ায় খুব কমই আছে। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে এবং উপকারের মাত্রাটা বুঝলে, ব্যায়াম ছাড়তেই তখন কষ্ট হবে। মুগুর, বারবেল ও ডাম্বেল না নিয়েও, শুধু-হাতে এত-রকমের ব্যায়াম আছে যে, তার সবগুলির পরিচয় দেওয়াই শক্ত। আমরা প্রতিমাসেই এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

ব্যায়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য, দেহকে সর্ব্বদাই তৈরি রাখা। যাঁরা ভীমের মতন পালোয়ান হয়ে বাহাদুরি কিনতে চান, তাঁরা রোজ পাঁচশো ডন, হাজার বৈঠক দিন এবং দু-তিন মণ ওজনের ভারি বারবেল তুলুন, বা আর-যা-খুসি হয় করুন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যহ পনেরো মিনিট ব্যায়ামই যথেষ্ট; বড়-জোর আধ ঘণ্টা। তাঁদের ভারি মাল তুলতেও বলছি না—এমন-কি মাল না তুললেও চলবে। হাল্‌কা-রকমের নিয়মিত ব্যায়ামেই তাঁদের দেহ এমন তৈরি হয়ে উঠবে যে, শ্রান্তি, অবসাদ, রোগ ও অকাল-জরা তাঁদের কাছেই ঘেঁসতে পারবে না।

১নং ছবি
পেটের ব্যায়াম •

বিশেষজ্ঞের মতে, দেহ তৈরি ও সবল কিনা, তা পেটের মাংসপেশী দেখ্‌লেই বুঝা যায়। যার পেটের মাংসপেশী শক্ত নয়, বুঝতে হবে তার অন্যান্য দেহ-যন্ত্রও কিছু-না-কিছু বিকল অবস্থায় আছে। কারণ দেহের ভিতরকার

২নং ছবি
পেটের ব্যায়াম

৩নং ছবি
পেটের ব্যায়াম

৪নং ছবি পেটের ব্যায়াম

যা-কিছু গোলমাল, তার অধিকাংশেরই প্রথম উৎপত্তি ঐ যত-নষ্টের-গোড়া পেটের মধ্যেই।

পেটের একটি খুব ভালো ব্যায়াম হচ্ছে এই :—একখানি হাতল-ওয়ালা চেয়ারে বসুন। তারপর চেয়ারের দুই হাতল দুই হাতে চেপে ধ'রে এবং হাতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে দেহকে উপরদিকে যতটা পারেন টেনে তুলুন। সেই সঙ্গে পাদুটিকেও সাম্‌নের দিকে সরল ভাবে ছড়িয়ে দিন। অর্থাৎ এই ব্যায়ামের সময় দেহের আকার হবে, ইংরেজী "L" হরফের মত। এর দ্বারা একসঙ্গে উদর, বাহু ও স্কন্ধের মাংসপেশী সঞ্চালিত হবে। যতক্ষণ না হাঁপিয়ে পড়েন, ততক্ষণ বারংবার এই ব্যায়ামটি করতে হবে। (১নং ছবি দেখুন)

দ্বিতীয় ব্যায়াম মাটির উপরে। ডন দেওয়ার মত ভঙ্গীতে, ঠিক দুই কাঁধের নীচে সরলভাবে হাত রেখে, মেঝের উপরে অবস্থান করুন। (২নং ছবি দেখুন) তারপর ধীরে ধীরে কনুইয়ের কাছ থেকে হাত নুইয়ে আমুন এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে কোমরের কাছ থেকে দেহকে উপরদিকে টেনে তুলুন—যতক্ষণ-না অগ্রবাহু ঘরের মেঝের উপরটা স্পর্শ করে। (৩নং ছবি) তারপর চাপ দিয়ে হাত মাটি থেকে তুলে, দেহকে এমন ভাবে নামিয়ে আমুন, যাতে আপনার বুকটা মাটির উপরে এসে পড়ে। (৪নং ছবি) তার পর আবার দেহকে প্রথম অবস্থায় এনে এই ব্যায়ামের পুনরাবৃত্তি করুন।

দ্বিতীয় ব্যায়ামটি যতদিন-না বেশ সড়োগড়ো হয়ে আসে, ততদিন খুব আস্তে-আস্তে ধীরে-সুস্থে করবেন। প্রত্যেক-বারের মাঝে আধ মিনিট বিশ্রাম নেবেন। প্রথমে দু-তিন বার ক'রে সুরু ক'রে প্রতি দুইদিন অন্তর ব্যায়ামের সংখ্যা বাড়াবেন। অভ্যাস হয়ে গেলে পর প্রত্যহ নিদ্রাভঙ্গের পর ও শয়নের আগে এই ব্যায়াম করা উচিত।

তৃতীয় ব্যায়াম। সোজা হয়ে দাঁড়ান। দু পাশে দুই বাহু লম্বিত রাখুন। আস্তে আস্তে নিশ্বাস নিন ও সেই সঙ্গে বুকটা সাম্‌নের দিকে স্ফীত করুন এবং উদর-দেশ ভিতর-দিকে যতটা পারেন সঙ্কুচিত ক'রে আনুন। এই ব্যায়ামের সময়ে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ থাকবে এবং সর্ব্বশরীর

৫নং ছবি
পেটের ব্যায়াম

প্রাণপণে কঠিন ক'রে তুলবেন। তারপর আবার আস্তে আস্তে নিশ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহকেও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনুন। (৫নং ছবি)

চতুর্থ ব্যায়াম। দুইপাশে দুই বাহু রেখে, মেঝের উপরে, একটা আলমারির সাম্‌নে চিৎ হয়ে দেহ সরল ভাবে ছড়িয়ে শুয়ে পড়ুন। তারপর আলমারির তলায় দুই পা আটকে ধীরে ধীরে উঠে বসুন। তারপর আবার শুয়ে পড়ুন। আবার উঠুন। এম্‌নি বারংবার—যতক্ষণ না শ্রান্ত হন।

পেট শক্ত ক'রে তার উপরে প্রথমে আস্তে আস্তে চড় ও ঘুসি (গাঁট্টা নয়) মারার অভ্যাস করবেন। ক্রমে ঘুসি ও চড়ের জোর বাড়াবেন। এতেও উদরের মাংসপেশী খুব কঠিন ও আঘাতসহ হয়ে ওঠে।

এই উদরের ব্যায়ামের ফল যে কি আশ্চর্য্য, আপনারা নিয়মিত-রূপে মাস-তিনেক অভ্যাস করলেই তা বুঝতে পারবেন। একবৎসরে আপনার দেহের উন্নতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দেহের অন্যান্য স্থানের ব্যায়ামের কথা আমরা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করব।

ঠাণ্ডা আলো

সব আলোতেই তাপ আছে। কিন্তু সংপ্রতি বৈজ্ঞানিকরা এমন এক আলোর আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন, যাতে মোটেই তাপ নেই। বৈজ্ঞানিকদের মতে

কুচো আগুন-চিংড়ী

আলোচোখো মাছ

এটা নাকি অসম্ভব নয়। পৃথিবীতে অনেক জাতের পোকা-মাকড় ও মাছ দেখা যায়, তাদের দেহ আগুনের মতন জ্বলে। এর মধ্যে জোনাকীকে সকলেই দেখেছেন। তাদের দেহের মধ্যে ও-রকম বিশেষত্বের কারণ, luciferin নামে একরূপ পদার্থ। জ্বলন্ত জীবদের দেহ থেকে ঐ জিনিষটিকে আলাদা করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকরা এতদিন ধ'রে যথেষ্টই চেষ্টা করছিলেন। কারণ তা'হলেই উত্তাপহীন আলোক আবিষ্কারের আশা সফল হবে। সংপ্রতি একজন বৈজ্ঞানিক "Cypridina" নামে একজাতীয় ক্ষুদ্র সামুদ্রিক বর্ম্মধর জীবদেহ থেকে ঐ জিনিষটি বার ক'রে নিয়ে জমাতে পেরেছেন। তাথেকে এমন উজ্জ্বল আলো পাওয়া যাচ্ছে, যার সাহায্যে অনায়াসেই লেখাপড়া করা চলে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, জ্বলন্ত জীবরা তাদের দীপ্তিকে শত্রুকে ভয় দেখিয়ে কবল থেকে ছাড়ান পাবার মতলবেই ব্যবহার করে। এ-রকম জ্বলন্ত জীবের সংখ্যাও বড় কম নয়। দু-একটির নাম করছি। একরকম মাছ আছে, তাদের নাম "photoblephron", তারা সমুদ্রের বাসিন্দা। তাদের দুই চোখের একটু তলাতেই দুটি জায়গা আছে, যেখান থেকে আলোর আভা প্রকাশ পায়। যখন সেই আলোর দরকার থাকে না, তখন তারা একরকম কালো রঙের পর্দ্দা দিয়ে আলোটা ঢেকে ফেলে। এই দীপ্যমান শরীর-যন্ত্রকে দেহ থেকে কেটে নিলেও নিবে যায় না।

বাণ্ডাদ্বীপের জেলেরা রাত্রে মাছ-ধরবার টোপ-রূপে তা ব্যবহার ক'রে থাকে। তাছাড়া সমুদ্রে জলহাওর, চিংড়ী-মাছ, জেলিমাছ ও নানা-রকমের পোকাও দেখা যায়।

কাজীর ছুটি চাই

বিজ্ঞান এতদিন পরে আর-একটি নূতন আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। আমেরিকার ডাঃ ক্র্যাম্পটন একরকম পরীক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যার দ্বারা খুব সহজেই বোঝা যাবে যে, আপনার শরীর কর্ম্মশ্রান্ত হয়ে পড়েছে কিনা? আপনার কি ছুটির দরকার? কেন দরকার এবং কতদিনের ছুটির দরকার?

দু-চার কথায়, মোটামুটি ব্যাপারখানা এই:—আপনি যখন দাঁড়িয়ে থাকেন তখন মাধ্যাকর্ষণের ফলে আপনার দেহের রক্ত নীচের দিকে নেমে আসে এবং আপনার দেহের বিরুদ্ধ শক্তি তাতে বাধা দেয়। এই প্রতিরোধ-শক্তির কম-বেশী মাত্রা নির্ণয় করতে পারলেই, আপনার মস্তিষ্কের ও মাংসপেশীর জোর এবং শ্রান্তির ফলাফল সম্বন্ধে অনেক গুপ্ততথ্য জাহির হয়ে পড়ে। এই আবিষ্কার আপিসের কর্ত্তা, শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ, ব্যায়াম-বীর ও দেহচর্চ্চা-শিক্ষকদের যথেষ্ট উপকারে আসবে। এই পরীক্ষার ফলাফল দেখে কাজ করলে কেরাণী ও ছাত্ররা ঠিক সময়ে ছুটি পাবে। ফুটবল প্রভৃতি খেলার ক্ষেত্রে গতি, কৌশল ও শক্তির দরকার। ডাক্তাররা পরীক্ষা ক'রে উপযোগী খেলোয়াড় বেছে দিতে পারবেন।

ডাঃ ক্র্যাম্পটন এই প্রসঙ্গে আরো দেখিয়েছেন যে, প্রাণ-খোলা হাসির কি গুণ, রাতে কাজ করলে এবং ঘুমের অভাব হ'লে আমাদের দেহ কেন ভেঙে পড়ে, গরমজলে স্নান করলে কেন আমাদের দেহের সেই অংশ এলিয়ে পড়ে—যে অংশে মস্তিষ্ক থেকে রক্ত সঞ্চারিত হয় এবং ব্যায়ামের দ্বারা পেটের মাংসপেশী সঞ্চালন করলে কেন আমাদের দেহের স্বাস্থ্য ভালো থাকে!

পরীক্ষার দ্বারা তিনি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করেছেন যে, সারাদিনের খাটুনির পর আটঘণ্টার ঘুমও যথেষ্ট নয়। বেলা ন'টা থেকে বৈকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত এই আটঘণ্টা

বই-পড়ার নিখুঁৎ কায়দা

যারা খাটে, সন্ধ্যায় তাদের দৈহিক শক্তি দশ পার-সেণ্ট কমে যায়। সেই অভাব পূরণ হবার আগেই পরের দিনে কাজ করতে গেলে, দুই-কি তিন পার-সেণ্ট কম শক্তি নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়। ফলে সোমবারের পরে দিনে দিনে শক্তিক্ষয় হয়ে আমাদের দেহের হাল শনিবারে বড়ই কাহিল হয়ে পড়ে। প্রতিদিন যাঁরা দরকার-মত ঘুমোতে পারেন না, তাঁরা এই শক্তির অভাব পূরণ করবেন কি উপায়ে? রবিবারের আমোদ-প্রমোদে ও খেলাধুলায় কিংবা অবকাশের বিশ্রাম-কালে মানুষ যদি ভালো ক'রে কাজ করতে চায়, তবে যথাসময়ে যেন বিশ্রাম গ্রহণ করে।

শ্রান্ত লোক কোলকুঁজো হয়ে চলে, তার মাথাও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। শরীরের নানান পেশী ও অঙ্গ প্রভৃতি অবসাদগ্রস্ত বা নিম্নমুখে স্থানচ্যুত হ'লেই দেহের অবস্থা হয় এমনধারা। এরূপ ভঙ্গী জীবনী-শক্তির অভাবের নিদর্শন। এর পরিণাম ভালো নয়। সর্ব্বদা বুক ফুলিয়ে মাথা তুলে, দেহকে সরলভাবে রাখতে চেষ্টা করবেন। ব্যায়ামের দ্বারা পেটের মাংসপেশী শক্ত ও স্নায়ুযন্ত্রকে পরিপুষ্ট ক'রে তুলবেন। সর্ব্বদাই মনকে বলবেন—আনন্দে রহো!

শোয়া ও দাঁড়ানো অবস্থায় রক্তের চাপ ও নাড়ীর গতি পরখ

হাসি-খুসি যার মুখে লেগে থাকে, সব কাজই সে ভালো ভাবে করতে পারে এবং আর-সকলের মত হাঁপিয়েও পড়ে না। Splanchic স্নায়ু-মণ্ডলীর উপরেই দেহের ও জীবনের সমস্ত ভালো-মন্দ নির্ভর করে। হাস্যের দ্বারা Splanchic শিরার অশেষ উপকার হয়।

ডাঃ ক্র্যাম্পটন ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকরা বলেন, সাধারণত সকলেই টেবিলের উপর বই রেখে, ঝুঁকে প'ড়ে, পায়ের উপরে পা দিয়ে পাঠ করে। এতে বেশী মানসিক শ্রমের দরকার হয়। চেয়ারে সিধে হয়ে বসে বই পড়া উচিত। তাতে পেটের splanchic শিরাগুলির উপরে চাপ পড়ে এবং ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রক্তের যোগান হয়।

ডাঃ ক্র্যাম্পটন প্রথমে আপনাকে শুইয়ে, তারপর দাঁড় করিয়ে আপনার রক্তের চাপ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করবেন। আপনার দেহ যদি নির্দোষ অবস্থায় থাকে, তবে এই পরীক্ষার ফলে, হৃৎপিণ্ডের গতি একটুও না বাড়িয়ে তুলে, আপনার দেহের রক্তের চাপ প্রবল ভাবে বেড়ে উঠবে।

পাতালে কুবেরের ভাঁড়ার

আজ পর্য্যন্ত সমুদ্রে অগুন্তি বড় বড় জাহাজ ডুবেছে। অনেক জাহাজের সঙ্গে প্রচুর ধন-সম্পত্তিও মানুষের হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। এর মধ্যে "স্প্যানিস আর্মাডা"র পঁচিশখানা জাহাজ, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের "লা-লুটাইন" নামে জাহাজ এবং গতযুদ্ধে নিমগ্ন "লুসিটানিয়া" প্রভৃতি জাহাজই প্রধান। এই সব জাহাজের ভিতরে কোটি কোটি টাকা মজুৎ আছে।

আজ এই জলমগ্ন কুবেরের ভাঁড়ার লুঠ করবার জন্যে অনেকে ক্ষেপে উঠেছে। উদ্ভাবকেরা নানারকম অদ্ভুত যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। গভীর সাগর জলে নেমে ডুবুরীরা যাতে ডোবা জাহাজ থেকে টাকা তুলে আনতে পারে, সেজন্যে একরকম পোষাকও তৈরি হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত ডুবুরীরা যে-রকম পোষাক প'রে সমুদ্রে ডুব দেয়, তাতে একশো ফুট জলের তলাতেও তারা বেশীক্ষণ কাজ করতে পারে না। "লুসিটানিয়া" জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে আরো অনেক নীচে ডুবে আছে। এখনকার পোষাকে সেখানে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু লিভিট সাহেবের উদ্ভাবিত পোষাক প'রে ৩৬১ ফুট গভীর জলের তলাতেও কাজ করা যায়। সে পোষাকের বিশেষত্ব হচ্ছে,—একরকম মিশ্র ধাতুতে তার আগাগোড়া তৈরি; পোষাকের পিছনে

নতুন-রকম ডুবুরীর পোষাক

জলমগ্ন জাহাজ উদ্ধার

হাওয়া-ঘর আছে; তার মধ্যে চার ঘণ্টার উপযোগী নিশ্বাস-বায়ু সঞ্চিত আছে। এই পোষাক প'রে ডুবুরী ডোবা জাহাজের কাছে যাবে। তারপরে জাহাজের ধন-ভাণ্ডার খুঁজে বার ক'রে "নাইট্রো-গ্লিসারিনে"র সাহায্যে ধন ভাণ্ডরের দেওয়াল উড়িয়ে দিয়ে, টাকা-কড়ি সোনা দানা উপরে নিয়ে আস্‌বে।

আর একদল লোক মত্‌লব করেছে, জাহাজকে জাহাজই তুলে আনবার জন্যে। "চলন্ত সিঁড়ি"র উদ্ভাবক জে, ডবলিউ রেনো সাহেব জাহাজ তোলবার এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। ডোবা জাহাজের তলার পাশে, সমুদ্র-তলে "caterpillar tractor" নামিয়ে, কতকগুলি প্রকাণ্ড ও ফাঁপা নলাকার যন্ত্র জাহাজের গায়ে প্রথমে সংলগ্ন করা হবে। ডুবুরীরা জাহাজের গায়ে সারবন্দী ছ্যাঁদা ক'রে, সেই ছ্যাঁদায় ঐ নলাকার যন্ত্রের ইস্পাতের আঁক্‌সি আট্‌কে দেবে। নলাকার যন্ত্রের একমুখ খোলা, আর এক মুখ বন্ধ। খোলা মুখ দিয়ে ক্রমে তার মধ্যে বাতাস ভরা হবে। তার ভিতরে যতই বাতাস ঢুক্‌বে, ততই তা জলশূন্য হয়ে আসবে এবং তার ভার তোলবার ক্ষমতাও বেড়ে উঠবে। এই ভাবে জাহাজকে জাহাজই জলের উপরে টেনে তোলা হবে। আয়োজন তো খুব চলেছে, এখন দেখা যাক্ ফল কি দাঁড়ায়!

তেলে জন্ম, কিন্তু তেল নয়

ফ্রেড হাওয়ার্ড নামে একজন রাসায়নিক তেল থেকে একরকম তরল ধারা বার করেছেন—যাতে তেলের কোন গুণ বা রাসায়নিক কোন ধর্ম্ম নেই। এই তরল ধারা যেন মন্ত্র-পড়া। এর গুণে ভবিষ্যতে চাম্‌ড়া, কাপড় বা কাগজে

এ কাপড় আগুনে পোড়ে না

আর পচ্ বা ফাট্ ধরবে না। এই জিনিষটি একবার মাখিয়ে নিলে চাম্‌ড়ায় আর জল বসবে না—কাজেই আপনার জুতা দুগুণ বেশী ট্যাকসৈ হবে। কাপড়ে এই জিনিষ মাখালে আগুনের সাধ্য নেই যে পুড়িয়ে তাকে ছাই করে।

কুর্ম্মাবতার

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরের চিড়িয়াখানায় একটি কচ্ছপ আছে, আজ তিন শতাব্দী সে মরণকে মর্ত্তমান দেখিয়ে বর্ত্তমান! লোকালয়ে আর কোন জীবই বোধ হয়

মান্ধাতার আমলের কচ্ছপ

এত কাল বেঁচে নেই! যমদূতেরা তার শক্ত খোলার মধ্য থেকে সম্ভবত তার জীবনটাকে টেনে বার কর্‌তে পারে নি! ওজনে সে তিন মণ ত্রিশ সের। এখনো সে রীতিমত চট্‌পটে আছে, আর তিন শো বছরের বুড়ো হ'লেও অথর্ব্ব হয়ে পড়ে নি। তাকে খাবার দেখালে এখনো সে চার-পায়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে, লম্বা গলা বার ক'রে মুখ তুলে খাবার খেতে পারে।

গালপাট্টা-আড্ডা

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সাক্রামেণ্টো সহরে নামজাদা এক "গালপাট্টা-আড্ডা" আছে। এই আড্ডার হুকুমে ঐ সহরের সমস্ত সাবালক বাসিন্দা গালপাট্টা রাখতে আইনত বাধ্য! সহরে গেলে দেখা যায়, চারদিকে গোঁফ ও দাড়ীর অবাধ রাজত্ব! ধনী বা গরীব—সকলেরই মুখে গোঁফদাড়ী, কারুর খাটো, কারুর বা মস্ত-বড়!

কেবলমাত্র "মস্ত-বড়" বল্‌লেই এ অপরূপ গালপাট্টার যথার্থ বর্ণনা করা হয় না। সংপ্রতি সেখানে গোঁফ-দাড়ীর এক প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। ঘোষণা করা হয়, যার

গালপাট্টা আড্ডার রাজা ও যুবরাজ

দাড়ী সব চেয়ে বড়, তাকে বখসিস্‌ দেওয়া হবে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেছেন, হ্যান্স ল্যাংসেথ সাহেব। তাঁর দাড়া লম্বায় সতেরো ফুট। দ্বিতীয় হয়েছেন জ্যাক উইলকক্স, তাঁর দাড়ী বারো ফুট লম্বা। এঁরা দুজনে যথাক্রমে গালপাট্টা-আড্ডার রাজা ও যুবরাজ খেতাব পেয়েছেন।

প্রসাদ রায়।

মানুষের ডাক

মানুষ ভাবে, কাজ কেন হয় না? এত মানুষ আছে মানুষের প্রাণে ইচ্ছে আছে, মুখে মুখে উত্তেজনার লহর উঠছে, যার তার কথায় হাজার মানুষ যেখানে সেখানে বলামাত্র লাফিয়ে পড়ছে, তবু কাজ এগোয় না কেন?

একথার উত্তরে আমরা কেবলি এ যাবৎ বলে আসছি, যে, মানুষ নেই। আমরা নিঃসম্বলে পথ চলেছি, এ পথের পুঁজি যে মনুষ্যত্ব তা' আমাদের হারিয়ে গেছে। ইঙ্গিতে ছোটবার ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ ঢের আছে, ইঙ্গিত দেবার দিশারী মানুষ নেই। হুকুমে চূণ বালি বয়বার মুটের দল হাজার হাজার পাবে, ইন্দ্রপ্রস্থ গড়বার শিল্পী নেই। বড় বড় বুলির ফানুস উড়িয়ে রাজপথ মুখর করে চলবার মানুষ ঢের আছে, সত্য-সংকল্প সত্য-দর্শী সত্য-সাধক ঋষি নেই।

একদিন ছিল, রত্নগর্ভা ভারত-জননীর পেটে তখন বীর

জন্মাত, শিল্পী জন্মাত, মুনি ঋষি কর্ম্মী জন্মাত, স্বয়ং ভগবানেরও সাধ হ'তো মনুষ্য দেহ ধরে ঐ মায়ের জঠরে একবার জন্মাই। তাই তখনকার যুগে তাদের হাতে যা' গড়ে উঠতো তা' ভাঙতে লাগতো হাজার পাঁচ হাজার বছর। তার টুকরো টাকরা গোপুর মন্দির জয়স্তম্ভ যেখানে আজও পড়ে আছে সেই সেই স্থান আজকের মরা যুগের তীর্থ হয়ে রয়েছে।

দেশ মানে শুধু মাটি ত নয়, দেশ মানে বিশ্ব-চৈতন্যের একটি নূতন ঈষণা, নূতন ভঙ্গী, নূতন রূপান্তর; মহামানবের নাভিকমলে আবার এক অভিনব সৃষ্টি—পদ্মের বিকাশ!—তাই না দেশ! দেশ মানে নব রাজপাট, নব শিল্পকলা, নব চাতুর্ব্বর্ণ্য, ঋষির নূতন সাধনা, বীরের নূতন দেবত্ব, নারীর নূতন লাবণী, বিশ্বকর্ম্মার নূতন স্বপ্ন। তা' তো আর কথায় গড়ে না, তিলোত্তমার রূপের মত তিল তিল করে লক্ষ স্রষ্টায় মিলে সৃষ্টি করলে দেশ-মাতার যে রাজীবশ্রী কমলা মূর্ত্তির উদয় হয় তা' তো শূন্যগর্ভ বাক্যে গড়ে না। অথচ

দিন দুই ছুটোছুটি
দিন দুই হুটোপাটি
তারপর ফিরে আসে
হয়ে আধমরা,
আমাদের দেশ শুধু
একাবাকি ভরা।

যত দিন আমরা দলে দলে কথা শুনে বেড়াব, যতদিন আমরা মালা গেঁথে নিয়ে হাততালির মানুষ খুঁজবো, ততদিন কর্ম্মীর নীরব সাধনার দিন পোছয়েই যাবে। যে বাজারে কথার এত দাম, সে বাজারে কাজের কাজী তার পসরা নামাতে আসে না।

এখন মানুষ চাই, নীরব মিতভাষী মানুষ চাই, অক্লান্ত-কর্ম্মা নিরভিমানী মানুষ চাই, স্থিতধী লক্ষ্যভেদী মানুষ চাই, সত্যের ঋষি সত্যের অনন্যমনা সাধক মানুষ চাই, অটুট সত্যসংকল্প অসীম ধৈর্য্যশীল মানুষ চাই। যারা জীবন-জলে কালী বলে একেবারে ডুব দিতে জানে, যারা বাজারে হাততালির জন্যে কখনও ছুটে আস্‌বে না কিন্তু নীরবে গড়বে, যারা পরের ছেঁদো কথায় শক্তিক্ষয় করবে না কিন্তু মায়ের 'রাজসিংহাসনের এক একটি সোনার খুরো ধরবে আর গড়ে ছেড়ে দেবে। যে যেদিকে যাবে তার তাই-ই হবে একার সাধনা, সেই দিকেরই সত্য সে গভীর ধ্যানে উদ্ধার করবে, আর জীবনে সফল সাধনে ফলিয়ে দেখিয়ে দেবে যে তা' হয়, তা' মানুষেরই সাধ্য।

এদেশে আগে নির্ম্মাতা চাই,—কৃষির ঋষি চাই, শিল্পের ঋষি চাই, কলার ঋষি চাই, ধর্ম্মের ঋষি চাই, শক্তির সাধক চাই, জ্ঞানের সাধক চাই; কারণ সবই যখন ভেঙে শ্মশান হয়ে গেছে, তখন মরার দেহে জীবন সঞ্চার করতে—ষষ্টি সহস্র সগর-সন্তানকে বাঁচিয়ে তুলতে সাধন-গঙ্গা—যার জীবন শিবের জটা বেয়ে নামতে পারে এমন অপরূপ মানুষ চারিদিকে প্রতি ক্ষেত্রে চাই-ই চাই।

এমন মানুষ এক একটা এলে যুগ পাল্টে যায়, ভানুমতীর ঝোলায় তখন যে সম্পদের নাম করে হাত দাও তাই উঠে আসে। একটা অরবিন্দ দেবকীর বুকের পাষাণ আঙুলের ভরে টলিয়ে দেয়, একটা গান্ধার বিফল স্বপ্নে অকালেও বসন্ত দেখা দেয়। শিব-অংশের বিষ্ণু-অংশের এই সব মানুষ প্রলয় জলে বিলুপ্ত জীবন-বেদের উদ্ধারা। কিন্তু সে বেদ শুধু উদ্ধার করলেই হবে না, তার প্রতিটি সত্য হাজার সাধকে সেধে নিতে হবে, ফলিয়ে দিতে হবে, ঋষির স্বপ্ন সফল করতে হবে। তাই আজ মানুষের ডাক পড়েছে; তাই আজ মানুষের মাঝে দেবতার খোঁজ হয়েছে; তাই আজ আর দু' চোখে কুলোয় না, কপালের তৃতীয় জ্ঞান-নেত্র খোলবার দিন এসেছে। তাই বলি, তোমরা কে কোথায় আছ, এস, শিবের ত্রিশূল কে ধরতে পার এস, দিগম্বরের শিঙা কে বাজাতে পার এস, কালীর খড়্গের বিজলী ও বরাভয়ের শরণ কে একসঙ্গে জাগাতে পার এস। দুইভুজ নিয়ে কে অষ্টভুজা সাজতে পার এস, দুই চক্ষে কে ত্রিনয়নের জ্ঞান-অগ্নি জ্বালতে পার এস, পুষ্পশয্যা ভুলে পশুরাজ সিংহের পিঠে চড়তে পার এস, জগতের অসুর হাসি-মুখে কে দলতে পার এস। তাই বলি মানুষ চাই। আর কিছু চাই নে, শুধু মানুষের মত মানুষ চাই। ভানুমতীর ঝোলা থেকে চতুর্দ্দশ ভুবন বেরিয়ে আস্‌বে।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

পরের ছেলে

দশম পরিচ্ছেদ

কিশোর যখন দেখিল, সে বাড়ীর বাহির হইলেই তাহার সঙ্গে একজন গার্ড বাহির হয়, তখন তাহার বাহিরের সমস্ত আকর্ষণই নিমেষে দূর হইয়া গেল। একটা প্রহরীর সজাগ সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে নজর-বন্দীর মত ফিরিতে ঘুরিতে তাহার একটুও ভাল লাগিল না। খেলার যত রস যা-কিছু মাধুর্য্য সব যেন ইহাতে একেবারেই শুকাইয়া লুপ্ত হইয়া গেল। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ চিত্ত লইয়া সে আর বাড়ী হইতে বাহির হইতেই চাহিল না; সহসা নিবিড়ভাবে পাঠে মন দিয়া একদম ভাল ছেলে বনিয়া বসিল।

আবার রাজেশ্বরী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ছেলে এমন করিয়া যদি দিনরাত ঘরের কোণে বই মুখে করিয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেই বা চলিবে কেন! ছেলে তাঁহার ইচ্ছামত পড়া-শোনায় খুব মন দিয়াছে বটে, কিন্তু এও যে বাড়াবাড়ি। ইহাতে তো তাহার শরীর ভাল থাকিবে না। সকালে সন্ধ্যায় বেড়ানো কিম্বা ছুটাছুটি করিয়া খেলা, এগুলা যে শিশু-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সেটুকু রাজেশ্বরী দেবীর ভাল রূপেই জানা ছিল। কিন্তু কিশোর যেরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহাকে একা আর কোন মতেই বাহিরে পাঠানো যাইতে পারেনা।

চাকর সঙ্গে লইয়া সে যখন কিছুতে বাহির হইবে না বুঝা যাইতেছে, তখন বিনয়েরই তাহাকে লইয়া দুইবেলা বেড়াইয়া আসা উচিত। নহিলে ছেলে যে অসুস্থ হইয়া পড়িবে! আবার তিনি বিনয়কে লইয়া একদফা বকাবকি বাধাইয়া দিলেন। মাষ্টারের দ্বারা কিশোরকে গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়ার চেষ্টায় তিনি বিফল হইয়া ছিলেন। কিশোর তাঁহার আর-সমস্ত উপদেশ এবং শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে প্রস্তুত আছে, কেবল বেড়াইতে চল কিম্বা খেলিতে চল বলিলেই সে যে-গোঁ ধরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইতে তাহাকে টলাইতে মাষ্টারের সাধ্যে কুলায় না। অগত্যা বিনয়কে অনুযোগ করা ছাড়া রাজেশ্বরী দেবী আর অন্য উপায়ও দেখিতে পাইতেছিলেন না।

সেদিনও বৈকালে মাষ্টার মহাশয় তাহাকে ঘরের বাহির করিবার প্রাণপণ চেষ্টায় বিফল হইয়া বিরক্তভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে কিশোর তাহার অঙ্কের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, ঘরে আর কেহ নাই, কিন্তু নীচের উদ্যান হইতে কতকগুলা পরিচিত কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় ভরিয়া বার বার তাহার কর্ণপথে আসিয়া বাজিতেছে। বই ও খাতা ফেলিয়া কিশোর বারান্দায় আসিয়া দেখিল, পুষ্পকুঞ্জবহুল উদ্যানের অনেকটা জমি একেবারে বৃক্ষ লতাশূন্য ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে, সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই নাই এবং সেই জমির উপরে তাহার সঙ্গীরা সদলে হাতে একটা নূতন ফুটবল লইয়া মহাস্ফূর্ত্তির সঙ্গে খেলার উদ্যোগে ব্যাপৃত আছে। কিশোরকে বারান্দায় দেখিয়া তাহারা কলরবে সমস্বরে অভ্যর্থনা করিল, "এই যে কিশোর, পড়া হল ভাই তোর? আয়, এইবার খেল্‌বি।" কিশোর বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "তোরা যে বড় এখানে! মাঠে আর খেলিস্ না?"

"মাঠে বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে যে কাদা হয়েছে। বিনয় বাবু আমাদের খেলার জন্য এই জমি তৈরী করে দিয়েছেন, দেখছিস্ না? সে বলটা তো ছিঁড়ে খুঁড়ে সাত্‌টা তালি দিয়েও আর বাগ্ মানছিলো না। বিনয় বাবু আমাদের এই নতুন বলও আনিয়ে দিয়েছেন। এ নতুন মেকারের বল্, খুব মজ্‌বুৎ, এ বল্ খুব টেঁক্‌বে, বিনয় বাবু বলেছেন। খুব দামী কিনা, তিনি নিজে পছন্দ করে বেছে বেছে ভাল কোম্পানিদের অর্ডার দিয়েছিলেন। ও কি ঘরে ঢুকছিস্ যে! খেল্‌বি না?"

"আমার এখনো অঙ্ক কষা হয়নি।"

তার পর দিন বৈকালে নরেন অপরাধীর মত প্রথমেই তাহার পড়ার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে ডাকিল,

"কিশোর ভাই, আমাদের সঙ্গে আর খেল্‌বিনা নাকি ভাই ?"

কিশোর বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "দেখ্‌ছিস না—ছবি দেখছি।"

"কি ছবি—দেখিনা ভাই—"

কিশোর তখনি পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিল, "ও ম্যাপের ছবি।"

"ম্যাপের আবার ছবি কিরে? ম্যাপ্‌ তো ম্যাপ। বিনয় বাবুর ঘরে কেমন সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, দেখেছিস্‌?"

অনিচ্ছাতেও বালকের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "না।"

"চল্‌ না, দেখ্‌বি। উনি এখন ঘরে নেই। একা গেলো দেখ্‌তে ভয় কর্‌ল, তুই থাক্‌লে ভাল করে দেখ্‌তে পেতুম। কত রকম-রকমের ছবি, চল্‌ না ভাই দেখাবি।"

ছবির উপর এই দুর্দ্দান্ত বালকের এমন একটা প্রবল ঝোঁক ছিল যে তাহার নেশায় সে অসাধ্য সাধনও করিতে পারিত; তাই এ আহ্বান তাহার পক্ষে বিষম হইয়া উঠিল। তথাপি সে আত্মজয়ের শেষ চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "কি-ই এমন ছবি যে -তাই—"

"ও ভাই তুই নিশ্চয় দেখিস্‌নি, দেখ্‌লে এ কথা বলতিস না- কত বড় বড়, আর কি সুন্দর রং-চং করা! শিকারের কটা ছবি, ছবিতে, বাপ্‌রে, একটা প্রকাণ্ড ঢাল-ওয়ালা লোককে কি প্রকাণ্ড একটা সিংহই ধরেছে,—উঃ, যেন জ্যান্ত! আরও একটায় একদল শিকারী তেমনি মস্ত ছুটো সিংহকে—"

কিশোর এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "উনি ঘরে নেই ত?"

"কে? বিনয় বাবু? না, উনি আমাদের দলের খেলা দেখতে বাগানে বসে আছেন। হ্যাঁ ভাই, তুই বল খেল্‌বি না আমাদের সঙ্গে?"

"ঐটুকু জায়গার মধ্যে? রামঃ!"

"কেন ভাই বেশতো খেলা হয়, সমস্ত বাগানটাই ত ছুট্‌তে পারা যায়। চল্‌ না খেলবি।"

বাগানের মধ্যে তখন বালকদলের কলরোল এবং চর্ম্মগোলকের অঙ্গে উপর্য্যুপরি তাহাদের পদাঘাতে ঢিপ্‌ ঢাপ্‌ শব্দ উঠিয়া নরেনকে বাগানের দিকে আকৃষ্ট করিল।

কিশোর সহসা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না, তুই ছবি দেখ্‌তে চাস তো চল্‌। আমিও নিশ্চয় ঐ রকম ছবি আনাব। আমি যে ঘরে শুই—মার ঘরে—সে ঘরেও নিশ্চয় ওর চেয়ে ভাল ভাল ছবি আছে। কেমন ছবি তুই দেখেছিস, দেখিগে। আমাদের ছবির চেয়ে আর ভাল হতে হয়না!"

উভয় বন্ধুতে বিনয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া ছবির বিশ্লেষণ করিতে লাগিল। বহুদিন—প্রায় বৎসরাধিক কাল হইতে কিশোর আর এ ঘরে মোটেই প্রবেশ করে নাই। আজ উত্তেজনা এবং লোভের বশে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহার কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইতেছিল; তাই ব্যগ্রভাবে সে নূতন ক্রীত ছবিগুলার মধ্যে মনকে ডুবাইয়া ধরিল। নরেন কিন্তু সহসা একখানা ছোট ফটোয় আকৃষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও ভাই দ্যাখ্‌, দ্যাখ্‌, ছোট্ট একটা ছেলের ফটোর চার্‌ দিকে কত রকমের ফুল-পাতা এঁকে সাজনো। এ সব কে এঁকেছে ভাই? বিনয় বাবু নিজে? উনি তো খুব সুন্দর আঁক্‌তে পারেন।"

কিশোর তাহার সম্মুখের ছবির পানে ঝুঁকিয়া এক মনে সেখানা দেখিলেও তাহার শুভ্র গণ্ড ও কর্ণের উপরে একটী রক্তিম আভা ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। উত্তর না পাইলেও নরেনের প্রশ্ন সমানে চলিতে লাগিল, "এ ছোট ছেলেটী কে ভাই? তোরই ছোটবেলার ছবি নাকি? ঐ যে আর একটি মেয়ে মানুষের—ছোট একটি বৌ-মানুষের ছবি, তাঁর কোলে একটি ছেলে, এ তুই-ই, না? আর ইনিই বুঝি তোর—তোর—"

"ওদিকে যাস্‌নে বল্‌ছি, উনি ওদিকে আহ্নিক করেন।"

কিশোরের কম্পিত অথচ উচ্চ তর্জ্জনে চমকিয়া নরেন প্রায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যই সে অনুপযুক্ত স্থানেই পদার্পণ করিয়াছে। গৃহের যে-কোণে ছোট ছোট লম্বা লম্বা টুলের উপরে এই ফটো কয়খানি সাজানো রহিয়াছে, তাহার সম্মুখে

একখানা পুরু আসন পাতা, এবং পঞ্চপাত্র ধূপাধার প্রভৃতি এদিকে ওদিকে ছড়ানো, এটা পূজা-আহ্নিকের স্থান বলিয়াই বোধ হইতেছে।

নরেন অপ্রতিভ ভাবটা সারিয়া লইবার জন্য বলিল, "তা কি ক'রে জান্‌ব। কোনো ঠাকুর-দেবতার ছবি সুমুখে নেই, কিছু না—এ-সব তো মানুষের ফটো। এ তো তোরই ফটো, আর তোর আপন মার ফটো। উনি কি এই সব সামনে নিয়ে পুজো করেন?"

"তা আমি কি করে জান্‌ব?"

"তুই কি এ-ঘরে আসিস্ না?"

কিশোর উত্তর না দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। না, এ-ঘরে আর তার কি দরকার? দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে এই শিশু-কোলে-করা জননী-মূর্ত্তিখানি তাহার সন্ধ্যার আসন্ন নিদ্রার মধ্যে স্বর্গ-কল্পনাকে বহিয়া আনিয়াছে। এই মূর্ত্তিই স্বপ্নে তাহাকে কোলে লইয়াছে, তাহার মা হইয়া কত চুম্বন করিয়াছে! কিন্তু আজ বাস্তব যে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের এ-সব স্বপ্নের সহিত কোন সম্বন্ধই রাখিতেছে না! তার আপন মা—আপন বাবা! জগৎ বলিতেছে, সে জমীদারের দুলাল, সে ব্রহ্মকিশোর বাবুর পুত্র ব্রজ কিশোর। সে রাজেশ্বরী দেবীর নয়নের নিধি—একমাত্র সন্তান! এ বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধীশ্বর।

"আচ্ছা, তোর বাবার ছবি দেখছিনে যে?"

"যে-ঘরে আমরা শুই, আর বৈঠকখানাতেও আছে, দেখিস্ নি?"

"কৈ, দেখিনি ত।"

"অত বড় বড় ছবি, তবু দেখিস্ নি? মার পুজোর ঘরেও আছে।"

"ওঃ, সে তো জমীদার মশায়ের। তোর বাপের মানে আমি বিনয় বাবুর কথা বলছি যে। আচ্ছা, তুই কি বিনয় বাবুকে বাবা বলে ডাকিস না?"

"না।"

"সত্যি? আহা, কেন ভাই? উনিই তো আসল বাপ।"

কিশোর নিঃশব্দে একখানা ছবির দিকে চাহিয়া রহিল। মুখের সমস্ত লোহিত বর্ণ চলিয়া গিয়া একটা পাণ্ডুটে শ্বেত রংয়ে তাহার সমস্ত মুখখানি ক্রমে ছাইয়া ফেলিতেছিল। ঠোঁট দুটি একেবারে ছাইয়ের মত বিবর্ণ, একটু একটু কাঁপিতেছে, হাত দুটি ক্রমে ধীরে ধীরে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল।

"তোর এই মা বুঝি বারণ করেছেন? ভারী অন্যায় কিন্তু।"

এইবার কিশোর কথা কহিল। স্বর যে কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা বালকদের অনুভবেরও অতীত।

"কেন অন্যায়? বড় ছবি যাঁর আর এই যিনি মা—এঁদের তবে কি বল্‌ব? মা বাবা আবার মানুষের কটা করে থাকে?"

নরেন একটু স্তব্ধ থাকিয়া কিশোরের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তাবলে নিজের বাপকে বাপ বল্‌বে না?"

"না।" কিশোরের দৃঢ়স্বরে আবার চমকাইয়া উঠিয়া নরেন চাহিয়া দেখিল, কিশোর সে গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নরেনও ঘরের বাহিরে আসিয়া যেন অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিল, "উনি কিন্তু তোকে খুবই ভালবাসেন। ঐ যে তোর ছোট বেলার ছবিখানা, ওর চারদিকে যে সব ফুল-পাতা এঁকেছেন, তার মধ্যে কি লেখা আছে পড়েছিস্?—আমার মাণিক!—কিন্তু তুই ওঁকে—"

বিস্ময়ে অভিভূত-প্রায় নরেন দেখিল, তাহার কথা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই কিশোর এক-দৌড়ে অন্দরের দিকে চলিয়া যাইতেছে।

সাধারণ বালকের মত পুত্রকে খানিকটা পড়াশুনা খানিকটা খেলায় নিযুক্ত দেখিলেই রাজেশ্বরী খুসী হইতেন কিন্তু এ ছেলে যে সাধারণের পথে চলিবে না, এই বয়সেই তাহার সূত্রপাত দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। আর সস্নেহ তিরস্কার শত রকমের চেষ্টা করিয়াও তিনি কিশোরকে তাহার জেদ ছাড়াইতে পারিলেন না। সেই যে সে পড়ায় মন দিল, তার পরে আর খেলা-

ধূলার দিকে কিছুতেই তাহাকে ভিড়াইতে পারা গেল না! তাই বাধা-হীন স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অনুমতি পাইয়াও যখন তাহার সঙ্কল্প টলিল না, মাসের পর মাস যখন সে এই বাল্যক্রীড়া-হীন চাপল্যহীন বয়োবৃদ্ধের মত গৃহ-কোটরে নিজেকে আবদ্ধ রাখিল, তখন রাজেশ্বরীও অগত্যা সে চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সে বারের বর্ষাকালটায় রাজেশ্বরী দেবী একটা গুরুতর রকম অসুখে মাস দুই ভুগিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মাথা আর হার্ট এই ব্যাপারে অনেকখানি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ডাক্তারে দেখিয়া শুনিয়া বড় মানুষদের যে ব্যবস্থা সর্ব্বদাই তাঁহারা দিয়া থাকেন, রাজেশ্বরী দেবীর জন্যও সেই ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তারের ব্যবস্থা শুনিয়া রাজেশ্বরী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার জন্যে আবার হাওয়া-বদল! পোড়ার দশা আর কি! আমাদের নাকি আবার মরণ আছে?" কিন্তু সে কথা কানে না করিয়া বিনয় যখন চেঞ্জের বন্দোবস্তে কর্ম্মচারীদের ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে দেখিলেন, তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া ধমক দিলেন, "ক্ষেপেছ নাকি? আমি বাড়াতেই ভাল হব। বাড়ী-ঘর ছেড়ে বিষয়-আশয় অব্যবস্থায় রেখে কিশোরকে নিয়ে দেশে দেশে হৈ হৈ ক'রে এখন আমি বেড়াতে পারব না।"

"বাড়ী-ঘর বিষয়-আশয় সব যেমন তেমনি থাকবে, কেবল তোমার শরীরটা সারিয়ে নিয়ে বুকের অসুখটা ভাল করে নিয়ে আস্‌তে পারা যাবে,—লাভ হবে এইটে। আর কিশোর? মাষ্টারের চেষ্টায় সকালে বিকেলে খানিকটা এক্‌সারসাইজ করলেও ভাল। খেলা-ধূলো ত একেবারে বন্ধ করেছে, এই বয়সে ছুটোছুটি কি বেড়ানো-চ্যাড়ানোর বিশেষ দরকার। এক বছর হয়ে গেল,—তবু জেদ ত ছাড়্‌লে না!"

"কি যে জেদী ছেলে! কিন্তু যাক্ রোগাটোগা এজন্যে হয় নি ত।"

"তা না হলেও এর ফল পরে বুঝতে পারবে। ভোগে রোগা না হতে পেলেও শরীর অকর্ম্মণ্য হবে, যে বয়সের যা তা যদি না করে। এই জেদও ক্রমে তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, দেখচ না? এই উপলক্ষে তার এ জেদটাও ভেঙে যাবে। অন্য দেশে গেলে নতুন নতুন জিনিষ দেখতে পাওয়ার লোভে সে বাইরে বেরুবে। শরীরটারও তার উপকার হবে।"

"চল বাপু তাহলে। মাষ্টারকেও সঙ্গে নিয়ো কিন্তু।"

"সে তো বটেই।"

"কোথায় যেতে বলেছে ডাক্তার?"

"সে তো অনেক তর্কাতর্কি চলল,—এখন ডাক্তার রাঁচি যাওয়াই ঠিক করে দিয়েছে।"

"রাঁচি! সেখানে কোন ঠাকুর-দেবতা নেই? না বাপু, সেখানে যাব না। যেতেই যদি হয় ত এমন জায়গায় চল, যেখানে তোমাদের এই হাওয়া বদলের খেয়ালও মিটবে, আমারও কিছু দর্শন-টর্শন—"

"সেইজন্যেই আরও এমন জায়গায় যাচ্ছি, যেখানে তোমার এ-সব দৌরাত্ম্যি একেবারে চল্‌বে না। তোমায় একা কি দোষ দেব,—মামা, তাঁর মত লোকও চেঞ্জে গেলেন কিনা দেওঘর কি বিন্ধ্যাচল নয়তো এলাহাবাদ! একটু সারেন অমনি পুণ্যি স্নান আর দর্শন-টর্শনে এমনি মেতে যান যে যে-উদ্দেশ্যে যাওয়া তার বিপরীত কাণ্ডই বাধিয়ে তুললেন। শেষের দিকে তো আর বাড়ী থেকে বেরুতেই চাইলেন না, দর্শন টর্শন করা ক্ষমতায় কুলুবে না ব'লে।"

"তবেই বোঝো বাপু, তাঁর মত অমূল্য জীবনের জন্যও যখন তিনি এতে রাজী হন্‌নি তখন তোরা কিনা আমার মত একটা বিধবা মানুষের জীবনের জন্যে তীর্থ-ধর্ম্ম-হীন জায়গায় নিয়ে যেতে চাস্?"

"হ্যাঁ, তাইতো চাই। তীর্থ-ধর্ম্ম এখন মাথার ওপরে থাকুন, আজো তোমায় বাঁচতে হবে—বুঝেচ! তীর্থ-ধর্ম্ম পালাবে না।"

ক্ষণেক ভাবিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "তা এক রকম ঠিকই বলেছিস্। কিশোর এখনো বড্ড ছেলে মানুষ,—এখন যদি আমি মরি, তাহলে ওর কি কিছু থাক্‌বে? পাঁচ ভূতে

লুট নেবে।—তুই যদি মানুষ হতিস্, তাহলেও বা ভরসা করতো।"

"জানই ত! এই বুঝে আর ও-সব আপত্তি-টাপত্তি করো না।"

তাহাই হইল। উপযুক্ত ব্যবস্থার সহিত সকলে রাঁচি যাত্রা করিলেন। হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনে কিশোরেরও অনেকখানি পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ায় বিনয়ের পরামর্শ এবং বুদ্ধির উপর রাজেশ্বরীর এবার অনেকখানি শ্রদ্ধা জন্মিল। পথে বাহির হওয়ার পর হইতেই ছেলের এই পরিবর্ত্তন তিনি লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার সম্মুখে সে তাহার পিতার সহিত ইদানীং আর কথা বলা দূরে থাকুক হাজির থাকিতেই চাহিত না। রাজেশ্বরীর এখনও সন্দেহ হইত যে কিশোর বোধ হয় বিনয়ের সহিত আর বাক্যালাপই করেনা বা তাহার কাছেও ঘেঁষেনা। এ চিন্তায় তাঁহার কিন্তু তেমন সুখ বোধ হইত না—আঘাতই বাজিত। অথচ এই তিনিই একদিন কিশোরকে এমনি একান্তভাবে পাইবার জন্য কি উন্মত্তই না হইয়া উঠিয়াছিলেন! তাঁহার সে সাধ এখন ত পূরা মাত্রাতেই পূর্ণ হইয়াছে, খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে সর্ব্বপ্রকারে কিশোর ত এখন তাঁহারই একান্ত নিজস্ব হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সেই প্রবল পিতৃ-অনুরক্তি তো তাহাকে দত্তক লওয়ার কয়েক মাস পার হইতেই ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়া এখন এমন স্থানে আসিয়া ঠেকিয়াছে—তাহাতে সেই রাজেশ্বরীও কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। এতখানি না হইলেই বুঝি ভাল হইত। নিজের প্রার্থিত বস্তুর পূর্ণ মূর্ত্তি এখন যেন তাঁহাকেই ফিরিয়া আঘাত দিতে চাহিতেছে। বিনয়ের উপর তাঁহার স্নেহও বোধ হয় এই কারণেই যেন ক্রমে গভীর হইতেছিল। সে যে জীবনে আর কোন অবলম্বন পাইল না। রাজেশ্বরীর সে-সব চেষ্টা যে বিফল করিয়া দিয়া এই ছন্নছাড়া মূর্ত্তিতে তাঁহার কোলের কাছেই বসিয়া রহিল, ইহার উপর কিশোরের সেই পিতার সম্বন্ধে এরূপ উদাসীনতা তাঁহাকে যেন বিনয়ের কাছে একটু লজ্জিতই করিয়া তুলিত, কিন্তু ইহা লইয়া বিনয় বা কিশোর কাহারো সঙ্গত কোন আলোচনা করিতেও তাঁহার সাহসে কুলাইত না। তাহার ফলও যে ভাল হইবে না, এটা তাঁহার মন অলক্ষ্যে যেন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিত।

তাই রাঁচির পথে যখন কিশোর বিনয়ের একটু কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া তাহাকে এটা কি, ওটা কি, এটা কোন্ নদী, কিসের পুল, কোন্ জেলার মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিতেছে ইত্যাদি প্রশ্নে তাহার ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া লইতেছিল, তাহাতেই রাজেশ্বরী দেবী বেশ খুসী হইয়া উঠিলেন। বিনয় অবশ্য বুঝিতেছিল যে তাহার মার গাড়ীতে মাষ্টারকে নিকটে না পাইয়া সে অগত্যা বিনয়ের কাছেই তাহার কৌতূহলগুলা মিটাইয়া লইতেছে। তবুও উভয় পক্ষেরই এইটুকুকেই পরম লাভ বলিয়া মনে হইল।

প্রভাতে পুরুলিয়ায় ট্রেণ বদলের পর যখন পথের দৃশ্যের পরিবর্ত্তন সুরু হইল, তখন কিশোর বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাঁচি প্লেটোতে পৌঁছিবার জন্য যখন সেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গাড়ী পাহাড়ের গায়ের আঁকা-বাঁকা পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়া দুই পার্শ্বে শালের গভীর জঙ্গল রাখিয়া গভীর খদের মধ্যস্থিত বাঁধের মত সঙ্কীর্ণ পথে ছুটিতে লাগিল তখন পরম বিস্ময়ে কিশোর বিনয়ের অনেকখানি নিকটস্থ হইয়া জানালায় একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল। পথের এক একটা বাঁকে যখন গাড়ীর দুই প্রান্ত এবং দুইদিকের পথই দেখা যাইতেছিল, তখন কিশোর তাহার এই কয় বৎসরের অভ্যস্ত সংযত মৃদুস্বর ভুলিয়া গিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেছিল, "দেখুন, দেখুন, এবার আর গাড়ী কোন দিকে যাবে? এইতো পথ বন্ধ হয়ে গেল। বাঃ—বাঃ, কেমন মজা দেখ্‌লেন? পথ লুকুনো ছিল বাঁকের মধ্যে? উঃ, কি প্রকাণ্ড গর্ত্ত দুধারে—যদি গাড়ী পড়ে যায়! ঘাটের মধ্যে আর চারদিকে ঐ ছোট ছোট ঝোপের মত যে সব গাছ, ঐগুলোই শাল গাছ? ওরা বড় গাছ অথচ অতটুকু দেখাচ্চে! বাবা! ঐ জঙ্গলগুলোর নাম কি?"

"জোন্‌হা!"

"ঐ সব শাল গাছের মধ্যে দিয়ে কেমন সরু সরু খালের মত জল বয়ে চল্‌ছে! সুবর্ণরেখা কোন্‌টার নাম? সবগুলোই তার ধারা? সেই যে প্রপাতের কথা বল্‌ছিলেন,—

এই 'জোন্‌হা' ষ্টেশনেই নাম্‌তে হয় ? চলুন না কেন, তবে আমরা নামি ! মা ? ডাক্‌ বাংলা আছে যে বললেন, তাতেই নাহয় থাক্‌বেন,—আমরা দেখে আস্‌ব।—এখান থেকে দেখতে কষ্ট কি আর এমন হবে ? পুস্‌ পুস্‌ কি রিক্‌স তো পাওয়া যায় বল্‌ছেন। মোটরে করে সে কবে কতদিনে আসবেন ! এখান থেকেও অনেক দূর, তাহলোই বা—" ইত্যাদি প্রশ্নে ও অনুরোধের আবদারে সে বিনয়কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। জানলা দিয়া সে বেশী না ঝোঁকে সেদিকে সতর্ক থাকিয়া বিনয় সানন্দে তাহার সহিত সমস্ত পথটা বকিয়া চলিয়াছিল।

তাহাদের বাসা হইতে মোরাবাদী পাহাড় খুব বেশী দূরে ছিল না। প্রত্যহ বৈকালে পিতা ও মাষ্টারের সহিত কিশোর সেখানে বেড়াইতে যাইত। রাঁচি হিলেও দুই চারিদিন তাহার গিয়াছিল কিন্তু হিলের নীচের ছোট-খাট লেকটার জন্য রাজেশ্বরী সেদিকে তাহাদের বেড়াইতে যাওয়া পছন্দ করিতেন না, জলকে তাঁহার বড় ভয়। ছেলে যদি জল দেখিয়া সাঁতার কাটিতে চাহিয়া বসে ! মোটরে করিয়া এদিক ওদিক দূরে দূরে বেড়ানোর ট্রিপগুলাও ক্রমে আরম্ভ হইল। বিনয়ের ইচ্ছা ছিল, রাজেশ্বরী আর একটু সারিলে তবে এসব জায়গায় বেড়ানো আরম্ভ করিবে, কিন্তু কিশোরের ধৈর্য্য ধরিতেছিল না, তাহার আনন্দে রাজেশ্বরী দেবীও বাধা দিতে চাহিতেন না। সে যে এতদিন পর্য্যন্ত এমন করিয়া কোন কিছু চাহে নাই, কোন আবদার ধরে নাই ! তিনি নিজে অনেক জায়গায় গাড়ীতেই বসিয়া থাকিতেন,—বিনয়ের সঙ্গে কিশোর নামিয়া যাইত। সহর সমস্ত ঘুরিয়া দেখা শেষ হইয়া গেল। ডুরাণ্ডার বাঙ্গালী গৃহস্থ-পল্লীর মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে কতবার তাহাদের ইচ্ছা করিতেছিল, কাহাদের সহিত তাহাদের পরিচয় হয়, যেস্থলে তাহাদের বাসা, সেখানে প্রতিবাসী কেহ ছিল না বলিলেই চলে, কিন্তু গাড়ী হইতে নামিয়া অদ্ভুতভাবে গায়ে পড়িয়া কাহারো সহিত আলাপ করা তো চলে না, কাজেই মনের ইচ্ছা মনে চাপিয়া তাহাদের ফিরিতে হইত ! সে দেশের আদিম অধিবাসী কতকগুলি মুণ্ডার সহিত কিশোর কিন্তু ভাব করিয়া লইয়া "চুটু পালু, ইচাদাগ ইচাদাগ হুণ্ডুঘাগ" প্রভৃতি বচনে ছোটখাটো দু-একটা পাহাড়-পর্ব্বত এবং সে দেশের প্রকাণ্ড প্রপাতটির নাম শিখিয়া লইয়া মাতা ও বিনয়কে শুনাইয়া হাসিয়া অস্থির করিত। হুণ্ডু প্রপাত দেখা ও চক্রধরপুর যাওয়া এই দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা দূরান্তরের এবং রাজেশ্বরীর পক্ষে শ্রমসাধ্য বিষয় সব শেষের জন্য রাখিয়া তাহারা এদিক ওদিকই দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেদিন সূর্য্যাস্তের সময় জগন্নাথপুরের অনতি-উচ্চ পর্ব্বতের বহু প্রাচীন এবং জগন্নাথ দেব মন্দির দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কিশোরের একটী সঙ্গী জুটিয়া গেল। সঙ্গীটি কিন্তু একটি বালিকা, বয়সে তাহার চেয়ে বছর দুইয়েব ছোট হইবে ! তাহার মামা এবং মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে মোটরে করিয়া তাহারাও মন্দির দেখিতে আসিয়াছিল। তাহার দুর্দ্দান্ত সাহস এবং অত্যন্ত অবাধ্যতাই তাহাকে সহসা কিশোরের ভাল লাগিবার একমাত্র কারণ। অভিভাবক এবং সঙ্গীদের কাহারো সাবধানতা সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে ছিলনা—উঁচু প্রস্তরখণ্ড হইতে খণ্ডান্তরে সে নির্ঝরিণী প্রবাহের মতই ঝাঁপাইয়া ঝাঁপাইয়া চলিতেছিল, কখনো প্রাচীন বট বৃক্ষের ঝুরি ধরিয়া ঝুল খাইতেছিল। তাহার কৃতিত্বে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আকৃষ্ট হইয়া কিশোর তাহার নিকটে গিয়া একটা সূক্ষ্ম-রকম ঝুরি ধরিয়া ঝোঁক দিতেই সেই দুঃসাহসিনী বালিকা তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "ওটায় ঝুলো না—বড্ড সরু—আমি পারিনি। ভয় কর্‌বে।"

অত্যন্ত আনন্দে এবং উত্তেজনার সহিত একটু চেষ্টা দ্বারা কিশোর সেটাতে নিজের দেহভার সম্পূর্ণ ঝুলাইয়া দিয়া যেন ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর দিল, "না—এই তো বেশ পারা যাচ্চে।"

"তুমি তো খুব ওস্তাদ। তোমার নাম কি ভাই ?"

"কিশোর। আর তোমার নাম ?"

"নির্ঝরিণী !—আমায় সবাই ঝরণা বলে ডাকে।"

"বাঃ বেশ নামতো !" বালিকার আনন্দ-চঞ্চল দেহ

এবং স্বচ্ছ শুভ্র সৌন্দর্য্যভরা মুখের পানে চাহিয়া বালক ভাবিল,' নামটা কি সার্থক। বলিল,"তোমাদের বাড়ী কোথায় ভাই ?"

"এই খেনের বাড়ী ?—শামলংয়ে আমার মামার বাড়ী,মার সঙ্গে আমি মামার বাড়ী বেড়াতে এসেছি। আমার বাবা আমাদের দেশের বাড়ীতে আছেন। আমাদের বাড়ী কল্‌কাতায়। তুমি কোনদিন শামলংয়ের মাঠের ধারে সুবর্ণরেখার ওপরে যে পুলটা আছে, সেইখানের নদীটাকে দেখ্‌তে যাওনি ?" "না।"

"আঃ—সে যে কি মজা! পাথরের ওপর দিয়ে নীচে দিয়ে দোড়ে জল চলেছে। সেই জল কোথাও টপ্‌কে কোথাও হেঁটে পার্ হও—সে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত টান্—কালো কালো পাথরের বড় বড় চাপের মধ্যে সে জল—দেখ্‌তে যাবে একদিন ? কালই চল না--কাল আমাদের সেই নদীর পাহাড়গুলোর ওপরে চড়ি ভাতি হবে—যাবে ?"

বালিকার চেয়ে কিশোর একটু বড় বলিয়া তাহার একটু কাণ্ড-জ্ঞানও জন্মিয়াছিল। সে এই সাদর নিমন্ত্রণে একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার মা আসেন নি ?"

"না.—মামা এসেছেন আর ভাই-বোন্‌রা এসেছে। ওরা ভারি ভীতু,—দেখ্‌ছ না, ভয়ে ভয়ে পা বাড়াচ্ছে, যেন এখনি প'ড়ে ম'রে যাবে। তোমার কিন্তু বেশ সাহস!" তার পরে দূরে মোটরখানার দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে কে কে এসেছেন ? তোমার মা এসেছেন ?"

"হ্যাঁ—তাঁর অসুখ, তিনি মোটরের মধ্যে বসে আছেন, বেশী উঁচুতে উঠ্‌তে পারেন না। তুমি পড়না ?—কি পড় ?"

মাথা হেলাইয়া বালিকা টপ্‌-টপ্‌ করিয়া যে বই কয়খানার নাম করিল—তাহাতে কিশোর বুঝিল, বিদ্যাতেও সে প্রায় তাহারই সমপাঠী। অথচ বয়সে ছোট।

"তোমার বয়েস কত ভাই ?"

বালিকা গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, "সাত বছর। তোমার ? আট হবে, না ? ন বচ্ছর ? ইস্ ক্ক্‌খোনো নয়। নিশ্চয় মিথ্যে কথা—চল, তোমার মাকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি।"

কিশোর হাসিতে হাসিতে বলিল, "চল।" ইতিমধ্যে বিনয় দূর হইতে ডাকিল, "কিশোর—সন্ধ্যে হলো। বাড়ী যাবেনা এবার ?"

"উনি কে ভাই তোমার ?"

একটু থামিয়া বাধ' বাধ' স্বরে কিশোর বলিল, "বাবা।"

মন্দির দেখার পর কিশোরকে যথেচ্ছ বেড়াইতে দিয়া বিনয় একটু একান্তে একখানা পাথরের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সেইদিকে চাহিয়া ঝরণা বলিল, "তাহ'লে ভালই হল—চল তো ওঁর কাছে।"

বালিকাকে কিশোরের হাত ধরিয়া অন্য দিকে ছুটিতে দেখিয়া তাহার এক ভগিনী ডাকিল, "এই ঝরণা, দস্যি মেয়ে—এদিকে আয়—বাড়ী যেতে হবেনা ?" মুহূর্ত্তে ঘাড় উঁচাইয়া দস্যি মেয়ে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "ফের্ গাল্ দেওয়া! এখুনি মামাকে বলে দেবো।"

এইবার তাহার মাতুলই বোধ হয় সাদরে ডাকিলেন, "এসো মা, বাড়ী যাই।"

"দাঁড়ান্, যাচ্চি।" তখন তাহারা বিনয়ের নিকটস্থ হইয়াছে। অপরাধীকে যেমন টানিয়া লইয়া যায় তেমনি কিশোরের হাত ধরিয়া বিনয়ের সুমুখে দাঁড় করাইয়া দিয়া ঝরণা বলিল, "দেখুন তো আপনার ছেলে বল্‌চে, তার ন'বছর বয়েস--সত্যি ? আমার চেয়ে দু'বছরের বড় হবেন উনি ? কথ্‌খনো না। বলুন তো আপনি, ক'বছর এর বয়েস ?"

বিস্মিত মুগ্ধ বিনয় বালিকার কুঞ্চিত আলুলায়িত চঞ্চল কেশগুচ্ছের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা—ন বছরই বটে। তোমার বুঝি সাত ? নাম কি মা তোমার ?"

"ঝরণা! দেখুন, শামলংয়ে আমার মামার বাড়ী, কাল আমরা শামলংয়ের মাঠে নদীর যে পুল আছে, তারই নীচে চড়িভাতি করবো। আপনার আর আপনার ছেলের নেমন্তন্ন রইলো, বুঝেছেন ? কাল বেলা নটা দশটার মধ্যেই যাবেন, সবাই মিলে আমোদ করে রাঁধ্‌তে হবে তো! তার পরে বিকেলে খুব খানিক মাঠে মাঠে বেড়িয়ে আমাদের বাড়ী গিয়ে তার পরে চলে আস্‌বেন। বুঝ্‌লেন ? নিশ্চয় যাবেন—ভুল্‌বেন না।"

আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে বালিকা ছুটিয়া চলিয়া গিয়া নিজ দলের মধ্যে ভিড়িয়া গেল এবং মোটরে উঠিতে উঠিতেও হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে তাহাদের অনুরোধ জানাইল।

মুগ্ধ বিনয় এতক্ষণে যেন সম্বিত পাইয়া বলিল,"চল কিশোর, মামীর কষ্ট হচ্চে একা ব'সে—আমরাও এইবার যাই।" ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

সঙ্কলন

চিঠি

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ঘোর বাদল নেমেচে। তাই আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দী চিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। আকাশ-রঙ্গভূমিতে জলবাতাসের মাতনের যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘমল্লারের মীড় লাগিয়েছে। আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি কোথায় ভেসে গেল, সম্প্রতি আমি আমার সাম্‌নেকার ঐ সারবন্দী শালতাল মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি। প্রাণরাজ্যে ওদের হ'ল বনেদি বংশ, ওরা কোন্ আদিকালের রৌদ্রবৃষ্টির উত্তরাধিকার পুরোপুরি ভোগ করে চলেচে। ওরা মানুষের মত আধুনিক নয়, সেইজন্যে ওরা চিরনবীন। মানবজাতির মধ্যে কেবল কবিরাই সভ্যতার অপব্যয়ের চোটে তাদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসেনি। তাই তরুলতার আভিজাত্য কবিদের নিতান্ত মানুষ বলে' অবজ্ঞা করে না। এই জন্যেই বর্ষে বর্ষে বর্ষার সময় আমাকে এমন করে উতলা করে দেয়, আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিরাগী করে' প্রাণের খেলা-ঘরে ডাক্‌তে থাকে— আমাদের মর্ম্মের মধ্যে যে ছেলেমানুষ আছে, যে হচ্চে আমাদের সব চেয়ে প্রাচীন পূর্ব্বজ, সেই আমার কর্ম্মশালাটি দখল করে বসে। সেইজন্যেই বর্ষা পড়ে অবধি আমি হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বসে গেছি, কাজকর্ম্ম ছেড়ে গান তৈরি করচি—সেই সূত্রে মানুষের মধ্যে আমি সব চেয়ে কমমানুষ হয়েচি—আমার মন ঘাসের মত কাঁপচে, পাতার মত ঝিল্‌-মিল্‌ করচে। কালিদাস এই উপলক্ষ্যেই বলেছিলেন, "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।" অন্যথাবৃত্তি হচ্চে মানববৃত্তির গণ্ডীর বাইরের বৃত্তি। এই বৃত্তি আমাদের সেই সুদূর-কালে নিয়ে যায় যখন প্রাণের খেলা চল্‌চে, মনের মাষ্টারী সুরু হয় নি—আজ যেখানে ইস্কুলের মোটা থাম উঠেচে সেখানে যখন ঘাসের ফুলে ফুলে প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে। যাই হোক্, এই সময়টাতে ঘনমেঘে মধ্যাহ্ন ছায়াবৃত, মাঠে মাঠে বাদল হাওয়া ভেঁপু বাজিয়ে চলেচে, আর ছোট ছোট চঞ্চল জলধারা ইস্কুলছাড়া ছাত্রীদের অকারণ হাসির মত চারিদিকে খিল্‌খিল্ করচে। আজ ৭ই আষাঢ় কৃষ্ণা একাদশী তিথি, আজ অম্বুবাচী আরম্ভ হল। নামটা সার্থক হয়েচে, সমস্ত প্রকৃতি আজ জলের ভাষায় মুখর হয়ে উঠ্‌ল। ঘনমেঘের চন্দ্রাতপের ছায়ায় আজ অম্বুবাচীর গীতিকবিতার আসর বসেচে—তৃণসভার গায়েনের দল ঝিল্লীরাও নিমন্ত্রণ পেয়েচে, আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে "মত্তদাদুরী।" এ আসরে আমার আসন পড়েনি যে তা মনেও করো না। মেঘের ডাকের জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে যাব, আমি এমন পাত্র নই। মেঘের পর মেঘের মত আমারো গান চলেচে দিনের পর দিন—তার কোন গুরুত্ব নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই—মেঘ যেমন "ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" সেও তেমনি নিরর্থক উপাদানে তৈরি। ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুঞ্জন ধ্বনিতে গান ধরেচি—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেচে
আমার মনে ;
আমার ভাবনা যত উতলা হ'ল
অকারণে

ঠিক এমন সময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কি? হঠাৎ মনে পড়ে গেল মানব সংসারে আমার কাজ আছে,—শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চল্‌বে না, মানব ইতিহাসের যে সমস্ত মেঘমন্দ্র প্রশ্নাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অম্বুবাচীর আসর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আস্‌তে হল।

পৃথিবীতে দুটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্ম্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্চে খৃষ্টান আর মুসলমান-ধর্ম্ম। তারা নিজের ধর্ম্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্ম্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোন উপায় নেই। খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধা কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন; তাদের মন মধ্যযুগের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্ম্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এই জন্যে অপর ধর্ম্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্ম্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না। য়ুরোপীয় আর খৃষ্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। "য়ুরোপীয় বৌদ্ধ" বা "য়ুরোপীয় মুসলমান" শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্ম্মের নামে যে-জাতির নামকরণ ধর্ম্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। "মুসলমান বৌদ্ধ" বা "মুসলমান খৃষ্টান" শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপর পক্ষে হিন্দু জাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মত। অর্থাৎ তারা ধর্ম্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য-প্রভেদটা হচ্চে এই যে অন্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্ম্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্ম্মের সঙ্গে তাদের Non violent non-co-operation। হিন্দুর ধর্ম্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমানধর্ম্ম স্বীকার করে' মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অপর-সম্প্রদায়কে

নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষ্যে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টান্‌তে পারে নি। আচার হচ্চে মানুষের মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেচে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারী-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বস্‌তে দিতে হলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে' গণ্য করার মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মত দুই জাত একত্র হয়েচে ;—ধর্ম্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয় আচারে প্রবল,—আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয় ধর্ম্মমতে প্রবল, -এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এ'রা কি করে মিল্‌বে ? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো সে "হিন্দু" যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী-কালে। হিন্দুযুগ হচ্চে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ,—এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে এ'কে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোন প্রাণবান জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সাম্‌লাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাই হোক মোট কথা হচ্চে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্ম্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মত করেই গড়েছিল—এর প্রকৃতিই হচ্চে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি। এই বাধা কেবল হিন্দু-মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মত মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা ত এই, কিন্তু সমাধান কোথায় ? মনের পরিবর্ত্তনে, যুগের পরিবর্ত্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্য যুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌচেচে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডীর বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্ম্মকে কবরের মত তৈরি করে তারি মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চল্‌বার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেল্‌বার উপায় নেই। আমাদের মানস প্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েচে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোন রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্ত্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড় এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেল্‌তে হবে তারপরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু মুসলমানের মিলন, যুগপরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই ; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়েচে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেচে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আস্‌ব ; যদি না আসি তবে নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩২৯। স্নেহাসক্ত

শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ ১৩২৯। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বতঃস্ফূর্ত্তি

গাছ জানে না কখন তাকে ফুল ফোটাতে হবে। পাখী জানে না কখন দস্তুরমত তার গান গাওয়া চাই। সমগ্র প্রাণশক্তির ভিতর থেকে তাদের উদ্যম জাগে, এজন্যে তাদের বুদ্ধিবিচারের দরকার হয় না। সুনয়নী দেবীও এমনি করেই তাঁর ছবিগুলি ফলিয়ে তোলেন। কি করে আঁকতে হয় তিনি কখনো শেখেন নি, তাই তাঁর অশিক্ষিত সহজপটুত্ব

পূজারতা

শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত (প্রবাসীর সৌজন্যে)

অনায়াসেই রঙে রঙে ফোটে এবং রেখায় রেখায় গান করে' উঠতে থাকে।

তাঁর ছবির মধ্যে কোনো পূর্ব্বকল্পিত আদর্শ নেই, তারা যেন নিজে নিজে বেড়ে উঠেচে। তাতে রেখাগুলির ধারা অভিন্ন এবং সুনিশ্চিত; যেহেতু তারা তাঁর প্রকৃতির ভিতর থেকে উৎসারিত সেইজন্তে কোনো দ্বিধায় নিজের পথ হতে তাদের বিক্ষিপ্ত করে নি: তারা প্রশান্ত গম্ভীরতায় ব্যাপ্ত হয়ে এক-একটি আকৃতিকে বা আকৃতি-সমবায়কে বেষ্টন করে' ধরে; তারা একইকালে বেগবান এবং মন্থর, যেমন তাদের আত্মঘোষণ তেমনি আত্মসম্বরণ, বায়ুহিল্লোলিত ভরা ফসল-ক্ষেতের মত যেন এই রেখাগুলির চারিদিক থেকে আতপ এবং আভা বিকীর্ণ হতে থাকে।

তাঁর আঁকা বালিকাদের মুখগুলি চারিদিকে পূর্ণ পরিণত প্রাণশক্তির উদ্দাম এবং বিরাম গাঢ় লাল গাঢ় সবুজ বর্ণে আবিষ্ট হয়ে আছে।

গ্রাম-বধূ

শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত (প্রবাসীর সৌজন্যে)

তাদের সাড়িগুলির মধ্যে এমনি একটি ব্যঞ্জনা, যেন তারা কাপড়ে তৈরী নয়, যেন তারা একটি কোমল ভাবের ভঙ্গিমায় গড়া। সেই সাড়ি যেন ঐ মেয়েগুলিকে একটি উদার প্রবাহে বেষ্টন করে' রক্ষা করচে। এইসব তরুণী, যৌবনের গোপনবার্ত্তা যাদের কাছে কেউ প্রকাশ করে নি, অথচ যারা আপনিই তা বুঝে নিয়েচে, তাদেরই ভাবাকুল রহস্যময় সত্তাকে এই সাড়িগুলি যেন বড় আদরের দোলায় দোলাচ্চে। এই মেয়েদের চোখে চাঞ্চল্য নেই, তারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত; তারা সেই অন্তরলোকের দূতী যে লোক লাল এবং সবুজ সাড়ির বিলুণ্ঠিত অবগুণ্ঠনে আবৃত। তাদের ঐ দীর্ঘ এবং স্থির অথচ পাখীর মত উদ্ভ্রান্ত চোখদুটির ভিতর দিয়েই তাদের মনের চিন্তা এবং হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ পেয়ে এই ছবিটিকে জীবন পূর্ণ করে' তুলেচে।

বাউল

শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত (প্রবাসীর সৌজন্যে)

এমনি করে' ছবিগুলির মধ্যে দুই ধারার ছন্দ দেখা দিয়েচে। একটি হচ্চে, শস্যক্ষেত্রের ভিতরকার বায়ু-মূর্চ্ছনার মত শান্ত এবং ব্যাপক, এমন একটি গাম্ভীর্য্যের বিস্তার যেটি সমগ্র ছবিকে ঐক্য এবং ধ্রুবত্ব দান করেচে। আরেকটি হচ্চে ঠিক এর বিপরীত, সেটি চঞ্চল, তীক্ষ্ণ, লঘু, সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ গতিমাত্র, প্রশস্ত বর্ণপুঞ্জের উপর দিয়ে সে দ্রুত বেগে চলে। এমনি করে' চোখ, ঠোঁট, এবং হাত দুটি মিলে একখানি

অর্দ্ধনারীশ্বর
শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর অঙ্কিত (প্রবাসীর সৌজন্যে)

ভাবব্যঞ্জনার ভঙ্গিতে পরিণত হয়ে পাখী ওড়ার মত ত্বরিত বেগে রচনাটির সুসংযত প্রবাহের উপর দিয়ে চলে যায়।

এমনি করে' খণ্ডকালের চঞ্চলতা এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন স্থিতি উভয়ে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ভঙ্গিমায় দৃশ্যমান হয়ে উঠেচে। সুনয়নী দেবীর আর্টের মূলতত্ত্বই হচ্চে জীবনের ভিতরকার এই দ্বৈত, যা একইকালে অনিত্য এবং ধ্রুব। এই ত সেই ভারতীয় প্রকৃতির প্রকাশ, যার গুণে ইনি অজন্তার অখণ্ড প্রবাহিত কলারীতিকে এমন অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেচেন। মোগল চিত্রকলা ভারতীয় আর্টকে আয়তনে প্রাণশক্তিতে এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় যে খর্ব্ব করে' ফেলেছিল, এই ছবিতে সেই ত্রুটি বিস্মৃত এবং মার্জ্জনাপ্রাপ্ত হয়েচে। রচয়িত্রীর অজ্ঞাতসারে অথচ নিশ্চিত নৈপুণ্যে এই ছবিতে বিশুদ্ধ ভারতীয় রেখার আকুঞ্চন-ভঙ্গী (curvature) আপনার শান্ত সকরুণ সুরটিকে প্রকাশ করেচে।

যে কলারীতি দুই হাজার বছরের পূর্ব্বেকার জিনিষ, তারই সঙ্গে এত সহজে সুর মিলিয়ে বোধ হয় আজকালকার দিনের কোনো পুরুষ চিত্রকর এমন করে' চিত্র রচনা করতে পারত না। মেয়েদের হাতের স্বাভাবিক সুক্ষ্মচেতনা, এবং নারীর নিজের মধ্যে অন্তর্গূঢ় জাতীয় জীবনের অখণ্ড ধারাবাহিকতার সহজ-বোধের দ্বারাই এটা সম্ভবপর হয়েচে। সেইজন্তেই এখনকার কালের অশিক্ষিত গ্রাম বধূরা তাদের আলপনায় যে-সব মোলায়েম গোল রেখার ধারা আঁকে, তার মধ্যে আমরা সনাতন ভারতকলাপ্রচলিত প্রাণের গতি-রেখা দেখ্‌তে পাই।

সুনয়নী দেবী আর্টিস্‌ট্ পরিবারের মেয়ে। তাঁর কোনো কোনো ভাই বহুকাল পূর্ব্বে অজন্তার গুহায় ছবি এঁকেছিলেন, আবার তাঁর কোনো কোনো ভাই আর কিছুকাল পরে ইটালিতে জন্মেছেন, যেমন, মাগারি-টোনে ডারেঞ্জো এবং গুইডোডা সিয়েনা। এইসব ভাইদের মধ্যে কেউ কারো অনুকরণ করেন নি, এমন কি পরস্পরের অস্তিত্ব তাঁদের জানাই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির এমনই আশ্চর্য্য নিয়ম যে, মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন করে' চলে তখন দেশকাল নির্ব্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে। এই জন্যেই ত সকল কালের সকল দেশের যোগীদের জীবন ও উক্তি সম্বন্ধে এমন সাদৃশ্য দেখা যায়।

এমন একটি দ্বিধাহীনতার জোরে সুনয়নী দেবী তাঁর তুলিতে রেখার টান দেন, সেই নিঃসংশয় বোধশক্তির অনুসরণ করেই তিনি রঙের মধ্যে লাল আর সবুজ বেছে নিয়েচেন। তাঁর বৈচিত্র্যহীন বর্ণ-সমাবেশের মধ্যে একটি গাম্ভীর্য্য আছে। সোনালি আর কালো রং পরিমিতভাবে বাঁটোয়ারা করে' দিয়ে তাঁর ছবিতে তিনি ঘনতা দেখিয়েছেন; আর মেয়েদের মুখের, দেয়ালের পর্দ্দার কোমল ধূসর (grey) এবং পিঙ্গল (brown) রঙের এক সমতলে তিনি লাল আর সবুজ রঙ মেলে ধরেছেন।

এই রকম চিত্রকলার মধ্যে যে নিবিড়তা আছে সে নিজের মধ্যেই নিজে বদ্ধ থাকে, কেননা শিল্পীর অন্তর্নিহিত রীতিধারাই তার আশ্রয়। কোনো শিক্ষা, বাইরের কোনো প্রভাব তাকে পোষণ করতে পারে না; বরঞ্চ তাকে মূলভ্রষ্ট করে' দিয়ে নষ্টই করতে পারে। আরও একটি বিপদ আছে, মাঝে মাঝে সুনয়নী দেবীকে তা আক্রমণ করে' থাকে, সে হচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা ও গল্পের সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য। তাঁর নিজের সৃষ্টি যে-সমস্ত উপাদানকে ব্যবহার করে সেইগুলি যদি তাঁর দৃষ্ট বা কল্পিত পদার্থের অনুকৃতি চেষ্টায় খাটাতে হয় তাহলে তাঁর সহজ সৃজনশক্তির উৎস এই সব জঞ্জালে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, তাহলে তাঁর দৃষ্টির ও লেখনী-চালনার ক্ষিপ্রতাই প্রবল হয়ে উঠ্‌বে এবং হৃদয়াবেগ ও ঘটনা-বর্ণনার ব্যস্ততায় তাঁর রচনার স্বাভাবিক শান্তি চলে' যাবে।

সুনয়না দেবীর নিজেও অন্তরের মধ্যেই আর্টিস্‌টের সমস্ত ঐশ্বর্য্য আছে। তাঁর আর কিছু দরকার নেই। তিনি যদি তাঁর সেই ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের অধিদেবতার গোপন সঙ্গীতে কান পেতে থাকেন, তাহলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা আপনিই প্রকাশিত হতে থাকবে।

প্রবাসী, শ্রাবণ—১৩২৯। ষ্টেলা ক্রামরিশ্।

গান

১

ভোর হল যেই শ্রাবণ-শর্ব্বরী
তোমার বেড়ায় উঠল ফুটে
হেনার মঞ্জরী।
গন্ধ তারি রহি রহি
বাদল বাতাস আনে বহি,
আমার মনের কোণে কোণে
বেড়ায় সঞ্চরি'।
বেড়া দিলে কবে তুমি
তোমার ফুল-বাগানে,
আড়াল করে রেখে ছিলে
আমার বনের পানে।
কখন্ গোপন অন্ধকারে
বর্ষারাতের অশ্রুধারে
তোমার আড়াল মধুর হয়ে
ডাকে মর্ম্মরি।

শান্তিনিকেতন শ্রাবণ — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২

একলা বসে একে একে অন্যমনে
পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে।
হায়রে বুঝি কখন তুমি গেছ ভুলে
ওযে আমি এনেছিলাম আপ্‌নি তুলে,
রেখেছিলেম প্রভাতে ঐ চরণমূলে অকারণে,
কখন্ তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে অন্যমনে॥
দিনের পর দিনগুলি মোর এম্‌নি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়,
এম্‌নি তোমার আলস ভরা অবহেলায়,
হয়ত তখন বাজবে ব্যথা সন্ধেবেলায় অকারণে,
চোখের জলের লাগবে আভাস নয়ন কোণে অন্যমনে॥

শান্তিনিকেতন শ্রাবণ — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আসা-যাওয়ার মাঝখানে

আসা-যাওয়ার মাঝখানে
একলা আছে চেয়ে কাহার
পথ-পানে!
আকাশে ঐ কালোয় সোনায়
শ্রাবণ-মেঘের কোণায় কোণায়
আঁধার-আলোয় কোন্ খেলা যে
কে জানে,
আসা-যাওয়ার মাঝখানে!
শুক্‌নো পাতা ধুলায় ঝরে,
নবীন পাতায় শাখা ভরে।
মাঝে তুমি আপন-হারা,
পায়ের কাছে জলের ধারা
যায় চলে' ঐ অশ্রুভরা
কোন্ গানে,
আসা-যাওয়ার মাঝখানে।

প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩২৯। — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেলাঘরে

(সাজানো খেলাঘর। এগারো বছরের মেয়ে গৌরী। হাই তুলিয়া আলস্য মেলিয়া)

কা কা, গুড়ুম!

ভোর হল, কাগ ডাক্‌ল, তোপ পড়্‌ল, যাই সব দেখিগে। বউ-ঝিরা বেলা আটটা অবধি ঘুমোবেন আমার ত আর সে জো নেই। এই কাগ না ডাক্‌তে উঠ্‌ব আর রাত দুপুর পর্য্যন্ত নিস্তার নেই। একেই বলে সংসারের সুখ!

ও কালো ঝি, হ্যাঁরে, ক্ষীরোদা এয়েচে? এখনো আসে নি? তা কেন আসবে! ওনার বাসায় নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্চেন! এই যে এসেছে! হ্যাঁ লা ক্ষিরী, তোর কি রকম আক্কেল? কালো ঝি যেন ঝাঁটপাট দিয়েচে, তা বলে কি অন্য কাজ নেই? উনুনে আগুন দিতে হবে না? আজকে রামদাসের এগ্‌জামিন, জানিস নে, নটার সময় ভাত খেয়ে তাকে যেতে হবে? ছেলেদের সকলের স্কুলের তাড়া, আর ওঁর যদি বেরুতে এক দণ্ড দেরী হয় তা হলে আর রক্ষে থাক্‌বে না। একে ত রাগী মানুষ, তার ওপর বয়স হয়ে দিন দিন আরও রাগী হচ্চেন।

বামুন ঠাকুর, ছেলেদের চা'র জল নামিয়ে দিয়ে আগে

ডাল চড়িয়ে দাও। জলয়েথে বাটিতে আমি সোনা-মুগের ডাল বের কোরে দিয়েচি। কালো ঝি, তোর ঘর ধোয়া হ'ল? মাছের চুবড়ী আর ঝুড়ি নিয়ে এইবারে বাজারে যা। এই দুটো টাকা নে, তাই বলে সব যেন বাজারে খরচ কোরে আসিস্ নে। রামদাস আমার কই-মাছ ভাল বাসে, বামুন ঠাকুর তপ্ত খোলায় ভেজে দেবে। আর ওঁর জন্যে পুকুরের মাছ চাই, সংসারেও তাই হলে হবে। তোদের জন্যে দু-পয়সার কুচো চিংড়ী আনিস্। ডাঁটা পাতা গোচ্চার আনিস্ নে, শুধু ফেলা যায়। বাজারে কচি আমড়া উঠেচে, অম্বলের জন্য দুটো আনিস্। আমার ত এমন পোড়া অরুচি হয়েচে, কিছু মুখে রোচে না। পোস্তো চড়্ চড়ি হলে দু মুঠো ভাত খেতে পারি। এক পয়সার পোস্তো আনিস্ ত। কি বল্লি? দই? মাগী যেন নেকী, দই আবার কোন্ দিন আসে না যে জিজ্ঞেস করচিস? দই যেমন আসে তেমনি আস্বে। যা যা, শীগ্ গির যা! যাবি আর আস্বি।

ক্ষিরী, জলখাবার কোথায়? ছেলেমেয়েরা কোথায় গেল? বাবা, বাবা, বাবা! ওদের ডেকে ডেকে আর পারিনে! ও পাঁচকড়ি, ও পুঁটি, চা যে জল হয়ে গেল! খাবার হাতে কোরে আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? তোরা খেলে আমার পেট ভর্‌বে, না? রোদ চড়্ চড় কোর্‌চে তোদের ঘুমই ভাঙে না। ঘুম যদি ভাঙল ত মুখ ধোয়া হয় না। তাও বা যদি হ'ল ত খাবার খোঁজ নেই। আমার কি অন্য কাজ নেই যে সারাক্ষণ তোদের সাধাসাধি কোর্‌ব?

হ্যাঁ বউমা, কাপড় ছাড়া হয়েচে? দেখ দেখি, বাছা, ছেলেদের আমি আর পারি নে। এই খাবার নিয়ে সাধাসাধি, যেন আমার মাথা কিন্‌বে। তুমি একটু জল খাওত মা, আমি একবার ঠাকুর-ঘর থেকে আসি।

ওই যাঃ, পুঁটি, কাগে যে তোর সন্দেশ নিয়ে গেল! আমার কি দশটা হাত যে সব দিক কোর্‌ব? একবার ঠাকুর-ঘরে এসেছি আর পোড়ারমুখো কাগে বাছার মুখের খাবারটুকু নিয়ে গেল! আচ্ছা বউ মা, তুমি ত বসেছিলে, কাগটাকে কোন্ হুস্ কোরে তাড়িয়ে দিলে? কি বল্‌চ, তুমি পান সাজছিলে, দেখতে পাওনি? সংসারে থাক্‌তে গেলে সকল দিকে নজর রাখ্ তে হয়। ও ঝি, আর একটা সন্দেশ এনে দে। আহা, মুখের খাবার গা! অমন কাগের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়!

এই যে বাবা রামদাস, বসো, আসন পাতা আছে। ও ঠাকুর, রামদাসকে ভাত দিয়ে যাও, গরম গরম কই মাছ ভাজা দিও। শুন্‌চ কালা, কথা শুন্‌তেই পায় না।

ছেলেরা সব চুপ কোরে বসে খা না, অত হাউ-চাউ কর্‌চিস কেন? ওই, এইবার উনি আস্‌চেন! এখন যে চুপ কর্‌লি সব? আবার চেঁচা না, তখন মজা দেখ্ বে!

(মাথায় কাপড় দিয়া) এই যে আমি বাতাস কর্‌ছি। আম-কাঁটালের সময় যেমন মাছি এখন তেমন নেই, তবু আছে বই কি! মাছি ছাড়া দেশ কবে আবার বল! ঝোল মেখে আর দুটী ভাত খাও, তুমি ত ঝোলের বড্ড ভাল বাস। পোনামাছের মুড়ো আছে। পাতে রাখবে কার জন্য? বউমার জন্য? তা থাক্। তোমার দিন দিন খাওয়া কমে যাচ্ছে। কি বল্‌চ? বয়স হ'লে কমে যাওয়া ভাল? কি আর তোমার এমন বয়স হয়েচে? তোমার যত সব ছিষ্টিছাড়া কথা! হ্যাঁ, রামদাস খেয়ে গিয়েছে। সকলে ত বল্‌চে পাস হবে, আমিও অনেক মানত মেনেছি, তার পর আমাদের বরাত। তুমি বল্‌চ পাস কোরেই বা কি হবে? তাও সত্যি, তা হলে ছেলেরা কি করবে? দিন দিন যে সময় হচ্চে দেখে শুনে হাত পা যেন পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যায়। তোমার বেলা হয়ে যাচ্চে? তাও ত বটে! পানের ডিবে তোমার পোষাকের কাছে আছে।

বামুন ঠাকুর, উনি খেয়ে বেরিয়েচেন, ছেলেরাও বেরিয়েচে, এইবার বউমাকে আর আমাকে দাও। ঝি-চাকরেরা যারা খেতে চায় তাদের দাও। ক্ষিরী ত এখন খাবে না, সে ভাতের থালা নিয়ে তার বাসায় যাবে সেইখানে তার প্রাণ পড়ে আছে। হ্যাঁরে, সিধু, তুই বা'র-বাড়ীর কাজ করিস ব'লে কি একবার উঁকিও মার্‌তে নেই? বাবুর কাজ কর্‌ছিলি? ভারি ত তোর কাজ! বাবু যদি বেরুল ত তোর টিকিটিও দেখবার জো নেই! আজ যেন খবরদার খেয়ে বাড়ী ছেড়ে যাস্‌নে, আমি মজুমদারদের বাড়ী যাব। তুই গাড়ী ডাক্‌বি আর আমাদের সঙ্গে যাবি।

ক্ষিরী, তুই বামুন ঠাকুরের সঙ্গে ক্যার্ ক্যার্ করচিস্ কেন? কুঁচুলে নাড়া কোঁ কোঁ করে। মাগী যদি দু-দণ্ড চুপ কোরে থাকে! মাছ যেমন কুলুবে সেই রকম দেবে, তোর ঘরে খাবার লোক আছে ব'লে কি তোকে বেশী কোরে দেবে? এ ত আঁর জগ্‌গি বাড়ী নয় যে যত খুসী নিবি?

এস ত বউমা. তোমার শ্বশুরের পাতে বস। তোমার জন্যে মাছের মুড়ো রেখে গিয়েছেন, তোমাকে বড় ভাল বাসেন কি না। তুমি কি আমার সঙ্গে ক্ষান্তর মার বাড়ী যাবে? তা বেশ ত! হ্যাঁ, পুঁটীও যাবে বই কি! তার বয়স কত হ'ল? তা বছর চোদ্দ পনর হবে। হ্যাঁ বউমা, ঠিক বলেছ, ওইটে আমাদের বড় খারাপ। ডাক-নাম কিছুতে আর ঘোচে না। এখন যেন ছোট মেয়ে কিন্তু ছেলের মা হ'লেও পুঁটীই থাক্‌বে। খোকা যদি হ'ল ত তার আর সে নাম ঘুচ্‌বে না। যখন ছেলের বাপ তখনও খোকা। তুমি ত বল্‌চ বড় হ'লে ও-রকম কোরে ডাকৃতে নেই, নাম ধোরে ডাকৃতে হয়, কিন্তু সে কথা শোনে কে? পুঁটী ত আজন্ম কাল পুঁটীই রইল কখনো রুই-মিরগেল হতে পাবে না। আর যদি খোকা হলেন তা হ'লে শেষে বাপও খোকা বেটাও খোকা। এম্‌নি আবার মজা যে পুঁটীকে যদি তার ভাল নাম ধোরে ডাকো তা হলে সে অপ্রস্তুত হয়।

পাণের বোঁটা কোরে একটু চুণ দাও ত বাছা, চুণ একটু কম হয়েচে। না, দোক্তা আর চাইনে। খেয়ে দেয়ে যে একটু জিরোবো তারও জো নেই। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও সোয়াস্তি নেই। বউমা, কাপড় পর-গে। তোমার নতুন জরির কল্কা দেওয়া খয়েরি রঙের সাড়ী পোরো। পুঁটী, তোর হ'ল? কি মেয়ে মা, কোন কিছুর খোঁজই নেই। একি কাপড় পরা হ'ল? এত কাপড় থাকৃতে ওই পছন্দ? তা বেশ, যা হয়েচে বেশ হয়েচে। এইবার সিধুকে গাড়ী ডাকৃতে বল। গাড়ী নয় ট্যাক্সি? আচ্ছা, বাছা, যা তোদের ইচ্ছে তাই কর্। তোদের আজ কাল সব-তাতে তাড়া, ঘোড়ার গাড়ীতে মন ওঠে না, ভোঁ কোরে মোটোরে না গেলে মনের মত হয় না।

ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে ঘণ্টা-খানেক লাগে আর এ ট্যাক্সিতে ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে পথ কেটে যায়। এই হেদো, সিমলে, বার-সিমলে, ঠনঠনে সব চোখ বুলিয়ে যাও, ভাল কোরে দেখ্‌বার জো নেই। এই যে বাড়ী এল। ও সিধু, তুই এগিয়ে চ'। বউমা, তুমি আগে নাম। পুঁটি অত ব্যস্ত হোস্‌নে, হাজার হোক পরের বাড়ী ত, ছটফট করলে ওরা নিন্দে কোরবে।

এই যে ক্ষান্তর মা দাঁড়িয়ে। দেখ ভাই, কদিন আস্‌ব আস্‌ব মনে করচি হয়ে ওঠে নি। আর তুমিও ত একটা মস্ত সংসারের গিন্নী, জানই ত কত রকম ঝঞ্ঝাট, মনে কোরলেই বাড়ী থেকে বেরুনো যায় না। হ্যাঁ, বউমা আর পুঁটীকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ওদের ফেলে এলে ওরা মনে দুঃখ কোর্‌ত। ওমা, ক্ষান্তকে সে দিন দেখেছি, এরি মধ্যে বেশ ডাগরটী হয়েচে। তা বিয়ের জল পেয়েচে কিনা, মাথা চাড়া ত দেবেই। ক্ষান্ত, শ্বশুর-বাড়ী থেকে কবে এলে? শাশুড়ী কেমন হয়েচে? মেয়ের লজ্জা দেখ, মাথা হেঁট কোরে রইল! আমার কাছে আবার কিসের লজ্জা! তোমার মাতে আমাতে ছেলেবেলা কত খেলা করেচি। আমি কি তোমার মাসী নই?

হ্যাঁ ভাই, পুঁটী বড় হয়ে উঠ্‌চে বই কি! বিয়ের সম্বন্ধ ক-জায়গা থেকে এসেচে, কিন্তু এখনো কোথাও পাকা কথা হয় নি। উনি বল্‌চেন, তাড়াতাড়ি কিসের, এখন ত আর খুব ছোট-বয়সে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় না। সেই জন্যে আমিও আর বেশী কিছু বলিনে। তবে তুমি যা বল্‌চ তা সত্যি কথা বটে, আইবুড়ো মেয়ে ঘরে থাক্‌লেই ভাবনা হয়। যে ক'দিন আমার ঘরে থাকে। মেয়েতো পরের ঘরে যাবেই! এই ক্ষান্ত তোমার কাছে রয়েচে, বড় হ'লে কি আর যখন-তখন আস্‌বে? তখন নিজের ঘর চিনে নেবে, কালে-ভদ্রে কখন বাপের বাড়ী আস্‌বে!

তোমার সেই যে ঢাকাই কাপড় পছন্দ হয়েছিল, কাপড়উলীকে তোমার ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। এসেছিল? তুমি দুখানা সাড়ী কিনেছিলে? তা বেশ, তা বেশ। আর যদি আক্রার কথা বল তাহলে কোন্ জিনিসটা এখন সস্তা পাওয়া যায়? সব আগুনে

পর, কোন জিনিসে হাত দেবার জো নেই। এর পর কি যে হবে তাই ভেবে সারা হই।

জল-খাবার ? না ভাই, আমি বুড়ো মাগী, জলখাবার আবার কি খাব ? দুবেলা দুটো ভাত খাই তাই সব সময় সয় না। বউমা আর পুঁটী ছেলেমানুষ, ওদের দাও। ওকি ও বউ মা, তুমি আবার খাবে না কেন ? এখানে আবার লজ্জা কিসের ? ছেলেবেলা ত হাঁসের মত খাওয়া হবে।

ও ভাই ক্ষান্তর মা, বেলা গেল ভাই, এইবার বাড়ী যাই। বাড়ীতে একদণ্ড না থাকলে সংসার চলে না। তা ভাই, তুমি ত সব জান, তোমারও ত মস্ত সংসার। কর্ত্তা এসে যদি দেখেন আমি বাড়ী নেই তা হলেই মুখ ভার হবে। ছেলেরা আছে, মেয়েরা আছে, দুদণ্ড আমায় দেখতে না পেলে মা মা কোরে বাড়ী মাথায় কোরবে। পুঁটি, সিধুকে বল্ একখানা গাড়ী ডাকতে। কি বললে ক্ষান্তর মা, গাড়ীর দরকার নেই, তোমাদের ঘরের মোটোর আছে তাইতে যাব ? তা সেও বেশ কথা, তাই যাব।

তাহলে ভাই আজ আসি, কিছু মনে কোরো না। থাক্ থাক্ ক্ষান্ত, পায়ে হাত দিয়ে আর নমস্কার করতে হবে না। হ্যাঁ মা, আবার আসব বই কি! আমরা আসব, তোমারা যাবে, পুঁটী আর বউমা ত সারাক্ষণ তোমার নাম করে।

এই ত বাড়ী এল। হাওয়া-গাড়ী না হাওয়া গাড়ী! হাওয়াই বা কোথায় থাকে! এই যে, ঝিয়েরা কোথায় গেল ? আমি বাড়ী নেই আর কারুর কোন ভাবনা নেই। ও কালো ঝি, কোথায় গেলি ? হ্যাঁ বাছা, তুই কতকেলে লোক, তোর ত বাসাও নেই, আর সেখানে খাবার মানুষও নেই। রোজকার কাজ কি তোকে রোজ রোজ বলে দিতে হবে ? কাচা কাপড়গুলো দড়ীতে মেলানো রয়েচে এখনো তোলা হয় নি কেন ? ছেলেদের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিলুম, তারা সব খেয়েচে ত ? সিধু, তুই দাঁড়িয়ে হাঁ কোরে কি দেখচিস ? বাইরে গিয়ে কাজকর্ম্ম সব সেরে রাখ, না হ'লে উনি এসে বকবেন। আর সব বকুনী শেষে পড়ে আমার উপর। আমি ত ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আছি। ছেলে মেয়ে বাড়ীর কর্ত্তা যে যেখানে আছেন সব ঝক্কি আমার ওপর। এর নাম বাড়ীর গিন্নী!

কলের ঘরে কে তোরা, আমাকে কি কাপড় কাচতে দিবি নে ? বাড়ীর মেয়েগুলো যেন জলের পোকা, কলতলায় গেলে আর আসবার নাম নেই। আর সাবান মাখবার ঘটাই কি! এদিকে ত বাচ-বিচার সব ঘুচে যাচ্চে। এক্কা কাপড়েই সব-তাতে হাত দেবে, সত্তিক জাতের ছোঁয়া খাবে। কে, বউ মা ? হ্যাঁ মা, আমার কাপড় কাচা হয়েচে, তুমি এস। কালো ঝি, আমার কাপড়খানা ওপরের বারান্দায় মেলে দে ত। ক্ষিরী যে নোংরা, ওর হাতের কাজে আমার কেমন ঘেন্না করে। পুঁটী, তুই কাপড় ছেড়েচিস্ ? পেরেক থেকে আমার মালার ঝুলি পেড়ে দে ত! নারায়ণ, মধুসূদন! বউমা, সন্ধ্যা দিয়েচ ? বেশ করেচ। কালো ঝি, ভাল ক'রে ধুনো দে, আবার এমন মশা হয়েচে যে আস্ত মানুষকে টেনে নিয়ে যায়, আর সন্ধ্যে হতেই ত কাণের গোড়ায় শানাই বাজতে আরম্ভ হবে।

বামুন ঠাকুর, রাত হচ্চে যে, ছেলেদের ভাত দাও। রামদাস, বসো, তোমার রুটী আনচে। ও হরি, ছাকা, খুকী, ভাত বেড়েচে যে। হুড়োহুড়ি করিস্ নে, ভাল কোরে খোস্। বামুন ঠাকুর, হাঁসের ডিমের ডালনা ছেলেদের দাও। পুঁটী, দুধে ভাতে চিনি মেখে খা দেখি। দুধ কেউ ছুঁতে চায় না।

বউমা, বামুন ঠাকুর ওঁর লুচি ওপরে নিয়ে গিয়েচে, তুমি চল, আমি যাচ্চি।

আজ তোমার আপিস থেকে ফিরতে অত দেরী হ'ল কেন ? খাটুনি যেন দিন দিন বাড়চে। হ্যাঁ, আজ ক্ষান্তর মার বাড়ী গিয়েছিলুম। তারা বেশ মানুষ। হ্যাঁ, তাইত বটে, আমি পাড়া বয়ে কোঁদোল করতে যাই। সে কথাটি কেউ বলতে পারবে না। বাড়ীতে বকি-ঝকি, যা খুসী করি, পরের চর্চ্চায় থাকিনে। বউমা, নীচে যাও ত, ঘরে কি মিষ্টি আছে, ছেলেদের দাও গে।

বুড়ো-বয়সে তোমার রঙ্গ দেখে বাঁচিনে! বউমার সাক্ষাতে বুঝি ঐ-রকম কোরে ঠাট্টা কোরতে হয় ? আমার মুখখানা ছাই হোক আর পাঁশ হোক ঐ মুখ নিয়েই ত এত দিন ঘর কোরেচ, আর এ মুখনাড়াও নতুন নয়। যাও যাও, আর জালিও না!

এস বউমা, আমরা খেয়ে শুতে যাই। বামুন ঠাকুরের কি এইবার হেঁশেল তোলা হবে নাকি? ঝি, রান্নাঘরের শেকল ভাল কোরে টেনে দিস্, যেন বেরাল না ঢোকে। পোড়া বেরালের জ্বালায় অস্থির কোরে তুললে!

(গৌরীর মা পিছন থেকে পা টিপে টিপে এসে শেষের কথাগুলি শুনলেন। হেসে বললেন, "ও গিন্নী, রান্না ঘরে ত শেকল দেওয়া হ'ল, আর ওদিকে আমি যে ভাঁড়ার ঘর খুলে রেখে এসেছি! বলি, মুখ ধুয়ে খাবার টাবার খেতে হবে না?"

গৌরী মুখ ফিরিয়ে মাকে দেখে হেসে উঠ্‌ল; বললে, "এই যে যাই মা!" খেলাঘর গুছিয়ে তুলতে লাগ্‌ল।)

কার খেলাঘর, মেয়ের না মা'র, না দুজনেরই?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

চলতি কথা

চলার পথ—কিছুদিন আগে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনেকেই নিজের কাজ-কর্ম্ম ফেলে দেশের কাজে লেগেছিলেন। অনেক ব্যবহারজীবীও ব্যবসা ছেড়ে তাঁদের সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ অসহযোগ প্রচারের কাজে ব্যয় করেছেন। এই কাজে অনেকেই কারাদণ্ডকে পর্য্যন্ত বরণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এঁদের মধ্যে অনেকেই যেমন অকাতরে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে নেমেছিলেন তার চেয়েও অসঙ্কোচে আবার নিজের ব্যবসায়ে ফিরে যাচ্ছেন।

ব্যবহারজীবীদের কথাই ধরা যাক;- আইনের ব্যবসা করলে মানুষের স্বাভাবিক চিত্ত-বৃত্তি কঠোর হয়ে যায়, সত্য মিথ্যার জ্ঞান আর তেমন থাকে না, মানুষকে অমানুষ করে ফেলে ইত্যাদি যে সকল মহাজন বাক্য আছে সে সকল নজির তুলে আমরা কোনো সম্প্রদায়ের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না। তবে আমরা এইটুকু বুঝতে চাই মাত্র যে, এক বছর আগে যাঁরা মনে প্রাণে বুঝেছিলেন—বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখা আর আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দেওয়া এক কথা, একদিন যাঁরা প্রচার করেছিলেন যে, এই গবর্মেণ্টকে সাহায্য করা দেশের মঙ্গলের পরিপন্থী—আজ তাঁরা আবার কি ভেবে আদালতে যোগ দিচ্ছেন? দেশের অবস্থা অথবা গবর্মেণ্টের ব্যবস্থার তো কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নি!

ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—প্রথম, এঁরা সে সময় মুখে যা বলেছিলেন অন্তরে বিচার কোরে তা বিশ্বাস করেন-নি। যশের আকাঙ্ক্ষায় অথবা সাময়িক উত্তেজনার আবেশে অসহযোগ আন্দোলনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে লোক ক্ষেপিয়ে বেড়িয়েছেন, নিজেরা জেলে গিয়েছেন এবং আরো অনেক অকপট কর্ম্মীর কারাদণ্ড ও অন্যান্য সাংঘাতিক বর্ব্বরোচিত শাস্তির এবং পরোক্ষভাবে অনেকেরই মৃত্যুর কারণ হয়েছেন আর বর্ত্তমানে অর্থ ও উত্তেজনা দুয়েরই অভাবে আবার আদালতের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন।

দ্বিতীয়—এই সব নেতারা তখন যা বলেছিলেন এখনও তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তবে অর্থের অভাবে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে ও দেশের অমঙ্গল হবে জেনেও আবার ওকালতী করতে বাধ্য হচ্ছেন। "অভাব" এবং "বাধ্য" এই দুটী কথা ব্যবহার করবার বিশেষ কারণ আছে। সম্প্রতি বাংলা দেশের একজন অসহযোগী নেতা আদালতে ফিরে যাবার সময় প্রথামত সাফাই গাইবার সময় প্রকাশ করেছেন যে, অর্থের অভাবে তাঁর আর চলছে না, কাজেই আবার আদালতে ফিরে যেতে তিনি বাধ্য হচ্ছেন।

নিজের চলার পথটা যদি এতই সরল হতো তা হলে বলবার কিছুই ছিল না। কিন্তু নিজের সুখ ও সম্ভোগের শকটখানা চলতে চলতে যদি এমন জায়গায় এসে পড়ে যেখানে দেশের মঙ্গল অসাড় হয়ে পড়ে আছে, তার বুকের ওপর দিয়ে চলে না যেতে পারলে সুখ ও সম্ভোগের পথে চলা বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে নিজের চলাকে সেখানে থামিয়ে দিয়ে দেশের মঙ্গলকেই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নিজের চলার জন্য দেশের চলার গতিরোধ করার ব্যবস্থা জগতের কোন

সভ্যদেশে এখন আর নাই। আমাদের দেশেও Community একদিন সব চেয়ে বড় ছিল। Communityর মঙ্গলের জন্য সকলেরই ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি দিতে হতো। নিজের চলা অচল হয়েছে দেখে যাঁরা আজ আদালতে ঢুকে পড়ছেন তাঁরা যে, দেশের চল্‌বার সামনে কত বড় প্রাচীর গেঁথে দিচ্ছেন সেটা একবার ভেবে দেখেছেন কি ?

এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলবার আছে। দেশের প্রধান প্রধান নেতা যাঁরা, অর্থাৎ যাঁদের চরিত্রের আদর্শ এই আন্দোলনের প্রাণ, তাঁরা এর তেমন প্রতিবাদ করছেন না। বরং সম্প্রতি কোনো এক নেতা এ সম্বন্ধে বলেছেন যে, আদালতে যারা ঢুকছে তাদের বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছুই নাই। এই ভাবে নারব থেকে এবং এই সব কথা বলে আমাদের মনে হয় যে, তাঁরা প্রকারান্তরে এঁদের কাজে ফিরে যেতে উৎসাহই দিচ্ছেন এবং ব্যক্তিগত মঙ্গলের পায়ে দেশের মঙ্গলকে বলি দিচ্ছেন।

প্রশ্ন উঠেছে, সংসার যদি সত্যিই অচল হয় এবং হাপফিল দেশের জন্য করবার যদি কিছু না থাকে তবে আদালতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি ?

প্রথম প্রশ্নের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তর হচ্ছে যে,—সংসার অচল হয় হোক, দারিদ্র্যে অনাহারে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়াও শ্রেয় তবু যাতে আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং দেশের অমঙ্গল হয় বলে বুঝেছি সে কাজ আর করবো না।

এ উত্তর সকলে দিতে পারে না সত্য। তবে যাঁরা ব্যবসা ছাড়বার আগে অনেক টাকা রোজগার করতেন এবং রাজার হালে দিন কাটাইতেন তাঁদের বোঝা উচিত ছিল যে, ব্যবসা ছেড়ে দেশের কাজে নামলে ঠিক তেমন ভাবে চলা আর সম্ভব হবে না। কিন্তু ব্যবসা করবার সময় এঁরা যেমন কূট ও সাংসারিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, ছাড়বার সময় এই সামান্য কথাটা যে তাঁদের মাথায় আসেনি এটা বিশ্বাস করলে তাঁদের বুদ্ধিকে অপমান করা হয়।

আর যাঁরা বলেন যে, বর্ত্তমানে দেশে করবার মতন কোনো কাজ নাই, আমাদের মনে হয় তাঁরা জেনে শুনে মনকে চোখ ঠারেন।

মোট কথা দেশের বড় ও মাঝারি নেতারা যদি এই রকম দৃষ্টান্ত দেখাতে থাকেন তবে তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে সব ছোটখাট নেতা দেশের কাজে লেগেছিলেন তাঁরাও আস্তে আস্তে নিজের কাজে লেগে যাবেন এবং সাধারণ লোকে আর তাঁদের বিশ্বাস করতে সাহস পাবে না। এই ভাবে বহুলোকের ত্যাগে ও বিশ্বাসে যে শক্তি সঞ্চিত হচ্ছিল দেখতে দেখতে তা ভূমিসাৎ হোয়ে যাবে।

আসল কাজ—আমরা শুনি যে, প্রকৃতির সঙ্গে যাদের দিনরাত লড়াই করতে হয়, তারা স্বভাবতঃই কর্ম্মঠ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পাঠান, গুর্খা, পাঞ্জাবী এরা কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ। কিন্তু বিবেচনা করে দেখতে গেলে বেশ দেখা যায় যে আমাদের সঙ্গেও প্রকৃতির বিরোধ বড় কম নয়। পূর্ব্ববঙ্গের ঝড় এখনো বোধ হয় অসীমে মিলিয়ে যায়-নি, খুলনার দুর্ভিক্ষের হাহাকার এখনো শোনা যাচ্ছে, এরি মধ্যে আবার বন্যাদায় উপস্থিত। জীবন-যাত্রায় মহামারীকে আমরা সঙ্গী করেছি, তার ওপর কয়েক বৎসর থেকে অন্য প্রদেশের লোক এসে আমাদের গ্রামে ডাকাতির উৎপাত সুরু করেছে। এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি কি আমরা সঞ্চয় করতে পেরেছি

ঝড়, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লব নিবারণ করবার আপাততঃ কোনও উপায় নাই। কিন্তু দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অন্যান্য বিপ্লবের প্রতিষেধক যে আমাদের হাতের মধ্যেই রয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা তেমন ভাবে কখনও বিবেচনা করে দেখি-নি।

আইনভঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে মহাত্মা গান্ধী যে গঠনমূলক পদ্ধতি দেশবাসীকে দিয়েছেন তার মূলেও এই কথাটাই আছে রবীন্দ্রনাথও বর্ত্তমান আন্দোলনের বহুপূর্ব্বে এবং এখনও বলছেন দেশকে বাঁচাতে হলে সমাজকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে, গ্রামকে রক্ষা করতে হবে।

আমরা বাঙালী, বাংলার গ্রাম এবং বাংলার সমাজের দিকেই আপাততঃ আমাদের দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। সহর আমাদের গ্রামগুলিকে ক্রমেই গ্রাস করে ফেলছে। গ্রাম সহরকে অন্ন জোগাচ্ছে, লোক জোগাচ্ছে, অর্থ জোগাচ্ছে কিন্তু তার বিনিময়ে কিছুই না পেয়ে ক্রমেই নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। তবুও হিসাবে দেখা যায় যে, দেশের শতকরা অতি

অল্পসংখ্যক লোকই সহরে বাস করে। আরও বেশী লোক গ্রাম ছেড়ে সহরে বাস করতে আরম্ভ করলে গ্রামগুলির দুর্দ্দশা যে আরও বাড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু নাই।

আর একদিক দিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, কলকাতা এবং জেলা ও মহকুমার প্রধান প্রধান সহরে আমাদের দেশের লোক ছাড়া অনেক বিদেশী এবং ভারতের অন্য প্রদেশের লোক বাস করে। গ্রামকে এদেরও অন্ন যোগাতে হয়, এবং ক্রমে এদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। দেশ যাচ্ছে সহর গ্রামগুলিকে দুই মুখ থেকেই খেতে আরম্ভ করেছে।

এক সময়ে আমাদের দেশের প্রত্যেক গ্রামে সেখানকার সমস্ত অধিবাসীদের প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রামেই উৎপন্ন হতো। সমস্ত গ্রামের স্বার্থকে তখন প্রত্যেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলে মানতে বাধ্য হতো। সমাজ তখন দৃঢ় ছিল, সমাজ শাসন করতো বটে কিন্তু শাসন অপেক্ষা পোষণ করাই ছিল সমাজের প্রধান কাজ। এই পোষণ করবার সমাজকে বাঁচিয়ে তুলতে না পারলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য।

অবশ্য এই গ্রামে গিয়ে গ্রামকে সজাগ করে আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলা অত্যন্ত শক্ত কাজ, জেলে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী শক্ত। আমরা অনেককে জানি যাঁরা এই কাজ করতে গিয়ে সহিষ্ণুতার অভাবে অপারগ হয়ে ফিরে এসেছেন।

আইন-ভঙ্গের আন্দোলনে প্রত্যহ শত শত লোক জেলে যেতেন কিন্তু আইন-ভঙ্গ বন্ধ হবার পর এঁদের আর কোনো কাজ নাই। তাঁরা যদি সত্যই দেশের মঙ্গল চান, তা হলে তারা গ্রামে এসে কাজ করুন; গ্রামগুলোকে বাঁচিয়ে তুলুন। অবশ্য এ কাজে তাঁদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ সিদ্ধ হবে না। কিন্তু তাঁদের ত্যাগে আমাদের জাতি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে।

সহরের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কর, এমন কথা বলা চলে না, অবশ্য যাঁরা সহরে এসে লেখাপড়া শিখতে চান, অর্থ উপার্জ্জন করতে চান তা তাঁরা করতে পারেন। কিন্তু সহরে তাঁরা বিদ্যা ও অর্থ অর্জ্জন করবেন সেটা গ্রামে গিয়ে ব্যয় করতে হবে।

গ্রামে গিয়ে কি ভাবে কাজ করতে হবে তার কোন একটা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া অসম্ভব। কারণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। তা ছাড়া এমন অনেক অবস্থাও হতে পারে, যার কথা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগে মনে আসা সম্ভব নয়। তবে এ-কাজে নামতে গেলে কতকগুলো প্রধান কথা মনে রাখতে হবে। প্রথম কথা মানুষকে ভালবাসতে শিখতে হবে, দ্বিতীয় কথা, দেশকে ভালবাসতে হবে, তৃতীয় কথা, সহিষ্ণুতা ও ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। লজ্জার কথা এই যে, আমরা আমাদের গ্রামকে জেনে শুনে সেখানে কাজ করতে গিয়ে সহিষ্ণুতা হারিয়ে পালিয়ে চলে আসি, আর সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি জায়গা থেকে পাদ্রী ও অন্য অনেকে এসে আমাদের গ্রামে বাস করে ভাষা, আচার, বিচার প্রভৃতি না জেনেও তাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন এবং যে ভাবে আমাদের দেশের লোককে সেবা করছেন তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমাদের গ্রামকে বাঁচিয়ে তোলাই যে সর্ব্বপ্রথম কাজ একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু মজার কথা এই যে, এ কাজের জন্য লোক পাওয়া যায় না। অথচ যখনই কোনো আন্দোলন হয়েছে তখনি বক্তৃতা, শোভাযাত্রা এমন কি জেলে যাওয়ার জন্যও লোকের অভাব হয় নি। আন্দোলনের মধ্যে যে মত্ততা আছে গ্রামের সংস্কার সাধনের কাজে সে মত্ততা নাই। কারাদণ্ডকে বরণ করার সঙ্গে সঙ্গে যে যশ ও প্রতিষ্ঠা আছে এর মধ্যে তার কিছুই নাই; এই কাজে লোক না পাওয়া যাবার এই একমাত্র কারণ না হলেও এটা যে একটা প্রধান কারণ তাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪৬শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩২৯ { ষষ্ঠ সংখ্যা

শেলি

আজকে শেলির—ইংরেজকবি শেলির—শতাব্দী-স্মরণ-সভা আমাদের এখানে। এই সভার কার্য্যভার আমার উপরে দেওয়া হয়েচে, আমি তা' আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। তার একটা প্রধান কারণ এই যে কবির জন্ম হয়েছিল সুদূর সমুদ্রতীরে য়ুরোপে তাঁকে আজ আমরা আমাদের আপন বলে স্বীকার করব।

যাঁরা পৃথিবীতে কোনো একটা বড় সৃষ্টির কাজ করেছেন—কোনো সৌন্দর্য্যকে আকার দিয়েছেন, কোনো মহৎ ভাবকে প্রকাশ করেছেন জীবনে বা সাহিত্যে বা কোনোরকম ললিত কলায়,—তাঁরা কোনো বিশেষ দেশের অধিবাসী নন। এই কথাটা আজকের দিনে আমাদের স্মরণ করবার সময় উপস্থিত হয়েছে। যারা নিজের দেশের জন্য ধনোপার্জ্জন করে, নিজের দেশের প্রতাপ বৃদ্ধি করবার জন্য দিক্‌বিদিকে জয়পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা তাদের নিজের দেশেরই লোক, তাদের অন্য দেশে প্রবেশের সহজ অধিকার নেই। কিন্তু পৃথিবীর যেখানে যে কোনো মানুষ সত্যকে সুন্দরকে কল্যাণকে বড় করে দেখিয়েচেন তিনি সকল দেশের অধিবাসী, সকল কালের লোক। আমাদের সম্পূর্ণ মন মুক্ত করে, সকল রকম কুণ্ঠা দূর করে একথা স্বীকার করতে হবে। তা যদি না স্বীকার করি তাহ'লে সমস্ত মনুষ্য-সমাজের মধ্যে আমাদের যে স্থান আছে সেই স্থানকেই অস্বীকার করা হবে। তাহ'লে এই কথা বল্‌তে হয় যে—পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করিনি, আমরা কেবলমাত্র নিজেরি এই ক্ষুদ্রদেশের চতুঃসীমানার ভিতর জন্মেছি—যা বেড়া দিয়ে আমাদের অন্তরায়ণের দণ্ডে দণ্ডিত করেছে। এই কথাটা আমরা যেন অন্তরের সঙ্গে বল্‌তে পারি যে সেই দণ্ড গ্রহণের আমরা যোগ্য নই। যদি যোগ্যতা প্রমাণ করে থাকি, যদি এমন মূঢ়তা নিয়ে আমরা গৌরব করে থাকি যে পৃথিবীর আর কোনো মহাজনের সঙ্গে আমাদের যোগ নেই, অন্য দেশের যা' সৃষ্টি যা' কর্ম্ম যা' চিরন্তন সম্পদ আমরা তাকেও সদর্পে প্রত্যাখ্যান করে থাকি—তবে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এবং বোধ হয় করেওছি;—অনেক দিন ধরে করেছি। কিন্তু সময় উপস্থিত হয়েচে যখন এমন করে নিজেদের চারিদিকে এইরকম একটা মানসিক গণ্ডী টেনে সেইটিরই ভিতরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকাকে যেন আত্মাবমাননা বলে অনুভব করি।

এই যে শতাব্দীকালের পরে এই কবিকে, স্বীকার করবার জন্যে আমরা বসেছি, এর ভিতর একটা বড় কথা হচ্চে এই যে, শতাব্দীর দূরত্ব তাঁর পক্ষে খাটে না, বরঞ্চ এমন একটা আশ্চর্য্য স্বতোবিরুদ্ধতা দেখ্‌চি, যে, যেকালে তাঁর জন্ম হয়েছিল সেকালে তিনি পৃথিবীর লোকের যত নিকট ছিলেন

এই শতাব্দীর পরে তার চেয়ে তিনি বেশী নিকটতর হয়েছেন। এ যেন এমন একটা জ্যোতিষ্কের কথা, যার আলো এসে পৌঁছতে সময় লেগেচে। কালের ব্যবধান তাঁর পক্ষে উত্তরোত্তর বেড়ে না চলে' ছোট হয়ে এসেচে।

আর একটী কথা এই যে, তিনি যেদেশে জন্মেছিলেন সেদেশে তাঁর স্থান হয়নি। সেদেশ থেকে দূরে নির্ব্বাসনে তাঁকে অধিকাংশ জীবন কাটাতে হয়েছিল। এই দেশছাড়া লক্ষ্মীছাড়া মানুষটি আজকে সকল দেশেই তাঁর দেশ পেলেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মহাপুরুষই ত নির্ব্বাসনের সিংহদ্বার দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে আপন অধিকার লাভ করেন। সাময়িক মানুষেরা তাঁদের যে তাড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে "তুমি আমাদের আপনার নও" সেই বলার ভিতর একটা বড় কথা রয়েছে। উপস্থিত সময়ে যিনি একটা উপস্থিত ক্ষেত্রকে অধিকার করেন কালক্রমে সর্ব্ব দেশের অধিকার তাঁর ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। কিন্তু সকলের চেয়ে যাঁরা বড় তাঁদের সম্বন্ধে এই দেখ্‌তে পাই যে, তাঁদের সাময়িক লোকে তাঁদের নির্ব্বাসনে দিয়েছে; তার কারণ, তাঁরা সংকীর্ণ ভাবে কোনো দেশের বা কোনো কালের মন জোগাতে পারেন নি। তাঁরা এমন একটি বাণী এনেছেন যা সকল কালের সকল দেশের; এই জন্য সামান্য ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে সেই বাণী আপনার স্থান পায় না। এই সকল মহাপুরুষেরা নগদ মজুরী কখনো পান না। জীবিতকালে যশের দিক থেকে সম্মানের দিক থেকে প্রবাসী হয়ে থাকেন, উপবাসী হয়ে জন্ম কাটান।

ইংলণ্ডের এই কবিকে একদিন তাঁর দেশের লোকেরা নাস্তিক, সমাজদ্রোহী বলে' কলঙ্ক আরোপ করে, তাঁর কবিত্বকে পর্য্যন্ত খর্ব্ব করে, তাঁকে দূর করে দিয়েছিল। আমি বলি যে ভাল করেছিল। সেই ছোট দেশের মধ্যে তাঁর স্থান তো নয়। এইজন্য নির্ব্বাসন তাঁর পক্ষে দিগ্বিজয়ের সিংহাসন। সেই সিংহাসনের উপরে যাঁর প্রতিষ্ঠা তাঁকে আজ আমরা আমাদের আপন বলে অনুভব করব, করে আমরাও আমাদের চারিদিকে দৈশিক ও সাময়িক যে ব্যবধানের স্তর আপনি আপনি জমে উঠচে তার ভিতর একটুখানি ফাঁক করে দিতে পারব। গণ্ডী আমাদের অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেচে। আমরা এই কথা বল্‌বার চেষ্টা করেছি যে আমাদের আপনাতেই আপনার সার্থকতা পর্য্যাপ্তি আছে। এমন কথা আমরা বলেছি যে—আমাদের সাহিত্যই একমাত্র আমাদের সাহিত্য, আমাদের ভাগ্যে আর যেন কোনো সাহিত্য নেই; আমাদের তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র আমাদের তত্ত্বজ্ঞান; তার বাড়া আর তত্ত্বজ্ঞান আমাদের পক্ষে হতেই পারে না; এমন কি বিজ্ঞান সেও আমাদের নয়, সে আর কোনো দেশের। এটার ভিতর যে কত অসত্য আছে মনের অভিমান বশতঃ ক্ষোভ বশতঃ আমরা সেটা ভাল করে বুঝতে পারি নি। আমাদের প্রত্যেকের জন্য তপস্যা করেছেন সকল দেশের তপস্বী এ কথা যখন ভাবি তখন হৃদয়ের কত বড় প্রসার হয়। মানুষকে মানুষ বলে আপন বলে জান্‌লে পর তাতে কত বড় শক্তি। আমাদের দেশে আমাদের অধিকারের সঙ্কীর্ণতাকে আমরা দোষ দিয়ে থাকি। কিন্তু রাষ্ট্রতান্ত্রিক সঙ্কোচই যে সঙ্কীর্ণতা তা ত নয়, তার চেয়ে ঢের বড় সঙ্কীর্ণতা হচ্চে মনের অধিকারের সঙ্কীর্ণতা। আমি যদি বলি আমার মন কবিকঙ্কণের বাইরে যাবে না, আমার মন দাশু রায়ের পাঁচালি ছাড়াবে না, এমন কি বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া আমার পক্ষে আর গীতি কাব্য নেই, তবে অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে হবে সমস্ত বিশ্বের যে শ্রেষ্ঠ দান বিশ্ব আমার হাতে তুলে দিয়েছে এবং আমাকে বল্‌ছে—"আমি তোমার।"

মানুষ হচ্চে বনস্পতি, অন্য যে সব জীব-জন্তু তারা ঘাস কি ছোট গুল্ম হতে পারে, কিন্তু মানুষ হচ্চে বনস্পতি। মানব-চিত্তের শিকড় বহুদূরগামী, বহুশাখাবিশিষ্ট। মহামানবের মানস ক্ষেত্রের ভিতর গভীর ভাবে এবং প্রশস্ত ভাবে সে যদি প্রবেশলাভ করতে না পারে, সমস্ত মানুষের চিত্তক্ষেত্র থেকে আপনার রস আহরণ করতে না পারে, নিশ্চয় সে মন ক্ষীণ হয়ে যায়, বুদ্ধি তার কখনই হতে পারে না, তার বুদ্ধির, ধর্ম্মবুদ্ধির, চরিত্রনীতির উন্নতি হতে পারে না। আমরা যে অনেক আত্মাবমাননা স্বীকার

করে নিয়েছি, অন্ধ বশ্যতায় যে কেবলমাত্র শাস্ত্রবচন বা গুরুর বাক্যকে মাথায় করে নিয়েছি, এমন ভাবে গতানুগতিকের মতন যে জীবনহীন হয়ে চলতে পেরেছি, কেন? মহা মানবের চিত্ত ক্ষেত্র থেকে আমাদের পূর্ণ খাদ্য আহরণ করতে না পারায় আমাদের মন নির্জীব হয়েছিল বলেই সকল কথাই নিশ্চেষ্টভাবে মেনেছি, রাষ্ট্রীয় শাসন, সামাজিক শাসন, শাস্ত্রীয়শাসন সমস্তই মাথা হেঁট্ করে স্বীকার করতে পেরেছি। বিচার করতে চাইনি কেননা বিচার বুদ্ধির জন্যে মনের প্রাণশক্তির দরকার। অধীনতার যে সমস্ত দুর্গতি থেকে আজ আমরা এত কষ্ট পাচ্ছি সে সমস্তের মূল হচ্চে মনের নির্জীবতা। মনকে সজীব সবল ও সচল করতে হলে মনের খাদ্য সম্পূর্ণরূপে দিতে হয়। কোনো বাইরের অনুষ্ঠান বাইরের যান্ত্রিক কোনো একটা ক্রিয়া দ্বারা আমাদের মন কখনই জীবন লাভ করতে পারবে না, পৃথিবীর যেখানে যা কিছু বড় আছে, যার ভিতর অমরতা আছে—সেই সমস্ত নিলে পর তবে আমাদের মন অমৃত খাদ্য লাভ করবে, এবং সেই অমৃতের দ্বারাই সে বড় হয়ে উঠবে আর কিছু দ্বারা নয়। মৈত্রেয়ী যে বলেছিলেন যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ সে কেবল আধ্যাত্মিকতার দিকেই নয় সমস্ত দিকে,—বিদ্যার দিকে জ্ঞানের দিকে সমস্ত দিকেই খাটে। সমস্ত পৃথিবীর একটা অমরাবতী আছে যেখানে অমৃত উৎসারিত হচ্চে। যে-সকল সাধকের মন্ত্রবলে তপস্যাবলে তা হয়েচে তাঁরা যেদেশেই থাকুন একই অমরাবতীর লোক। সেই অমরাবতী সকল দেশেই আছে। সেই অমরাবতীর লোক যেমন কালিদাস সেই অমরাবতীর লোক তেমনি শেলি কি শেক্‌সপিয়র, তাঁদের কাছে যেতে হবে। বলতে হবে "হাত পাতলেম, গণ্ডূষ করলেম্, দাও।" তবে আমাদের মন আপনার খাদ্য পাবে এবং শক্তি লাভ করবে। এই কথাটা মনে রেখেছি বলে, আজকার দিনে এই অন্য দেশের কবি, এমন কি যে দেশের সম্বন্ধে আমাদের মনের ভিতর স্বাভাবিক বিরোধ আছে, সেই দেশের যে একটি কবি, তাঁকে আজ আমাদের এই সভাতে—এই আমাদের বাংলা ভাষার বাংলা দেশের সভাতে আজ আহ্বান করলেম; এখানে তাঁর আত্মাকে আমরা অনুভব করলেম্—এখানে আমাদের মধ্যে তিনি তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন।

তারপরে কবির সঙ্গে পরিচয়। কালের দূরত্ব এবং দেশের দূরত্ব কম নয়, কিন্তু তার চেয়ে আর একটা বড় দূরত্ব হল ভাষার দূরত্ব। আমরা ইংরেজী ভাষা বাল্যকাল থেকে পড়ছি, শিখছি, তার ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমাদের হয়ত ভুল নাও হ'তে পারে। কিন্তু একথা জোর করে বলা যায় যে, ইংরেজী ভাষায় যে সব বড় বড় কাব্য আছে—গীতি কাব্য বিশেষতঃ, তার সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করবার অধিকার বিদেশীর পক্ষে দুর্লভ। আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা আমি বলচি, য়ুরোপের সঙ্গীত সম্বন্ধে। এটা আমি দেখ্‌লেম যে যে-সঙ্গীতে বিদেশের সমস্ত বড় বড় লোক আনন্দিত হলেন, তার মধ্যে আমাদের প্রবেশ সহজ নয়। অথচ সেই সঙ্গীতের গৌরব যে সে দেশে কতখানি তা আপনারা জানেন। তাঁদের যাঁরা বড় বড় গায়ক, কি যাঁরা বেহালা কি অন্য কোনো বাজনা ভাল বাজাতে পারেন, তাঁদের একজনের একরাত্রির যে আয় তা আমাদের দেশের সমস্ত বছরের আয়ের দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়। আর তাঁদের সেই গান কি বাজনা শোনবার জন্য হয়ত এক বছর আগে থেকে লোক আপনার জায়গাটি কিনে ভিড় ঠেলে দ্বারের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অথচ দেখ্‌লেম সেই সঙ্গীতের ভিতরকার যে রসটুকু সে আমার মতন বিদেশীর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা কঠিন। অবশ্য দীর্ঘকাল শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেলে পর ক্রমে বোঝা যায় যে, এই সঙ্গীতের একটা মাহাত্ম্য আছে। সেটি দুইদিক থেকে বোঝা যায়। এক বোঝা যায় যখন দেখি যে এরা কত গভীর ভাবে এর রস গ্রহণ করচে। আর একটি দিক থেকে দেখা যায় যে—শুনতে শুনতে তার ভিতরকার কিছু কিছু রস আমাদের অন্তঃকরণকে যে একেবারে স্পর্শ করে না তা নয়। আমি আমার কথা বলচি। অল্পদিন হল আমি য়ুরোপে যখন গিয়েছিলেম, সেখানকার একজন গুণী বেহালা বাদয়িত্রী বিশেষ করে

আমাকে কুড়িটি কি বাইশটি, কিছু বা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কিছু বা আধুনিক সঙ্গীত রচনা শোনালেন। সেই রাত্রিতে আমি নিঃসন্দেহে এটা অনুভব করলেম যে, এই সঙ্গীত অবহেলা করবার নয়। এর ভিতর খুব একটি গভীর শক্তি আছে এবং সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সন্দেহ উপস্থিত হল। মনে হল যে আপনি যা বুঝলেম আর একজন য়ুরোপীয় সেটাকে সেই রকম বোঝেন কিনা সন্দেহ। দেখতে পাচ্ছি যে সঙ্গীতের যে একটি ক্ষেত্র আছে তার ভিতর প্রবেশ করা বাইরের লোকের পক্ষে বড় কঠিন। ছবিতে বরঞ্চ অত বাধে না। য়ুরোপীয় যে সমস্ত ছবি আমরা দেখি, তাতে আমাদের তেমন বাধা ঠেকে না। কিন্তু গানে বাধা কিছু বেশী। ওর একটা Idiom আছে সেটা যখন আয়ত্ত না করতে পেরেচি তখন তার ভাষার ভিতর তার ভাবের ভিতর মনের প্রবেশ সম্পূর্ণ হয় না। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে গীতিকাব্যের একটি প্রধান জিনিষ হচ্চে গীতি, তার গান। কাব্য আপনার সঙ্গীত আপনি বহন করে। সেই সঙ্গীতটি যে কেবল ধ্বনির সঙ্গীত একথা মনে করা ভুল হবে। কতকগুলি লকার দিয়ে,—যেমন ললিত-লবঙ্গ-লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে—এক রকম ধ্বনিলালিত্য গড়ে তোলা হয় সেটা হচ্ছে অত্যন্ত বাহ্যিক, সেটা গভীর নয়। কালিদাসের কাব্যে আমরা যে শব্দ সমাবেশ পাই তার মধ্যে ধ্বনি-সঙ্গীতের চেয়ে ভাব-সংস্থানের সঙ্গীত বড়। ভাষার প্রাণবান শব্দের মধ্যে যে ভাবপ্রসঙ্গ আছে সেই ভাবপ্রসঙ্গের সঙ্গীত বিদেশীর পক্ষে সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত।

এই জন্য আমার সন্দেহ হয় যখন কোনো বিদেশী কবির কাব্য আমরা পড়ি তার ভিতরকার অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের অনেক অংশ বাদ পড়ে যায়। সুতরাং শেলির গীতিকাব্যের যে গীতি অংশ আছে সেটা সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করতে ইচ্ছা করিনে। তবে একথাও সত্য যে ইংরেজী ভাষা বারম্বার পড়ার দ্বারা সেই ভাষার ভিতর আমাদের অনেকটা প্রবেশ লাভ হয়েচে। এমন কি তার সঙ্গীত ভাণ্ডারের প্রান্তেও আমরা আসন বোধ হয় পেয়েচি। সেইজন্য শেলির কাব্যের ভিতর একটি যে অসামান্য গীতির রয়েছে সেটা যে আমাদের মনে লাগেনা একথা আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করিনে। খুব লাগে। আমি শুনেছি ইংরেজ সমালোচকেরা বলেন যে,—'শেলি হচ্চেন কবিদের কবি'। কবিদের কবি বল্লে এইটে বোঝা যায় যে কবিরা যে উপকরণ নিয়ে তাঁদের ভাব প্রকাশ করেন সেই উপকরণের উপর শেলির যে কি আশ্চর্য্য প্রভুত্ব ছিল সেটা কবিরা বিশেষ করে বুঝতে পারেন যেহেতু তাঁদের সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে।

শেলি ভাষার শব্দগুলিকে যেন মন্ত্রবলে কাব্য রচনায় খাটিয়ে নিতে পারেন। এই শক্তি যখন কোনো একজন কবি আর একটি কবির ভিতর দেখেন তখন তিনি কেবলমাত্র কাব্যের কাব্যসামগ্রীর নয় কাব্যকলার যে গুণ সেটাও নিবিড় করে অনুভব করেন। শেলির ভিতর শব্দ-প্রবাহের কলধ্বনি ও তার মাধুর্য্য অতি আশ্চর্য্য রকম মনোরমভাবে আছে। এটা আমরা বিদেশী হলেও বোধ হয় অনুভব করতে পারি। এটা হল কাব্যের গীতি অংশের কথা।

শেলির আর একটি দিক ছিল সেটি আমরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারি। সে হচ্চে কি, না, তিনি একজন মানুষ ছিলেন, তিনি সর্ব্বাংশে কবি ছিলেন। অর্থাৎ ষোলো আনা তাঁর সমস্ত জীবনটিকে তিনি কবিত্বে পরিণত করেছিলেন। তাঁর ব্যবহার, তাঁর যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্তই এক কবিত্বের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করেছিলেন—একথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। অনেক কবিকে জানি, একটা বিশেষ সময়ে হয়ত কবিত্বের ভূত তাঁদের পেয়ে বস্‌লে পর কাব্য রচনা করেন এবং বেশ ভাল কাব্যও রচনা করেন। আমাদের বিক্রমাদিত্যের কথায় আছে যে, এক সিংহাসন ছিল সেই সিংহাসনে বস্‌লে রাখালও রাজার মতন হয়ে উঠ্‌ত, তেম্নিতর ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতির গোপন কোণে এক গুপ্ত সিংহাসন থাকতে পারে সেখানে বস্‌লে পর অন্ত চব্বিশ ঘণ্টার রাখাল ঘণ্টা বিশেষের কবি হয়েও

উঠতে পারে। কিন্তু শেলির জীবনের আশৈশব গতি এবং প্রকৃতি সমস্তই কবির। অর্থাৎ Imagination,—যাকে বলে কল্পনা,—(ঠিক সে শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আমি বলতে পারব না, হয়ত নেই),—Imaginationএর আবহাওয়ায় তাঁর মন নিমগ্ন ছিল, কেবল তাঁর মগজের এক অংশ নয়, তাঁর সমস্ত জীবন নিমগ্ন ছিল। এই জন্য তাঁকে লোকে ক্ষেপা বলে মনে করেচে অনেক সময়। এই জন্য তাঁকে প্রবীণ বিচক্ষণ লোকে, সংসারী লোকে হয়ত ঘৃণা করেচে এবং তাঁর প্রতি তাদের একটা বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মেচে। ঐ জন্যই সেই ক্ষেপা চারিদিকের সঙ্গে খাপ খায় নি।

অন্যান্য সাধারণ বা অসাধারণ ব্যক্তির মত শেলিরও কতকগুলি মতামত ছিল। একথা আমরা সকলেই জানি মতামত থাকাটা কবিত্বের পক্ষে একটা বালাই! সেগুলি এসে পড়ে কেমনতর, যেমন এক একটি পাথরের টুকরো আসে ঝরণার মুখে। নিজেদের বড় করে দেখিয়ে মতামতগুলি খাড়া হয়ে ওঠে, ভ্রূকুটি করে দাঁড়ায়, এবং রসের ধারাকে প্রতিহত করে এইটে সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়। সেটা আমরা Wordswothএ বিশেষ করে দেখেছি। যেখানে তিনি রসেতে খুব পূর্ণ হয়েচেন সেখানে তিনি মতকে চাপা দিতে পেরেচেন। কিন্তু সেই পূর্ণতার একটু খর্ব্ব হবামাত্র তাঁর মতগুলো খাড়া হয়ে উঠে রসপ্রবাহের প্রতিবাদ করতে থাকে। শেলিরও মতামত ছিল স্বাধীনতা সম্বন্ধে, মানব জাতির জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজনীতি সম্বন্ধে। কিন্তু সেই মতগুলি পাগলামির দ্বারা বেশ মজে গিয়েছিল। সে ছিল এক পাগলা কবির মতামত। সুবুদ্ধি জিনিষটা মর্ত্ত্যের জিনিষ, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের খাঁটি যে পাগলামি সে দৈবী। তাই বুঝি সুবুদ্ধির গড়া জিনিষ ভেঙে ভেঙে পড়ে, আর পাগলামির উড়িয়ে আনা জিনিষ বীজের মত অরণ্যের পর অরণ্য সৃষ্টি করে। তাই পাগলা শেলির বাণী আজও নবীন আছে। তাঁর মন্ত্রগুণ আজও নষ্ট হয়নি। তিনি যখন বালক তখন থেকেই রাজশক্তি রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে উন্মত হয়েছিলেন সেটা যে কোনোরকম হিসেবী বুদ্ধি থেকে তা নয়। উনপঞ্চাশ পবনের দ্বারা চালিত হয়ে যেন তিনি দৌড়ে ছুটে ছিলেন। অত্যন্ত উদ্দাম হৃদয়ের Imaginationএর বেগের দ্বারা উতলা হয়ে উঠে তিনি এত বড় মানব জাতির দূর ভবিষ্যৎকে মহিমামণ্ডিত করে দেখতে পেয়েছিলেন। মানবজাতির দূর ভবিষ্যৎগৌরবের সেই স্বর্গলোককে তিনি যে দেখতে পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে মুগ্ধ হয়ে তিনি বর্ত্তমান কালের যা কিছু দুর্গতি তাকে অত্যন্ত আঘাত দেবার চেষ্টা করেছিলেন।......দুই সংঘবদ্ধ শক্তিকে তিনি আঘাত করেছেন তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে। রাজতন্ত্র এবং পুরোহিত তন্ত্র। তিনি বলেচেন মানুষ এই দুই তন্ত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে একেবারে জর্জ্জর হয়ে গেল; একদিক থেকে বাইরে তাকে দাসত্বে বদ্ধ করেচে রাজশক্তি, আর একদিকে ধর্ম্মতন্ত্র তার আত্মাকে সঙ্কীর্ণ করেচে, মুগ্ধ করে রেখে দিয়েচে। এই দাসত্বের বন্ধন আর মোহের বন্ধন তিনি সইতে পারেননি।

একথা স্বীকার করতে হবে যে Revolt of Islam প্রভৃতি যে সব কাব্যে তিনি তাঁর এই মতগুলিকে উদ্ধতভাবে প্রকাশ করেছেন, সে গুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়। অপরপক্ষে তাঁর এই মতই Prometheus Unboundএ সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেচে। আমরা তাঁর দূরদেশের লোক এবং দূরকালের, কিন্তু আমরাও আজ তাঁকে বলতে পারি—তোমার কাছ থেকে মন্ত্র নেব। আমরাও রাজশক্তিকে তার রুদ্ধ বেষ্টনের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে জনসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ করতে চাই। যে-শক্তি রাজদণ্ডরূপে আমাদের হাতে থাকবে সেটাকে আমাদের মেরুদণ্ডের উপর পড়তে দিতে পারিনে, এই কথা আমাদের বলবার সময় হয়েচে।

এখানে আমরা কবিকে বলব যে, তুমি আমাদের কবি, আমাদের কথাই তুমি বলেচ। ধর্ম্মতন্ত্র আমাদের আত্মাকে বস্তুপ্রবণ বস্তুতন্ত্রের দ্বারা আবিষ্ট করে দিয়েচে—এ অত্যন্ত সত্য। আমরা যে সব জড় বিশ্বাসকে অন্ধভাবে জড়িয়ে ধরে' জড় মন্ত্রকে না চিন্তা করে কেবল আবৃত্তি করে যাওয়ার ভিতরে ধর্ম্মলাভ, পুণ্যলাভ করতে চেষ্টা

করেছি তার দ্বারা কতখানি নিজেকে খর্ব্ব করেছি সেটা বলা যায় না। এটা সেদিনও যেমন বিপদের কথা আজও সেইরকম বিপদের কথা। শেলি সেদিন এর প্রতিকার চেষ্টায় যে বিপদে পড়েছিলেন আজকার দিনেও সেই বিপদই রয়ে গেছে। বাহিরের ক্ষেত্রে এই শাসনশক্তি এবং অন্তরের ক্ষেত্রে এই অন্ধমোহের শক্তিকে আজও প্রতিরোধ করতে যে দাঁড়াবে বাহির থেকে তাকেও মার খেতে হবে, এবং তাকেও তার আত্মীয়েরা বল্‌বে—"তুমি আমাদের আত্মীয় নও," কিন্তু—তবু বল্‌তে হবে যে এই দুই তন্ত্র থেকে আমাদের মুক্তিলাভ কর্‌বার দিন এসেছে। ইংরেজ কবি শেলি তাঁর জীবন দিয়ে তাঁর কবিতা দিয়ে এই কথাই সকল মানুষের হয়ে বলেচেন।

এইজন্যই আমি আজকে শেলিকে আমাদের এই সভাতে, আমাদের এই বাঙ্গালার সভাতে, আদর করে ডাকছি; আমি এইজন্যই বলছি যে তোমার বাণী আমাদের বাণী। তোমার কাব্যে পৃথিবীর সকল মানুষের কথা, বিশেষভাবে আমাদের এই কালের, আমাদের এই দেশের। প্রবল বিদ্রোহ নিয়ে তিনি যে সব প্রচণ্ড শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দ্বারা পীড়িত হয়েছেন, তাড়িত হয়েছেন, সেই শক্তি আমাদের সমস্ত দেশকে ব্যাপ্ত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দুর্গ বাইরে নয়—মনে। সমস্ত দেশের সব জায়গায় সে তার ভিত্তি গেড়েছে প্রত্যেকের হৃদয়ের ভিতরে জীবনের ভিতরে। চূর্ণ করে ফেলতে হবে তার প্রভাব। এই যে প্রচণ্ডশক্তি—এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, বিদ্রোহের ধ্বজা তুলতে হবে। কবির কাছ থেকে তার সম্মতি আসবে। এই বিদ্রোহের মন্ত্র কবির কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করব। এইজন্য বলছি যে আজিকার দিনে তোমাকে আমরা অভিবাদন করি—তোমাকে আমরা আহ্বান করি—আমাদের মনের মধ্যে আমাদের আপনাদের মধ্যে তুমি তোমার সিংহাসন গ্রহণ কর।

আর একটা কথা আছে। যখন শেলির কাব্য ভাল করে আলোচনা করা যায় তখন দেখি এই বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরাত্মার সঙ্গে তিনি যেন কারবার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে বিশ্বের বাইরের রূপ তেমন বেশী সত্য ছিল না। সেইজন্য আমরা দেখতে পাই যে শেলির কাব্যে একের সঙ্গে আরের যে মিলে যাওয়া এ অতি সহজে হয়,—একটা ভাবের সঙ্গে আর একটা ভাবের, একটা রূপের সঙ্গে আর একটা রূপের। বিশ্বে বাইরের যে রূপ, যেটা স্থূলরূপ, সেটা যেন তার কাছে ছিলনা বললেই হয়। আপনারা তার সেই skylark-এর কবিতাটা মনে মনে ভেবে দেখুন। skylark ত একটি পাখী নয় সে বিশ্বসৌন্দর্য্যের একটি উৎস।

ঐ যে পাখীর গান, ওর সঙ্গে কবি এই জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মর্ম্মগত মূল সাদৃশ্য দেখেছিলেন।

বিচিত্র সুখদুঃখময় মানুষের এই জীবনটাকেও শেলি যেন একটা পর্দ্দার মত করে দেখেছিলেন। এর খণ্ডতা এর স্থূলতা যেন সত্যকে আবৃত করে রয়েচে। এই কুহেলিকার পর্দ্দাখানা ছিঁড়ে ফেলে সত্যের অখণ্ড নির্ম্মল মূর্ত্তি দেখবার জন্যে কবির ভারি একটা ব্যাকুলতা ছিল। কতবার সেইজন্যে তিনি মৃত্যুর মধ্যে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করেচেন। এই মুক্তিপিপাসু কবি যেমন রাজতন্ত্র ও ধর্ম্মতন্ত্রের বাধা সইতে পারেন নি তেমনিই মানুষের জীবনের খণ্ড চেতনা বিরাট সত্যের উপলব্ধি থেকে আমাদের চিত্তকে যে গণ্ডিবদ্ধ করে রেখেচে এও তিনি সহ্য করতে পারেন নি। এইখানে যেন শেলির মনের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় মনের একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষও এই ব্যাবহারিক জগৎকে এই স্থূল জগৎকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে না এবং এর ভিতরে অন্তরতম অন্তর্যামী যে সত্য আছে তাকেই সন্ধান করে বেড়ায়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলবার আছে। শেলিকে তাঁর জীবনকালে ও পরবর্ত্তীকালে তাঁর দেশের লোকে নাস্তিক বলে অপবাদ দিয়েছে। তার কারণ এই যে প্রচলিত ধর্ম্মতন্ত্র পুরোহিততন্ত্রকে তিনি আঘাত করেছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে গভীর একটা ধর্ম্মের তৃষ্ণা ছিল, একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করা যেতে পারে না। তিনি তাঁর Alaster কাব্যের মধ্যে যে সন্ধানের বেদনা প্রকাশ করেচেন সে কিসের সন্ধান? মেঘদূতে বিরহী যক্ষের হৃদয়ব্যথা

যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে সেই সৌন্দর্য্যের চরমতাকে অলকাপুরীতে গিয়ে স্পর্শ করেছিল এলাস্টরেও তেমনি মানুষের ব্যথা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতরে অমৃতের সন্ধান করে সেই প্রকৃতির অতীত লোকে তাকে পাবার চেষ্টা করেচে। প্রকৃতির মধ্যে তার তৃপ্তির পূর্ণতা হয় নি। আত্মা যে আত্মীয়কেই চায়, বিশ্বের অলকাপুরীতে সেই আত্মীয় যদি কোথাও না থাকে, সমস্তই যদি কেবল আধিভৌতিক হয় তাহলে ত বিরহের আর অন্ত নেই। আত্মার আত্মিক সম্বন্ধ বিশ্বে যদি না থাকে তাহলে ত এ কারাগার। এই যে আত্মিক সম্বন্ধ এর একটি পরমাশ্রয়, এর কোনো একটা অপরূপ প্রকাশ কোথায় আছে? এই খুঁজতে সে বেরুল। যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আর তাকে তৃপ্তি দান করলে না তখন সে কেবল বলতে লাগল কোথায় পাব! কোথায় পাব! মাঝে মাঝে এই সন্ধানী কোনো এক সুন্দরীর কল্পমূর্ত্তি দেখেচে। বিশ্বের অন্তরতম আনন্দ যেন বাহিরে রূপধারণ করে তার মনের সাম্‌নে সাম্‌নে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে সে তৃপ্তি লাভ করতে গিয়ে সেগুলি স্বপ্নের মতন যখন তিরোহিত হয়েছে তখন সে নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে মরেছে। কিন্তু তার যে বেদনা, সেই যে সন্ধান, তারই দ্বারা প্রমাণ হয় যে, পরম সৌন্দর্য্যময় একটি আত্মিক সত্তা বিশ্বের মধ্যে আছে; সে সম্বন্ধে শেলির চিত্তে গভীর বেদনাপূর্ণ একটি আকূতি ছিল। এইজন্যই তিনি Alasterএর গোড়াতেই যে উদ্বোধন লিখেচেন সে ত নাস্তিকের লেখা নয়। তিনি গেয়েচেন, "হে পৃথিবী, হে মহাসমুদ্র, হে আকাশ, হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী, যদি আমার সেই মহামাতা আমার এই আত্মাকে এমন ধর্ম্মসম্বন্ধের বন্ধনে বেঁধে থাকেন যাতে করে আমি অনুভব করতে পেরে থাকি তোমাদের প্রীতি, আর তার প্রতিদানে আমারও প্রীতি দিয়ে থাকি; যদি আমার কাছে প্রিয় হয়ে থাকে শিশিরস্নিগ্ধ প্রভাত, পুষ্পগন্ধে আবিষ্ট মধ্যাহ্ন, সূর্য্যাস্তের কিরণমহিমায় মহোজ্জ্বল সন্ধ্যা, গম্ভীর অর্দ্ধ রাত্রের রোমাঞ্চকর নিঃশব্দতা, শরৎকালের শুষ্কপত্র অরণ্যসঞ্চারী দীর্ঘনিঃশ্বাস, নির্ম্মল তুষারবিন্দুখচিত তৃণ ও নিষ্পত্র শাখার দ্বারা মুকুটিত শীত, নব-বসন্তের প্রথম চুম্বনবৃষ্টি, তার বাসনা-আবেশের ঘন নিঃশ্বাসবেগ, যদি কোনো সুন্দর পাখী বা পতঙ্গ কিম্বা কোনো নিরীহ জন্তুকে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আঘাত করে না থাকি, আর যদি তাদের আমার আত্মীয় বলেই ভালবেসে থাকি তবে ক্ষমা কর আমার এই অহঙ্কার উক্তি, তবে আমার কাছ থেকে তোমার দয়ার এককণাও ফিরিয়ে নিয়োনা। হে অতল-স্পর্শ বিশ্বসমুদ্রশায়িনী মাতা, তুমি আমার এই গম্ভীর গানের প্রতি প্রসাদ বর্ষণ কর; কেন না চিরদিন আমি তোমাকে ভালবেসেছি, একমাত্র তোমাকেই আমি ভালবেসেছি। আমি তোমার পদক্ষেপের ছায়ার দিকেই এতদিন তাকিয়ে আছি, আর আমার হৃদয়ের দৃষ্টি চিরকাল তোমার গহন রহস্যের গভীরতার মধ্যেই নিবিষ্ট হয়ে আছে। যেখানে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যু তোমার ভাণ্ডার থেকে লুট করা তার জয়লব্ধ ধনের বৃত্তান্ত লিখে রাখে সেই শশ্মানে শবের শয্যায় আমার আসন পেতেচি, আশা করেচি তোমার কোনো নির্জ্জন-বিহারী দূতের কাছ থেকে, প্রেতের কাছ থেকে, তুমি কে, জোর করে জেনে নেব, আমার মনের অশান্ত জিজ্ঞাসাকে শান্ত করব। যেমন কোনো ভাবোদ্দীপ্ত আল্‌কীমাবিদ্যার সাধক গূঢ় সিদ্ধির আশায় মরীয়া হয়ে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে বসে, আমি তেমনি উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায় ঝিল্লিঝঙ্কৃত রাত্রির নির্জ্জন নিস্তব্ধ প্রহরে অশ্রুতে চুম্বনে গম্ভীর বাণীতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিশিয়ে এমন একটি জাদু রচনা করেচি যার শক্তিতে মন্ত্রমুগ্ধ রাত্রির কাছে থেকে তোমার রহস্য ভুলিয়ে নিতে পারি। যদিও তোমার অন্তরতম মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে পারলেম না কিন্তু এই যে অনির্ব্বচনীয় সমস্ত স্বপ্ন ধারা, এই যে প্রদোষ কালের ছায়ামূর্ত্তি, নিশীথ কালের গভীর চিন্তা লহরী এরা আমার মনের ভিতর দীপ্যমান হয়ে উঠেচে; সেই জন্যই আমি কোনো একটি পরিত্যক্ত মন্দিরের রহস্যময় নির্জ্জনমণ্ডপে লম্বমান দীর্ঘকাল বিস্মৃত বীণার মত প্রশান্ত এবং নিশ্চল হয়ে, হে মাতা, আমার মধ্যে তোমার নিঃশ্বাসপাতের জন্যে অপেক্ষা করছি—সেই নিঃশ্বাস যার প্রভাবে আমার গানের তান বাতাসের ধ্বনিতে, অরণ্য ও সমুদ্রের নৃত্যে, দিন ও রাত্রির দ্বারা উদ্গীত

স্তবগানে এবং মানবের গভীর হৃদয় বেদনার মূর্চ্ছনায় মিলিত হয়ে রচিত হয়ে ওঠে।

এ কি নাস্তিকের কথা?

এলাস্টরে কবি কেবল সন্ধানের কথা বলেচেন, এই সন্ধান অবশেষে যে উপলব্ধিতে এসে পৌঁচেছে সেই উপলব্ধির গান হচ্চে তাঁর Hymn to Intellectual Beauty, সেইটি পাঠ করে আজ সভাভঙ্গ করি।

একটি অদৃশ্য শক্তির বিরাট ছায়া আমাদের মধ্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে তাকে আমরা জানিনে, দেখতে পাইনে। এই বিচিত্র জগৎকে সে তার চঞ্চল পক্ষ দ্বারা স্পর্শ করে করে যাচ্ছে, কেমনতর? না যেমনতর বসন্তের বাতাস পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে ধীরে ধীরে চলে যায়, যেমনতর পর্ব্বতের দেবদারুক্রমচ্ছায়ার অন্তরালবর্ত্তী নির্ঝর ধারার উপর জ্যোৎস্নালোক পড়ে, তেম্নি করে প্রত্যেক মানবের হৃদয় এবং মুখশ্রীকে ক্ষণে ক্ষণে তার সেই চঞ্চল কটাক্ষপাতের দ্বারা স্পর্শ করে যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলাকার সঙ্গীত এবং বর্ণচ্ছটার সম্মিলনার মত, নক্ষত্র আলোকে উদারবিস্তৃত মেঘমালার মত, যে সঙ্গীত শান্ত হয়ে গিয়েছে তারি স্মৃতির মত, এমন যা কিছু আছে যা তার সৌন্দর্য্যের জন্যই আমাদের কাছে প্রিয় কিন্তু তার চেয়ে প্রিয়তর তার অনির্ব্বচনীয়তার জন্য, সেই সমস্তের মত, একটি অদৃশ্য শক্তির ছায়া আমাদের মধ্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। হে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, মানুষের দেহমনের উপরে যখন তোমার বর্ণরশ্মি পড়ে তখন তারা পবিত্র হয়ে যায়, তোমাকে আজ আমি জিজ্ঞাসা করি তুমি কোথায় চলে গিয়েছ? কেন বা তুমি এমন করে চলে চলে যাও? কেন বা তুমি আমাদের জীবনকে এমন অশ্রুসিক্ত কুহেলিকাবৃত করে তোলো, তাকে বিষাদে পূর্ণ করে দিয়ে চলে যাও? কিন্তু এই যদি আমার জিজ্ঞাসা হয় তবে এও প্রশ্ন করতে হয় যে, পর্ব্বতের উপর দিয়ে যে ঝরণা পড়ছে তার উপরে সূর্য্যের আলো চিরদিনই ইন্দ্রধনু ফোটায় না কেন? কেন যা এক সময় দেখা যায় আর এক সময় তা শুকিয়ে যায়, ঝরে যায়; কেন আশা আকাঙ্ক্ষা জন্ম এবং মৃত্যু পৃথিবীর এই দিবালোকের উপরে এমন অন্ধকার বিস্তার করেচে, কেন একই মানুষের ভিতরে ভালবাসবার এবং বিদ্বেষ করবার আবেগ, নৈরাশ্যের নিষ্ফলতা এবং আশার শক্তি এক সঙ্গে ঘটে? এর ত কোনো উত্তর পাই না। ঊর্দ্ধ্ব লোক থেকে কোনো তপস্বী কোনো কবি এ প্রশ্নের উত্তর দেয় নি। সেই জন্য মানুষ, দৈত্য দানব প্রেত স্বর্গ প্রভৃতি কতকগুলি নাম নিয়ে আপনাকে ভুলিয়েচে, সেই নামগুলি আমাদের ব্যর্থ প্রয়াসের ইতিহাস রূপে রয়ে গেছে। এই সমস্ত নামের নিষ্ফল মায়ামন্ত্র ত আমাদের উদ্ধার করতে পারে না; আমরা এই সব যা কিছু দেখচি শুনচি তার ভিতরকার সংশয়, আকস্মিকতা, পরিবর্ত্তনশীলতার হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করতে পারে না। কেবলমাত্র তোমার দিব্যজ্যোতি গিরিশৃঙ্গের উপর দিয়ে ধাবমান কুহেলিকার মত, কোনো নিস্তব্ধ বীণাযন্ত্রের তার গুলির মধ্যে নিশীথ বায়ুর স্পর্শঘাতে জাগরিত সঙ্গীতের মত, মধ্যরাত্রে স্রোতস্বিনীর জলধারার উপর জ্যোৎস্নালোকের মত মানবজীবনের অশান্ত দুঃস্বপ্নে সৌন্দর্য্য এবং সত্য বিকীর্ণ করে। ভালবাসা, আশা আত্মসম্মান এ সব মেঘের মতন যায় এবং আসে। ক্ষণকালের ধার করা জিনিষের মতন তাদের কখনো পাই কখন হারাই। কিন্তু মানুষ যে সর্ব্বশক্তিমান হত, দেবতা হত যদি তুমি,—হে অপরিমেয়, হে বিরাট, তোমার নিজের প্রভাবকে তার হৃদয়ের মধ্যে চিরন্তন করে রাখতে। তোমার প্রেমের দৌত্য প্রেমিকদের চোখে-চোখে চাওয়ার উপরে কখনো উজ্জ্বল কখনো ম্লান হচ্চে, তুমি যে মানুষের চিত্তকে তার খাদ্য জোগাচ্চ, যেয়োনা, তুমি যেয়োনা, ছায়া যেমন এসে চলে যায় তেম্নি করে তুমি যেয়োনা। যদি তুমি যাও তাহলে মৃত্যুর মধ্যেও যে আমাদের আশা করবার কিছু থাকবে না, সেও যে জীবনের মতই অন্ধকারময় ভীষণ হয়ে উঠবে। যখন আমি এক সময় বালক ছিলেম তখন আমি ভূত প্রেতদের খুঁজে বেড়িয়েচি। কত সব নির্জ্জন ঘরের কান পাতা নিঃশব্দতার ভিতর দিয়ে—কতগুহা কত পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, কত তারালোকিত বনভূমির ভিতর

দিয়ে আমি ভয়ে ভয়ে পা ফেলে গিয়েচি—মনে আশা রেখেচি যে, যারা যারা পরলোকে গিয়েচে তাদের কাছ থেকে কোনো একটী বার্ত্তা পাব। আমার বাল্যকালে যে সমস্ত বিষাক্ত নাম, দেব দৈত্যের যে সমস্ত নাম জান্‌তেম, সেই সমস্ত নাম ধরে কতবার ডেকেছি, আমায় কেউ উত্তর দেয়নি। একদিন কিন্তু যখন এই জীবনের রহস্যের কথা গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়ে ভাবচি—সে সময়টি কেমন? না, যখন মধুর মধুমাসে দক্ষিণ সমীরণের সাধনাগুণে জীবলোকে পাখীর গান আর পুষ্পমঞ্জরীর বিকাশের ঘোষণা ছড়িয়ে গেছে, সেই সময়ে হঠাৎ তোমার ছায়া আমার উপরে অবতীর্ণ হল, পরমানন্দে দুই হাত জোড় করে চাৎকার করে উঠ্‌লেম। আমি এই প্রতিজ্ঞা করলেম যে তোমাকে—আমার যা কিছু আছে—সব তোমাকে উৎসর্গ করব। সে প্রতিজ্ঞা আমি কি রাখিনি? আমার এই হৃদয় স্পন্দিত হচ্চে আমার চোখ দিয়ে জল পড়চে। এই এখনি আমি তাদের ডাকৃচি, অতীতকালের সেই জ্বলন্ত প্রহরগুলিকে সাক্ষী ডাকৃছি, তারা আমার সঙ্গে কতদিন রাত জেগেছে, সেই সব রাত যা কখনো অধ্যয়নের আগ্রহে কখনো প্রেমের আনন্দে কেটে গেছে! সেই আমার সাক্ষীরা জানে যে যখনি আনন্দের আভায় আমার ললাট উদ্দীপ্ত হয়েচে, তখনি সেই সঙ্গে এই আশা আমার মনে জেগেচে যে তুমি এই জগৎকে তার দাসত্বের তামস থেকে মুক্ত করে দেবে, তুমি, হে বিরাট মাধুরী, আমাদের এমন কিছু দেবে য আমি ভাষায় বর্ণনা কর্‌তে পারিনে।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

সেদিন আমায় বলেছিলে
আমার সময় হয় নাই—
ফিরে ফিরে চলে' গেলে তাই।
তখনো খেলার বেলা
বনে মল্লিকার মেলা
পল্লবে পল্লবে বায়ু উতলা সদাই।

আজি এল হেমন্তের দিন
কুহেলি বিলীন ভূষণবিহীন।
বেলা আর নাই বাকি
সময় হয়েছে নাকি,
দিন-শেষে দ্বারে বসে' পথপানে চাই॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

II { মসা -া গা -া। গা -মা পধপা -মগা I মা গা গরা -গমা। মগা -া (া -া I
সে • দি ন আ • মা• • য় • ব লে ছি • • লে • • •

গা -মা মপা -া। পনা -া নর্সা -সনা I নধা -না ধপা -া। পধা -ধপা মা -গা) } I গা মা I
আ • মা• র্ স• • ম• য় হ য় না• ই হ• য় না ই ফি রে

মপা -না না -া। না -া নর্সা -র্সনা I নধা -না পা -া। পা -ধা -না -র্সা II
ফি রে • রে চ • লে• • গে • লে • তা • • ই

* বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে ইংরেজ কবি শেলির শতাব্দী স্মরণ-সভায় সভাপতির বক্তৃতা।

II -া -া পা পা। পনা -া না -া I র্মর্সা -া র্সনা -া। র্রর্সা -া র্সা র্সা I না -া পা
০ ০ ভ থ নো০ ০ থে ০ লা০ য় বে ০ লা০ ০ ব নে ম ল্ লি

-া। পা -ধা না -র্সা I ধনা -া -ধপা -া। না -া র্সা -পা I ধা -া পা মা। পা -মা গা
০ কা য় মে ০ লা০ ০ ০ ০ ০ প ল্ ল বে প ল্ ল বে বা ০ য়ু

-া I গা মা পা ধা। ধর্সা -া -া -া II
০ উ ত লা স দাই ০ ০ ০

II { সা সা সন্া -া। সা -া গা -া I গা -া গমা মরা। গা -া -া -া I গা গা মা
আ জি এ০ ০ ল হে ০ ম ন্ তে০ র দি ০ ০ ন্ কু হে লি

মরা। রগা -া -া -া I গা পা পক্ষা পক্ষা। ধপা -া -া -া } I -া -া পা পা। না -া র্সা
০ বি লী০ ০ ০ ন্ ভু ষ ণ০ বি০ হী০ ০ ০ ন্ ০ ০ বে লা আ য় না

-া I র্রা -না র্সা -া। -া -া -া -া I না -া র্সা -া। -া -া না না I র্সা -না ধনা -া।
ই বা০ কি ০ ০ ০ ০ স ০ ম য়্ ০ ০ হ য়ে ছে ০ না০ ০

ধপা -া পা পা I পধা -পা মা -া I -মপা পমা গা মা I মরা -মা মগা -া। -া -া -া -া।
কি০ ০ দি ন শে ০ ষে ০ ঝা০ ০ রে ০ ব ০ সে ০ ০ ০ ০ ০

গা মা পা ধা। ধর্সা -া -া -া II II
প থ পা নে চাই ০ ০ ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেলি-প্রসঙ্গ

সাসেক্স কাউন্টিতে হর্শহামের কাছে ফীল্ড প্লেসে শেলির জন্ম হয় ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা অগষ্ট তারিখে। কবির বংশ ছিল প্রাচীন। ছেলেবেলা থেকেই কবির কতকগুলো খেয়াল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেকেলে ধরণের বাড়ীটা কবির কাছে মনে হতো যেন রূপকথার যাদুকরের ঘর! সে ঘরের ছাদটা খুঁড়তে পারলে সেখানে লুকোনো এক গুহার সন্ধান মিলবে—আর সেই গুহায় মস্ত-মস্ত সাপ আছে! তাছাড়া আছে সেখানে বাগান—সে বাগানে কত ফুল, কত ফল, আরো কত কি! ভাই-বোনেরা ছোট শেলির এই সব আষাঢ়ে গল্পে মজা পেতো, ভয়ও পেতো। মার ভাবনা হতো, ছেলের এ কি পাগলামির খেলা! অন্য ছেলে-মেয়েরা খেলা করে, গল্প করে,—সে কেমন মানুষের মতন—আর এ ছেলের এ কি বিদ্‌ঘুটে আজগুবি ধরণের খেলা আর গল্প! মা বক্‌তেন। তিনি চাইতেন, আর পাঁচজনের মতই ছেলেটি মানুষ হয়! কিন্তু ছেলের কল্পনা তখন থেকেই যে বিভ্রম আর খেয়ালের মধ্য দিয়ে কোন্ পথে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল, মা তা বোঝেন নি! তিনি কি জানতেন, তাঁর এই আজগুবি খেলার খেলুড়ি ছেলে কালে জগজ্জয়ী কবি হবেন!

স্কুলেও সহপাঠীরা প্রথমে অবাক হলো শেলির খামখেয়ালি পোষাক দেখে। সে পোষাকের ফ্যাশান কবির নিজের—কোন বড় দর্জির দোকানে তার ছাঁচ মিল্‌ত না। দিনের বেলায় শেলি পড়াশোনা একটু করতেন, কারো সঙ্গে বড় মিশতে পারতেন না। রাত্রে যখন চাঁদ উঠত, আকাশে তারা ফুটত, তখন যেন শেলির সুপ্ত চেতনা তীব্র সাড়ায় জেগে উঠত। চাঁদ-নক্ষত্র ছিল তাঁর বড় প্রিয় সাথী—যেন বন্ধু! স্কুলেও তাঁর খেলা ছিল, আগুনের বেলুন ওড়ানো, ইলেকট্রিক মেশিনে নীল আলো ফুটিয়ে তোলা। বন্ধুরা বলত, কি হচ্ছে শেলি? শেলি বল্‌তেন, শয়তানকে জাগিয়ে তুলছি। "I am raising the devil."

শেলি

স্কুলের ছুটি হলে বাড়ী এসেও তাঁর ঐ খেলা। কথাটা বাপের কানে গেল। তিনি বল্লেন, এই চক্‌চকে বাড়ী, ঝক্‌ঝকে ময়দান—এখানে শয়তান আসবে কি? শেলি বল্‌তেন, তাকে টেনে আন্‌ব।

শেলির বোন হেলেন বলেছেন, "ছেলেবেলা থেকেই শেলির আমোদ-খেলা সবই ছিল দুঃসাহসিকের আমোদ খেলা। তার প্রকৃতি ছিল এমন যে সে শাসন মানতে চাইত না, আইনের বাঁধন কেটে টানা গণ্ডী ছাড়িয়ে উধাও হয়ে ছুটত, দিক্‌-বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে, ভয়-ডর অগ্রাহ্য করে! শেষে তার প্রকৃতি এমন দুরন্ত হয়ে উঠেছিল

ফাল্ড প্লেস
এই ঘরে শেলির জন্ম হয়

কণ্ঠের স্বর ছিল মিহি—তবে তাতে মধুরতার অভাব ছিল।"

হগের সঙ্গে শেলির বন্ধুত্ব ক্রমে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। ইটনে থাকতে প্রচলিত ধর্ম্মের উপর কবির অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হয়; আর সেই সময় তিনি একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন,—'নাস্তিকতাব প্রয়োজনীয়তা' (The Necessities of Atheism)। এতে লেখকের নাম ছিল না। কলেজে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কে লিখেচে? শেষে নাম জানা গেলে তাঁকে মাপ চাইতে বলা হলো—তিনি তা চাইলেন না। এজন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে ইটন ছাড়তে হলো বন্ধুর পক্ষে নিয়ে হগ ইটনের কর্ত্তাদের সঙ্গে ভীষণভাবে লড়ে ছিলেন। এ লড়ার ফলে হগকেও ইটন ত্যাগ করতে হল। বাড়ীতে পিতার শাসন তখন বাজের মত উদ্যত—শেলি বাড়ী গেলেন না! হগের সঙ্গে হগের বাড়ীতে লণ্ডনে গিয়ে উঠলেন। কিছুদিন পরে হগ আইন পড়তে ইয়র্কে গেলেন।

যে স্কুলে যেতে ভালোই লাগ্‌ত না, পড়াশোনায় মন তাব বসতেই চাইত না!"

স্কুলের সহপাঠী টমাস্ জেফার্শন হগ্ শেলির সম্বন্ধে ব'লেছেন, "শেলির খাওয়া ছিল খুব কম। আর কারো সঙ্গে সে মিশত না। হাড় ছিল বেশ শক্ত আর জোরালো,—দীর্ঘ আকৃতি কিন্তু এমন ঝুঁকে চল্‌ত যে বেঁটে ব'লে মনে হতো। কাপড়-চোপড় যা সে পরত তা খুব দামী, আর তার কাটছাঁট চমৎকার, নতুন ফ্যাশনের, কিন্তু ভারী অপরিষ্কার। ব্রশ চালিয়ে তা ঝাড়া-মোছা মোটেই হতো না। গায়ের রংটি ছিল হালকা,—লালে-সাদায় মিশুনো; মুখ অনেকটা মেয়েলি ছাঁচের। মাথাটি বেশ একটু ছোট গড়নের। চুল ঘন আর লম্বা—নিজে সর্ব্বদাই কি যেন চিন্তায় বিভোর। একটু উদ্বিগ্ন হলে দুই হাতে খুব জোরে মুখ ঘষত। মাঝে মাঝে চুল ছাঁটত, ফৌজের দলের মত ছোট ছোট করে—মাথা প্রায় মুড়িয়ে ফেলত। মেজাজ অত্যন্ত খামখেয়ালি ধরণের। তার

শেলির গৃহ—বিশপ গেট

তারপর মাতুল কাপ্তেন মিলফোর্ডের মধ্যস্থতায় বাপের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘুচলে শেলি পিতার গৃহে ফিরে আসেন।

১৮১১ সালের মে মাসে যে ঘরে শেলি অশান্তি হেনে চলে গিয়েছিলেন, সেই ঘরে আবার ফিরে এলেন। কিন্তু এতটুকু অনুতপ্ত হন্ নি—তবে মাথায় নূতন রঙীন কল্পনা নিয়ে তিনি ফিরলেন। হগ মাঝে মাঝে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর গৃহে গোপনে এসে দেখা করতেন। শেলির বাপের মানা ছিল, হগের সঙ্গে মেশা হবে না! শেলি বন্ধুকে ঘরে লুকিয়ে রাখতেন বলতেন, "বন্দীশালায় বন্দ থাকো, বন্ধু! মাঝ রাত্রে সকলে ঘুমোলে মাঠে বেড়াতে যাব।"

এই সময় শেলি সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে নানা কথা প্রচার করতে লাগলেন,—প্রথমে ভাই-বোনের কাছে, পরে বন্ধুবান্ধবের কাছে। হ্যারিয়েট ওয়েষ্টব্রুক ছিলেন মিসেস্ ফেনিংয়ের স্কুলে তাঁর বোনের সহপাঠিনী আর বন্ধু। মাউণ্ট ষ্ট্রীটে হ্যারিয়েটের বাপের কফির দোকান ছিল। হ্যারিয়েট খুব সুন্দরী; বয়স তাঁর তখন ষোল বছর। শেলির বোনের কাছে হ্যারিয়েট প্রায়ই আসতেন। শেলির সঙ্গে ক্রমে আলাপ-পরিচয় হলো। শেলি তাঁকে দেখে মুগ্ধ হলেন, তাঁর সঙ্গে দেখাশোনা হত—তাঁর বাড়ীতে প্রায় যেতেন—দুজনের মধ্যে প্রণয় ক্রমে গাঢ় হলো। শেলি হ্যারিয়েটকে তাঁর মন্ত্রে দীক্ষা নিতে বললেন, অর্থাৎ সমাজের শাসন নিগড় ভাঙ্গো, বাঁধা আইনের শিকল কাটো, মনে-প্রাণে স্বাধীন হও,—তাব মনে, তা করতে গেলে হ্যারিয়েটকে স্কুল ছাড়তে হয়! হ্যারিয়েট প্রস্তুত হলেন; কিন্তু তাঁর বাপের শাসন সুরু হলো। বাপ মেয়েকে স্কুল ছেড়ে আসতে দেবেন না—শেলি তাঁকে বোঝালেন; হ্যারিয়েটের বাপের সঙ্কল্প তবু অটল। হ্যারিয়েট বললেন, তিনি বাপের গৃহ ত্যাগ করে শেলির সঙ্গে কোথাও চলে যেতে প্রস্তুত! পয়সার টানাটানি হবে, হোক—দুজনের প্রেমই দুজনকে বাঁচিয়ে রাখবে। তারপর দুজনে গৃহ ত্যাগ করে' এসে এডিনবরায় বিবাহ করেন। দু-পক্ষেই দুই বাপ রাগে অন্ধ হয়েছিলেন,—কিন্তু পরে আবার মিটমাট হয়ে গেল।

শেলি-পত্নী

তার কিছুকাল পরে বন্ধু হগের অভিভাবকতার পত্নী হ্যারিয়েটকে রেখে শেলি সাসেক্সে গেলেন বৈষয়িক কাজে; ফিরে এসে দেখলেন,—বন্ধু ও পত্নী দুজনেই দুজনের প্রণয়ে বিভোর। শেলি নিজে এ সম্বন্ধে লিখেছেন,

Before I quitted York, I spoke to him. Our conversation was long. He was silent, pale, overwhelmed; the suddenness of the disclosure oh. I hope, its heinousness, had affected him. I told him that I pardoned me; freely, fully, completely pardoned, that not the least anger against him possessed me. His vices and not himself were the objects of my horror and my hatred.

এই সময় শেলির চিত্ত মিস্ হিশ্‌নারের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠে। হিশনার তাঁর চেয়ে দশ বৎসরের বড়। তাঁর একটা স্কুল ছিল হার্ষ্টপিয়ারপয়েন্টে। শেলি স্ত্রী ও বন্ধুর বিশ্বাস-ঘাতকতায় আঘাত পেয়ে শান্তির আশায় বারবার হিশনারকে

সাহচর্য্য চেয়ে পত্র লিখতে লাগলেন। হিশনারের বাপ আপত্তি তুললেন, মেয়েকে তিনি ছাড়বেন না। শেলি তাঁকে ধমক দিলেন,ছেলে-মেয়ে বাপের সম্পত্তি বা তৈজসপত্র নয় যে তার উপর কর্ত্তামি চালাবে। প্রকৃতির আইন তার সমর্থন করে না, ইংলণ্ডের আইনও নয়।

"Who made you her governor? Believe me, such an assumption is as impotent as it is immoral. Neither the laws of nature, nor of England have made children private property."

এর কিছুদিন পরে মিশ্ হিশনার শেলির কাতর প্রার্থনা এড়াতে না পেরে সাসেক্সের বাড়ী রেখে তাঁর সঙ্গে এসে মিললেন।

এর প্রায় ছ'মাস পরে শেলির মোহ টুটে গেল। তিনি দেখলেন, মিস্ হিশ্নার নেহাৎ সাধারণ নারী। তাঁর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নেই। কাজেই বিচ্ছেদ ঘটতে দেরী হলো না। তাঁরি একটা অশান্ত উদ্দাম খেয়ালের বশে এই নারী দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হলেন—বেচারী! শেলী তাতে কিন্তু বিচলিত হন্ নি।

এঁর সম্বন্ধে শেলি বন্ধু হগ্‌কে লিখেছিলেন,—আমার বুদ্ধি যেন লোপ পেয়েছিল—নাহলে এই কুৎসিত অন্তঃসারহীন নারীর জন্যে এত কাতর হই! নিজের রুচি যে কেন হয়েছিল, তা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই!

মিশ্ হিশনারের সঙ্গে চার মাস তিনি একত্র বাস করেছিলেন। তবে যে নারী তাঁর জন্য যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে এসেছে, তার আর্থিক ক্ষতি যতটা পূরণ করতে পারেন, সে বিষয়ে শেলি পরে তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিলন আর হয়নি।

মিশ্ হিশনার কিন্তু কবিকে ভোলেন নি। শেলির কাব্যই তাঁর জীবনের অপরাহ্নে একমাত্র আরামের বস্তু ছিল। শেলির জীবনী-কার বলেছেন, শেলির নাম শুনলে মিশ্ হিশনারের দুই চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠতো!

এ ঘটনার পরে পত্নী হ্যারিয়েটের সঙ্গে শেলির পুনর্ম্মিলন হলো—লণ্ডনে নূতন করে বিবাহের প্রথা মেনে আবার বিবাহ হয়। তবে এ মিলন যে খুব ঘনিষ্ঠ হলো, তা নয়। কারণ শেলির প্রতিভার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা হ্যারিয়েটের ছিল না। তিনি ছিলেন কবির 'প্রিয়া'—তাঁর চিন্তার অংশ নেবার ক্ষমতা হ্যারিয়েটের ছিল না। তার ফলে শেলির

কাসা মাগ্‌নী—স্পেজিয়া-তীরে শেলির বাসগৃহ (১৮২২)

শেলির সমাধ

চিত্ত হ্যারিয়েটে তৃপ্ত ছিল না। স্বামী অন্যাগতচিত্ত—হ্যারিয়েট শেষে মনের দুঃখে নদীতে ডুবে মৃত্যুকে বরণ করেন। তার একপক্ষ পরে শেলি মেরিকে বিবাহ করলেন।

মেরির সঙ্গে এই যে বিবাহ, এরও ইতিহাস আছে। এ সম্বন্ধে মিসেস্‌ শেলি তাঁর এক মহিলা বন্ধুকে লিখেছিলেন,—"মেরি ওঁকে না পেয়ে ক্ষান্ত হবে না। মেরিরই দোষ। সে নানা গল্পে ওঁর কল্পনাকে এমনি উত্তেজিত করে তুলচে! তিনি আমার কথা তুলেছিলেন, আমার মনে অত্যন্ত বেদনা লাগবে! মেরি বলে,—তা কেন! আমি তাঁর বোনের মত থাকব, আর সে হবে প্রেয়সী পত্নী! মেরি আমায় দেখবে-শুনবে—যাতে কোন কষ্ট না পাই। আমায় উনি বাথ থেকে আনিয়ে নিলেন—এসেই আমি রোগে শয্যা নিলুম। ডাক্তারেরা আশা ছেড়ে দিলে। ওঁর কি উদ্বেগ! চোখে গভীর হতাশা নিয়ে উনি বিছানার ধারে পড়ে কেবলি বলছেন,—তুমি, বাঁচো, তুমি বাঁচো! হায়রে আমায় বাঁচতেও হলো—আস্‌চে মাসে আর একটি শিশুকে এই দুঃখের পৃথিবীতে আবাহন করতে হবে আমায়! উনি মুখে যতই বলুন, আমাতে ওঁর আর সুখ নেই! এ কি আমি বুঝি না! যে-শেলিকে আমি ভালবেসেছিলুম, সে শেলি নেই, মরে গেছে! এ কথা ভাবতে আমার প্রাণ ছিঁড়ে যেন রক্ত ঝরতে থাকে!"

তার পর এই শিশু পুত্রের জন্মের পর শেলির অবহেলা বেড়ে উঠল। ১৮১৫ সালের জানুয়ারি মাসে মিসেস্‌ শেলি তাঁর শেষ চিঠি লিখেছেন,—"আমার দুঃখের সীমা নেই, বন্ধু। ওঁর দেখাও পাই না। উনি আমার কোন খপরই নেন্‌ না! আমি বাপের বাড়ীতেই আছি। জীবনে ক্লান্তি এসেছে। এই উনিশ বৎসর বয়সে আমি মরবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি। এই ছেলেরা যদি না জন্ম নিত!...মরাব নামে মানুষ শিউরে ওঠে—মরণ আমার বন্ধু! ওঁর ভালবাসার বিন্দুও যদি পেতুম!...যাক্‌, ও-সব ভেবে কি ফল! আর আমি ভাবব না। ভাবতে গেলে যেন পাগল হই! ভবিষ্যতের কালো পর্দাটা ঘুচিয়ে যদি একবার দেখতে পেতুম। তাহলে দেখ্‌তুম, অদৃষ্টে কি আছে!...এই যে দুঃখের শেষ করতে যাচ্ছি, এটা কি অন্যায় মনে কর? পরলোকে একটুও কি শান্তি পাব না?"

স্ত্রীর মৃত্যুর পর শেলি এসে ছেলেদের নিয়ে যান্‌—আর তার একপক্ষ পরেই তিনি মেরিকে বিবাহ করেন। মিসেস্‌ শেলির শোচনীয় মৃত্যুর উল্লেখ করে তিনি বলেন,—একটা দিন কি অসহ্য যন্ত্রণাই না ভোগ করেচি! such as the contemplation of vice and folly, and hard-heartedness, exceeding all conception, must produce.

মেরিকে বিবাহ করেও শেলি সুখ পেলেননা,—জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠল। এই সময় তাঁর বন্ধুত্ব হলো জেন্‌ উইলিয়াম্‌সের সঙ্গে। এই জেনের স্বামীর সঙ্গে কবি লেগ্‌হর্ণ থেকে লেরিকিতে যাচ্ছিলেন—সেখানে দুজনের পত্নীই অপেক্ষা করে বসে ছিলেন। এই যাত্রাপথে নৌকাডুবি হয়ে দুই বন্ধুই সলিল-সমাধি লাভ করেন। তারিখ ৮ই জুলাই।

শেলির প্রকৃতিতে এই যে উদ্দামতা, অশান্তি, এটা কালের প্রভাবেই ঘটেছিল। ধর্ম্মের বন্ধন তখন শিথিল—স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে, এ বিশ্বাস তখন কারো ছিল না! তাই জীবনে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে তিনি যতই কাতর হয়ে পড়্‌ছিলেন, ততই তাঁর 'সকল কাঁটা ধন্য করে' কবিত্বের 'ফুল' অপরূপ শোভায় ফুটে উঠ্‌ছিল, মন কিন্তু অতৃপ্তির হাহাকারে ভরে যাচ্ছিল।

যাই হোক্, নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনার সংঘাতে কবির চিত্তে যে উদ্দামতা জেগে উঠেছিল, তার বেদনার কথা মনে করে' আর কালের প্রভাবের কথা ভেবে আমরা যদি সেটুকু ক্ষমা না করি, তাহলে কবির প্রতি আমাদের অবিচার করা হবে।

শ্রীশিশিরকুমার রায়।

শারদ সাধনা

এরা কি ভাই বুঝতে পারে
কী যে আমার দাম,
যারা ভাবে রাখবে দুই-ই
কূলও এবং শ্যাম!
নাম্‌টি তাদের ধোরে যখন
বাঁশী আমার বাজে,
আস্‌তে ছুটে চরণ যাদের
বাধে লোকের লাজে,
শুনলে আমার নূপুর-ধ্বনি
তমাল কুঞ্জবনে
গৃহ-কাজের মাঝে যারা
রয় না অন্যমনে।

* * * *

তুমি গেছ, শেফালিকায়
কে মালিকা গাঁথে!
তুমি গেছ, সকল আলো
গেছে তোমার সাথে!
তুমি গেছ, জ্যোৎস্না-রাতে
স্নেহ-দান কে যাচে
চুমু-কাঙাল ঠোঁটটি দিয়ে
এগিয়ে মুখের কাছে!
তুমি গেছ, ভাব-সাগরে
বইয়ে কথার বাণ
জাগ্‌বে নিশি, কোরবে আমায়
আঁখিতে কে পান?

* * * *

এস আমার শরৎ-রাকা
কুমুদ-ফোটা রাতে,
অভ্র-ধবল শুভ্র মেঘের
এস মুকুট মাথে,
এস তুমি শিশির-ধোওয়া
তৃণের বাসে সেজে,
এস তুমি শিউলি-বোঁটায়
পা-দুখানি মেজে,
শ্রাবণ-নিশায় হারিয়ে দিশা
পাইনি তোমার দেখা,
আশ্বিনে আজ সারা ধরায়
তোমারি রূপ লেখা।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

অন্যদিকে ফিরিল। সে মনে করিল, আহা, উঁহারা যদি সত্যই অরুণদার কেহ হন্, কেমন আনন্দ হয়! হিমু মনের আবেগে এককালীন পাঁচ পয়সার হরির লুট মানসিক করিয়া ফেলিল। হে হরি, উহাঁদের অরুণদার আপন জন করিয়া দাও, ঠাকুর! হিমু তোমায় পাঁচ পয়সার হরির লুট দিবে। অরুণদা বড় দুঃখী। উহার আপন জন কেহ নাই। মানুষের কেহ না থাকা বড় কষ্ট। উহাকে তুমি কষ্ট দিয়ো না। মা বলেন যে ভাল হয়, তুমি তাকে ভালবাস। অরুণদা বড় ভাল, সুতরাং তাহাকে দুঃখ দেওয়া তোমার উচিতও নয়! এবং তুমিও তাহাকে ভালবাসিতে বাধ্য। এইরূপে মনে মনে ঠাকুরের কর্ত্তব্য মীমাংসা করিয়া দিয়া খুসী হইয়া সে এবার প্রফুল্ল মনে পথ চলিতে লাগিল। যে ভগবানে যথার্থ নির্ভর করিতে পারে, সেই খুসী। সরলা হিমু নির্ভরের আনন্দ জানিত! তাহার চির-প্রসন্ন মুখে বিষাদের ছায়াটিও কখনও পড়িতে পারিত না।

কয়েকদিন পরে একদিন সকাল বেলা দুর্গামন্দির-বেষ্টিত উদ্যানদ্বারে দাঁড়াইয়া হিমু কহিল, "অরুণদা মন্দির দেখে যাবে না?"

মুক্তা ঠাকুরাণী কহিলেন, "চল্, চল্ বাপু, আর দাঁড়ায় না, আজ আবার হাটবাজার—উনকুটি চৌষট্টি—সব করে'নে তবে রান্না খাওয়া। রোদ চড়ে উঠ্‌ল মাথার ওপর—এইত সেদিন দেখে গেলি বাগান! বাগানের আবার দেখবি কি রোজ রোজ?"

দিদিমা বারণ না করিলে হয়ত হিমুর জেদ এতটা চাপিত না। বাধা পাইয়া সে নিজ অভ্যাসমত হাসিয়া কহিল, "দিদিমার কেবল বাড়ী আর বাড়া। তবু যদি সে বাড়ী স্যাঁতানে অন্ধকূপ না হতো! আরসুলা ইদুর ছুঁচো বাঁদর—বাসঃ! ও বাড়ীতে একদম্ মানুষের থাকতে ইচ্ছে করে। চল একবারটী, রান্না-খাওয়া ত চিরদিন ধরেই আছে।" এই বলিয়া সে চৌকাঠের ভিতর পা গলাইতেই মালতী ডাকিলেন, "হিমু!"

হিমু বুঝিল, মা বিরক্ত হইয়াছেন। এ আদেশ তাহাকে পালন করিতেই হইবে। তাই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "আমরা তবে এগুই। তুমি পরে যেও অরুণদা! দেখ, সেই সন্ন্যাসীদের যদি দেখ্‌তে পাও ওখানে।"

মুক্তাঠাকুরাণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "হিমি যে সন্ন্যিসীর জন্যে পাগল হয়ে উঠ্‌লি, দেখ্‌চি। মন্তর-তন্তর নিবি নাকি লো? না, আর কিছু? বর তো জুটচে না, বলি, তপস্বিনী হবি ঠিক করেছিস্ না কি?"

হিমু কহিল, "পাগল আমি হইনি দিদিমা, অরুণদাই হয়েচে! তোমরা যে চোখ চেয়ে ঘুমোও কিনা, তাই দেখ্‌তে পাওনা। কেবল রান্না আর খাওয়া বুঝতে পার। দেখ দিদিমা, বলা মুখ আর চলা পা,—এরা কখনো থামে না। যখন থামে সেই—" বলিয়া সে অত্যন্ত দ্রুতপদে চলা সুরু করিয়া দিল। সে জানিত, এই মাত্র রসনার যে সুব্যবহার সে করিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। তাহার অনেকখানি ভাষা উহ্য রাখিলেও যতটুকু প্রকাশ করিয়াছে, তাহার একটা প্রতিক্রিয়াও বাকী! কিন্তু সেটা আর ঘটিল না। মুক্তাঠাকুরাণী উদ্দেশে 'ষাট, ষাট' বলিয়া বার-দুয়েক ষষ্ঠী দেবীর কৃপা ভিক্ষা করিয়াই আপাততঃ বিধবার একমাত্র স্নেহাধারকে ক্ষমা করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর তিন জনেই নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলেন। অরুণ সঙ্গে না থাকায়, আর কল্পনায় তাহারই অনুকূলে দিবাস্বপ্ন দেখিতে ব্যস্ত থাকায় হিমুর বলা মুখও বন্ধ রহিয়া গেল।

কাশী আসিয়া অবধি অরুণ বরাবরই তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়াছে। কদাচিৎ মুক্তাঠাকুরাণী একা কোথাও গিয়াছেন। কিন্তু মালতী বা হিমু সঙ্গে থাকিলে অরুণকে না লইয়া তিনি পথ চলিতে সম্মত হইতেন না। কাশীর পথ তাঁহার অনেকখানি পরিচিত হইলেও বাঙ্গালী টোলার এক রকমের গলি ও এক রকমের বাড়ীগুলি চিনিয়া বাহির করা তাঁহার পক্ষে বড়ই মুস্কিলের মনে হইত।

আজও তিনি বা মালতী কোন কথা বলেন নাই। অরুণকে তাঁহারা পথিমধ্যেই ছুটি দেন নাই। দিবার ইচ্ছাও তাঁহাদের বিশেষ ছিল না। হিমু তাহাকে মন্দিরে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল মাত্র। হিমু এমন অনেক কথা বলে—সবই যে অরুণ নির্ব্বিচারে পালন করে, এমন নহে।

কিন্তু আজ হিমুর অনুরোধ যেন কাহার অলক্ষ্য আদেশের ন্যায় অরুণের কাণে শুনাইল। এর পর যে কাহারও অনুমতি লওয়ার কোন প্রয়োজন আছে, সে কথা আর তাহার মনেও হইল না।

তাহাকে ব্যাকুলভাবে বাগানে ঢুকিতে দেখিয়া মুক্তা ঠাকুরাণী বিরক্ত হইয়াই পথ চলিতে লাগিলেন। তবু মনে মনে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অরুণ শীঘ্রই তাঁহাদের অনুসরণ করিবে। সত্যই কি আর সন্ন্যাসীর লোভে মধ্যপথে তাঁহাদের ছাড়িয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে?

ঠাকুরাণীটি আজ কিন্তু তাঁহার অনুমানে ভুল করিয়াছিলেন। অরুণের মুখ দেখিলে হয়ত এ ভুল তাঁহারও হইত না। সে সময় অরুণের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই তিনি তাহার প্রকৃতিস্থতায় যথেষ্ট সন্দিহান হইতেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি তখন পথের পানেই বিরাগ-ভরা দৃষ্টি বদ্ধ রাখিয়া চলিতেছিলেন।

বাগানের মাঝখানে শ্বেত পাথরের চত্বর-বেষ্টিত শ্বেত পাথরের মন্দির। চূড়ার উপর সুবর্ণ-রঞ্জিত কলস। মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ। পূজারী ক্ষণপূর্ব্বে কয়েকটি ফুল বিল্বপত্রের সহিত গুটিকতক আতপ চাউল ছড়াইয়া দিয়া পূজা সারিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দ্বার খোলাই ছিল। একজন গেরুয়া পরা নামাবলী গায়ে পুরুষ বাহিরের দিকে পিছন করিয়া মন্দিরমধ্যে বসিয়া জপ করিতেছিলেন। জপ-নিমগ্নের শান্তি ভঙ্গ না করিয়া অরুণ নীচে জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া দ্বার-প্রান্তে প্রণাম করিয়া তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল, পশ্চাৎ হইতে শুনিতে পাইল, "একটু বসে যেয়ো বাবা! আমি তোমারই প্রতীক্ষা করছিলুম এতক্ষণ!"

অরুণ বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, মন্দির মধ্যস্থ ঐ জপ-নিমগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কাছাকাছি কেহ কোথাও নাই। এ কি তবে উহাঁরই আদেশ? উনি অরুণেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন! কে উনি? কিই বা উহার বক্তব্য? অরুণের সঙ্গেও তবে লোকের প্রয়োজন থাকে! মানুষটি যেন চেনা মনে হইতেছিল। সম্মুখ-ভাগ ভাল দেখা না যাওয়ায় স্পষ্ট বুঝা গেল না। বিস্ময়-সংশয়ান্দোলিত চিত্তে সে চুপ করিয়া বাহিরে বসিয়া রহিল। সযত্ন-রক্ষিত উদ্যানে নানাজাতি পুষ্পে রমণীয় শোভা বিস্তার করিয়াছিল। দুইধারে ক্ষেত্রাকার গঠন, মধ্যে এক এক শ্রেণীর ফুলের গাছ। মাঝখানের চলন পথের দু-ধারে ঘন-বিন্যস্ত সমান মাপে ছাঁটা মেহেদির বেড়া। চলন পথগুলি পাথর বাঁধান, দিকে দিকে পথ গিয়াছে। গোলাপের ক্ষেত্রে অজস্র গোলাপ ফুটিয়া আছে। অপর অংশে তেমনি গাঁদা, জিনিয়া, রজনীগন্ধার বাহার। চন্দ্র-মল্লিকায় সবে কুঁড়ি ধরিতে সুরু হইয়াছে, এখনও ফুল ফোটে নাই। মালীরা কুয়া হইতে জল তুলিয়া নালাতে ঢালিতেছিল। সেই জল প্রত্যেক ক্ষেত্রের ধারে ধারে সরু নালী পথ দিয়া পুষ্প ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইতেছিল। বর্ষা-ধৌত গাছগুলির শ্যামল বর্ণ ফুলের সহিত মিলিয়া সুন্দরতর দেখাইতেছিল! অন্য দিন হইলে মুগ্ধ দৃষ্টিতেই অরুণ এ-সব শোভা-সম্পদ দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার মনের অবস্থা অন্যরূপ থাকায় চোখ মেলিয়া সে চাহিয়া সবই দেখিতেছিল বটে, কিন্তু চোখে তাহার কোন কিছুই পাড়িতেছিল না।

কিছুক্ষণ এমনই কাটিয়া গেলে সন্ন্যাসী মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। অরুণ প্রণাম করিয়া উঠিয়াই বিস্মিত হইয়া গেল। এ যে সেই তিনি! যাঁহাকে দেখিয়া অরুণ আত্মহারা হইয়াছিল! যাঁহাকে দেখিবার আশায় আজ এক সপ্তাহ ধরিয়া সমস্ত দিন দিন পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মত সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজও এখানে এই ইহাঁরই দর্শনাশাই কি তাহাকে টানিয়া আনে নাই? সেই জনের দেখা এমন অবলীলায় ঘটিয়া যাওয়ায় সে কেবল বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। কারণ, কি যে তাহার কাঙ্ক্ষিত সেও তাহা স্পষ্ট করিয়া নিজেই জানিত না।

গৌরীপতি তাহার হাত ধরিয়া বাহিরে বসাইয়া নিজেও কাছে বসিলেন, কহিলেন, "বাবা, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, যদি কিছু জিজ্ঞাসা করি, রাগ করবে না ত?"

অরুণ মাথা নাড়িয়া জানাইল, না, রাগ সে করিবে

না। চেষ্টা করিয়াও কণ্ঠে সে শব্দোচ্চারণ করিতে পারিল না।

গৌরীপতি কহিলেন, "বাবা, তোমার নামটি কি জানতে পারি?"

অরুণ জড়িত স্বরে কহিল; "শ্রীঅরুণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।"

"গঙ্গোপাধ্যায়!" বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন ম্লান আকাশের পানে তেমনি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কণ্ঠেও তাঁহার যেন একটা নিরাশা-ব্যঞ্জক ক্ষুণ্ণ স্বর ধ্বনিত হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "নিবাস?"

অরুণ কহিল, "আপাতত ঝালদা। কলকাতায় থেকে আমি পড়ি, ছুটিতে ঝালদায় একজনদের বাড়ী থাকি।"

গৌরীপতি আর একটু কাছ ঘেঁসিয়া উৎসুক কণ্ঠে কহিলেন, "সে ত তোমার দেশ নয়! নিজের দেশ? পৈত্রিক নিবাস? বাবা, বুড়ো মানুষের অন্যায় কৌতুহলে অসন্তুষ্ট হচ্চ কি? তোমার বাবার নামটি কি ছিল, বল ত বাবা?"

অরুণের বিষণ্ণ মুখে লজ্জার অরুণ আভা ফুটিয়া উঠিল। সে মুখ নামাইয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "৺ইন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জমীদার। তিনি বীরগঞ্জের—আমার পিতা নন, পালক পিতা। আমি জানি না, কেন আপনি আমার পরিচয় চাইচেন। আমি হতভাগ্য,—এ পৃথিবীতে আমার কোন সত্যকার পরিচয় স্পষ্ট নেই। ভয় হয় যে অন্ধকারে আছে তা জানতে! জানি না, আমি কে—বা কি?"

এমন করিয়া মনের কথা সে কখনও কাহাকেও জানায় নাই। আজ ইচ্ছা না থাকিলেও কেমন আত্ম-বিস্মৃতের মতই এত কথা বলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে তাঁহার কম্পিত হাতখানি অরুণের মাথায় স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "তোমার মুখই তোমার পরিচয় দিচ্চে যে! ভয় কিসের বাবা! কিন্তু এ কি সত্যি? এ কি শুনচি! তুমি কি তবে নদীর জলে ভেসে ঐ মহাপুরুষের আশ্রয় পেয়েছিলে? কিন্তু বীরগঞ্জ বহু দূরে যে—সে দেশ, সে যে অনেক দূরে!" আত্মগতভাবে এইরূপ বলিয়া গৌরীপতি চিন্তাবিষ্ট হইলেন।

অরুণ ব্যাকুলভাবে কহিল, "বাবা নৌকো করে বিদেশ থেকে ফিরছিলেন, পথে সন্ধ্যা থেকে ঝড় বৃষ্টির জন্য আঘাটায় নৌকো বেঁধে রাত্রে থাকতে হয়েছিল। সকাল বেলা জলের ধারে গাছের তলায় মরার মত অবস্থায় আমায় তিনি কুড়িয়ে পান। বাবা মারা যেতে আজ ছ-বছর আমি সে শান্তির আশ্রয় হারিয়েচি। তিনি থাকতে একদিনও আমি জানতে পারিনি যে আমি তাঁর ছেলে নই।" ইন্দ্রনাথের স্মরণে অরুণের চোখে জলের আভাস দেখা দিল।

"পূর্ব্ব-জীবনের কোন নিদর্শন কি তোমার ছিল না তাহলে? গলার ত্রিকোণাকৃতি সোনার পদক, ভিতরে ভূর্জ্জপত্রে কিছু লেখা, এমন কিছু? তিনি বোধ হয় তোমার আত্মীয়দের কোন সন্ধানের চেষ্টা করেন নি তেমন করে?"

"না, না। অনেক চেষ্টাই তিনি করেছিলেন বই কি। বহুকাল কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ কখনো আমার খবর নিতে আসে নি। হয়ত তাঁদের কেউ বেঁচেও ছিলেন না। নৌকো-ডুবিতে সকলেই বোধ হয় মারা গেছলেন। বাবা তাই অনুমান করে আমার অতীত আমায় জানতে দেন নি। তিনি না দেখলে, তাঁর অসীম যত্ন-চেষ্টা না পেলে সবাই বলে, আমারও বাঁচার কোন সম্ভাবনা ছিল না। হ্যাঁ, ত্রিকোণাকৃতি গলায় ছিল বই কি, ভূর্জ্জপত্রে লেখা—কিছু পড়া যায় নি—শুধু শর্ম্মা কথাটুকু জানা গেছল। তাই বাবা আমায় ব্রাহ্মণ বলে প্রচার করেন।"

গৌরীপতি অশ্রুসিক্ত চোখে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিয়া সিক্তকণ্ঠে কহিলেন, "সত্যই তিনি তোমার পিতাই ছিলেন। তাই তোমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করে নিজের করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তোমার হতভাগ্য জন্মদাতা সেই দুর্য্যোগের রাত্রে একমাত্র স্নেহের ধনকেও ঘরের ভিতর বন্ধ করে নিরাপদ রাখতে পারে নি—নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল!"

অরুণ সহসা সন্ন্যাসীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ব্যাকুলভাবে কহিল, "এ-সব কি বলছেন আপনি! কেন বলচেন আমায়? আমার বাবা? কে তিনি? কোথায় তিনি? আমার মনে হচ্চে, আপনি সব জানেন। আমায়

এ কি মনে হচ্ছে! যা কখনো হয় নি, তাই হচ্ছে। আর আর এ-সব আমি কি দেখচি! গাছের ছায়ায় ঢাকা একতলা বাড়া, পাশে পুকুর, মন্দির! বিগ্রহ—কি ঠাকুর? কালী? না, শিব? উঁহুঁ, রাশ রাশ ফুল দিয়ে ঘর সাজানো গোপাল মূর্ত্তি তুলসী-মঞ্চ। বায়স্কোপের মত এ কোন দেশের ছবি আমি দেখতে পাচ্চি! মন্দিরের ধারে কুর্চ্চি ফুলের গাছ, সাদা ফুলে সবটা ভরা, পাতা দেখা যায় না—" অরুণ তাহার স্বপ্নাভিভূত দৃষ্টি তুলিয়া পুনরায় কহিল, "জ্বলন্ত চিতা, দাহ হচ্চে—সে দেবীমূর্ত্তি,—আর তিনি? সেদিন যাঁকে আপনার সঙ্গে দেখে ছিলুম। আপনি আর তিনি—আমার কোন জন্মের কেউ কি? আমায় বলুন, বলুন আমায়—" অরুণের দেহ কাঁপিতেছিল।

গৌরীপতি অভিভূতপ্রায় অরুণকে বুকের খুব কাছে টানিয়া ব্যথা-বিজড়িত মৃদু স্বরে কহিলেন, "তোমার এ-জন্মেরই সন্তান-হারা অভাগা বাপ আমি। আর দুর্ভাগিনী —তিনি তোমার ঠাকুরমা। গোপাল! গোপাল! অরুণ বাবা আমার, চোখ চাও। মা যে তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন।, আমি বাপ হয়েও চিনতে পারিনি! তিনি যে একবার দেখেই কুড়ি বছর পরেও তোমায় চিনেছিলেন। মা আমায় ভোর হতেই এখানে পাঠিয়ে দিয়েচেন। বলেছিলেন, তুমি আজ এখানে নিশ্চয়ই আসবে। বাবা আমার, কথা কও বাবা! আজ তুমি আত্ম-সন্তপ্ত পরিচয়-হীন গৃহহারা,—আর আমি সর্ব্বহারা হয়েও সম্মানিত, গৃহী! হা জগদীশ্বর!"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

ফার্‌সী ফরাস*

প্রেমীদের নাকি এই রেওয়াজ—
প্রাণে প্রাণে হয় কথা-বলাবলি,
সে ভাষার নাকি নেই আওয়াজ!
তবে কেন মোর চোখের জলের
জবাব মেলে না কোনো দিনই,
মিছে কেঁদে মরি—আর্‌জি আমার
জানি গো সেথায় পৌঁছে নি!

———

বুলবুল গায় গুঞ্জরি'—
যা' কিছু শাখায় মুকুলিয়া ওঠে
প্রেম সে ত' নয়, সুন্দরি!
সে ত নয় সবই আশার কুসুম
যা' ওঠে লতায় মুঞ্জরি'

———

চাই না প্রণয়—চির-সৌহৃদ,
সেই ত' রহে না, সে যে গো বৃথায়!
আমি চাই শুধু ক্ষণিকের স্মৃতি—
নিমেষের দেখা, মধুর বিদায়!

———

শুধু এক পাক ঘুরিব দু'জনে
ফুলের বনে,
হাতখানি চেপে ধর একবার
অন্যমনে।
আবেশে অবশ দাও গো বারেক
আলিঙ্গন,
একটি সে চুমা—অধীর অধরে
আলিম্পন!
নিঠুর বিধিরে ফাঁকি দিয়া মোরা
এস গো সখি,
একটি নিমেষ উজলিয়া তুলি,
অমৃত ভখি!

* 'কলিকাতা-রিভিউ'—পত্রিকায় প্রকাশিত ফার্‌সী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে

তারাগুলি সব ওই চলে' যায়
অস্তপারে,
যাত্রীরা হবে এখনি বিদায়
অন্ধকারে !

গুল্‌শন্ চুমি' বুলে বুলবুল,
পোকা নাচে হের ঘেরি' চেরাগ !
কবিরা যা' বলে হাতে হাতে ফলে
আশকের হের কী অনুরাগ !
আপনা-আহুতি করিতে হোথায়
অন্ধ প্রেমীর মরণ-যাগ !

শয়ন তেয়াগি' উঠিনু যখন
আকাশে প্রথম ভোরের আলো,
নবীনা সাধ্বী প্রকৃতি-কুমারী
বুকে এল মোর—লাগিল ভালো !
কোমল পরশে জাগিল হরষ,
পাখীর কাকলী শুনি মধুর !
আমার মনে যে আন কথা আনে,
আমারে এরা যে করে বিধুর !
কাণে কাণে কয়—আয়ু ক্ষয় হয়,
সুখ শোভা সব অকিঞ্চিৎ !
আর সবই ঝুটা—ভাঙা আর ফুটা,
মৃত্যুই শুধু সুনিশ্চিত !

প্রেমে যে ব্যথা দেয় প্রেমিক হ'য়ে
কখনো সে ব্যথা যাবে না স'য়ে !
সান্ত্বনা নাহি রে !
হাত তা'য় বুলায়োনা,
জুড়াতে না চাহি রে !
আশাটি হত হ'লে যে-ক্ষত হয়—
ব্যথা সে চিরদিন সমানই রয় !
সান্ত্বনা নাহি রে !
হাত তায় বুলায়োনা
জুড়াতে না চাহি রে !

প্রেম যে আরাধনা—সুখ যে প্রীতি !
দুখ সে হবে তারি সাধন-রাত।

সুখ সুখ করে' মিছে ঘুরে ম'র'—
অরুচি আনে !
ধন-দৌলত ?—মন কভু তায়
তৃপ্ত মানে ?
জ্ঞানের সাধনা ভ্রম ঘুচা'ল না,
আঁধার তবু !
সন্তোষ-মধু শান্তি কোথায় ?—
কোথায় প্রভু !

বক্ষে বাজিছে আঘাত-চিহ্ন,
আতুল করিয়া গা' দিব কি ?
দুঃখ জানাব ? কাঁদিব কি ?
না গো, কাজ নাই ! বন্ধুর হাত
হানিল বক্ষে যেই আঘাত—
আতুল করিয়া তা' দিব কি !
যে-ব্যথা গুমরে আমারি এ মনে,
হয় ত' সে মিছা, জানাব কেমনে—
কাঁদিব কি।
হায় সখি !

কার তরে তুই ছেয়ে দিলি ভুঁই—
তুলিলি আকাশ ঘিরে'
উদ্ধত ওই গুম্বজগুলা
মস্‌জেদ-মন্দিরে ?
কার কাছে তুই জুড়িস দু'হাত,
জানু পাতি' পূজা কার ?
ধূম-কুণ্ডলী, ধূপের অর্ঘ্য—
কারে এ রক্তধার ?
কাঙাল-জনেরে বঞ্চিত করি'
অন্নহীনের গ্রাস
ভারে ভারে তুই যারে দিস্ সে যে
কিছুরই করে না আশ !

মাঝে মাঝে কেন মনে হয় হেন
যৌবন যেন ফিরে আসে !
সুখ অনন্ত, নব বসন্ত !—
বধূ-বেশে যেন ধরা হাসে !
সেই উৎসব, গত বৈভব
মানসে উদিছে কেন আজি ?
সেই মধুমাস সেই সুখহাস—
কেন সেই সুর ওঠে বাজি' ?
বুঝি দেয় দোলা কোন্ আধ্-ভোলা
মনোব্যথাখানি—তারি গীতি !
হরষ-অশ্রু, মুছে-আসা সেই
পুরাণো স্বপন—তারি স্মৃতি !

—

শুধু যৌবন ফিরে দাও, দেব !
ফিরে দাও, ফিরে দাও !
তাই পেলে মোরা চাহি না কিছুই,
আর যাহা আছে নাও !
যে চায় সে নিক্ তব কণ্ঠের
চির-মন্দার-মালা !
যে চায় সে নিক্ মুকুট তোমার
অমৃত-কিরণ ঢালা !

—

প্রেম করিয়াছি পড়েছে অনেক
দীরঘ শ্বাস,
দুখ পাইয়াছি—সহিয়াছি সে যে
বরষ-মাস।
ভাগ্যে কি আছে সে ভাবনা মোর
ছিল গো মনে,
ভয় ভরিয়াছে দিবারাতি মোর
দুঃস্বপনে !
তবু সহিয়াছে সকলি আমার
হে মনোরমা,
কেমন করিয়া—জানিতে চেয়ো না,
মিনতি তোমা !

—

চুলগুলি তোর কাকের পালক,
ঘাড়ের কাছটি বরফ-শাদা !
টুক্‌টুকে ঠোঁট লালা-ফুল যেন !
চোখ কি নরম—আদর-সাধা' !
পিয়ারী ! করিনু ধর্ম্ম শপথ—
এর একটিরো বদলে আমি
কায়কোবাদ আর কায়-খসরুর
চাই না মুক্তামণির গাদা !

—

এস এস বঁধু, শুধু ক্ষণতরে
বসি একাসনে তোমার সনে,
এস প্রাণসমা, এস প্রিয়তমা,
কুসুম তুলিব কালের বনে।
মনে মনে গাঁথি', মনে মনে পরি'
চাপিব দু'হাতে বুকের 'পর,
মরণের মহা উর্ম্মি এখনি
গ্রাসিবে সকলি, সহে না স্বর।

—

দুঃখের কথা কে আজ বলে !
ডুবে যাক্ দুখ পেয়ালা-তলে !
বুকে বাঁধি আয় সহেলি মোর,
খুলিব না আর এ বাহু-ডোর !
দুখ চিরদিন সাথেই আছে—
মানুষ বল্ ত' ক'দিন বাঁচে ?
কর্ জীবনের এ-সুধা-পান,
হাতে যতখন পেয়ালাখান !

শ্রীমধুব্রত।

বাহাদুর

বেনের দোকানে ধুনো কিনতে দাঁড়িয়েছিলাম। বাজার-বলা—খরিদ্দারের ভিড় জমে গিয়েছিল। কত লোক কত জিনিষ কিনতে এল—কিনে নিয়ে গেল। আমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, তাগিদ দিতে পারছিলাম না। সময়ের কোন তাড়া আমার ছিল না।

এক পাহারাওলা এসে দু-পয়সার মসলা চাইলে। একবার তার দিকে চেয়ে দোকানী জিজ্ঞাসা করলে—কি মসলা?

—রাঁধবার মসলা।

তারপর দু'চার জন খরিদ্দার ঠেকিয়ে পাহারাওলার দিকে চেয়ে দোকানী আবার জিজ্ঞাসা করলে—কি মসলা দিতে হবে, বল না?

—বলব আবার কি! সব মসলাই দেবে!

—দু'পয়সায় কি সব মসলা হয়?

—খুব হয়।

আরো জন-কয়েকের ফরমাশ মেটাতে মেটাতে হঠাৎ আমার উপর নজর পড়ায় দোকানী যেন একটু অপ্রতিভভাবে বললে,—এই দি আপনাকে। দেখচেন ত,হাত কামাই পাচ্চিনে।

আমি চুপ করেই থাকলাম। কিন্তু পাহারাওলা গর্জ্জন করে উঠল—দাও জলদি, কতক্ষণ দাঁড়াবো?

তার করুণ দৃষ্টি পাহারাওলার মুখের ওপর ফেলে বেনে শুধু আরম্ভ করছিল—দেখচ ত বাপু—কিন্তু সে ফুরসৎ না দিয়ে পাহারাওলা বলে উঠল,—দেখতে চাইনে আমি। আগে দাও আমায়—

—আচ্ছা, কি দেব? বল—

—কতবার বলব এক কথা! রাঁধবার মসলা দেবে।

দোকানী ততক্ষণে একখান বড় কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাতে এক-একটা জিনিষের মোড়ক করতে করতে হেঁকে বলে যেতে লাগল—জিরে, মরিচ, হলুদ—

—আরো দাও হলুদ—ঐ ক'খানায় কি হবে?

মোড়ক খুলে আরো খানকতক হলুদ তার মধ্যে দিয়ে আবার আগেকার মত দোকানী হাতের কাজ করতে করতে মুখে তার পরিচয় আউড়ে যেতে লাগল—ধনে, লঙ্কা—

—এ কি ছেলেখেলা পেয়েচ নাকি! ও দুটো মরচায় কি হবে?

—যে দাম লঙ্কার—ব'লে কিন্তু পাঁচ আঙুলে যে ক'টা ধরে, সেই ক'টা লঙ্কা আবার মোড়কের মধ্যে দিয়ে দোকানী জিজ্ঞাসা করলে,—এই ত সব হল—না, আরো চাই? তেজপাত টেজপাত?

—হাঁ, হাঁ—সব চাই।

—তেজপাত, মৌরি, পাঁচফোড়ন। গরম মসলাও ত দেব?

—গরম মসলা দেবে না?

—দু'পয়সায় কিন্তু বাপু এত হয় না।

দোকানী মুখে ঐ কথা বললে, শুনলাম, কিন্তু দেখলাম, একখানা কাগজে লবঙ্গ প্রভৃতি মুড়চে। পাহারাওলাও দেখছিল। তাকে কাগজ মুড়তে দেখে সে বলে উঠল—ছোট এলাচ দিলে না যে!

—দাম জানো ছোট এলাচের? আচ্ছা, এই দুটো দিলাম, বলে গোটা-কতক এলাচ সেই মোড়কের মধ্যে দিয়ে একটা বড় ঠোঙায় সব মোড়কগুলো পুরে পাহারাওলার দিকে এগিয়ে ধরে বললে—নাও, পয়সা দাও।

পাগড়ির মধ্যে থেকে পয়সা বার ক'রে দোকানীর দিকে সেই দুটো ছুড়ে দিয়ে ঠোঙা-হাতে পাহারাওলা শেষে চলে গেল।

পয়সা দুটো বাক্সে রাখতে রাখতে আমার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় বেশ একটু অপ্রতিভ-ভাবে বেনে বলে উঠল—আপনার কি দেব, বলুন ত? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন আপনি—

—ধুনো আধ সের।

দাঁড়ির দিকে চেয়ে যেন আপন মনেই বেনে তখন বলে যেতে লাগল—কনেষ্টবল ব'লে ভেবেচেন, ওঁকে দেব সব-আগে! সেটী হবার যো নেই আমার কাছে, কিন্তু—

অতঃপর আমার হাতে ধুনো দিতে দিতে সে আবার বললে—দেখলেন ত বাবু আপনি—কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম ওকে। ভারী ত কনেষ্টব্‌ল্—

লোকটী আরো কি বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমি ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়লাম।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে

পৃথিবীর এই প্রাচ্য জাতিদের মধ্যে যে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল তাহা মিশরের ইতিহাস-প্রণেতারা সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নব অভ্যুদিত আমেরিকার উৎসাহী প্রত্নতত্ত্ববিদগণ জগতের সেই প্রাচীনতম সভ্যতার ক্ষেত্র মিশরে উপস্থিত হইয়া চারি পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার বিস্মৃত মিশর সভ্যতার বহু বিলুপ্ত গৌরব-চিহ্ন আজ মৃত্তিকা-গহ্বর অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতেছেন।

প্রাচীন গৃহের ভগ্নাবশেষ
(উপরে উঠিবার সিঁড়ি সংযুক্ত)

গৃহ-দেবতার মূর্ত্তি

প্রথমেই তাঁহারা মিশরের প্রাচীনতম পল্লী 'লিষ্ট' অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই লিষ্ট প্রদেশেই জগতের বৃহত্তম সমাধি-মন্দির পীরামিড নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ২০০০ সালে অর্থাৎ প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশর নৃপতি প্রথম আমেনেম্হাত এইখানে তাঁহার বিশ্ববিদিত সমাধি-স্তূপ পীরামিড নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি তাঁহার নূতন অধিকৃত রাজ্যের উত্তর-সীমান্ত প্রদেশ উত্তমরূপে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার রাজধানীটি 'থীব্স্' হইতে 'ফেয়ুমের' নিকটবর্ত্তী কোনও স্থলে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিবার জন্য বাহির

কেরাণী

তোলবার জন্যে, তারা দলবল নিয়ে হৈ হৈ ক'রে ছুটে এসেচে।

শি। তারা কারা?

রু। মানুষ। তাদের সঙ্গে আছে যন্ত্র-রাক্ষস।

রাজপুত্র বল্‌লে—আমি যন্ত্র-রাক্ষসকে বধ করতে চাই, কিন্তু মা আমাকে বারণ কর্‌চেন।

শি। বাছা, তাকে তুমি বধ করতে পারবে না। মানুষ সে কাজ একদিন নিজেই করবে।

রা। কিন্তু মানুষ যে যন্ত্র-রাক্ষসের বন্ধু!

শি। হ্যাঁ। কিন্তু এ বন্ধুত্ব চিরদিনের নয়। মানুষ আজ তার বন্ধু—কারণ মানুষই এখন তাকে চালাচ্ছে। কিন্তু শীঘ্রই পৃথিবীতে এমন দিন আসবে, যে-দিন যন্ত্র-রাক্ষসই মানুষের চালক হয়ে উঠবে। সেদিন মানুষের মোহ কেটে যাবে, তার প্রাণ বিদ্রোহী হবে। যন্ত্র-রাক্ষসের বিষ-দাঁত মানুষ নিজেই সেদিন ভেঙে দেবে।

রু। কিন্তু খালি আমাকে মারতে নয়—যন্ত্র-রাক্ষসকে নিয়ে মানুষ যে এই কৈলাস-পুরীও দখল করতে ছুটে আস্‌চে!

শি। কি ক'রে জানলে? মানুষের এত সাহস হবে না!

রু। আমরা সকলে স্বচক্ষে দেখে আস্‌চি।

রা। এতক্ষণে তারা মানস-সরোবরের পথে এসে পড়েচে!

শিবের তৃতীয় নেত্র আস্তে আস্তে ডাগর হয়ে উঠতে লাগল। বিস্মিত স্বরে বল্‌লেন—এতদূরে তারা এসেচে?

রু। হ্যাঁ,—মানুষ আর যন্ত্র-রাক্ষস।

শি। আমার এই কৈলাস-পুরী অপবিত্র করবে—এত বড় সাহস কি তাদের হবে?

রা। তারা নাকি বলচে যে, এই কৈলাস-পুরীর টঙে তারা বিজয়-নিশান পুঁতে দিয়ে যাবে!

শিব গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—নন্দী, কৈলাসের চুড়োয় উঠে দেখ তো, কারা এদিকে আস্‌চে!

কৈলাসের মেঘ-ভেদী সর্ব্বোচ্চ শিখরের উপরে উঠে নন্দী একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে। সেখান থেকে পৃথিবীর সবুজ বুক পর্য্যন্ত শূন্যতার অবাধ বিস্তার।

নন্দী তাড়াতাড়ি নেমে এসে ব্যস্ত-ভাবে বল্‌লে,—আজ্ঞে বিষম বিপদ!

শিব অধীর ভাবে জটা-নাড়া দিয়ে বল্‌লেন—বিপদ! আমার আবার বিপদ! কি দেখ্‌লি, আগে তাই বল্!

ন। আজ্ঞে, দেখলুম—মানস-সরোবরের জলে লীলা-কমল সব শুকিয়ে গুটিয়ে গেছে, মরালরা আর জলকেলি করচে না, দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর আর অপ্সর-বালারা কি-এক অজানা বিপদের ভয়ে ঘাট থেকে উঠে দলে দলে পালিয়ে যাচ্চে। চারি তীরে তরু-কুঞ্জে আর বসন্তের লীলা নেই, তাদের শ্যাম-শ্রীর ওপরে কালিমার গাঢ় ছায়া নেমেচে, ফল-ফুল সব খসে পড়েচে, ভ্রমর আর প্রজাপতিরা মূর্চ্ছিত হয়েচে, কোকিলরা সব দেশ ছেড়ে উড়ে গেছে।

শিবের তৃতীয় নেত্র ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল। নন্দী ভয়ে ভয়ে সুমুখ থেকে স'রে দাঁড়াল। মনে মনে বল্‌লে—কি জানি বাবা, ও আগুন-চাউনির একটা ফিনিক্ গায়ে লাগলে আর তো রক্ষে নেই—একেবারে মদন-ভস্ম হয়ে যাব!

শিব রুক্ষ স্বরে বল্‌লেন—আর কি দেখ্‌লি?

ন। আকাশ-গঙ্গার স্রোত আকাশেই স্তম্ভিত হয়ে আছে, ভয়ে আর নীচে নামতে পারচে না।

শি। গঙ্গা—গঙ্গা—আমার গঙ্গাও ভয় পেয়েচেন! আচ্ছা, আর কিছু দেখ্‌লি?

ন। আর দেখলুম—দূরে, মানস-সরোবরের পথে একখানা উড়ো-রথ—তার সারথি মানুষ। বরফেরও উপর দিয়ে আসচে দলে দলে মানুষের পর মানুষ।

শিব তাঁর চক্‌চকে ত্রিশূলের দিকে সুদীর্ঘ বাহুবিস্তার ক'রে উদ্যত বজ্রের মতন প্রদীপ্ত নেত্রে, সমুদ্র-গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—মানুষ? ভালো ক'রে দেখেছিস্?

ন। আজ্ঞে হ্যাঁ,—ফিরিঙ্গি!

ত্রিশূলে ভর দিয়ে শিব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার জটাজুট, গলার হাড়ের ও সাপের মালা এবং কোমরের বাঘ-ছাল লটপট ক'রে দুলতে লাগল। নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে আকাশ-বাতাস চমকে দিয়ে এবং

কৈলাসের শিখরের পর শিখরে প্রতিধ্বনির আর্ত্তনাদ জাগিয়ে তিনি বল্‌লেন—মানুষ! কৈলাসের ওপরে মানুষের আক্রমণ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! পাথরের শিব দেখে তারা কি ভেবেচে—সত্যি-সত্যিই আমি অম্‌নি প্রাণহীন? তারা কি ভুলে গেছে—আমিই বিলয়-কর্ত্তা? এই এক লাথিতে সারা পৃথিবীটাকে গাঁজার কল্‌কের মত গুঁড়িয়ে, এক ফুঁয়ে ধুলোর মত আমি শূন্যে উড়িয়ে দিতে পারি, তারা কি তা জানেনা? বটে! আচ্ছা—দেখুক্ তবে!—শিব প্রচণ্ড বেগে তাঁর দক্ষিণ পদ উপরে তুল্‌লেন।

পার্ব্বতী প্রমাদ গণে তাড়াতাড়ি শিবের পা চেপে ধ'রে বল্‌লেন—প্রভু, প্রভু! লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেবেন না!

শি। লঘুপাপ! কৈলাসে মানুষের আক্রমণ!—একি লঘুপাপ? পার্ব্বতী, তুমি বল কি? এ চিন্তাও যে অসহ্য!

পা। প্রভু, মানুষ অবোধ জীব—এ যাত্রা সামান্য দণ্ডেই তাদের চোখ ফুটিয়ে মুক্তি দাও।

রু। দেবাদিদেব, অবিশ্বাসীদের জন্যে আমার ভক্তরাও কেন দণ্ড-ভোগ করবে? পৃথিবী ধ্বংস হ'লে আমার ভবিষ্যতের আশা দাঁড়াবে কোথায়?

পা। পৃথিবীতে তোমারও তো ভক্ত আছে। বিনা-দোষে তাদের ওপরেও দণ্ড দেবে কেন প্রভু?

শিব আপনাকে কতকটা সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন—আচ্ছা, এ যাত্রা নির্ব্বোধগুলোকে অল্পে-অল্পেই ছেড়ে দিচ্ছি। প্রভঞ্জন!

প্রভঞ্জন এসে শিবের চরণে প্রণাম ক'রে জোড়-হাতে দাঁড়াল।

শি। প্রভঞ্জন! তোমার উনপঞ্চাশ বায়ুকে এখনি মানস-সরোবরের পথে পাঠিয়ে দাও—তুষারের ঝড় উঠুক্—তুষারের স্তূপ ধ্বসে পড়ুক্—হিমাচলের বুক দুপ্‌দুপিয়ে কাঁপ্‌তে থাকুক্—তুচ্ছ মানুষের বাচালতাকে ক্ষণিক স্বপ্নের মত ধুয়ে-মুছে লুপ্ত ক'রে দিক্!

প্রভঞ্জন তখনি লাফাতে লাফাতে ছুটে চ'লে গেল।

শি। নন্দী, তুমি আর একবার কৈলাসের শিখরে উঠে দেখ।

শিব আবার বাঘের ছালের উপরে স্থির হয়ে বস্‌লেন—নিবিড় মেঘে যেমন জ্বলন্ত সূর্য্য ঢেকে যায়, তাঁর অগ্নি-বর্ষী তৃতীয় নেত্র তেম্‌নি ধীরে ধীরে আবার ছাই-মাখা চোখের পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়্‌ল।

কৈলাসের শিখরে শিখরে অকস্মাৎ প্রভঞ্জনের ভৈরব হুঙ্কার ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে উনপঞ্চাশ বায়ু অন্ধকার গিরি-কন্দর থেকে ছাড়ান্ পেয়ে, হুড়মুড় দুড়দুড় ক'রে পিঞ্জর-খোলা দুর্দ্দান্ত বন্যের মত নীচে নেমে গেল, তাদের নির্দ্দয় পদাঘাতে হিমাচলের বিপুল ললাট থেকে তুষারের বৃহৎ স্তূপ সব চারিদিকে খসে খসে পড়তে লাগল—বহু যুগের শীতল নিদ্রার অনাহার থেকে জেগে উঠে, তুষার-স্তূপেরা যেন সাক্ষাৎ ক্ষুধিত-মৃত্যুর মত মানস সরোবরের ঢালু পথ ধ'রে, ক্রুদ্ধ আবেগে গড়াতে গড়াতে ছুটতে সুরু করলে!

মরণের পূতি গন্ধ পেয়ে, শিবের চ্যালা জীবন্ত তিমির-মূর্ত্তির মত ভূত-প্রেতরা ঊর্দ্ধবাহু হয়ে নাচতে নাচতে, বিকট 'হর-হর-শঙ্কর' চীৎকারে কৈলাসপুরী থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

শিব মনের খুসিতে একবার ডম্বরুটা ডিমি ডিমি বাজিয়ে নিয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে বল্‌লেন—ব্যোম্, ব্যোম্, ব্যোম্! অনেক দিন পরে এই খণ্ড-প্রলয়ের সূচনা দেখে, আমারও পাদুটো আজ তাণ্ডবে মাত্‌বার জন্যে উস্‌খুস্ ক'রে উঠচে!

পার্ব্বতী বল্‌লেন—ঢের হয়েচে, থামো। বুড়ো-বয়সে আর নাচের সখে কাজ নেই!

আকাশ-পটে আঁকা ছবির মত, হিমালয়ের সব-উঁচু শিখরের টঙে, ততক্ষণে নন্দীও ত্রিশূল ঘুরিয়ে নাচ লাগিয়ে দিয়ে বলচে—ব্যোম্ ভোলানাথ! ব্যোম্ ভোলানাথ! ব্রাভো প্রভঞ্জন! কতক মলো—কতক পালালো—পথ একেবারে সাফ্! যাদুরা ঘুঘু দেখেচ, ফাঁদ তো দেখনি!—এইবার দেখ! ব্রাভো—ব্রাভো! ক্যা-পি-ট্যা-ল! এখনি থাম্‌ল কেন—এন্‌কোর!

শি। আমিও একবার ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আস্‌ব না কি?

পা। না, না—তাও কি হয়! তোমার কি আর

ডাংপিটে-গিরি করবার বয়স আছে গা? বরফে পা হড়্‌কে পৃথিবীর গর্ত্তে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে যাবে যে!

পাঁচ

মানস-সরোবর।

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগর-পুত্র আগে আগে আস্‌চেন—পিছনে রূপকথা।

রা। কি চমৎকার রাত!

ম। প্রকৃতি যেন রূপের ধ্যানে বসেচে।

কো। মানস-সরোবরে চাঁদের হাসি ফুটে উঠেচে!

স। গাছে গাছে আবার সবুজ পাতা গজিয়েচে, রাঙা রাঙা ফুল-ফল ফুটেচে, বসন্ত আবার কোকিলের গানের সঙ্গে দখিন হাওয়ার বেহালায় সুর মেলাচ্চে!

র। এম্‌নি এক রাতেই ঘুম-পুরীর রাজকন্যার সঙ্গে আমার প্রথম চোখে-চোখে মিল হয়!

ম। হায়রে, পৃথিবীতে বেলবতী-কন্যা আজ যদি আমাকে তার পাশটিতে পেত, তবে কি খুসিটাই যে হতো!

কো। আজ পৃথিবীতে থাক্‌লে, এমন সুখের রাতে আমি চোর-টোর ধর্‌লেও তখনি বেকসুর খালাস দিতুম।

ম। আমার সাধ হচ্চে, মানস-সরোবরের অথই অপার রূপোলি জলে সাতখানা ডিঙা সাজিয়ে ভেসে যাই, আর জ্যোৎস্নার কাণে কাণে সারা রাত চুপিচুপি মনের কথা কই।

রা। বাছারা, দেবাদিদেবের অনুমতি পেয়েচি, আজ থেকে আমরা এই মানস-সরোবরের তীরেই বাস করব।

রা। তাহলে আর আমাদের নীচের সেই গুহাতে ফিরতে হবে না?

রূ। না—যন্ত্র-রাক্ষসের ছায়ায় সে স্থান অপবিত্র হয়েচে। সেখানে আর আমাদের ঠাঁই নেই।

আর সকলে। আঃ, বাঁচা গেল, আর শীত ভুগে মর্‌তে হবে না!

রূ। ঐ যে রাঙা ফুলের কুঞ্জটি রয়েচে, আমি এখন ঐখানেই চল্‌লুম।

রা। কেন মা?

রূ। ঘুমুতে।

রা। আবার ঘুম?

রূ। জেগে জেগে কষ্ট সওয়া যে বড় দায় বাছা!

রা। এবারে কত দিন পরে আবার জাগ্‌বে?

রূ। যতদিন না যন্ত্র-রাক্ষসের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ মাথা-চাগাড় দেয়।

রা। তারপর?

রূ। তারপর আবার আমাদের দিন ফিরে আস্‌বে—কবিত্বের দিন, কল্পনার দিন, পরীর স্বপনের দিন। মানুষের বুকটা সেদিন আর কঠোর গদ্যের পাথরে চাপা থাক্‌বে না—সেখানে জেগে উঠবে সুরের ছন্দ, পারিজাতের গন্ধ আর রূপের আনন্দ!

রা। সেদিন আবার আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাব?

রূ। হ্যাঁ।

রা। আবার তেপান্তরের মাঠে আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটবে? আবার আমি ঘুমপুরীতে যাব? আমার সোনার কাঠি খুঁজে পাব?

ম। বেলবতী কন্যা আমাকে দেখে সুখে কেঁদে ফেল্‌বে?

কো। মানুষ আবার আমাদের আদর করবে?

স। সাত ডিঙা নিয়ে আবার আমি কমলে-কামিনীকে খুঁজ্‌তে বেরুব?

রূ। হ্যাঁ বাছা, তোদের সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। মানুষ তোদের পেলে বর্ত্তে যাবে। বুঝ্‌বে, তোদের নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে এতদিন তারা কি ভুলই করেছিল।

রা। সে আর কতদিন—আর কত দিন!

রূ। জানি না। আমি আর দাঁড়াতে পারচি না, ঘুম আমাকে ডাক দিয়েচে, আমার চোখ ঢুলে আস্‌ছে, আমি ঘুমোতে যাই—ঘুমোতে যাই!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ভিখিরী

একাকী সহায়-সঙ্গতি-হীন,
দ্বারে দ্বারে দ্বারে ফিরি প্রতিদিন,
মাগিয়া ভিক্ষা ছিন্ন মলিন
বসনে ;
কেহ দেয় কিছু করুণা করিয়া
কেহ যায় দূরে ঘৃণায় সরিয়া,
অপমানে যাই মরমে মরিয়া ;
নয়নে
উথলিয়া ওঠে অশ্রুর ধার,
প্রাণে ব্যথা বাজে লাগে ধিক্কার,
কেন গো মরণ—ভিখিরী যে—তার
হয়না ?
হয়না মরণ, কী কঠিন জান !
এত লাঞ্ছনা, এত অপমান
সয়ে বেঁচে আছি, আর ভগবান
সয়না !
দেখে মোরে লোকে সন্দেহে চায়,
থালা ঘটি বাটি ভয়ে সামলায়,
চলে গেলে তবু পিছনে তাকায়
পিছনে ;
ঘুরে ফিরে পাছে আসি যদি আমি,
চুরি করে নিই কোন কিছু দামি,
ঘড়ি কি আংটি সোনার বোতামি
বিজনে ;
উপবাসী থেকে শুধু খালি পেটে
কত দিন রাত যায় মোর কেটে,
ঝর ঝর জল পড়ে আঁখি ফেটে,
তবুও
হয়না মরণ, কী কঠিন জান !
তুমিও কি ফেলে দিলে ভগবান ?
মুছিবেনা জ্বালা—পাবনা কি প্রাণ
কভুও ?

হাত পা রয়েছে খেটে-খুটে খাও,
কেন দিক্ কর, মিথ্যে জ্বালাও ?
হবে না এখানে পাই-পয়সাও—
বলিয়া
কত শত জন হায় হাঁকাইয়া,
কর্কশ স্বরে ঘাড় বাঁকাইয়া,
আসি তাহাদের পানে তাকাইয়া
চলিয়া ;
হয়েছে ওষুধ, ভিখ দিতে নাই—
এইরূপ শুনি কত অছিলাই ;
ধনীর দুয়ারে যদি কভু যাই
মাগিতে,
আধা বাংলায় আধা হিন্দিতে,
দরোয়ান খাড়া থাকে গালি দিতে,
লাঠি দেখাইয়া বলে ইঙ্গিতে
ভাগিতে।
হয়েছি পথের কাঙাল এখন,
চিরকাল কিছু ছিল না এমন,
ঘর-সংসার প্রিয়-পরিজন
ছিল গো !
ছিল গো সকলি যমে নিল লুটে,
জমি-জমা-জোত দেইজীতে জুটে
করে ছারখার দিল ছিঁড়ে কুটে,
দিল গো !
এই আমারেও বাবা বাবা ব'লে
আসিত ছুটিয়া ঝাঁপ দিয়া কোলে
সোনার পুতলি ; উবে গেল গ'লে
বাতাসে !
এই আমারেও ছিল একজন,
সঁপেছিল তার তনু-প্রাণ-মন,
হায় সে আমার কোথায় এখন ?
কোথা সে !

ছিনু বাপ-মার আদরের ছেলে,
কেটেছিল কাল শুধু হেসে খেলে,
প্রজাপতিসম খালি ডানা মেলে
উড়েছি,
ফুলে-ফুলে ফুলে পাতায় পাতায়,
নেচেছি হাসির ঢেউএর মাথায়,
এবে নিয়তির চাকার তলায়
পড়েছি!
ভাগ্যহীন ও লক্ষ্মীছাড়ার
শুনিবে কাহিনী? কী শুনিবে আর?
জেনে রেখো এই দুনিয়ার সার—
রুপিয়া!
ও চিজ্ তোমার থাকিলে প্রচুর,
হবেনা অভাব কভু বন্ধুব,
লইবে তোমারে হাসিয়া মধুর
লুফিয়া!
নচেৎ তোমারে পায়ের তলায়,
থেঁত্‌লাবে সবে দারুণ হেলায়,
এক ফোঁটা জল মরে যাও ঠায়,
পাবে না,
আর জেনো এই মানব-প্রণয়
পুরোপুরি ঝুটো, খাঁটি অভিনয়!
কেউ তারে, যারে ভাগ্য নিদয়,
চাবে না!
একেবারে আমি দাঁড়াই নি পথে,
ক্রমশঃ ভেসেচি অবনতি-স্রোতে,
চেষ্টা করেচি যদি কোন মতে
অকূলে

কূল পেতে পারি কারেও ধরিয়া,
সবাই গিয়াছে ঘৃণায় সরিয়া,
ডেকেচি কাঁদিয়া কাতরে সাধিয়া—
নে তুলে!
কতবার মনে ভাবিয়াছি তাই,
ভিখিরীর ঠাঁই দুনিয়ায় নাই,
জঞ্জাল তারা আপদ বালাই
সমাজে;
অতএব দাও তাদের পুলিশে,
চর্ম্মে তাদের কালো মিশ্‌মিশে
যাবতীয় রোগ-বীজাণুর বিষে
ভরা যে!
কতবার মনে ভাবিয়াছি, চুরি
করি কারো টাকা বুকে মেরে ছুরি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নেইক কিছুরি
ভিত্তি;
নেই ঈশ্বর, নেই পরকাল,
প্রহেলিকা এই সৃষ্টির জাল,
অন্ধ জড়াণু-রচিত বিশাল
পৃথ্বী!
ক্ষমিও না প্রভু, ক্ষমিও না মোর
তোমা পরে এই সন্দেহ ঘোর,
চুরি-না-করিয়া-মনে-মনে-চোর
পাপীকে,
দাও গো শাস্তি যত তুমি পারো,
মেরেছ ত প্রভু, আরো মারো, আরো,
আমিই হারি কি তুমি প্রভু হারো
দেখি কে!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

ডিটেক্‌টিভ মবকুমার

খুস্ খুস্, খুট্ খুট্ !

মস্ত-বড় পালঙে হরপ্রসাদ আর তাঁর স্ত্রী ভুবনমোহিনী নিদ্রিত ছিলেন। ভারি রাত্রি। কেউ কোথাও জেগে নেই। মস্ত বাগানওয়ালা বাড়ী, ফটকের সাম্‌নে পুষ্করিণী তক্ তক্ করচে, জলে তারা জ্বলচে। চাঁদ নেই, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। চারিদিকে বেশ নিস্থুতি, মাঝখান থেকে হঠাৎ ভুবনমোহিনীর ঘুম ভেঙে গেল।

খুস্ খুস্, খুট্ খুট্ !

"রাত্রে ইঁদুরের জ্বালায় ঘুমোবার জো নেই," আপনার মনে এই কথা ব'লে ভুবনমোহিনী পাশ ফিরে শুলেন। তাঁর একটু সজাগ ঘুম, কিন্তু হরপ্রসাদের প্রায় এক ঘুমেই রাত কেটে যায়। তাঁর অল্প অল্প নাক ডাক্‌ছিল, এ-রকম একটু-আধটু শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙে না।

খুস্ খুস্, খুট্ খুট্ !

এবার ভুবনমোহিনীর ঘুম একেবারে ভেঙে গেল। কিসের শব্দ? এ ত ইঁদুরের শব্দের মত নয়! ইঁদুর ত এত সাবধানে শব্দ করে না, এ-ভাবেও করে না! আর ইঁদুরের সে কুটুর্ কুটুর্ শব্দ ত শুন্‌তে এ-রকম নয়! ভুবনমোহিনী কান পেতে শুন্‌তে লাগ্‌লেন।

খুস্ খুস্, খুট্ খুট্ !

ভুবনমোহিনী ভয়-তরাসে মেয়েমানুষ নন, মিছামিছি একটা গোলমাল সহজে করেন না। স্বামীর গায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ঠেল্‌লেন। হরপ্রসাদ ঘুমের ঘোরে বল্‌লেন, "আর একদিন আস্‌তে বল, আজ সময় নেই।"

ভুবনমোহিনী তাঁর মুখে হাত চাপা দিলেন। তখন হরপ্রসাদের ঘুম ভেঙে গেল, চোখ মেলে দেখেন, ভুবনমোহিনী নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আছেন। হরপ্রসাদের চক্ষে একটা প্রশ্ন, কি হয়েচে?

ভুবনমোহিনী তাঁর কাণের গোড়ায় মুখ নিয়ে গিয়ে একটি কথা বল্‌লেন, "শোনো।"

খুস্ খুস্, খুট্ খুট্।

সে শব্দে হরপ্রসাদ একেবারে পুরো জেগে উঠ্‌লেন। আর একবার শুনে ভুবনমোহিনীর কাণে কাণে বল্‌লেন, "বাড়ীতে মানুষ!" ভুবনমোহিনী একটুখানি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

আস্তে আস্তে হরপ্রসাদ খাটে উঠে বস্‌লেন। ভুবনমোহিনীও সেই সঙ্গে উঠ্‌লেন। হরপ্রসাদ আবার তাঁর কাণে কাণে বল্‌লেন, "ভয় পেওনা, আমি উঠ্‌চি।"

ভুবনমোহিনী সেই রকম কোরে হরপ্রসাদের কাণে কাণে বল্‌লেন, "আমি ভয় পাই নি। তুমি একলা যেও না।"

"না, আগে ঘনশ্যামকে ডাকি।" ঘনশ্যাম তাঁদের জামাই, পাশের ঘরে মেয়ে-জামাই ঘুমুচ্চে।

হরপ্রসাদ পায় চটি দিলেন না, শুধু পায় উঠে গিয়ে জামাইয়ের ঘরের দরজা ঠেল্‌লেন। খুস্ খুস্ খুট্ খুট্ কোরে যে শব্দ হচ্চিল তার চেয়েও আস্তে। দুবার দরজা ঠেল্‌তেই দোর নিঃশব্দে খুলে বেরিয়ে এল হরপ্রসাদের মেয়ে মায়া। বাপের মুখে আঙুল দেখে সে চুপ কোরে রইল। আবার যখন সেই রকম শব্দ হ'ল তখন হরপ্রসাদ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কিসের শব্দ?" মায়া বল্‌লে, "মানুষের। বাড়ীতে লোক ঢুকেছে।"

"আমাদেরও তাই মনে হয়। চুপি চুপি ঘনশ্যামকে ডাক।"

মায়া বিনা শব্দে নিজের ঘরের ভিতর থেকে ঘনশ্যামকে ডেকে নিয়ে এল। ঘনশ্যাম শব্দ শুনে বল্‌লে, "দোতালায় যে ঘরে আপনার লোহার সিন্দুক আছে, সেই ঘরে শব্দ।"

হরপ্রসাদ সংক্ষেপে বল্‌লেন, "হাঁ।"

মায়ে-ঝীয়েও তাই বল্‌লেন। কারুর মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই, কেউ একটা কথা চেঁচিয়ে বলে নি।

ঘনশ্যাম নিজের ঘর থেকে একটা মোটা লাঠি নিয়ে এল। বল্‌লে, "আমি নেমে যাচ্চি, ডাক্‌লে আপনারা আস্‌বেন।"
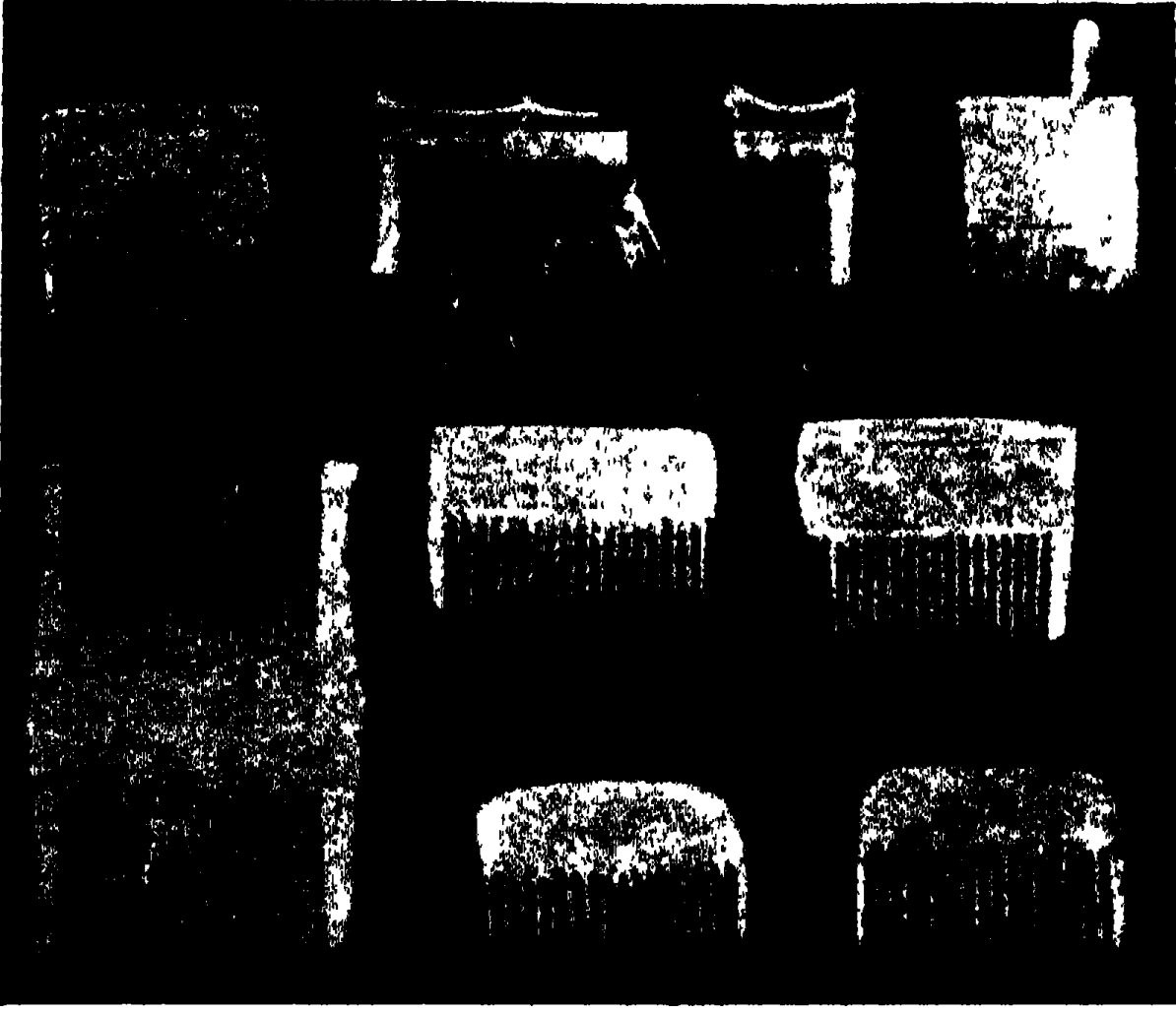
৪। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে কেশপ্রসাধনের জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চিরুণী

হইয়া তিনি উক্ত 'লিষ্ট' প্রদেশটি তাঁহার সমাধি-মন্দির স্থাপনের জন্য মনোনীত করেন। কিন্তু স্থাপত্য-বিদ্যা-বিশারদেরা পরীক্ষা করিয়া উক্ত স্থানটি অত বড় মন্দির নির্ম্মাণের পক্ষে উপযোগী নহে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তথাপি নৃপতি আমেনেম্হাত তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য সত্বর ঐস্থানে তাঁহার সমাধি স্তূপ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু স্থপতিগণের আশঙ্কা যে অমূলক নহে, পীরামিডের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগ শীঘ্রই হেলিয়া পড়িয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিল। এইজন্য সমাধি স্তূপের নিকটেই পীরামিডের মত একটি বিরাট ও উচ্চতর মন্দির নির্ম্মাণ করিবার তাঁহার যে অভিলাষ ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট ও অনতি-উচ্চ মন্দির গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

আমেনেম্হাতের মন্দির ও সমাধি স্তূপ যেখানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, অনুমান সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেখানে যাঁহাদের বসতি ছিল তাঁহারা অর্দ্ধ-যাযাবর মানব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন বংশ বা গোষ্ঠীগত বিভাগ স্থাপিত হয় নাই। তাঁহাদের সেই প্রাচীনতম আবাস-পল্লীর কোন চিহ্নই আজ আর দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদ্গণের সংগৃহীত কতকগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত তৈজস ও মৃৎপাত্র সমূহের চুর্ণাবশেষ হইতে উহার অস্তিত্বের বহু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

নৃপতি প্রথম-আমেনেম্হাতের মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারী নৃপতি প্রথম-সেনুশার্টও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমেনেম্হাতের সমাধি স্তূপ হইতে প্রায় সার্দ্ধ এক মাইল দূরে নিজের জন্য একটি বৃহত্তর পীরামিড নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ক্রমে এই দুইটি পীরামিডকে বেষ্টন করিয়া রাজপরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণের, বিশিষ্ট রাজসভাসদ ও উচ্চরাজকর্ম্মচারীগণের সমাধিস্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে তাঁহাদেরও পরিবারবর্গ অনুচর ও ভৃত্যগণের এবং এক এক করিয়া পর্য্যায়ক্রমে দ্বাদশটি নৃপতির সমাধি এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ বংশধর অনুচর ও ভৃত্যগণের কবর বেদীতে ঐ পীরামিডের চারিপার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান একেবারে ছাইয়া গিয়াছিল।

৫। নগরাধ্যক্ষ ৬। রমণী-মূর্ত্তি

৭। গজদন্ত নির্ম্মিত কুম্ভীর

প্রথম-আমেনেম্‌হাতের পর হইতে মিশরের দ্বাদশ নৃপতির শাসনকালে দেশের রাজশক্তির অধঃপতন সুরু হইয়াছিল। রাজনৈতিক গোল-যোগের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দ্দিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লুটপাট হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে চতুর্দ্দশ নৃপতির শাসন-কালে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া-ছিল। সেই সময় মিশরের ঐ বিরাট ভূত তীর্থ ওই সুবিস্তৃত সমাধি অরণ্যে পাহারা দিবার কোন ব্যবস্থাই ছিলনা। কবর-লুণ্ঠনকারী দস্যু ও অসৎ প্রস্তর-ব্যবসায়ীরা সেই সময় এখানে যদৃচ্ছা লুট ও চুরি চালাইয়াছিল।

৮। চারিটি মুখ
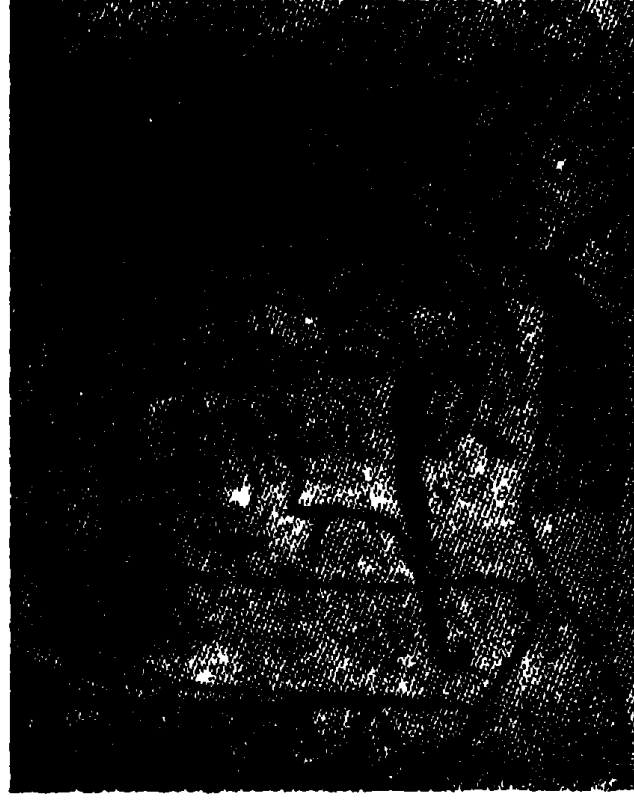
কিছুদিনের মধ্যেই এই ধ্বংসোন্মুখ সমাধি-ক্ষেত্রের উপর একটি প্রকাণ্ড পল্লী সহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ দুঃসাহসী প্রস্তর-ব্যবসায়ীদের মধ্যে দু'একজন তাহাদের কাজের সুবিধার জন্য সর্ব্বপ্রথম এইখানে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরে তাহাদের দেখাদেখি একে একে আরও অনেকে আসিয়া তাহাদের প্রতিবাসী হইতে লাগিল, এবং ক্রমে ঐ বিশাল সমাধি-ক্ষেত্রের সমস্ত উত্তর-প্রান্ত জুড়িয়া এই ভূতপল্লীটি একটি বিশিষ্ট সহরে পরিণত হইয়া উঠিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে হাজার বৎসরের মধ্যেই এই সমাধি ক্ষেত্রোদ্ভূত পল্লী সহরটীর যা-কিছু লীলাখেলা সব শেষ হইয়া গিয়াছিল। মিশরীয় পুরাতত্ত্বের ইতিহাসেও সমাধি ক্ষেত্রের উত্তর প্রান্তের এই পল্লী সহরটীর যা-কিছু বিবরণ এইখানেইশেষ হইয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি আমেরিকার প্রত্নতত্ত্ববিদ-গণের উৎসাহে এই লুপ্ত পল্লীর উদ্ধার হইতেছে। তাঁহারা মিশর নৃপতিগণের

৯। একটি মূর্ত্তির মুখ
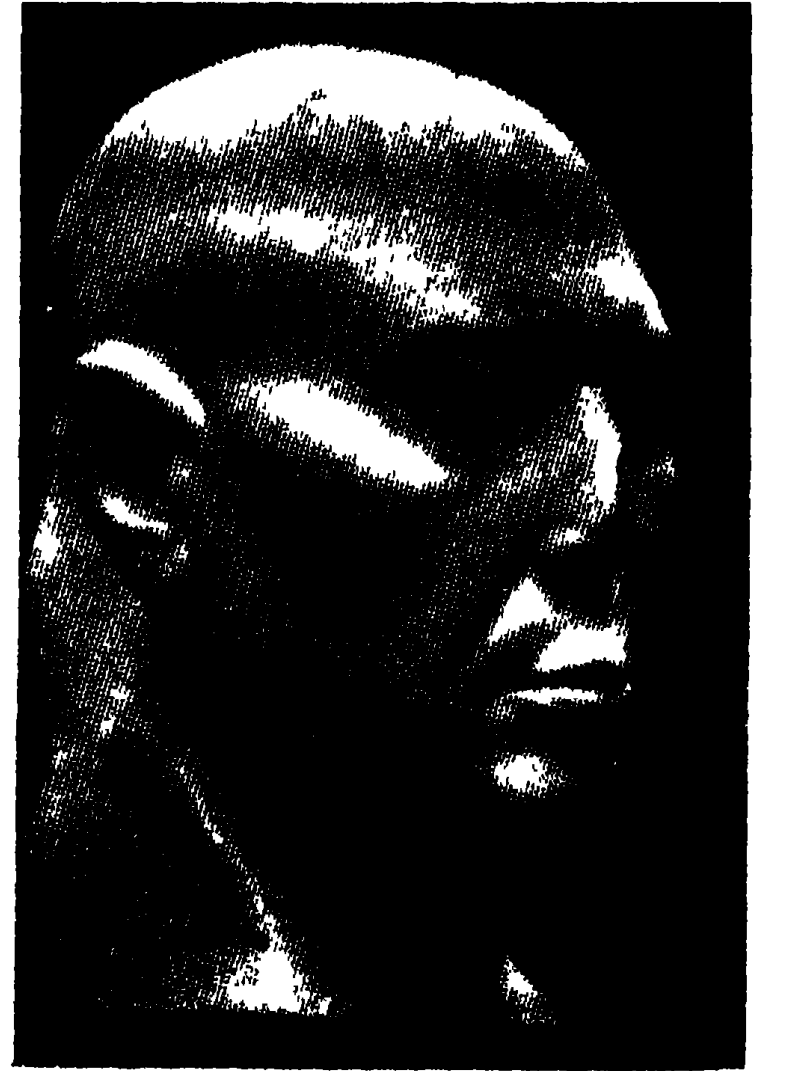
১০। ভগ্নমূর্ত্তির মুখ

হল না সেই পীরামিডের প্রথম প্রতিষ্ঠার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে—শুনিয়া পুরাবিদের জগতে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যে জিনিসগুলি ভিত্তি-গহ্বর হইতে পাওয়া গিয়াছে উহা তাহাদের নিকট দুর্লভ সম্পদ স্বরূপ। কারণ উহার সাহায্যে প্রাচীনতম মানব-সভ্যতার ইতিহাসের কতকটা অপরিজ্ঞাত পরিচয় প্রমাণিত হইবে। ভিত্তি-গহ্বরটীর উপরদিকের মুখের আকার যদিও দীর্ঘ-চতুষ্কোণ কিন্তু উহার ভিতরদিক ও তলদেশ ডিম্বাকার। গহ্বরের মুখের উপর একখানি মোটা অমসৃণ বেলেপাথর চাপা দেওয়া ছিল। দ্বাবিংশ চিত্রে উহার ছবি দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ভিত্তি-গহ্বরটি পরিষ্কার সাদা বালিতে পরিপূর্ণ ছিল। বালি তুলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যে যে জিনিসগুলি উহার ভিতর হইতে পাওয়া গিয়াছে, ত্রয়োবিংশ চিত্রে তাহার ছবি দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে উহার একটি তালিকা প্রকাশ করিতেছি।

১। একটি প্রকাণ্ড বৃষমুণ্ডের কঙ্কাল।
২। ছয়খানি অসম আকারের মাটির ইট।
৩। কয়েকটি চীনামাটির ফুলদান ভাঙা।
৪। অনেকগুলি চীনামাটির বাসনের ভগ্নাংশ।

সাধারণের চক্ষে এগুলির কোন মূল্য নাই বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের নিকট যে ইহার কি মূল্য তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইটগুলি কালের প্রভাবে এমন জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল যে গহ্বরের ভিতর হইতে বাহির করিবার সময় গুঁড়াইয়া গিয়াছে। কত হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সেগুলি ঐ প্রকাণ্ড পীরামিডের ভিত্তিমূলে থাকিয়া উহার ভার বহন করিয়া আসিয়াছে! প্রকাণ্ড পীরামিডের প্রচণ্ড চাপে সেগুলিতে আর কোন পদার্থও ছিল না তবে প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডের অভ্যন্তরে যে এক একখানি পদক সন্নিবেশিত ছিল সেগুলি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সপ্তদশ চিত্রে ঐরূপ একখানি পদক সন্নিবিষ্ট ইষ্টকখণ্ডের ছবি দেওয়া হইয়াছে। এই পদকগুলিতে কেবল যে পীরামিড নির্ম্মাতা নৃপতির নাম খোদিত আছে তাহা নহে—পীরামিডের বিষয়ও বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। ছয়খানি পদকের মধ্যে দুইখানি তাম্র নির্ম্মিত, দুইখানি প্রস্তরের এবং আর দুইখানি চকচকে চীনা মাটীর তৈয়ারী। দ্বাদশ রাজ-বংশধরগণের সমাধির অন্ততঃ একশতটি কবর অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে—তন্মধ্যে একটির ভিতর হইতে একটি চক্রাকার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি একটি পাথরের বেদীর উপর স্থাপিত। বেদীর সম্মুখভাগ অনেকটা আমাদের শিবলিঙ্গের পিণাকের আকারে গঠিত। দেখিলেই মনে হয় ইহা নিশ্চয় কোন দেবতার বিগ্রহ মূর্ত্তি। চতুর্দ্দশ চিত্রে উহার একটি প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। অন্য একটি কবরের ভিতর হইতে অন্ততঃ আটটি ভাঙা পুতুল বা প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রায় অধিকাংশ কবরের ভিতরেই হাতীর দাঁতে নির্ম্মিত এক প্রকার যাদুদণ্ড পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে কতকগুলি খুব কারুকার্য্য খচিত এবং কতকগুলি

২২। পীরামিডের প্রথম ভিত্তি গহ্বর
(উপরিভাগের চিত্র)

একেবারেই সাদাসিধা। এগুলি যেন সেকালের সমাধি-গহ্বরের অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়।

পঞ্চবিংশ চিত্রে এইরূপ কতকগুলি যাদু দণ্ডের ছবি দেওয়া হইয়াছে। এগুলি সমস্তই সমাধি গহ্বর হইতে সংগৃহীত। ইহার মধ্যে কয়েকটিতে অদ্ভুত রহস্যাকৃতি বিশিষ্ট জীবজন্তুর অতি চমৎকার প্রতিকৃতি খোদিত আছে। এই সকল হস্তিদন্ত নির্ম্মিত যাদুদণ্ডগুলি যে মৃত ব্যক্তিগণের বিদেহ আত্মার রক্ষা-কবচ স্বরূপ কবরের মধ্যে দেওয়া হইত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মৃত ব্যক্তির আত্মা পাছে পাতালে ভ্রমণ-কালে মেদিনীমূলের অধিবাসী কোন ভীষণ রাক্ষস বা হিংস্র জীবজন্তুর কবলে পতিত হয়, এই ভয়ে মৃতদেহের সঙ্গে এই যাদুদণ্ডও সমাধিস্থ করা হইত। মিশরীয়দের বিশ্বাস যে এই যাদুদণ্ড নিকটে থাকিলে মৃত আত্মারা নিরাপদ হইবেন।

চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে দেশে গজদন্তের উপর এমন নিপুণ ও সুচারু কারুকার্য্য বিদ্যমান ছিল, সে দেশ যে তখন সভ্যতার তুঙ্গ-শৃঙ্গে বিরাজ করিতেছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সপ্তম চিত্রে যে গজদন্ত নির্ম্মিত নক্র কুম্ভীরাদির প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে, উহা দেখিলেই তখনকার দ্বিরদ শিল্পীগণের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কুম্ভীরটি এমন সুন্দর ও নিখুঁতভাবে গঠিত যে প্রথম দর্শনে যেন জীবন্ত বলিয়া মনে হয়! ষোড়শ চিত্রে যে চীনামাটির ফুলদানটির প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে—উহার গঠন প্রণালী যেন একটু নূতন ধরণের,—ঠিক মিশরীয় বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ

২৩। পীরামিডের প্রথম ভিত্তি গহ্বর (ভিতরের চিত্র)। (গহ্বরের অভ্যন্তরে বৃষমুণ্ডের কঙ্কাল, ছয়খানি ইট, চীনামাটির ফুলদান ও বাসন ভাঙা রহিয়াছে)

উহা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল কিম্বা বিদেশী কারিকর আনাইয়া প্রস্তুত করানো হইয়াছিল। এই ফুলদানিটির রং কতক চাঁপা ফুলের মত, কতক বা ঈষৎ রক্তাভ। ফুলদানিটির গায়ে শ্বেত রেখা-বেষ্টিত ঘোর লাল রংয়ের পাখী ও মাছের চিত্র অঙ্কিত আছে। এই ফুলদানিটির আর একটি বিশেষত্ব এই যে এর হাতোলটি স্কন্ধদেশ হইতে উঠিয়া ফুলদানিটির কানায় না ঠেকিয়া ঘুরিয়া আসিয়া আবার স্কন্ধের উপরেই মিশিয়াছে। হাতোলটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় চিত্রে উহা সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না বটে কিন্তু উহার সংযোগস্থলটি বেশ চিনিতে পারা যায়!

২৪। নিমন্ত্রণ বাড়ী।

অন্যান্য যে সকল দ্রব্য এই বিরাট সমাধি স্তূপের শ্মশানগর্ভে পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি পাথরের ওজোন-

বাটখারা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই বাটখারাগুলির চারিপার্শ্বে নৃপতি সেনুশার্টের নাম ও খেতাব খোদিত আছে। নবম রাজ-বংশধর নৃপতি ক্ষেতির নাম উৎকীর্ণ করা কারুকার্য্য খচিত করিবার জন্ত ব্যবহৃত গজদন্ত এবং নৃপতি ক্ষেপ্তায়ের নামাঙ্কিত নিদর্শন-পত্র আঁটা উজ্জল টালির ভগ্নাবশেষও দুর্লভ সংগ্রহাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অনুমান হয়। কারণ তাহারা কোদাল ও লাঙলের সাহায্যে স্ব স্ব ক্ষেত্র কর্ষণ করিত; মাছ ধরিত ছিপ ও জাল দু'য়েরই সাহায্যে। চরকায় সূতা কাটিত, তাঁতে কাপড় বুনিত, ছুঁচে পোষাক পরিচ্ছদ সেলাই করিয়া পরিত, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে সুদক্ষ ছিল এবং চীনেমাটীর দ্বারা হরেক রকম জিনিস তৈয়ার করিতে পারিত।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে চিত্তাকর্ষক ছবিগুলি দেওয়া হইল উহা হইতে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার একটি মিশরীয় পল্লী-জীবনের অনেক ইতিহাসই জানিতে পারা যাইবে!

খৃঃ পূঃ দুই সহস্র সালে অর্থাৎ প্রায় চার হাজার বৎসর আগে মিশর নৃপতি প্রথম আমেনেম্‌হাত লিষ্টে তাঁর পীরামিড বা সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমেনেম্‌হাত রাজ-বংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই পীরামিডও ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইয়াছিল। প্রথম আমেনেম্‌হাত হইতে দ্বাদশ আমেনেম্‌হাতের রাজ্যকালের মধ্যে অর্থাৎ পীরামিড প্রতিষ্ঠিত হইবার তিনশত বৎসর পরেই খৃঃ পূঃ ১৭০০ সালে পীরামিডের ত্রিকোণ আকৃতি আর চেনাই যাইত না! দস্যু ও অসৎ প্রস্তর-ব্যবসায়ীগণের অত্যাচারে উহা কেবলমাত্র একটা প্রকাণ্ড পাথরের বিকৃত ঢিবিতে পরিণত হইয়াছিল। এই ধ্বংসাবশেষ পীরামিডের ধারে ধারে ক্রমে একটী পল্লী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে পল্লীবাসীরা অধিকাংশই দরিদ্র কৃষিজীবী ছিল বলিয়া
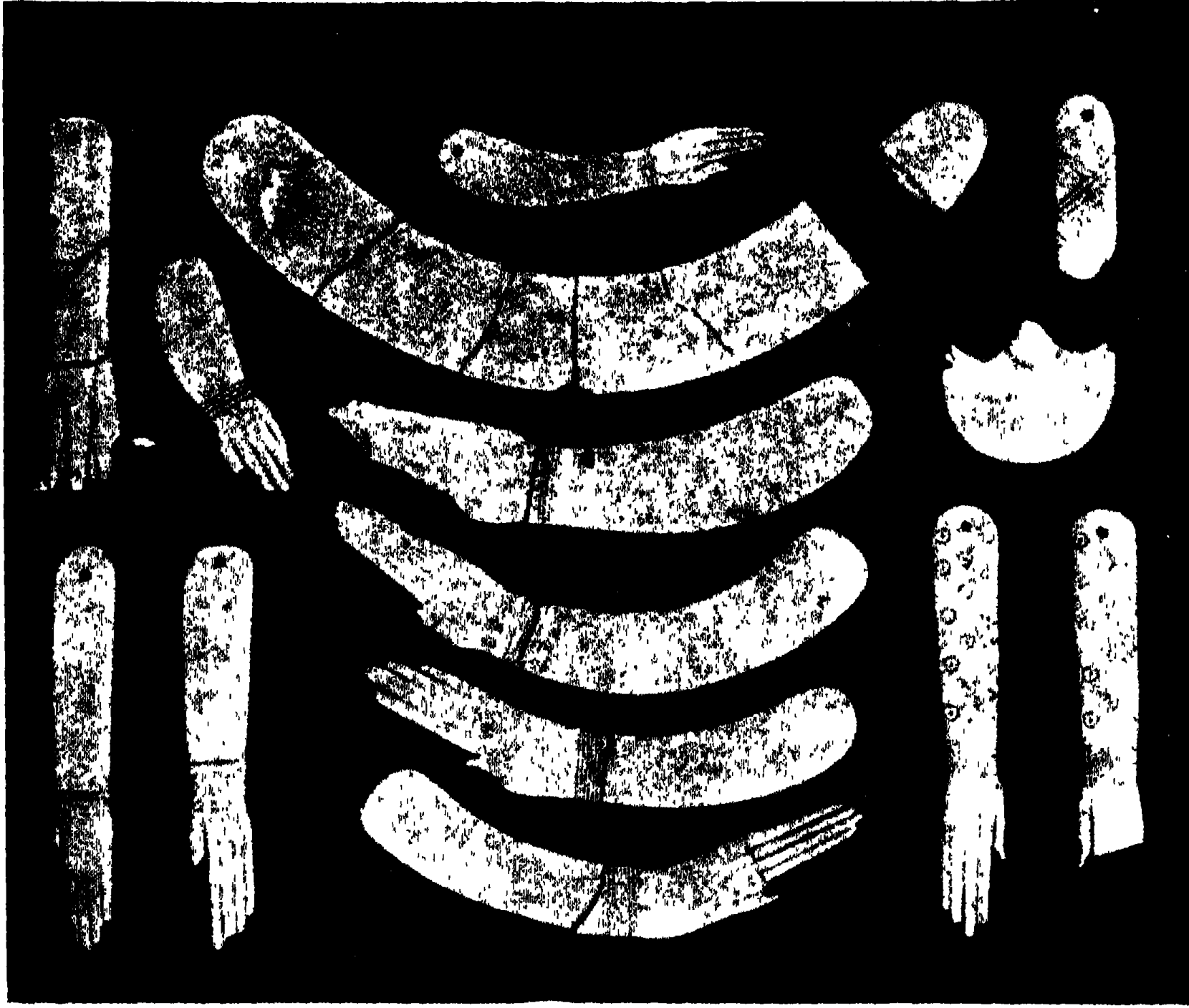
২৫। সমাধি-গর্ভ হইতে প্রাপ্ত গজদন্তের হস্তাকৃতি যাদুদণ্ড

মিশরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পল্লীবাসীদের মত অমন রক্ষণশীল মানব সম্প্রদায় পৃথিবীর আর কোন দেশে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও পর্য্যন্ত সেখানে সেই প্রথম পীরামিড নির্ম্মাতা নৃপতিগণের রাজত্বকালের সমসাময়িক অনেক পল্লী বিরাজ করিতেছে। এই সব পল্লীর প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে কোন যুগে কোনও দিনই কালের সর্ব্ব-বিধ্বংশী যন্ত্র ইহাদের বিলুপ্ত করিতে পারিবে না! কেবল দুর্ভাগ্যক্রমে পীরামিডের ধারে যে-পল্লীটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহা মাত্র এক হাজার বৎসর জীবিত ছিল। খৃঃ পূর্ব্ব ৭০০ সালে ভূপৃষ্ঠে উহার আর কোন অস্তিত্বও ছিলনা! আমেরিকার পুরাতত্ত্ববিদগণের যত্নে ও চেষ্টায় সম্প্রতি ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকা গহ্বর হইতে এই প্রাচীন পল্লীটির উদ্ধার হইয়াছে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

রূপকথার ঘুম

এক

রূপকথার গুহা।

গৌরীশৃঙ্গ। রোদ-মাখা ভোরবেলা। চারিদিকে অকলঙ্ক তুষারের শুভ্র আবরণ। আকাশ দিয়ে পেঁজা তুলোর মত তুষার ঝরচে—বাতাসে তুষারের কণা উড়চে।

থম্‌থমে গভীর স্তব্ধতা, এত স্পষ্ট যে, হাত দিয়ে যেন স্পর্শ করা যায়!

একটি গুহা। ভিতরে কেবলমাত্র একটি পাখী চুপি চুপি নিসাড় গলায় গান গাইচে—সুদূর কানন-ভূমির শ্যামল গান! গুহার ফাটলে ফাটলে দু-চারটি সবুজ তৃণ, ভয়ে-থরো-থরো মাথা বার ক'রে একমনে সেই গান শুনচে। তৃণগুলির গায়ে গায়ে গুটিকয় ছোট ছোট রঙীন ফুল,—গানের সুরের দীর্ঘশ্বাসে তারা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে।

গুহার ভিতরে আলো-আঁধারের আবছায়া। নীচের উপত্যকা থেকে পেড়ে-আনা কচি ফুল-পাতার বিছানা পেতে, গুহার একধারে রূপকথা শুয়ে আছে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখে রাঙা ঠোঁট-দুখানি ফাঁক ক'রে সে হাস্‌চে। গোলাপী মুখখানির আশেপাশে ভ্রমররা ঘুম-ভাঙানো গুঞ্জনধ্বনি করচে—তারা এসেচে মানস-সরোবরের কমল-রেণু গায়ে মেখে। রূপকথার নিশ্বাসে মলয়-হাওয়ার সুগন্ধ, অল্প-খোলা চোখ-দুটিতে জ্যোৎস্নার আভাস, পরনে বাসন্তী রঙে ছোপানো, লুতার সুতায়-বোনা একখানি হাল্‌কা-মিহি কাপড়। নধর-নিটোল ডান-হাতখানি একটি কুসুম-লতার মতন বুকের উপরে এলিয়ে আছে, শিথিল মুষ্টিতে একগুচ্ছ পদ্ম-কলি।

গুহার বাইরে নীরবতার স্তব্ধ একতান আচম্বিতে শিউরে উঠল! নীরবতা যেন নীরবে সভয়ে ব'লে উঠ্‌ল—ও কে গো, ও কে গো, ও কে?

রূপকথার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে, অবাক্ হয়ে সে গুহার দরজার দিকে খানিকক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

কিছুই বুঝতে না পেরে বল্‌লে, কেন আমার ঘুম ভাঙ্‌ল? ... ... এ কি! আমার শ্যামাপাখীর গান থেমেচে, তৃণ-ফুল সব বেরঙা হয়ে ঝরে, পড়েচে, কমল-কলি শুকিয়ে গেছে! ... ...কেন এমন হলো? অসময়ে কেন আমার সোনার স্বপন মিলিয়ে গেল?

গুহার দরজার উপরে সূর্য্যালোকের খানিকটা কালো ক'রে কার ছায়া এসে পড়্‌ল!

রূপকথা তাড়াতাড়ি আপনার ধব্‌ধবে আদুড় বুকখানির উপরে আঁচল টেনে দিলে। ভয়ে ভয়ে বিবর্ণ মুখখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখ্‌লে,, তারপর অস্ফুট আর্ত্তনাদে ব'লে উঠল—মানুষ!

সেও রূপকথাকে দেখ্‌তে পেয়েছিল। দরজার কাছে এসে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে সে রূপকথার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

রূপকথা মাথায় ঘোম্‌টা টেনে বল্‌লে, কে তুমি?

—মানুষ।

—কোথায় থাকো?

—তিব্বতে।

—এখানে কেন?

—সায়েবদের সঙ্গে এসেচি।

—সায়েব! সায়েব কি?

—সায়েব জানো না? তারা যে পৃথিবীর রাজা!

—ও! যারা কলের গাড়ী চালায়, বিজলীকে বেঁধে রাখে, সমুদ্রকে শাসন করে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তারাই!

—তারা এখানে এসেচে!

—হ্যাঁ, ঐ যে তাদের গলার আওয়াজ পাচ্চি!

—অ্যাঁ! এত কাছে এসেচে! এই শিবের রাজত্বেও শান্তি নেই! কেন, কেন তারা এখানে এসেচে?

—গৌরীশৃঙ্গ দখল করবে ব'লে!

রূপকথা কেঁদে উঠল। গুহার দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

দুই

রাজপুত্রের গুহা।

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটাল-পুত্র ব'সে ব'সে গল্প করচে।

রা। উঃ, কি শীত!

ম। আংরাটা গেল কোথায়?

কো। তাতে আগুন নেই।

রা। সওদাগরের ছেলে নীচের উপত্যকায় কাঠ আনতে গেছে। এলে বাঁচি, আগুন পুইয়ে স্যাঁতা বুকটা তাতিয়ে নি।

ম। আমরা আর কতদিন এখানে থাকব? ক্রমেই যে বুড়ো হয়ে পড়চি!

কো। রূপকথা না বললে তো আমরা আর যেতে পারি না!

রা। রূপকথা তো দিন-রাত ঘুম নিয়েই অজ্ঞান হয়ে আছেন!

ম। আমি কিন্তু আর পারচি না—পৃথিবীর জন্যে আমার মন কেমন করচে।

কো। বসে থেকে থেকে আমার গেঁটে বাত হয়েচে। পৃথিবীতে গেলে রাজ-বৈদ্যের কাছ থেকে আগেই একটা অব্যর্থ বাত-বিনাশক তৈল কিনতে হবে।

রাজপুত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর বললে,—আমার তরোয়ালে মর্চে ধ'রে গেছে। অমৃত-কুণ্ডের ধারে সেই যে রাক্ষসী বধ করেছিলুম, সে আজ কত দিনের কথা!

ম। তোমার ঘুমপুরীর রাজকন্যার ঘুম ভাঙাবার লোক আজ আর নেই, সোনার কাঠির সন্ধান তুমি ছাড়া তো আর কেউ জানে না!

রা। রাজকন্যা এখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপনে আমাকে দেখে কি? এতদিন পরে গিয়ে সোনার কাটি ছুঁইয়ে কন্যার ঘুম যদি ভাঙাই, তাহলে সে হয়তো আর আমাকে চিনতেই পারবে না!

কো। আমরা চার বন্ধুতে মিলে কত দেশেই যেতুম! অন্ধকারের নদীর ধারে, সেই তেপান্তরের মাঠের পারে, বনের গাছটিতে ব্যাঙ্গমা-ব্যেঙ্গমা বাসা বেঁধে থাকত, তারা আমাদের দেশ-বিদেশের পথ ব'লে দিত! আহা, কী দিনই গেছে হে!

রা। বনের ভেতরে চাঁদ যেদিন রংমশাল জ্বালত, তখন সাত ভাই চাঁপা তাদের ফুটফুটে মুখগুলি বার ক'রে পারুল বোনকে গান গাইতে বলত। পারুল বোনের গান শুনে সাতটি চাঁপা তালে তালে দুলতে থাকত, আর জ্যোছনার মুখে হাসি যেন ধরত না!

ম। তারপর সেই সোনার শ্রীফল, কাঠের ঘোড়া, সোনার চাঁপা, পাথর-পাখা, মাণিক-জোড় পায়রা—কত দিনই যে এ-সব চোখে দেখিনি।

কো। রাজপুত্র, তোমার সুয়োরাণী দুয়োরাণী মায়েরা এখন না-জানি কি করচেন!

রা। তাঁরা কি আর বেঁচে আছেন!

কো। মন্ত্রীপুত্র, তোমার বেলবতী কন্যাকে কি আর মনে পড়ে?

ম। (করুণ স্বরে) হায় রে, তা আর মনে পড়ে না! দীঘির ধারে অপ্সরীকে পুঁতে রেখে, কত কষ্টেই যে তাকে উদ্ধার ক'রে এনেছিলুম!

কো। সে সব দিনের কথা ভেবে আমার কান্না আসচে!

রা। ইচ্ছে হচ্চে, যাই আবার পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে! কিন্তু প্রজারা হয় তো আর আমাকে চিনতেই পারবে না!

ম। কেন চিনতে পারবে না? সেদিন মানস-সরোবরের ধারে রূপকথার জন্যে পদ্মফুল আনতে গিয়েছিলুম। মহাদেবের নন্দীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা! সে পৃথিবীতে শিবরাত্রির মোচ্ছব সেরে ফিরে আসছিল। তার মুখে শুনলুম, পৃথিবীতে ঠাকুমারা এখনো নাকি আমাদের ভোলেন-নি। তুলসীতলায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়ে, এখনো রোজ তাঁরা হরিনামের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে আমাদেরই নাম করেন। খোকা-খুকিরা এখনো আমাদের দেখতে চায়!

রা। আর যুবারা?

ম। যুবারা? তারাই নাকি আমাদের শত্রু। তারা সব বড় বড় সহরে থাকে, চোখে চশ্‌মা দিয়ে দিন-রাত বড় বড় পুঁথি পড়ে আর খালি বড় বড় বুলি কাটে আর তর্ক করে। আমাদের কখনো চোখেও দেখে-নি, আমরা যে বেঁচে আছি—তাও তারা মানতে চায় না তারা কেবল কল-কব্জা নিয়ে মেতে আছে, সারাজীবন ষোড়-শোপচারে যন্ত্র-রাক্ষসের পূজো দিচ্ছে। তাদের প্রাণ শুক্‌নো যেন পাথর, নিংড়োলেও একফোঁটা রস বেরোয় না। কবিতা আর রূপকথার নাম শুন্‌লেই তারা মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে।

রা। তবেই তো।

কো। ওদের ভয়েই তো আজ আমরা দেশছাড়া।

রা। ভয়? কিসের ভয়? আমরা কি কাপুরুষ? এই হাতে আমি কত দৈত্য-দানব বধ করেচি, তা কি তোমাদের মনে নেই? সামান্য মানুষকে আমরা ভয় করব? চল, আজই আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাই। তাদের ভালো ক'রে জানিয়ে দিই গে—আমরা আছি, আমরা জেগে আছি, আমরা জ্যান্ত আছি!

কো। কিন্তু রূপকথার ঘুম এখনো ভাঙেনি যে!

রা। কবে তাঁর ঘুম ভাঙ্‌বে?

ম। যতদিন না পৃথিবীর যন্ত্র-রাক্ষসকে কেউ বধ করে।

রা। চল, আমরাই গিয়ে তার গলা টিপে দিয়ে আসি।

ম। উঁহু, অস্ত্রে সে মরবে না। আগে তার প্রাণ-পাখীকে খুঁজে বার কর্‌তে হবে।

রা। আমরাই তা খুঁজে বার করব।

কো। কিন্তু রূপকথা না বল্‌লে আমরা তো যেতে পারব না!

রাজপুত্র দমে গিয়ে চুপ কর্‌লে।

কো। উঃ, কি কন্‌কনে হাওয়া!

ম। সওদাগরের ছেলে এখনো ফির্‌ল না তো! কাঠ আন্‌তে বুড়ো হয়ে গেল যে!

তিনজনে বসে বসে শীতের বাতাসে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।... ... ...হঠাৎ তিনজনেই একসঙ্গে চম্‌কে উঠল।

রা। ও কি-ও!

ম। কিছুই বুঝ্‌চি না তো!

কো। চল, চল,—বাইরে গিয়ে দেখে আসি।

তিন

যন্ত্র-রাক্ষসের আক্রমণ

হিমালয়ের একটি উচ্চ শিখর। সূর্য্যকরোজ্জ্বল তুষার-শয়নের উপরে মেঘের পর্দ্দা দুলচে।

চারিদিকের নীরবতার মাঝে একটা অশ্রান্ত, নিষ্ঠুর শব্দ শোনা যাচ্ছে—যেন কোন অশরীরী দানবের গভীর গর্জ্জন।

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটাল-পুত্র আকাশের দিকে বিস্মিত চোখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

রা। শুন্‌চ?

ম। হুঁ। স্তব্ধতার বুক যেন চিরে যাচ্ছে।

কো। কিসের শব্দ ও?

রা। কে জানে! শব্দটা কিন্তু ক্রমেই কাছে এগিয়ে আস্‌চে।

ম। এমন শব্দ তো কখনো শুনি নি!

কো। বাপ্‌ রে বাপ্‌, রাক্ষসদের চীৎকারের চেয়েও এ শব্দ ভয়ানক।

রা। এ কি বৃদ্ধ হিমালয়ের কান্না?

ম। বোধ হয় নরকের প্রেতাত্মাদের আর্ত্তনাদ!

কো। কৈলাসের শ্মশানে বুড়ী ডাকিনী হাড়ের মাদল বাজাচ্ছে না তো?

সবাই আবার চুপ ক'রে শুনতে লাগ্‌ল।

রা। শব্দটা খুব কাছে এসেচে।

ম। হ্যাঁ, সাম্‌নের ঐ শিখরটার পিছনে।

কো। আমার বুকটা কেমন ছম্‌ছম্‌ ক'রে উঠ্‌চে!

র। শব্দটা যেন কাকে খাই, কাকে খাই কর্‌চে!

ম। ও শিবের ধ্যান ভেঙে দেবে।

কো। চল ভাই, গুহার ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিই-গে!

রা। ও আবার কে? ঝড়ের মতন ছুটে আস্‌চে?

ম। হাঁা—এই দিকেই।

কো। ওকে চিন্‌তে পারচ না? ও যে সওদাগরের ছেলে!

রা। ওর মাথার তাজ কোথায় গেল?

ম। গায়ের উত্তরীয় কোথায় ফেলে এল!

কো। নিশ্চয় কোন বিপদ হয়েচে!

রা। শব্দটা কি ওরই পিছনে তাড়া করেচে?

ম। তাই হবে!

কো। আমার গা ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌চে। সবাই গুহার ভেতরে চল!

রা। সওদাগরের ছেলের মুখ দেখেচ!

ম। মড়ার মত সাদা।

কো। গুহার ভেতরে চল!

সওদাগর-পুত্র ছুটে কাছে এসে পড়্‌ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বারবার পিছনে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

রা। বন্ধু, বন্ধু, কি হয়েচে বল!

স। ভয়ানক বিপদ!

রা, ম, কো। (একসঙ্গে) বিপদ!

স। সাংঘাতিক বিপদ! তোমাদের সাবধান কর্‌তে ছুটে আস্‌চি।

কো। ভূত-প্রেতরা বিদ্রোহী হয়েচে না কি?

রা। হিমালয়ের তুষার-মুকুট খসে পড়েচে?

ম। শিবের ষাঁড় কি চুরি ক'রে সিদ্ধি খেয়ে ক্ষেপে গিয়েচে? তোমার পিছনে তাড়া করেচে?

স। না, না,—ও-সব বিপদ নয়!

রা। তবে?

স। মানুষ!

রা। কোথায়?

স। মানস-সরোবরের পথে।

রা। মানস-সরোবরের পথে মানুষ? অসম্ভব!

স। আমি নিজের চোখে দেখে আস্‌চি। এক-আধজন নয়—দলে দলে, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে।

রা। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে? কি উদ্দেশ্যে?

স। জানিনা। তাদের সঙ্গে আছে যন্ত্র-রাক্ষস।

রা। যন্ত্র-রাক্ষস! মানুষরা যার গোলাম? যার জন্যে আজ আমরা দেশছাড়া? যার ভয়ে পৃথিবী থেকে রূপকথা পালিয়ে এসেচেন?

ম। সর্ব্বনাশ!

কো। যন্ত্র-রাক্ষস কি এখানেও আমাদের আক্রমণ কর্‌তে এসেচে?

রা। কিন্তু আকাশে ও কিসের শব্দ, বল্‌তে পারো?

স। যন্ত্র-রাক্ষসের গর্জ্জন!

কো। ওরে বাস্‌রে, যার গর্জ্জন এমন ভয়ানক—না-জানি তার চেহারা কি বিকট! আমার তো ভাবতেই মূর্চ্ছার উপক্রম হচ্চে!

রা। আচ্ছা, আসুক সে,—আজ এস্পার কি ওস্পার! কতদিন আর অলসের মতন নির্ব্বাসনে থাকব? আজ আমি যন্ত্র-রাক্ষসকে বধ করব।—এই ব'লেই রাজপুত্র খাপ থেকে তরোয়াল খুল্‌লে।

স। কিন্তু যন্ত্র-রাক্ষস বড় যে সে রাক্ষস নয়। মানুষকে পিঠে ক'রে সে আকাশে ওড়ে।

রা। উড়ুক্। আমারও পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে।

স। কিন্তু তোমার কাছে বাজ নেই। মানুষরা দেবরাজ ইন্দ্রের বাজ কেড়ে এনেচে। তুমি পার্‌বে কেন?

হঠাৎ দূরে বন্দুকের শব্দ হলো।

স। ঐ শোনো!

রা। ও আবার কিসের শব্দ?

স। মানুষ তার বাজ ছুড়্‌চে।

ম। দেখ, দেখ,—আকাশে কি ওটা?

কো। ও বাবা, ওর নাক দিয়ে যে হুস্‌ হুস্ ক'রে ধোঁয়া বেরুচ্চে!

স। যন্ত্র-রাক্ষস!

আকাশে একখানা উড়ো-জাহাজ ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এগিয়ে আস্‌চে। সকলে শ্বাস বন্ধ ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

রা। ও কার কান্না?

স। তাইতো, এ যে রূপকথার গলা!

কো। রূপকথার ঘুম ভাঙ্‌ল কি ক'রে?

স। বোধ হয় যন্ত্র-রাক্ষসের গর্জ্জনে।

রূপকথা কাঁদতে কাঁদতে আলুথালু বেশে ছুটে এল। যেখানে তার পা পড়্‌চে, সেইখানেই তুষারের উপরে এক-একটি টুকটুকে পদ্ম ফুটে উঠ্‌চে—যেন শুচি-শুভ্র তুষার পটে তরুণী উষার বিকসিত রাঙা-বাসনার রেখা!

ব। বাছা, এখানেও মানুষের বিদ্রোহ মাথা তুলেচে—ত্রিভুবনে আমার কি কোথাও একটু ঠাঁই নেই।

রা। তোমার কোন ভয় নেই মা, আমরা তোমাকে রক্ষা করব!

রূ। পালিয়ে আয় বাছারা, পালিয়ে আয়,—ঐ যন্ত্র-রাক্ষসের মুখে পড়্‌লে তোরা কি আর বাঁচবি?

রা। কাপুরুষের মত পালিয়ে যাব! মা, তুমি কি বলচ!

রূ। যা বলচি, শোন্, এ তোর মায়ের হুকুম!

চার

কৈলাস।

আকাশ-গঙ্গা ঝরে পড়চে হিমারণ্যের তুষার-তাজের উপরে—দুধের মত ধবল তার ধারা।

বিশাল পুরী। সিংহদ্বারের বাইরে একপাশে দুইথাবার উপরে মুখ রেখে দুর্গার সিঙ্গি শুয়ে শুয়ে ঝিমুচ্চে, আর একপাশে শিবের ষাঁড় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নেড়ে গায়ের উপর থেকে মাছি তাড়াচ্চে।

সিংহদ্বারের ভিতরে, আঙিনার এককোণে ব'সে ভূতের দলের মাঝখানে নন্দী আর ভৃঙ্গীর আড্ডা খুব জমে উঠেচে।

মণি-মন্দিরের দরদালানে শিবের আসর। একখানা বাঘছালের উপরে শিব বসে আছেন। সামনেই মড়ার মাথার খুলিতে ফল-মূল সাজানো।

আর একপাশে পার্ব্বতী বসে বসে শিবের খাওয়ার তদারক করছেন। জয়া-বিজয়া তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।

পা। হ্যাঁগা, এতকাল ধ'রে পৃথিবীর সহরে সহরে আনাগোনা করলে, তবু এই বদ্-অভ্যাসটা ছাড়তে পারচ না?

শি। বদ্-অভ্যাস আবার কি দেখলে?

পা। এই, মড়ার মাথার খুলিতে খাওয়া?

শি। তুমিও কি আমাকে কার্ত্তিকের মতন একেলে হ'তে বল? ও-সব পুরাণো অভ্যাস আমি ছাড়তে পারব না। পছন্দ না হয়, আমাকে 'ওল্ডফ্যুল' ব'লে 'ডিভোর্স' করতে পারো।

পা। তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও ঝকমারি দেখচি। একটুতেই মেজাজ একেবারে তেরিয়া! গাঁজাখোরের স্বভাব, যাবে কোথায়!

শিব সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, সিদ্ধির বাটির দিকে হাত বাড়ালেন। আসন্ন নেশার স্ফূর্ত্তিতে চোখদুটি তাঁর ঢুলঢুলে হয়ে এল। কিন্তু বাটিটা মুখের কাছে ধ'রেই দেখলেন, তাতে সিদ্ধি বড় কম রয়েচে! অমনি চেঁচিয়ে হাঁক দিলেন—নন্দী!

নন্দী আজ্ঞে ব'লে কাছে এসে দাঁড়াল।

শি। সিদ্ধি আজ এত কম কেন? ক-আনা পয়সা চুরি করেচিস?

ন। আজ্ঞে, আজ তো আমি বাজার করতে যাইনি!

শি। তবে কে বাজারে গিয়েছিল শুনি?

ন। আজ্ঞে, বেহ্মদত্যি।

শি। হুঁ, ব্যাটা পাকা ছিঁচ্‌কে-চোর। বেহ্মদত্যিকে এখনি বেলগাছ থেকে কাণ ধ'রে নামিয়ে, দূর ক'রে তাড়িয়ে দে।

ন। যে আজ্ঞে।

শি। আর শোন্। বেশ ক'রে একছিলিম গাঁজা সেজে দিয়ে যা দেখি!

ন। আজ্ঞে, আজ তো বাজার থেকে গাঁজা আসে নি!

শি। কী! একে সিদ্ধি কম, তায় গাঁজা নেই! ভৃঙ্গী, নন্দীকে এখনি ধ'রে খড়ম-পেটা ক'রে দে তো!

ন। আজ্ঞে, আমার দোষ কি, বাজারে দোকানীরা যে আজ 'হর্ত্তাল' করেচে—সব দোকান বন্ধ।

শি। রোজ রোজ 'হর্ত্তাল!' দোকানীরা ভারি চালাকি পেয়েচে দেখচি। আচ্ছা শোন্। এবারে অন্নপূর্ণো-পুজোর

সময়ে তুই পৃথিবীতে গিয়ে, ছদ্মবেশে একটা কৃষি-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হবি। তার পর শিবরাত্রির সময়ে আমি গিয়ে তোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌ব। কিন্তু এর মধ্যে তোকে সিদ্ধি আর গাঁজার চাষ শিখে নিতে হবে। এবারে আমি কৈলাস-পুরীর বাগানেই সিদ্ধি আর গাঁজার চাষ করাব। হর্ত্তালের মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি, রোসোনা! কেমন, পার্‌বি তো?

ন। আজ্ঞে, তা আর পার্‌ব না!

এমন সময়ে শুড় নাড়তে নাড়তে ও ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে গণেশ এসে গরম হয়ে ডাক্‌লে—বাবা!

শি। এস বাপধন, এস, তোমার আবার কি আর্‌জি?

গ। ভালো চাও তো তোমার সাপকে সাবধানে রাখো, নইলে এবারে আমি ওর দফা রফা ক'রে দেব—তা কিন্তু আগে থাক্‌তেই ব'লে দিচ্চি—হাঁ!

শি। আরে গেল, আমার সাপ আবার কি কর্‌লে তোর?

গ। তোমার সাপ আমার ইঁদুরকে ধ'রে, আজ আর একটু হ'লেই পেটে পুরে ফেল্‌ত।

শি। আপদ যেত। তোর ইঁদুর রোজ আমার বাঘছাল কেটে দিয়ে যায়।

গ। আচ্ছা, আমার কথায় কাণ না দাও, মজাটা দেখতেই পাবে। কাল থেকে আমি একটা বেজি পুষব।—গণেশ মুখ ভার ক'রে শুঁড় তুলে চলে গেল।

শি। গিন্নির আদরে গণেশ-ছোঁড়ার বড় বাড় হয়েচে! একালের ছোঁড়াগুলো হলো কি! বাপের মুখের ওপরে লম্বা লম্বা কথা!

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে কার্ত্তিক গান ধরলে—

"যে যাহারে ভালোবাসে, সে তাহারে পায়না কেন?"

শিব চেঁচিয়ে বল্‌লেন—কেতো, কেতো! থাম্ ইষ্টুপিড, গেরস্ত-বাড়ীতে বসে বাপের কাণের কাছে এই-সব ছাই গান! একেবারে গোল্লার দোরে গিয়েচ?

গান থেমে গেল।

শি। নাঃ, এমন-সব ছেলেপুলে নিয়ে আমার আর বাঁচতে সাধ নেই। কি বল্‌ব, আমি যে অমর—নইলে এখনি গলায় দড়ি দিতুম। নন্দী, শীগ্‌গির সোমরস নিয়ে আয় তো বাবা!

পা। আবার ও-সব ঢলাঢলি কেন? বুড়ো হ'লে, লজ্জা করে না?

শি। তুমি থামো গিন্নি, কানের কাছে মিছে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ কোরো না!

নন্দী ফিরে এসে বললে—সোমরস নেই!

শিব তিন চোখের তিন ভুরু কুঁচ্‌কে বল্‌লেন—সোমরস নেই কি-রকম? সবে কাল কিনে আনা হয়েছে যে!

ন। আজ্ঞে, সোমরসের পাত্রটা দেখলুম, কার্ত্তিক-দাদার টেবিলের ওপরে উপুড় হয়ে আছে।

শি। হুঁ, বুঝেচি—এ কেতোর কীর্ত্তি! গিন্নি, এর জন্যেও তুমিই দায়ী!

পা। তা তো বল্‌বেই গো—ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো আছি আমি,—যত পারো ব'লে নাও!

শি। বল্‌ব না তো কি? তোমাকে না ফি-বছরে বারণ করি, কেতোকে নিয়ে বাপের বাড়ী যেতে? কল্‌কাতায় গিয়ে যত কুসংসর্গে মিশে, ছোঁড়ার চরিত্র একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে! তুমি যদি ওকে ফি-বছর সোহাগ ক'রে সঙ্গে না নিতে, তাহলে আজ ওকে কে চিন্‌ত?

পা। সঙ্গে করে নিয়ে যাই, বেশ করি। আমার বাপের বাড়ীর দোষ কি? কার্ত্তিক যেমন দেখচে তেমনি শিখচে—তোমারি ছেলে তো, বংশাবলীর ধারা বজায় রাখবে না?

শি। তোমার লেক্‌চার থামাও গিন্নি! এ কল্‌কাতা সহর নয়—এ কৈলাস-ধাম, এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা একেবারেই আউট-অফ-প্লেশ!

পা। দেখ, আমাকে বেশী রাগিও না বলে দিচ্চি। আমার সেই দশবাই-চণ্ডী মূর্ত্তির কথা মনে নেই বুঝি? ধর্‌বো নাকি সেই মূর্ত্তি?

শিব আর উচ্চবাচ্য কর্‌লেন না—হতাশভাবে চুপ মেরে গেলেন।

আচম্বিতে সিঙ্গির হালুম-হুলুম আর ষাঁড়ের গাঁ গাঁ শোনা গেল।

শি। নন্দী, দেখ্ দেখ্,—ষাঁড়ের সঙ্গে সিঙ্গি ঝগড়া কচ্চে বুঝি! সেবারে ঐ হতভাগা সিঙ্গি থাবা মেরে আমার ষাঁড়ের আধখানা-ল্যাজ ছিঁড়ে নিয়েছিল!

পা। আর সেদিন ঐ মুখপোড়া ষাঁড় আমার সিঙ্গির পেটে গুঁতিয়ে দিয়েছিল!

নন্দী সিং-দরজা খুলে বল্লে—না, ষাঁড় আর সিঙ্গি ঝগড়া কর্‌চে না, একটি পরমা সুন্দরী কন্যা এসেচে, তাকে দেখেই ওরা চ্যাঁচাচ্চে।

শি। পরমা সুন্দরী কন্যা!

পা। পরমা সুন্দরী কন্যা! এই কৈলাসে!

জয়া-বিজয়ার দিকে ফিরে পার্ব্বতী চুপিচুপি বল্লেন—এ আবার কে লো?

জ। আবার সেই ত্রেতাযুগের মোহিনী-টোহিনীর মতন কেউ এল না তো?

বি। সেবারে মোহিনী তো কর্ত্তাবাবুকে সাত-ঘাটের জল খাইয়ে তবে ছেড়েছিল!

পা। নন্দী, মেয়েটাকে এখান থেকে চ'লে যেতে বল্।

পার্ব্বতীর মনের ভাব বুঝে শিব হেসে বল্লেন—গিন্নি, আমাকে তাব'লে তুমি এতটা খেলো ভেবো না!

পা। পুরুষকে বিশ্বেস নেই!

নন্দী এতক্ষণে চিন্‌তে পেরে বল্লে—চিনেচি, চিনেচি! উনি রূপকথা-ঠাকরোণ, ঐ যে,—রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র আর সওদাগর-পুত্র সবাই সঙ্গে রয়েচে।

শি। রূপকথা এখানে কি করতে?

ন। উনি ভেতরে আস্‌তে চাইচেন!

শি। আস্‌তে দে।

রূপকথা পুরীর ভিতরে এসে ঢুক্‌ল—পিছনে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটাল-পুত্র ও সওদাগর-পুত্র। সকলে একে একে এসে শিবের ও পার্ব্বতীর পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

রূপকথার পদ্মের পাপড়ির মতন চোখে তখনো শিশিরের ফোঁটার মতন অশ্রু টলটল করছিল।

শি। তুমি কাঁদচ কেন বাছা? তোমার কিসের দুঃখ?

রূ। বাবা, জানেন তো একদিন সারা-পৃথিবীতে আমারি রাজত্ব ছিল!

শি। জানি বৈকি! প্রত্যেক মানুষের প্রাণ সেদিন ছিল তরুণ কবির মতন—তারা মর্ম্ম দিয়ে ভাব-রস-রূপের মর্ম্ম বুঝ্‌ত।

রূ।—কিন্তু লোকে আর আমাকে মানেনা, তারা আমাকে পৃথিবী থেকে বিদেয় ক'রে দিয়েচে। তারা আগে আমাকে প্রাণের মত ভালোবাস্‌ত। সে ভালোবাসার বিনিময়ে আমি তাদের দিতুম—কল্পনার অগাধ ঐশ্বর্য্য, কবিত্বের মনোরম আকাশ-কুসুম, আনন্দের সুমধুর সুধাপাত্র! তাই নিয়ে তারা পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্য-হাহাকারের মধ্যেও দুদণ্ডের তরেও বিস্মৃতির দুর্লভ আস্বাদ পেত।

শিব। মানুষ তোমাকে এখন মানে না কেন?

রূ। তারা যন্ত্র-রাক্ষসের পাল্লায় গিয়ে পড়েচে। তারা আর আমাকে বিশ্বাস করে না,—বলে, আমার সব মিথ্যে। তারা এখন কল্পনার রঙীন আলোতে মন দিয়ে যা দেখা যায়, তাকে ফেলে, স্পষ্ট সূর্য্যের উত্তাপে চোখ দিয়ে যা দেখা যায়, তাকেই সত্যি ব'লে মানে।

শি। ভুল করে। চোখের দেখা দুদিনের, কিন্তু মনের দেখা চিরদিনের।

রূপ। সেই দুঃখেই তো আমি এই কৈলাসের ছায়ায় পালিয়ে এসে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নলোকে বাস করবো।

শি। তা আমি শুনেচি।

রূ। অবিশ্বাসীদের যুক্তিতে আমার যে-সব ভক্তের মন আজও টলে-নি, তারা তবু এই ভেবেও সুখী যে, রূপকথা মিথ্যা নয়—সে তার কবিত্ব আর কল্পনাকে নিয়ে হিমালয়ের এই গোপন অন্তঃপুরে, এই অজানা রহস্য-লোকে আজও বাস করচে। যন্ত্র-রাক্ষস তাদের পূজা পায়-নি। সংসার-মরুর তপ্ত বালুরাশির ভিতরে এই বিশ্বাসই তাদের মনকে শ্যামল ক'রে রেখেচে! কিন্তু অবিশ্বাসীদের প্রাণে আমার এটুকু পূজাও সইল না। আমাকে বধ করবার জন্যে, কল্পনার এই সর্ব্বশেষ আশ্রয়টুকুও বাস্তবের আড্ডা ক'রে

ভুবনমোহিনী বল্‌লেন, "একলা যেও না।"

"তাতে কি হয়েচে?"

মায়া বল্‌লে, "ভয় কিসের?"

শোবার ঘর তেতালায়। ঘনশ্যাম লাঠি হাতে, শুধু পায়ে, একটুও শব্দ না কোরে দোতালায় নেমে গেল।

২

প্রদীপ, মোমবাতি, কেরোসিন তেলের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশ থেকে আলো চলে গিয়েচে। এখন ঐ যে কুট্ কোরে কল টিপে দিলে আপনি আলো জ্বলে ওঠে, সেটাকে আলো বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়। তার নাম হ'ল লাইট। হরপ্রসাদের বাড়ীতে আগাগোড়াই বিদ্যুতের আলো, কিন্তু এ সময় একটাও জ্বল্‌ছিল না। হরপ্রসাদের শোবার ঘরে একটী ছোট তেলের আলো, আর কোথাও আলো নেই। শব্দ শুনে উঠে তাঁরা কেউ একটাও লাইট জ্বালেন নি। ঘনশ্যাম অন্ধকারে সিঁড়ি নেমে গেল। কর্ত্তার বস্‌বার ঘরে—বৈঠকখানায় নয়—লোহার সিন্দুক ছিল। ঘনশ্যাম বরাবর সেই ঘরে গেল। দরজা একটু ফাঁক করা, ভিতরে পাহারাওয়ালাদের আলোর মত একটু আলো ঘরের দেওয়ালে পড়েচে। হাতে লাঠি শক্ত কোরে ধরে ঘনশ্যাম দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে গেল। অমনি দপ্ কোরে ঘরের লাইট জ্বলে উঠ্‌ল, একজন দাড়ীওয়ালা মুখস্‌পরা লোক বল্‌লে, "অনুগ্রহ কোরে চেঁচামেচি কিংবা কোন গোল করবেন না। এই দিকে এসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন।"

কথাগুলো বেশ ভদ্রলোকের মত, কিন্তু তার চেয়েও ভদ্র লোকটার হাতের পিস্তল, আর পিস্তলের নল ঠিক ঘনশ্যামের সাম্‌না-সাম্‌নি। ঘনশ্যাম চেঁচামেচি করলে না, বল্‌লে, "এ ত দিব্য ভদ্র সমাজ। আপনাদের সঙ্গে কি কথা কওয়াও বারণ?"

"সে কি কথা! আমাদের সঙ্গে কথা কইবেন, সে ত আমাদের সৌভাগ্য, তবে লাঠিগাছা আমার বাঁ হাতে দেন, আর জামার কিম্বা বুকের পকেটে আপনার হাত না দেওয়াই ভাল, কিন্তু আমার দিতে কোন দোষ নেই।" ডান হাতের পিস্তল যেমন ছিল তেমনি রইল, বাঁ হাত দিয়ে চটপট ঘনশ্যামের জামার পকেট দেখে ফেল্‌লে, নিজের পিস্তলের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "এগুলোর বড় দোষ—বড় সহজে পকেটের মধ্যে রাখা যায়।"

"মশাইও নিজেরটা পকেটে রাখুন না কেন?"

চোরেদের সর্দ্দার নিঃশব্দে হেসে বল্‌লে, "আপনার রসিকতা প্রশংসার যোগ্য। অন্য সময় হ'লে আপনার সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড করতুম।"

"সেইটে আমি পার্‌তুম না।"

"বুঝেছি, আপনারা খুব exclusive, তা হবারই কথা।"

ঘনশ্যাম দেখ্‌লে, লোহার সিন্দুক খোলা, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আর দুজন। সেই রকম মুখস্, সেই রকম দাড়ী। দাড়ীগুলো পরচুলার।

সর্দ্দার চোর বল্‌লে, "আপনার লোহার সিন্দুক বড় জবর, খুলতে একটু শব্দ হয়েচে তাইতে আপনাদের ঘুম ভেঙে গিয়েচে। আপনার কষ্ট হ'ল, কিছু মনে করবেন না।"

"তা কেন করব, তবে আমার দাঁড়িয়ে থাকা কি নিতান্ত দরকার? স্কুলে মাষ্টার পড়া না হ'লে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌ত বটে, কিন্তু সে অনেক কালের কথা।"

"বেশ কথা, আপনি এই চেয়ারে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসুন। তবে চুপ কোরে থাকাই আপনার পক্ষে বুদ্ধির কাজ হবে।"

"আমি চুপ করেই আছি," বলে ঘনশ্যাম নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে বস্‌ল। একটু পরে বল্‌লে, "আপনি বোধ হয় আমাকে এ বাড়ীর কর্ত্তা মনে করচেন?"

"অমন ভুল হ'লে ভারি অন্যায় হয়। আপনি ঘনশ্যাম বাবু, বাড়ীর জামাই, আপনি কেন বাড়ীর কর্ত্তা হতে গেলেন?"

"আপনার পরিচয় পেলুম না এই দুঃখ। তা আপনাদের বোধ হয় introduced হবার নিয়ম নেই?"

"ঐটে আমাদের গণ্ডীর বাইরে। তার কারণ আপনি উকীল মানুষ, আপনাকে আর বোঝাতে হবে না। একটু মাপ কোরবেন।"

সে লোকটা একটু সরে লোহার সিন্দুকের দিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের সব দেখা হ'ল?"

আর দুজন লোকের মধ্যে একজন বল্‌লে, "না, এখনো টানাগুলো বাকি আছে।"

"একটু হাত চালিয়ে নাও।"

"যে আজ্ঞে।" তাদের দুজনের পাশে এক একটা পিস্তল। সর্দ্দারের পিস্তলের লক্ষ্য কিন্তু বরাবর ঘনশ্যামের দিকে।

হঠাৎ চাপা স্বরে নিশ্বাস টেনে ঘনশ্যাম বলে উঠ্‌ল, "আঃ!"

দরজার মাঝখানে স্থির প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে মায়া!

৩

ঘনশ্যাম ফেরে না, কোন সাড়া শব্দও নেই দেখে মায়া বল্‌লে, "কোথায় গেলেন উনি, একেবারে আর কোন শব্দ নেই! আমি যাই গিয়ে দেখে আসি।" এই বলেই, বাপ মা কিছু বল্‌বার আগেই তড়তড় কোরে সিঁড়ি নেমে গেল। ঘরে আলো জ্বল্‌চে দেখে সেই দিকে গিয়ে দরজার চৌকাঠে পা দিতেই স্থির হয়ে দাঁড়াল। যেন ফ্রেমে-আঁটা ছবিখানি!

ঘনশ্যাম একটা চাপা শব্দ কোরে চোরেদের সর্দ্দারের দিকে চেয়ে দেখলে। সে লোকটা যদি মায়াকে পিস্তল দেখাত কিম্বা শাসাত, তা হ'লে কি হত বলা যায় না, কিন্তু সে ভারি চতুর লোক, মায়াকে দেখেই পিস্তল-সুদ্ধ হাত পিছন দিকে ঘুরিয়ে নিলে। একটা ভাল চেয়ার দেখিয়ে বল্‌লে, "আপনি এইখানে বসুন," তারপর ঘনশ্যামকে বল্‌লে, "ওঁকে বলুন কোন ভয় নেই, তবে কোন-রকম গোল করা চল্‌বে না।"

জবাব ঘনশ্যামকে দিতে হ'ল না, তার আগেই মায়া ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে বল্‌লে, "কিসের ভয়, তোমার বালামচির দাড়ী না তোমার মুখসকে, না, তোমার হাতের পটকা ছোড়বার বন্দুককে? ছেলেবেলা অন্য ছেলে-মেয়েরা মুখস্ দেখ্‌লে আঁৎকে উঠ্‌ত, আমি চড়িয়ে দিতুম মুখসকে। এখনো পারি। আর ঘোড়ার ল্যাজের দাড়ী ওপ্‌ড়াতে কতক্ষণ?"

চোরেদের সর্দ্দার এক পা পিছোল, বল্‌লে, "এখন সে চেষ্টায় কাজ নেই।"

মায়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ের হাসি হাস্‌ল। "না, কথার কথা বল্‌চি। তুমি না কি এইমাত্র ভয় পেতে বারণ কর্‌ছিলে তাই তোমায় বললুম। এ বাড়ীতে ভয় কাকে বলে কেউ জানে না।"

"তাই ত দেখ্‌চি। তবে আমাদের না ঘাঁটালে আমরাও আপনাদের কোন ক্লেশ দেব না।"

ঘনশ্যাম বললে, "আমরা ত আপনাদের কোনরূপ বাধা দিচ্চি না!"

মায়া বল্‌লে, "তা ত আমি জানি নে। সর্দ্দার মশাই না সেনাপতি-মশাই, কি বল্‌ব? আমার রমণী-সুলভ চপলতা মার্জ্জনা করবেন। আপনি অবিশ্যি কিছু পাশ টাস কোরেচেন?"

"আজ্ঞে হাঁ, তা করেচি বই কি! আমি B. T."

ঘনশ্যাম আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "Bachelor of Teaching?"

মুখস্ বল্‌লে, "আজ্ঞে না, এটা খুব পুরাণো ডিগ্রী—Bechelor of Thieving।"

"ওঃ" বলে ঘনশ্যাম অপ্রস্তুত হ'ল। সে ঠকে গেল।

লোহার সিন্দুকে নানা রকম অলঙ্কার, কতক মায়ার, কতক তার মায়ের। সেগুলো চোরেরা নিজেদের থলির ভিতর পুর্‌লে। তারা কোনরকম ব্যস্ততা প্রকাশ না কোরে ধীরে-সুস্থে সব গুছিয়ে নিলে। তার পর নোটের তাড়া। সর্দ্দার চোর বল্‌লে, "নম্বরী নোট নিও না।"

ঘনশ্যাম বল্‌লে, "তা হলে গোল হতে পারে।"

সর্দ্দার বল্‌লে, "আপনি ত সব জানেন। নম্বরী নোটগুলো অচল টাকার মত, বাজারে চলে না।"

"চলে, তবে সকলের কাছে নয়।"

এমন সময় হরপ্রসাদ আর তাঁর পত্নী এলেন। চোরের সর্দ্দার তাঁদের খুব সমাদর কোরে অভ্যর্থনা কর্‌লে। হরপ্রসাদ বল্‌লে, "আস্‌তে আজ্ঞে হোক্, আপনি হলেন বাড়ীর কর্ত্তা, বসুন, বসুন।"

হরপ্রসাদ আর ভুবনমোহিনী বস্‌লেন। হরপ্রসাদ স্মিতমুখে বল্‌লেন, "ঐ সময়টা আপনারাই বাড়ীর কর্ত্তা।

শিশিরের স্মৃতি

বোশেখ মাস পড়ে গেছে। কলকাতার ইট-পাথর ভেদ ক'রেও বসন্তের মধু-চোঁয়ানো রঙীন যে পতাকাখানি বাতাসকেও রঙের নেশায় আকুল ক'রে উড়ছিল, তপনের কড়া তাপে সেখানিও ঈষৎ ফিকে হয়ে এসেছিল।

অগণ্য সৌধ-তরঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পিত গাছের গাঢ় হলুদ রঙের উপর অস্ত-রবির সিঁদুরে আলো ঝক্‌মক্‌ করছিল। আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণ ছেয়ে গাঢ় কালো মেঘ এমন নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে, সেদিকে চোখ ফেরাতেই মনে পড়ে,—

ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে—
কে দিয়াছে কেশ এলায়ে!

পথচারী পথিকদের শিথিল গতি কাল-বোশেখীর ঝড় জলের আশঙ্কায় ক্ষিপ্রতর হয়ে উঠেছিল।

হোষ্টেলের ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবী চড়িয়ে সান্ধ্য ভ্রমণের উদ্যোগে আস্তিনের বোতাম আঁটছিলেন, অথবা আ-চিবুক চুলের গোছা ব্রসের সাহায্যে কৌশলে মাথার উপরেই চেপে গুছিয়ে রাখছিলেন, তাঁরা আকাশের ঘনঘটা দেখে কেউ বা ক্যাম্বিসের চেয়ারে আর কেউ বা সেই পায়রার খোপের মত ছোট ঘরের মাঝেই বিছানার একপাশে বসে পরম উৎসাহে, সামান্য সরল কথার সূত্র ধরে অন্তহীন তর্কের সৃষ্টি করে দিলেন!

শিশিরের ঘর বন্ধ। বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেই সে ঘর বন্ধ করা হয়েছে। রুদ্ধ দ্বারে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বন্ধু সুধীর ডাকলে, "শিশির,—এই শিশির—"

নীরব ঘরের দুয়োরের একটু ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, ঘরের ভেতরে ঘরের অধিবাসীটি জাগ্রত অবস্থাতেই বসে আছে। বার-কতক ডাকের পরে সাড়া পাওয়া গেল।

"কে···সুধীর নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে দুয়োর খুলে গেল। ঘরে ঢুকতেই এক ঝলক অতি তীব্র বিদ্যুতের আলো চোখে লেগে দুজনেই চমকে উঠ্‌লো! মিনিট দু-একের মধ্যেই ঝমঝমে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাগল হাওয়া মত্ত আনন্দে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল।

বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে একটু বিস্ময়ের সুরে সুধীর প্রশ্ন করলে, "কাল বুঝি থিয়েটারে গিয়েছিলে? কালও এসেছিলুম, তোমার দেখা পাইনি।"

"না,—থিয়েটারে আমি অনেক কাল যাইনি,—তবে কাল আমার বেড়িয়ে ফিরতে দেরী হয়ে গিয়েছিল।"

"আজও তো ভাবছিলুম, বুঝি বা ফিরেই যেতে হয়! কি, হচ্ছিল কি? এত ডাকে জবাব নেই?—মনটা ছিল কোথায়?"

বন্ধুর সকৌতুক প্রশ্নের উত্তরে প্রচ্ছন্ন ব্যথা-ভরা স্বরে শিশির বললে, "হ্যাঁ,—মনটা আমার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল!"

"পথে পথে?"

"তা বলে এই পাথুরে রাস্তায় নয়। আমাদের দেশের যে পথটায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হাঁটতে পারতুম, সেই আমার চির-চেনা পথে!"

"আচ্ছা, তারপর? পথে কি দেখলে বলতে পারো—?"

"পারি। কিন্তু "

শিশির একবার বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে,—বিশেষ কাছাকাছি আর কেউ নেই,—মেঘলা দিনের ঝিমিয়ে-আসা আলোয় লোকের মুখ আর চেনাও যায় না! সুধীর বললে, "এখন এখানে আর কেউ আস্‌চেনা বল না তুমি, তুমি তো বলবে বলেছিলে?"

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে শিশির তার প্রাণের পটে রক্তে লেখা চিত্রখানি বন্ধুর কাছে খুলে দিলে। সজল-ঘন বাদল-সাঁঝের ঝর ঝর অশ্রু বর্ষণের মাঝে শিশির বললে—

"ঝরা ফুলের মরা গন্ধের মত এ আমার কথা।

সহরের ওপরে বাড়ী বলে আমার পড়াশুনো অনেকদিন অবধি বাড়ীতে থেকেই চল্‌ছিল।

আমাদের দেশেই আমাদের বাড়ী ছাড়া আরও অন্য এক বাড়ীতে আমার সকল পরিচয় খুব বেশী ক'রে জানা ছিল, আমি সেখানে অবাধ বিশ্বাসের সঙ্গে স্নেহ-ভালবাসা সবই পেয়েছিলুম, কিন্তু আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের একটুও হৃদ্যতা ছিল না।

কিন্তু তাতে আমার গতির কোনো বিঘ্ন আনতে পারেনি, বোধ হয় সর্ব্বজয়ী মনের আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে যেত।

এখনি ভাবছিলুম আমি সেই পথ,—যে পথটুকু পেরিয়ে গেলেই চামেলীর পলকহারা চোখদুটীর আনন্দের আলো আমাকে মুগ্ধ—হয়তো বা আমার চৈতন্যকে মূর্চ্ছাহত ক'রে তুলতো!

তুমি তো জানো সুধীর,—গন্ধে, বর্ণে, গুণে, কোনো রকমে আমি ভুল করিনি,—তবুও মানুষ দেবতা নয়, তাই কিছু ভুল আমার হয়েছিল, পরে তা বুঝেছিলুম। সেবারে যখন পরীক্ষার ফল বেরুবার পরে আমার কলকাতায় আসাই সাব্যস্ত হলো, সেই সময়ে বুঝলুম যে, কি বেদনার মুখেই আত্মনিবেদন করা গিয়েছে! বুঝলুম, যার প্রতীক্ষিত চোখের সাগ্রহ দৃষ্টির ডাক আমার এই এতটুকু পথের শিথিল গতি দ্রুত ক'রে তোলে, তারই নীলপদ্মের মত ছলছলে দুটী চোখের কাছে বিদায় নিতে হবে—দু-চারশো মাইল দূরে চলে যাবার জন্যে!

তবু যেতে তো আমায় হবেই। যখন চামেলীর দাদাদের সঙ্গে বাইরের আলাপ শেষ করে চামেলীর সঙ্গে দেখা হলো, তখনো তার কাছে নিভা বসেছিল।

নিভা চামেলীর বন্ধু। প্রায়ই সে চামেলীর কাছে আসতো দেখেছি, আমার গলার সাড়া পেলেও চামেলীর চোখে-মুখে যে অকুণ্ঠিত আনন্দের স্নিগ্ধ দীপ্তি ফুটে উঠতো, তার আড়ালে কখন্ যে নিভারও কুণ্ঠিত বুকের অন্তরালে তার মুখ-কান লাল হয়ে উঠতো, আমি তা চোখে দেখবার বিশেষ দরকার বোধ করিনি। কিন্তু চামেলীর চোখ মেয়েদের চোখ, তার চোখে এটুকু এড়ায়'নি।

সে যে কত বড় ত্যাগশক্তি, কি অসাধারণ সহ্যশক্তি নিয়ে জন্মেছিল, তাতে কিছুতেই বিচলিত হওয়া তার সম্ভব ছিল না! তার প্রফুল্ল হাসির আড়ালেও সে তার অন্তর-আকাশের সব বিপ্লব চাপা দিয়ে রাখতে জানতো।

তার কাছে, কেমন ক'রে কি কি কথায় যে বিদায় নেব, তার একটা কল্পনা বাড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে পথে আস্‌তে আস্‌তেই গড়ে রেখেছিলুম, কিন্তু আসল কাজের সময়েই দেখি তার সমস্তটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে!

তাই অচেনা পথে পা দেবার মত ক'রে তার কাছে বিদায়ের কথা পাড়তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু সে নিজে থেকেই প্রথমে বললে, "তারপর! তোমার পড়াশুনোর কি রকম হলো? কলকাতা যাওয়াই তো ঠিক?"

"হ্যাঁ। বাবা কলকাতায় পাঠানোই ঠিক করেছেন,—কাল যাব।"

"কাল?...কালই যাবে?"

তার অম্লান সুন্দর মুখে একটু যেন বেদনার ছায়া দেখা গেল। চোখের পাতায় শিশির-কণাও যেন দেখলুম,—পরক্ষণেই আমার মুখপানে মুক্ত চক্ষে চেয়ে সে বললে, "চললে তা হলে?"

"না গিয়ে যে উপায় নেই,—আবার ফিরে যখন আস্‌বো হয়তো তোমার সঙ্গে দেখাই হবেনা।"

"বাঃ! কেন হবেনা?"

"তুমি হয়তো অন্য ঘরে চলে যাবে, সে আরো কত বেশী দূরে—"

"যাঃ-ও!"

"আশ্চর্য্যি নাকি?"

"না, ভারি সত্যি! তা দূরে থেকে আনিয়ে নিয়ো।"

"কি অধিকারে?"

চামেলী আমার কাছে বসেছিল। তার মাথার চুলের মৃদুগন্ধ তপ্ত লঘু শ্বাসের সৌরভ থেকে আরম্ভ ক'রে তার পুষ্পপেলব শুভ্র তনুখানি ঘিরে আমার ব্যথা সাঞ্চিত হয়ে উঠছিল।

আমার মানুষ মনের ক্ষুধা যে অসঙ্কোচ স্পর্দ্ধায় তাকে আমার ব'লে বুকে চেপে ধরবার প্রার্থনা নিত্য জানাতো! পাথর-ঢাকা ঝরণার মত এইখানেই ছিল যত বেদনার সৃষ্টি!

চামেলী মুখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়েছিল, আমি ডাকলুম, "চামেলী—"

আমার গাঢ়স্বরে একটু চকিত হয়ে সে বললে, "কি ?"

"অধিকার নেবার যে, কোনোদিকেই কোনো উপায় নেই। এক তো তোমাদের আর আমাদের ঘরোয়া বিরোধ আছেই, তা ছাড়াও আমাদের মেলবার মস্ত একটা বাধা যে আমরা স্বগোত্র,—স্বগোত্রে তো বিয়ে হয় না !"

"তা যদি না হয়তো আমাদের এ-রকম মনকে প্রশ্রয় দেওয়া একেবারেই উচিত নয়,—দূরে সরে যাওয়া বোধ হয় ভালই হবে। আমি তো মনে করি, তাই—"

"হুঁ—তাতে কি স্নেহ ভালবাসা কমে যায় ?"

তার ক্ষুব্ধ গলায় একটু শ্লেষও ছিল। আমি বললুম, "যাওয়া তো উচিত। যা পাবার নয় তার জন্যে—"

"চুপ কর,—চুপ কর তুমি। আমি জানতুম না যে, তোমার মন এত ছোট, এমন স্বার্থপর তুমি,—তুমি কি পাওনার নিক্তিতে ভালোবাসার ওজন করতে চাও ? তা হলে তো স্বগোত্র মনে ক'রেই ভাল না বাসলেও পারতে ! দেখ,—এতে এত দেনা-পাওনার হিসেব রাখা চলে না। নাই বা হলো বিয়ে,—ভালবাসার একটা স্বাভাবিক অধিকার আছে,—তাই থাকলেই হলো ! আমরা পরস্পরের শুভার্থী বন্ধুই না হয় রইলুম !"

ঠিক ! কাম্য প্রেমের ধন,—সে যে দুষ্প্রাপ্য ! ভোগের বাইরে থাকাই তার ঠিক্ !

২

চলে এলুম কলকাতায়। তবু এ মন তারি সৌরভে ভরা ছিল। মাঝে মাঝে ভারী ইচ্ছে করতো তাকে চিঠি লিখ্‌তে, কিন্তু সাহসে কুলিয়ে উঠ্‌তোনা,—যদি সে চিঠি গিয়ে তার বাবার হাতে পড়ে !

আমি জানতুম যে যদি তার দাদাদের কারো হাতে আমার চিঠি পড়ে তো তাদের তরুণ মন,—করুণায় তারা সে চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দেবে, কিন্তু দৈবাৎ যদি তার বাবার হাতে পড়ে, আর তিনি ভুল কিছু বোঝেন !

একবার হয়েও ছিল এমনি ব্যাপার। গেল বারে জানুয়ারীতে—না, না, ডিসেম্বর,—ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময় আর-আর বন্ধু-বান্ধবদের মনে পড়বার সঙ্গে চামেলীকেও বাদ দিতে পারলুম না,—কিন্তু অনেকখানি ভেবে-চিন্তে অনেক ইতস্ততঃ করে তবে তাকে আবরণহীন একখানি কার্ড মাত্র পাঠিয়েছিলুম ! নিজের নাম তাতে লিখতে সাহস করিনি—জানতুমই যে, তার হাতে এটি পড়্‌লে নাম না লিখলেও কে যে পাঠিয়েছে, তা বুঝতে তার দেরী হবে না ! তাই নামের জায়গায় লিখেছিলুম, "A friend !"

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয় বলে যে একটা কথা আছে, সেটা একেবারে সার্থক হয়ে গেল। আমার পাঠানো কার্ডখা'ন গিয়ে চামেলীর বাবার বাক্সেই বন্দী হয়ে রইল। নামের জায়গায় ওই A friend লেখা দেখে তিনি হয় তো একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সে কথা নিয়ে আর কিছু আলোচনা করেন নি !

—"তুমি যে চিঠি লিখেছিলে, চামেলী তা জান্‌তো ? সে তোমাকে চিঠিপত্র দিত নাকি ?"

—"দিত,—মাঝে মাঝে—কেন না আমার তো জবাব দেবার উপায় ছিল না।"

—"আচ্ছা, তারপরে ?"

—"ফিরে বছর ছুটীতে বাড়ী গিয়েছিলুম। সেই সময়ে যখন চামেলীদের বাড়ীতে যাই, তখন ছেলেদের কাছ থেকে জান্‌তে পারি যে, যে-প্রলোভনকে তখন অত করেও চাপতে পারে নি, সেখানি বাক্সে বন্দী হয়েই আছে।

যাহোক্ এবারে বাড়ী গিয়ে অবধি মস্ত একটা বিপদের হাওয়া আমাকে পরিবর্ত্তনের মাঝে পড়তে বাধ্য করেছিল !

আমার মা তখন অসুস্থ। তাঁর আর বাড়ীর আর সকলের ইচ্ছে যে আমি বিয়ে করি ! মায়ের বড় ছেলে আমি,—এ অবস্থায় মায়ের কথা রাখা আমার একটা কর্ত্তব্যও তো বটে !

কিন্তু এ মন আমার পূর্ণ ছিল। তাই এ আসনে আর কাউকে স্থান দিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় নি, বিয়েতে আমার

যে একটুও মত নেই, তা শক্ত করেই জানালুম। তারা সব থেমে গেল। কোথায় যেন সম্বন্ধ হচ্ছিল, সে সব বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু আমার মতামতের উপরে অবাধ কর্তৃত্ব যার ছিল, সে আমাকে মুক্তি দিলে না, দেখা হওয়া মাত্রই বলে বস্‌ল, "তুমি নাকি বিয়েতে অমত জানিয়েছো ?"

একটু চমকে আমি চেয়ে দেখলুম, তার সেই অম্লান সুন্দর মুখখানি তেমনি উজ্জ্বল অম্লান জ্যোতির আভাস মাখা। আমি বললুম—"জানিয়েছি।"

"কেন ?"

"মত নেই বলে। কেন, তাতে তোমার কি হলো, কৈফিয়ৎ নিচ্চো যে !"

"কেন মত নেই, তাই বল না ? তোমার সমস্ত ঠিক রয়েছে—"

"কি ঠিক রয়েছে ? কিছু না, কিছু না,—কিছুই আমার ঠিক নেই চামেলী,—কেন আঘাত দাও ? তুমি তো জানো যে আমার সমস্তই অন্যের অধিকারে !"

"অন্যের অধিকারে ? এ কথা কি সত্যি ?"

"আমায় কি প্রমাণ দিতে হবে যে সত্যি কি না ?"

"তবে সেই অধিকার নিয়ে সে যা ইচ্ছে করতে পারে. নিশ্চয়ই। ভাল, আমি কনে পছন্দ ক'রে দেব, তুমি বিয়ে কর,—করবে তো ?"

বললুম, "কেন অধিকারের অপব্যবহার করবে ?"

"আবার ! অপব্যবহার কেন করতে যাব,—একটু ধর্ম্মের কাজ করবো—"

"অর্থা ?"

"তৃষিতকে জলদান ইত্যাদি—"

আমি প্রশ্ন-ভরা চোখে চামেলার মুখ-পানে চাইলুম। তার শান্ত সংযত মুখে একটু হাসির ছটা দেখে আমিও একটু হেসে বললুম, "বুঝতে পারছিনে, আমাকে কাকে দান করবে ?"

"যে তোমাকে ভালবাসে, তাকে।"

"কে সে ?"

"কেন বুঝতে পারছো না ?—সে নিভা।"

"নিভা ! নিভা আমাকে ভালবাসে ? কেন সে তা বাসতে গেল ? সে তো সবই জানে, তোমার বন্ধু যখন সে—"

"সে কথা তাকে বিয়ের পরে জিজ্ঞাসা করো,—এখন আর আপত্তি-টাপত্তি করো না, আমি উঠে পড়ে লেগে যাই,—কেমন ?"

"তার পর ?"

কান্নার চেয়ে করুণ হাসি হেসে সে মুখ নামালে।

আমারই দীর্ঘ দ্রুত শ্বাসের হাওয়ায় তার শুভ্র নিটোল ঘাড়ের উপরকার কুচো চুলগুলি কেঁপে কেঁপে উড়ছিল, আমি চুপ ক'রে তাই দেখছিলুম।

পরীর মত হাল্‌কা তরুণী বালিকার ছোট্ট বুকখানির মহিমা আমাকে সকল দিকে মুগ্ধ করেছিল !

এর পরে সে নিভার সঙ্গে আমার বিয়ের চেষ্টায় লেগে গেল। পাত্রী হিসেবে নিভার খুঁৎ বিশেষ কিছু ছিল না। আর চামেলীর আগ্রহ আমাদের বাড়ীর সকলকে এক-মত করেছিল। এবারে আমি মতামতের বাইরে মৌন হয়েই রইলুম।

সুখ বা আনন্দ ইচ্ছে ক'রেও তো পাইনি, বরং উল্‌টে দুঃখ ও ব্যর্থতাই এসেছে, তাই এবারে না চাইতে যা পেলুম, তাতে আর বাধা দেবার কোনো চেষ্টা করলুম না।

যেদিনে বিয়ে হলো, সেদিনে আমি যতবার মুখ তুলে চেয়ে দেখেছি,—দেখেছি, চারিদিকে আনন্দের ঢেউ তুলে, উৎসাহ-চঞ্চল পায়ে সে ঘুরে ঘুরে এ-ঘর ও-ঘর করছে ! মাঝে মাঝে বন্ধুকে গিয়ে আদরও করছে !

সেকালে কালীপূজোয় নরবলি হতো, যাকে বলি দেওয়া হবে সেও উৎসবে যোগ দিয়ে আনন্দ করলে যেমন মনে হয়, এদিনে আমারও তেমনি মনে মনে উৎসবটাকে ভারী বে-মানান মনে হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নেই চুকে গেল !

সৌভাগ্য ছিল যে,—আমার কোনো কথাই আমার স্ত্রীর অবিদিত ছিল না। তাঁর অতি-গোপন আকাঙ্ক্ষা যে কখনো পূর্ণ হওয়া সম্ভব হবে, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন

নি, আর তা হতোও না, যদি চামেলী এমন করে একাগ্র হয়ে না লাগতো!

বিয়ে করবার পরে দূর আকাশের চাঁদের মত চামেলীকে আমার স্নিগ্ধ-সুন্দর বলে মনে হলেও তাকে চাঁদেরি মত উঁচু ও পাওনা-প্রার্থনার অতীত বলে মনে হত!

আমার স্ত্রী যদিও চামেলীরই বন্ধু, তবু যে তাকে খুব প্রসন্ন চক্ষে দেখতেন, তা মনে হতো না, কিন্তু চামেলীকে লক্ষ্য ক'রে মাঝে মাঝে তিনি বিষবাণ নিক্ষেপ করতেন আমারই ওপরে!

বলা বাহুল্য সেগুলি আমার খুব মিষ্টি বোধ হতো না। আমার বিবাহিত জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক করলুম যে, চামেলীর যোগাড়-যন্ত্রই আমার এ বিয়ে ঘটিয়েছে, আমিও যোগাড়-যন্ত্র ক'রে চামেলীর বিয়ে দিয়ে দেব!

ঠিক তেমনি প্রসন্ন উৎসাহ-ভরা বুক নিয়ে এ কাজ করতে হবে! নইলে নিজেকে পরাজিত মনে হবে যে! আর চামেলীর বিয়ে শেষ হলেই অতীতের কাঁটার ঘায়ে একটা পরদা পড়ে গিয়ে বেদনার উপশম হয়ে যেতে পারে, এও একটা কথা মনে হত!

আব্‌দেরে শিশুর মত মানুষের মন যা দুষ্প্রাপ্য তারই বায়না করে, পেলে হয় তো দু-দিন না যেতেই মাটীতে ফেলে দ্যায়, আর তার কোনো যত্ন নেবার দরকার বোধ করে না, কিন্তু না পেলে যুগযুগান্ত তার বায়না-ধরা কান্না আর থামে না!

মানুষের এই চিরন্তন স্বভাবই কচি বেলাকার আবদারে ফুটে ওঠে! চামেলীদের বাড়ীতে গিয়েছিলুম। শুনলুম, চামেলীরই বিয়ের আলোচনা চলছে! কত সম্বন্ধই আসছে, আর বনিবনাও না হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, কোথাও বা পাত্র সুপাত্র নয় বলে বাধছে, আর কোনখানে পাত্র-পক্ষই আপত্তি করে পিছিয়ে যাচ্ছে!

আমি গিয়ে শুনলুম, চার-পাঁচটী পাত্রের কথা, কিন্তু বাছাই ক'রে যেটীকে সর্ব্বাংশে সুপাত্র বলে মনে করা যেতে পারে, এঁরা সে-পক্ষ থেকে কোনো আগ্রহ টের না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

যা শুনলুম, তাতে আমারও পাত্রটীকে সুপাত্র বলেই মনে হলো। কিন্তু একে আমি চিনি না। এর আগে আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম, চামেলীর বিয়ের জন্যে চেষ্টা করবো, তাই যে তপ্ত শ্বাস বুকের কাছে জমা হয়েছিল, তাকে চোখ রাঙিয়ে থামিয়ে রাখলুম!

সেইদিনেই চললুম ওই পাত্রটীর খোঁজে। ইচ্ছে দুরকম ছিল। এক,—বিয়ে হওয়ার আগেই চামেলীর স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা,—আর যদি সে অন্য কোথাও বিয়ের চেষ্টায় থাকে তো তাকে ফিরিয়ে এইদিকে আনতে চেষ্টা করা!

অনেক চেষ্টা ক'রে পাত্রটীকে খুঁজে বের ক'রে পুরানো বন্ধুর মত আলাপ ক'রে নিলুম। যখন বিয়ের কথা উঠ্‌লো, তখন সে বললে, তার বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছে, অন্য জায়গায়!

আমার বুকের গুমট বোঝা যেন পলকের জন্যে হাল্‌কা মনে হলো, কিন্তু তাহলে তো চল্‌বে না—! চামেলীদের নাম ক'রে বল্‌লুম, "আপনার না এই জায়গায় বিয়ের কথা চলছিল?"

"চলছিল,—কিন্তু অন্য জায়গায় ঠিক হয়েছে, তাই ওটা আর হলো না!"

কোথায় ঠিক হয়েছে জিজ্ঞাসা ক'রে শুনলুম, সে মেয়েটী আমারই ভাগ্নী। মামা হয়ে আমি কি ক'রে এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে পারি?

দিন-কয়েক কেটে গেল। হঠাৎ খবর পেলুম যে, আমার সে ভাগ্নীটি মারা গিয়েছে, তার বিয়ে আর হতে পারে নি,—এর পরে আমি আবার সেই পাত্রের সঙ্গে দেখা করলুম। দু'চার কথার পরে বললুম—"আচ্ছা, আপনি ও মেয়েটীকে কি দেখেছিলেন?"

"না—"

"তবে একবার দেখুন না,—যাবেন?"

আমার মনে এ বিশ্বাস ঠিক ছিল যে চামেলীকে একটীবার দেখলে এঁকে মত ফেরাতেই হবে! সে সৌন্দর্য্যের তুলনা তো কৈ এ অবধি আর কোথাও দেখলুম না!

শুধু আমি নই, তাকে যে দেখেছে সেই বলে এ কথা। আমার চিত্ত? সে তো রূপ ছাড়িয়েও তার প্রাণের দীপ্তিতে মাতাল হয়ে গিয়েছিল,…কিন্তু থাক্, সে আকাশ-কুসুমের কথা,—এ লোকটী তো এখন দেখবে শুধু তার রূপ! তাতেও তো বর্ণে বা শোভায় সে যে অপরূপ!

বন্ধুর মত আগ্রহ ক'রেই এই ভদ্রলোকটীকে বাড়ীতে নিয়ে এলুম। যাকে দেখবার জন্যে একদিন আমার এ নয়নের প্রতি পলক ব্যগ্র আগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকৃত, যার একটুখানি সহজ-সরল হাসির হাওয়ায় ফাগুন বনে দখিণ হাওয়ার পরশ লাগার মত, আমার এ মনের বনে নিত্য বসন্ত জেগে উঠ্‌তো, অপরের মুখেও তার নাম শুনলে কুহু-রবের মিষ্টি সাড়া পেতুম, আমার মনোমন্দিরের সেই দেবীকে পরকে দেখাবার জন্যে।

মেয়ে দেখা হয়ে যাওয়ার পর জানা গেল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে। চামেলীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

আমার বাইরের উৎসাহ-আগ্রহ দেখে বিশ্বসংসার বুঝলে যে, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশী খুসি যেন আর কেউ হয়নি!

বিয়ের কাজের অনেক ভার কর্তৃপক্ষ হতেই আমি পেলুম, আর অনেকগুলি ভার আমি নিজে হতেই তৈরী ক'রে নিলুম। শুধু কি তাই? বরের পক্ষ হতেও আমাকে যোগ দিতে হবে যে,—কারণ বরেরও যে আমি বন্ধু!

আমার বিয়ের দিনে চামেলীর উৎসাহ-চঞ্চল ব্যস্তভাব আমার ভালরকমই মনে ছিল। এই জীবনের ছাড়াছাড়ির পথে চির-বিরহের কাঁটাগাছে ত্রিলোক-বাঞ্ছিত প্রেমের মন্দার ফুটে উঠ্‌বে না?

নাই বা হলো সে আমার বাঞ্ছিতা, তবু পূজিতা তো হতে পারে! সত্যিই আমি তাদের দাম্পত্য জীবনের শুভার্থী বন্ধু!

৩

পূর্ণিমার রাত্রে বিয়ে। লগ্ন ছিল অনেক রাত্রে। সন্ধ্যার দিকটা ভোজের আয়োজনে ভারি গোলমালে কেটে গেল, এরি একটা ফাঁকে আমি বিয়ের জন্যে ফুলের মালাটালা সাজিয়ে রাখলুম।

যে মালা চামেলীর হাত থেকে তার স্বামীর গলায় যাবে, সেগাছি আমি নিজের হাতে গাঁথবো ঠিক করলুম।

মালাকে বলা ছিল। আমার সুমুখে একরাশ অম্লান শুভ্র চামেলী আর জুঁই বেলের ডালা ধরে দিয়ে সে সরে গেল। আমি মালা গাঁথতে গিয়ে দেখি, ছুঁচ তো নেই।

নিভাও তখন বিয়ে-বাড়ীতেই ছিল। একটা ছুঁচের জন্যে তার খোঁজ করতে গিয়ে চামেলীর সঙ্গে দেখা হলো। বিয়ের কনের বেশেই সে পিঁড়িতে বসেছিল। আমার দিকে একবার চোখ তুলে চাইলে!

কিন্তু আমার মনের তখন এমন অবস্থা নয় যে, সে চোখে প্রশ্ন কিছু আছে কিনা তাই খুঁজতে যাব।

রাত্রে যখন কনের পিঁড়ি ধরে সাত-পাক ঘোরানো হল, তখন আমিও তার মধ্যে ছিলুম। শুভদৃষ্টির সময় বরের কাছাকাছি দাঁড়াতে হয়েছিল বলে তার চোখের এক পলক আমার চোখেও পড়ে গিয়েছিল,—ওঃ! সে কি বাদল রাতের সন্ধ্যা-তারার মত স্নিগ্ধ-সজল দৃষ্টির আভাস!

এর পরে যখন একবার তার সঙ্গে দেখা হলো, সে আমার একখানি ফটো চাইলে! আমিও দেব অঙ্গীকার করলুম! সে এক চকিতের একটুখানি দেখায়—

তার পরেই বিয়ে-বাড়ীর বহু লোকের কোলাহল,—আর আমি তাকে কিছু দেবার অবসর পেলুম না, অতলোকের মাঝখানে কি ক'রে দেব?

আমার ফটো, সে আমার অনেক অকথিত কথার মত পকেটেই তোলা রইল তখনকার মত,—মনে করলুম, যদি অবসর পাই তো ষ্টেশনে গিয়ে দেব।

ওই যে একটুখানি দেখা হয়েছিল, ওরি মধ্যে চামেলী বলে দিলে, আর যেন আমি তাকে কোনো চিঠিপত্র না দিই! অবশ্য এ কথা সে না বললেও আমার অতখানি দুঃসাহস হতোও না!

ষ্টেশনেও অনেক লোকের ভিড়। চামেলীকে নিয়ে তার স্বামীর কাছে কাছে থেকেই আমি বন্ধুটীর সঙ্গে আলাপ করছিলুম। তারা ট্রেণে উঠ্‌লে পরে আমি

একবার চামেলীর মুখপানে চাইলুম,— ফটোখানা পকেটেই ছিল।

ট্রেন ছেড়ে দিলে। মন্থর গতিতে খানিকটা আগিয়ে গেলে আমি লাফিয়ে উঠে ফটোখানি ছুড়ে দিলুম। এককোণে লেখা ছিল, বন্ধু!

ও কথা লিখতে সাহস হয়েছিল এই জন্যে যে, তার স্বামীও আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছে!

সর্ব্বস্ব গেলেও লোকে স্মৃতি মুছতে চায়না! মরণ-কালেও জ্ঞান থাকলে অনেকে বলে যায় যে, আমাকে মনে রেখো, কিন্তু মরণের পরে তাকে কেউ মনে রাখা না রাখায় কি তার লাভ-ক্ষতি কিছু আছে?

সাগ্রহে চামেলী আমার ফটোখানি তুলে নিলে, দেখলুম, তারপর,—তারপর ঝাপ্‌সা চোখ মুছে আর একবার—একবার মাত্র তাকে দেখতে চাইলুম, তখন ট্রেণ বহুদূরে চলে গেছে! আর দেখতে পাওয়া যায় না!

দেখলুম, জনহীন কঠিন পাথরের পথের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি, সাঁঝের কালো আবরণ যেন আমার জীবনের আনন্দ ও নিরানন্দের মাঝখানে নিঃশব্দে এলিয়ে পড়্‌ছে! দূরে সিগ্‌নাল দেখা যাচ্ছিল।

দিন দুই তিন পরে চামেলীর স্বামীর চিঠি পেলুম। তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর স্ত্রী আমার ফটোখানি পেয়ে ভারি খুসি হয়েছেন! স্বামীর বন্ধুর ফটো পেয়ে যতখানি খুসি হওয়া সম্ভব ততখানিই কি? আমার মুখে হাসি এলো।

—"এই কি এ গল্পের শেষ?"

—"ওঃ, না—আরো আছে,—আর অল্প-একটু!"

—"তবে বল,—তোমার স্ত্রী বোধ হয় এতদিনে নির্ভয় হলেন?"

—"হ্যাঁ ততদিনে, যতদিনে বাড়ী গিয়ে শুনলুম যে, চামেলী তার বাপের বাড়ী এসেছে, সাংঘাতিক অসুস্থ শরীর নিয়ে, আর একটী অতি কচি শিশু মেয়ে নিয়ে—

আমি তাকে দেখতে যাবো, এ প্রস্তাবটাই হয়তো নিভার পছন্দ হয়নি, কিন্তু জোর ক'রে বারণ করতেও পারতো না, কেন না আমিও তো জানি যে, তিনি তাঁর ব'লে যে জোর করছেন, সেটা চামেলী কি উৎসাহে তাঁকে দান করেছিল! তার পরের দিন কি একটা কাজে আমি অন্য এক জায়গায় যাব ঠিক ছিল, তাই সেইদিনই চামেলীকে দেখতে গেলুম,—এ যাওয়া আমার অনধিকার প্রবেশের মতই সঙ্কোচ-ক্ষুণ্ণ!

গিয়ে দেখলুম, সেই অতুল সৌন্দর্য্যের রাণী চামেলী একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েছে! দেহের কিংবা মনের, কিসের ঝঞ্ঝা যে এমন করে তাকে নিঃশেষ করেছিল, তা ঠিক বোঝা যায় না, কেন না মুখের নির্ব্বিকার হাসিটী তখনো লেগেই আছে!

আমাকে দেখে বেশ শান্ত-ভাবেই আমার আর নিভার কুশল সে জিজ্ঞাসা করলে। তারপর খানিক বাদে বললে, "আপনি কি আজই চলে যাবেন?"

বললুম, "হ্যাঁ।"

"বিশেষ দরকারি কোনো কাজে যাবেন কি?"

"কেন বল তো?"

"যদি আজকের দিনটী থেকে যেতে পারতেন তো বড় ভাল হতো! শুধু আজকের দিনটী—থাকবেন?"

আমি দেখলুম, এই ক'টী কথা বলতেই তার রক্তহীন সাদা মুখ বেদনায় কালো হয়ে উঠেছিল! দীর্ঘশ্বাস সামলাতে গিয়ে সে হাঁপিয়ে উঠছিল। কিন্তু আমি ভাবলুম, একটা দিন থেকেই বা কি হবে! কেন যে সে আমাকে থাকতে অনুরোধ করলে তা আর বুঝলুম না!

বিশেষ, এই যে চামেলীকে দেখতে এসেছি, এতেই তো নিভার মন-ভার নিশ্চয় হবে, তার ওপরে থাকলে তো আর কথাই নেই! অনর্থক অপ্রীতির সৃষ্টি!

চামেলীর কথা রাখি নি,—তবু নিভার তপ্ত অভিযোগ যে, আজও যে আমি সেই পুরানো অতীতকে ঘাঁটিয়ে জাগাই, তাতে সে দুঃখিত ইত্যাদি—

নিভার মনের সঙ্কীর্ণতায় যে আমিও কি-রকম দুঃখিত সেটা তাকে জানানো দরকার মনে করছিলুম,—কিন্তু তা আর আবশ্যক হলো না।"

—"অর্থাৎ— ?"

—"অর্থাৎ খবর পেলুম যে, সেই রাত্রেই এবারকার মত চামেলী ঝরে গিয়েছে,—এখন সে স্বর্গে—"

শিশির থেমে গেল !

সুধীর একটুখানি কি ভেবে নিয়ে বললে, "চমৎকার রোমান্স তো ! আমি এটা একটা গল্প বানিয়ে বের করতে চেষ্টা করবো ! বেশ জলন্ত হবে !"

শিশির বললে, "হ্যাঁ,—আগুন থাকলেই আলো থাকে, তা তুমি গল্প-টল্প যা বানাও, বানিয়ো, নাম দিয়ো না যেন !"

—"আচ্ছা, নামগুলি না হয় বদ্‌লে দেব।...আরে বারান্দায় ওরা গান করছে নাকি ? চলো শুনিগে—"

—"না,—ভাল লাগছে না—"

—"না, না,—ওঠো, চল !"

—"আচ্ছা, চল যাই।"

বাইরে তখনো বিরহতপ্ত আকাশের চোখের জল ঝরঝর করে ঝরে পড়ছিল। বারান্দা নয়—ঘরের ভিতরেই, ফার্ষ্ট ইয়ারের একটী কিশোর ছাত্র তরুণ-কোমল সুরে গাইছিল,

"ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে—"

শ্রীনীহারবালা দেবী।

পথ-পাগলের গান

*

পাগল ভোলা, ঝড়ের দোলা দুলিয়ে দিয়ে নৃত্য করো,
কাল-বোশেখীর মেঘ-মাদলের তাল-বেতালে চিত্ত ভরো !
এমন ক'রে ঘরের কোণে রইতে নারি—রইতে নারি,
মুস্‌ড়ে প'ড়ে জীবন-বোঝা পিঠের 'পরে বইতে নারি !
বাইরে বাজে বিশ্ব-বাঁশী, আলোর সুরে রন্ধ্র ভ'রে,
মুক্ত-বায়ুর ছন্দে মেতে সবাই আজ আনন্দ করে !
আকাশ ওদের হাতের মুঠোয়, পাতাল ওদের লীলার গেহ,
ওদের কুহক-ছোঁয়ার গুণে জ্যান্ত হয় যে শিলার দেহ !
ওদের কাছে থির চপলা, লক্ষ্মী বাঁধা ওদের ঘরে,
অন্ধকারের কান্না সুধুই জমাট্ আছে মোদের তরে !
ওদের পায়ের সোপান হয়ে প'ড়ে আছে এই বসুধা,
আমরা আছি জড়ের মত,—নেইকো তৃষা, নেইকো ক্ষুধা !
গ্রহে গ্রহে দিচ্ছে খবর, যাচ্ছে ওরা চন্দ্রলোকে,
আমরা সবাই খাঁচার পাখী, মোদের গীতি বন্ধ শোকে !

** ** **

মোদের হৃদয় বেদান্তেরি "জগৎ-মায়া"-সূত্র-ভরা,
সে-সব ওরা হেসেই ওড়ায়, ভোগ-অমৃতের পুত্র ওরা।
শাস্ত্র নিয়ে আমরা লড়ি, ওরা লড়ে অস্ত্র নিয়ে,
অস্ত্র দেখেই শাস্ত্র ছেড়ে পড়ি গলায় বস্ত্র দিয়ে !
ভোগের কোলে ব'সে তবু ত্যাগের বুলি মুখে ছোটে,
কিন্তু চ্যাঁচাই ভ্যাড়ার মতন দুঃখ যখন বুকে ফোটে।
ভক্ত-বিটেল নয়কো ওরা, নেইকো ওদের ও-রোগ-জানা,
হরিনামের ঝুলির ফাঁকে দেয়না উঁকি মোরোগ-ছানা !
পষ্ট বলে "চাই দুনিয়া ! আমরা মানুষ—তরুণ মানুষ !
কল্পলোকের গগন-পারে উড়িয়ে দেব অরুণ-ফানুষ !"
যৌবনেরি জয়-গীতিকা ওদের নবীন বক্ষে জাগে—
চির-জোছ্‌নার দীপ্ত আলো বিনিদ্র সব চক্ষে লাগে।

** ** **

এ জগতে দৃষ্টি তুলে কে দেখে ভাই কার বেদনা ?
নিজেই ওঠো—পর-মুখো গো ! খাঁচার কোণে আর থেকোনা।
দেশের খাঁচা, সমাজ-খাঁচা, জাতির খাঁচা চূর্ণ করো,
রুদ্র ঝড়ের তীব্র শ্বাসে চিত্ত সবার তূর্ণ ভরো।
যাত্রী যত যাচ্ছে চ'লে, ভেঙে সকল গণ্ডী ওরে—
আমরা কেবল নাড়ছি টিকি মনু-গীতা-চণ্ডী প'ড়ে!
বিশ্বে এখন নতুন বিধান, শাস্ত্র কাজে লাগ্‌বেনা গো,
দুর্ভিক্ষ আর মড়ক ব্যাধি মন্ত্রগুণে ভাগ্‌বেনা গো !
যৌবন কাহার ঘুমিয়ে আছে—
জাগিয়ে তোলো, জাগিয়ে তোলো—
ঘর-ছাড়া ঐ বিশ্ব-পথে আগিয়ে চলো, আগিয়ে চলো !

হায়গো কুণো, ভয় পেয়োনা, মনকে বোঝাও মাভৈ দিয়া,
বুকের দুয়ার ভেঙে তোমার পাগল নাচুক্ তাথৈ-থিয়া !
পাগল নাচুক্—পাগল নাচুক্, যুক্তি-তর্ক উড়িয়ে দিয়ে,—
পাগল নাচুক্—শাস্ত্র-ফাস্ত্র, পত্র-পুঁথি পুড়িয়ে দিয়ে,
পাগল নাচুক্—শিবের চ্যালা ঘুচিয়ে দিয়ে ভয়-ভাবনা, -
আমরা যুবক পথের পাগল, ঘরের কোণের জয় গাবনা।
আমরা যুবক—শক্তি পাগল, আগল ভেঙে ছুটব যত—
আমরা যুবক—ছুটব এবং গণ্ডী বাঁধন টুটব তত !
আমরা যুবক—মোদের পথে সদ্য-ওঠা তপন জাগে,
আমরা ক্ষ্যাপা শিবের চ্যালা, মোদের দেখে মরণ ভাগে !

** ** **

পাগল ভোলা, ঝড়ের দোলা দুলিয়ে দিয়ে নৃত্য করো,
কাল-বোশেখীর মেঘ-মাদলের তাল বেতালে চিত্ত ভরো।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ফোর্ড কার ও হেনরি ফোর্ড

ফোর্ড মোটর-কার এবং তার সৃষ্টিকর্ত্তা ফোর্ডের নাম সভ্যজগতে বিশেষ পরিচিত। আধুনিক জীবন-সংগ্রামের সুকঠিন সমস্যার সময়ে যে-সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি স্বীয় কল্পনা ও প্রতিভাবলে মানবের সুখ-স্বচ্ছন্দতার উপায় বিধানে সমর্থ হইয়াছেন—অথবা কারুকার্য্যসম্পন্ন শিল্প-যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়া শ্রমজাত শিল্পে নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। মহাত্মা ফোর্ড ইঁহাদের অন্যতম। আজকাল প্রত্যেক সহরে যে বিচিত্রনাদী মোটরকার চলিতেছে—নদীবক্ষে যে মোটর লঞ্চ্ ছুটিতেছে—কর্ম্মশালায় শিল্পযন্ত্রাদি চালাইয়া যে মোটর কাজ করিতেছে, তাহা বিচক্ষণ ফোর্ডের প্রাণপাত সাধনার অপূর্ব্ব সাফল্য। ফলতঃ, এই মোটরের প্রচলনে একদিকে যেমন সুখ-সুবিধার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে—অন্য দিকে তেমনি শিল্পশালায় প্রভূত সময়ের লাভ হইয়া শ্রমজাত শিল্প বহুল পরিমাণে সুলভ হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই কর্ম্মবীর ফোর্ড সাহেবের জীবন-কথা ও তাঁহার বিস্তৃত কর্ম্মশালার বিষয়ে আলোচনা করিব।

ইং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে আমেরিকার অন্তর্গত মিশিগন প্রদেশস্থ এক ক্ষুদ্র গ্রামে হেনরি ফোর্ড জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল উইলিয়ম ফোর্ড। তিনি প্রায় ৩০০ একর (প্রায় ৯০০ বিঘা) জমির অধিকারী ছিলেন। উইলিয়ম ঐ জমিতে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। হেনরি পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। সাধারণ শিশুর ন্যায় তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে কোনো চমৎকার বা অলৌকিক ঘটনায় তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের গৌরবময় আভাষ প্রতীত হয় নাই। তবে এই এক বিশেষত্ব ছিল যে, তাঁহার সমবয়স্ক বালকগণ যখন ক্রীড়া-কৌতুকে কাল কাটাইত, হেনরি তখন গ্রামের কর্ম্মকারগণের ভাঁটিতে গিয়া কাজ করিতেন এবং তৎসম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসায় তাঁহার চিত্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিত। সেই সময়ে তাঁহার এরূপ আগ্রহ হইত যে, কোনো কর্ম্মকার তাঁহাকে উত্তপ্ত লৌহখণ্ড পিটাইতে দিলে তিনি অপূর্ব্ব আনন্দ বোধ করিতেন। তখন বালক হেনরি জানিতেন না, এই লোহা পিটানোর পশ্চাতে তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব সাফল্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে !

বাল্যকালেই এমন এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে—যদ্দ্বারা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এক দিন রবিবারে হেনরির পিতা হেনরিকে গির্জ্জায় যাইবার জন্য আদেশ করেন। বালক ফোর্ড বলিলেন, "আমি গির্জ্জায় যাইব না। যদি গির্জ্জাতেই ভগবানকে ধ্যান করিতে পারা যায়, তবে যেখানে ভগবৎ-সৃষ্ট যাবৎবস্তুই

শ্রীভগবানের গুণগান করিতেছে এমন দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে ভগবানের চিন্তা করিতে পারা যাইবে না কেন?" পিতা চমৎকৃত হইয়া বলিলেন", হেন্‌রি,তুমি এ কি বলিতেছ? গির্জ্জাই যে ভগবানের মন্দির—কত বিশ্বাসীর ভক্তির অশ্রুজলে তাহা পবিত্র ও স্নিগ্ধ। ছি, ও সঙ্কল্প;পরিত্যাগ

হেনরি ফোর্ড

কর।" হেন্‌রি পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া গির্জ্জায় গেলেন। তিনি ধ্যানমগ্ন পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন; কিন্তু এইরূপে নীরবে বসিয়া থাকা তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। হেন্‌রি বাহিরে আসিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার সমবয়স্ক এক বন্ধু তাঁহাকে সঙ্কেত দ্বারা জানাইল, হেন্‌রি, বাহিরে আইস—তোমাকে আমি একটি নূতন জিনিষ দেখাইব। হেন্‌রি আর তথায় থাকিতে পারিলেন না। ধ্যানমগ্ন পিতার পার্শ্ব হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বলা বাহুল্য, তৎপূর্ব্বেই তাঁহার বন্ধু বাহিরে আসিয়া হেন্‌রির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে হেন্‌রিকে একটি পকেট-ঘড়ি দেখাইল। হেন্‌রি সেই ঘড়ি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। সেই ঘড়িটি খুলিয়া দেখিবার জন্য হেন্‌রি ব্যাকুল হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথায় বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। তিনি একটা পেরেক খুঁজিয়া লইয়া তাহার মুখটা পিটিয়া ও ঘসিয়া লইয়া এক পেঁচকস প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন এবং তদ্দারা ঐ ঘড়ির চাকা, স্প্রাং ইত্যাদি সমস্ত খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার বন্ধু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। হেন্‌রি শান্ত ও মধুর বাক্যে বলিলেন, "বন্ধু, ভয় পাইয়ো না, আমি এই ঘড়ি খুলিয়াছি, এখান ইহার সমস্ত অংশ যথাস্থানে লাগাইয়া ঠিক করিয়া দিতেছি।" ঐ ঘড়ি মেরামত করিয়া তাহার সমস্ত কলকব্জা লাগাইতে তাঁহার মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

বিদ্যাশিক্ষার প্রতি হেন্‌রি চিরকাল উদাসীন ছিলেন। স্কুলে সাধারণতঃ যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাতে হেন্‌রির চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। তিনি মনে করিতেন কিরূপে এই শিক্ষার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এজন্য তিনি সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতেন। যখন স্কুলেই এক কামারের কারখানা খুলিল তখন হেন্‌রি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কামারের দোকানের কাজ করিবার সুবিধা পাইবেন ভাবিয়া হেন্‌রি আশ্বস্ত হইলেন। হেন্‌রি প্রাণপণ চেষ্টায় ঐ দোকানে কাজ করিতে লাগিলেন। এতদিন তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন এখন তাহা পাইয়া তাঁহার

প্রাণ নাচিয়া উঠিল। হেন্‌রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কামারের কাজে লাগিয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মাথায় এক নূতন সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল—কোনো-না-কোনো প্রকার ষ্টীম্ এঞ্জিন (steam engine) প্রস্তুত করিতে হইবে। এজন্য হেন্‌রির চক্ষে নিদ্রা নাই—কেবলি ভাবিতেছেন কিরূপে ষ্টীম এঞ্জিন প্রস্তুত করা যায়। হেন্‌রি তাঁহার ক্ষুদ্র কারখানায় বসিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কত বিনিদ্র-রজনী হেন্‌রির অজ্ঞাতসারে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—কর্ম্মনিরত হেন্‌রি কত দিন অনশনে কাটাইয়াছেন——হেন্‌রির তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। সহসা এক পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটায় এই ধ্যানমগ্ন যোগীর যোগ-সাধনায় ব্যাঘাত ঘটিল। হেন্‌রির পুণ্যবতী জননী হেন্‌রির এই কৈশোর অবস্থায় তাঁহাকে কর্ম্ম-সমুদ্রের মাঝখানে ফেলিয়া হঠাৎ স্বর্গবাসিনী হইলেন। এই আকস্মিক বজ্রপাতে হেন্‌রির হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। স্নেহময়ী জননীর বিয়োগে তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; আরব্ধ কার্য্যে তাঁহার মন আর লাগিল না। তিনি সব কাজ ছাড়িয়া বিভ্রান্ত-মস্তিষ্কের মত তাঁহার কারখানা-ঘরে বসিয়া বসিয়া সেই স্নেহময়ী জননীর উদ্দেশে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল। এই সময়ে একখানি সংবাদ-পত্রের কয়েক সংখ্যা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। তাহাতে ডেট্রয় (Detroit) প্রদেশস্থ বড় বড় কারখানার বর্ণনা ছিল। ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হেন্‌রি সঙ্কল্প করিলেন যে, এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ডেট্রয় যাইতে হইবে এবং তথাকার কোনো কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া হেন্‌রি একদিন স্কুল যাইবার ছলে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ট্রেণে চড়িয়া ডেট্রয় প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন তথায় নানা কারখানায় চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিলেন। অবশেষে এক এঞ্জিনের কারখানায় প্রতি সপ্তাহে ২½ ডলার বেতনে কাজ পাইলেন। সেই সময়ে তিনি স্থির করিলেন যে, আমাকে এখানে লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে হইবে। ষোড়শবর্ষীয় বালক হেন্‌রির চাকুরী জুটিল; কিন্তু থাকিবার জন্য ঘর চাই। এজন্য তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর সাপ্তাহিক ৩½
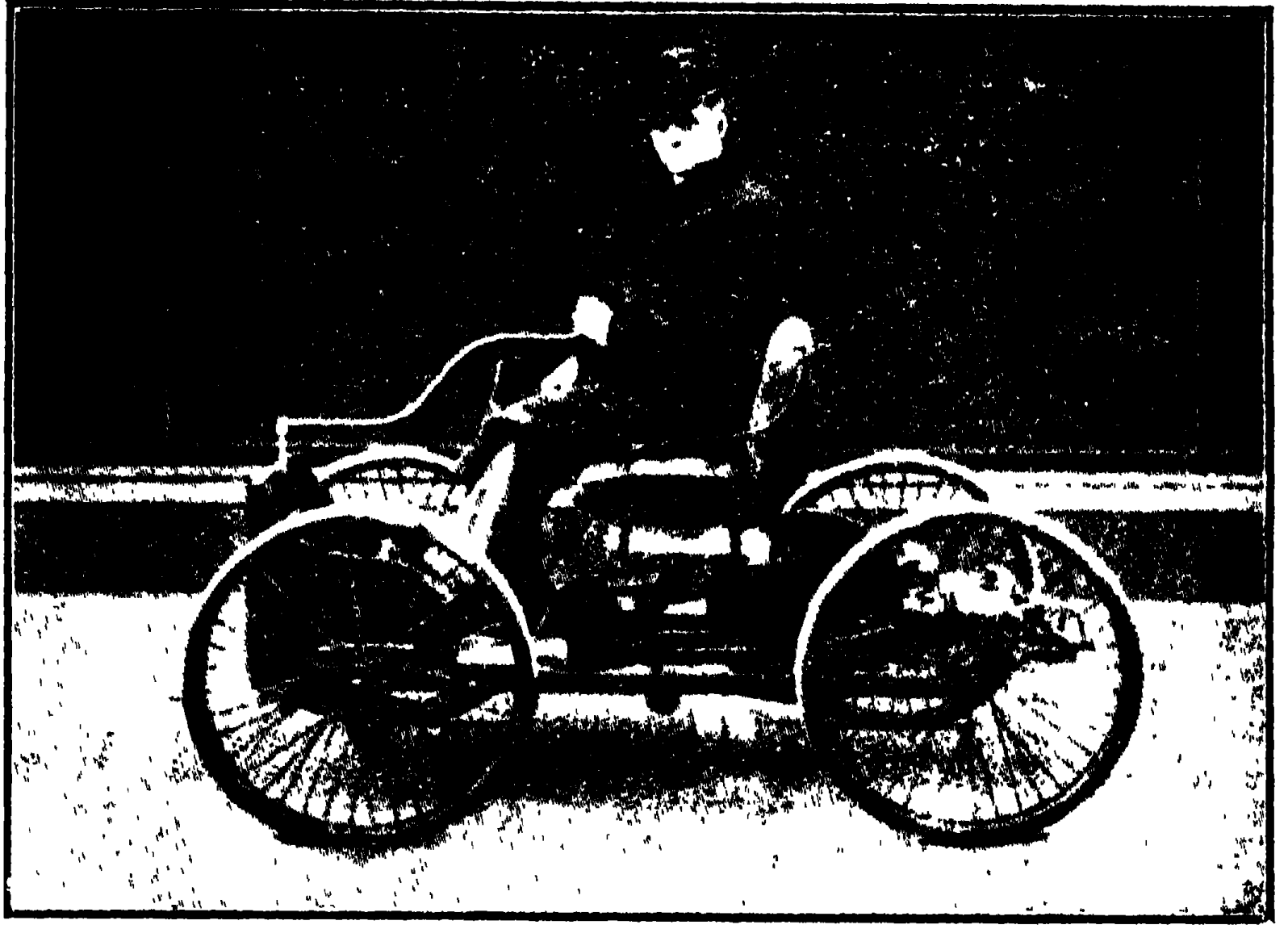
নবনির্ম্মিত গাড়ীর উপর ফোর্ড সাহেব

ডলার ভাড়ায় এক ঘর পাওয়া গেল! কিন্তু বড় কঠিন সমস্যা এই যে, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক দাঁড়াইল। এমন ভাবে কিরূপে চলিবে! সন্ধ্যার পর কাজ করিতে পারা যাইবে এরূপ কাজ খোঁজ করিতে তাঁহার দুই দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে এক মণিকারের দোকানে ঘড়ি মেরামতের কাজ পাইলেন, এজন্য তাঁহাকে প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে ৪ ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য সপ্তাহে ২ ডলার বেতন পাইবেন, এইরূপ স্থির হইল।

হেন্‌রির গৃহ-ত্যাগের পর তাঁহার পিতা চারিদিকে হেন্‌রির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি ডেট্রয় উপস্থিত হইয়া হেন্‌রিকে দেখিতে পাইলেন। না বলিয়া সুদূর ডেট্রয়ে চলিয়া

আসার জন্য পিতা হেন্‌রিকে অতিশয় তিরস্কার করিলেন এবং শেষে তাঁহাকে গৃহে ফিরিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। হেন্‌রি বলিলেন, "পিতা, বাড়ী যাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিবেন না। যাহাতে আমার মন লাগে এমন কোনো কাজ সেখানে নাই। চাষের কাজ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। আর স্কুলে যাহা পড়ানো হয় তাহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এঞ্জিন প্রস্তুত করা আমার বড়ই প্রিয় বোধ হয়। কিন্তু সেখানে
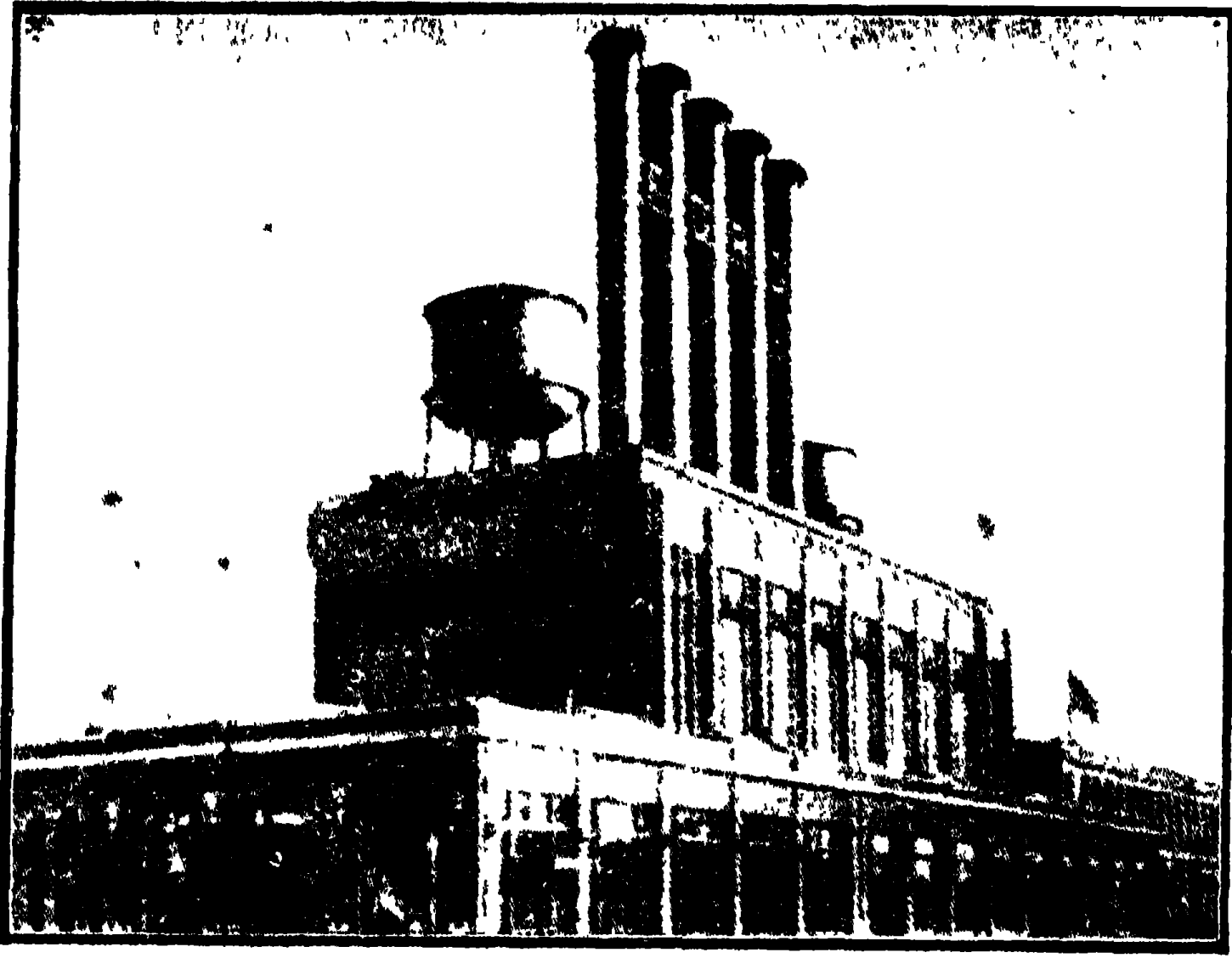
ফোর্ড সাহেবের বর্ত্তমান কারখানা

সে কাজ শিখিবার ত কোনো উপায়ই নাই; সুতরাং সেখানে লইয়া গিয়া কেন আমার ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার করিবেন!" অগত্যা হেন্‌রির পিতা নিরাশ হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হেন্‌রি সেই সময় প্রাতে ৭টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত ওয়ার্কশপে ও সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত ঘড়ি মেরামতের কাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কঠিন পরিশ্রম করিয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। এক বৎসর পরে হেন্‌রি অন্য এক এঞ্জিনের কারখানায় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই কারখানায় তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইলে তিনি ঘড়ি মেরামতের কাজ ছাড়িয়া দিলেন।

এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার অল্পদিন পরেই পিতার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া হেন্‌রি আকুল হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং বৃদ্ধ পিতার অনুরোধে গৃহে থাকিয়া পিতার ক্ষেত্রে কাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময়ে হেন্‌রি ক্লারা ব্রাণ্ড নাম্নী এক যুবতীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রণয়ের মোহপাশে আবদ্ধ করিয়া এই রূপগুণশালিনী রমণী কিছু দিন হেন্‌রির চিত্তকে ডেট্রয়ের কারখানার দিক হইতে নিবৃত্ত রাখিলেন। সহসা হেন্‌রির মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। শত বন্ধুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া হেন্‌রি পত্নী সমভিব্যাহারে ডেট্রয়ে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তথায় একটি ঘর ভাড়া লইয়া পত্নীকে সেই ঘরে রাখিয়া কাজের চেষ্টায় বাহির হইলেন। কয়েকদিন অনুসন্ধান করিয়া "এডিশন ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটিং এণ্ড পাওয়ার কোম্পানী"র অফিসে মাসিক ৮৫ ডলার বেতনে এক কর্ম্ম পাইলেন। ৬ মাসের মধ্যে ইঁহার বেতন মাসিক ১৫০ ডলার নির্দ্দিষ্ট হইল; এবং কর্ম্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি মেকানিক বিভাগের ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে কিছু অর্থ সঞ্চয় হইলে হেন্‌রি এক খণ্ড ভূমি খরিদ করিয়া তথায় একটি ছোট কারখানার প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই শুভদিনে ভবিষ্যৎ জীবনের গৌরবময় সফলতা হেন্‌রিকে যেন তাঁহার কাম্যলোক দেখাইয়া দিল। সাপ্তাহিক ২½ ডলার বেতনের ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী ছোট-খাট একটি কারখানার মালিক হইলেন!

হেন্‌রি দিবাভাগে এডিশন কোম্পানীর অফিসে চাকরী করেন এবং রাত্রে আপনার কারখানায় কাজ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার মনে হইল, যদি এমন এক গ্যাসোলীন এঞ্জিন প্রস্তুত করা যাক্, যাহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ষ্টীম এঞ্জিনের মত কার্য্যকরী হইবে।' এডিশন সাহেবের কারখানায় একটা পাইপ অকর্ম্মণ্যভাবে পড়িয়াছিল; হেন্‌রি সেটি লইয়া আসিয়া তাহা হইতে সিলিণ্ডার প্রস্তুত করিলেন।

সঙ্কলিত এঞ্জিন প্রস্তুত করিতে হেন্‌রির দুই বৎসর লাগিল। যখন এই ক্ষুদ্র এঞ্জিন প্রস্তুত হইল তখন অনেকেই উহার প্রশংসা করিলেন। কিন্তু কিছুদিনের পর প্রায় সকলেই বলিতে লাগিলেন, "হেন্‌রির এই এঞ্জিন অতি সুন্দর হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা প্রস্তুত করিতে লক্ষাধিক মুদ্রার প্রয়োজন। এত অর্থ কোথা হইতে আসিবে ?" হেন্‌রি ইহার উত্তরে বলিলেন—"জিনিষ প্রস্তুত করা আমার কাজ ছিল, এজন্য অর্থ আপনিই আসিবে।" প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিল ; হেন্‌রির পরীক্ষা সফল হইয়া গেল। তাঁহার ওয়ার্কশপে এক-সিলিণ্ডারের মোটরকার প্রস্তুত হইল! এখন হেন্‌রি ফোর্ড প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঐ মোটরে চড়িয়া হোটেলে গিয়া আহার করিয়া আসিতেন। এবং তিনি ও হোটেলের স্বত্বাধিকারী তদীয় বন্ধু ঐ মোটরে চড়িয়া কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিতেন। এইরূপে তাঁহার ঐ এক-সিলিণ্ডার মোটরের সাধ মিটিয়া গেল। ফোর্ড সাহেব এখন দুই-সিলিণ্ডার মোটর প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যস্ত

ফোর্ড সাহেবের কারখানার ভিতরকার দৃশ্য

হইয়া উঠিলেন।

কিছুদিনের পর হেন্‌রি ফোর্ড পত্নীকে আপনার গৃহে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। পত্নীকে বাড়ীতে রাখিয়া আসায় হেন্‌রিকে সমস্ত গৃহকার্য্য স্বহস্তে করিতে হইত। খাবার প্রস্তুত করা—সমস্ত দিন কারখানায় কাজ করা এবং রাত্রে আপনার কারখানায় পরীক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সহজ কথা নহে। এইরূপ অবস্থায় দুইবার রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিয়া ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এজন্য হেন্‌রি কেবল একবার মাত্র রাঁধিতেন এবং রাত্রে কোনো হোটেলে গিয়া সামান্য কিছু খাবার খাইয়া আসিতেন। কিছুদিনের মধ্যেই আট বৎসরের পরীক্ষার পর ১৯০১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে ফোর্ড সাহেবের দুই-সিলিণ্ডার মোটর প্রস্তুত হইল। এখন ফোর্ড সাহেব তাঁহার নব-নির্ম্মিত দুই-সিলিণ্ডারের মোটরে চড়িয়া ডেট্রয় সহরের রাজপথে বেড়াইতে লাগিলেন। এই ক্ষুদ্র কারের উপর ফোর্ড সাহেবকে উপবিষ্ট দেখিয়া কেহ-বা তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা করিত, কেহ-বা তাঁহাকে নানাপ্রকার উপহাস করিত। কিন্তু তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ দিবার উপযুক্ত কোনো ধনবান ব্যক্তি সে-সময়ে অগ্রসর হন নাই। তথাপি মনস্বী ফোর্ড নিরুৎসাহ না হইয়া অনেক ধনীর দ্বারে

উপস্থিত হইয়া আপনার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলেন। কিন্তু ফোর্ড সাহেবের উদ্ভাবিত কলকব্জা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত অর্থের প্রশ্ন উঠিলেই অনেকে নীরব হইয়া যাইতেন। এজন্য ফোর্ড সাহেব মনে করিলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকচক্ষুর সম্মুখে কোনো চমৎকার ঘটনা না দেখানো যাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার প্রতি ধনিগণের কৌতুহল সঞ্চার করানো কঠিন হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, আগামী বর্ষে মোটরের দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইবে। ফোর্ড সাহেব ভাবিলেন যদি এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া পারদর্শিতা লাভ করা যায় তবেই আমার এই সাধনার সিদ্ধির জন্য ধনিদের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে। ফোর্ড সাহেব তদায় বন্ধু কাফিজিম সাহেবকে আপনার অভিলাষ জানাইলেন। সদাশয় কাফিজিম ফোর্ড সাহেবকে এ-বিষয়ে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কাফিজিম বলিলেন, "তোমার সংকল্পিত কার্য্যের সিদ্ধির জন্য আমি আমার সমুদয় অর্থ ব্যয় করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।" ফোর্ড সাহেব বন্ধুর উপরোধে ফ্যাক্টরীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র মোটর দৌড়ে কৃতিত্ব দেখাইবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ফোর্ড সাহেবের এই মোটর প্রস্তুত হইল। কাফিজিম এই কারের অশেষ প্রশংসা করিলেন। বন্ধুর উৎসাহে প্রতিভাশালী ফোর্ড সাহেবের মনে আবার এক নূতন কল্পনা দেখা দিল। ফোর্ড ভাবিলেন, যদি চার-সিলিণ্ডার কার প্রস্তুত করা যায়, তবে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সফলতা লাভ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই থাকে না। কিন্তু তখন এমন সময় ছিল না, যে, সেই অল্প সময়ের মধ্যে চার-সিলিণ্ডার কার প্রস্তুত হইতে পারে। যাহা হউক, মোটর-দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ফোর্ড সাহেব প্রথম হইলেন। এখন সমস্ত সংবাদ-পত্রে ফোর্ড সাহেবের ও তাঁহার মোটরের বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত হইতে লাগিল। অনেকে অর্থ দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং ফ্যাক্টারী চালাইতেও সম্মত হইলেন। কিন্তু সকলেই বলিতে লাগিলেন, ফ্যাক্টারীটা পরিচালকের সম্পত্তি হইবে—ফোর্ড সাহেব তাহাতে কর্ম্মচারী থাকিবেন মাত্র। এই ব্যবস্থা ফোর্ড সাহেবের মনঃপূত হইল না। তিনি ভাবিলেন, ফ্যাক্টারী চালাইবার প্রধান জিনিষ ত আমার, কিন্তু মূলধন মাত্র ধনীর। অতএব এ ব্যবস্থায় তিনি সম্মত হইলেন না। ফলে, ধনিগণ সরিয়া পড়িলেন—ফ্যাক্টারীও স্থাপিত হইল না। যাহা হউক ফোর্ড সাহেব এ ব্যাপারে ভগ্নোদ্যম হইলেন না। টামকুপার, ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান সি, এইচ, উইল্‌স্‌ এবং মিষ্টার কজন এই তিন ব্যক্তি মিলিত হইয়া স্থির করিলেন, প্রত্যেকেই আপনাদের বন্ধুবর্গকে এই বিষয়ে সম্মিলিত করিবেন। ফোর্ড সাহেব বলিলেন, আগামী দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমি চার-সিলিণ্ডার কার প্রস্তুত করিতেছি। সেই সময় তাঁহারা আপনাদের বন্ধুবর্গকে সেই স্থানে আনয়ন করিয়া উক্ত মোটরের উপযোগিতা প্রদর্শন করিবেন।

দৌড়ের সময় 'কার' প্রস্তুত হইল। কুপার এবং ফোর্ড সাহেব উভয়ে গাড়ীর উপরে চড়িলেন। কল কব্জা দেখিবার জন্য গাড়ী চালানো হইল। ইহাতে গাড়ীর এরূপ বেগ উৎপন্ন হইল যে, আরোহিদ্বয় ভীত হইয়া উঠিলেন। এখন প্রশ্ন এই উত্থাপিত হইল যে, রেসের সময় কে গাড়ী চালাইবেন! অবশেষে ওল্‌ড্‌ ফীল্‌ড নামক এক ব্যক্তিকে গাড়ী চালাইবার উপযুক্ত করিয়া লওয়াই স্থির হইল।

আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত ছিল। রেসের দিন কুপার কজন এবং উইল্‌স্‌ আপন আপন বন্ধুবর্গসহ রেস-কোর্সে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেস আরম্ভ হইল। ফোর্ড সাহেবের মোটর সকলের অগ্রে নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌঁছিল। যে মোটর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল তাহা তখন প্রায় আধ মাইল পশ্চাতে ছিল। এই আশ্চর্য্য সফলতায় সমবেত দর্শক-গণের ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি মহামতি ফোর্ড ও তাঁহার নবোদ্ভাবিত কারের উপর নিপতিত হইল।

সত্বরই এক মোটর-কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হইল। মিষ্টার ফোর্ড এই কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়ার নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহার বেতন মাসিক ১৫০ ডলার নির্দ্দিষ্ট হইল। দিনদিনই ফ্যাক্টারীর উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে ফ্যাক্টারীর পরি-চালকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। ফোর্ড সাহেব ইচ্ছা

করিলেন তাঁহাদের কার এমন সুলভ করা হউক যাহাতে অনেকেই তাহা ক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু অনেক সভ্যই বলিতে লাগিলেন— 'কার' খুব উচ্চ মূল্যেই বিক্রীত হউক— তাহাতে এক একটা কারে অনেক লাভ থাকিবে। এইরূপ মত-বিরোধে ফ্যাক্টারী বন্ধ হইয়া গেল। শেষে ফোর্ড সাহেব কতকগুলি অংশীদার লইয়া নিজেই ফ্যাক্টারী খুলিতে বাধ্য হইলেন।

ঐ অংশীদারগণের মধ্যে ব্যাপার-বিভাগের পরিচালক কজন ব্রাদার্স আজকাল ডেট্রয় সহরে কোটিপতি। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পরিদর্শক ডজ্ ব্রাদার্স- অধুনা তাঁহারা ডজ্ মোটর কারখানার স্বত্বাধিকারী। এতদ্ব্যতীত ইহার পর্য্যবেক্ষণকারী যিনি ছিলেন, তিনি এখন সমস্ত ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। এই ফ্যাক্টারীর অন্যতম ইঞ্জিনিয়ার সি, এইচ্ উইল্স্ তিনিও পরে স্বতন্ত্র এক কার-নির্ম্মাতা। ফলে জানা যাইতেছে যে, ফোর্ড সাহেব ফ্যাক্টারীর কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে একব্যক্তি কারের এক বিশেষ অংশের পেটেন্ট করিয়াছিলেন। তাহাতে কারে গ্যাসোলীনের প্রয়োগ অন্যের অধিকার-বহির্ভূত হইল। কিন্তু ফোর্ড সাহেব তাঁহার কারে ঐ প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ ব্যক্তি ফোর্ড সাহেবের 'কারে' রয়াল্‌টির দাবী করেন। কিন্তু ফোর্ড সাহেব রয়ালটি দিতে অথবা গ্যাসোলেনের প্রয়োগ বন্ধ করিতে অসম্মত হন। সুতরাং এই বিরোধ শেষে মোকদ্দমায় গড়াইল। সকলেই মনে করিল এইবারে ফোর্ড সাহেবের কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে। মোকদ্দমা হাইকোর্টে উপস্থিত হইলে হাইকোর্টের বিচারে ফোর্ড সাহেব জয় লাভ করিলেন। তখন ঐ ব্যক্তি অল্পদিনের মধ্যে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

কারখানার অন্তর্দৃশ্য

ফোর্ড সাহেবের কারখানা

ফোর্ড সাহেবের প্রকাণ্ড কারখানা একটা দেখিবার জিনিষ। সে যেন একটা সহর। এই কারখানা প্রায় ৩৫০ একর ভূমির উপর অবস্থিত। ইহাতে যে-সকল লোক কাজ করে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। প্রত্যেক শ্রমজীবী ৮ঘণ্টা কার্য্য করিয়া প্রতিদিন ৬ ডলার (প্রায় তিন টাকা) বেতন পাইয়া থাকে। এই কারখানা হইতে প্রতিদিন চার হাজার

'কার' প্রস্তুত হইতেছে। কারখানার কাজে প্রতি বৎসর কোন্ জিনিষ কত খরচ হয় তাহার একটা মোটামুটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ষ্টীল	...	... ৬, ৩৪, ৩৭৫ টন
রবারের কাপড়	...	৮, ১৮, ৭৫, ০০০ বর্গফুট
ল্যাম্প	...	৩৭, ৫০, ০০০
কাচ	...	৭২, ৮৭, ৫০০ বর্গফুট
তামার নল	...	১৭, ২৫, ০০, ০০০ ফুট
বিদ্যুৎ উৎপাদন জন্য ষ্টীল	...	১, ৭৯,৫০, ০০০ পাউণ্ড
বৈদ্যুতিক তার	...	... ৪২, ০০০ মাইল

১২,৪০, ০০০ মোটরকার এই কারখানা হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

এই কারখানার বৈশিষ্ট্য

১। এই কারখানার প্রত্যেক বিভাগ স্বতন্ত্র; কোনো বিভাগের অন্তর্গত নহে। প্রত্যেক বিভাগে আবার কতকগুলি বিভিন্ন ভাগ আছে; যথা—Heat treatment department, grinding forging Inspection—এই প্রকার বিভাগ থাকায় নানাবিষয়ে অশেষ সুবিধা হইয়াছে।

২। কন্‌ওয়েয়র সিষ্টম্ এখনকার প্রধান বিশেষত্ব।
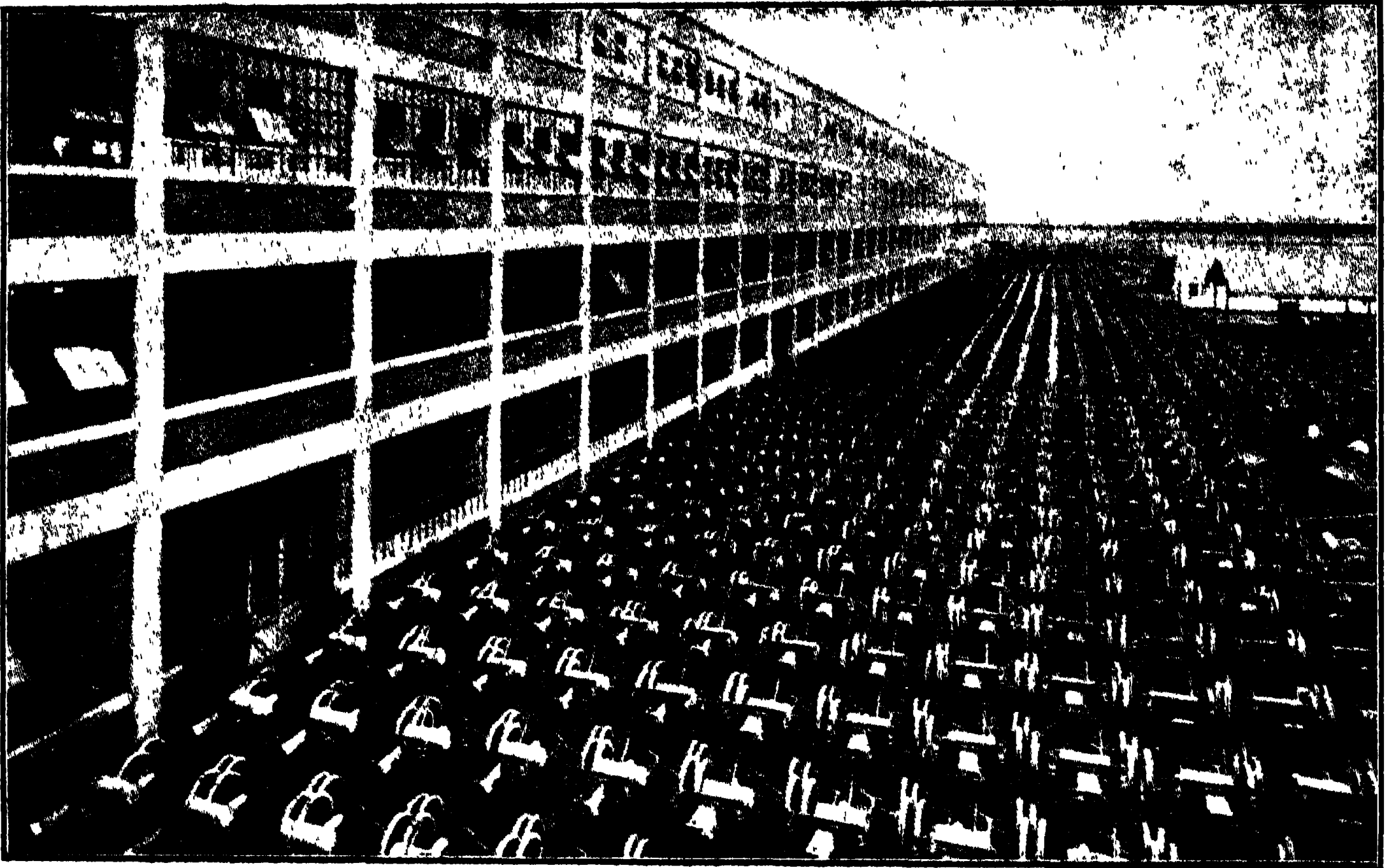
কারখানার একদিনের কাজ

গ্যাস ট্যাঙ্কের জন্য :—

galvanised metal sheet	...	১,১৪,০০,০০০ বর্গফুট

পাখা ও অন্যান্য কাজের জন্য :—

ধাতুনির্ম্মিত চাদর	...	৬, ৬৭, ২৫, ০০০ বর্গফুট
নল	...	৩, ৮৭, ৫০,০০০ ফুট
তৈল (Heat treatment জন্য)	...	১, ০০,০০, ০০০ গ্যালন
কয়লা	...	১, ৫০,০০০ টন

প্রতি দিন চার হাজার হিসাবে বৎসরে প্রায় ইহাতে তিন প্রকারের কন্‌ওয়েয়র আছে। এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত ভারী ভারী জিনিষও একস্থান হইতে স্থানান্তরে অনায়াসে প্রেরিত হয়।

৩। শ্রমজীবীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান। ফোর্ড সাহেব বলেন, শ্রমজীবীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে তাহারা কাজ করিতে পারে না। এই জন্য এই কারখানায় অন্য সকল কারখানা অপেক্ষা অধিক মজুরী দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন এই কারখানায় 'বোনাস'

প্রথা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থায় বৎসরের শেষে তথাকার শ্রমজীবীদিগকে লাভের অংশ দেওয়া হয়। এক Investigation department আছে, যাহা শ্রমজীবীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে। ঐ বিভাগ শ্রমজীবীদের সাংসারিক অবস্থা কিরূপ ইহার অনুসন্ধান করে। এবং তাহারা পানদোষাদি অসৎ কার্য্যে রত হইয়া অন্যায় ভাবে অর্থ নষ্ট করে কিনা তাহারও খবর লয়। মজুরেরা এইরূপ দুক্রিয়াসক্ত হইলে 'বোনাস' পায় না।

৪। এই কোম্পানির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক বিভাগের হেডম্যান এই কোম্পানিতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হইতেই নির্ব্বাচিত হয়। এই কার্য্যের জন্য বিভিন্ন শিল্পবিষয়ক স্কুল খোলা হইয়াছে। সেখানে মজুরদিগকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। মজুরদিগকে ইংরাজী পড়াইবার ব্যবস্থা আছে, শিল্পযন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য পৃথক ক্লাস আছে। একটা প্রকাণ্ড রসায়নশালা আছে। তথায় বৎসরে বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইতেছে।

শিক্ষানবীশেরা কাজ শিখিতেছে

(ক) মজুরদের সাহায্যের জন্য একটি ষ্টোর খোলা হইয়াছে। এই ষ্টোরে তাহারা বাজার অপেক্ষা সুলভে ভাল জিনিষ পায়।

(খ) এখানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মানুষ কাজ করে।

(গ) প্রত্যেক বিভাগে এক একটি চিঠির বাক্স আছে। ইহাতে প্রত্যক ব্যক্তি কারখানা সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত লিখিয়া ফেলিয়া দিতে পারে।

(ঘ) মজুরদের চিত্তবিনোদনের জন্য উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা আছে।

ফোর্ড্ সাহেব প্রত্যেক বিভাগের হেডম্যান স্থানীয় লোক লইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, হেডম্যান স্থানীয় হইলে ফ্যাক্টরীর অধঃপতন হয় না ঐ হেডম্যান সমস্ত কার্য্য তাহার নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে শিখাইতে বাধ্য। এই ব্যবস্থায় হঠাৎ কোনো হেডম্যান কাজ ছাড়িয়া দিলে তাহার নিম্নস্থ ব্যক্তি দ্বারা ঐ কাজ চলিতে পারে।

৫। আমাদের দেশে প্রায়ই ইহা দেখা যায় যে, যখনই কোনো নূতন কারখানা খোলা হইয়াছে, তখনই হয় ত কোনো জাপানী বা ইংরেজ বা কোনো আমেরিকান

তাহার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই ব্যবস্থায় যত দিন ঐ বৈদেশিক ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, ততদিন কারখানার কাজ বেশ চলিয়া যায়, কিন্তু কোনো কারণে ঐ ব্যক্তি কাজ ছাড়িয়া দিলে কারখানার কাজ চলা দুষ্কর হয়। কেননা কারখানার রহস্য অন্যের অবিদিত থাকায় অপরের দ্বারা কাজ চালানো অসম্ভব হইয়া ওঠে।

৬। এই কোম্পানি তাহার মূলধন নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়োগ করিয়াছেন,—

(ক) (Rail-works) রেলপথ ঐ কোম্পানার ক্রীত।

(খ) কাষ্ঠের জন্য জঙ্গল কেনা হইয়াছে।

(গ) কাগজের জন্য পেপার মিল।

(ঘ) কয়লা ও লোহার জন্য কয়লা ও লোহার খনি।

(ঙ) কাচ প্রস্তুতের কারখানা।

এইরূপ নানা বিষয় নিজের আয়ত্তের মধ্যে আসায় এই কোম্পানীকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

যে অসহায় বালক একদিন সামান্য কাজের জন্য দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার কারখানায় ৫০ হাজার শ্রমজীবী কাজ করিতেছে। একটি মোটর-কার প্রস্তুত করিতে যে-ফোর্ড সাহেবের ৮ বৎসর সময় লাগিয়াছিল আজ তাঁহারই কারখানায় প্রতিদিন চারহাজার মোটর-কার প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রত্যাবর্ত্তন

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কাশীতে

কাশী আসিয়া হিমুর আর আনন্দের সীমা রহিল না। চারিদিকে দেবমন্দির—সকালে সন্ধ্যায় মন্দিরে নহবত বাজিতেছে। ব্যোম্ ব্যোম্ হর হর শব্দে গঙ্গাস্নানার্থীর দল পথ চলিয়াছেন। চারিদিকে ভক্তি ও আনন্দের সুর! গঙ্গার নির্ম্মল স্নিগ্ধ জলে গা ডুবাইয়া চারিদিকে উন্নত মন্দির-চূড়ার পানে চাহিয়া এক অভিনব আনন্দে ও ভক্তির ভাবে হিমুর সারা চিত্ত ওতঃপ্রোত হইয়া উঠিত। মনে হইত, অরুণদার ছুটি যদি খুব—খুব অনেকদিন হইত, তবে কেমন মজাই না হইত! কাশী ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ কথা মনে করিতে তাহার ভাল লাগিত না। অরুণকে সঙ্গী করিয়া সকাল বিকাল ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকলে মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইতেন।

কাশীখণ্ড পড়া থাকায় দেবদেবীদের নাম-ধাম ও অবস্থান-ইতিহাস অনেক বিষয়ই মুক্তাঠাকুরাণীর কণ্ঠস্থ ছিল; তাছাড়া পূর্ব্বেও তিনি আর একবার কাশী আসিয়াছিলেন। অরুণ তাঁহাদের অভিভাবকরূপে সঙ্গে আসিলেও আসলে সেথোর কাজ তিনিই করিতেছিলেন। হিমুর সব দেখিয়া দেখিয়া আশ আর মিটিতেছিল না। একই মন্দির দুইবার তিনবার করিয়া সে দেখিতে যায়।

ক্রমে অরুণের ছুটি ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া মুক্তাঠাকুরাণী ত্বরা দিয়া কহিলেন, "চট্‌পট এবার সেরে নাও বাছা। এখনও ওদিক্‌টা সব বাকী রইল যে! দুর্গামন্দিরে মনস্কামনেশ্বর, জগন্নাথ-দেব—বড় বড় ঠাকুরই সব বাকী রয়েচেন। এমন করে দেখতে গেলে কি ফুরোবে কখনও!"

স্থির হইল, পরদিন দুর্গাবাড়ী গিয়া তার পর জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া হইবে। তাঁহাদের বাসা বাঙালীটোলায়। পথ অনেকখানি, একটু সকাল সকাল বাহির হওয়া চাই।

কাশী মস্ত সহর। চকে বিস্তর দোকান। পাথরের বাড়ী, মন্দির রাজপথের দুইধারে সার-বন্দী বিপণী। কোথাও বর্ণ-বহুল ফল, ফুল, ফুলের মালা সাজানো;—কোথাও জুতার দোকান। কাপড়ের দোকানে নানা পাড়ের চুনারী বেনারসী বৃন্দাবনী কত রকমারী সাড়ী

ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। ছিটের ফ্রক ব্লাউস সার্ট কোঁট পিনাফোর রঙিন পাতলা কাপড়ের কৃত্রিম পত্র-পুষ্প-খচিত বিলাতি বনেটও আছে—এখানকার দোকানদার ও খরিদ্দারের হাত এড়ায় নাই। যেদিকে চাও, চোখ যেন ঝলসিয়া যায়। সুদৃশ্য সুসজ্জিত পিতলের সিংহাসন, বাক্স, গালার চুড়ি, সুগন্ধি জরদা, দোক্তার গুলি, বাসন, কাঠের খেলনা, এসবে কাশীর বিশেষত্ব। পথিকেরা সব হর্ষোৎফুল্ল। অধিকাংশ লোকেরই হাতে জলপাত্র, পরণে ক্ষৌম বস্ত্র, দেখিলেই দেব-মন্দিরের যাত্রী বলিয়া বুঝা যায়। হিমু স্বপ্নপূর্ণ বিহ্বল দৃষ্টিতে সমস্তই লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল, তাহার চোখে এ সমস্তই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব।

মুক্তাঠাকুরাণী প্রত্যেক ছোট-খাট মন্দিরে ঢুকিয়া পথের ধারে জড় করা নোড়া-নুড়িতেও একটু জলের ছিটা দিয়া মালতীকে বলিতে ছিলেন, "যদি মানস করবার কিছু থাকে ত এই বেলা ভাল করে করে নে রাণু! এঁরা এক একজন সকলেই জাগ্রত দেবতা। দেখিস্ বাছা, কাউকে যেন ছোট-বড় করিসনে। বাবা মা তোমরা সব আমার রাণুর মনস্কামনা পূর্ণ কর। আবার এসে তোমাদের পূজো দিয়ে যাব।" মনস্কামনা-পূরণের এ ইঙ্গিত মালতীরও বেশ জানাই ছিল। মেয়ের জন্য বর প্রার্থনাই যে তাঁহার উপস্থিত কাম্য কর্ম্মের মধ্যে প্রধান, তাহা তিনি ভালই জানেন। তবু সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে বিরক্ত বিষণ্ণ চিত্ত—এ আনন্দধামে তাহার সে দুঃখের পশরা যেন নামাইতে চাহিতেছিল না! তৃপ্ত মন পরিপূর্ণ আনন্দে কেবলি যেন বলিতে চাহিতেছিল, আর কিছুই চাহি না—কিছুই না, শুধু তোমাকেই যেন চাহিতে পারি! সব অভাব মন হইতে দূর হইয়া যাক্,—এ শান্তির সিংহাসনে শুধু তুমি থাকো আমার অন্তরের সব ঠাঁইটুকু জুড়িয়া। তাই মাসিমার আদেশ অনেক সময় কানে পৌছাইলেও মনে ঠিক পৌছিতেছিল না। প্রার্থনার ভাষা হারাইয়া মন যেন নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল।

একজায়গায় তাঁহাদের অযথা বিলম্বে অরুণ ব্যস্ত হইতেছিল। দুর্গামন্দিরে অঞ্জলি দিয়া মালতী তন্ময় হইয়া দেবীর মুখপানে চাহিয়া যুক্ত করে বসিয়া থাকায় মুক্তা ঠাকুরাণী দ্রুত অঙ্গুলি-চালনায় নির্দ্দিষ্ট জপ সংখ্যার কতকটা সারিয়া লইতেছিলেন ও ভাবিতেছিলেন, আবার বাড়ী ফিরিয়া রান্না-খাওয়ার আয়োজন ত আছেই। আজ আবার ফিরিবার পথে কিছু আনাজ-পাতি কিনিয়া লইতে হইবে। ঘরে যা' আছে, অকুলান হইবে। হিমানী মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একদল যাত্রী মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছিল—সেও তাহাদের দলে মিশিল দেখিয়া অরুণও অগত্যা বাধ্য হইয়া তাহার অনুসরণ করিল। যে মেয়ে, এখান ভিড়ের মধ্যে কোথায় ছুটিবে—কাণ্ড-জ্ঞান ত কিছু নাই!

মন্দির প্রদক্ষিণ হইলে অরুণ চাহিয়া দেখিল, মন্দিরদ্বারে জনতা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সিঁদূর ও গাঁদা ফুলের মালায় চর্চ্চিত হিমুকে বাহিরে যেখানে দোকানীরা ফুলেরমালা ফুল বেল পাতা ও বাতাসা কুলী সিন্দুর পেঁড়া, ছোট ছোট মাটির খুরি ও সবায় পূজার উপকরণ ডালি সাজাইয়া বসিয়া ছিল, সেইখানে শিষ্টভাবে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়া সে পুনরায় মন্দির- মধ্যে প্রবেশ করিল।

মালতী ও মুক্তাঠাকুরাণীকে ভিড়ের মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া প্রদক্ষিণ করাইয়া বাহিরে আসিয়া অরুণ দেখিল, হিমু তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া যথা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া নাই। দেখিয়া মুক্তাঠাকুরাণী পুরুষালী মেয়ের বিরুদ্ধে মালতীকে শুনাইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর এই অনার্য্য স্বভাবের জন্য ভবিষ্যতে এককালে যে তাহার ললাটে বিস্তর দুঃখ সঞ্চিত আছে, এই কথা বলিয়া চিন্তা-ভারাতুর মায়ের মনে আশঙ্কা উদ্দীপ্ত করিবার প্রয়াসে সচেষ্ট হইলেন।

অরুণ অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দুর্গাকুণ্ডের দিকে তাঁহাদের দেখাইয়া দিয়া কহিল, "আপ্‌নারা ঐখানে গিয়ে দাঁড়ান একটু, আমি তাকে এখনি খুঁজে আন্‌চি। খুব সম্ভব সে ঐ ভিড়ের মধ্যে গান শুন্‌তে ঢুকেচে।" মুক্তাঠাকুরাণী মালতীকে অগ্রবর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়া হিমুর উদ্দেশে বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে কুণ্ড-অভিমুখে চলিয়া গেলে অরুণ হিমুর সন্ধানে মন্দির-পার্শ্বে যেখানে জনতামধ্য হইতে গানের ধ্বনি আসিতেছিল সেই দিকে চলিল।

এক জায়গায় দুইজন ব্যক্তিকে দাঁড়াইতে দেখিলে তৃতীয় ব্যক্তিকে অকারণেও সেখানে একবার দাঁড়াইতে হয়, ক্রমে চতুর্থ পঞ্চম করিয়া জনতা যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে, দ্রষ্টব্য যতই অদৃষ্ট হয় মানুষের দেখার বা শোনার কৌতূহলও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। এক্ষেত্রেও এমনি ঘটিয়াছিল। গায়ককে দেখা যাইতে ছিল না, কেবল ঠেলা-ঠেলি হুড়াহুড়ির ধূম লাগিয়া গিয়াছিল। যে গান করিতে-ছিল, সে একজন অন্ধ ভিখারী। যদিও সে বাংলা গান গাহিতেছিল, তবু কণ্ঠস্বরে তাহাকে বাঙালী বলিয়া মনে হইতেছিল না। গায়ক বেহালা বাজাইয়া গাহিতেছিল,

"শুধু আসন পাতা হ'ল আমার সারাটি দিন ধরে।
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, তারে ডাকব কেমন করে!
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে হয়নি আমার পাওয়া—"

গায়কের কণ্ঠস্বর যেমন মিষ্ট, সুরবোধও তেমনি অসাধারণ। শিক্ষিত কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রোতৃ-বর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া কখনো নীচে গড়াইয়া কখন ঊর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ-বাতাসকে যেন প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছিল। অরুণ ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নিজের প্রয়োজন যেন ভুলিয়া গিয়াছিল। গায়কের সম্মুখে একখানি মাটির সরা, তাহাতে পয়সা আধ্‌লা দুই-চারিটি আনি দুয়ানিও জমিয়াছে।

হিমুও এই ভিড়ের মধ্যে একপাশে স্থান করিয়া লইয়া গান শুনিতেছিল। এইবার ফিরিবার কথা মনে পড়ায় সে অগ্রসর হইয়া হাতের অবশিষ্ট দুয়ানিটি মৃৎস্থালীতে গায়কের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া দেবতার প্রসাদী শালপাতা-মোড়া পেঁড়া দুইখানিও তাহার মধ্যে রাখিয়া দিল। সে ফিরিতে গিয়া শুনিতে পাইল, "আহা, মেয়েটি বড় দয়াময়ী! মা, ভগবান্‌ তোমার মঙ্গল করবেন।" এ আশীর্ব্বচন কার? ভিক্ষাপ্রাপ্ত অন্ধের নয় ত! হিমু বিস্মিতভাবে চাহিয়া দেখিল, এক গেরুয়াধারী সৌম্যদর্শন পুরুষ ও এক বিধবা নারী তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। সঙ্গীতমুগ্ধ হিমু এতক্ষণ তাঁহাদের অবস্থান উপলব্ধি করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম সে সন্ন্যাসী দেখিলে ভয় পাইত। তাহাদের গ্রামে সন্ন্যাসী বড় দেখা যাইত না। ছোট বেলায় সে শুনিয়াছিল, জটাধারীরা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে দেখিলেই নিজেদের ঝুলির মধ্যে ভরিয়া লন। হিমু তখন বস্তুতত্ত্ব জানিত না। সুতরাং একটি মাত্র সাধারণ ঝুলির ভিতর কেমন করিয়া যে ক্রমাগত ছেলে ভর্ত্তি হইতেছে, এ সংশয় বা তৎসংক্রান্ত তর্ক কিছুরই প্রয়োজনীয়তা সে তখন অনুভব করে নাই। বয়স বাড়ার সঙ্গে ক্রমশ এ ভ্রম তাহার ভাঙ্গিয়া গেলেও ভক্তির সহিত ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে ভয়েরও আধার, এ বিশ্বাস এখনও তাহার প্রবল রহিয়াছে। এখানে পথে ঘাটে মন্দিরে সর্ব্বদা সন্ন্যাসী দণ্ডী ব্রহ্মচারী পরমহংস প্রভৃতি দেখিয়া দেখিয়া তাহার ভয়ের ভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। মা দিদিমার অনুকরণে সুবিধা পাইলে সেও এখন সন্ন্যাসী দেখিলে গলবস্ত্রে প্রণাম করে। তবু এই গেরুয়াধারী সৌম্যসুন্দর মূর্ত্তির পানে বারেক চাহিয়া দেখিয়াই হিমুর মনে কেমন একটা ভক্তির সহিত আনন্দের ভাবও জাগিয়া উঠিল। সে গলায় আঁচল বেড়িয়া জনতার মধ্যেও কোন মতে সন্ন্যাসীর পায়ের তলায় মাথা ঠেকাইল। পার্শ্ববর্ত্তিনী বৃদ্ধার সাদা কাপড়ের জন্য সে তাঁহাকে প্রণাম করা প্রয়োজন বোধ করিল না। ভক্তির মূল্য আমরা অনেকখানি বাহিরের পরিচ্ছদ দেখিয়াই নির্দ্ধারণ করিত!

গেরুয়াধারী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া স্নেহ-মধুর স্বরে কহিলেন, "লক্ষেশ্বরী হও মা! দীনের প্রতি চিরদিন যেন তোমার দয়া থাকে!"

বৃদ্ধা কহিলেন, "মেয়েটি বড় সুন্দরী!"

গেরুয়াধারী কহিলেন, "শুধু সুন্দরী নয় মা,—সর্ব্ব সুলক্ষণা!"

হিমু ঘন ঘন বাহির হইবার পথ-পানেই তাকাইতেছিল। অভিপ্রায়, দু-একজন সরিয়া একটু স্থান করিয়া দিলেই সে বাহির হইয়া পড়ে অরুণ ফিরিয়া তাহাকে না দেখিয়া না জানি কতই বিরক্ত হইয়াছে! তাছাড়া অপরি-চিতের মুখে আত্ম-প্রশংসা শুনিতে তাহার লজ্জাও করিতেছিল। হিমুর আবার এত লজ্জা জন্মিল কবে? সংসারে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রকৃতি ঠাকুরাণীর অসাধ্য কিছুই নাই। বয়ঃবৃদ্ধিজনিত মনোভাবের পরিবর্ত্তনের সহিত আলোকনাথের ব্যবহার স্বভাব-চঞ্চলা বালিকা

হিমুকেও অনেকখানি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। মনে মনে সে এখন সংসারকে চিনিতে ও বুঝিতে শিখিতেছিল।

হিমুর উদ্বেগ-চঞ্চল দৃষ্টি অরুণের উপর পড়িতেই সে তাড়াতাড়ি আগাইয়া ভিড় ঠেলিয়া তাহাকে বাহির হইবার পথ করিয়া দিল। বাহিরের মুক্ত বায়ুতে আসিয়া ভিজা চুলের গোছা হাত দিয়া জড়াইয়া লইয়া হিমু হাসি-মুখে কহিল, "ভাগ্যে তুমি এলে অরুণদা। নৈলে গিয়েছিলুম আর কি! কেমন করেই যে বের হতুম!"

"কেন! যেমন করে ঢুকেছিলে!" বলিয়া অরুণ তাহার পরিশ্রমের প্রতিশোধ লইবার জন্য মুখ ভার করিয়া রহিল।

হিমু তেমনি সপ্রতিভ হাসিমুখে কহিল, "বা রে, তখন বুঝি এমন ভিড় ছিল!—অরুণদা, ঐ সন্ন্যেসি আর বুড়িটি আমাদের দিকে কি রকম করে দেখ্‌চেন, দ্যাখো!"

হিমুর দৃষ্টির অনুসরণে অরুণ চাহিয়া দেখিল, রাস্তায় অপর অংশে দাঁড়াইয়া এক বৃদ্ধা নারী অনিমেষ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার পানেই চাহিয়া আছেন। সে চোখের পানে চাহিয়া অরুণের সারা দেহ কি এক ভাবাবেগে কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ও দৃষ্টি যেন তাহার বড় পরিচিত। সে যেন যুগ-যুগ ধরিয়া তেমনি করিয়া উহারই লক্ষ্য হইয়া আসিতেছে। স্বপ্নময়, ভাবময়, জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময়, দুঃখ বিস্ময়-বিস্মরণময় সে দৃষ্টি যে কি, তাহা সে যেন বুকের ভিতর দিয়া প্রাণের ভিতরে অনুভব করিতেছিল—অথচ কিছুই বুঝি অনুভব করিতেছিল না! মানুষকে মেস্‌মেরাইজ করিলে তাহার যেমন অবস্থা হয় হয়ত এও সেই ভাব। তেমনি অননুভূত স্বপ্নপূর্ণ অভিনব আনন্দ ও বিষাদের শীতল আক্রমণ সারা দেহ-মনে যেন ধীরে ধীরে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল। বৃদ্ধার দক্ষিণ পার্শ্বে পিতলের কমণ্ডলু হস্তে ঐ যে গেরুয়া-পরা সৌম্যসুন্দর মূর্ত্তি—! কে উনি? অরুণের পরিচিত কেহ কি হইবেন? কে জানে, কৈ, মনে ত পড়ে না! তবু মন কেন ছুটিয়া ঐ দুখানি ধূলি-ধূসরিত চরণ-তলেই লুটাইতে চাহিতেছে! অরুণ ব্যাকুলভাবে নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। মনকে বুঝাইতে চাহিল, হয়ত এই কাশীর পথেই আর কোন দিন ইহাদের সে দেখিয়া থাকিবে। হয়ত তেমন করিয়া তখন চাহিয়া দেখে নাই। এমনি আবছায়ামত ভাসা-ভাসা সেদিন দেখিয়াছিল, তাই ভাল স্মরণ হইতেছে না। তাই হইবে; কি আশ্চর্য্য! এই সহজ তথ্যটি বুঝিতেও এত সময় লাগে! কিন্তু কাশীর পথে ত সন্ন্যাসীর অভাব নাই। পথের ধূলায় পড়িয়া কয়জনের পায়ে লুটাইবার তাহার সাধ হইয়াছে! এ চিন্তাটিকেও সে প্রশ্রয় দিল না। পথে নোড়ানুড়ি অনেক থাকে। তাই বলিয়া সকলকেই ত আর বিশ্বনাথ বলিয়া ভ্রম হয় না। ভক্তি তাহার যোগ্য আধারেই আশ্রয় লয়। হয়ত ঐ মহাপুরুষে ভগবানের কিছু বিভূতি আছে! নহিলে এমন ভাবই বা হইবে কেন? হিমুকে ত্বরা দিয়া সে অগ্রসর হইল।

রোদের তাপ বাড়ায় মুক্তা ঠাকুরাণী মালতীকে লইয়া দুর্গাকুণ্ডের অনাবৃত ভূমি ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। আজ তাহাদের অযথা বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে সারাটা দিনই হয়ত বকুনি খাইয়া কাটিয়া যাইবে। মনকে এই সব ভিন্ন চিন্তায় অবসর দিবার চেষ্টা করিয়াও অরুণ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিল না। চলিতে চলিতে ক্ষণে ক্ষণে সে মুখ ফিরাইয়া চকিত দৃষ্টিতে পূর্ব্ব-দৃষ্টদের পানে চাহিতেছিল। সে যে ঠিক ইচ্ছা করিয়াই চাহিতেছিল, তা নয়, সে না চাহিয়া পারিতেছিল না। রমণী তেমনি অপলক নেত্রে তাহার দিকেই চাহিয়া আছেন। গেরুয়া-ধারীর কোমল স্নেহময় দৃষ্টিও তাহার উপর ন্যস্ত। সে দৃষ্টির লক্ষ্য হইতে সুখ কি দুঃখ, আনন্দ বা বিষাদ কি যে তাহার মনে উঠিতেছিল, সে তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। কেবল এইটুকু বুঝিতেছিল যে ইহাদের সান্নিধ্য সে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। এখান হইতে পলাইয়া যাওয়াই তাহার এখন একমাত্র কাম্য। তবু পা চলিতে চাহে না। দৃষ্টি সেই অনীপ্সিতদেরই পুনঃপুনঃ দেখিতে চায়। অরুণ লক্ষ্য করিয়াছে, সুন্দরী হিমু তাঁহাদের লক্ষ্য নয়। তা যদি হইত, তবু কিছু অর্থ বুঝা যাইত! কিন্তু দীন হীন অরুণের পানেই যে উঁহারা চাহিয়া আছেন। কি আছে তার! কেনই বা তাহাকে দেখিতেছেন!

চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাৎবর্ত্তী অরুণের উদ্দেশে হিমু কহিল, "হলো কি তোমার অরুণদা? তুমি যে আজ চলতেই পারছ না, আমি ত ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলেছি, তবু তুমি পেছিয়ে পড়চ যে! শোধ নিচ্চ না তো আমার গান শোনার?"

উত্তর না পাইয়া এবার সে অরুণের বিবর্ণ ম্লান মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, "ওমা, তোমাব মুখ চোখ অমন হয়ে গেছে কেন? অসুখ কচ্চে নাকি—পায়ে লাগল কিছু বুঝি, দেখি।" বলিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইতে, অরুণ গম্ভীর আদেশব্যঞ্জক স্বরে কহিল, "এগিয়ে চল, মা ব্যস্ত হচ্চেন কত।" নিজের সম্বন্ধে সে কোন উত্তর দিল না। তাহার গম্ভীর মুখেব পানে চাহিয়া হিমুও দ্বিতীয় প্রশ্ন তুলিতে সাহস করিল না। সদাপ্রসন্ন-চিত্ত শান্তমূর্ত্তি অরুণদার এ ভাব ও কণ্ঠের সুর যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই বিস্ময়ের চেয়ে ভয়ই তাহার হইয়াছিল বেশী।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সংশয়-দোলায়

"মা, শরীর কি বড় বেশী খারাপ মনে কচ্চ? আর খানিকটা যেতে পারলে স্বামীজি ভাস্করানন্দের মন্দির দেখে সেইখানেই একটু বিশ্রাম করে নিতে পারতে। পারবে কি তা?" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত গেরুয়াধারী পুরুষ সঙ্গিনী বৃদ্ধার পানে চাহিয়া দেখিলেন। রমণীর বিস্মিত মথিত ব্যাকুল অনিমেষ দৃষ্টি তাহার দৃষ্ট পদার্থের পানেই চাহিয়াছিল। ছেলের কথা যে তাঁহার কানে গিয়াছে, এমন বুঝাইল না দেখিয়া তিনি মাতৃ-দৃষ্টির অনুসরণে চাহিয়া দেখিলেন। ক্ষণপূর্ব্বদৃষ্টা সেই সুন্দরী মেয়েটীর পাশে দাঁড়াইয়া সেই সুন্দর তরুণ যুবা তাঁহাদের দেখিতেছে। সংসারে সৌন্দর্য্যের উপাসক কে নয়? রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয় সকলেই। রূপ বিধাতৃ-সৃষ্টির উৎকৃষ্ট অংশ। মানুষ সুন্দরকে ভালবাসিয়াই চির-সুন্দরকে লাভ করিতে পারে। সুন্দরকে নিন্দা করিয়ো না। সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিনাশী শক্তি দেখিয়া যদি তাহাকে নিন্দা করিতে চাও—তবে ভুল করিবে। মানুষ নিজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে আপন দুঃখের সৃষ্টি করে! যে নারী-সৌন্দর্য্যের মোহে জগতে কত বিপ্লব বাধিয়াছে, কত সুখের রাজ্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাস কত শত দুরপনেয় মসীরেখায় ভরিয়া গিয়াছে, সেই নারীর রূপ আবার শুদ্ধ চিত্তের দৃষ্টিতে বিশ্ব-জননীর সাক্ষাৎ কল্যাণময়ী মূর্ত্তি বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে! সংসার-বিরাগী ও সংসার-অনুরাগীর রুচির পার্থক্য যত বড়ই থাক্, তবু দুজনেই সুন্দর দেখিতে ভালবাসে, দেখিলে আনন্দ লাভ করে। সাধক তাঁহার চির-সুন্দরের মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়াই অনুভব করেন। সংসার-বিরাগীর শান্ত দৃষ্টি দুইটি সুন্দর মুখের পানে নিবদ্ধ হইয়া সহসা যেন প্রীতিরসে সিক্ত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "কি দেখচ মা? হরগৌরী মূর্ত্তি? কিন্তু আমি বোধ করি, ভুল করলুম। মেয়েটির মাথায় সিঁদুর দেখচি না ত! ভাই-বোন্ হবে।"

মার দৃষ্টি এতক্ষণে স্বপ্নরাজ্য হইতে যেন ধীরে ধীরে বাস্তবে ফিরিয়া আসিতেছিল। গভীর আবেগপূর্ণ স্বরে মা কহিলেন, "চব্বিশ বছর আগেকার চোখ নিয়ে এ আমি কাকে দেখচি, গৌরা! মাঝখানের এ কুড়ি বচ্ছর তার প্রত্যেকটি ভয়ঙ্কর দিন নিয়ে কি সত্যিই কেটে যায় নি?" রমণীর দেহ হৃদয়াবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। মনে হইল, তিনি এখনই পড়িয়া যাইবেন। পথে কাছাকাছি কোথাও ছায়াশীতল স্থান নাই। রাস্তার ওপারের বড় বড় বাগান-বাড়ীগুলির পশ্চাৎভাগ—রাস্তার দিকে বাগানের প্রাচীর বেষ্টনীর উপর দিয়া কোন কোন গাছের শাখা রাস্তার দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহারই অল্প একটুখানি ছায়া রৌদ্রতপ্ত পথিককে সময় সময় আপনার শীতল আকর্ষণে টানিয়া আনিত। মন্দিরে ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় কি! কাছে আর কোথাও ছায়ার চিহ্নমাত্র ছিল না। পুত্র মনে মনে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "মা আমার কাঁধে মাথা রাখো। আস্তে আস্তে চল, আমরা ঐ পাঁচিলটার ধারে একটু বসি। কাল একাদশী গিয়েছে। আজ এতখানি পথ

তোমায় হাঁটিয়ে এনে ভাল কাজ করি নি। চল্‌তি গাড়ী পেলে একখানা ডেকে নেব।"

রমণী তেমনি কাঁপিতে কাঁপিতেই কহিলেন, "ওকে জিজ্ঞাসা কর গৌরী, ও—কে? অনেক বছরের—অনেক চোখের জল পড়ে চোখ আমার দৃষ্টিহারা, তবু সে ভুল করবে না! হয় আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি—নয়, নয়—জানিনা, আমি কি বল্‌ব তোমায়!"

"মা, শান্ত হও! বসো! এইখানেই—তুমি আমার কাঁধে মাথা রেখে বসো! স্বপ্নই তুমি দেখ্‌চ মা। যা চিরকালের জন্যে চলে গেছে, তা ফিরে আসবেনা। যা বিশ্বনাথকে দিয়েছ, তা আর ফিরে চেয়ো না। সে এখানে না থাক্‌, সেখানে আছে। ফিরে তাকে আমরা একদিন পাব বই কি। মিথ্যে আশা করে দুঃখ পেয়ো না।"

"গৌরী, গৌরী, ওরে না রে—সে আছে, সে এখানেই আছে। সেই চোখ—সেই মুখ—সেই তোরই মতন মিষ্টি হাসিটি—"

ধীরে ধীরে তাঁহার মাথা গৌরীপতির কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল। গৌরীপতি দেখিলেন, মার সংজ্ঞা নাই। ধৈর্য্যশালী পুত্র বিচলিত হইলেন না। কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মার চোখে ও মুখে অল্প অল্প ছিটাইয়া উত্তরীয়ের বাতাস দিতে অল্প ক্ষণ পরেই রমণীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। চোখ মেলিয়াই ব্যাকুল দৃষ্টিতে যেন কাহাকে তিনি খুঁজিতে লাগিলেন। ছেলে নত হইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "তারা চলে গেছে মা।" মা একটা গভীর পরিতাপের নিশ্বাস ফেলিলেন। তারপর অনেকক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেল।

মন্দির-ফেরৎ যাত্রীর দল, পথবাহী লোকেরা অনেকেই তাঁহাদের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। যাহাদের কৌতূহল অধিক, তাহারা কাছে আসিয়া বৃদ্ধার কি হইয়াছে খবর লইতেছিল। কেহ সহানুভূতি দেখাইয়া "আহা, বুড়ো মানুষ, রোদটা আজ হয়েচেও তেমনি" বলিয়া যাইতেছিল, কেহ কেহ গৌরীপতির বুদ্ধির নিন্দা করিয়া দ্বাদশীর দিন উপবাস-পীড়িতাকে টানিয়া আনা ভাল হয় নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এমনভাবে পথের ধারে লোকের কৌতূহলের বিষয় হইয়া বসিয়া থাকা গৌরীপতিরও ভাল লাগিতেছিল না। এতক্ষণের পর একখানা ভাড়াটিয়া খালিগাড়ী যাইতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাকিলেন। গাড়ী আসিলে মাকে সাবধানে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া নিজেও উঠিয়া বসিলেন।

খানিকটা পথ দুইজনেই চুপ করিয়াছিলেন। গাড়ী দশাশ্বমেধের রাস্তা ধরিলে মা একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তারা চলে গেল—কিছু জিজ্ঞাসা কল্লিনে গৌরী!"

"না মা।" বলিয়া গৌরীপতি রৌদ্রপূর্ণ ধূলিধূসরিত রাজপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সারা পথ মা ও ছেলের মধ্যে আর একটিও কথা হইল না। গৌরীপতি ভাবিতেছিলেন, মা ভ্রান্ত হইয়াছেন! যা হারায়, তা আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। বৃথা আশায় মানুষ নিজের দুঃখকে কেবল বর্দ্ধিতই করে। তাই দুরাশা সকল সময়েই পরিত্যাজ্য!

মা ভাবিতেছিলেন, সে আছে, সে আছে! একদিন সে আবার নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে! বিশ্বনাথ তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্যই বুঝি তাঁহাদের আহ্বান করিয়া এতদূরে আনিয়াছেন! নহিলে, এ কি অচিন্তনীয় দর্শন! এমন অভিন্ন পিতৃমূর্ত্তিতে দেখা না দিলে তিনিও ত তাহাকে চিনিতেন না! হাতে পাইয়াও হারানিধি ছুড়িয়া ফেলিলেন! হা বিশ্বনাথ! দয়াল! যদি চোখের দেখা দেখিতে দিলে, তবে সত্য কি, তাহাও বুঝাইয়া দাও, প্রভু! হাতে না দাও, নাই দিয়ো, তবু জানিতে দাও, সে আছে! তোমার এত বড় সুরক্ষিত বিশাল রাজ্যে মাতৃহীন ক্ষুদ্র শিশুর স্থানাভাব হয় নাই! এইটুকু, শুধু এইটুকু সান্ত্বনাই তুমি ফিরাইয়া দাও!

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হারানিধি

সেদিন বাড়ী ফিরিবার পথে অরুণ এমনই অন্যমনস্ক হইয়া রহিল যে আনন্দ-বাগ কখন ছাড়াইয়া আসিল, সে তাহা জানিতেও পারিল না। মোড়ের মাথায় অপ্রসন্ন মুখে মুক্তাঠাকুরাণী ও মালতীদেবী অপেক্ষা করিতেছিলেন,

তাহাদের আসিতে দেখিয়া মুক্তাঠাকুরাণী কহিলেন, "তবু ভাল! আমি ভাবছিলুম, ঘর-বাড়ী পেতেই বা বসে গেলে কোথাও! ভ্যালা মেয়ে যা হোক তুই হিমি! তোর খুরে খুরে দণ্ডবৎ! সবই কি সৃষ্টিছাড়া তোর!" অরুণ নিরুত্তরে চলিতে লাগিল। হিমু কহিল, "তুমি এগিয়ে চল ত দিদিমা,—ভাল ভাল সন্ন্যাসী দেখছিলুম—দেরী হয়েচে, তার জন্যে আর হয়েচে কি? তুমি সন্ন্যাসী দেখলে দাঁড়াও না? সেদিন বেণী মাধবের ধ্বজায় ওঠাই হল না যে!" মুখরা নাতিনীর সহিত পথে কলহ করিবার ইচ্ছা না থাকায় মুক্তাঠাকুরাণী মালতীর উদ্দেশে ক্ষোভপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন, "শোন্ রাণু মেয়ের বাক্যি শোন্!" মালতী মেয়ের পানে বারেক ফিরিয়া মৃদু অনুযোগের সুরে ডাকিলেন, "হিমু—" "এই ত যাচ্ছিমা।" বলিয়া হিমু এবার হন্‌হন্ করিয়া সকলের আগে আগে চলিতে সুরু করিল।

কিন্তু পণরক্ষা তাহার ঘটিয়া উঠিল না; তাহা কোন সম্পূর্ণ অ[illegible]পর ঘটে না। তাহার মনে হইতেছিল, মাগো, দিনই এ[illegible]রেশী। [illegible] বুঝিয়া না-জানা বিষয়ে প্রশ্ন না করিয়া এমন করিয়া মুখ [illegible]ন্ত্রের পুতুলের মত কেবলই চলিতে মানুষ নাকি কখনো ক[illegible] পারে? মুক্তাঠাকুরাণী বাঁ[illegible] হাতে ফুলশূন্য সাজিটি ঝুলাইয়া [illegible] ফিরাইতে ফিরাইতে পথের ডান হাতে হরিনামের মালা[illegible] [illegible]কান্ দোকানে কি জিনিষ দুইধারে চাহিয়া চলিতেছিলেন। [illegible] বিক্রী হইতেছে, কে কি দর করিতেছে, পথ চ[illegible] দুষ্ট বালক কি অস্পৃশ্য দ্রব্য মাড়াইয়া গেল,—এ সকলের কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে ছিল না। মালতী মৃদুতর স্বরে স্তব আবৃত্তি করিয়া চলিতেছিলেন। হিমু বার-কতক মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদের পানে চাহিয়া যখন উত্তর পাইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিল, তখন পিছাইয়া অরুণের সঙ্গ ধরিল। কিন্তু আজ অরুণও ভাল করিয়া তাহার সহিত কথা কহিতেছিল না। তাহার অনর্গল প্রশ্নের উত্তর ত ছিলই না, যদিই কোনটার দিতেছিল, তাহাও এত সংক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন যে হিমু হাসিয়া কহিল, "হলো কি তোমার অরুণদা? কাণেও কি তুমি আজ শুনতে পাচ্ছনা? বুঝতে ত কিছুই পাচ্ছনা, দেখ্‌চি! সন্ন্যাসী তোমায় যাদু করে দিলেন না কি?"

সনিশ্বাসে অরুণ কহিল, "কি জানি, কি করেন! তবে কিছু যে করেচেন, তা সত্যি! আমার মনে কি হচ্চে, জানো? পালিয়ে না এসে যদি ছুটে গিয়ে তাঁদের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে চারখানি পা চোখের জলে ভিজিয়ে দিতুম, তাহলেই বেশ হতো। হয়ত জন্মান্তরের আমার কেউ ছিলেন ওঁরা!"

হিমু একটুখানি ভাবিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কিন্তু যদি এজন্মেরই হন্? তাও ত হতে পারেন।"

"হ্যাঁ, পারেন তা?" বলিয়া হঠাৎ যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বিস্ময়-ব্যাকুল কণ্ঠে অরুণ কহিল, "কই সে কথা ত আমার মনে হয়নি। এ জন্ম বলতে আমার যে বাবার মুখ মার মুখ বীরগঞ্জের বাড়ী, সেখানকার মানুষদের, গাছ-পালা, মন্দির অতিথশালা সেখানকার রাস্তা, ঘাট—এই সবই মনে পড়ে। তারও পিছনে যে আর একটা জন্ম ছিল সে যে আমি ভুলেই গেছি! চেষ্টা করেও ত কিছু মনে আন্‌তে পারি না। কিন্তু কি যে ছেলে মানুষি করচি আমি! -চল হিমু, ওঁরা এগিয়ে গেলেন আবার—বলিয়া সে জল-ভরা চোখ লুকাইবার জন্যই ইচ্ছা করিয়া হিমুকে পিছনে রাখিয়া অগ্রসর হইল। পিছনে থাকিলেও তাহার বুক-ফাটা চাপা নিশ্বাসের শব্দটা হিমুর কাণ এড়াইল না। সে দ্রুত চলিয়া কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "এবার থেকে রোজ আমরা দুর্গা বাড়ী আস্‌ব, কেমন? হয়ত—একদিন না একদিন আবার তাঁদের [illegible] আমাদের দেখা হবে। এবার দেখা হলে তাঁদের আমি সব জিজ্ঞাসা করব, কে তাঁরা, কোথায় বাড়ী, এই সব?"

অরুণের বিষাদাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া সমবেদনায় তাহারও চোখ দুটি জলে ভরিয়া গিয়াছিল। ইচ্ছা করিতেছিল, আগেকার মত পাশে গিয়া অরুণের ডানহাতখানা সে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সান্ত্বনার কোন কিছু কথা বলে। কিন্তু মনের এ ইচ্ছাটিকে সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। এবার দিদিমার বোন্‌ঝির বাড়ী গিয়া সে যে নব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছে যে সে এখন আর বালিকা নাই। এবং যে কোন পুরুষ সম্বন্ধে ঐ প্রকার কার্য্যগুলা তাহার অনুচিত, লোকে তাহা পছন্দ করে না। আর কেহ না হউক, দিদিমাই এখনি হয়ত বিরক্ত হইয়া তর্জ্জন করিয়া উঠিবেন। হিমুর চিন্তা

লোহার সিন্দুক আপনাদের হাতে। এ কি মোটর-ডাকাতি না কি?"

"আজ্ঞে, মোটর বাইরে ঠিক কাছে, কিন্তু ডাকাতির ত কোন লক্ষণ নেই। আমাদের সঙ্গে মশাল নেই, খাটির পাকও বাইরে নেই। পাড়ায় কোন গোল হয় নি। আপনাদের ঘুম ভেঙে গিয়েচে কেবল এই সিন্দুকের কলের দোষে। এত শক্ত কলের কি দরকার?"

হরপ্রসাদ বললেন, "ওটা আমার ভুল। আপনারা যেমন কারিকর, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার কলও আপনাদের কাছে কিছু নয়।"

মুখস্-পরা সর্দ্দার বললে, "আমরা কি অত প্রশংসার যোগ্য? ও কথা আপনি নিজগুণে বলচেন।"

মাকড়সার জালে সব মাছিগুলি এই-রকম কোরে পড়্‌ল, কিন্তু ভন্‌ভনানি কিম্বা ছট্‌ফটানি কিছু নেই।

৪

কথাটা ঠিক হ'ল না। সব মাছি তখনও জালে পড়ে নি। যে ঘরে হরপ্রসাদ আর ভুবনমোহিনী শয়ন কর্‌তেন, সেই ঘরে আর একখানা ছোট খাটে তাঁদের নাতি, মান্নার ছেলে নবকুমার শুত। মশারি-খাটানো খাটে সে শুয়ে ঘুমুচ্চে মনে কোরে তাকে আর কেউ জাগায় নি।

ঘরের ভিতরে আর সকলে জেগে ফুস্‌ফুস্ গুজ্‌গুজ কর্‌চে আর সে তারি মাঝখানে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবে, তেমন ছেলে নবকুমার নয়। তার বয়স আট বছর আর তার পেটে পেটে বুদ্ধি। গোলগাল নধর গড়ন, মুখখানি ঢলঢল কর্‌চে, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল চোখের উপর পড়েচে, আর আগাগোড়া শরীরখানি দুষ্টামিতে ভরা! তার ঘুম ভেঙে গিয়েচে অনেকক্ষণ, জুলজুল্ কোরে সব দেখ্‌চে, কিন্তু সকলের রকম-সকম দেখে চুপটি কোরে আছে। তার খাটের পাশে কেউ এলে চোখ সিঁটকে থাকে, যেন কত ঘুমুচ্চে। যখন ভুবনমোহিনী তার খাটের মশারির একটা কোণ তুলে হেঁট হয়ে দেখ্‌লেন তখন নবকুমার ঘুমিয়ে কাদা, বাড়ীতে ডাকাত পড়্‌লেও তার ঘুম ভাঙবে না। আর যেই দিদিমা সরে গেল, তখনি প্যাট্‌পেটিয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ছেলেটি কম নয়, দুষ্টুর ধাড়ী!

নবকুমার দেখ্‌লে আগে বাবা গেল তারপর মা গেল, তার পর দিদিমা আর দাদা এক সঙ্গে গেল। গেল সকলে কিন্তু ফিরে এল না কেউ। কি হয়েচে? এত রাত্রে সব গেলই বা কোথায় আর ফিরেই বা আসে না কেন? নবকুমারের মত মাতব্বর লোক এর একটা কিনারা না করলে কি থাক্‌তে পারে? নবকুমার খাটের উপর উঠে বসে চোখ রগ্‌ড়াতে লাগ্‌ল। চুলগুলো চোখের উপর পড়েছিল সেগুলো টেনে মাথার উপর তুলে দিলে। তার পর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার যোগাড় আরম্ভ হ'ল। কোমরে ধুতির কসি এঁটে নবকুমার একটি পা মশারির বাইরে বা'র কোরে দিলে। তার পর আর একটি পা, তারপর আস্তে আস্তে খাটের উপর থেকে টুপ্ কোরে নেমে পড়্‌ল। খাটের পাশে একখানা চেয়ারের উপর জামা ছিল, গায়ে দিলে। মিট্‌-মিটে আলোটা তার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না, সুইচটা কট্ কোরে টিপে লাইট জ্বেলে ফেল্‌লে। ইতি উদ্যোগপর্ব্ব।

তারপর আবিষ্কার যাত্রা। সকলে নেমে কোথায় গেল? হয় দোতালায়, না হয় একতলায়। বাড়ীর বাইরে এতরাত্রে কোথায় যাবে? আর নবকুমারেরও শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়। তার বাপ একটা মোটা রকম লাঠি হাতে করে গিয়েছিল। নবকুমার আলমারির পাশ থেকে খুঁজে তার পটকা-বন্দুক বা'র কর্‌লে। সেইটে হাতে ক'রে চল্‌ল দোতালায়।

দোতলায় দাদা-মশাইয়ের বস্‌বার ঘরে আলো ফট্ ফট্ কর্‌চে, সুতরাং এই নব-কলম্বসের আবিষ্কার চট্ কোরে হয়ে গেল। দরজা-গোড়ায় দিয়ে দেখে, বাঃ, এ'ত বেড়ে মজা! রাত্রে ঘুম ভেঙে রোজ রোজ এ-রকম দেখতে পেলে ত বেশ হয়! থিয়েটার, বায়স্কোপ, না রাসলীলা? সিদ্ধান্ত হ'ল এ টা রাসলীলা, কেন না পশ্চিমে থাক্‌তে নবকুমার রাসলীলা বছর বছর দেখত। তারপর মুক্তকণ্ঠে টীকা-টিপ্পনী আরম্ভ হ'ল।

"মুখস্ পরা এরা কে? বুঝেছি, এটা রাসলীলা। এরা লঙ্কার রাক্ষস। কই, রাবণ ত নেই! তার দশ-মুণ্ডুর মুখস্ কোথায়? এরা হল কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ আর অঙ্গদ।

বিভীষণ আর অঙ্গদ, তোমরা দাদা মশাইয়ের লোহার সিন্দুক খুলে এত রাত্রে কি কর্‌চ? ডাক্‌ব পাহারওয়ালাকে? কুম্ভকর্ণ ঠাকুর, তুমি কোথায় নাক ডাকিয়ে ছ-মাস ঘুমুবে, না, এত রাত্রে তোমার রাসলীলা হচ্চে! আর তোমার ডান হাতে কি আছে যে পিঠের পিছনে লুকিয়ে রেখেচ? দেখি, দেখি, আমার মত পট্‌কা বন্দুক! এই নিয়ে তুমি কুম্ভকর্ণ সাজবে? তবেই হয়েচে!"

ঘরের মধ্যে একটা মাঝারি রকম সাইক্লোন্ হয়ে গেল। চোরেদের সর্দ্দার পিস্তল আর লুকোতে না পেরে বল্‌লে, "আপনার ছেলেকে সামলান্, তা না হলে আপনাদেরই বিপদ।" তিনজন চোরই পিস্তল বার কোরে দাঁড়াল।

মায়া ডাক্‌লে, "খোকা, আমার কাছে আয়! চুপ কোরে থাক্, একটিও কথা কোস্ নে।"

নবকুমার মায়ের কাছে গিয়ে বল্‌লে, "আমি লক্ষ্মণ সাজব। তীর-ধনুক নিয়ে এসে এই তিনটে রাক্ষসকে মেরে ফেল্‌ব।"

"চুপ, চুপ, ও-সব বল্‌তে নেই।"

নবকুমার ঠাণ্ডা হয়েছে দেখে চোরের সর্দ্দার স্থির হল, বল্‌লে, "খোকাবাবু, তুমি লজঞ্জুস ভালবাস?"

ফশ্ কোরে মায়ের হাত ছাড়িয়ে নবকুমার তার পাশে গেল, বল্‌লে, "কই, দাও!"

সর্দ্দারের পকেটে সত্যি-সত্যিই লজঞ্জুস ছিল। বাঁ হাত দিয়ে বার কোরে পিছনে হাত লুকিয়ে বল্‌লে, "এই নাও।"

নবকুমার তার পিছনে গিয়ে তার হাত দেখে লজঞ্জুস নিলে। আর কেউ দেখতে পেলে না, কিন্তু নবকুমার দেখলে, চোরের সর্দ্দারের বাঁ হাতে বুড়ো আঙুলের পাশ দিয়ে আর একটা ছোট আঙুল বেরিয়েচে। সব-সুদ্ধ তার ছ'টা আঙুল। নবকুমার লজঞ্জুস নিয়ে মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে খেতে আরম্ভ কোর্‌লে।

এদিকে চোরেরা নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল। নম্বরী নোট কিংবা দলিল-পত্র কিছুই নিলে না। ডাকাতের মত কোন অত্যাচার কিংবা মেয়েদের গায়ের গহনা নেওয়া, সে-সবও কিছু করলে না।

শেষে সর্দ্দার বল্‌লে, "এইবার আমরা বিদায় হব। গৃহস্থের একটা বদ্ অভ্যাস আছে যে, আমরা চলে গেলে অনর্থক একটা গোলমাল করে। পাছে সেই রকম কিছু হয় ব'লে বাড়ীর কর্ত্তাকে খানিকটে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তিনি ফিরে আস্‌বেন, কিন্তু আপনারা আর কেউ গোলমাল করবেন না।"

হরপ্রসাদ বল্‌লেন, "তাতে ত কোন ফল নেই। চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্চি।"

দরজার গোড়ায় মোটর তৈরী, ভিতরে একজন লোক বসে। হরপ্রসাদকে নিয়ে চোরেরা উঠে ভোঁ ক'রে চলে গেল।

একটা রাস্তার মোড় বেঁকেই মোটর দাঁড়াল। সর্দ্দার বল্‌লে, "আপনি নেমে বাড়ী যান। আপনি বুদ্ধিমান লোক, এখানে চেঁচামেচি কর্‌বেন না জানি।"

হরপ্রসাদ রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়লেন, মোটর সাঁ কোরে বেরিয়ে গেল।

৫

তার পর দিন রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজওয়ালারা ডেকে বেড়ায়, "সহরের ভিতর মোটর ডাকাতি! ভীষণ কাণ্ড!" হরপ্রসাদের বাড়ীর সাম্‌নে লোক চলা ভার হ'ল। পুলিস ডিটেক্‌টিভ বাড়ীতে গিস্ গিস্ করতে লাগল। কদিন খুব হই-চই হ'ল, তারপর সব থেমে গেল। চুরির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

কিছু দিন হরপ্রসাদ আর ঘনশ্যামের বাড়ী থেকে বেরুনো বিপদ হয়ে উঠল। যে দেখে সেই চুরির কথা জিজ্ঞাসা করে, শেষে তারাও ক্ষান্ত হ'ল। নবকুমার যখন বুঝতে পারলে যে মুখস্ প'রে বাড়ীতে চোর এসেছিল, রাসলীলার রাক্ষস নয়, তখন সে রেগে অস্থির। মাতামহকে বল্‌লে, "তোমরা সব চুপ করে রইলে কেন? আমি ত পাহারাওয়ালা ডাক্‌তে চেয়েছিলুম, তোমরা ডেকে চোর ধরিয়ে দিলে না কেন?

"তাদের হাতে যে পিস্তল ছিল, গোল করলে আমাদের মেরে ফেল্‌ত।"

"ভারি ত পিস্তল, আমার মত পট্‌কা-বন্দুক।"

"না রে, মানুষ-মারা পিস্তল, তাতে গুলি ভরা ছিল।"

"সত্যি না কি ?"

মাস দুই-তিন কেটে গেল। চোরাই মাল যে পাওয়া যাবে কিংবা চোরেরা ধরা পড়বে, হরপ্রসাদ কি বাড়ীর আর কেউ সে আশা কখনো করে নি।

একদিন বিকেল বেলা হরপ্রসাদ ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েচেন, সঙ্গে নেঙ্গুড় নবকুমার আছে। যেখানে ব্যাণ্ড বাজে তার পাশে হরপ্রসাদ পায়চারি করচেন, আর নবকুমার এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করচে। হঠাৎ সে একটা বেঞ্চের পিছনে থম্‌কে দাঁড়াল। বেঞ্চে বসে একটি সৌখীন বাবু, রেশমের পাঞ্জাবী, রেশমের চাদর, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দুটি তিনটী ছেলে। বাবু পকেট থেকে লজঞ্জুস বের ক'রে ছেলেদের হাতে দিচ্চেন। নবকুমার দেখলে, বাবুর বাঁ হাতে ছয়টি আঙুল, বুড়ো আঙুলের পাশ দিয়ে আর একটি ছোট আঙুল বেরিয়েচে। নবকুমারকে সে বাবুটী মোটেই দেখতে পান নি, তার দিকে তিনি পিছন ফিরিয়ে বসে ছিলেন। নবকুমার হরপ্রসাদকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে, তিনি এলে বল্‌লে, "সেদিন রাত্রে যে আমাদের বাড়ী চুরি হয়েছিল, সেই চোরের সর্দ্দার ঐ বসে।"

"বলিস কিরে, ভদ্রলোক, অমন কাপড়-চোপড় পরা ? যা, তুই খেলা করগে যা !"

"তুমি এস না আমার সঙ্গে, তোমায় দেখাচ্চি।" নবকুমার এগিয়ে গিয়ে সেই বাবুটীর সামনে দাঁড়াল, হরপ্রসাদ একটু দূরে। নবকুমার হাত পেতে বল্‌লে, "আমাকে দুটো লজঞ্জুস দাও না, সেদিন রাত্রে আমাকে দিয়েছিলে, মনে নেই ? তোমার মুখস আর দাড়ী আর পিস্তল কি হ'ল ?"

বাবুটির বাঁ হাতে লজঞ্জুস ছিল, ডান হাতে গন্ধে ভুর্‌ভুর্ রেশমী রুমাল। একবার চেয়ে নবকুমারের মুখ দেখলেন, আবার হরপ্রসাদের মুখ দেখলেন। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত গিয়ে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, হাতের আঙুলগুলো কাঁপতে লাগ্‌ল। মুখ খুলে কথা কইতে গেলেন, একটিও কথা বেরুল না। হরপ্রসাদের আর কোন সন্দেহ রইল না। তিনি গিয়ে তাঁর হাত ধর্‌লেন, ডাক্‌লেন,—"সার্জ্জন !"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

জাগরণ

রাত্রির অপার
স্পন্দহীন-অন্ধকার,
বুকে তারি—অপলক জাগরণ মম,—
ভেসে যাওয়া প্রদীপের শিখাটীর সম,
—কেঁপে কেঁপে চলে অনিবার,
অজানারি যাত্রী সে আমার !

তবু মনে হয়,—
ব্যর্থ কিছুতেই নয়
স্তব্ধ এই জাগরণ সুদূরেরি তরে।
ধরা আর আকাশের অন্তরাল ভরে
মেলে আঁখি চির-অনিমিখ,
ফিরিয়া সে দিক হতে দিক—

একটী নিমেষে,
থামিয়া পড়ে গো এসে,
নিভৃত সে কুটীরেরি বাতায়ন-তলে ;
তন্দ্রাহীন চোখে যেথা একান্ত বিরলে
বসে থাকে বিরহিণী প্রিয়া,
দিগন্তের ওপারে চাহিয়া।

ধীরে তার আঁখি
ঘুমভারে আসে ঢাকি ;
মৌন জাগরণ মম, তার পরে শেষে
অশ্রুর নির্ঝর-ঝরা স্বপনের বেশে
পশি তারি নিবিড় অন্তরে,
শিহরিয়া মুরছিয়া পড়ে !

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

স্যাণ্ডো বনাম রোল্যাণ্ডো

সাধারণের একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে, স্যাণ্ডোই পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে বলবান লোক। একালে বিজ্ঞাপনের ও মুখ-সাবাসির জোরে লোকে হয়কে নয় করতে পারে। স্যাণ্ডো যথার্থই একজন জোয়ান লোক বটে, কিন্তু তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে নাম কিনেছেন, সেটা কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জোরেই।

স্যাণ্ডোর উঠ্‌তি বয়সেও পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ ও তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক অনেকে স্যাণ্ডোর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে রাজি হ'লেও, স্যাণ্ডো সে প্রস্তাবে কখনো রাজি হন-নি। কারণ নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়। এম্‌নি ভাবে

১ মণ ৩৫ সের ওজন নিয়ে লাফিয়ে টেবিল পার হওয়া

প্রতিদ্বন্দ্বীকে এড়িয়েই স্যাণ্ডো নিজের নাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

রোল্যাণ্ডো—২৪ বৎসর বয়সে

স্যাণ্ডোর এই শ্রেণীর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম, রোল্যাণ্ডো। ইনি জাতে সুইস। পঁচিশ বৎসর আগে স্যাণ্ডো যত-রকম গায়ের জোরের কসরৎ দেখিয়েছিলেন, ইনি তার কোনটিতেই অপারগ হন-নি। স্যাণ্ডোকে ইনি শক্তি-পরীক্ষায় আহ্বানও করেছিলেন, কিন্তু স্যাণ্ডো চালাকের মত পিছিয়ে যান। অথচ স্যাণ্ডোর চেয়ে রোল্যাণ্ডো ওজনে বারো সের কম ছিলেন! যাঁরা দেহ-চর্চ্চায় বিশেষজ্ঞ, তাঁরা বিলক্ষণই বুঝতে পারবেন যে, দেহের ওজনে চার-পাঁচ সের হের-ফের হ'লেও, জোর ও দমের হেরফেরও হয় কতটা!

রোল্যাণ্ডো আবার যে-রকম গায়ের জোরের পরিচয় দিয়েছেন, স্যাণ্ডো কখনো তা পারেন-নি। রোল্যাণ্ডো

রোল্যাণ্ডো—৪৯ বৎসর বয়সে

মাটি থেকে কেবলমাত্র একটি আঙুল দিয়ে ধ'রে সাতমণ বিশ সের ওজনের মাল টেনে তুলতে পারেন! না-জানি সে কি-রকম আঙুল! তিনমণ পঁয়ত্রিশ সের ওজনের বারবেল তিনি অনায়াসেই মাটি থেকে মাথার উপরে তুলতে পারেন। একটি পাঁচমণ ওজনের বারবেল দুইহাতে ধ'রে, সেটা শূন্যে রেখেই, তিনি সামনে ও পিছনে বারবেল টপ্‌কে লাফাতে পারেন। প্রতি হাতে এক-একটি আটাশ সের ওজনের বেল নিয়ে (মোট একমণ ষোল সের) তিনি শূন্যে—পিছনদিকে ডিগবাজি খেতে পারেন। প্রতি হাতে সাড়ে সাঁইত্রিশ সের ওজনের বেল নিয়ে (মোট একমণ পঁইত্রিশ সের) তিনি একটি ত্রিশ ইঞ্চি উঁচু ও ছাব্বিশ ইঞ্চি চওড়া টেবিল লাফিয়ে টপ্‌কে আসতে পারেন। আজ পর্য্যন্ত কেউ দড়ি নিয়ে পাঁচ হাজার বারের বেশী লাফাতে পারে নি। কিন্তু রোল্যাণ্ডো এই কাজটি (rope jumping) পনেরো হাজার বার করেছেন। স্যাণ্ডো একসঙ্গে আড়াই 'প্যাক' তাস ছিঁড়েছেন—রোল্যাণ্ডো ছিঁড়েছেন তিন 'প্যাক'।

রোল্যাণ্ডো এত বড় জোয়ান, কিন্তু তাঁর দেহের কোথাও মাংসপেশীর অনাবশ্যক ভার নেই। তাঁর দেহ আদর্শ দেহ। বড় বড় জোয়ানরা প্রায়ই থপ্‌থপে, অথর্ব্ব হয়, রোল্যাণ্ডো কিন্তু আশ্চর্য্য-রকম চটপটে, তাঁর গতি লঘু ও বিদ্যুতের মতন দ্রুত। তিনি খুব ভালো মুষ্টিযোদ্ধা ও কুস্তিগীর। তিনি পায়ের মত দুইহাতে ভর দিয়ে শূন্যে পা তুলে অনায়াসে চলা-ফেরা করতে পারেন। ব্যায়াম যে মানুষের যৌবনকে কতটা দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে, রোল্যাণ্ডোর দেহ তার চমৎকার প্রমাণ। চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁর যে চেহারা ছিল, আজ উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সেও তাঁর চেহারা প্রায় তেম্‌নিই অবিকৃত আছে—জরা তাঁর দেহে মোটেই দাঁত ফোটাতে পারে-নি।

৫ মণ বারবেল হাতে নিয়ে সেটার সামনে ও পিছনে টপ্‌কে যাওয়া

বিষে বিষক্ষয়

আজ-পর্য্যন্ত অনেকেই সর্প-দংশনের ঔষধ আবিষ্কার করেছে ব'লে লোক ঠকিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই সাবেক-কালের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যা বলেছে, তার চেয়ে সঠিক কথা আর কেউ বলতে পারে-নি। কবিরাজরা জানেন, সাপের বিষের একমাত্র ওষুধ, সাপের বিষ। একালের বিজ্ঞানও ঐ মতকে সত্য ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে

১ মণ ১৮ সের ওজন নিয়ে পিছন-মুখো ডিগবাজি

যদি কারুকে কেউটে বা গোখ্‌রো সাপে কামড়ায়, তবে যথাক্রমে ঐ কেউটে বা গোখ্‌রো সাপের বিষ বা serum (রক্তের জলীয় অংশে) ব্যবহার না করলে কোনই ফল পাওয়া যাবে না। সাপে কামড়ালেই প্রথমে তাই জান্‌তে হবে, তখনি ঐ বিষ-ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। দেরি করলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

এখন, সাপের বিষ ঔষধের আকারে হাতের কাছে পাওয়া তো বড় সহজ কথা নয়! এজন্যে আগে থাকতে প্রস্তুত না হ'লে চলবে না। এই উদ্দেশ্যে ব্রেজিলে একটি সর্পাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে 'ডোমে'র আকারে গড়া ছোট ছোট ঘরে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সকল-রকম বিষাক্ত সাপই পোষা থাকে। সেই সাপেদের বিষ থেকে ডাক্তাররা আগে থাক্‌তে ওষুধ তৈরি ক'রে রাখেন। এই উপায়ে গত দশ-বৎসরের মধ্যে ব্রেজিলের অসংখ্য লোক সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। ব্রেজিলের দেখাদেখি ভারত-সরকারও এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারতেও শীঘ্রই একটি সর্পাগার প্রতিষ্ঠিত হবে! মঙ্গলের কথা। কারণ সর্পাঘাতে ভারতে কি বৎসরে যত লোক মরে, তেমন আর কোথাও নয়।

কি-ক'রে এই ওষুধ তৈরি হয়, তাও মোটামুটি বলছি।

সর্পাগার থেকে মাঝে মাঝে সাপের বিষ সংগ্রহ করা হয়। তারপর সেই বিষের সঙ্গে চিনি বা দুধ মিশিয়ে তাকে পাৎলা ক'রে এনে খচ্চর বা অন্য কোন জন্তুর দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। জন্তুর দেহে এমনি, অল্পে অল্পে মাত্রা বাড়িয়ে বিষ দিলে, পরে তার দেহে বিষের আর কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। তারপর সেই জন্তুর দেহ থেকে টিকা নিয়ে সাপে-কামড়ানো লোকের দেহে যথাসময়ে দিতে পারলে আর কোনই ভয় থাকে না।

সাপের উপর-চোয়ালের পাশে, ঠিক চোখের পিছনকার চামড়ার তলায় দুটি-গ্রন্থি বা 'গ্ল্যাণ্ড' আছে। সেই দুটি গ্রন্থির ভিতরেই কিঞ্চিৎ-ঘন তরল বিষ সঞ্চিত থাকে।

কু-ক্লু,ক্স্‌ ক্ল্যান্‌

"কু-ক্লু,ক্স্‌-ক্ল্যান" হচ্ছে আমেরিকার এক গুপ্ত আড্ডার নাম। লক্ষ লক্ষ লোক এই আড্ডার নিয়মিত সভ্য। সম্প্রতি প্রায় দশ হাজার নতুন সভ্য এই আড্ডায় নাম লিখিয়েছে। এ থেকেই বোঝা যাবে, আমেরিকায় এই আড্ডায় কল্‌কে পাবার জন্যে লোকের আগ্রহ কতটা বেশী।

কু-ক্লু,ক্স-ক্ল্যানের নামে আমেরিকার ভালোমানুষেরা ভয়ে শিউরে ওঠে। ঐ আড্ডার লোকেরা এমন অসৎ কাজ নেই যা করে না। খুন-জখম, বেত্রাঘাত, অত্যাচার, লুঠ-তরাজ, মানুষ চুরি ও নারীর অপমান প্রভৃতি সকল কাজেই তারা সর্ব্বদাই তৎপর। তারা সরকারি আইনকে গ্রাহ্য করে না। কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোরা বিশেষ ক'রে তাদের অত্যাচারে জর্জ্জর। রাত্রের অন্ধকারে ছায়া-শরীরীর মত ক্ল্যানের লোকেরা শান্তিসুপ্ত পল্লীর উপরে গিয়ে পড়ে, নিগ্রোদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়, টাকা-কড়ি লুঠ করে, এবং কারুকে পুড়িয়ে, কারুকে জলে ডুবিয়ে বা কারুকে গুলি ক'রে মারে। এরা দলে এমন ভারি যে, কর্তৃপক্ষ এদের এঁটে উঠতে পারছেন না। পুলিসের লোকও এদের যমের মত ভয় করে। সমস্ত দেশ এদের বিরুদ্ধে, কিন্তু তাতেও ক্ল্যানের প্রভাব কিছুমাত্র
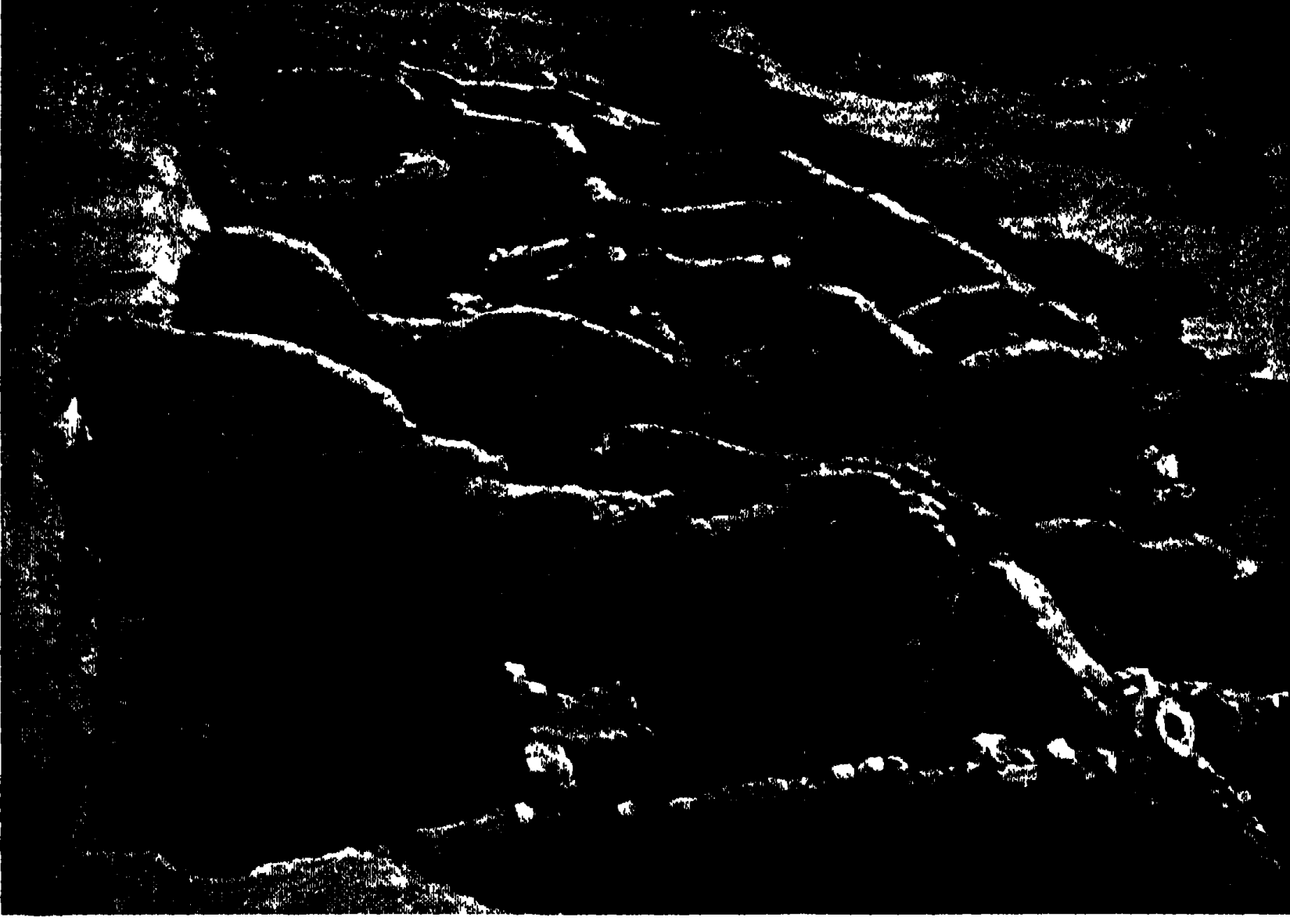
১১। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার একটী মিশর পল্লীর ধ্বংশাবশেষ

পীরামিড অনুসন্ধান করিতে আসিয়া এই পল্লীটির সন্ধান পাইয়াছেন। নৃপতি আমেনেমহাত ও তৎপরবর্ত্তী রাজা ও রাজপরিবারবর্গের কবর অন্বেষণে খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল বটে—কিন্তু খনিত্র মৃত্তিকা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে উহা কোনও না কোনও ধ্বংশপ্রায় পল্লী-গৃহের ভিত্তিগাত্রে যাইয়া ঠেকিতেছিল। লিষ্ট্ প্রদেশের সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার। আসল সমাধিস্তূপে পৌছিবার পথে এই ভগ্নাবশেষ পল্লীকুটীরগুলি বাধাস্বরূপ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে বটে কিন্তু এই সব প্রাচীন কুটীরের অভ্যন্তরে মানুষের কৌতুহলোদ্দীপক যে সকল অতীত-ইতিহাসের অজ্ঞাত তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, উহা বোধ হয় মিশর নৃপতি-গণের কোন সমাধি-গৃহ হইতেই পাওয়া যাইত না। একাদশ চিত্রে এইরূপ অনেকগুলি কুটীরের ছবি দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি সমস্তই ধ্বংশাবশেষ পীরামিডের নিম্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চিত্রে কেবল-মাত্র একখানি কুটীরের ছবি আছে। এই কুটীর-
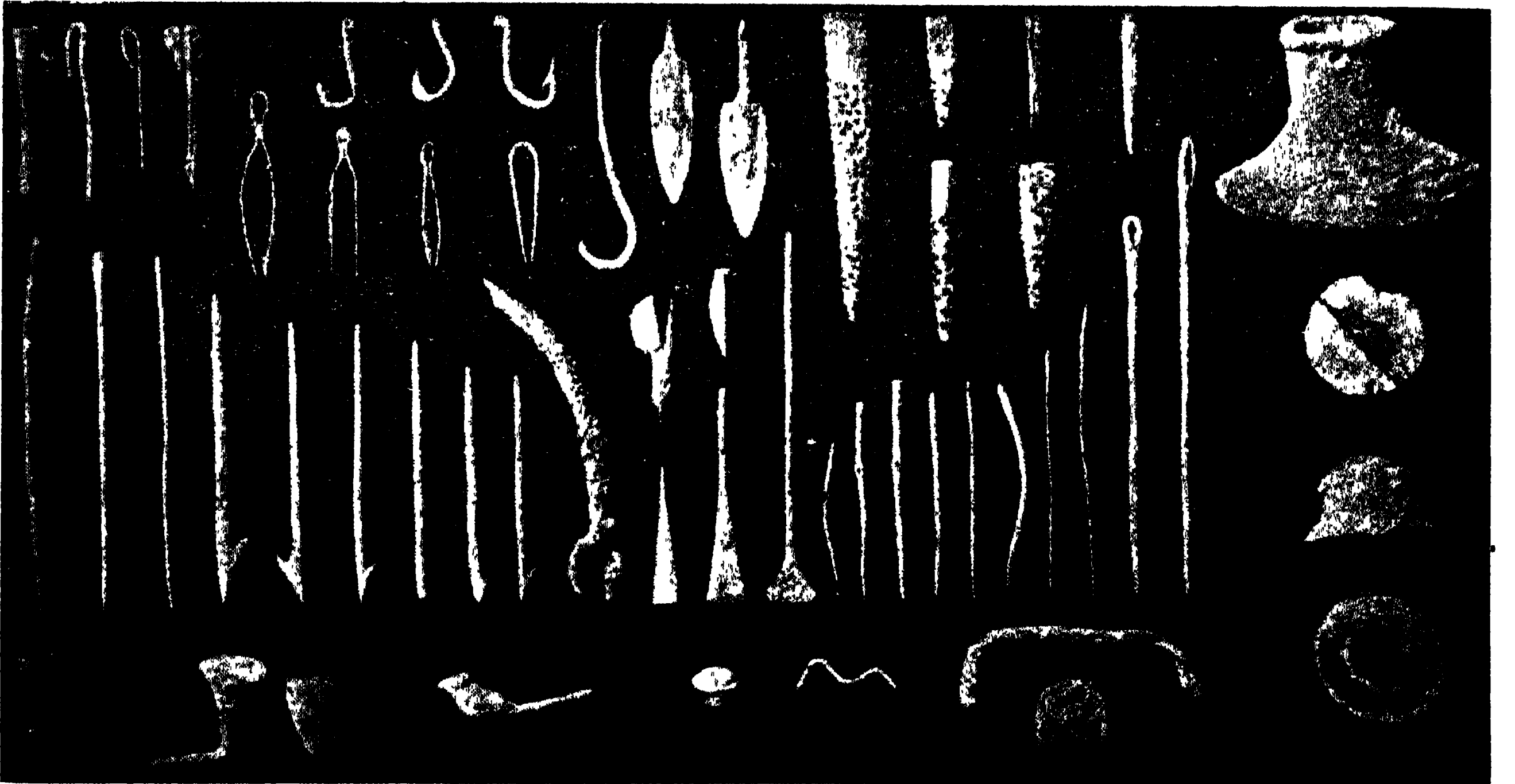
১২। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার গৃহস্থগণের ব্যবহৃত যন্ত্রাদি

১৩। ছুটি হাঁস

আমরা তদানীন্তন পল্লীবাসীগণের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাইতেছি। চতুর্থ ও দ্বাদশ চিত্রে ওই সকল দ্রব্যের ছবি দেওয়া হইয়াছে। একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন দ্বাদশ চিত্রে কত তাম্রনির্ম্মিত যন্ত্রপাতি অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, যেমন—গজাল, পেরেক, চিমটে, সোন্না, বঁড়শী, তেফালা, শড়্কী, তীর-ফলা, মোটা উকো, ছুঁচ, শলা, কুড়ুলের ফলা এমনি আরও কত-কি পাওয়া গিয়াছে। চতুর্থ চিত্রে দেখা যাইবে কেশ-প্রসাধনের জন্য কত হরেক রকমের

খানির পার্শ্বে উপরে উঠিবার একটি সিঁড়ি আছে। সম্ভবতঃ এই সিঁড়িটি—ঐ বাড়ীরই দ্বিতলে যাইবার সিঁড়ি ছিল অথবা অন্য এমন একখানি কুটীরে উঠিবার সিঁড়ি ছিল, যেখানি পীরামিডের আরও উপরিভাগের গড়ানে জমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কুটীরখানির দ্বিতলের আর এখন কোন অস্তিত্বই নাই—তবে চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই সব ধ্বংশাবশেষ কুটীরগুলিতে মূল্যবান দ্রব্যাদি বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই বটে—কিন্তু প্রাচীন দারিদ্র গৃহস্থগণের নিত্যব্যবহার্য্য যে সকল ছোটখাটো আসবাব ও তৈজস পত্র প্রভৃতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে—উহা অতীতের বহু অজানিত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছে। এই সকল দ্রব্যাদি হইতে

১৫।

চিরুণী সে সময় প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া চরকা তাঁত প্রভৃতি বয়ন কার্য্যের বহুবিধ সরঞ্জাম, মাছ ধরা জালের ধারে লাগাইবার কাঁঠি, ওজন বাটখারা, ওলোন, হাতুড়ী, জাঁতা, ল্যাম্প, কাঠের মুগুর, গরুকে জাবনা দেবার ডাবর, চালুনী প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে—যাহার অধিকাংশই আজ এই চার হাজার বৎসর পরের গৃহস্থদেরও নিত্য ব্যবহার করিতে হয়।

সকল বাড়ীতেই প্রায় এক একটি ঠাকুর ঘর ছিল। সেই ঘরের একধারে বেদীর উপর বেলেপাথরে নির্ম্মিত গৃহদেবতার বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপিত

১৪। চক্রাকার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত বেলে পাথরের বিগ্রহমূর্ত্তি

থাকিত। প্রথম চিত্রে এইরূপ কয়েকটি বিগ্রহমূর্ত্তির আলোক-চিত্র দেওয়া হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে চারহাজার বৎসর পূর্ব্বেও মিশরের গৃহে গৃহে দেবদেবী উভয় মূর্ত্তিই নিত্য নিয়মিত ভাবে পূজিত হইত। একাদশ চিত্রের সম্মুখস্থ কুটীর-খানির মধ্যে এইরূপ একটি বেদীযুক্ত কক্ষ পরিলক্ষিত হইবে।

পীরামিডের খনন-কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইবার পর মিশরীয় রাজকুমারীদের সমাধি কক্ষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে-যে চারটি রাজকুমারীর কবরের উদ্ধার হইয়াছে, সে চারটি একেবারে শূন্য! মৃত্তিকা গহ্বরে বিলুপ্ত হইবার বহু পূর্ব্বেই বোধ হয় সেগুলি লুট হইয়া গিয়াছিল। পীরামিডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে

১৬। চীনামাটির রঙীণ ফুলদান

অনেকগুলি কবর বাহির হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেগুলি রাজ-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের ও তাহাদের অনুচরবর্গের। ঐ কবরগুলির মধ্যে ৩৭৯নং কবরটির ভিতর হইতে একটি নীলবর্ণের সুন্দর সিংহমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, অষ্টাদশ চিত্রে তাহার ছবি দেওয়া হইয়াছে। এই সিংহটি প্রস্তর নির্ম্মিত নহে, নীলরঙের চীনামাটি বা এইরূপ ধরণের কোন পদার্থে প্রস্তুত।

পীরামিডের সানুদেশ অনেকটা প্রায় খোলাই পড়িয়াছিল। এই অংশটি পরিষ্কার করিতে করিতে
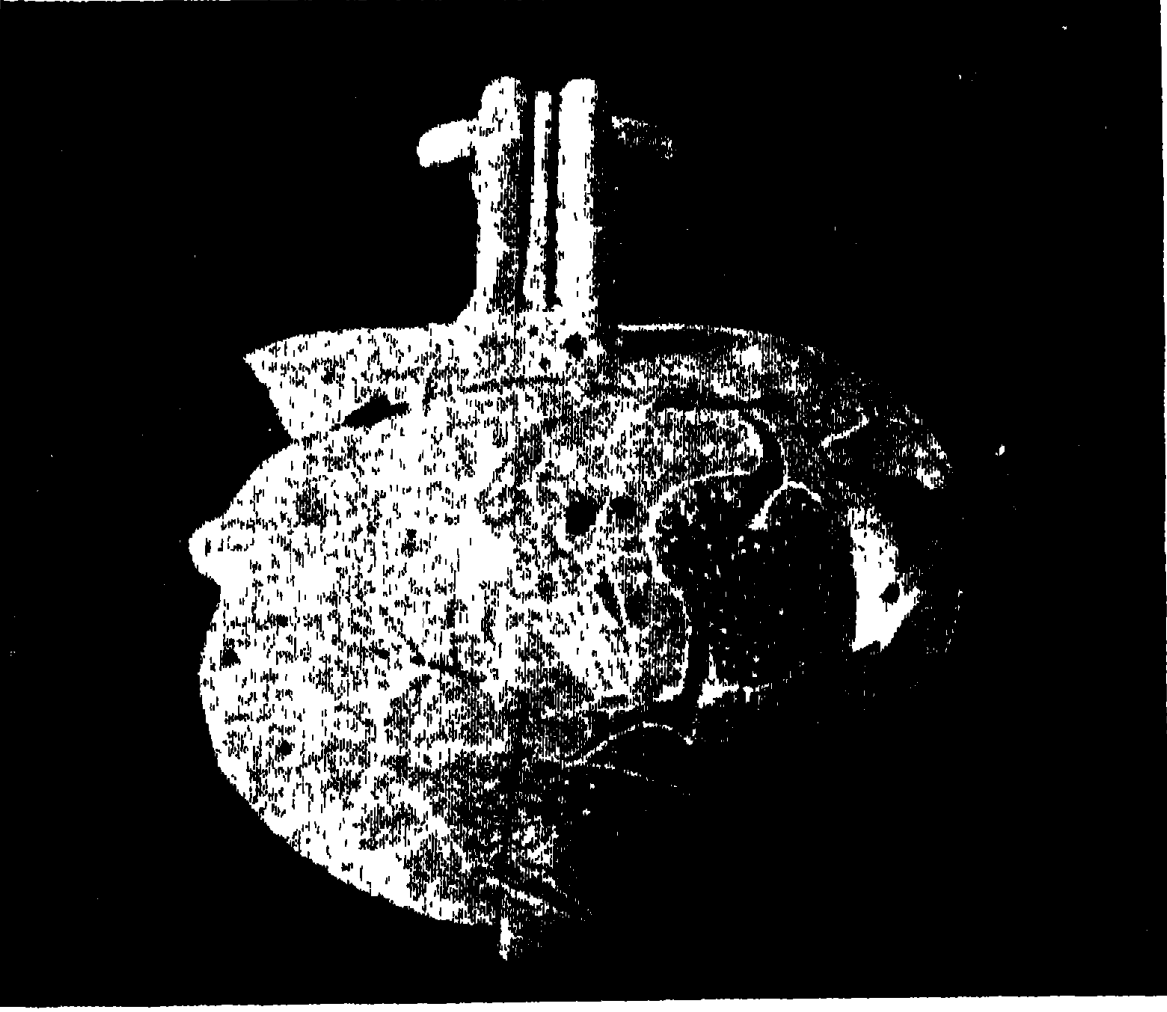
১৭। পীরামিডের ভিত্তি হইতে প্রাপ্ত ইট
(এই ইটের অভ্যন্তরে রাজার নামাঙ্কিত পদক পাওয়া গিয়াছে)

পীরামিডের প্রথম ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে-স্থানে, সেই জায়গাটি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এই বিরাট
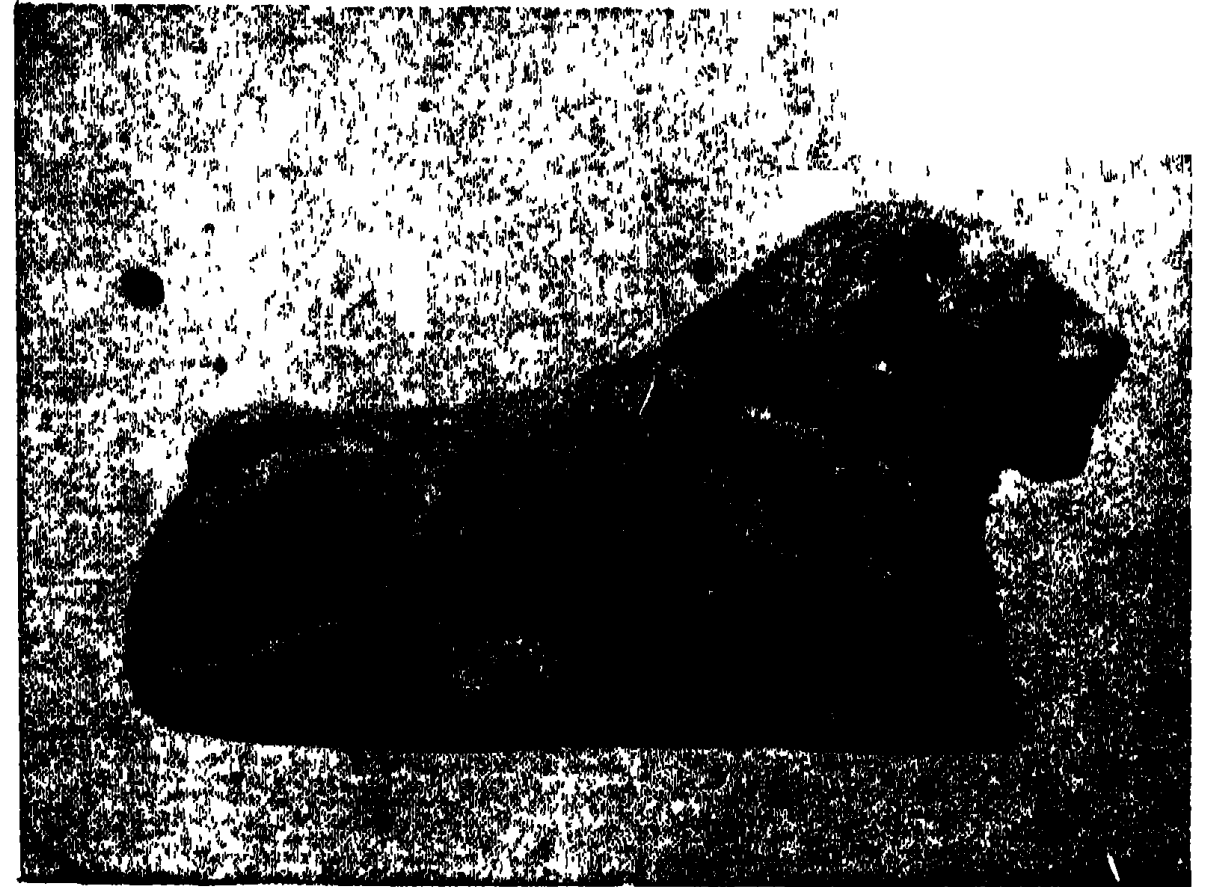
১৮। নীলবর্ণের সিংহমূর্ত্তি
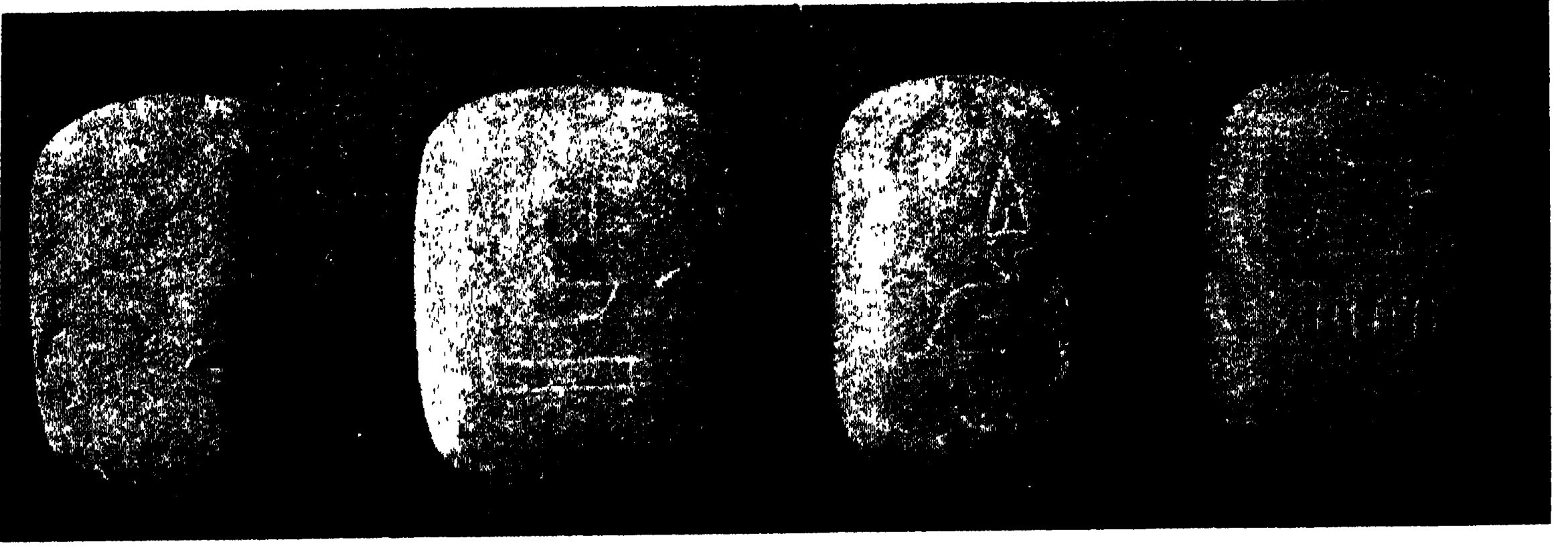
১৯। নৃপতি প্রথম স্যেমুশার্টের নামাদি প্রস্তরে প্রস্তুত ওজোন বাটখারা

পীরামিডের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে। এই কোণেই সর্ব্বাগ্রে পীরামিডের প্রথম ভিত্তি খোঁড়া হইয়াছিল এবং ভিত্তি প্রতিষ্ঠার দিন সেই প্রথম-খনিত ভূগর্ভে মাঙ্গলিক চিহ্ন স্বরূপ যে সকল দ্রব্যাদি অর্ঘ্য-প্রদান করা হইয়াছিল সেগুলিও পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধীগণের নিকট আজ উহা অমূল্য রত্নস্বরূপ বিবেচিত হইতেছে! বহু চেষ্টা করিয়াও এতকাল যাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে

২০। লুক্সরের মন্দির

২১। তৃতীয় টুথমোসিস

দলে নতুন লোক নেওয়া ;—পুরাণো সভ্যরা ঘেরাটোপের পোষাক প'রে দাঁড়িয়ে আছে

কমছে না। ক্ল্যানের সভ্যদের বিশেষ একরকম পোষাক আছে। সে পোষাকে মুসলমান নারীর বোর্খার মত শরীরের আপাদমস্তক ঢাকা পড়ে। যে এখানকার আড্ডাধারী বা দলপতি,—রাজার মতন তার ক্ষমতা। তার কথা সকলেই মাথা পেতে মানতে বাধ্য। ক্ল্যানে এখন একজন নারী আছে,—সে এখানে রাণীর মত শক্তি পেয়েছে। এই দলে খালি পুরুষ নয়, নারীও আছে অগুন্তি। আমেরিকায় কোনল নারীত্বের যে কি অধঃপতন হয়েছে, ক্ল্যানের নারী সভ্যরা তারই জীবন্ত প্রমাণ।

যারা দলে ভর্ত্তি হ'তে চায়, আগে তাদের চোখ বেঁধে, তবে সকলকে প্রধান আড্ডার ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তারা আড্ডার সব নিয়ম মানবে ব'লে শপথ করে। তারপর তাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। তারা জানতে পারে না যে প্রধান আড্ডার ঠিকানা কোথায়। একবার দলে ঢুকে যে বিশ্বাসঘাতক হয়, তার আর রক্ষা নেই।

ক্ল্যানের লোকবল আর অর্থবল দুইই যথেষ্ট। ক্ল্যানের নিয়মাবলী পড়্‌লে সকলেরই মনে হবে, এখানে ন্যায়েরই অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা, দলের লোকেরা সকলেই ঈশ্বর-ভক্ত ও সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী,—এমন-কি বিশ্ব-প্রেমিক বল্‌লেও চলে। কাজে কিন্তু এ ভণ্ডামি জাহির হয়ে পড়ে। ভগবানের নাম নিয়ে মানুষ যে কত অসৎ কাজ করতে পারে, "কু-ক্লুক্স-ক্ল্যান" তা বিশেষ-রূপেই দেখিয়েছে এবং দেখাচ্ছে। আসল কথা, "কু-ক্লুক্স-ক্ল্যান" আমেরিকার সভ্যতা-গৌরবকে কলঙ্কে কালো ক'রে তুলেছে।

শিশু-ব্যায়াম

দেহ-চর্চ্চার কোন নামজাদা বিশেষজ্ঞ লিখেছেন :—অনেকের ভ্রম আছে যে, নব-জাত শিশুর গায়ে বিশেষ কিছুই জোর নেই। আসলে শিশুরা তাদের দেহের তুলনায় মোটেই দুর্ব্বল নয়। প্রত্যেক বাপ-মায়েব উচিত যে, শিশুর এই জোর যাতে বাড়ে সেই চেষ্টা করা।

শিশুর জোর নির্দ্দোষভাবে বাড়াতে চাইলে গুটিকতক উপায় অবলম্বন করতে হয়। প্রথম,—শিশুকে উপুড় করিয়ে শুইয়ে রাখ্‌বেন। বাধাই হচ্ছে জোর বাড়াবার প্রধান উপায়। উপুড় হয়ে শুয়ে থাক্‌লে শিশুর প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে বাধা পায়। হাত-পা-মাথা নাড়তে সে রীতিমত বেগ পাবে। তার ফলে শিশুর বুক, হাত, পা, গলা ও শিরদাঁড়ার হাড় শক্ত হয়ে ওঠে। উপুড়

১। শিশুর ব্যায়াম

২। শিশুর ব্যায়াম

ক'রে শুইয়ে রাখলে শিশুর কিছুমাত্র অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই।

শিশুর বয়স মাসখানেক হ'লেই তাকে ধীরে ধীরে ব্যায়ামে অভ্যস্ত করে তোলা উচিত। প্রথমে দিনে একবার তারপর দু'বার ক'রে ব্যায়ামই যথেষ্ট। গোড়ায় পাঁচমিনিটের বেশী ব্যায়ামের দরকার নেই, তারপর আস্তে আস্তে সময় বাড়িয়ে দশ কি পনেরো মিনিট পর্য্যন্ত ব্যায়াম করতে পারেন। এই প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যায়ামের পাঁচখানি ছবি দেওয়া গেল। ছবির শিশুটির বয়স চার মাসের বেশী নয়। ছবির ব্যাখ্যা এই :—

১ম ছবি। দুই হাতে শিশুর দুই হাত ধরুন। তারপর পর্য্যায়ক্রমে একবার ডান ও একবার বাঁ নীচে থেকে কাঁধের কাছ পর্য্যন্ত তুলুন আর নামিয়ে আনুন। এটা হয়ে গেলে, ঠিক ঐভাবেই আবার শিশুর হাত তোলা-নামা করতে হবে,—কিন্তু হাত এবার প্রায় মাথা ছাড়িয়ে উঠবে।

৩। শিশুর ব্যায়াম

২য় ছবি। শিশুর হাত দুই পাশে বাইরের দিকে ছড়িয়ে, কনুই প্রায় সিধা রেখে মাথার উপর পর্য্যন্ত তুলতে হবে। এ ব্যায়ামে শিশু যত বেশী বাধা দেয় ততই ভালো।

৩য় ছবি। ঠিক ছবির মত অবস্থায় শিশুকে রেখে—তার হাত দুটি বুকের উপরে জোড় ক'রে ধরে, দুই পাশে বাইরের দিকে ছড়িয়ে, আবার পূর্ব্ব-অবস্থায় আনুন। এম্‌নি কয়েকবার।

৪র্থ ছবি। বসানো অবস্থায় শিশুকে রেখে, তার দুই হাত ধরে তাকে সামান্য একটু সাম্‌নের দিকে টেনে আনুন। এর ফলে শিশু দাঁড়াবার চেষ্টা করবে, তাতে তার পায়ের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠ্‌বে।

৪। শিশুর ব্যায়াম

৫ম ছবি। ছবি-শিশুর মত আপনার শিশুর হাত ধ'রে, তাকে উপরদিকে টেনে অল্পক্ষণ ঝুলিয়ে রাখুন। আবার তাকে বসান, আবার তাকে ঝোলান। এম্‌নি বার কতক।

এই-সব ব্যায়ামে প্রথম প্রথম শিশু বাধা দেবে নিশ্চয়ই—কিন্তু আগেই বলেছি, বাধাতেই শক্তিবৃদ্ধি হয়।
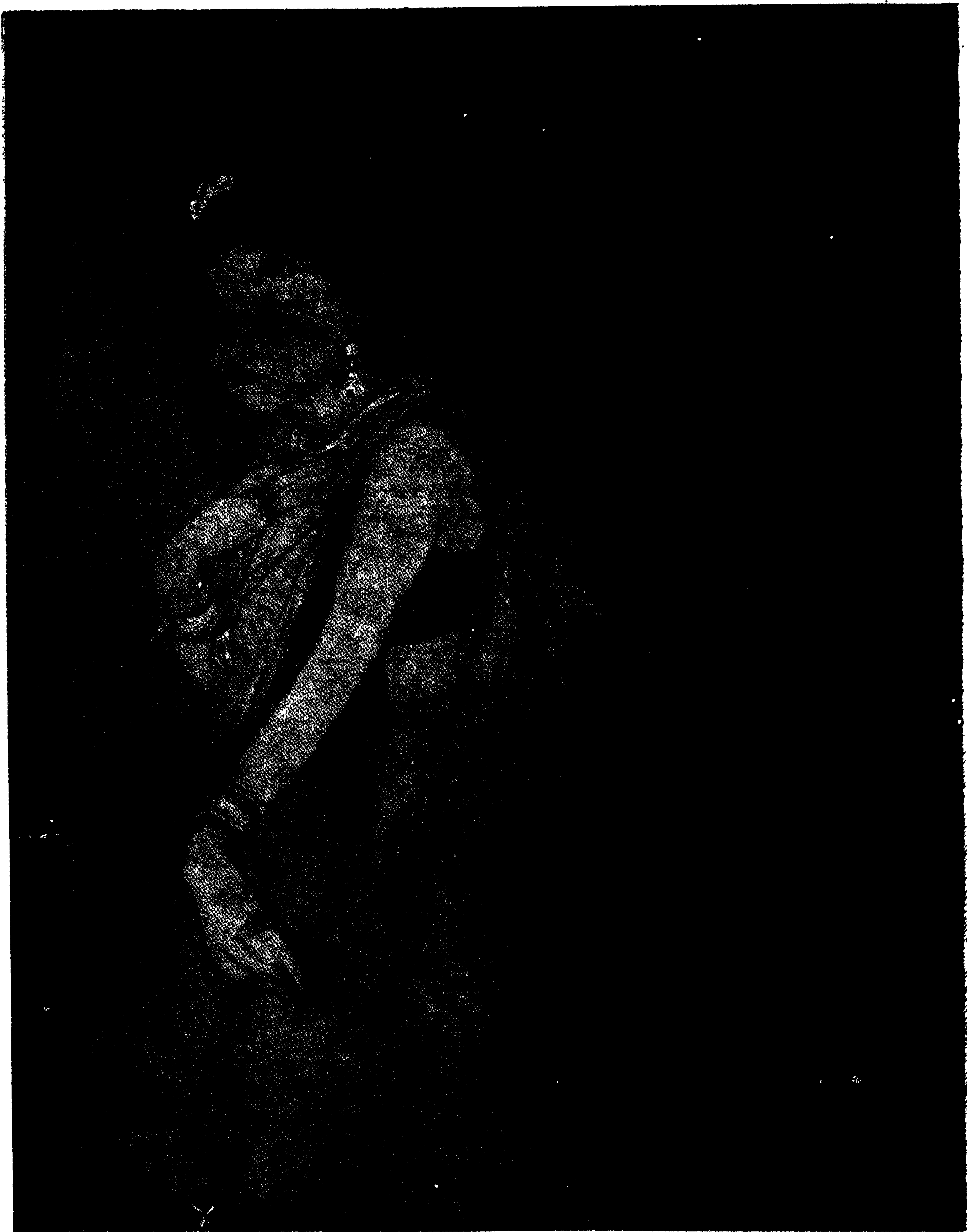
বসন্তসেনা।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত
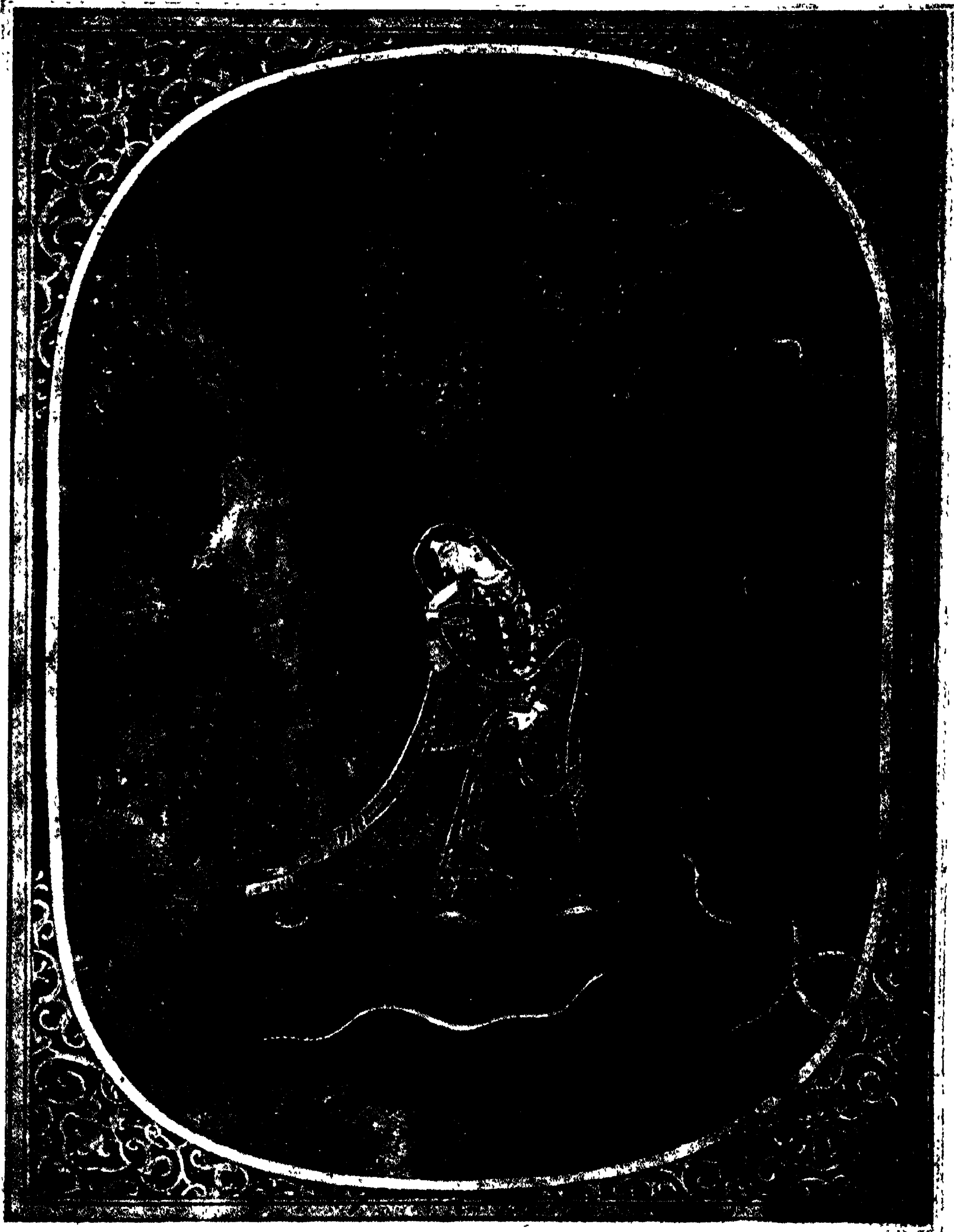
"নব অনুরাগিণী রাধা, কিছু নাহি মানয়ে বাধা,
একলি করল পয়ান, পথ বিপথ নাহি মান।"
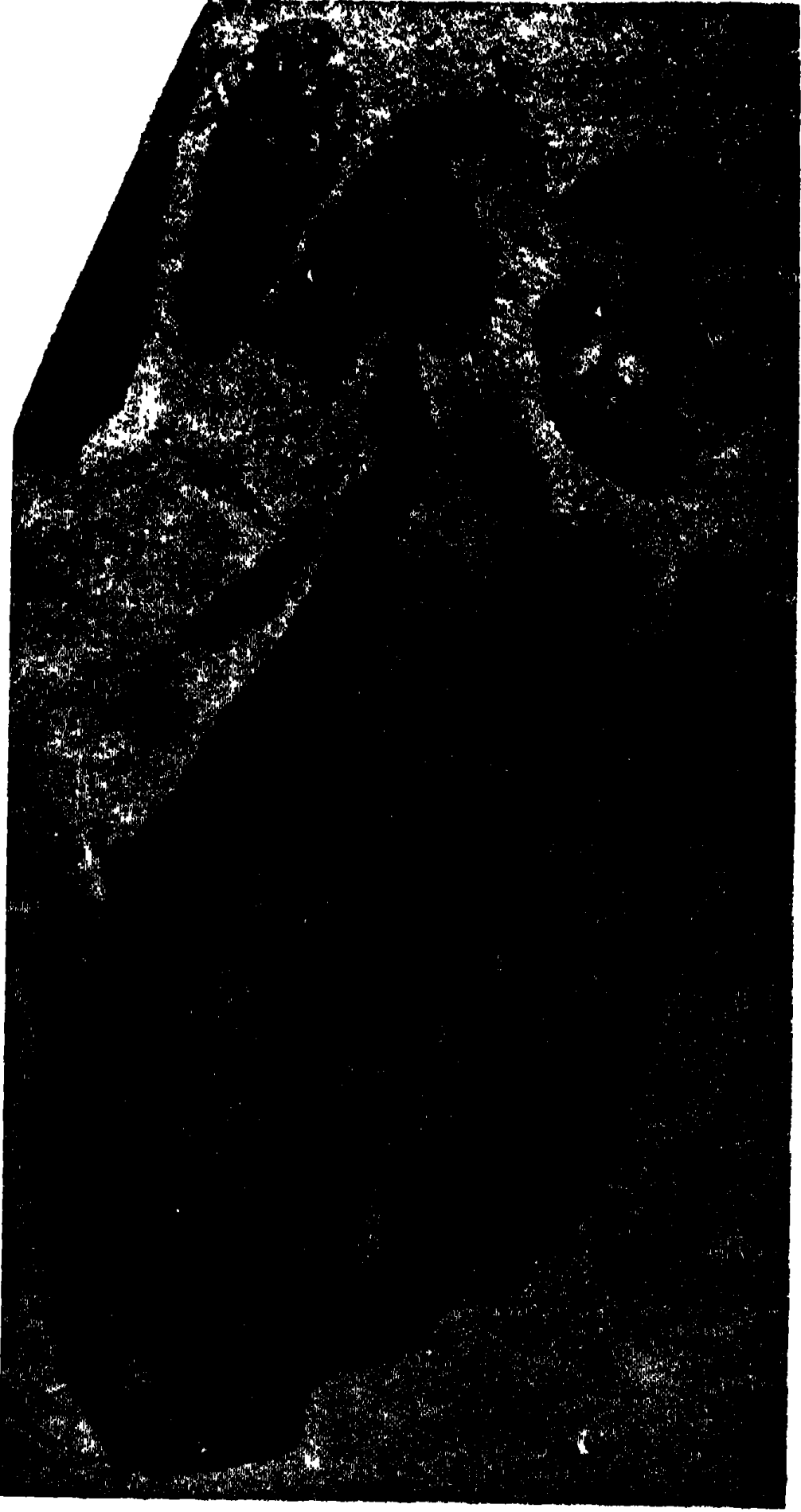
৫। শিশুর ব্যায়াম

সুতরাং শিশুর বাধা গ্রাহ্য করবার দরকার নেই। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে, শিশু পরে এ-সব ব্যায়ামে যার পর নাই খুসি হবে। কোন একটি ব্যায়ামই বেশীক্ষণ ধ'রে করাবেন না। শিশুকে পায়ের উপরে সোজা অবস্থায় দাঁড়-করাতে চেষ্টা পাবেন না। তাকে জোর ক'রে হাঁটাতেও শেখাবেন না—সে আপনিই হাঁটতে শিখবে।

সাইবেরিয়ার দানব

সংপ্রতি সাইবেরিয়ার একটি লোক হাঙ্গেরীতে এসেছে তার নাম, ক্যায়ানলক। শোনা যাচ্ছে, বর্ত্তমান পৃথিবীতে তার চেয়ে লম্বা-চওড়া লোক আর নাকি দ্বিতীয় নেই। তার আহারও তার আকারের অনুরূপ। তার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি বেরিয়েছে।

ক্যায়ানলকের দেহ লম্বায় ন' ফুট তিন ইঞ্চি! তার দেহ প্রস্থে দৈর্ঘ্যেরই অনুরূপ। তার বুক ছাপ্পান্নো ইঞ্চি চওড়া। তার হাত—আঙুলের ডগা থেকে কজী পর্য্যন্ত—একফুট এক ইঞ্চি। তার এক-একখানা পা এক ফুট ন' ইঞ্চি লম্বা। তার মাথার বেড় পঁচিশ ইঞ্চি। তার দেহের ওজন দশমণ উনত্রিশ সের! প্রতিদিন চার বেলা সে আহার করে। দৈনিক আহার্য্যের পরিমাণ এই:—দুধ প্রায় দু' সের। পনেরো থেকে কুড়িটি ডিম। দেড় থেকে দু' সের মাংস। পাঁচ কি ছ'খানা প্রমাণ পাউরুটি আলু ও অন্যান্য ফল-ফসলও রাশি রাশি। প্রায় সাড়ে তিন সের সুরা—কোন দিন কিছু কম, কোনদিন কিছু বেশী। এর ওপর পাঁচ সের এক পোয়া পর্য্যন্ত বিয়ার মদও আছে! দিনের বেশীর ভাগই সে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। সময়ে সময়ে চব্বিশ ঘণ্টা সে ঘুমিয়ে থাকে। যখন জেগে থাকে, তখনো তার চলা-ফেরা, ভাব-ভঙ্গি তন্দ্রা-কাতরের মত; একলা হ'লেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। জাগরণের সময়ে একমাত্র বিষয়ে তার উৎসাহ দেখা যায়,—তা হচ্ছে পানাহার। দুঃখের বিষয়, আমরা এই অতিকায় লোকটির কোন ছবি জোগাড় করতে পারি নি।
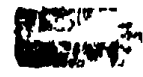
প্রসাদ রায়।

ইউরোপের পুরুষ ও নারীর সংখ্যা

সম্প্রতি বার্লিনে ইউরোপের জন-সংখ্যার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তা থেকে দেখা যায় যে ইউরোপে পুরুষের সংখ্যা প্রায় ২২৫, ০০০, ০০০ সাড়ে বাইশ কোটী; আর মেয়ের সংখ্যা প্রায় ২৫০, ০০০, ০০০ পঁচিশ কোটি—অর্থাৎ ইউরোপের সব পুরুষও যদি বিবাহ করেন তা হ'লেও প্রায় আড়াই কোটি মেয়েকে অবিবাহিত থাকতে হ'বে।

সোমনাথ সাহা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন দ্বিপ্রহর হইতেই বিনয় প্রতীক্ষা করিতেছিল যে কিশোর এইবার হয়ত শামলংয়ের দিকে বেড়াইতে যাইতে চাহিবে তখন তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তখন যাওয়া উচিত নয়, অন্ততঃ ঝরণাদের চড়িভাতি পর্ব্ব শেষ হইয়া যাওয়াটা আন্দাজ করিয়া বৈকালের দিকে গেলেই চলিবে। কিন্তু সমস্ত দ্বিপ্রহর কিশোর যে একবারও এসম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলে না, ইহাতে বিনয় একটু বিস্মিতই হইল। যে দিন ঐরূপ কোন দর্শনীয় স্থানে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব হইত, সেদিন কিশোর যে উৎসাহের আধিক্যে দ্বিপ্রহরে বিশ্রামই করিতে পারিত না! নিদ্রিতা রাজেশ্বরী দেবীর নিকট হইতে সে নিঃশব্দে বিনয়ের ঘরে পলাইয়া আসিয়া এটা ওটা নাড়িয়া চাড়িয়া সময় কাটাইত এবং বোধ হয় মনে মনে প্রতীক্ষা করিত, কখন্ বিনয় উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ করিবে। তাহার অধীরতায় সেদিন আর বিনয়ের দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম-সুখটুকু উপভোগ করা ঘটিয়া উঠিত না। দু-একবার এপাশ ওপাশ করিয়া বিনয় উঠিয়া বসিতেই কিশোর সাগ্রহে তাহাকে যাত্রাপথ সম্বন্ধে নানা প্রশ্নে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। সেস্থানটা তাহাদের বাসা হইতে কত মাইল, যাইতে কতক্ষণ লাগিবে; দিনের অবশিষ্ট সময়টুকুর মধ্যে সেস্থানের সমস্তটা ভাল করিয়া দেখা সম্ভব হইবে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নে তাহার অধীরতার সীমা দেখা যাইত না। বিনয় সস্নেহে হাসিয়া একে একে তাহার সমস্ত ঔৎসুক্যের নিবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিত যে এত আগে যাইবার কোনই প্রয়োজন নাই, যথাকালে যাত্রা করিলেও সমস্ত দেখা শোনার যথেষ্ট সময় থাকিবে। এই অসময়ে রাজেশ্বরী দেবীর বিশ্রাম-সুখ ভঙ্গ করিয়া টানাটানি করিলে তাঁহাকে অসুস্থ করিয়া তোলা হইবে মাত্র,—তখন কিশোর আর কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ দিনে যাইতে হইবে, সে দিকে দর্শন-যোগ্য আর কোন্ কোন্ স্থান আছে তাহাদেরও সবিশেষ তথ্য জানিতে চাহিত। তাহার অধীর আগ্রহের মাত্রা ক্রমেই অধিক হইতেছে বুঝিয়া বিনয় মাতুলানীকে খবর পাঠাইত—তিনি যেন একটু শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া লন্। একটু বেলা থাকিতেই ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে। কিশোর তখন লাফাইয়া উঠিয়া ভৃত্যদের ট্যাক্সি আনিতে আদেশ করিত এবং নিজের সাজসজ্জা ও রাজেশ্বরী দেবীকে তাগিদ দিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া চলিয়া যাইত। তারপরে বেশ একটু রৌদ্র থাকিতেই তাহাদের ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িতে হইত।

সেই কিশোর আজ এমন লোভনীয় বিষয়েও যে ঔৎসুক্যের আভাষ মাত্র প্রকাশ করিতেছে না, ইহাতে বিনয় ক্রমেই একটু বেশী রকম বিস্মিত হইতেছিল। নিজের মনের এই অস্বস্তিটুকুতে তাহার দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামটা আজ ভালরূপে হইল না। বারে বারে চোখ খুলিয়া দেখিতে হইতেছিল কিশোর তাহাকে তাগিদ দিতে আসিতেছে কিনা- কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্র না দেখিয়া চিত্ত নিশ্চিন্ত হইল না। বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া অগত্যা বিনয় উঠিয়া মুখ ধুইয়া লইয়া দেখিল, তখনো কিশোর বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসে নাই। ভৃত্যকে ট্যাক্সি আনিতে পাঠাইয়া কিশোরকে শামলং বেড়াইতে যাইবার জন্য ডাকিয়া উত্তর পাইল—সে আজ বেড়াইতে যাইবে না। কোন অসুখ করিয়াছে কিনা জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া বিনয় রাজেশ্বরার নিকট গিয়া শুনিল, মাষ্টারের সঙ্গে একটু আগে সে রাঁচি হিলের দিকে আজ হাঁটিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। বালকের মনের বা ইচ্ছার গতি এইরূপ চঞ্চল হওয়াই স্বাভাবিক, এই তথ্য ক্রমে বিনয়ের মাথায় আসিয়া তাহার সে বিস্মিত ভাবটা শেষে কাটিয়া গেল বটে—কিন্তু ক্ষুণ্ণতাটুকু ঘুচিল না। সেই নির্ঝরিণীর মত অবাধ-গতি স্বচ্ছ সরল-হৃদয়া বুঝি তাহারই মত মধুর-দর্শনা মনোহারিণী বালিকাটিকে আর একবার দেখিতে, তাহার সঙ্গে আর একটু আলাপ করিতে বিনয়েরই মনের ভিতর

যে একটা আগ্রহ আসিয়াছিল, তাহা এইবার বিনয় বুঝিতে পারিল। এই সুযোগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া তাহাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার উপায়টিও যে হারাইয়া গেল! আর কি তাহার সঙ্গে কোথাও দেখা হইবে? সম্ভব নয়! মাত্র সেই কয় মুহূর্ত্তের সেই কয়টি কথা—ইহাতেই মেয়েটিকে কেন যে বিনয়ের এত ভাল লাগিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

পরদিনই বিনয় রাজেশ্বরী দেবীর নিকট হইতে হুকুম পাইল যে সে-অঞ্চলের যাহা কিছু দর্শন-যোগ্য এবং ভ্রমণ-যোগ্য স্থান আছে, তাহা এইবার বেড়াইয়া দেখিয়া লইতে হইবে। আর কতদিন বাড়াঘর দেশ-ভুঁই ছাড়িয়া বিদেশে পড়িয়া থাকা চলে? বিষয়-আশয়ের কি হইতেছে তার ঠিক নাই—শরীর শরীর বলিয়া তো সর্ব্বস্ব ঘুচাইতে পারা যাইবে না!

ইহার পর মাঝে দুই-একদিন করিয়া বিশ্রাম লইয়া ক্ষিপ্রগতি যানে তাহারা ছোটনাগপুর ও হাজারিবাগ প্রদেশের প্রসিদ্ধ জঙ্গল ও গিরিদরী উপত্যকাময় পথ অতিবাহন করিবার আনন্দ ও বিস্ময় পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া লইতে লাগিল। বহু পর্ব্বত শিখরমালা পার হইয়া গভীর শালবনের ভিতর দিয়া ঘাটের পর ঘাট অতিক্রম করিয়া চক্রধরপুরে তাহারা বেড়াইয়া আসিল। রামগড় দেখার জন্য হাজারিবাগ রোড ধরিয়া দামোদর নদের জন্মস্থান হইতে সে অঞ্চলের দ্বিতীয় সুউচ্চ পর্ব্বত"ইচাদাগের" উপরিস্থ সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ-শূন্য সুগভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া মুণ্ডা গাইডের প্রদর্শিত পথে তাহারা সেই দুরারোহ পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া তবে সন্তুষ্ট হইল। রাঁচি প্লেটোর যেখানে শেষ হইয়াছে, সেই দু-হাজার ফুট নিম্নভূমি প্লেনের অনবদ্য শোভা দেখিতে দেখিতে চুটুপালুর উপর দিয়া বায়ুগতি যানে তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আবার রাঁচিতে ফিরিয়া আসিল। এসব স্থানে রাজেশ্বরী দেবী গাড়ীতে যতদূর যাইতে পারা যায় গিয়া তাহার সাধ্যমত ততদূর দেখিয়াই অগত্যা সন্তুষ্ট হইতেন—কেবল কিশোরের উৎসাহে এবং দৃঢ়তায় বিনয়কে অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াই বেড়াইতে হইত। দেশে ফিরিবার দিন স্থির করিয়া তাহারা তখন দীর্ঘ ভ্রমণের শেষ যাত্রা স্বরূপ হুণ্ডু-প্রপাত দেখিতে গেল। মোটরের গতি যেখানে স্থগিত হইয়াছে, সেখান হইতে সে যাত্রার দর্শনীয় ব্যাপারকে তো কিছুমাত্র অনুভব করিবার উপায় নাই। সেই সমতল ক্ষেত্রবাহিনী অনতিগভীরা অনতিসলিলশালিনী সুবর্ণরেখা যে কিছুদূর গিয়া একটা বিরাট অচিন্ত্য ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সেই ক্রম-নিম্নপথে রাঁচি প্লেটো হইতে প্রায় অর্দ্ধেক নামিয়া আসিয়াও বুঝিবার কিছুমাত্র পথ পাওয়া যায় না। কাজেই রাজেশ্বরীকে বিনয় ও কিশোরের সঙ্গে এবার যান ছাড়িয়া মাইল দুই হাঁটিয়া কয়েকটা মুণ্ডাগাইডের প্রদর্শিত পথে যেখানে সুবর্ণরেখা হঠাৎ পা পিছলাইয়া বিচ্ছিন্ন ক্রমনিম্নপথে স্তরে স্তরে পড়িতে পড়িতে শেষে একস্থানে মিলিত হইয়া শত শত ফুট নিম্নে মহাবেগে ঘোর রোলে পড়িয়া যাইতেছে, তাহারই অদূরে গিয়া উপস্থিত হইতে হইল। এইটুকু পরিশ্রমেই অবসন্ন হইয়া রাজেশ্বরী পাহাড়ের ধারের কাছে একটু ছায়াযুক্ত স্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "আমি বাপু আর চলতে পারব না, এইখানেই আমার শেষ।" কিশোর ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "বাঃ—এইখানেই? এ তো দিব্যি ফল্সের কাছেই পৌঁছুতে পারা যাবে। ঐ দেখুন, কাঁরা সব ওপরের জলের ধারাগুলো টপকে কেবল ফল্সের ওধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার কারা ঐ নীচে নেমে যাচ্ছে। আমরাও যাব, চলুন।"

বিনয় বাধা দিয়া বলিল, "যেখানে যাবে আমার সঙ্গে চল, উনি কি পারেন। উনি এই ছায়াটুকুতেই বসুন।" তারপরে সেইখানে একখানা কম্বল পুরু করিয়া পাতিয়া মাতুলানীকে বসাইয়া দিয়া বলিল, "এখান থেকে প্রপাতটার মোটামুটি চেহারা বেশ বোঝা যাচ্ছে। যেন নাচেটা দেখবার জন্য ধারের দিকে বেশী ঝুঁকোনো—দেখছো তো, পাহাড়টা একেবারে খাড়া। মতির মা আর-একটা লোক রইলো তোমার কাছে, আমি কিশোরকে থামিয়ে আনি।"

তারপরে কিশোরের অনুসরণ করিয়া সেই অসমতল পর্ব্বত গাত্রে বিনয়কে প্রায় ছুটিয়াই চলিতে হইল। দুইটা গাইডকে অগ্রে ও পার্শ্বে লইয়া কিশোর হরিণের মত ক্ষিপ্র গতিতে মহা বেগবান মূল ধারার এত নিকটে উপস্থিত

হইল যেখানে একটা পাথরের উপরে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে প্রায় স্পর্শই করিতে পারা যায়। সেখানে একটা সুকৃষ্ণ প্রস্তর শত শত ফুট নিম্ন হইতে প্রাচীরের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া সেই পতনশীল প্রচণ্ড জল-ধারাকে নিজের তমোময় গভীর গহ্বরে প্রথমটা সংগুপ্ত করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু সে জলরাশিকে সেখানে লুকাইবার সাধ্য কি! সেই কূপ হইতে মহাবেগে তাহারা বাহির হইয়া বিস্তৃত ধারায় আবার শত শত ফুট নিম্নে একেবারে পুরুলিয়ার সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইতেছিল। কিশোর সেই কৃষ্ণ প্রাচীরের সন্নিকটস্থ ঈষৎ উচ্চ অপর একটা প্রস্তর-শীর্ষে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া প্রপাতটাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় তাহার জল-কণায় সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া ফেলিতেছিল দেখিয়া বিনয় তাহার হাত ধরিয়া সেখান হইতে টানিয়া তিরস্কার করিল, "কি কর্‌ছ কিশোর—পায়ের তলায় পাথরটা পড়ছে তা কি বুঝ্‌তে পার্‌চো না! অমন জায়গায় কি যায়!"

কিশোর মহা-উৎসাহে উত্তর করিল, "পড়ে তো যেতুম না, লোকটার হাত ধরে ছিলুম যে এক হাতে। চলুন না, আমরা জলটা পার হ'য়ে ওপাশের ঐ পাহাড়ে যাই! এই লোকটা আমায় পার্ ক'রে নিয়ে যেতে পারবে, বল্‌লে। ঐ ধারে একটু স'রে সেই জায়গা দেখে এলেন না—যেখান থেকে এক লাফ্ দিয়ে জলটার ওপারে যাওয়া যায়? চলুন না!"

"ও পাহাড়ে গিয়ে কি হবে,—দেখ্‌চ না, ওটা আরও উঁচু! মিছিমিছ শ্রান্ত হয়ো না। চল, এইবার ওদিকে ফিরে গিয়ে নীচে নেমে ফল্‌সের আসল রূপটা দেখে আসি। এই নামা আর ওঠায় বড় কম কষ্ট হবে না! একবার জলটা পার হ'তে চাও হ'য়ে নাও—তার পরে ফির্‌তে হবে।"

অগত্যা কিশোরকে তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। সেখান হইতে ফিরিয়া রাজেশ্বরীর নিকটে কিছু অনুযোগ এবং খাবার খাইয়া লইয়া তাহারা আবার নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিল।

কতকদূর নামিয়া কিশোর বলিল, "দেখ্‌ছেন—কতকগুলো লোক নীচে নেমেছে। খুব নীচে একদল এইদিকে আবার উঠেও আস্‌ছে—বোধ হচ্চে না?"

বিনয়ও এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেইদিকেই চাহিতে চাহিতে নামিতেছিল। আরও খানিকটা অবতরণ করিয়া সহসা বিনয় বলিয়া উঠিল, "ওর মধ্যে ছোট ছেলে কি মেয়ে আছে, একটি তোমার মত—দেখ্‌ছ? একটি মেয়ে ঐ যে—সকলের আগে ছুটে ছুটে উঠ্‌ছে—ও কে, চিন্‌তে পারছ কি?

কিশোর সচকিতে চাহিয়া বলিল, "কৈ—কে ও?"

বিনয় মৃদুস্বরে বলিল, "ঝরণা!"

তাহারা আরও খানিক পথ অতিবাহন করিলে বিনয় দেখিল, কিশোর সেই আরোহণ ও অবরোহণের জন্য নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথটুকু ছাড়িয়া বিপথে যাইতেই যেন চেষ্টা করিতেছে। সে ডাকিল, "অমন এলোমেলো ভাবে চলো না—এমন জায়গায় গিয়ে পড়্‌বে যেখান থেকে আর নামা চল্‌বে না। গাইড্‌টার পথ ধ'রে চল।"

সহসা কিশোর ঘাড় ফিরাইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া বলিল, "নীচে যাব না, ওপরে ফিরে চলুন।"

অত্যুগ্র বিস্ময়ে বিনয় বলিল, "সে কি! আর ত এসে পড়েছি। আর কষ্ট কিসের! এইটুকু নেমে চল—"

"না—" বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কিশোর দৃঢ় পদে সত্যসত্যই আবার উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া বিনয় ও গাইড্ অত্যুগ্র বিস্ময়ে সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঝরণাই বটে! সেই হাস্য-কুশলা স্বচ্ছন্দগতিশালিনী লীলাময়ী বালিকা আসিয়া দুই হাতে একেবারে বিনয়ের দুই হাত ধরিয়া ফেলিল। নির্ঝরের মতই স্নিগ্ধ তরল স্বরে বলিল, "আপনি!" আপনার ছেলে কই? একা এসেছেন না কি? বাঃ!"

বিনয়ের তখনো বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। নিঃশব্দ সঙ্কেতে কেবল ঊর্দ্ধগতিশীল কিশোরের দিকে চাহিল মাত্র।

"ও কি! এতখানি নেমে এসে আবার পালাচ্ছে

না কি! বারে ছেলে, আচ্ছা বোকা ত! দাঁড়ান, আমি ধরি।"

বালিকা হরিণীর মত চঞ্চল গতিতে ঊর্দ্ধপানে ছুটিল, নিম্নে হইতে তাহার অভিভাবকের দল হাঁকিল, "ঝরণা আস্তে, এইবার মার খাবি।"

সে কথা ঝরণা কেয়ারও করে না দেখিয়া কর্ত্তব্য-বোধে বিনয়ও তখন তাহার পশ্চাতে এইবার ঊর্দ্ধগতি ধরিল। বালিকাকে পুনঃ পুনঃ থামিতে অনুরোধ করিতে করিতে অন্ততঃ একটু আস্তে চলিবার জন্য মিনতি জানাইতে জানাইতে বিনয় পর্ব্বতের তলদেশে পৌঁছিবার ইচ্ছা এতক্ষণে একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়া উপরে ফিরিয়া চলিল, তাহার পথ-প্রদর্শকও ফিরিল। ঝরণার সঙ্গীরা বালিকাকে সহজেই এতক্ষণ দলের সঙ্গে হাঁটাইতে পারে নাই, এখনো তাহার বিষয়ে নবাগত ব্যক্তিরা খবরদারি লইল দেখিয়া তাঁহারা বোধ হয় কতকটা নিশ্চিন্তভাবেই যেমন ধীর গতিতে ঊর্দ্ধপথে উঠিতেছিলেন তেমনিই উঠিতে লাগিলেন।

"ওগো কিশোর বাবু মশায়, দাঁড়ান গো, আমার চেয়ে আপনি যে বেশী এগুতে পার্‌বেন, তা মনেও কর্‌বেন না। এই আমি আপনাকে ধর্‌লুম ব'লে।"

ঝর্‌ণার এই ডাক-হাঁকে ঈষৎ যেন লজ্জিত হইয়াই কিশোর গতির বেগ কমাইয়া দিল! বালিকার কলহাস্য বনদেবীর সঙ্গীতের মত পর্ব্বতের গাত্রে যেন বাজিতে লাগিল। "ফিরলেন কেন? আর পেরে উঠলেন না বুঝি! কিন্তু যেমন নামছিলে অমনি সেই মুখেই উল্টো পথে চল্‌তে তার চেয়েও বুঝি কষ্ট হচ্চে না? আচ্ছা, বুদ্ধিমান ছেলে তো!"

আরক্তিম মুখে চলিতে চলিতে কিশোর বলিল, "ভারি ত, এতে আর কষ্ট কিসের! ইচ্ছে হ'ল না দেখলুম না।"

"তবে এতক্ষণ ধরে নাম্‌লে কেন গো এতখানি পর্য্যন্ত? আচ্ছা মানুষ!"

কিশোর আর উত্তর দিল না, তখন বালক-বালিকা দুটি প্রায় পাশাপাশিই চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ঝর্‌ণা যেন দুঃখিতভাবে বলিল, "আহা, কেন এটুকু নেমে গেলে না ভাই? নীচে থেকে সব-চেয়ে সুন্দর লাগছে দেখতে! কত উঁচু থেকে কতটা চওড়া হয়ে জল কি শব্দ ক'রেই পড়ছে; চারদিকে যেন ধোঁয়ার রাশ্‌! কি ঠাণ্ডা জলো হাওয়া ওখানে! আর কেমন জল ঘুরে ঘুরে তোড়ে নদী হয়ে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে যাচ্ছে।"

"আর ওপরেই বুঝি কম সুন্দর? সব্বার ওপর থেকে প্রথমে যে থাক্‌-টায় জল পড়ছে সেটায় নয়, তার পরের থাক্‌-টার যেখানটায় সব চেয়ে মোটা ধারায় বেশী জল নীচে প'ড়ে ছোট্ট একটি পুকুরের মত হয়েছে সেইখানে পৌঁছুবার আগে পাহাড়ের ফাঁকের মধ্যে প'ড়ে তোড়ের চোটে চাকার মত ঘুরে তুলো ধোনার মত হ'য়ে যাচ্ছে, সেখানটা?"

বালিকা অবজ্ঞার হাস্যে বলিল, "ওঃ কি যে বল! নীচে গিয়ে দেখগে এখনো। আমরা তো এখন ওপরে গিয়ে সেই সব ছোট ধারায় নাইব খাব জিরুবো তারপর বাড়ী যাব, ততক্ষণ তোমাদের কোন্‌কাল দেখা হবে যাবে।"

কিশোর দ্বিধায় পড়িয়া একবার দাঁড়াইল। কিন্তু কাহারো অনুরোধে বা ইচ্ছায় কার্য্য করা তাহার স্বভাব নয়, তাই তখনি আবার চলিতে চলিতে বলিল, "নাঃ— ওপরেই যাব।"

"বেশ—নিজেই ঠক্‌লে, তাতে কার কি!" বালিকা ঠোঁঠ দুটি একটু ফুলাইয়া একটু নীরবে চলিল, তারপর আবার কলকণ্ঠে স-উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চয্যি ভাই! এত বড় পাহাড়টা,—অথচ ওদিক থেকে কিচ্ছু কি বুঝতে পারা গিয়েছিল! বরং ক্রমশঃ যেন নীচেই নেমে এসেছিলুম! নীচ থেকে হবে না বোঝা যায় ঠিক যে কত উঁচু থেকে জলটা পড়ছে।"

কিশোর বিজ্ঞভাবে বলিল, "রাঁচিটা কত উঁচু আমাদের দেশ থেকে, জানো? সেই জন্যেই না—"

তাহাকে অর্দ্ধপথে বাধা দিয়া বালিকা বলিল, "তা আবার কে না জানে! তোমরা তো ভারি কত দিনই বা এসেছ! আমরা আজ চার পাঁচ মাস এখানে আছি।

মা আর বাবার সঙ্গে আর একবার এখানে আমি এসেছিলাম, তা জান? তাই আমার এ-সব এত জানা হয়ে গেছে। এবারে মামার বন্ধুরা এসেছেন, তাই মামার সঙ্গে আমিও এসেছি।"

কিশোর অন্য মনে বলিল, "তোমাদের সেদিন চড়িভাতি হয়েছিল?"

"হবে না আবার? খুব ধুমধাম ক'রে হয়েছিল? তোমরা কেন সেদিন গেলে না? আমি আর মামা কত খুঁজেছি। কেন গেলে না?"

কিশোর মাত্র একটু হাসিল। উত্তর দিল না।

ঝরণা আপনিই বলিল, "তোমার বাবা যেতে দেন নি না? তাঁকে যে আমি কত ক'রে নেমন্তন্ন করলাম তবুও তিনি গেলেন না, বেশ লোক তো তিনি। দাঁড়াও, বলছি তাঁকে!" তারপরে চারিদিকে চাহিয়া তখনি প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিয়া বালিকা বলিল, "কেবল তোমরাই দুজনে এসেছ? তোমার মা আসেন নি?"

"এসেছেন।"

"কই তিনি? ওপরে বসে আছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের দেশ কোথায় ভাই? সেদিন তোমরা শামলং গেলে না দেখে আমি মোরাবাদি বেড়াতে আসতে চাইলাম—তা মামা বল্লেন,—তারা কারা? কাদের সঙ্গে তোর ভাব হয়েছে? সে ছেলেটির বাবার নাম কি—কোন্ বাড়ীতে তাঁরা থাকেন, সে সব জেনেছিস্. না, শুধু কিশোর ব'লে আমাদের ঝরণার মতই বুদ্ধিমান ছেলেটি কোন্ বাড়ীতে আছে গো ব'লে বাড়ী বাড়ী খুঁজে বেড়াতে হবে?—এই সব বলে খুব হাস্‌ছিলেন! তোমরা কোন্ বাড়ীতে থাক আর তোমার বাবার নাম কি, বল ত ভাই। শীগ্‌গিরই আমরা আবার একদিন মোরাবাদি পাহাড়ে বেড়াতে যাব। কি ভাই তোমার বাবার নাম?"

কিশোরের উত্তরের প্রতীক্ষায় ক্ষণেক থাকিয়া বালিকা আবার ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "বলবে না বুঝি? আচ্ছা গুমুরে ছেলে ত! আচ্ছা ওঁকেই জিজ্ঞাসা করছি, দাঁড়াও। আমার বাবার নাম আগে শুনবে, তবে বলবে বুঝি? আমার বাবার নাম মোহিনীমোহন মজুমদার। মামার নাম বলব? কিন্তু আগে তুমি বল এইবার—।"

কিশোর তাহার পাংশুবর্ণ মুখ নামাইয়া জড়িত স্বরে বলিল, "নাম নন্দকিশোর রায়—"

"কার? তোমার বাবার? আর তোমাদের বাড়ীর ঠিকানা?"

কিশোর তাহাদের বর্ত্তমান ঠিকানা এবং দেশের নাম-ধাম সমস্তই ধীরে ধীরে ঝরণাকে বলিতে বলিতে চলিল। ক্রমে তাহারা পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলে ঝরণা নিম্নস্থ তাহার সঙ্গীদের একবার হাতছানি দিয়া কিল্ দেখাইয়া আদরের সহিত আহ্বান করিতে করিতে দেখিল, বিনয় তাহার মামার সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে।

বালিকা প্রফুল্ল মুখে দূর বন-রেখারনিবদ্ধ দৃষ্টি কিশোরকে বলিল, "চল, এইবার তোমার মার কাছে যাই।" বালিকা অগ্রসর হইল; কিশোরের পা যেন ক্রমশঃ অচল হইয়া যাইতেছিল।

"ঐ যে যিনি বসে আছেন, তোমায় ডাকছেন, উনি কে ভাই?",

কিশোর নির্ব্বাক।

"কে উনি তোমার? তোমার বাবার কে হন উনি?"

"মামী-মা।"

"বাবার মামি-মা? তুমি ওঁকে কি বলে ডাক?"

"মা।"

"মা?" অত্যুগ্র বিস্ময়ে বালিকা বলিল, "কেন? তোমার মা কই? উনি তো বিধবা মানুষ—সাদা কাপড় যে! তুমি যাঁর পেটে হয়েছ, তিনি কই?"

"তিনি নেই।"

"নেই?" বালিকার মুখ ক্রমে যেন সাদা হইয়া উঠিল, "মা নেই ভাই তোমার? মরে গেছেন কি?"

কিশোর দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ!"

দুই হাতে তাহার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া ঝরণা করুণভাবে কিশোরের পানে একটু

চাহিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ভাই। বালিকা হইলেও ঝরণা বুঝিতে পারিল, তাহার হাতের মধ্যে কিশোরের হাতখানি যেন ক্রমে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া উঠিতেছে।

"তোমার হয়ত ক্ষিদে পেয়েছে, না! হয়ত শীত লেগেছে। চল, ওঁর কাছে যাই, উনি ডাকছেন আমাদের।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হঠাৎ দেখিয়া আবার রাত্রেই রাজেশ্বরী নিজের শরীরের অবস্থার ব্যতিক্রম অনুভব করিলেন। সকালে বিনয়কে ডাকাইলে সে আসিয়া তাঁহার হাত দেখিয়া বলিল, "এ যে স্পষ্ট জ্বর হয়েছে মামি-মা—আর তাও নিতান্ত কম বোধ হচ্চে না!" মামীর শরীরে তাপমান যন্ত্র লাগাইয়া চিন্তিত মুখে বিনয় বলিল, "ঝরণার জলে আপনার স্নান করাটা খুবই অন্যায় হয়েছে।"

"চুপ কর তো বাছা। তোমরা স্নান করলে, কিশোর করলে, আর আমার এমনি সোনার শরীর যে ভাবেই গ'লে যাবে! তা যদি হয় তো এমন শরীরের একেবারে গলে যাওয়াই উচিত।"

"ওঁদের দলের সবাই স্নান করছে দেখে আমারও ইচ্ছা গেল বটে, তবে আপনাকে আর কিশোরকে স্নান করতে দিতে তত আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নির্ঝরিণী মেয়েটির দায়ে বাধ্য হয়ে মত দিতেই হল যে।"

রাজেশ্বরী চোখ বুজিয়া বলিলেন, "কি সুন্দর মেয়েটি! ঝরণা তো ঝরণাই বটে। তার কথা যে আমিই ঠেলতে পারলাম না। যাক্, আমার একটু জ্বর হয়েছে, সে আর এমন কি! দু-দিনেই সেরে যাবে। কিশোরকে এই বেলা কুইনিন্ টুইনিন্ যা দেবে, দিয়ে রাখো।"

কিন্তু রাজেশ্বরী দেবীর নিজের জ্বর সম্বন্ধে অগ্রাহ্য ভাবের মতটা বিফল করিয়া বৈকালে তাঁহার জ্বর এতখানি বাড়িয়া গেল যে বিনয়কে তখনি ডাক্তার আনাইতে হইল। সুস্থ শরীরে সকলেই সেই শীতল সলিলে স্নানটা সহ্য করিয়া লইল; কেবল রাজেশ্বরীই পারিলেন না। বুকের কষ্টটাও আবার অনুভব করিতে লাগিলেন এবং ডাক্তারের কাছে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে একটা অতি সামান্য সূক্ষ্ম জলধারার নীচে মাথা পাতিলেও তাহার পতন বেগে মাথায় ও বুকের মধ্যে সহসা বজ্রপাতের মতই একটা ধাক্কা পাইয়া ছিলেন এবং সেই হইতেই বুকটা আবার ধড়ফড় করিতে সুরু হইয়াছে। যদিও তাহার কোন ভয় নাই বলিল, তথাপি এই ঘটনায় মামীর এই দুই তিন মাস কালের উপকার যে আবার পিছাইয়া গেল ইহা বুঝিয়া বিনয় অত্যন্ত অনুতাপিত হইল। একদিন পরেই ঝরণা আসিয়া হাজির হইল। তাহার মামার বন্ধুরা সেদিন মোরাবাদ দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের পথে দাঁড় করাইয়া ঝরণা কিশোরের সন্ধানে পাড়ার মধ্যে আসিয়া রাজেশ্বরীকে শয্যাগত দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার জ্বরটা তখন একটু বেশীই হইয়াছে। বিনয় ও কিশোর তখন রাজেশ্বরীর উভয় পার্শ্বে বসিয়াছিল। বালিকার ম্লান মুখ দেখিয়া রাজেশ্বরী কিশোরকে কাপড় জামা পরিয়া লইতে আদেশ দিলেন। কিশোর তবু সম্মত হয় না, শেষে বিনয় ও রাজেশ্বরীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা প্রস্তুত হইতে গেলে রাজেশ্বরী ঝরণাকে কাছে ডাকিয়া মাথায় গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আমার জ্বরটা বন্ধ হলেই তোমার মার আর মামীর সঙ্গে আলাপ করতে যাব ঝরণা।"

ঝরণা ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "আর তো আমরা বেশী দিন থাকব না, বাবা শীগ্‌গিরই আমাদের নিতে আসবেন। তার মধ্যে ভাল হন তবে ত।"

"তা নিশ্চয়ই হব। নিতান্ত না হই তোমার মাকে ব'লো তাঁরা যদি দয়া করে একবার আসেন। মামী ত থাকবেনই, তার সঙ্গে যতদিনে হোক্ দেখা হবে, তোমরা যে চ'লে যাবে সেই ভাবনা হচ্ছে।"

"আচ্ছা, বলব!" সজ্জিত কিশোর ও ঝরণাকে বিনয় তাহাদের অভিভাবকদের নিকটে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। একটা হুঁসিয়ার চাকরকেও কিশোরের তত্ত্বাবধানের জন্য পাঠাইয়া দিল।

সন্ধ্যার পর কিশোর মাতার নিকটে বসিয়া ঝরণার গল্প অত্যন্ত উৎসাহের সহিত করিতে লাগিল। তাহারা দুইজনে কেমন হাত ধরাধরি করিয়া সকলের আগে পাহাড়ের উপরে উঠিয়াছে, কত বেড়াইয়াছে, ঠাকুর

মহাশয়দের ব্রহ্ম মন্দিরে এবং বাড়ীতেও অবাধে তাহারা বেড়াইতে পাইয়াছে। ঝরণা কেমন মহা অভিভাবিকার পদ লইয়া প্রতিপদে তাহার খবর্দ্দারি করিয়া ফিরিয়াছে হাসিতে হাসিতে সে সব কাহিনীও উৎস-ধারার ন্যায় কিশোর মাতার নিকটে বলিয়া যাইতে লাগিল, আর রাজেশ্বরী অত্যন্ত তৃপ্ত মনে সে সব শুনিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, কিশোর যেন এমনভাবে কখনো তাঁহার সঙ্গে এত গল্প করে নাই, কোন বিষয়ে স্বেচ্ছায় এত আলোচনা তাঁহার নিকটে করে নাই। ছেলে এতদিনে যেন ঠিক্ ছেলের পদ লইতেছে, ইহা অনুভব করিয়া অসুস্থতার মধ্যেও তিনি পরম সুখ বোধ করিতে লাগিলেন। নিকটে বসিয়া বিনয়ও হাস্যমুখে কিশোরের বর্ণনা শুনিতেছিল। তাহাকে অনুরোধ করিলেন কল্য বৈকালে বিনয় যেন তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া কিশোরকে লইয়া শামলংয়ে ঝরণাদের বাড়ী বেড়াইয়া আসে।

পরদিন কিন্তু কিশোরের সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়া বিনয় একটু খুসিই হইল; কেন না, রোজ শয্যায় রাজেশ্বরীকে ঘণ্টা কতকের মত একা রাখিয়া তাহারা দুইজনেই বাহির হইবে, এটা ইচ্ছা হইতেছিল না। বৈকালে মাতুলানী তাহাদের বেড়াইবার কথা বলিতেই সে এই আপত্তিই উত্থাপন করিবে। রাজেশ্বরী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তবে মাষ্টারকে নিয়ে কিশোর যাক্ না হয়।" বিনয় ইহাতেও অসম্মতি জানাইবার পূর্ব্বেই বিস্মিত হইয়া দেখিল, কিশোর একেবারে যেন লাফাইয়া উঠিয়া তখনি "মাষ্টার মশায়, মাষ্টার মশায়" বলিতে বলিতে বাহিরে ছুটিয়া গেল, এবং কিছু পরেই সজ্জিত বেশে মাষ্টারের সঙ্গেই ট্যাক্সিতে বাহির হইয়া গেল।

রাজেশ্বরী সস্নেহ হাস্যে বলিলেন, "ছুটিতে বড্ড ভাব হয়েছে কিনা।"

তাহা বিনয়ও বুঝিতে পারিতেছিল; কিন্তু তবুও যেন কোথায় আবার একটা আঘাত বাজিতেছিল অনেকদিন—রাঁচি আসিয়া পর্য্যন্ত এ ব্যথার অনুভব যেন একদিনও জাগে নাই, তাই নূতন করিয়া বেদনাটা একটু বেশীই বাজিল।

সেদিনও সন্ধ্যার পরে কিশোর, রাজেশ্বরীর নিকটে বসিয়া শামলংয়ের মাঠ হইতে ট্রেণ যাইতে দেখা, সুবর্ণ রেখার তীরে খেলা করা—ঝরণার কথা, তাহার বিদ্যা বুদ্ধি পরিমাণের গল্প, ঝরণা যে তাহার চেয়ে দুই বছরের ছোট হইয়াও বিদ্যায় তাহারই সমান একটু সলজ্জ ভাবে অথচ গর্ব্ব মিশাইয়া তাহাও কিশোর মাতার নিকটে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া ফেলিল। সব শুনিয়া রাজেশ্বরী স্নেহ-হাস্যে বলিলেন, "তাহলে ঝরণাকে বৌমা করে ফেলছি, দাঁড়াও, তবে তুমি জব্দ হয়ে পড়ায় মন দেবে।"

"যাঃও—বলিয়া কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইয়া তখনি আবার বসিয়া পড়িয়া বলিল, "জান মা ঝরণার দাদাদের চেয়েও যে বড় দিদি আছে সে একেবারে এণ্ট্রেন্স পড়ে। এণ্ট্রেন্স পাশ হলে সে একত্র পড়বে তার পরে বি-এ—"

"সে কি রে! তবে কি ওরা ব্রাহ্ম নাকি? ডাক্‌তো বিনয়কে, ভাল করে সব জিজ্ঞাসা করি। মেয়েদের দেখ্‌লে ঠিক বুঝতে পারতাম, আমার যে এ-ছাই জ্বর কবে ছাড়বে, তা জানি না।"

তাঁহার এই অকারণ অধীরতার অর্থ বিনয়ও বুঝিতে পারিল না কিন্তু জ্বরটা তারপর দুই একদিনের মধ্যেই অবশ্য ছাড়িয়া গেল। তবুও বিনয়কে রাজেশ্বরী সাহস করিয়া শীঘ্র বেনাইতে যাইবার কথা বলিতে পারিলেন না, শরীরও ততখানি সবল বোধ হইতেছিল না। ইতিমধ্যে ঝরণার মা এবং মামীই সদলবলে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

মহা উৎসাহে আদর আপ্যায়ন চলিতে লাগিল। রাজেশ্বরী দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে ব্রাহ্ম বিষয়ে তাঁহার যে ধারণা ছিল ইহাদের সহিত তাহার কিছুই মেলে না। তবু মনে করিলেন, আলাপ-পরিচয়ে ক্রমে সঠিক খবর পাইবেন। অভদ্রের মত মুখ ফুটিয়া তো একটা জিজ্ঞাসা করা চলে না।

ঝরণা মনের স্ফূর্ত্তিতে কিশোরের হাত ধরিয়া তাহার অন্যান্য ভ্রাতাভগ্নীদের নিজের গর্ব্ব দেখাইতেই যেন এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল, আর সে বেচারাও

তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া, এই নিছক পরের বাড়ীতে ভগ্নীটির আধিপত্য-দর্শনে মুগ্ধ হইতে লাগিল। কিশোরের এ্যাল্‌বমখানা টানিয়া লইয়া তাহার সংগৃহীত নানাস্থানের সুন্দর সুন্দর চিত্র সকল দেখাইতে দেখাইতে ঝরণা বলিতে-ছিল, "জানিস্ কে, কিশোর খুব ছোটবেলাতেই দার্জ্জিলিং গিয়েছিল। এই ছবি-কটি সেইখানেরই! এ-সব জায়গা ওর ঠিক্ মনে না পড়লেও ও নিশ্চয় এ-সব জায়গাতেই গিয়েছে, বুঝছিস্?" সকলকেই এ যুক্তি মানিয়া লইতে হইল। তখন কিশোরের উপরেই ঝরণার প্রশ্নবর্ষণ সুরু হইল, "আচ্ছা ভাই, তুমি আর তোমার বাবা মাত্র দুজনে সেখানে গিয়ে ছিলে? তোমার এই মাও কেন যাননি? অতটুকু ছোট তুমি একা বাবার কাছে থাকতে পারতে?" ইতিমধ্যে তাহার এক বড় দাদা প্রশ্ন করিল, "কিশোরের অন্য মা তবে কে?" তাহাকে চোখ টিপিয়া থামাইয়া সহানুভূতিতে মুখ করুণ করিয়া স্নেহ-ভরা সুরে ঝরণা বলিল, "আহা ভাই, তখন তুমি কত রোগা ছিলে, উঃ! এই তো তোমার আর তোমার বাবার চেহারা?" তারপরে হঠাৎ যেন কি মনে পড়ায় ব্যস্তভাবে ঝরণা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, ওঁর নাম তো নন্দকিশোর বাবু আর তোমার নাম ব্রজকিশোর, না? আর মামা বল্‌ছিলেন ওঁর নাম বিনয় বাবু। ওঁর কি ভাই দুটো নাম?" ইতিমধ্যে রাজেশ্বরী কোন পরিচারিকাকে "বিনয়কে এই কথা ব'লে আয়" এইরূপ কি একটা বলিতেছিলেন—শুনিতে পাইয়া হরিণীর মত সেইদিকে কাণ খাড়া করিয়া বালিকা বলিল, "ঐ তো উনিও তাই বল্‌ছেন। ওঁর বুঝি ডাক্ নাম ওটা—না ভাই? এই যেমন আমার নাম নির্ঝরিণী,—কিন্তু সবাই বলে, ঝরণা! দাদার নাম অজিত সবাই ডাকে জিতু, খোকার নাম মোহিত সবাই ডাকে বুলু।" আপন মনেই বকিয়া ঝরণা পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া চলিল, শিশু-বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিল না যে কিশোর তাহার প্রশ্নে ক্রমে যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

দলের একজন প্রস্তাব করিল, "চল, আমরা বাইরে একটু ছুটোছুটি খেলিগে।" কিশোর সাগ্রহে এ প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া ঝরণার হাত ধরিয়া টানিল। "যাই যাই, আচ্ছা ইনি কে ভাই? বইটার সব্বার ভাল পাতায় খুব ভাল লোকের মত চেহারা, এটা কার?"

"বাইরে যাবে ত এস" বলিয়া কিশোর তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে দলও তাহার অনুসরণ করিতেছে দেখিয়া অগত্যা ঝরণা এই ছবি দেখা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইল।

সেদিনকার আনন্দ-সম্মিলনের শেষে সকলে যখন বিদায় লইতেছেন, রাজেশ্বরী ঝরণাকে কোলের কাছে লইয়া আদর করিতেছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার শয্যার নিকটে একখানা ফটো টাঙ্গানো দেখিয়া ঝরণা সহসা কিশোরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "এইটা, এই ছবিটিই তোমার এ্যাল্‌বামের ভাল পাতাটায় আছে, না?" তারপর রাজেশ্বরীকেই একেবারে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "ইনি কে, বলুন না?" রাজেশ্বরী বালিকার এই অনুসন্ধিৎসু স্বভাবে হাসিয়া কিশোরের মুখপানে চাহিলেন। ভাবটা, কিশোরই ইহার উত্তর দিবে, কিন্তু কিশোর তো তাহা দিতে পারিল না। নির্ব্বাকভাবে ভূমির পানে চাহিয়া বসিয়াই রহিল। ঝরণা তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাজেশ্বরীকে বলিল, "ও গুমুরে ছেলে কিছুতে যদি সেই থেকে বলবে! বলুন না কার ছবি?"

এইবার রাজেশ্বরী দেবীরও মুখ ঈষৎ যেন গম্ভীর হইয়া উঠিল। গম্ভীর মুখে তিনি কিশোরের পানে কয়েকবার চাহিতেছেন দেখিয়া ঝরণার মামী এ সমস্যার সমাধান করিলেন, "কর্ত্তারই ফটো বোধ হয়, না দিদি?" তারপরে সকলকেই যেন শুনাইয়া বলিলেন, "কিশোরের বাপের ছবি ওটা।"

"বাপের ছবি? না ত! ঐতো বাইরেই তিনি রয়েছেন, ওঁর ছবি কেন হবে? তুমি তো ভারী জানো!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, যা, তোরা খেল্‌তে যা, এইটুকু মেয়ে অথচ যেন পাকা বুড়ি। সব খোঁজ চাই ওর।" মায়ের নিকট হইতে ধমক্ খাইয়াও ঝরণার কৌতূহলের নিবৃত্তি হইল না। আবার ও-প্রশ্ন করিতে গিয়ে বেশী-রকম তাড়া খাইয়া অগত্যা তাহাকে সেখান হইতে উঠিয়া পড়িতে হইল। দূরে সরিয়া গিয়া ইঙ্গিতে কিশোরকে সে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিল, কিশোর কিন্তু নড়িল না;

নির্ণ শ্বেত প্রস্তর-পুত্তলির মত সেইখানেই স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। ঝরণার মা ও মামার কথাবার্ত্তায় কিশোর তখন বুঝিল, ইহাঁরা রাজেশ্বরীর নিকট হইতে সকল সংবাদই সংগ্রহ করিয়াছেন।

যখন সকলে বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিতেছেন তখন খোঁজ পড়িল, ঝরণা কই? ডাকাডাকিতে বিনয়ের ঘর হইতে সে বাহির হইয়া আসিয়া যখন গাড়ীতে উঠিতেছে তখন কিশোর তাহার পড়িবার ঘরের জানালার অন্তরাল হইতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, সে মুখ যেন বিস্ময়ে হতবাক্! যেন কেমন বিবর্ণ ঔজ্জ্বল্য-হীন! সে বুঝিল, এইবার ঝরণাও তাহার ইতিহাস সমস্ত শুনিয়াছে! যাইবার সময়ও যে ঝরণা তাহাকে একবার খুঁজিল না, ইহাতে কিশোরের মনে হইল যে পিতা-মাতার স্নেহ-পালিতা সে, তাহার এ ব্যাপারে ঘৃণা আসাই ত স্বাভাবিক। সকলের বিদায়ের পর রাজেশ্বরীও ক্লান্তভাবে শয্যায় শুইয়া রহিলেন, কাহাকেও তখনি নিকটে আহ্বান করিতে তাঁহার ভাল লাগিল না। বিনয়ও নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল না, আর কিশোরও নিঃশব্দে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে অর্থহীনভাবে পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাষ্টারের আহ্বানে শেষে বই লইয়া বসিল।

(ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী।

নারীর কথা

কিছুদিন আগে নারী-কর্ম্ম-মন্দির হতে কয়েকটী মহিলা এসে কংগ্রেসের মেম্বর হবার অনুরোধ করায় আমি তাঁদের সে অনুরোধ রাখ্‌তে পারিনি। আমাদের মতন অন্ধকারের জীব চেতনা-হীন-ভাবে জীবন কাটিয়ে কোন দায়িত্ব না বুঝে শুধু চার আনা পয়সার জোরে মেম্বর হবে, আর ভোটের অধিকারের গর্ব্বে ফুলে উঠ্‌বে, এহেন সোখীন সম্মানের চেয়ে অসম্মান শত গুণে ভালো। কারণ দায়িত্ব না বুঝে যে অধিকার-লাভ, তাতে করে সত্যকেই একান্ত ভাবে চাপা দেওয়া হয়। সমাজের ভূমিতলে যাদের চলনকে চিরকালের জন্য ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে, পাডুটীকে আচ্ছা করে বেঁধে দিয়ে, হঠাৎ একদিন রাষ্ট্রীয় আকাশে তাদের ডানা মেল্‌তে বলার মানে তাদের নিয়ে নতুন একটা সং সাজানো! বর্ত্তমান কংগ্রেসের মূল কর্ম্মপ্রণালী হচ্চে অসহযোগ-মন্ত্র বা বর্জ্জন নীতিরই প্রচার। তাতে আমার প্রাণ একেবারেই সাড়া দেয় না। তার কারণ এই বর্জ্জন-নীতিরই শতাব্দী-ব্যাপী কঠোর চাপে ভারতের সকল প্রদেশের নাহলেও, বাংলাদেশের নারীর প্রাণ এতই মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে যে সে আজ বেদনা-বোধেরও বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্ত্তাজাতির এতকালকার অবজ্ঞা-ভরা অসহযোগের ফলে এদেশের মাতৃজাতির মন দুর্ব্বলতা নিশ্চেষ্টতা ও সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে হয়ে তার মনন-শক্তিকে যে ধ্বংসেরি পথে অগ্রসর করে দিচ্ছে দিন দিন, তা আজ আর কারো অস্বীকার করবার জো নেই।

অর্দ্ধেক মানুষকে বাদ দিয়ে বাকী অর্দ্ধেক শত-চেষ্টা করেও যে জাতির জীবন-গঠনে সকলকাম হতে পারছেন না, তার কারণ সেই অর্দ্ধেকের রক্তের ভিতর মাতার মনের অজ্ঞতা অক্ষমতা ও সংকীর্ণতারই প্রতিক্রিয়া চল্‌ছে বলে একদিকে সে যতটা এগিয়ে পড়ে আর-একদিকে তাকে ততটাই পিছিয়ে পড়্‌তে হয়, নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও। আজ যে বাঙালীর ভাব-প্রবণতা সাধনাহীন নিশ্চেষ্টতায় আর তার অর্দ্ধেক জীবনের বিদ্যার্জ্জন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বক্তৃতারি তর্জ্জনে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, এ অভিযোগ তো অনেকেরি মুখে শুনে আস্‌চি। শিক্ষিত মহোদয়দের অনেকেই এই সাধনা-হীন প্রগল্‌ভ মনের ভাবকে কার্য্যে ফলিয়ে তোলার চেষ্টা করেও যে সকলকাম হতে পারছেন না, তার কারণ বাঙালীর পোষাকী শিক্ষার সঙ্গে আটপৌরে জীবন-যাত্রার আর তার অন্তঃপুরের অবরোধের সঙ্গে বাইরের বৈঠকখানার একেবারেই অমিল। ঘরের অর্দ্ধেক জীবন যেখানে ষোড়শ

শতাব্দীর অসূর্য্যম্পশ্য আবরণ-তলে নিশ্চেষ্ট নীরব, সেখানে বাইরেকার বাকী অর্দ্ধেক যদি বিংশ শতাব্দীর আলোকোজ্জ্বল আকাশ-পানে ডানা মেলে ক্রমাগতই উধাও উড়তে চায় তাহলে তার সেই অসঙ্গত চেষ্টার যা কিছু প্রয়াস তা কেবল পাখা-ঝট্পটানিতেই শেষ হবে। যে কালে বাংলার অন্তঃপুরের সঙ্গে বহিরঙ্গনের মিল ছিল, তখনকার বাঙালী সমাজ কালোপযোগী ধর্ম্মকর্ম্ম শিল্পকলায় কতকটা ঐশ্বর্য্য-শালীই ছিল। তখনকার দিনের সাদা-সিধে বাঙালী জীবনের প্রধান আদর্শ ছিল সামাজিকতা। এই সামাজিকতা বাঙালী গৃহের পূজা-পার্ব্বণ ক্রিয়া-কর্ম্মকে আশ্রয় কোরে বেশ সহজভাবেই যে ফুটে উঠ্‌তে পেরেছিল তার কারণ সে যুগের মেয়ে-পুরুষ দুজনারি সহজ মনের সহযোগের উপর ছিল তার ভিত্তি।

'সেকালের মহিলারা ছিলেন পাকা গৃহিণী'—এই কথা অনেকেরই কাছে শুনি। কিন্তু এই মন্তব্য যাঁরা মুখের কথায় ও কাগজের লেখায় অবাধে প্রকাশ করে আধুনিক কালের শিক্ষিতা নারীকে অপটু ও অক্ষম বলে ঘোষণা করতে ব্যস্ত, তাঁরা একটীবারও ভেবে দেখেন না যে সেকালের কর্ত্তা ব্যক্তিরাও পাকা গৃহস্থ ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। অর্থাৎ তাঁদের মন গৃহেরি যা কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার-অনুষ্ঠান তারি গণ্ডীতেই আবদ্ধ ছিল। আর সেই কারণেই সে কালের নারীরাও তাঁদেরি ষোল আনা সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী হবার সুযোগ পেয়ে পাকা গৃহিণী মাত্র হওয়াকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে ধরে নিতেন।

কিন্তু সেকালের কর্ত্তা আর একালের বাবুতে তফাৎ এতটা বেশী যে তা বালকের চোখেও ধরা পড়ে। তার পর সেকালের তাঁদের আর একালের এঁদের গৃহও যে একই বস্তু নয় তার প্রমাণ তো একালের বাড়ী তৈরীর পদ্ধতিতে চণ্ডীমণ্ডপকে স্রেফ্ বরখাস্ত করে গাড়া বারান্দার চলন, ফরাস তাকিয়ার পরিবর্ত্তে সাহেবী আপিসের কায়দায় টেবিল চেয়ার প্রভৃতিতে বৈঠকখানা সাজানো থেকে সুরু করে পানদানা ও আলবোলার জায়গায় চায়ের কাপ আর চুরুটের টিনের আমদানীতেই পাওয়া যায়। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই—খালি সীতাকেই সেই সীতাই থাকতে হবে, আর টিকি-ছাঁটা টেরিকাটা স...-কোটে ভূষিত-তনু নব্য রাম কর্ত্তৃক নগদ চার হাজার পণের সঙ্গে স্ত্রীরূপে নির্ব্বাচন—থেকে সুরু করে নিজ স্বার্থ বা পরের কথার খাতিরে বিনা-বিচারে ঘর থেকে নির্ব্বাসন-লীলার যা-কিছু পরাক্রম সবই মুখ বুজে অনুমোদন করেই চল্‌তে হবে, এই হলো যে দেশের ব্যবস্থা, সে দেশের নারীর প্রতি দেশের কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বানের মত উৎকট উপহাস আর কি হতে পারে!

তার পর বঙ্গনারীর শিক্ষার কথা। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই স্ত্রী-শিক্ষাকে মুখে মুখে স্বীকার কর্‌লেও বাস্তবিক পক্ষে কি সকলেই তাঁরা মেয়েদের নিজ প্রয়োজনের অনুরূপ স্বাধীন শিক্ষার অনুমোদন করেন? আজো এ দেশের স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী বেশীর ভাগ লোকেরই মত—ঘর গৃহস্থালীর দৈনিক খরচের হিসাব-পত্র রাখ্‌বার ক্ষমতা লাভ করা ও চলন-সই চিঠিপত্রখানা লিখতে পারাই মেয়েদের বিদ্যালাভের পক্ষে যথেষ্ট। এ দলের মতে অল্প বিদ্যা অপরের পক্ষে ভয়ঙ্করী হলেও অবরোধবাসিনীদের বেলায় তাই-ই হচ্ছে শুভঙ্করী। আর এক দলের অল্প সংখ্যক লোক আছেন, যাঁরা স্বয়ং নিজেরাও খুব সৌখীন শিক্ষিত বলেই সহধর্ম্মিণীদেরও কেতাব-পাঠের জোরে খনা, লীলাবতী খেতাব লাভটাকে বেশ পছন্দই করেন, কিন্তু নারীদের রাষ্ট্রীয় কি সামাজিক কোন একটা অধিকারের কথা তাঁদের কাছে তুল্‌তে গেলেই দেখা যায়, তাঁরা আগে থেকেই কান ঢেকে বসে আছেন। অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই দুই দলের লোকই নারীকে দেখতে চান শুধু আপন আপন রুচির ছাঁচে ঢালাই করা গৃহিণী-মূর্ত্তিতেই, বিচিত্র জীবনের যাত্রা-পথের সঙ্গিনারূপে নয়। তাই তো শত সভা-সমিতির পরও তথাকথিত স্ত্রী-শিক্ষা আজ পর্য্যন্ত হয়ে রয়েছে সমাজের আর পাঁচ রকমের বিলাস-কলায় ঐ...যুক্ত মাত্র, মেয়েদের নিজের জীবনকে পূর্ণতার পথে ...তৈরী নেবার বা তাদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করবার উপায় এবং অবলম্বন-স্বরূপ সে নয়।

অতএব কি শিক্ষার ক্ষেত্রে কি ধর্ম্মে-কর্ম্মে সর্ব্বত্রই

যখন দেখা যায়, এ দেশের নারী শুধু সমাজের হাজারো প্রয়োজন-সাধনের যন্ত্র মাত্র, দেশের চিন্তার উৎসের সঙ্গে তাব প্রাণের উৎসকে মিলিত হবার সুযোগ কোথাও দেওয়া হয় নেই, হচ্চেও না, সে অবস্থায় যদি আর একটা নতুন ফরমাসের চাপ দেশের কল্যাণ ও অর্থনীতির দোহাই দিয়ে তার ঘাড়ে তুলে দেবার ব্যগ্র আগ্রহের মুখে দেশ-সেবকেরা কোন সাড়াই তার তরফ থেকে না পান, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। তাই তাঁদে প্রতি আমাদের নিবেদন—ঘরের ভিতরে এতকাল ধ যে অসহযোগ চলে চলে জাতির চলবার গতিকে দোটানা মাঝখানে অনড় করে রেখেছে, তাকে আগে বিশেষ ক না ভেঙ্গে পরের সঙ্গে নতুন করে অসহযোগ করবার ম যত আগ্রহ-ভরেই জপতে থাকুন না—সিদ্ধি-লাভ তাতে হওয়াই সম্ভব।

শ্রীসোনামাখা দেবী।

চল্‌তি কথা

নারী-সমস্যা—কিছুদিন থেকে কয়েকটি মহিলা আমাদের দেশের নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেছেন। প্রায় প্রত্যেক মাসিকে, সাপ্তাহিকে, দৈনিকেই কোনো না কোনো নারীর এই বিষয়ে প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া যায়। এই সময় এই প্রসঙ্গ নিয়ে একটু আলোচনা করবার চেষ্টা বোধ হয় অবান্তর হবে না।

অনেকেই বলেন, এবং সেটা বোধহয় নিছক মিথ্যাও নয় যে, এই লেখিকাদের মধ্যে অধিকাংশের লেখাতেই যুক্তি এবং চিন্তাশীলতার বিশেষ অভাব দেখতে পাওয়া যায়। ব্যথা এমন একটা জিনিষ যা চিন্তাশীল ও চিন্তাহীন দুই ব্যক্তিকেই সমানভাবে কাতর করে, অবশ্য দু-জনের কাতরানিটা যে একই রকমের হবে তা ঠিক কোরে বলা যায় না; বিশেষ এই ব্যথা যখন দারুণ হয়ে ওঠে তখন যুক্তি অথবা চিন্তাশীলতার পরিচয় না দিয়ে শুধু চীৎকার করাই প্রাণীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই শুধু চীৎকারের পরিমাণ দিয়েই তাঁদের বেদনাটা অনুভব করাই সঙ্গত।

আমাদের দেশের নারীকে দেবী বলা হয়েছে। নারী সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যে অনেক সম্মানসূচক পদও আছে। 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' কথাটার এমন সার্থকতা আর কোথাও ক্ষেত্রে এমনভাবে ফুটে উঠেছে কিনা জানিনা। নারীকে জাতিগত হিসাবে খামকা আমি দেবী বলতে রাজী নই, দানবী বলতেও নই। নারী দেবী ঠিক ততখানি, পুরুষ যতখানি দেব। পুরুষ যদি সত্যই দানব ও নারী দেবী হতেন তা হোলে অমৃতভাণ্ডটি নারীর কবলেই থাকতো, আর নারী ওপরে অত্যাচার করা তো দূরের কথা, পুরুষ তাঁদের দাসা দাস হয়ে থাকতে বাধ্য হতো।

আমাদের সমাজ নারীকে অনেক বিষয়েই তাঁদের জন্মগ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। অনেকে বলেন আমাদের নারীরা এক সময় পুরুষের মতই সমস্ত অধিক ভোগ করতেন; কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ও সামাজি অবস্থার বিপর্য্যয়ে নারীদের জন্য এই ব্যবস্থা করতে হয়েে

নারীকে ঈশ্বর পুরুষের চেয়ে দুর্ব্বল করেই পৃথিবী পাঠিয়েছেন। সেজন্য পুরুষই নারীকে যুগে যুগে বাহি আক্রমণ থেকে রক্ষা করে আসছে, এটা পুরুষের না প্রতি দয়ার জন্য নয়—সবল দুর্ব্বলকে বিশেষ করে পু নারীকে রক্ষা করতে ধর্ম্মত বাধ্য এ কথায় বো মতভেদ নেই। কিন্তু আমাদের দেশে বাহিরের আক্র যতবার ও যেমনভাবে আমাদের নারীকে বধণ কে তেমনটি আর কোনো দেশেই হয় নি। নারীকে পুরুষ বাহিরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে না পারে—সে পুরুষেরই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হওয়া উচিত, নারীর কিন্তু আমাদের সমাজকর্ত্তারা পুরুষের অধিকারের পথ দিকেই প্রশস্ত করে রেখে নারীকে সিন্দুকের মধ্যে করে ফেলে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করছেন।

সে যাই হোক, এখন এদেশের অনেক নারীই দে পুরুষদের এই কারচুপী ধরে ফেলেছেন, এবং তাঁরা তাঁ

ন্মগত অধিকার দাবী করছেন। কোন রকম অধিকার াবার ইচ্ছার মূলে চাই শিক্ষা। আজ যাঁরা নারীর অধিকার াবী করে কাগজে আন্দোলনের তরঙ্গ তুলেছেন, অধিকার াবার ইচ্ছা হওয়ার জন্য যতটুকু শিক্ষার দরকার তা যে াদের হয়েছে এটুকু স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু একটা থা ভুলে গেলে কিছুতেই চলবে না। সেটা হচ্ছে—মধিকার চাইলেই পাওয়া যায় না, অধিকার কেউ দিতে ারে না বা অধিকার পাবার ইচ্ছা হলেই অধিকার পাওয়া ায় না। রাষ্ট্রীয় অধিকার, সামাজিক অধিকার যে কোনো অধিকারই হোক না কেন, তা পাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে—বিপুল চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টা করার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে নামতে আমরা কেউ চাই না; এটি আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান অভাব।

আজ যে সব নারী অনুভব করছেন যে, আমাদের সমাজ এতদিন তাঁদের চোখের সামনে একটা মিথ্যা মায়ার জাল বুনে জন্মগত অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে রেখেছে, এই মায়াজাল ছিন্ন করবার জন্য তাঁরা কাজে নামুন। তা না হলে কথায় খালি কথাই বাড়তে থাকবে। নারীর অধিকার পাওয়া চাই-ই এটা যদি তাঁরা উপলব্ধি করে থাকেন তা হলে তো তর্কের আর কোনো স্থানই নেই।

বেত্রদণ্ড—সম্প্রতি বাংলা দেশের দু-একটি জেলে জনকয়েক অসহযোগীকে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। সেদিন এখানকার ব্যবস্থাপক সভার জনকয়েক সভ্য এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের প্রতিবাদের উত্তরে [illegible] জানিয়েছেন, তাঁরা [illegible] তাঁরা [illegible] আইন [illegible] [illegible] জেলের অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের বিগড়ে [illegible] আশঙ্কা [illegible] [illegible] কিছু পাশবিক [illegible] নয়। ইংলণ্ডে বেত্র[illegible] [illegible] ছেলেরা যে সব স্কুলে (public sch[illegible]) [illegible] নিয়মকানুন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য তাদের পশ্চাদ্দেশে বেত্রাঘাত করা হয়।

সরকার পক্ষ হয়ত ভেবে আশ্চর্য্য হন যে, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরা তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এসে এ সব আবার কি কথা বলতে সুরু করেছেন! এ সব অত্যাচারের জন্য যে তাঁদের কখনও জবাবদিহি করতে হবে, সেটা বোধ হয় তাঁরা ভাবতেও পারেন না, কারণ অত্যাচারের আগেই যদি জবাবদিহির ভাবনা ভাবতে হতো, তা হলে অত্যাচার গুলো তো একটু মিঠে রকমের হতোই এবং তার জবাব-গুলোও একেবারে কচি ছেলের বুলির মতন হতো না।

যাদের পশ্চাতে বেত্রাঘাত করা হয়েছে, তারা কারা? যাঁরা বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের আইনকে অমান্য করে এবং এই গবর্ণমেণ্টের আদালতে সুবিচার হয় না এই বিশ্বাসে নিজের পক্ষ সমর্থন না করে কারাদণ্ড বরণ করেছে, তারা জেলে গিয়ে জেলের সাধারণ নিয়ম-কানুন মেনে চলবে এ বিশ্বাস গবর্ণমেণ্টের আমলাদের যে কি করে হলো তা বুঝতে পারা যায় না। জেলের অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে এদের রাখলে অন্য কয়েদীরা বিগড়ে যাবে, এ আশঙ্কা তো এমনিতেই আছে। প্রথম থেকেই এদের আলাদা জায়গায় রাখা উচিত ছিল। তা হলে আইন অমান্য করার জন্য কারাদণ্ড এবং তারপরে বেত্রদণ্ড—এই দুই দণ্ডের একটা দণ্ড থেকে তারা অব্যাহতি পেত। বেত্রদণ্ড ইংলণ্ড, সাইবেরিয়া জুলুল্যাণ্ড অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশেই প্রচলিত থাক না কেন, এ দণ্ড পাশবিক ও বর্ব্বরোচিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। সরকার তরফের এই সদস্যটি বলেছেন যে, ইংলণ্ডের Public school-এ Flogging চলে। কিন্তু তিনি ভুলে [illegible] যে, [illegible] চলে Ragging [illegible] তেমনি [illegible] কোনো আমলাকে অসহযোগীরা [illegible] [illegible] তাঁরা কি [illegible] [illegible]বন? [illegible] লোককেও Rag[illegible] [illegible] জিনিষ চলে সেই [illegible] এখ[illegible] মানে নেই। [illegible] মারার ফলে desired effec[illegible]

পাওয়া গেল কিনা, সে কথা স্পষ্টভাবে জানতে পারা যায়নি। যদি কোনো বন্দী বেত্রাঘাত সহ্য কোরেও কোনো বিশেষ নিয়মকে অগ্রাহ্য করতে থাকে তা হলে তার জন্য জেল-কর্তৃপক্ষ কি সাজার ব্যবস্থা করে থাকেন সেটা জানতে পারলে ভবিষ্যতে আলোচনা করবার একটু সুবিধা হতো।

পাঞ্জাবে নিরুপদ্রব যুদ্ধ—পাঞ্জাবে আকালি শিখেরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রব যুদ্ধ সুরু করেছে। এরকম যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায়-নি। শিখেরা গুরু-কা-বাগের সংলগ্ন বাগানকে মোহন্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মানতে চায় না, শিখদের সমাজ অর্থাৎ শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটিও গুরু-কা-বাগের মোহন্তের এই অধিকার অস্বীকার করেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই মোহন্তের পক্ষে থাকায় তাঁরা গুরু-কা-বাগের কর্তৃত্ব অধিকার করতে পাচ্ছেন না। প্রত্যহ একশ' করে শিখ অমৃতসরের মন্দিরে নিরুপদ্রব মন্ত্রে দীক্ষিত হোয়ে কৃপাণ ঝুলিয়ে গুরু-কা-বাগের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—কিন্তু পথেই পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চালাচ্ছে। যাদের গ্রেপ্তার করা না হচ্ছে তাদের চলৎশক্তি যতক্ষণ থাকছে তারা অগ্রসর হচ্ছে। আহত অপারগ হয়ে পড়বার পর গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির গাড়ী এসে তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের হাসপাতালে চিকিৎসা করছে। আহতদের নাম কোনো কোনো সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই সম্পর্কে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি এক বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। তাতে প্রকাশ যে, আহতদের প্রতি শিক্ষিত কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া নানা রকম অমানুষিক অত্যাচারের কথাও শোনা যাচ্ছে।

গবর্ণমেণ্ট অবশ্য বলেছেন যে, তেমন কিছু অত্যাচার সেখানে করা হচ্ছে না। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর [illegible] তাঁরা বোধ হয় বেশ ভালো করেই জানেন যে, দেশবাসী তাঁদের কথায় বিশ্বাস করেন না এবং দেশবাসীর প্রতিও যে তাঁদের বিশ্বাস নেই তাও তাঁদের অনেক ব্যাপারেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। গুরু-কা-বাগ যাত্রীদের প্রতি যে অত্যাচার হচ্ছে, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে তার বায়স্কোপ ছবি নেওয়া হয়েছে। এই ছবি দেখাতে গবর্মেণ্ট যেন বাধা না দেন, কারণ তাঁরা যে অত্যাচার করেননি, তা এই ছবি দেখালেই প্রমাণ হয়ে যাবে। এবং প্রত্যহ যাতে সেখানে ছবি তোলার ব্যবস্থা হয় গবর্মেণ্টের সে রকম বন্দোবস্ত করাও তাঁদের দিক থেকে বাঞ্ছনীয়।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই সম্পর্কে এক ইস্তাহার জারি করে জানিয়েছেন যে, গুরু-কা-বাগ যাত্রীদের পথের মাঝে আর আটকানো হবে না। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর কোনো রকম অত্যাচার না হয় সেদিকে তাঁরা বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখবেন। গুরু-কা-বাগে মিলিটারী এবং মটর গাড়ী করে মিলিটারী সরঞ্জামও নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মন্দির কখনো কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হোতে পারে না। সমাজ যাকে মোহন্ত বলে স্বীকার করবে সেই মন্দিরের স্বত্ব ভোগ করবে এবং সমাজ যাকে অস্বীকার করবে সে আর মোহন্ত থাকবে না। গুরু-কা-বাগের মোহন্ত কে হবে না হবে তার বিচার শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি যতটা করতে পারবেন ততটা অধিকার কি গবর্ণমেণ্টের আছে? অবশ্য গায়ের জোরের কথা হলে স্বতন্ত্র।

শিখেরা দুর্ব্বল জাতি নয়, তারা কাপুরুষও নয়। শিখদের বল এবং সাহস কতখানি, তা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বেশ ভালো করেই জানেন। এই শিখেরা ধর্ম্মের জন্য বহুবার রক্তপাত করে মরেছে। কিন্তু আজ তারা ধর্ম্মের জন্য নিরুপদ্রব যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে। তারা পুলিশের হাতে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করে নিজেদের কাছে কৃপাণ থাকা সত্ত্বেও কারো গায়ে হস্তক্ষেপ করে নি। শিখেরা আজ পর্য্যন্ত সমরক্ষেত্রে অনেক বীরত্ব দেখিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা যে দার্ঢ্য ও সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছে জগতে তার তুলনা নাই। তারা যদি এই ভাবে নিরুপদ্রব থাকতে পারে, তা হলে তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।